মানিকগ্রন্থাবলী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মানিক গ্রন্থাবলী

প্রকাশকের নিবেদন

'কল্লোল' যুগকে বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রের তৃতীয় যুগ বলা যায়। এই যুগে যে কয়জন বিশিষ্ট সাহিত্যিক গতানুগতিক ধারাবাহিক ভাবধারার গণ্ডিকে লঙ্ঘন করে সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াসী ছিলেন তাঁদের মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে বিশেষ স্থান করে নিয়েছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অনেকেই সাহিত্যের পথে মাটির কাছাকাছি, মানুষের কাছাকাছি—কল্পনার রাজ্য ছেড়ে বাস্তবের কাছাকাছি আসবার প্রয়াসী ছিলেন। কিন্তু, দৃষ্টিভঙ্গি এবং চরিত্র ও আঙ্গিক বিশ্লেষণের মধ্যে অনেকেরই ছিল স্বকীয়তা। অবশ্য, এইটাই স্বাভাবিক। মানিকের স্বকীয়তায় সে যুগে তিনি প্রায় অদ্বিতীয়, নিঃসঙ্গও বলা যেতে পারে। দুই একটি উপন্যাস এবং কিছু সংখ্যক গল্প বাদ দিয়ে তার সাহিত্য সৃষ্টির সমীক্ষা করতে গিয়ে প্রথমেই যেটা লক্ষ্যণীয় তা হলো—তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির পথে কাহিনী ও নাটকীয়তা তেমন প্রাধান্য পায় নাই। অথচ অন্তঃসলীলা ফল্গুর মতো সমাজ এবং জীবনের সত্যকে প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টায় অলক্ষ্যে প্রায় সব ক্ষেত্রেই একটি বিদ্রোহের সুর। সুন্দর, সরল ও অনায়াসী জীবনকে তিনি প্রতিহত করতে চা'ন নাই, কিন্তু বাস্তব সত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি নির্মমভাবে তাদের প্রাধান্যকে ম্লান করে দিয়েছেন। কোথাও কোথাও তাঁকে মনে হয় নির্দয় ও নিষ্ঠুর। কোথাও কঠোর পরোক্ষ বিদ্রূপে মেকী সভ্যতার আপাত সৌন্দর্য হাস্যাস্পদ। কোথাও ভদ্র পোশাকের অন্তরালে পঙ্কিল মনের ক্লেদাক্ত রুচিকে দেখে হতবাক্ হবার সুযোগ করে দিয়েছেন। আবার কোথাও নানা বিপর্যয়ের ভিতরেও ফুটে উঠেছে সংবেদনশীল স্রষ্টার মনের কমনীয়তা।

সকল দিক বিচার করে মানিক-সাহিত্য একটি আশ্চর্য সৃষ্টি। অবশ্যই সাহিত্যের মূল্যায়নে বিভিন্ন মত থাকবেই, এবং সেইটাই বাঞ্ছনীয়। সেই বিচারের ভার সাহিত্যরসিকদের উপরে। একথা অনস্বীকার্য যে, এখনও অগণিত পাঠকবর্গ মানিক-সাহিত্য পাঠ এবং আলোচনায় আগ্রহী। তাঁর গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ড অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যায়। এখনও তার চাহিদা অনেক। সেইজন্যই উৎসাহী হয়ে মানিক-সাহিত্যের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। নানা কারণে মানিক-সাহিত্যের প্রকাশের ক্রম অনুসারে গ্রন্থ সংকলন করা সম্ভব হয়নি। অবশ্য, এ-কথা স্বীকার্য যে, এই খণ্ডে সংকলিত উপন্যাস, গল্প ও অন্যান্য বিষয় প্রায় সমধর্মী। মানিক যে নির্যাতিতদের কথা বলতে চেয়েছেন সেই সকল চরিত্র ও বক্তব্য এই খণ্ডে যথাসাধ্য সংকলিত।

গ্রন্থপ্রকাশে কিছু-না-কিছু ত্রুটি থেকেই যায় সেই ত্রুটি স্বীকার করে আমরা মার্জনাপ্রার্থী।

—প্রকাশক

১৩৫২

হয়ত শেষ হত। জীবনের চাপে হুয়ে চলা মামুলি লোকের ভীড়। প্রেসের কর্মচারী শীতল, গ্রাম্য জোতদার রাখাল, গর্বিতা ধনীগৃহিনী বিষ্ণুপ্রিয়া, বাড়ি পালানো আধপাগলা মামা, নব্বুই টাকার গম্ভীর কেরানী বিধান, মেরুদণ্ডহীন ফেরিওয়ালা বনবিহারী। এত তুচ্ছ যে, চোখে পড়ে না! দূর থেকে এরা শ্রেণীর ভীড়ে একাকার—কারও নাক-মুখের আদল চোখে পড়ে না। ব্যক্তিকে চিনতে হলে কাছে আসতে হয়। শ্রেণী পরিচয়ের ভারী পর্দা সরিয়ে মনের গহনে ঢোকার পথ জানা চাই। গুণে মানুষ ভাবমাত্র। পরিপাটি সজ্জাটি নিখুঁত। পাপে বিকারে ব্যাধিতে প্রসাধনে চিড় ধরে, সাজ ভাঁজ কিঞ্চিৎ বিচলিত হয়। দোষে মানুষ ব্যক্তি। জননীর বহু মানুষের ভীড়ে আমরা হারিয়ে যাই না, কারণ মনের কোণের গোপন ছিটে-ফোটা অশুচি ভাবনায় এরা এক একটি স্বতন্ত্র মুখশ্রী। গ্রীক ট্র্যাজেডিতে বাঁধা মুখোস অভিনয় চলত। জীবন ট্র্যাজেডিতে যত কোটি মানুষ তত কোটি মুখোস। কারুর চামড়ার সঙ্গে তা জুড়ে গেছে। কেউ অতৃপ্ত কেউ অশান্ত। খসে পড়ছে কারুর নির্মোক।

শীতলের পলায়নপর উচ্ছৃঙ্খলতা, অসামর্থ্যজাত ক্রোধ, পিতৃত্বের তির্যক অভিব্যক্তি, পত্নীকে পীড়নের উদ্দেশ্যে নির্মম আত্মপীড়নের উন্মত্ততা। রাখালের দ্বিপত্নীত্ব, মন্দার সপত্নী প্রীতির আত্মতুষ্টি। পুত্রশোকে শ্যামা কিভাবে কাঁদে বিষ্ণুপ্রিয়ার তাই দেখতে আসা, যৌবনে যোগিনী হওয়া এবং প্রৌঢ়ত্বে নর্মসজ্জা। শামুর প্রতি বকুলের বক্রদৃষ্টি, মেরুদণ্ডহীন বনুবাবুর নীরব প্রেম বা পূজা, বিভার সরব সপ্রীতভ ভর্ৎসনা। অনাচারী মামা এবং রুক্ষ দয়ার্দ্র হারাণ ডাক্তার। সাধারণ প্রতিটি মানুষই প্রায় অসামান্য। আর তারা স্বতন্ত্র হয়েও সংলগ্ন শ্যামার কেন্দ্রে।

বিধানকে না নিয়ে শঙ্করদের গাড়ি স্কুলে চলে গেলে শ্যামা অপমানিত হয় এবং সাশ্রু নেত্রে অনুরোধ করতে ছোটে। বিরক্ত বিষ্ণুপ্রিয়া না চাইতে কুড়িটা টাকা তার হাতে গুঁজে দিলে সে লাঞ্ছিতা বোধ করে কিন্তু ভরসার স্বস্তির নিশ্বাসও ফেলে। বাঘিনীর সন্তান রক্ষার উদগ্র জৈব-কামনাই মনুষ্য জগতে বিচিত্র ক্ষুদ্র স্বার্থবোধ-হীনতা হৃদয়হীনতার সঙ্গে মিলেছে। স্বামীর প্রতি দয়া আছে মোহ নেই, সেবায় সে জননী কিন্তু হৃদয়ে কদাপি ব্যাকুল নয়। শীতলের জেল হবার মুখে কাতর হয়ে লুকানো হাজার টাকা দিয়ে ফেলেনি। অলস স্বামীর রুগ্নতার ভান ধরে ফেলতে তার কষ্ট হয় নি, ভেঙে দিতে মমতা হয়। এই উপন্যাসের ছোট বড়ো অনেক চরিত্রের মত শ্যামাও ভেঙে অনেকখানা। কিন্তু টুকরোগুলো একত্রে অখণ্ডও।

এ জননীতে গোর্কির মায়ের বৈপ্লবিক গৌরব নেই। শরৎচন্দ্রের মায়েদের মত বিশ্বস্নেহরসের উৎস নয় সে-হৃদয়। কিন্তু সহজ সরল বিশেষত্বহীন স্বাভাবিক পায়ের তলার ঘাসের মত, মাটির মত। তাই অনেক বড়। আদর্শে নয় মমতায় নয়। এত তুচ্ছ মাহাত্ম্যহীন এবং এত বড়ো যে শ্যামা ছাড়া অন্য নামে তাকে ডাকা যেত না। বাঙালি তো এই নামেই আদ্যা প্রকৃতিকে দিয়েছে জননীর অভিধা। পাপ-পুণ্য বিচারের উর্ধ্বে মানবের দেহপ্রসবিনী বসুন্ধরা—বিষণ্ণ গম্ভীর চতুর প্রসন্ন জননী শ্যামা। আর "কোলে স্পন্দিত হইতে লাগিল জীবন"। যেমনটি সাধারণতঃ হয়ে থাকে। সে জীবনের চেয়ে অনন্ত রহস্যময় আর কি আছে?

।। সহরতলী ।। (প্রথম পর্ব। উপন্যাস। ১৯৪১।)

সহরতলীর দেহগত বিস্তার যেন কেন্দ্রাতিগ। বহু নরনারী। কখনও শুধুই জনতার ভীড়। কচিৎ মুখাবয়ব। কেন্দ্র হিসেবে যশোদার চরিত্র যতই শক্তিময়ী হোক সে শ্যামারই কতক অনুবৃত্তি। সন্দেহ নেই, স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। কিন্তু এদের জন্ম একই উৎসে এবং তা মানিকবাবুর একটি অতিপ্রিয় উওম্যান-মোটিফ্। যশোদায় শ্যামার সূক্ষ্মতা বা বিকাশ নেই। শ্যামা জননী, যশোদা মৃতবৎসা। মৃত চাঁদ শুধু স্মৃতি, সর্বজনপ্রিয় পরিচয় তার চাঁদের মা। শ্যামার সংসার তার দেহের বিস্তার বলে রক্ত-মাংস-মজ্জার মত সত্য; যশোদার বানানো সংসার গড়ায় ভাঙায় নাড়ীতে টান পড়ে না। যশোদার চরিত্র না হলেও মাতৃত্ব কিছু আদর্শায়িত। তার হোটেলকল্প সংসারে কমিউনিটি কিচেনের সমাজতান্ত্রিক আদল যদি থাকেও সে বন্ধন শিথিলগ্রন্থি।

যশোদার মনোজীবন আবেগজয়ী। অনেকখানি পুরুষালি অথচ নারীই। নারী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয় অভিমানে—শরৎ-সাহিত্যের এ শিক্ষা আর চলল না। যশোদায় মেয়েলি ছলাকলা নেই, পুরুষের দৃঢ়তা আছে। তার বিপুল দেহে নেত্রীর শক্তিতে অরমণীয় রমণীত্ব কিছু ছিল। মতি সুধীর রাজেন ধনঞ্জয় তার প্রমাণ। কারুর গোপন কামনায়, কারুর স্পষ্ট প্রস্তাবে, ঈর্ষার বিষে ওয়াগন ঠেলে প্রতিদ্বন্দ্বী-হননের নির্বিকার চেষ্টায়, কখনও অসহায় আত্মসমর্পণে—যার প্রকাশ।

মানিকবাবু সহরতলীতে শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের নানা মানুষের কাহিনী বলেছেন। তাদের শ্রেণী হিসেবে চিনতে চেয়েছেন, কিন্তু একমেটে পরিচয়ে, কোনো রাজনৈতিক ভাবাদর্শের চিহ্নে নিঃশেষে বুঝে উঠতে চান নি। তাদের স্বতন্ত্র করে এঁকেছেন।

যশোদার রাজনৈতিক বুদ্ধি নেই। কিন্তু সহজ প্রেমে সে বহুশক্তি মালিকের সঙ্গে লড়েছে। কৌশলের কাছে হেরেছে, কিন্তু শ্রমিকদের প্রতি ভালোবাসা হারায় নি। উত্তর পর্বে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাস একটা আকস্মিক ব্যাপার ছিল না। যশোদার বিরক্তিমিশ্র প্রীতিতে, ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতায়, শ্রেণীগত ভালোবাসায় মানিকবাবুর রাজনৈতিক ভবিতব্যের ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায়।

সহরতলীতে সুঅঙ্কিত মানুষ অনেক। সরল জটিল ভাঙাচোরা গভীর নানা মানুষ। প্রায়ই তারা অসমাপ্ত রেখায়, অল্প অবকাশে মনের আরণ্য গহনতার ইঙ্গিতবাহী। কীর্তনের আবেগ উদ্বেল নন্দর স্নায়ুবিকলতা, কুমুদিনীর বিরূপ সখীত্ব, ভগ্ন-মেরুদণ্ড জ্যোতির্ময়ের পদলেহন, অজিত-সুব্রতার হিসেবী তারুণ্য, বিদ্রোহী জামাতা যামিনীর আত্মসমর্পণের আগ্রহে ধনাঢ্য শ্বশুরের অঙ্গুলিহেলনের ব্যাকুল প্রতীক্ষা, বনলতার ঈর্ষাকুটিল স্নায়ুবিকার, সুবর্ণর প্রণয়-হিষ্টিরিয়া। দ্বিতীয় পর্বের ভদ্রলোকেদের প্রসঙ্গে বর্ণ বিরলতা প্রকট। এই অংশের পরিকল্পনায়—শুরু এবং সমাপ্তির আকস্মিকতায় ঔপন্যাসিকের কোনো সরল বা জটিল অভিপ্রায়ই অনুভূত নয়।

যশোদার চরিত্রের মূল বদলায় নি। অনেক মানুষের অবিরাম আসা যাওয়া তার বাড়ির এবং মনেরও পান্থশালায়। সেই ভাসমান নর-নারী চলমান ছবির মত মনের পর্দায় বয়ে রেখাপাত করে গেছে, তার অস্তিত্বে গভীর কর্ষণের দাগ রাখে নি।

মিল মালিক সত্যপ্রিয়ের কুশল মুখোসবৃত্তি, চতুর দেশদ্রোহ, বিগতচিত্ত নিস্পৃহা, সূক্ষ্ম মুনাফাবুদ্ধি, ঝুটা মূল্যবোধের চাকচিক্য, মানবদুর্বলতা বিষয়ে প্রজ্ঞা এবং তার পূর্ণ ব্যবহার একটা চমৎকার ভৎ'সনাতিক্ত ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে। তবুও বলা যায় এই সব উপাদানের মধ্যে মুখ্য চরিত্র অভিপ্রায়ের বিরোধিতা কোথাও নেই;—সূত্রগুলি তার শ্রেণীস্বার্থানুগ; নীরক্ত হননে নিরীহ।

তবুও সত্যপ্রিয়ের এ জটিলতা আপাত, প্রকৃত নয়। মানিকবাবু এতে

তৃপ্ত হতে পারেন না।

যে যশোদার সঙ্গে সত্যপ্রিয় শত্রুতা করেছে পার্থিব তুলনায় সে কত অকিঞ্চিৎকর। অবিচল বুদ্ধির প্যাঁকে প্যাঁকে পর্যুদস্ত করেও যশোদাকে এই ধনী মালিক পরাভূত করতে পারে নি। এ সবের পেছনেও কিছু ছিল, যতটা বোঝা যায় তার চেয়ে বেশি, বিপরীত কিছু। মানিকবাবুর ভাষা ছাড়া সেই অগ্নিগর্ভ কামনার অত শান্ত ক্ষণস্থায়ী আত্মপ্রকাশ অনুভব করা যাবে না:

> "সত্যপ্রিয় এতক্ষণ অন্যদিকে চাহিয়াছিল, কথা বলিবার সময় সে কদাচিৎ শ্রোতার মুখের দিকে তাকায়। এবার যশোদার চোখে চোখ মিলাইয়া সে খানিকক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল, তারপর মৃদুস্বরে বলিল, 'অন্য কেউ একথা বললে বিশ্বাস করতাম না, চাঁদের মা। তবে তোমার কথা আলাদা। তুমি কখনো মিথ্যা বল না'।
>
> সত্যপ্রিয়ের দৃষ্টি দেখিয়া যশোদা এক মুহূর্তের জন্য শিহরিয়া উঠিয়াছিল। যশোদার স্নায়ুগুলি এরকম শিহরণের উপযোগী করিয়া তৈরী হয় নাই; রাতদুপুরে হঠাৎ বাড়ীর অন্ধকারে একটা ভূত দেখিলেও সে ভালো করিয়া চমকাইয়া ওঠে কি না সন্দেহ। কিন্তু সত্যপ্রিয়ের দৃষ্টিতে যে ভাষা তার স্পষ্ট চোখে পড়িয়াছে ভূত দেখার চেয়ে তা চমকপ্রদ। ধনঞ্জয়ের চোখে একদিন যশোদা এ ভাষা দেখিয়াছিল, তবে সত্যপ্রিয়ের চোখের এমন বিশ্বগ্রাসী মারাত্মক ক্ষুধার সঙ্গে ধনঞ্জয়ের সেই মৃদু কামনার অভিব্যক্তির তুলনাই হয় না। হঠাৎ যশোদার একটা অদ্ভুত ধরনের লজ্জা বোধ হয়, অনেকদিন সে-রকম লজ্জার সঙ্গে তার পরিচয় ঘুচিয়া গিয়াছিল।"

চোখের সেই অস্বাভাবিক দীপ্তিতে দেহের কামনা ছিল না; এবং এর মুখে দাঁড়িয়ে পাঠক যে বিপন্ন বিস্ময় অনুভব করে তাতে সহরতলীর উপন্যাসের অনেক দুর্বলতার দাম মিটে যায়।

॥ প্রতিবিম্ব ॥

প্রতিবিম্বর আকার ছোট। প্রকৃতি নিটোল। সহরতলীর শিথিল বিকেন্দ্রীকরণ এখানে নেই। যুদ্ধের অফিসে—জীবনযুদ্ধের বলতে ক্ষতি কি—তারকের একটা

ইন্টারভিউ গল্পের সুনির্দিষ্ট বিষয়। হিটলার-বিরোধী যুদ্ধে মিত্রপক্ষে যোগ দেওয়া আয়ত্তপ্রায় ছিল। স্বেচ্ছায় তা মুষ্টিচ্যুত করতে হলো। সমাজতন্ত্রের মহত্তর যুদ্ধে শ্রেণীসংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিতে দুর্লভ প্রবেশাধিকারও অবাধ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তাও প্রত্যাখ্যাত হল। তারক খুঁজছিল জীবিকা আর জীবনের সত্য।

গ্রাম থেকে কলিকাতায় এসেছে তারক। পার্টি কমিউনে কিছুকাল কাটাল। গ্রামের কর্মগুরু রামবাবুর উদ্দেশ্য ছিল তাকে এর মধ্য দিয়ে পার্টির ভেতরে টেনে নেওয়া। শ্বশুর আর স্ত্রীর গরজ ছিল তার চাকরিতে ঢুকে পড়ায়। তারক ইন্টারভিউ দিয়েছিল। উভয়ত স্বেচ্ছাকৃত বিফলতা নিয়ে সে প্রত্যাবর্তন করেছে তার গ্রামে। অবশ্যই তারকের কোনো মহৎ যন্ত্রণা নেই—জিজ্ঞাসাও। কিন্তু একটা বিশিষ্ট মনুষ্যত্ব আছে যা একেবারে সাধারণের কাঠামোয় ধৃত। নেশা হলে সে কর্মে উৎসাহী, পেশা হলে আতঙ্কিত। চাকরির ফাঁদে সে পড়ে নি, পার্টির জালেও নয়। পৃথিবীর নিয়মকানুনের অনেক স্বতঃসিদ্ধ তার চরিত্রের বাইরের সীমা পর্যন্ত মাত্র পৌঁছতে পেরেছে। স্বেচ্ছাচার তার রক্তে অথচ উচ্ছৃঙ্খলতা নেই কোথাও। বিদ্রোহের উচ্চকণ্ঠে তার প্রবৃত্তি নেই। বন্ধনভীরু স্বভাবের প্রতি রক্তকণিকায় স্বাধীন ব্যক্তিত্ব। সেই স্বাতন্ত্র্য কোনো সামাজিক বিদ্রোহে উচ্চকণ্ঠ নয়। প্রায় অনুচ্চার আত্মকেন্দ্রিক। কখনও পলায়নপর। কোনো তটস্থ দার্শনিকের কর্মবিমুখ চিত্তের উদ্‌ঘাটন লক্ষ্য নয় এক্ষেত্রে—জীবনযুদ্ধে ভগ্নবিকৃত প্রাণ সে নয়। সহজ সুস্থ জীবন বিষয়ে আগ্রহী এবং বিরূপও, যদিও তিক্ততা নেই। অর্থাৎ সে প্রান্তবাসী।

প্রতিবিম্ব উপন্যাসে মাণিকবাবু রাজনীতির দলের মত ও মতের তর্ক তুলেছেন। ঔপন্যাসিকের শিল্পীমনের বিবর্তনে এর ভূমিকা তুচ্ছ নয়। তাঁর উপলব্ধির উত্তর কোটিতে যে বিশিষ্ট রাজনৈতিক প্রত্যয় প্রাধান্য বিস্তার করেছিল তার আবির্ভাব ও পরিণতির একটি আভ্যন্তর ইতিহাস আছে। সহরতলী উপন্যাসে দেখা গেছে শ্রমিকদের প্রতি ঔপন্যাসিকের এক ধরনের প্রীতির আকর্ষণ—ধনপতির শোষণ কৌশলের মর্মচ্ছেদও। অবশ্য ঠিক কমিউনিস্ট পার্টি বা কোনো বিশিষ্ট মতবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে সে-ভাবনা বিস্তার লাভ করে নি। আবার প্রতিবিম্বে সংগ্রামী শ্রমিক-কৃষকেরা নেই বটে তবে পার্টির ভেতরে

তাকাবার চেষ্টা আছে। বইয়ের ভূমিকায় লেখক যা-ই বলুন, যে কোনো সতর্ক পাঠকই বলবেন প্রতিবিম্বে কমিউনিস্ট পার্টিই মানিকবাবুর লক্ষ্য।

সহরতলী-প্রতিবিম্বের মত উপন্যাসের ঘুরপাক খেতে খেতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানস প্রতিক্রিয়া বক্রজটিল মনুষ্যভাবনা থেকে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতায় পৌঁছেছিল।

এই উপন্যাসে কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরের যে ছবি আছে তা তারকের মনের আয়নায় প্রতিবিম্বিত। এবং সে-আয়না কারাখানায় তৈরি নিখুঁত বস্তু নয় বলেই কিঞ্চিৎ চিড়্ ধরা। সম্ভবত তারকে লেখকের ভেতরের অংশও কিছু স্থানলাভ করেছিল। ঔপন্যাসিকের তরফ থেকে কোনো কৈফিয়ৎ অবান্তর। কারণ এ-চিত্র ডকুমেন্টারি নয়। রবীন্দ্রনাথের সন্দীপের শুদ্ধ পাপোদ্বুদ্ধ মনুষ্য-ধর্মে সেকালের স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাস খোঁজা চলবে না, তেমনি তারকের মনের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন কমিউনিস্ট পার্টির তথ্যনিষ্ঠ পরিচয় নয়।

পার্টির কর্মীদের যৌথবাস যৌনমুক্তি ও আদর্শবাদের উচ্চকণ্ঠ ভেদ করে ঈষৎ ব্যঙ্গের রঙ্ ফুটে বেরিয়েছে। সে-ব্যঙ্গের রঙ্ ছাপিয়ে কয়েকটি মানুষ সঙ্কীর্ণ অবকাশে দুই একটি রেখার টানেই পূর্ণমুখশ্রী। বিশেষত সরোজিনী আর সীতানাথ। সরোজিনীর চেহারায় পুঞ্জ পুঞ্জ বিষাদ। সে কিন্তু এই বিষাদকে তার রূপের ছলনা বলে মনে করে। জননীর ন্যায় তার নেত্রীত্ব—সহনশীল গম্ভীর শান্ত। সীতানাথের অধীর এবং সংযমোধ্ব তারুণ্যে, সরোজিনীর নিরুত্তাপ প্রত্যাখ্যানে, তারকের বীরত্বে যে নাটক জমে উঠেছিল গোটা উপন্যাসে তা-ই শীর্ষ। নাটক করার দায়িত্ব গ্রামের তারকের। সহরের অন্যেরা মূর্তিমান অনাটক। তারা কি দগ্ধচিত্ত অথবা সবটাই উধ্বগতি-কামনার ভান? এ-জাতীয় নাটক করায় মানিকবাবুর আগ্রহ কম। এখানেও তা শুধু উপলক্ষ। লক্ষ হল চারপাশের কয়েকটা মানুষ যাদের সূক্ষ্ম যৌনবোধে, ছলনায়—অপরকে ছলনার চেয়ে আরও বেশি নিজেকে ছলনায় দুশ্ছেদ্য-গ্রন্থি মনস্তত্ত্বের জাল বিস্তৃত। সীতানাথের প্রতি সরোজিনীর মন যতটা নিরুত্তাপ ততটা নির্দোষ কি? সীতুর বালকভাব কি প্রত্যাখ্যাত-প্রহৃত হয়ে কোনো গোপন তৃপ্তি পায় নি? তারকের ঔদ্ধত্য কি নির্মোহ সমাজস্বাস্থ্যের বাহনমাত্র? ছাদে দাঁড়িয়ে সরোজিনীকে পরীক্ষা করে যে প্রশ্ন সে করেছিল তা কি কোথাও কামনায় একটু ভেজা ছিল না?

এই প্রশ্নগুলি অবাস্তব নয়। তবুও প্রতিবিম্ব মানিকবাবুর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির মত মহৎ নয়। এখানে তিনি জটিলতাকে ছুঁয়ে গেছেন, মানবমনের ভুলভুলায়ায় হারিয়ে যান নি।

।। প্রবন্ধ ।।

মানিকবাবুর কয়েকটি প্রবন্ধ এই সংকলনে স্থান পেয়েছে। এগুলি ততটা মূল্যবান প্রবন্ধ নয় বটে, কিন্তু এগুলি লেখকের শিল্পী-ব্যক্তিত্বের হদিশ পাবার উপাদান। জীবনের একটা উল্লেখ্য পর্যায় তিনি প্রগতি লেখক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। মার্কসবাদী লেখক-কর্মীরূপে নিজের পরিচয় দিতে দ্বিধা ছিল না। সেই বিশ্বাসজাত সাহিত্য-ভাবনা, কিছু তাৎকালিক সমস্যা, কিছু বিতর্ক, নিজের পুরানো ও নূতন লেখা সম্বন্ধে মন্তব্য এ বইয়ের প্রবন্ধ-গুচ্ছে স্থান পেয়েছে।

আধুনিক বাংলাদেশের সাংস্কৃতির ইতিহাসে এই পর্বটির গুরুত্ব ছিল। মানিকবাবুর প্রবন্ধ ক'টি উপাদনরূপে গবেষকদের কাজে লাগবে।

আমি অবশ্য মানিকবাবুর তুচ্ছ লেখাও তাৎপর্যবহ মনে করি অন্য কারণে। লেখকের ব্যক্তিত্বকে তার রূপান্তরকে তার আত্মিক সঙ্কট ও সঙ্কট-উত্তরণের প্রয়াসকে বুঝতে গেলে এদের সাহায্য নিতে হয়। মানিকবাবু খুব ভালো প্রবন্ধ লিখেছেন এখানে এ-কথা বলা চলবে না—কিন্তু যে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব স্পর্শ করতে চাই তার কোনো মানস স্তরের উপরে এই সচেতন চিন্তার আলোকে দৃষ্টিপাত সম্ভব।

সমকালের গল্পোপন্যাসের সঙ্গে মিলিয়ে এই প্রবন্ধগুলি পড়লে নিজেকেই প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়। উত্তরকালের কমিউনিস্ট বিপ্লবী মানিকবাবু কি এই স্থূল বহিরঙ্গ সংগ্রামের যোগ্য সৈনিক—না যে আভ্যন্তর চিত্ত-সংঘর্ষে তিনি ছিলেন নিত্য আহত এ পর্ব তা থেকে পলায়নের—বিশ্বাস থেকে সংশয়ে স্পষ্টতা এড়িয়ে প্রত্যক্ষ বক্রতায় রহস্যকুটিল মনুষ্যসত্যকে শ্রেণীবোধের সাদা-কালো ছকে রূপান্তরিত করায়? বাইরের দৃষ্টিতে যা সংগ্রাম মানিকবাবুর কাছে তা-ই কি নিশ্চিত বিশ্রাম? আর সমাজতন্ত্রের যোদ্ধা-লেখকরূপে সোচ্চার আত্মঘোষণায় নেই কি আত্মছলনা? ভাষায় জমেছে অনেক ক্লান্তি। ইস্পাতে মরচে ধরেছে। আকাশের বিদ্যুতের প্রতিবিম্ব আর নেই।

।। গল্প ।।

সংকলিত গল্পের সংখ্যা পাঁচটি। লেখকের শিল্পীজীবনের দুই পর্বের গল্পই আছে। প্রাগৈতিহাসিক, শৈলজ শিলা, মাটির সাকীতে তিনি জীবনকে শুধু নিজের মত করে দেখেছেন। হারানের নাতজামাই বা ছোট বকুলপুরের যাত্রীতে মানিকবাবু সংগ্রামী শিল্পী। কমিউনিস্ট কর্মী। ১৯৪৮-৫১-র ভারতের কমিউনিস্টদের ভাবনা ও কর্ম থেকে এই দুটি গল্পকে ছিন্ন করা চলে না।

তাঁর প্রথম পর্বের গল্প জীবন বিষয়ে তির্যক ও জটিল, জৈবসত্যে নিষ্করুণ, প্রসাধিত সৌন্দর্যঘাতী।

'প্রাগৈতিহাসিক'। গল্পটি জৈব অস্তিত্বের সত্যোপলব্ধি। সভ্য পৃথিবীর রুচিচিক্কন সংস্কৃতির অন্তরালবর্তী শুধু জীবন ধারণের মনহীন গতি, জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখার নিয়তি নিয়ন্ত্রিত চক্রাবর্তন। এর ক্ষণিক নিষ্ঠুর পরিচয়ে হৃৎপিণ্ড চঞ্চল হয়। বিশ্ববিধানের মূলে যে শক্তি আছে যা জীবধাত্রী তা-ও তো বিমল। আবেগহীন প্রীতিহীন ভিখুতে, তার পরিচিত জগতে পাপ কত সহজ, হত্যা বিবেকহীন, যৌন লিপ্সায় কোন বাধা নেই। তখন এত সাধের মানব জন্ম সম্বন্ধে ঘৃণা হয় কি? মনে হয় না, মানুষ এমন কি ব্যর্থ?

'শৈলজ শিলা'। এ গল্পে মনই প্রধান। মননে যন্ত্রণা। কামনার আগুনে জ্বলছে বাৎসল্যের পবিত্রতা। বৃদ্ধের মানসবিকার এখানে নির্মম, কিন্তু সহানুভূতিতে দ্রব। মানিকবাবুর সহজ স্বল্পাবেগ ভাষা এ গল্পে ঈষৎ কম্পমান। শিলার প্রেমে, কামবদ্ধ বৃদ্ধের প্রতি যৌন নিশ্চিত অস্বীকারে কিন্তু অক্রোধে বৈশিষ্ট্য বিশেষ নেই।

'মাটির সাকী'। গল্পের কেন্দ্রে দুটি বিপরীত দৃষ্টিকোণ থেকে আলো পড়ায় কিছুটা পূর্বপরিকল্পনার চিহ্ন আছে মনে হয়। শঙ্করদের ক্লিষ্ট জীবনও যে কোনো দিক থেকে হিমানীদের কাম্য হতে পারে এ ভাবনায় বিস্ময় আছে। কিন্তু গল্পের অভিনবত্ব হল হিমানীর প্রসাধনের ফাঁক দিয়ে দেখা হৃদয়-সংবাদে। আরও বেশি করে তার চরিত্রবিকারে মনের ভারসাম্য চ্যুতিতে।

উত্তর পর্বের জীবন অনেক সরল। মানুষ প্রায় সুনির্দিষ্ট। ঘটনাও যেন পরিকল্পিত। গল্প হয়েছে প্রচার। তার বিরুদ্ধে আভ্যন্তর-যুদ্ধ আছে শিল্পী-প্রাণের। ফলশ্রুতিতে কচিৎ প্রচারও রূপান্তরিত শিল্পে।

'হারাণের নাতজামাই'। এ গল্প শিল্পের অপমৃত্যু। আশ্চর্য মনে হয় মানিকবাবুর মানুষেরা এত সহজ ভোঁতা স্বাতন্ত্র্যহীন। ময়নার মার নৈতিক বিপ্লবী মনও তাৎপর্যহীন—কারণ এ দুঃসাহস শ্রেণীস্বভাব। শ্রেণীসংগ্রাম গরীব চাষীর নৈতিক ভাবনায়ও রাতারাতি বিপ্লব ঘটিয়েছে। জগমোহনের আচরণের আকস্মিক পরিবর্তন ছক ধরে এগিয়েছে বলে সত্যের বিভ্রম নেই। এ গল্পের মানুষ ইসতেহারের ভাষা শুধু।

'ছোট বকুলপুরের যাত্রী।' উত্তর পর্বের এ-ধরণের শিল্পসিদ্ধ রচনা অল্প। চরিত্র ভাবনায় এখানেও ব্যক্তির আভ্যন্তর জটিলতা প্রশ্রয় পায় নি। ঘটনায় নয়, বিন্যাসে প্রসঙ্গ ছাপিয়ে একটা সূক্ষ্ম রুচিবোধ ইঙ্গিতময় হয়ে উঠেছে। সে ইঙ্গিত মানবজীবনের গূঢ় মহলের অভিমুখি নয়। তবুও শ্রেণীস্বভাবের বিপরীত বৈচিত্র্যে এ গল্প অভিনব—বিশেষত তা শব্দার্থে নয় ছবির রঙের ভাষায় প্রকাশিত বলেই। বহু অস্ত্রে উদ্যত গার্ডদের ত্রস্ত গোপন ভীতিও দিবাকর-আন্নার সহজ স্বস্তির সংঘাতে এ গল্পে রস জমেছে। সমাপ্তির ব্যঙ্গে, অবিশিষ্ট দিবাকরকে ঘিরে মনুষ্যমহিমার যে জয়ধ্বনি উঠেছে তা শিল্পসার্থক। কারণ, লেখকের অভিপ্রায় এখানে গল্পস্বভাবের অঙ্গ।

ক্ষেত্র গুপ্ত
অধ্যাপক
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
কলিকাতা।

উপন্যাস

জননী -- ২১

শহরতলী (প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব)- ২০৯ - ৩৬১

প্রতিবিম্ব -- ৪৫৭

প্রবন্ধ

কেন লিখি -- ৫১১

প্রগতি সাহিত্য -- ৫১৩

বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা -- ৫২০

সাহিত্য সমালচনা প্রসঙ্গ -- ৫২৩

উপন্যাসের ধারা -- ৫৩০

সাহিত্যিক ও গুন্ডামি -- ৫৩৯

নতুন জীবন -- ৫৪০

ভারতের মর্মবাণী -- ৫৪৩

গল্প

প্রাগৈতেহাসিক -- ৫৪৯

শৈলজ শিলা -- ৫৬৫

হারাণের নাতজামাই -- ৫৭৮

ছোট বকুলপুরের যাত্রী -- ৫৯০

মাটির সাকি -- ৫৯৯

जननी

এক

সাত বছর বধূজীবন যাপন করিবার পর বাইশ বছর বয়সে শীতলের দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী শ্যামা প্রথমবার মা হইল। এতকাল অনুর্বরা থাকিয়া সন্তান লাভের আশা সে একরকম ছাড়িয়াই দিয়াছিল। ব্যর্থ আশাকে মানুষ আর কত-কাল পোষণ করিতে পারে। সাত বছর বন্ধ্যা হইয়া থাকা প্রায় বন্ধ্যাত্বের প্রমাণেরই সামিল। শ্যামাও তাই জানিয়া রাখিয়াছিল। সে তার মায়ের একমাত্র সন্তান। একমাত্র সন্তান না হইয়া তার উপায় অবশ্য ছিল না, কারণ সে মাতৃগর্ভে থাকিতেই তার বাবা ব্রহ্মপুত্রে নৌকাডুবি হইয়া মারা যায়। তারপর তার আর ভাইবোন হইলে সে বড় কলঙ্কের কথা হইত। শ্যামার যেন তাহা খেয়াল থাকে না। সে যেন ভুলিয়া যায় যে, তার বাবা বাঁচিয়া থাকিলে সাতভাই চম্পার একবোন পারুলই হয়তো সে হইত, বোনও যে তাহার দু-পাঁচটি থাকিত না, তা-ই বা কে বলিতে পারে? তবু, একটা যুক্তিহীন ছেলেমানুষী ধারণা সে করিয়া রাখিয়াছিল যে, সে নিজে যখন এক-মা'র একমেয়ে, দুটি একটির বেশী ছেলেমেয়ে তারও হইবে না।—বড় জোর তিনটি। গোড়ার কয়েক বছরের মধ্যেই এরা আসিয়া পড়িবে, এই ছিল শ্যামার বিশ্বাস। তৃতীয় বছরেও মাতৃত্বলাভ না করিয়া সে তাই ভীত হইয়া উঠিয়াছিল। তার পরের চারটা বছর সে পূজা, মানত, জলপড়া, কবচ প্রভৃতি দৈব উপায়ে নিজেকে উর্বরা করিয়া তুলিতেই একরকম ব্যয় করিয়াছে। শেষে, সময়মত মা না হওয়ার জন্য এবং দৈব উপায়ে মা হইবার চেষ্টা করার জন্য নানাবিধ মানসিক বিপর্যয়ের পর তার যখন প্রায় হিষ্টিরিয়া জন্মিয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে, তখন ফাল্গুনের এক দুপুরবেলা ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া শীতলপাটিতে গা ঢালিয়া ঘুমের আয়োজন করিবার সময় সহসা বিনাভূমিকায় আকাশ হইতে নামিয়া আসিল সন্দেহ। বাড়িতে তখন কেহ ছিল না। দুপুরে বাড়িতে কেহ কোনদিনই প্রায় থাকিত না, থাকিবার কেহ ছিল না—আত্মীয় অথবা বন্ধু। সন্দেহ করিয়াই শ্যামার এমন

বুক ধড়ফড় করিতে লাগিল যে, তার ভয় হইল হঠাৎ বুঝি তার ভয়ানক অসুখ করিয়াছে। সারাটা দুপুর সে ক্রমান্বয়ে শীত ও গ্রীষ্ম এবং রোমাঞ্চ অনুভব করিয়া কাটাইয়া দিল। সন্দেহ প্রত্যয় হইল একমাসে। কড়া শীতের সঙ্গে শ্যামার অজ্ঞাতে যাহার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, সে জন্ম লইল শরৎকালে। জগজ্জননী শ্যামা জগতে আসিয়া মানবী শ্যামাকে একেবারে সাতদিনের পুরাতন জননী হিসাবে দেখিলেন।

শ্যামার বধূজীবনের সমস্ত বিস্ময় ও রহস্য, প্রত্যাশা ও উত্তেজনা তখন নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। নিঃশেষ হইবার আগে ওসব যে তাহার খুব বেশি পরিমাণে ছিল তা বলা যায় না। জীবনে শ্যামার যদি কোনোদিন কোনো অসাধারণত্ব থাকিয়া থাকে, সে তাহার আত্মীয়স্বজনের একান্ত অভাব। জন্মের পর জগতে শ্যামার আপনার বলিতে ছিল মা আর এক মামা। এগার বছর বয়সে সে মাকে হারায়। মামাকে হারায় বিবাহের এক বছরের মধ্যে। মামার কিছু সম্পত্তি ছিল। প্রকৃতপক্ষে, উত্তরাধিকারীবিহীন এই মামাটির কিছু সম্পত্তি না থাকিলে শীতল শ্যামাকে বিবাহ করিত কি না সন্দেহ।

মৃত্যুর মধ্যে মামাকে হারাইলে সম্পত্তি শ্যামা পাইত সন্দেহ নাই। কিন্তু শ্যামার বিবাহের পর একা থাকিতে থাকিতে মামার মাথার কি যে গোলমাল হইয়া গেল, নিজের যা-কিছু ছিল চুপিচুপি জলের দামে সমস্ত বিক্রয় করিয়া দিয়া একদিন তিনি উধাও হইয়া গেলেন। একা গেলেন না। শ্যামার মামাবাড়ির গ্রামে আজীবন সন্ন্যাসী-ঘেঁষা প্রৌঢ়বয়সী ব্রহ্মচারী মামাটির কীর্তি এখনো প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। প্রসিদ্ধ হইয়া আছে এই জন্য যে, শ্যামার মামা সামান্য লোক হইলেও আসল কলঙ্ক যাদের, তাদের চেয়ে বনেদী ঘর আশে-পাশে দশটা গ্রামে আর নাই। এই গেল শ্যামার দিকের হিসাব। স্বামীর দিকের হিসাব ধরিলে বিবাহের পর শ্যামা পাইয়াছিল শুধু একটি বিবাহিতা রুগ্না ননদকে।

সে মন্দাকিনী।

প্রথমবার স্বামিগৃহে আসিয়া শ্যামা, কোনো দিকে তাকানোর অবসর পায় নাই। মন্দাকিনী তখন সুস্থ ছিল। নিজের নানাপ্রকার বিচিত্র অনুভূতি, প্রতিবেশিনীদের ভিড়, বৌভাতের গোলমাল, সব মিলিয়া তাহাকে একটু উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। মামার কাছে ফিরিয়া যাওয়ার সময় সে শুধু সঙ্গে লইয়া

গিয়াছিল কয়েকটা হৈ-চৈ-ভরা দিনের স্মৃতি। ছ' মাস পরে এক আসন্ন-সন্ধ্যায় আবার এ বাড়িতে পা দিয়া চোখে সে দেখিয়াছিল অন্ধকার। একি অবস্থা বাড়ি-ঘরের? বাড়িতে মানুষ কই? লণ্ঠন দু'টা ধোঁয়া ছাড়িতেছে, উঠানে পোড়া কয়লা, ছাই ও হাজার রকম জঞ্জালের গাদা, দেয়ালে-দেয়ালে ঝুল, পায়ের তলে ধূলাবালির স্তর। আর এক ঘরে মরমর একটি মানুষ।

সে মন্দাকিনী।

শীতল বলিয়াছিল, সব দেখে শুনে নাও। এবার থেকে সব ভার তোমার।

বলিয়া সে উধাও হইয়া গিয়াছিল। বোধ হয় খাবার কিনিতে,—এ বাড়িতে রান্নার কোনো ব্যবস্থা আছে, শ্যামা তাহা ভাবিতে পারে নাই। সেইখানে, ভিতরের রোয়াকে তাহার ট্রাঙ্কটার উপর বসিয়া, ভয়ে ও বিষাদে শ্যামার কান্না আসিতেছে এমন সময় সদরের খোলা দরজা দিয়া বাড়িতে ঢুকিয়াছিল লম্বা-চওড়া জোয়ান একটা মানুষ।

সে রাখাল। মন্দাকিনীর স্বামী।

এই রাখালের সাহায্য না পাইলে শ্যামা তাহার নূতন জীবনের সঙ্গে নিজেকে কিভাবে খাপ খাওয়াইয়া লইত, জানিবার উপায় নাই, কারণ রাখালের সাহায্য সে পাইয়াছিল। শুধু সাহায্য নয়, দরদ ও সহানুভূতি। এতদিন রাখাল যে সব ব্যবস্থা করিতে পারিত কিন্তু করে নাই, এবার শ্যামার সঙ্গে সমস্তই সে করিয়া ফেলিল। প্রথমে বাড়িঘর সাফ হইল। তারপর আসিল কুকারের বদলে পাচক, ঠিকা ঝির বদলে দিবারাত্রির পরিচারিকা। হাট-বাজার রান্না-খাওয়া সব অনেকটা নিয়মিত হইয়া আসিল।

মন্দার চিকিৎসার জন্য রাখাল আরও পাঁচ-ছয় মাস এখানে ছিল। সে সময়টা শ্যামার বড় সুখে কাটিয়াছিল। সে সময়মত স্নানাহার করে কি না রাখাল সেদিকে নজর রাখিত, হাসি-তামাসায় তাহার বিষণ্ণতা দূর করিবার চেষ্টা করিত, শ্যামার বয়সোচিত ছেলেমানুষীগুলি সমর্থন পাইত তারই কাছে। শীতলের মাথায় যে একটু ছিট আছে এটা শ্যামা গোড়াতেই টের পাইয়াছিল। শীতলকে সে বড় ভয় করিত, পুরানো হইয়া আসিলেও এখন পর্যন্ত সে ভয় তাহার রহিয়া গিয়াছে। শীতলের না ছিল নেশার সময়-অসময়, না ছিল খেয়ালের অন্ত ও মেজাজের ঠিকঠিকানা।

প্রথম ছেলেকে কোলে পাইয়া শ্যামা পূর্ববর্তী সাতটা বছরের ইতিহাস আঁতুড়েই অনেকবার স্মরণ করিয়াছে—যে সব দোষের জন্য শীতল তাহাকে শাস্তি দিয়াছিল তাহা মনে করিয়া জ্বলিবার জন্য নয়—শীতল সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়াছিল নিজের এমন একটিমাত্র লঘু অপরাধের কথা যদি মনে পড়িয়া যায়, এই আশায়। শীতলের কাছে তাহার কোন ত্রুটির মার্জনা না থাকাটা ছিল এত বড় নিরেট সত্য! কেবল রাখালের কাছেই শ্যামার অপরাধও ছিল না, ত্রুটিও ছিল না। রাখালের এই সহিষ্ণুতা শ্যামার কাছে আরও পূজ্য হইয়া উঠিবার অন্য একটি কারণ ছিল। সে মন্দার গালাগালি। মন্দার অসুখটা ছিল মারাত্মক। স্বভাবও তাহার হইয়া উঠিয়াছিল মারাত্মক। মন্দার পান হইতে চুনটি শ্যামা কখনো খসাইত না বটে—পান মন্দা খাইত না, কারণ পান খাওয়ার ক্ষমতা তাহার ছিল না—অনুরূপ তুচ্ছ অপরাধে চিঁ চিঁ করিয়া সে এত এবং এমন সব খারাপ কথা বলিত যে, শ্যামার মন তিক্ত হইয়া যাইত। শীতলের কোলে গরম চা ফেলিয়া (ভয়ে) গালে একটা চড় খাওয়ার পরক্ষণেই বার্লি দিতে পাঁচ মিনিট দেরি করার জন্য (গালে চড় খাইলে মিনিট পাঁচেক না কাঁদিয়া সে পারিত না) মন্দার গাল খাইয়া নিজেকে যখন শ্যামার বিনামূল্যে কেনা দাসীর চেয়ে কম দামী মনে হইত, রাখাল তখন তাহাকে কিনিয়া লইত দুটি মিষ্টি কথা দিয়া।

শুধু সান্ত্বনা ও সহানুভূতি নয়, রাখাল তাহার অনেক লাঞ্ছনাও বাঁচাইয়া চলিত। কতদিন গভীর রাত্রিতে শীতল বাড়ি ফিরিলে (বন্ধুরা ফিরাইয়া দিয়া যাইত) রাখাল তাহাকে বাহিরে আটকাইয়া রাখিয়াছে, শ্যামার কত অপরাধের শাস্তি দিতে আসিয়া শীতল দেখিয়াছে রাখাল সে অপরাধের অংশীদার, শ্যামাকে শাসন করিবার উপায় নাই। শীতলের কত অসম্ভব সেবার আদেশ রাখাল যাচিয়া বাতিল করিয়া দিয়াছে।

স্বামীর বিরুদ্ধে এভাবে স্ত্রীর পক্ষ অবলম্বন করা বিপজ্জনক, বিশেষ স্ত্রীটির যদি বয়স বেশি না হয়। স্বামী নানারকম সন্দেহ করিয়া বসে। কিন্তু রাখাল ছিল অত্যন্ত বুদ্ধিমান, চালাকিতে সংসারে শ্যামা তার জুড়ি দেখে নাই। যে সব আশ্চর্য কৌশলে শীতলকে সে সামলাইয়া চলিত, শ্যামাকে আড়াল করিয়া রাখিত, আজও মাঝে মাঝে অবাক হইয়া শ্যামা সে-সব ভাবে। মন্দা সুস্থ হইয়া উঠিলে রাখাল তাহাকে লইয়া চলিয়া গিয়াছিল বনগাঁ। কলিকাতায় এত আপিস থাকিতে

বনগাঁয়ে তাহার চাকরি করিতে যাওয়া শ্যামা পছন্দ করে নাই। একদিন, রাখালদের চলিয়া যাওয়ার আগের দিন, ওই কথা লইয়া রাগারাগিও সে করিয়াছিল। বয়স তো শ্যামার বেশি ছিল না। জগতে কারো স্নেহে যে কারো দাবি জন্মে না এটা সে জানিত না! আকুল আগ্রহে বিনা দাবিতেই স্বামীর চেয়ে আপনার লোকটিকে সে ধরিয়া রাখিতে চাহিয়াছিল। রাখাল চলিয়া গেলে সে দু-চারদিন চোখের জল ফেলিয়াছিল কি না, আজ প্রথম সন্তানের মা হওয়ার পর, শ্যামার আর তাহা স্মরণ নাই। সমস্ত নালিশ সে ভুলিয়া গিয়াছে। সেই উদ্‌ভ্রান্ত দিনগুলিকে হয়তো সে রহস্যে ঢাকিয়া রাখিতে ভালবাসে, কারণ তাহাই স্বাভাবিক। যতই আপনার হইয়া উঠুক, রাখালকে শ্যামা একফোটা বুঝিত না, লোকটার প্রকাণ্ড শরীরে যে মনটি ছিল তাহা শিশুর না শয়তানের কোনোদিন তাহা সঠিক জানিবার ভরসা শ্যামা রাখে না। তখন দ্বিপ্রহরে গৃহ থাকিত নির্জন, সন্ধ্যার পর দুটি ভাঙ্গা লণ্ঠনের আলোয় বাড়ির অর্ধেকও আলো হইত না! শীতল যেদিন রাত্রে দেরি করিয়া বাড়ি ফিরিত, দাওয়ায় ঠেস দিয়া বসিয়া তাহার প্রতীক্ষা করিতে করিতে নিয়মাধীন জীবনযাপন স্বভাবতই শ্যামার কাছে অবাস্তব হইয়া উঠিত—বয়স তো তাহার বেশি ছিল না। সুতরাং রাখালকেও তাহার মনে হইত নির্মম, মনে হইত লোকটা স্নেহ করে, কিন্তু স্নেহের প্রত্যাশা মিটায় না।

শীতলের তখন নিজের একটা প্রেস ছিল, মন্দ আয় হইত না। তবু অভাব তাহার লাগিয়াই থাকিত। শীতলের মাথায় ছিট ছিল রকমারি, অর্থ সম্বন্ধে একটা বিকৃত উদাসীনতা ছিল তার মধ্যে সেরা। তাহার মনকে বিশ্লেষণ করিলে যোগা-যোগ খুঁজিয়া পাওয়া যায় সন্দেহ নাই, কেবল, সে চেষ্টা করিবার মত অসাধারণ মানসিক বৈশিষ্ট্য ইহা নয়। টাকার প্রতি মমতার অভাবটা অনেকেই নানা উপায়ে ঘোষণা করিয়া থাকে। শীতলের উপায়টা ছিল বিকারগ্রস্ত—তাহা ভীরুতার ও দুর্বলতার বিষে বিষাক্ত। যে সব বেকার-দল চিরকাল বুদ্ধিমানদের ভোজ দিয়া আসিয়াছে, সে ছিল তাদের রাজা। বন্ধুরা পিঠ চাপড়াইয়া তাহার মনকে গড়ের মাঠের সঙ্গে তুলনা করিত, তাই পাছে কেহ টের পায় যে, মন তাহার আসলে বড়বাজারের গলি, এই ভয়ে সর্বদা সে সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিত। ফেরত পাইবে না জানিয়া টাকা ধার দিত সে, থিয়েটারের বক্স ভাড়া করিত সে, মদ ও আনুষঙ্গিকের টাকা আসিত তাহারই পকেট হইতে। বিকালের দিকে প্রেসের

ছোট আপিসটিতে হাসিমুখে সিগারেট টানিতে টানিতে দু-চারজন বন্ধুর আবির্ভাব হইলে ভয়ে তাহার মুখ কালো হইয়া যাইত। পাগলামি ছিল তার এইখানে। সে জানিত বোকা পাইয়া সকলে তাহার ঘাড় ভাঙে, তবু ঘাড় ভাঙিতে না দিয়াও সে পারিত না।

শেষে, শ্যামার বিবাহের প্রায় চার বছর পরে, শীতলের প্রেস বিক্রয় হইয়া গেল। আবোল-তাবোল যেমনই খরচ করুক, আয় ভাল থাকায় এতকাল মোটামুটি একরকম চলিয়া যাইত, প্রেস বিক্রয় হইয়া যাওয়ার পর তাহাদের কষ্টের সীমা ছিল না। বাড়িটা পৈতৃক না হইলে মাঝখানে কিছুদিনের জন্য হয়তো তাহাদের গাছতলাই সার করিতে হইত। এই অভাবের সময় শ্যামার মামার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হওয়ার শোক শীতলের উথলিয়া উঠিয়াছিল, সব সময় শ্যামাকে কথার খোঁচা দিয়াই তাহার সাধ মিটিত না। শ্যামার গায়ে তাহার প্রমাণ আছে। প্রথম মা হওয়ার সময় শ্যামার কোমরের কাছে যে মস্ত ক্ষতের দাগটা দেখিয়া বুড়ি দাই আপসোস করিয়াছিল এবং শ্যামা বলিয়াছিল, 'ওটা ফোড়ার দাগ'। ছড়ির ডগাতেও সেটা সৃষ্টি হয় নাই, ছাতির ডগাতেও নয়।—ওটা বঁটিতে কাটার দাগ। বঁটি দিয়া শীতল অবশ্য তাহাকে খোঁচায় নাই, পা দিয়া পিঠে একটা ঠেলা মারিয়াছিল। দুঃখের বিষয়, শ্যামা তখন কুটিতেছিল তরকারি।

তরকারি সে আজও কোটে। সুখে-দুঃখে জীবনটা অমনি হইয়া গিয়াছে, সিদ্ধ করিবার চাল ও কুটিবার তরকারি থাকার মত চলনসই। অনেকদিন প্রেসের মালিক হইয়া থাকার গুণে একটা প্রেসের ম্যানেজারির চাকরি শীতল মাস ছয়েক চেষ্টা করিয়াই পাইয়াছিল। শ্যামা প্রথমবার মা হওয়ার সময় শীতল এই চাকরিই করিতেছিল।

বিবাহের সাত বছর পরে প্রথম ছেলে হওয়াটা খুব বেশি বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। অমন বিলম্বিত উর্বরতা বহু নারীর জীবনেই আসিয়া থাকে। শ্যামার যেন সব বিষয়েই বাড়াবাড়ি। প্রথম ছেলেকে প্রসব করিতে সে সময় লইল দুদিনেরও বেশি এবং এই দুটি দিন ভরিয়া বারবার মূর্ছা গেল।

শেষ মূর্ছা ভাঙিবার পর শ্যামা এক মহামুক্তির স্বাদ পাইয়াছিল। দেহে যেন তাহার উত্তাপ নাই, স্পন্দন নাই, সবগুলি ইন্দ্রিয় অবশ বিকল হইয়া গিয়াছে। সে বাতাসের মত হাল্কা। শীতকালের পুঞ্জীভূত কুয়াশার মত সে যেন

আলগোছে পৃথিবীতে সংলগ্ন হইয়া আছে। তাহার সমগ্র বিস্ময়কর অস্তিত্ব ব্যাপিয়া এক তরঙ্গায়িত স্তিমিত বেদনা, মৃদু অথচ অসহ্য, দুর্জ্ঞেয় অথচ চেতনাময়। একবার তাহার মনে হইল, সে বুঝি মরিয়া গিয়াছে, ব্যথা দিয়া কাঁপানো এই শূন্যময় অবস্থাটি তাহার মৃত্যুরই পরবর্তী জীবন। ভোঁতা ক্লান্তিকর যাতনা তাহার অশরীরী আত্মার দুর্ভোগ।

তারপর চোখ মেলিয়া প্রথমটা সে কিছুই বুঝিতে পারে নাই। চোখের সামনে সাদা দেয়ালে একটি শায়িত মানুষের ছায়া পড়িয়াছে। ছায়ার হাতখানেক উপরে জানালার একটা পাট অল্প একটু ফাঁক করা। ফাঁক দিয়া খানিকটা কালো আকাশ ও কতকগুলি তারা দেখা যাইতেছে। একটা গরম ধোঁয়াটে গন্ধ শ্যামার নাকে লাগিয়াছিল। কাছেই কাদের কথা বলিবার মৃদু শব্দ। খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিবার পর দেয়ালের ছায়াটা তাহার নিজের বলিয়া চিনিতে পারিয়া সে একটু আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিল। এমনভাবে সে শুইয়া আছে কেন? তাহার কি হইয়াছে? কাঠ-কয়লা পুড়িবার গন্ধ কিসের? কথা বলিতেছে কাহারা?

হঠাৎ সব কথাই শ্যামার মনে পড়িয়া গিয়াছিল। পাশ ফিরিতে গিয়া সর্বাঙ্গে বিদ্যুতের মত তীব্র একটা ব্যথা সঞ্চারিত হইয়া যাওয়ায় সে আবার দেহ শিথিল করিয়া দিয়াছিল। মনের প্রশ্নকে বিহ্বলের মত উচ্চারণ করিয়াছিল এই অর্থহীন ভাষায়: কোথায় গেল, কই?

কে যেন জবাব দিয়াছিল: এই যে বৌ, এই যে! মুখ ফিরিয়ে তাকা হতভাগি!

কাছে বসিয়াও অনেক দূর হইতে যে কথা বলিয়াছিল, সে-ই বোধ হয় শ্যামার একখানা হাত তুলিয়া একটি কোমল স্পন্দনের উপর রাখিয়াছিল। জাগিয়া থাকিবার শক্তিটুকু শ্যামার তখন ঝিমাইয়া আসিয়াছে। সে অতিকষ্টে একটু পাশ ফিরিয়াছিল।

—দেখবি বৌ? এই ত্যাখ্—

এবার স্বর চিনিতে পারিয়া কম্পিতকণ্ঠে শ্যামা বলিয়াছিল—ঠাকুরঝি?

মন্দাকিনী আলোটা উঁচু করিয়া ধরিয়া বলিয়াছিল—আর ভাবনা কি বৌ? ভালয় ভালয় সব উতরে গিয়েছে। খোকা লো, ঘর আলো করা খোকা হয়েছে তোর।

মাথা তুলিয়া একবার মাত্র খানিকটা রক্তিম আভা ও দুটি নিমীলিত চোখ দেখিয়া শ্যামা বালিশে মাথা নামাইয়া চোখ বুজিয়াছিল।

শ্যামার যে সব বিষয়েই বাড়াবাড়ি ছিল তাহা নিঃসন্দেহ। পরদিন সকালেই সে তাহার প্রথম ছেলেকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। অনেক বেলায় ঘুম ভাঙ্গিয়া নিজেকে শ্যামার অনেকটা সুস্থ মনে হইয়াছিল। ঘরে তখন কেহ ছিল না। কাত হইয়া শুইয়া পাশে শায়িত শিশুর মুখের দিকে এক মিনিট চাহিয়া থাকিয়াই তাহার মনে হইয়াছিল, ভিতরে একটা অদ্ভুত প্রক্রিয়া ঘটিয়া চলিবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলের মুখখানা তাহার চোখে অভিনব হইয়া উঠিতেছে। কতটুকু মুখ, কী পেলবতা মুখের! মাথা ও ভ্রুতে চুলের শুধু আভাস আছে। বেদানার জমানো রসের মত তুলতুলে আশ্চর্য দুটি ঠোঁট। একি তার ছেলে? এই ছেলে তার? গভীর ঔৎসুক্যে সন্তর্পণে শ্যামা হাত বাড়াইয়া ছেলের চিবুক ও গাল ছুঁইয়াছিল, বুকের স্পন্দন অনুভব করিয়াছিল। এই বিচ্ছিন্ন ক্ষীণ প্রাণস্পন্দন কোথা হইতে আসিল? শ্যামা কাঁপিয়াছিল, শ্যামার হইয়াছিল রোমাঞ্চ। স্নেহ নয়, তাহার হৃদয় যেন ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিয়া তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া দিতে চাহিয়াছিল। প্রসবের পর নাড়ীসংযোগ-বিচ্ছিন্ন সন্তানের জন্য একি কাণ্ড ঘটিতে থাকে মানুষের মধ্যে? আশ্বিনের প্রভাতটি ছিল উজ্জ্বল। দু-দিন দু-রাত্রির মরণাধিক যন্ত্রণা শ্যামা দুঃস্বপ্নের মত ভুলিয়া গিয়াছিল। আজ সকালে তাহার আনন্দের সীমা নাই।

তখন ঘটিয়াছিল এক কাণ্ড।

ঘুম ভাঙ্গিয়া হঠাৎ শিশু যেন কি-রকম করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। টানিয়া টানিয়া শ্বাস নেয়, চঞ্চল ভাবে হাত পা নাড়ে, চোখ কপালে তুলিয়া দেয়। ভয়ে শ্যামা বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ডাকিয়াছিল—ঠাকুরঝি গো, ও ঠাকুরঝি!

রান্না ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া ব্যাপার দেখিয়া মন্দা হইয়াছিল রাগিয়া আগুন।

—চোখ নেই বৌ? সরো তুমি, সরো। গলা শুকিয়ে এমন করছে গো, আহা। মধুর বাটি গেল কোথা? মিছরির জল? দিয়েছো উল্‌টে? আশ্চর্যি।

তাকের উপর শিশিতে মধু ছিল। ছোট একটি বাটিতে মধু ঢালিয়া আঙ্গুলে করিয়া ছেলের মুখ ভিজাইয়া চোখের পলকে মন্দা তাহাকে শান্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। বিড় বিড় করিয়া বলিয়াছিল,—আনাড়ি বলে আনাড়ি, এমন আনাড়ি জন্মেও চোখে দেখি নি মা! কচি ছেলে, পলকে পলকে গলা শুকোবে, তাও যদি না টের পাও, তবে মা হওয়া কেন? দাইমাগীও মানুষ কেমন? তামাকপাতা আনতে গিয়ে বুড়ি

হল।

এই তুচ্ছ ঘটনাটি শ্যামার মনে গাঁথা হইয়া আছে, প্রথম সন্তানকে সে যে বারো দিনের বেশি বাঁচাইতে পারে নাই, তার সবটুকু অপরাধ চিরকাল শ্যামা নিজের বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে, সন্তান-পরিচর্যার কিছুই সে যে তখন জানিত না, এই ঘটনাটি শ্যামার কাছে হইয়া আছে তাহার আদিম প্রমাণের মত। তখন অবশ্য সে জানিত না, বারো দিন পরে পেট ফুলিয়া ছেলে তাহার মরিয়া যাইবে। মন্দা চলিয়া গেলে ছেলের দিকে চোখ রাখিয়া সে শান্তভাবেই শুইয়া ছিল, গলা শুকানোর লক্ষণ দেখা গেলে মুখে মধু দিবে। অন্যমনে সে অনেক কথা ভাবিয়াছিল। দরজা দিয়া দুটি চড়াই পাখি ঘরে ঢুকিয়া খানিক এদিক-ওদিক ফড়ফড় করিয়া উড়িয়া জানালা দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল, জানালা দিয়াই রোদ আসিয়া পড়িয়াছিল শ্যামার শিয়রে। জীবন-মৃত্যুর কথা শ্যামার তখন মনে পড়ে নাই, ভগবানের কাণ্ডকারখানা বুঝিতে না পারিয়া সে অবাক হইয়া গিয়াছিল। বুকে তাহার দুদিন দুধ আসিবে না। নবজাত শিশুর জন্য ভগবান দুদিনের উপবাস ব্যবস্থা করিয়াছেন। মন্দার হুকুম স্মরণ করিয়া মাঝে মাঝে ছেলের মুখে সে শুষ্ক স্তন দিয়াছিল। সন্তানের ক্ষুধার আকর্ষণ অনুভব করিয়া ভাবিয়াছিল, হয়তো এ ব্যবস্থা ভগবানের নয়। বুকে তাহার যথেষ্ট মমতার সঞ্চার হয় নাই, তা হওয়ার আগে দুধ আসিবে না।

তবু, কোন মা সন্তানের জীবনকে অস্থায়ী মনে না করিয়া পারে? বেলা বাড়িলে পাড়ার কয়েক বাড়ির মেয়েরা শ্যামার ছেলেকে দেখিতে আসিয়া যখন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছিল, শ্যামার তখন যেমন গর্ব হইয়াছিল তেমনি হইয়াছিল ভয়। ভয় হইয়াছিল এইজন্য, দেবতারা গোপনে শোনেন। গোপনে শুনিয়া কোন দেবতার হাসিবার সাধ হয়, কে বলিতে পারে? তাই বিনয় প্রকাশের জন্য নয়, দেবতার গোপন কানকে ফাঁকি দিবার জন্য শ্যামা বলিয়াছিল—কানাখোঁড়া যে হয় নি মাসিমা, তাই ঢের। —বলিয়া তাহার এমনি আবেগ আসিয়াছিল যে ঘর খালি হওয়া মাত্র ছেলেকে সে চুম্বনে চুম্বনে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল।

ছেলের গলা শুকানোর স্মৃতি মনে পুষিয়া রাখিবার আরেকটি কারণ ঘটিয়াছিল সেদিন রাত্রে। গভীর রাত্রে।

সারাদুপুর ঘুমানোর মত স্বাভাবিক কারণেও নিশীথ জাগরণ মানুষের মনে অস্বাভাবিক উত্তেজনা আনিয়া দেয়। দূরে কোথায় পেটা ঘড়িতে তখন বারোটা

বাজিয়াছে। শ্যামার কল্পনা একটু উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া আসিয়াছিল। ঘরের একদিকে বুড়ি দাই অঘোরে ঘুমাইতেছিল। কোণে জ্বলিতেছিল প্রদীপ। এগারটি দিবারাত্রি এই প্রদীপ অনির্বাণ জ্বলিবে, জাতকের এই প্রদীপ্ত প্রহরী। শিয়রের কাছে মেঝেতে খড়ি দিয়া মন্দা দুর্গা-নাম লিখিয়া রাখিয়াছে। সকালে আঁচল দিয়া মুছিয়া ফেলিবে, কেহ না মাড়াইয়া দেয়। সন্ধ্যায় আবার দুর্গা-নামের রক্ষাকবচ লিখিয়া রাখিবে। আঁতুড়ের রহস্য ভয়ে পরিপূর্ণ! এমনি কত তাহার প্রতিবিধান। হঠাৎ শ্যামার একটা অদ্ভুত অনুভূতি হইয়াছিল। একটা অদৃশ্য জনতা যেন তাহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। চারিপাশে যেন তাহার অলক্ষ্য উপস্থিতি, অশ্রুত কলরব। সকলেই যেন খুশী, সকলের অনুচ্চারিত আশীর্বাদে ঘর যেন ভরিয়া গিয়াছিল। শ্যামার বুঝিতে বাকি থাকে নাই, এঁরা তাহার সন্তানেরই পূর্বপুরুষ, ভিড় করিয়া সকলে বংশধরকে দেখিতে আসিয়াছেন। কিন্তু একি? বংশধরকে আশীর্বাদ করিয়া তাহার দিকে এমন ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে সকলে চাহিতেছেন কেন? ভয়ে শ্যামার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল। হাতজোড় করিয়া সে ক্ষমা চাহিয়াছিল সকলের কাছে। মিনতি করিয়া বলিয়াছিল, আর কখনো সে মা হয় নাই, সকালে ছেলে যে তাহার গলা শুকাইয়া মরিতে বসিয়াছিল, এ অপরাধ যেন তাঁহারা না নেন, আর কখনো এরকম হইবে না! জননীর সমস্ত কর্তব্য সে তাড়াতাড়ি শিখিয়া ফেলিবে।

তারপর ছেলে মানুষ করার বিপুল কর্তব্য আঁতুড়েই নিখুঁতভাবে শুরু করিয়া দিতে শ্যামার আগ্রহের সীমা ছিল না। নিজে সে বড় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল, উঠিয়া বসিতে গেলে মাথা ঘুরিত। শুইয়া শুইয়া সে খুঁতখুঁত করিত, 'এটা হল না, ওটা হল না'—মন্দা বিরক্ত হইত, মাঝে মাঝে রাগিয়াও উঠিত। কিন্তু শ্যামার সঙ্গে পারিয়া ওঠা দায়। ছেলের অফুরন্ত সেবার এতটুকু ত্রুটি ঘটিলে সে শুধু ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে বাকি রাখিত। ছেলেকে খাওয়ানো হাঙ্গামার ব্যাপার ছিল না, কাঁদিলে মুখে স্তন তুলিয়া দিলে চুক চুক করিয়া টানিয়া পেট ভরিয়া আসিলে সে আপনি ঘুমাইয়া পড়িত। খুঁটিনাটি সেবাই ছিল অনন্ত। স্নান করাইয়া চোখে কাজল দিলেই শুধু চলিত না, কি কারণে ছেলের চোখে বড় পিচুটি পড়িতেছিল, ঘণ্টায় ঘণ্টায় পরিষ্কার ভিজা ন্যাকড়ায় তাহা মুছিয়া লইতে হইত। মিনিটে মিনিটে আবিষ্কার করিতে হইত কাঁথা বদলানোর প্রয়োজনকে। ছেলের বুকে একটু সর্দি বসিয়াছিল, ব্যাপারটা সামান্য বলিয়া কেহ তেমন গ্রাহ্য করে নাই,

কেবল শ্যামার তাগিদে লণ্ঠনের উপর গরম তেলের বাটি বসাইয়া বার বার বুকে মালিশ করিয়া দিতে হইত। এমনি আরও কত কি। নাড়ী কাটিবার দোষেই সম্ভবত ছেলের নাভিমূল চার দিনের দিন পাকিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছিল। শ্যামা নিজে এবং মন্দা ও বুড়ি দাই এই তিনজনে ক্রমাগত ছেলের নাভিতে সেঁক দিয়াছিল।

দিনের বেলাটা একরকম কাটিয়া যাইত, শ্যামার ভয় করিত রাত্রে। পূর্বপুরুষ-দের আবির্ভাবের ভয় নয়, তাঁরা একদিনের বেশি আসেন নাই,—অসম্ভব কাল্পনিক সব ভয়। শ্যামা যেন কার কাছে গল্প শুনিয়াছিল এক ঘুমকাতুরে মার, ঘুমের ঘোরে যে একদিন আঁতুড়ে নিজের ছেলেকে চাপা দিয়া মারিয়া ফেলিয়াছিল। নিজের ঘুমন্ত অবস্থাকে শ্যামা বিশ্বাস করিতে পারিত না। নাকে মুখে পাতলা কাপড় এক মুহূর্তের জন্য চাপা পড়িলে যে ক্ষীণ অসহায় প্রাণীটি দম আটকাইয়া মরিতে বসে, ঘুমের মধ্যে একখানা হাতও যদি সে তাহার উপর তুলিয়া দেয়, সে কি আর তবে বাঁচিবে? শ্যামা নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে পারিত না। পাশ ফিরিলেই ছেলেকে পিষিয়া ফেলিয়াছে ভাবিয়া চমকিয়া জাগিয়া যাইত। কান পাতিয়া সে ছেলের নিশ্বাসের শব্দ শুনিতে চেষ্টা করিত। মনে হইত, নিশ্বাস যেন পড়িতেছে। কানকে বিশ্বাস করিয়া তবু সে নিশ্চিন্ত হইতে পারিত না। মাথা উঁচু করিয়া ছেলেকে দেখিত, নাকের নিচে গাল পাতিয়া নিশ্বাসের স্পর্শ অনুভব করিত। তারপর ছেলের বুকে হাত রাখিয়া স্পন্দন গুণিত—ধুক্ ধুক্। হঠাৎ তাহার নিজের হৃৎপিণ্ড সজোরে স্পন্দিত হইয়া উঠিত। একি, ছেলের হৃৎস্পন্দন যেন মৃদু হইয়া আসিতেছে!

নিশীথ স্তব্ধতায় এই আশঙ্কা শ্যামাকে পাইয়া বসিত। সে যেন বিশ্বাস করিতে পারিত না যে, এতটুকু একটা জীব নিজস্ব জীবনী-শক্তির জোরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাঁচিয়া থাকিতে পারে। শ্যামার কেবলি মনে হইত, এই বুঝি দুর্বল কলকব্জাগুলি থামিয়া গেল। পৃথিবীর সমস্ত মানুষ একদিন এমনি ক্ষুদ্র, এমনি ক্ষীণপ্রাণ ছিল,—দিনের বেলা এ যুক্তি শ্যামার কাজে লাগিত, রাত্রে তাহার চিন্তাধারা কোনো যুক্তির বালাই মানিত না। ভয়ে ভাবনায় সে আকুল হইয়া থাকিত। সৃষ্টির রহস্যময় স্রোতে যে ভাসিয়া আসিয়াছে, নিঃশব্দ নির্বিকার রাত্রির অজানা বিপদের কোলে সে মিশিয়া যাইবে, শ্যামার ইহা স্বতঃসিদ্ধের মত মনে হইত। ছেলে-কোলে সে জাগিয়া বসিয়া থাকিত। দুর্বলতায় তাহার মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করিত। প্রত্যাহত নিদ্রা চোখের সামনে নাচাইত ছায়া। প্রদীপের নিষ্কম্প শিখাটি তাহাকে আলো দিত,

ভরসা দিত না।

এই আশঙ্কা ও দুর্ভাবনার ভাগ শ্যামা কাহাকেও দিত না।

ভাগ লইবার কেহ ছিল না। এক ছিল শীতল, আঁতুড়ের ধারে-কাছেও সে ভিড়িত না। ষষ্ঠীপূজার রাত্রে সে কেবল একবার নেশার আবেশে কি মনে করিয়া আঁতুড়ে ঢুকিয়াছিল। ছেলের শিয়রের কাছে ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িয়াছিল এবং অকারণে হাসিয়াছিল।

শ্যামা বলিয়াছিল—তুমি কি গো? বিছানা ছুঁয়ে দিলে?

শীতল বলিয়াছিল, খোকাকে একটু কোলে নিই! —বলিয়া ছেলের বগলের নিচে হাত দিয়া তুলিতে গিয়াছিল।

শ্যামা ঝট্‌কা দিয়া তাহার হাত সরাইয়া দিয়া বলিয়াছিল—কি কর? ঘাড় ভেঙ্গে যাবে যে!

—ঘাড় শক্ত হয় নি?

নাকে গন্ধ লাগায় এতক্ষণে শ্যামা টের পাইয়াছিল।

—গিলেছ বুঝি? তুমি যাও বাবু এখান থেকে, যাও।

নেশা করিলে শীতলের মেজাজ জল হইয়া করুণ রসে মন থমথম করে। সে ছলছল চোখে বলিয়াছিল, আর করব না শ্যামা। যদি করি তো খোকার মাথা খাই!

শ্যামা বলিয়াছিল—কথার কি ছিরি। যাও না বাবু এখান থেকে!

শীতল বড় দমিয়া গিয়াছিল। যেন কাঁদিয়াই ফেলিবে। খানিক পরে শ্যামার বালিশটাকে শোনাইয়া বলিয়াছিল, একবার কোলে নেব না বুঝি!

শ্যামা বলিয়াছিল, কোলে নেবে তো আসনপিঁড়ি হয়ে বসো। তুলবার চেষ্টা করলে কিন্তু ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।

শীতল আসনপিঁড়ি হইয়া বসিলে শ্যামা সন্তর্পণে ছেলেকে তাহার কোলে শোয়াইয়া দিয়াছিল। লোকে যেভাবে অচল দুয়ানি দেখে, ঝুঁকিয়া তেমনিভাবে ছেলের মুখ দেখিয়া শীতল বলিয়াছিল—যমজ নাকি, এ্যাঁ?

নেশার সময় মাঝে মাঝে শীতলের চোখের সামনে একটা জিনিস দুইটা হইয়া যাইত।

শুধু সেই একদিন। ছেলে কোলে করার সাধ শীতলের আর কখনো আসে

নাই। যে ক'দিন ছেলে বাঁচিয়াছিল আনন্দ ও ভয় উপভোগ করিয়াছিল শ্যামা একা। পাড়ায় শ্যামার সখী কেহ ছিল না। ছেলে হওয়ার খবর পাইয়া কয়েক বাড়ির কৌতূহলী মেয়েরা একবার দেখিয়া গিয়াছিল এই পর্যন্ত। শ্যামা মন খুলিয়া কথা বলিতে পারে, এমন কেহ আসে নাই। একজন, যে কখনো এ বাড়িতে পা দেয় নাই, শ্যামার সঙ্গে ভাব করিতে চাহিয়াছিল। সে পাড়ার মহিম তালুকদারের স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া। পাড়ায় মহিম তালুকদারের চেয়ে বড়লোক কেহ ছিল না। ভাব করা দূরে থাক শ্যামাকে দেখিতে আসাটাই বিষ্ণুপ্রিয়ার পক্ষে এমন অসাধারণ ব্যাপার যে শ্যামা শুধু বিনয় করিয়াছিল, ভাব করিতে পারে নাই।

তখন শীতল ছাপাখানায় গিয়াছে, মন্দা রান্না শেষ করিয়া শ্যামার ছেলেকে স্নান করানোর আয়োজন করিতেছে। কে জানিত এমন অসময়ে বিষ্ণুপ্রিয়া বেড়াইতে আসিবে গয়না-পরা দাসীকে সঙ্গে করিয়া?

শ্যামা বলিয়াছিল—ও ঠাকুরঝি, ওঘর থেকে কার্পেটের আসনটা এনে বসতে দাও।

মন্দা বলিয়াছিল—কার্পেটের আসন তো বাইরে নেই বৌ, তোরঙ্গে তোলা আছে

মন্দার বুদ্ধির অভাবে শ্যামা ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। একটা তুচ্ছ কার্পেটের আসন তাও যে তাহারা তোরঙ্গে তুলিয়া রাখে বিষ্ণুপ্রিয়াকে এ কথাটা কি না শোনাইলেই চলিত না।

—খুলে আন না?

—দাদা চাবি নিয়ে ছাপাখানায় চলে গেছে বৌ।

অগত্যা একটা মাদুর পাতিয়াই বিষ্ণুপ্রিয়াকে বসিতে দিতে হইয়াছিল। মাদুরে বসিতে বিষ্ণুপ্রিয়ার কোনই অসুবিধা হয় নাই, কেবল শ্যামার মনের মধ্যে এই কথাটা খচ খচ করিয়া বিঁধিয়াছিল যে, এত বড়লোকের বৌ যদি বা বাড়ি আসিল, তাহাকে বসিতে দিতে হইল ছেঁড়া মাদুরে!

—গরম জল কি হবে ঠাকুরঝি?—বিষ্ণুপ্রিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল।

—ছেলেকে নাওয়াবো।

—নাওয়ান, দেখি বসে বসে।

মন্দা হাসিয়া বলিয়াছিল—দেখাও হবে শেখাও হবে, না? আপনার দিনওতো

ঘনিয়ে এল।—বলিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার গলায় মুক্তার মালা আর কানে হীরার দুল চোখে পড়ায় অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া মন্দা আবার বলিয়াছিল—তবে আপনি কি আর নিজে ছেলে নাওয়াবেন, ছেলে নাওয়াবার ক'টা দাই থাকবে আপনার!

বিষ্ণুপ্রিয়া এ ধরণের কত মন্তব্য শুনিয়াছে। মৃদু হাসিয়া বলিয়াছিল, আপনার ছেলেমেয়ে ক'টি ঠাকুরঝি?

—মেয়ে নেই, তিনটি ছেলে, দুটি যমজ। কোলেরটিকে সঙ্গে এনেছি, বড় দু'টি শাশুড়ীর কাছে আছে।

স্নানের জলে পাঁচটি দূর্বা ছাড়িয়া মন্দা জানালা বন্ধ করিয়াছিল। শ্যামা উৎকণ্ঠিতা হইয়া বলিয়াছিল, জল বেশি গরম নয় তো ঠাকুরঝি?

মন্দা বলিয়াছিল—আমি কি পাগল বৌ, গরম জলে তোমার ছেলেকে পুড়িয়ে মারব?

শ্যামা বলিয়াছিল—নরম চামড়া যে ঠাকুরঝি, একটু গরম হলেই সইবে না। —জলে হাত দিয়া সে চমকাইয়া উঠিয়াছিল, জল যে দিব্যি গরম গো।

—জল বুঝি ঠাণ্ডা হতে জানে না বৌ?

ইহার পরেই বিষ্ণুপ্রিয়ার বসিবার ভঙ্গি অত্যন্ত শিথিল হইয়া আসিয়াছিল। শ্যামার মধ্যে সে যেন হঠাৎ কি আবিষ্কার করিয়াছে। সে সহজে শ্যামার সঙ্গ ছাড়িবে না। বাড়ি হইতে বার বার তাগিদ আসিয়াছিল। বিষ্ণুপ্রিয়া বাড়ি যায় নাই। বসিয়া বসিয়া শ্যামার সঙ্গে রাজ্যের গল্প করিয়াছিল।

কয়েকদিন পরে বিষ্ণুপ্রিয়া আবার আসিয়াছিল। কেহ টের পায় নাই যে সান্ত্বনা দিতে নয়, সে ছেলের জন্য শ্যামার শোক দেখিতে আসিয়াছিল। শ্যামার প্রথম সন্তান বাঁচিয়াছিল বারো দিন।

দুই

দুইবছরের মধ্যে শ্যামার কোলে আবার ছেলে আসিল। সেই বাড়িতে, সেই ছোট ঘরে শরৎকালের তেমনি এক গভীর নিশীথে। কিন্তু মানুষের জীবনের অভাবের পূরণ আছে ক্ষতির পূরণ নাই বলিয়া প্রথম সন্তানকে শ্যামা ভুলিতে পারে নাই।

ছেলে মরিয়া যাওয়ার পর কয়েকমাস সে মুহ্যমানা হইয়াছিল, এই অবস্থাটি অতিক্রম করিতে তাহার মধ্যে যে পরিবর্তন আসিয়াছিল এখনো তাহা স্থায়ী হইয়া আছে। সন্তানের আবির্ভাবে এবার আর তাহার সেই অসংযত উল্লাস আসে নাই, উদ্দাম কল্পনা জাগে নাই। সে শান্ত হইয়া গিয়াছে। সংসারধর্ম করিলে ছেলেমেয়ে হয়, ছেলেমেয়ে হইলে মানুষ সুখী হয়, এবারের ছেলে হওয়াটা তাহার কাছে শুধু এই। এতে না আছে বিস্ময়, না আছে উন্মত্ততা; চোখের পলকে একটা বিরাট ভবিষ্যতকে গড়িয়া তুলিয়া বহিয়া বেড়ানো, ক্ষণে ক্ষণে নব নব কল্পনার তুলি দিয়া এই ভবিষ্যতের গায়ে রঙ মাখানো, আর সর্বদা ভয়ে ও আনন্দে মশগুল হইয়া থাকা, এসব কিছুই নাই। এবারও আঁতুড়ে এগারোটি দিবারাত্রি অনির্বাণ দীপ জ্বলিয়াছিল, কিন্তু শ্যামার এবার একেবারেই ভয় ছিল না, শুধু ছিল গভীর বিসন্নতা। এবার পূর্ব-পুরুষেরা গভীর রাত্রে শ্যামার ছেলেকে ভিড় করিয়া দেখিতে আসেন নাই। ছেলের ক্ষীণ বক্ষস্পন্দন হঠাৎ একসময় থামিয়া যাইতে পারে শ্যামার এ আশঙ্কা ছিল, কিন্তু আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া সে জাগিয়া রাত কাটায় নাই। ও বিষয়ে তাহার কেমন একটা উদাসীনতা আসিয়াছে। ভাবিয়া লাভ নাই, উতলা হইয়া লাভ নাই, ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়া কোনো ফল হইবে না। যিনি দেন তিনিই নেন। তাঁর দেওয়াকে যখন ঠেকানো যায় না, নেওয়াকে ঠেকাইবে কে?

সে শীতলকে স্পষ্ট বলিয়াছে—এবার আর যত্নটত্ন করব না বাবু।

—অযত্ন করা কি ভাল হবে?

—অযত্ন করব না তো। নাওয়াবো, খাওয়াবো, যেমন দরকার সব করব। তার বেশি কিছু নয়। কি হবে করে?

শীতল কিছু বলে নাই। কি বলিবে?

শ্যামা আবার বলিয়াছে—সেবার আমার দোষেই তো গেল।

শীতল একটু ভাবিয়া বলিয়াছে, এটার কিন্তু পয় আছে শ্যামা। হতে না হতে কমল প্রেসের চাকরিটা পেলাম।

—বোলো না বাবু ওসব। পয় না ছাই। আগে বাঁচুক।

কিন্তু কথাটা তুচ্ছ করিবার মত নয়। পয়মন্ত ছেলে? হয়তো তাই। সব অকল্যাণ ও নিরানন্দের অন্ত করিতে আসিয়াছে হয়তো। শ্যামা হয়তো আর দুঃখ পাইবে না।

—এরা সময় মত মাইনে দেবে ?

—দেবে না ? কমল প্রেস, কত বড় প্রেস জানো !

এবার ছেলে তাহার বাঁচিবে শ্যামা যে এ আশা করে না এমন নয়। মানুষের আশা এমন ভঙ্গুর নয় যে একবার ঘা খাইলে চিরদিনের জন্য ভাঙ্গিয়া পড়িবে। তবু আশাতেই আশঙ্কা বাড়ে। সব শিশুই যদি মরিয়া যাইত, পৃথিবীতে এতদিনে তবে আর মানুষ থাকিত না, শ্যামার এই পুরানো যুক্তিটাও এবার হইয়া গিয়াছে বাতিল। সংসারে এমন কত নারী আছে যাদের সন্তান বাঁচে না। সেও যে তাহাদের মত নয় কে তাহা বলিতে পারে ? একে একে পৃথিবীতে আসিয়া তাহার ছেলেমেয়েরা কেউ বারোদিন কেউ ছমাস বাঁচিয়া যদি মরিয়া যাইতে থাকে! বলা তো যায় না। এমনি যাদের অদৃষ্ট তাদের এক-একটি সন্তান দশ-বারো বছর টিকিয়া থাকিয়া হঠাৎ একদিন মরিয়া যায়, এরকমও অনেক দেখা গিয়াছে। হালদার বাড়ির বড়বৌ দু'বার মৃতসন্তান প্রসব করিয়াছিল, তার পরের সন্তান দু'টি বাঁচিয়াছিল বছরখানেক। শেষে যে মেয়েটা আসিয়াছিল তাহার বিবাহের বয়স হইয়াছিল। কি আদরেই মেয়েটা বড় হইয়াছিল। তবু তো বাঁচিল না।

নৈসর্গিক প্রতিবিধানের ব্যবস্থা এবার কম করা হয় নাই। শ্যামা গোটা পাঁচেক মাদুলি ধারণ করিয়াছে, কালীঘাট ও তারকেশ্বরে মানত করিয়াছে পূজা। মাদুলিগুলির মধ্যে তিনটি বড় দুর্লভ মাদুলি। সংগ্রহ করিতে শ্যামাকে কম বেগ পাইতে হয় নাই। মাদুলি তিনটির একটি প্রসাদী ফুল, একটিতে সন্ন্যাসী-প্রদত্ত ভস্ম ও অপরটিতে স্বপ্নাদ্য শিকড় আছে। শ্যামার নির্ভর এই তিনটি মাদুলিতেই বেশি। নিজে সে প্রত্যেক দিন মাদুলি-ধোয়া জল খায়, একটি একটি করিয়া মাদুলিগুলি ছেলের কপালে ছোঁয়ায়। তারপর খানিকক্ষণ সে সত্যসত্যই নিশ্চিন্ত হইয়া থাকে।

এবারও মন্দাকিনী আসিয়াছে। সঙ্গে আনিয়াছে তিনটি ছেলেকেই। শ্যামার সেবা করিতে আসিয়া নিজের ছেলের সেবা করিয়াই তাহার দিন কাটে। এমন আব্দারে ছেলে শ্যামা আর দেখে নাই। ঠাকুরমার জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে যমজ ছেলে দুটি বাড়ি ঢুকিয়াছিল, তারপর কতদিন কাটিয়া গিয়াছে, এখনো তাহারা এখানে নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে নাই। বায়না ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে না মিটিলে ঠাকুরমার জন্যই তাহাদের শোক উথলিয়া উঠে। দিবারাত্রি বায়নারও তাহাদের শেষ নাই। অপরিচিত আবেষ্টনীতে কিছুই বোধ হয় তাহাদের ভাল

লাগে না, সর্বদা খুঁতখুঁত করে। কারণে-অকারণে রাগিয়া কাঁদিয়া সকলকে মারিয়া অনর্থ বাধাইয়া দেয়। মন্দা প্রাণপণে তাহাদের তোয়াজ করিয়া চলে। সে যেন দাসী, রাজার ছেলে দুইটি দুইদিনের জন্য তাহার অতিথি হইয়া সৌভাগ্য ও সম্মানে তাহাকে পাগল করিয়া দিয়াছে, ওদের তুষ্টির জন্য প্রাণ না দিয়া সে ক্ষান্ত হইবে না। শ্যামা প্রথমে বুঝিতে পারে নাই, পরে টের পাইয়াছে, এমনিভাবে মাতিয়া থাকিবার জন্যই মন্দা এবার ছেলে দুইটিকে সঙ্গে আনিয়াছে। সেখানে শাশুড়িকে অতিক্রম করিয়া ওদের সে নাগাল পায় না। স্বাদ মিটাইয়া ওদের ভালবাসিবার জন্য, আদর যত্ন করিবার জন্য, সেই যে ওদের আসল মা, এটুকু ওদের বুঝাইয়া দিবার জন্য মন্দা এবার ওদের সঙ্গে আনিয়াছে।

আনিয়াছে চুরি করিয়া।

মন্দাই সবিস্তারে শ্যামাকে ব্যাপারটা বলিয়াছে। কথা ছিল, শুধু কোলের ছেলেটিকে সঙ্গে লইয়া মন্দা আসিবে, শাশুড়ীর দুই চোখের দুইটি মণি যমজ ছেলে দুইটি, কানু আর কালু, শাশুড়ীর কাছেই থাকিবে। কিন্তু এদিকে কাঁদাকাটা করিয়া স্বামীর সঙ্গে যে গভীর ও গোপন পরামর্শ মন্দা করিয়া রাখিয়াছে, শাশুড়ী তার কি জানেন? মন্দাকে আনিতে গিয়াছিল শীতল, কানু ও কালু স্টেশনে আসিয়াছিল বেড়াইতে, রাখাল সঙ্গে আসিয়াছিল তাহাদের ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য। গাড়ি ছাড়িবার সময় রাখাল একাই নামিয়া গিয়াছিল। কানু ও কালু তখন নিশ্চিন্ত মনে রসগোল্লা খাইতেছে।

শীতল বলিয়াছিল, গাড়ি ছাড়ার সময় হল, ওদের নামিয়ে নাও হে রাখাল।

রাখাল বলিয়াছিল—যাক না যাক; মামাবাড়ি থেকে কদিন বেড়িয়ে আসুক।

মন্দা বলিয়াছিল, ওরাও যাবে দাদা। উনি টিকিট কেটেছেন, এই নাও।

শ্যামাকে ব্যাপারটা বলিবার সময় মন্দা এই সংক্ষিপ্ত কথোপকথনটুকু উদ্ধৃত করিতেও ছাড়ে নাই, বলিয়াছে—দাদা কিছু টের পায় নি বৌ, ভেবেছিল শাশুড়ী বুঝি সত্যি সত্যি শেষে মত দিয়েছে। ফিরে গেলে যা কাণ্ডটা হবে! পেটের ছেলে চুরি করার জন্য আমায় না শেষে জেলে দেয়।

এদিক দিয়া শ্যামার বরাবর সুবিধা ছিল, স্বামীর জননীর খেয়াল মত কখনো তাহাকে পুতুল নাচ নাচিতে হয় নাই। তবু, মাঝে মাঝে শাশুড়ীর অভাবে তাহার কি কম ক্ষোভ হইয়াছে! আর কিছু না হোক, বিপদে আপদে মুখ চাহিয়া ভরসা

করিবার সুযোগ তো সে পাইত। মন্দা কোন দায়িত্ব গ্রহণ করে না, কেবল কাজ চালাইয়া দেয়। সেবার যে শ্যামার ছেলে মরিয়া গেল সে যদি কাহারো দোষে গিয়া থাকে অপরাধিনী শ্যামা, মন্দার কোনো ত্রুটি ছিল না। কিন্তু শাশুড়ী থাকিলে তিনিই সকল দায়িত্ব গ্রহণ করিতেন, শুধু আঁতুড়ে তাহাকে এবং বাহিরে তাহার সংসারকে সাহায্য করিয়া ক্ষান্ত না থাকিয়া ছেলেকে বাঁচাইয়া রাখার ভারও থাকিত তাঁহারই। যে সব ব্যবস্থার দোষে ছেলে তাহার মরিয়া গিয়াছিল সে তাহা বুঝিতে না পারুক শাশুড়ীর অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে অবশ্যই ধরা পড়িত। তা ছাড়া, স্বামীর মা তো পর নয় যে ছেলেকে সব দিক দিয়া ঘেরিয়া থাকিলে তাহাকে কোনো মায়ের হিংসা করা চলে! মন্দাকে শ্যামা সমর্থন করিতে পারে না।

বলে,—ওদের না আনলেই ভাল করতে ঠাকুরঝি!

মন্দা বলে, ভাল দিয়ে আমার কাজ নেই বাবু—সে ডাইনি মাগীর ভাল। আদর দিয়ে দিয়ে মাথা খাচ্ছেন আর দিনরাত জপাচ্ছেন আমাকে ঘেন্না করতে,—বড় হলে ওরা কেউ আমাকে মানবে? এখনি কেমন ধারা করে ছাখো না।

—কিন্তু এ ক'টা দিনে ওদের তুমি কি করতে পারবে ঠাকুরঝি? ফিরে গেলেই তো যে কে সেই। মাঝ থেকে শাশুড়ীর কতগুলো গালমন্দ খেয়ে মরবে।

মন্দার এসব হিসাব করাই আছে।

—একটু চেনা হয়ে রইল। একেবারে কাছে ঘেঁষত না, এবার ডাকলে-টাকলে একবার দুবার আসবে।

একদিন বিষ্ণুপ্রিয়া আসিয়াছিল।

বিষ্ণুপ্রিয়ার একটি মেয়ে হইয়াছে। মেয়ের জন্মের সময় সেও শ্যামার মত কষ্ট পাইয়াছিল, শ্যামার ভাগ্যের সঙ্গে তাহার ভাগ্যের পার্থক্য কিন্তু সব দিক দিয়াই আকাশ পাতাল, মেয়েটি তাহার মরে নাই, সোনার চামচে দুধ খাইয়া বড় হইতেছে। বিষ্ণুপ্রিয়ার শরীর খুব খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল, কোথায় হাওয়া বদলাইতে গিয়া সারিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এখনো তাহার চোখ দেখিলে মনে হয় রোগ যন্ত্রণার মতই কি একটা অস্থিরতা যেন সে ভিতরে চাপিয়া রাখিয়াছে। তাছাড়া, তাহার সাজ-সজ্জার অভাবটা অবাক করিয়া দেয়। এমন একদিন ছিল সে যখন বসনভূষণে, কেশরচনা ও দেহমার্জনার অতুল উপাদানে নিজেকে সব সময় ঝকঝকে করিয়া রাখিত। ত্বকে থাকিত জ্যোতি, কেশে থাকিত পালিশ, বসনে থাকিত বর্ণ ও ভূষণে

থাকিত হীরার চমক। এখন সেসব কিছুই তাহার নাই। অলঙ্কার প্রায় সবই সে খুলিয়া ফেলিয়াছে, বিন্যস্ত কেশরাজিতে ধরিয়াছে কতগুলি ফাটল, সে কাছে থাকিলে সাবান ছাড়া আর কোনো সুগন্ধীর ইঙ্গিত মেলে না। তাও মাঝে মাঝে নিশ্বাসের দুর্গন্ধে চাপা পড়িয়া যায়।

ঘনিষ্ঠতার বালাই না থাকিলেও মন্দা চিরকাল ঘনিষ্ঠ প্রশ্ন করিয়া থাকে।

—সাজগোজ একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন দেখছি।

বিষ্ণুপ্রিয়া হাসিয়া বলে—এবার মেয়ে ওসব করবে।

—একটি মেয়ে বিইয়েই সন্ন্যেসিনী হয়ে গেলেন ?

—একটি দুটির কথা নয় ঠাকুরঝি। নিজে ছেলেমেয়ে মানুষ করতে গেলে ও একটিই থাক আর দুটিই থাক ফিটফাট থাকা আর পোষায় না। মেয়ে এই এটা করছে, ওই ওটা করছে—নোংরামির চূড়ান্ত, তার সঙ্গে কি এসেন্স মানায় ? মেয়ে একটু বড় হলে হয়তো আবার শুরু করব। তা করব ঠাকুরঝি, এবয়সে কি আর বুড়ি হয়ে থাকব সত্যি সত্যি !

শ্যামা বলে, মেয়ে বড় হতে হতে আর একটি আসবে যে !

বিষ্ণুপ্রিয়া জোর দিয়া বলে—না, আর আসবে না।

মন্দা খিলখিল করিয়া হাসে—বললেন বটে একটা হাসির কথা ! এখুনি রেহাই পাবেন ? আরও কত আসবে, ভগবান দিলে কারো সাধ্যি আছে ঠেকিয়ে রাখে।

শ্যামা বলে—ঠাকুরঝি আপনাকে জব্দ করে দিলে।

বিষ্ণুপ্রিয়া বলে—আমাকে জব্দ করা আর শক্ত কি ?

যে বিষ্ণুপ্রিয়ার এমনি পরিবর্তন হইয়াছে একদিন সকালে সে শ্যামাকে দেখিতে আসিল। মেয়েকে সে সঙ্গে আনিল না। মেয়েকে সঙ্গে করিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া কোথাও যায় না, কারো বাড়ি মেয়েকে যাইতেও দেয় না, ঘরের কোণে লুকাইয়া রাখে। বাড়ির পুরানো ঝি ছাড়া আর কারো কোলে সে মেয়েকে যাইতে দেয় না। মেয়ের সম্বন্ধে তাহার একটা সন্দেহজনক গোপনতা আছে, পাড়ার মেয়েরা এমনি একটা আভাস পাইয়া কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছিল। তারপর সকলেই জানিয়াছে। জানিয়াছে যে বিষ্ণুপ্রিয়ার মেয়ে পৃথিবীতে আসিয়াছে পাপের ছাপ লইয়া, মহিম তালুকদার ভীষণ পাপী।

এবার বিষ্ণুপ্রিয়াকে কার্পেটের আসনটাতেই বসিতে দেওয়া হইল। মন্দা

ভদ্রতা করিয়া জিজ্ঞাসাও করিল—আপনাকে এক কাপ চা করে দি'?

চা? বিষ্ণুপ্রিয়া চা খায় না।

—খান না?—মন্দা সুন্দর অবাক হইতে জানে, কি আশ্চর্য!—তা, চা, আমার মেজ ননদও খায় না। তার বিয়ে হয়েছে চিলপাহাড়ীর জমিদার বাড়ি, মস্ত বড়লোক তারা, চালচলন সব সাহেবি! বিয়ের আগে আমার ননদ খুব চা খেত, বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি গিয়ে ছেড়ে দিলে। বললে, চা খেলে গায়ের চামড়া কর্কশ হয়। আমার মেজ ননদ খুব সুন্দরী কিনা, রঙ প্রায় গিয়ে মেমদের মত কটা। রঙ খারাপ হবার ভয়ে মরে থাকে। আমার কর্তাটিকে দেখেন নি? ওদের হল ফর্সার গুষ্টি, তাদের মধ্যে ওনার রঙ সবচেয়ে মাজা, তারপরেই আমার মেজ ননদ।

ছেলেদের জন্য বসিয়া কারো সঙ্গে কথা বলিবার অবসর মন্দা পায় না। উঠানে দুই ছেলে চৌবাচ্চার জল নষ্ট করিতেছে দেখিয়া সে উঠিয়া গেল। বিষ্ণুপ্রিয়া বলিল—আপনার ননদটি বেশ। খুব সরল।

—মুখ্যু।

বিষ্ণুপ্রিয়া প্রতিবাদ করিল না। আঁচলে মুখ মুছিয়া শ্যামার চোখাচোখি হওয়ায় একটু হাসিল। বাহিরে ঝকঝকে রোদ উঠিয়াছিল। শহরতলীর বাড়ি, জানালা দিয়া পুকুরও চোখে পড়ে, গাছপালাও দেখা যায়। আর পাখি। শরৎকালে পথ ভুলিয়া কতকগুলি পাখি শহরের ধারে আসিয়া পড়িয়াছে।

বিষ্ণুপ্রিয়া বলিল—তোমার ছেলের জন্যে দুটো একটা জামা-টামা পাঠালে কিছু মনে করবে ভাই? মনে যদি কর তো স্পষ্ট বলো, মনে এক মুখে আর এক, করো না।

বিষ্ণুপ্রিয়ার বলার ভঙ্গিতে শ্যামা একটু অবাক হইয়া গেল। বলিল—জামার দরকার তো নেই।

—দরকার নাই বা রইল, বেশিই না হয় হবে। পাঠাবো?

শ্যামা একটু ভাবিয়া বলিল—আচ্ছা।

—আনকোরা নতুন জামা, দর্জিবাড়ি থেকে সোজা তোমায় দিয়ে যাবে—আমার মেয়ের জামা-টামার সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি হবে না ভাই।

—হলই বা ছোঁয়াছুঁয়ি?

বিকালে বিষ্ণুপ্রিয়ার উপহার আসিল। কচি ছেলের দরকারী কয়েকটা

জিনিস। গালিচার মত পুরু ও নরম ফ্লানেলের কয়েকটা কাঁথা, ছেলেকে জড়াইয়া পুঁটলি করিয়া কোলে নেওয়ার জন্য ধবধবে সাদা কোমল তিনটি তোয়ালে আর আধ ডজন সেমিজের মত পাতলা লম্বা জামা। শেষোক্ত পদার্থগুলি মন্দাকে বিস্মিত করে।

—এগ্‌লো কি বৌ? আলখাল্লা নাকি?

শ্যামা হাসে—ঠাকুরঝি যেন কি! সায়েবদের ছেলেরা পরে ছাখো নি?

—তুমি যেন কত দেখেছ!

—দেখি নি! গড়ের মাঠে চিড়িয়াখানায় কত দেখেছি!

—ও, কত তুমি বেড়িয়ে বেড়াচ্ছ গড়ের মাঠে চিড়িয়াখানায়!

—না ঠাকুরঝি, ঠাট্টা নয়, আগে সত্যি নিয়ে যেত, চার-পাঁচবার গিয়েছি যে। সায়েবদের কচি কচি ছেলেদের এমনি জামা পরিয়ে ঠেলা গাড়িতে করে আয়ারা বেড়াতে আনত। এমন সুন্দর ছেলেগুলি, চুরি করে আনতে সাধ হত আমার।

পুরানো কাঁথার উপর শ্যামা নূতন কাঁথা বিছায়, ছেলের তৈলাক্ত পেনিটি খুলিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার দেওয়া আলখাল্লা পরায়, তারপর একখানা তোয়ালে জড়াইয়া শোয়াইয়া দেয়। আনন্দে অভিভূতা হইয়া বলে—কি রকম দেখাচ্ছে ছাখো ঠাকুরঝি!

মন্দা হাসিমুখে সায় দিয়া বলে—খাসা দেখাচ্ছে বৌ। ওমা, মুখ বাঁকায় যে!

ছেলেকে শ্যামা সত্যসত্যই পুটুলি করিয়াছে। হাত না নাড়িতে পারিয়া সে হাঁপাইয়া কাঁদিয়া ওঠে। তোয়ালেটা শ্যামা তাড়াতাড়ি খুলিয়া লয়। মন্দা শিশুকে কোলে লইয়া বলিতে থাকে—অ সোনা, অ মানিক—তোমায় বেঁধেছিল, শক্ত করে বেঁধেছিল, মরে যাই!

শ্যামার গায়ে কাঁটা দেয়।

মাথা দুলাইয়া ঝোঁক দিয়া দিয়া মন্দা বলিতে থাকে—মেরেছে? আমার ধনকে মেরেছে? কে মেরেছে রে! আ লো আ লো—ন ন ন—

শ্যামা উত্তেজিত হইয়া বলে—ও ঠাকুরঝি, ও যে হাসলো।

মন্দা দেখিতে পায় নাই। তবু সে সায় দিয়া বলে—পিসীর আদরে হাসবে না?

কি আশ্চর্য কাণ্ড ঠাকুরঝি! ওইটুকু ছেলে হাসে!

এরকম আশ্চর্য কাণ্ড দিবারাত্রিই ঘটিতে থাকে। খোকার সম্বন্ধে এবার সে কিনা অনেক বিষয়েই উদাসীন থাকিবে ঠিক করিয়াছে, খোকার আশ্চর্য কাণ্ডগুলিতে

অনেক সময় শ্যামা শুধু তাই মনে মনে আশ্চর্য হয়, বাহিরে কিছু প্রকাশ করে না। খোকার হাত-পা নাড়িয়া খেলা করা দেখিয়া মনে যখন তাহার দোলা লাগে, খেলার অর্থহীন হাত-নাড়া আর ক্ষুধার সময় স্তন খুঁজিয়া হাত-নাড়ার পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া তাহার যখন সকলকে ডাকিয়া এ ব্যাপার দেখাইতে ইচ্ছা হয়, শ্যামা তখন নিজেকে সতর্ক করিয়া দেয়। স্মরণ করে যে সন্তানকে উপলক্ষ্য করিয়া জননীর অসংযত উল্লাস অমঙ্গলজনক। আনন্দের একটা সীমা ভগবান মানুষের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, মানুষ তাহা লঙ্ঘন করিলে তিনি রাগ করেন। তবু সব সময় শ্যামা কি আর নিজেকে সামলাইয়া চলিতে পারে? অন্যমনস্ক অবস্থায় হঠাৎ এক সময় ঝাঁ করিয়া খোকাকে সে কোলে তুলিয়া লয়। তাহার পাঁজরে একদিকে থাকে হৃৎপিণ্ড আরেক দিকে থাকে খোকা, খোকার লালিম পা দুটি হইতে কেশ-বিরল মাথাটি পর্যন্ত শ্যামা অসংখ্য চুম্বন করে, দীর্ঘনিশ্বাসে খোকার দেহের আঘ্রাণ লয়। তারপর সে অনুতাপ করে। বাড়াবাড়ি করিয়া একবার তাহার সর্বনাশ হইয়াছে, তবু কি শিক্ষা হইল না?

শীতলের মিশ্র খাপছাড়া প্রকৃতিতেও বাৎসল্যের আবির্ভাব হইয়াছে। বাৎসল্যের রসে তাহার ভীরু উগ্রতাও যেন একটু নরম হইয়া আসিয়াছে। পিতৃত্বের অধিকার খাটাইয়া ছেলের সঙ্গে সে একটু মাথামাথি করিতে চায়, শ্যামা সভয়ে বাধা দিলে রাগ করার বদলে ক্ষুণ্ণই যেন হয়,—প্রকৃতপক্ষে, রাগ করার বদলে ক্ষুণ্ণ হয় বলিয়াই তাহার বিপজ্জনক আদরের হাত হইতে ছেলেকে বাঁচাইয়া চলিবার সাহস শ্যামার হয়। সে উপস্থিত না থাকিলে ছেলেকে কোলে তুলিতে শীতলকে সে বারণ করিয়া দিয়াছে। মাঝে মাঝে দুই-চার মিনিটের জন্য ছেলেকে স্বামীর কোলে সে দেয়, কিন্তু নিজে কাছে দাঁড়াইয়া থাকে, পুলিসের মত সতর্ক পাহারা দেয়।

মাঝে মাঝে শীতল তাহাকে ফাঁকি দিবার চেষ্টা করে। রাত্রে হয়তো সে জাগিয়া আছে, খোকা কাঁদিল। চুপি চুপি চৌকি হইতে নামিয়া মেঝেতে পাতা বিছানায় ঘুমন্ত শ্যামার পাশ হইতে খোকাকে সে সন্তর্পণে তুলিয়া লয়—চোরের মত। অনভ্যস্ত অপটু হাতে খোকাকে বুকের কাছে ধরিয়া রাখিয়া নিজে সামনে পিছনে দুলিয়া তাহাকে সে দোলা দেয়, মৃদু গুনগুনানো সুরে ঘুমপাড়ানো ছড়া কাটে। বলে, 'আয়রে পাড়ার ছেলেরা মাছ ধরতে যাই, মাছের কাঁটা পায়

ফুটেছে, দোলায় চড়ে যাই।' রাতদুপুরে নিজের মুখে ঘুমপাড়ানো ছড়া শুনিয়া মুখখানা তাহার হাসিতে ভরিয়া যায়। এ ছেলে কার? তার! শ্যামা মানুষ করিতেছে করুক, ছেলে শ্যামার নয়, তার।

এদিকে শ্যামার ঘুম ভাঙে। কচি ছেলের বুড়ি মা কি আর ঘুমায়? লোক দেখানো চোখ বুজিয়া থাকে মাত্র। উঠিয়া বসিয়া শীতলের কাণ্ড চাহিয়া দেখিতে শ্যামার মন্দ লাগে না। কিন্তু মনকে সে অবিলম্বে শক্ত করিয়া ফেলে।

বলে—কি হচ্ছে?

শীতল চমকাইয়া খোকাকে প্রায় ফেলিয়া দেয়।

শ্যামা বলে—ঘাড়টা বেঁকে আছে। ওর কত লাগছে বুঝতে পারছ?

—লাগলে কাঁদত।—শীতল বলে।

—কাঁদবে কি? যে ঝাঁকানি ঝাঁকছ, আঁতকে ওর কান্না বন্ধ হয়েছে।—শ্যামা বলে।

শীতল প্রথমে ছেলে ফিরাইয়া দেয়। তারপর বলে—বেশ করছি! অত তুমি লম্বা লম্বা কথা বলবে না বলে দিচ্ছি, খপরদার!

শীতল শুইয়া পড়ে। সে সত্য সত্যই রাগ করিয়াছে অথবা এইটা তার ফাঁকা গর্জন শ্যামা ঠিক তাহা বুঝিতে পারে না। খানিক পরে সে বলে, আমি কি বারণ করেছি ছেলে দেব না! একটু বড় হোক, নিও না তখন, যত খুশী নিও। ওকে ধরতে হলে আমারি এখন ভয় করে! কত সাবধানে নাড়াচাড়া করি, তবু কালকে হাতটা মুচড়ে গেল—

শীতল বলে, আরে বাপরে বাপ! রাত দুপুরে বকর বকর করে এ যে দেখছি ঘুমোতেও দেবে না!

শীতলের মেজাজ ঠাণ্ডা হইয়া আসিয়াছে সন্দেহ নাই। রাগ সে করে না, বিরক্ত হয়। মন যে তাহার নরম হইয়া আসিয়াছে অনেক সময় এটুকু গোপন করিবার জন্যই সে যেন রাগের ভান করে, কিন্তু আগের মত জমাইতে পারে না।

মন্দাকে নেওয়ার জন্য তাহার শাশুড়ী বারবার পত্র লিখিতেছিলেন, মন্দা বারবার জবাব লিখিতেছিল যে পড়িয়া গিয়া তাহার কোমরে ব্যথা হইয়াছে, উঠিতে পারে না, এখন যাওয়া অসম্ভব। শেষ পর্যন্ত শাশুড়ী বোধ হয় সন্দেহ করিলেন। এক শনিবার রাখালকে তিনি পাঠাইয়া দিলেন কলিকাতায়। রাখালের স্নেহ শ্যামা

ভুলিতে পারে নাই, সে আসিয়াছে শুনিয়াই আনন্দে সে উত্তেজিত হইয়া উঠিল, কিন্তু আনন্দ তাহার টিকিল না। রাখালের ভাব দেখিয়া সে বড় দমিয়া গেল। এতকাল পরে তার দেখা পাইয়া রাখাল খুশী হইল মামুলি ধরণে, কথা বলিল অন্যমনে, সংক্ষেপে। শ্যামার ছেলের সম্বন্ধে তাহার কিছুমাত্র কৌতূহল দেখা গেল না।

সারাদিন পরে বিকালে ব্যাপার বুঝিয়া মন্দা স্বামীকে বলিল—তুমি কি গো? বৌ কতবার ছেলে কোলে কাছে এল, একবার তাকিয়ে দেখলে না?

রাখাল বলিল, দেখলাম না? ওই যে বললাম, তুমি রোগা হয়ে গেছ বৌঠান?

মন্দা বলিল—দাদার ছেলে হয়েছে জানো? জানো আমার মাথা! ছেলেকে একবার কোলে নিয়ে একটু আদর করতে পারলে না? দাদা কি ভাববে!

রাখাল বলিল—তোমায় আদর করে সময় পেলাম কই?

মন্দা রাগ করিয়া বলিল—না বাবু তোমার কি যেন হয়েছে। তামাসাগুলি পর্যন্ত আজকাল রসালো হয় না।

—তোমার কাছে হয় না। বৌঠানকে ডেকে আনো হবে।

মন্দার অনুযোগের যে ফল ফলিল শ্যামার তাহাতে মনে হইল একটু গাল টিপিয়া আদর করিয়া রাখাল বুঝি ছেলেকে তাহার অপমান করিয়াছে। শ্যামার মনে অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়া রহিল। জীবন-যুদ্ধে সন্তানের প্রত্যেকটি পরাজয়ে মার মনে যে ক্ষুব্ধ বেদনার সঞ্চার হয়, এ অসন্তোষ তাহারই অনুরূপ। শ্যামার ছেলে এই প্রথমবার হার মানিয়াছে।

পরদিন বিকালে রাখাল একাই ফিরিয়া গেল। মন্দা যাইতে রাজী হইল না, রাখালও বেশি পীড়াপীড়ি করিল না। যাওয়ার কথা মন্দাকে সে একবারের বেশি দুইবার বলিল কি না সন্দেহ। পথ ভুলিয়া আসার মত যেমন অন্যমনে সে আসিয়াছিল, তেমনি অন্যমনে চলিয়া গেল।

কি জন্য আসিয়াছিল তাও যেন ভাল রকম বোঝা গেল না।

শীতল গোপনে শ্যামাকে বলিল, রাখাল আবার বিয়ে করেছে শ্যামা।

বলিল রাত্রে, শ্যামার যখন ঘুম আসিতেছে। শ্যামা সজাগ হইয়া বলিল—কেন ঠাট্টা করছ?

—কিসের ঠাট্টা? ও মাসের সাতাশে বিয়ে হয়েছে। মন্দাকে এখন কিছু

বলো না। রাখাল বলে গেছে সেই গিয়ে সব কথা খুলে ওকে চিঠি লিখবে। মুখে বলতে এসেছিল পারল না। আমিও ভেবে দেখলাম, চিঠি লিখে জানানোই ভাল।

উত্তেজনার সময় শ্যামার মুখে কথা যোগায় না। রাখালের ভাবভঙ্গি মনে করিয়া সে আরও মূক হইয়া রহিল। একদিন যে তাহার পরমাত্মীয়ের চেয়ে আপন হইয়া উঠিয়াছিল, গভীর রাত্রে বারান্দায় টিমটিমে আলোয় যার কাছে বসিয়া দুঃখের কথা বলিতে বলিতে সে নিঃসঙ্কোচে চোখ মুছিতে পারিত,—শুধু তাই নয়, যে চঞ্চল হইয়া উসখুস করিতে আরম্ভ করিলেও যার কাছে তাহার ভয় ছিল না, এবার সে তাহার কাছে ঘেঁষিতে পারে নাই। একটা কিছু করিয়া না আসিলে কি মানুষ এমন হয়?

—কোথায় বিয়ে হল, কি বৃত্তান্ত, বলো তো আমায়, গুছিয়ে বলো।—শ্যামা যখন এ অনুরোধ জানাইল, শীতলের চোখ ঘুমে বুজিয়া আসিয়াছে।

—অঁ?—বলিয়া সজাগ হইয়া সে যাহা জানিত গড়গড় করিয়া বলিয়া গেল। তারপর বলিল—বড় ঘুম পাচ্ছে গো। বাকি সব জিজ্ঞেস করো কাল।

জিজ্ঞাসা করিবার কিছু বাকি ছিল না, এবার শুধু আলোচনা। শ্যামার সে উৎসাহ ছিল না, সে জাগিয়া শুইয়া রহিল নীরবে। একি আশ্চর্য ব্যাপার যে রাখাল আবার বিবাহ করিয়াছে? স্ত্রী যে তাহার তিনটি সন্তানের জননী, একি সে ভুলিয়া গিয়াছিল। অবস্থা-বিশেষে পুরুষমানুষের দুবার বিবাহ করাটা শ্যামার কাছে অপরাধ নয়। ধর, এখন পর্যন্ত তার যদি ছেলে না হইত, শীতল আবার বিবাহ করিলে তাহা একেবারেই অসঙ্গত হইত না। কিন্তু এখন কি শীতল আর একটা বিবাহ করিতে পারে? কোন্ যুক্তিতে করিবে! রাখাল একি কাণ্ড করিয়া বসিয়াছে? মন্দার কাছে সে মুখ দেখাইবে কি করিয়া? রাখালকে শ্যামা চিরকাল শ্রদ্ধা করিয়াছে, কোনোদিন বুঝিতে পারে নাই। এবারও রাখালের এই কীর্তির কোনো অর্থ সে খুঁজিয়া পাইল না। এমন যদি হইত যে মন্দার স্বভাব ভাল নয়, সে দেখিতে কুৎসিত, তাহাকে লইয়া রাখাল সুখী হইতে পারে নাই,—আবার বিবাহ করিবার কারণটা তাহার শ্যামা বুঝিতে পারিত। মনের মিল তো দুজনের কম হয় নাই? এ বাড়ীতে পা দিয়া অসুস্থা মন্দার যে সেবাটাই রাখালকে সে করিতে দেখিয়াছিল তাও শ্যামার মনে আছে।

এমন কাজ তবে সে কেন করিল? শ্যামা ভাবে, ঘুমাইতে পারে না। চৌকির উপর শীতল নাক ডাকায়, ঘুমন্ত সন্তানের মুখ হইতে স্তন আলগা হইয়া খসিয়া আসে, জননী শ্যামা আহত উত্তেজিত বিষণ্ন মনে আর একটি জননীর দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিয়া যায়। রাখালের অপকার্যের একটা কারণ খুঁজিয়া পাইলে সে যেন স্বস্তি পাইত। কে বলিতে পারে এরকম বিপদ তারও জীবনে ঘটিবে কি না? শীতল তো রাখালের চেয়ে ভাল লোক নয়। কিসের যোগাযোগে স্ত্রী ও জননীর কপাল ভাঙ্গে মন্দার দৃষ্টান্ত হইতে সেটুকু বোঝা গেলে মন্দ হইত না। তারপর একটা কথা ভাবিয়া হঠাৎ শ্যামার হাত-পা অবশ হইয়া আসে। মন্দা জননী বলিয়াই হয়তো রাখালের স্ত্রীর প্রয়োজন হইয়াছে? ছেলের জন্য মন্দা স্বামীকে অবহেলা করিয়াছিল, স্ত্রী বর্তমানে রাখাল স্ত্রীর অভাব অনুভব করিয়াছিল, হয়তো তাই সে আবার বিবাহ করিয়াছে?

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া শীতল দেখিল, বুকের উপর ঝুঁকিয়া মুখের কাছে হাসিভরা মুখখানা আনিয়া শ্যামা তাহাকে ডাকিতেছে। শ্যামা সে রাত্রেই বার বার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল ছেলের জন্য কখনো সে স্বামীকে তাহার প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিবে না, শীতল তো তাহা জানিত না, এও সে জানিত না, যে প্রতিজ্ঞা-পালনে স্বামীর ঘুম ভাঙ্গিবার নিয়মিত সময় পর্যন্ত সবুর শ্যামার সহে নাই। শীতল তাহাকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিল। বলিল, হয়েছে কি?

—বেলা হল উঠবে না?

শীতল পাশ ফিরিয়া শুইল। বিড়বিড় করিয়া সে যা বলিল তা গালাগালি।

তখন শ্যামা বুঝিতে পারিল সে ভুল করিয়াছে। ছেলের জন্য স্বামীকে অবহেলা না করিবার প্রক্রিয়া এটা নয়! স্বামী যতটুকু চাহিবে দিতে হইবে ততটুকু, গায়ে পড়িয়া সোহাগ করিতে গেলে জুটিবে গালাগালি।

মন্দার কোনো পরিবর্তন নাই। সে তো এখনো জানে না। ছেলেদের লইয়া ব্যস্ত ও বিব্রত হইয়া রহিল। আড়চোখে তাহার সানন্দ চলাফেরা দেখিতে দেখিতে শ্যামার বড় মমতা হইতে লাগিল। সে মনে মনে বলিল, অ পোড়াকপালি! বেশ হেসে খেলে সময় কাটাচ্ছ, ওদিকে তোমার যে সর্বনাশ হয়ে গেছে। যখন জানবে তুমি করবে কি?—

একটা বিড়াল ছানার জন্য মারামারি করিয়া কানু ও কালু কাঁদিতেছিল।

দেখাদেখি কোলের ছেলেটিও কান্না জুড়িয়াছিল। শ্যামা সাহায্য করিতে গেলে মন্দা তাহাকে হটাইয়া দিল। তিনজনকে সে সামলাইল একা।

শ্যামার চোখ ছলছল করিতে লাগিল। সে মনে মনে বলিল, কার ছেলেদের এত ভালবাসছ ঠাকুরঝি? সে তো তোমার মান রাখে নি!

মন্দার সমস্যা শ্যামাকে বড় বিচলিত করিয়াছে। রাখালের প্রতি সে যেন ক্রমে ক্রমে বিদ্বেষ বোধ করিতে আরম্ভ করে। সংসারে স্ত্রীলোকের অসহায় অবস্থা বুঝিতে পারিয়া নিজের কাছে সে অপদস্থ হইয়া যায়। যে আশ্রয় তাহাদের সবচেয়ে স্থায়ী কত সহজে তাহা নষ্ট হইয়া যায়। যে লোকটির উপর সব দিক দিয়া নির্ভর করিতে হয়, কত সহজে সে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বসে?

মন্দা অবশ্যই এবার অনেক দিন এখানে থাকিবে। এ আরেক সমস্যার কথা। আর্থিক অবস্থা তাহাদের স্বচ্ছল নয়, নূতন চাকরীতে শীতল নিয়মিত মাহিনা পায় বটে, টাকার অঙ্কটা কিন্তু ছোট। শীতলের কিছু ধার আছে, মাঝে মাঝে কিছু কিছু শুধিতে হয়, সুদও দিতে হয়। খরচ চলিতে চায় না। তিনটি ছেলে লইয়া মন্দা বেশিদিন এখানে থাকিলে বড়ই তাহারা অসুবিধায় পড়িবে। শ্যামা অবশ্য এসব অসুবিধার কথা ভাবিতে বসিত না, অত ছোট মন তাহার নয়,—যদি তাহার খোকাটি না আসিত। মন্দার জন্য তাহারা স্বামী-স্ত্রী না হয় কিছুদিন কষ্টই ভোগ করিল, কারো খাতিরে খোকাকে তো তাহারা কষ্ট দিতে পারিবে না। ওর যে ভাল জামাটি জুটিবে না, দুধ কম পড়িবে, অসুখে-বিসুখে উপযুক্ত চিকিৎসা হইবে না, শ্যামা তাহা সহিবে কি করিয়া? নিজের ছেলের কাছে নাকি ননদ ও তাহার ছেলেমেয়ে! যতদিন সম্ভব, ঠিক ততদিনই মন্দাকে সে এখানে থাকিতে দিবে। তারপর মুখ ফুটিয়া বলিবে, আমাদের খরচ চলছে না ঠাকুরঝি। বলিবে, অভিমান চলবে কেন ভাই? মেয়েমানুষের এমনি কপাল। এবার তুমি ফিরে যাও ঠাকুরজামায়ের কাছে।

হিসাবে শ্যামার একটু ভুল হইয়াছিল। কয়েকদিন পরে রাখালের পত্র আসিবামাত্র বনগাঁ যাওয়ার জন্য মন্দা উতলা হইয়া উঠিল। সে কোনোমতেই বিশ্বাস করিতে চাহিল না, রাখাল আবার বিবাহ করিয়াছে। বারবার সে বলিতে লাগিল, সব মিছে কথা। সে বনগাঁ যায় নাই বলিয়া রাগিয়া রাখাল এরকম চিঠি লিখিয়াছে। একথা কখনো সত্যি হয়? তবু এরকম অবস্থায় তাহার অবিলম্বে

বনগাঁ যাওয়া দরকার।

—আমায় আজকেই রেখে এসো দাদা, পায়ে পড়ি তোমার।

এদিকে, সেদিন আরেক মুস্কিল হইয়াছে। রাত্রে শ্যামার ছেলের হইয়াছিল জ্বর, সকালে থার্মোমিটার দিয়া দেখা গিয়াছে জ্বর একশ দুইয়ের একটু নিচে। ছেলে কোলে করিয়া শেষরাত্রি হইতে শ্যামা ঠায় বসিয়া কাটাইয়াছে। ভাবিয়া ভাবিয়া সে বাহির করিয়াছে যে, বারোকে চার দিয়া গুণ করিলে যত হয়, ছেলের বয়স এখন তাহার ঠিক ততদিন। আগের খোকাটি তাহার ঠিক বারোদিন বাঁচিয়াছিল। বনগাঁ অনেক দূর, শীতলকে শ্যামা ছাপাখানায় পর্যন্ত যাইতে দিতে রাজী নয়।

শীতল বলিল—দুদিন পরেই যাস মন্দা। চিঠিপত্র লেখা হোক, একটা খবর দিয়ে যাওয়াও তো দরকার। খোকার জ্বরটাও ইতিমধ্যে হয়তো কমবে।

মন্দা শুনিল না। বাড়িটা হঠাৎ তাহার কাছে জেলখানা হইয়া উঠিয়াছে। সে মিনতি করিয়া বলিতে লাগিল—আজ না পার, কাল আমাকে তুমি রেখে এসো দাদা। সকালে রওনা হলে বিকেলের গাড়িতে ফিরে আসতে পারবে তুমি।

শীতল বলিল—ব্যস্ত হোস কেন মন্দা, দেখাই যাক না কাল সকাল পর্যন্ত, খোকার জ্বর আজকের দিনের মধ্যে কমে যেতেও পারে তো!

বিকালে খোকার জ্বর কমিল, শেষরাত্রে আবার বাড়িয়া গেল।

সকালে মন্দা বলিল—আমার তবে কি উপায় হবে বৌ? আমি তো থাকতে পারি না আর। দাদা যদি নাই যেতে পারে, আমায় গাড়িতে তুলে দিক, ওদের নিয়ে আমি একাই যেতে পারব।

শ্যামা রাত্রে ভাবিয়া দেখিয়াছিল, মন্দাকে আটকাইয়া রাখা সঙ্গত নয়। উদ্বেগে ও আশঙ্কায় সে এখন বনগাঁ যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, পরে হয়তো মত পরিবর্তন করিয়া বসিবে, আর যাইতেই চাহিবে না। বলিবে, অমন স্বামীর মুখ দেখার চেয়ে ভাইয়ের বাড়ি পড়িয়া থাকাও ভাল। বোনকে পুষিবার ক্ষমতা যে শীতলের নাই, এতো আর সে হিসাব করিবে না। তার চেয়ে ও যখন যাইতে চায়, ওকে যাইতে দেওয়াই ভাল। একদিনে তাহার খোকার কি হইবে—শীতল তো ফিরিয়া আসিবে রাত্রেই।

এই সব ভাবিয়া শ্যামা শীতলকে বনগাঁ যাইতে বাধা দিল না। জিনিস-পত্র

মন্দা আগের দিনই বাঁধিয়া ছাঁদিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। একচড়া আলুভাতে ফুটাইয়া কালু ও কানুকে খাওয়াইয়া, কোলের ছেলেটির জন্য বোতলে দুধ ভরিয়া লইয়া শীতলের সঙ্গে সে রওনা হইয়া গেল। গাড়িতে ওঠার সময় মন্দা একটু কাঁদিল, শ্যামাও কয়েকবার চোখ মুছিল।

গাড়ি যেন চোখের আড়াল হইল না, শ্যামার ছেলের জ্বর বাড়িতে আরম্ভ করিল। ঝিকে দিয়া কই মাছ আনাইয়া শ্যামা এবেলা শুধু ঝোল-ভাত রাঁধিবার আয়োজন করিয়াছিল, সব ফেলিয়া রাখিয়া দুরুদুরু বুকে অবিচলিত মুখে সে ছেলেকে কোলে করিয়া বসিল। নিয়তির খেলা শ্যামা বোঝে বৈ কি। মন্দার ভার এড়াইবার লোভে শীতলকে যাইতে দেওয়ার দুর্মতি নতুবা তাহার হইবে কেন? স্বামী আবার বিবাহ করিয়াছে বলিয়া মন্দা চিরকাল ভাইয়ের সংসারে পড়িয়া থাকিত, এ আশঙ্কা শ্যামার কাছে একটা অর্থহীন মনে হইল। কাঁধে শনি ভর না করিলে মানুষ ভবিষ্যতের একটা কাল্পনিক অসুবিধার কথা ভাবিয়া ছেলের রোগকে অগ্রাহ্য করে? ছেলে যত ছটফট করিয়া কাঁদিতে লাগিল, অনুতাপে শ্যামার মন ততই পুড়িয়া যাইতে লাগিল। যেমন ছোট তাহার মন, তেমনি উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে। তার মত স্বার্থপর হীনচেতা স্ত্রীলোকের ছেলে যদি না মরে তো মরিবে কার? একা সে এখন কি করে!

ঠিকা ঝি বাসন মাজিতেছিল। তাহাকে ডাকিয়া শ্যামা বলিল—খোকার বড় জ্বর হয়েছে সত্যভামা, বাবু বনগাঁ গেলেন, কি হবে এখন?

ঝি শতমুখে আশ্বাস দিয়া বলিল—কমে যাবে মা, কমে যাবে।—ছেলেপিলের এমন জ্বর জ্বালা কত হয়, ভেবো নি।

—তুমি আজ কোথাও যেয়ো না সত্যভামা।

কিন্তু না গিয়া সত্যভামার উপায় নাই। সে ধরিতে গেলে স্বামীহীনা, কিন্তু তাহার চারটি ছেলেমেয়ে আছে। তিন বাড়ি কাজ করিয়া সে ইহাদের আহার যোগায়, শ্যামার কাছে বসিয়া থাকিলে তাহার চলিবে কেন? সত্যভামার বড় মেয়ে রানীর বয়স দশ বছর, তাহাকে আনিয়া শ্যামার কাছে থাকিতে বলিয়া সে সরকারদের কাজ করিতে চলিয়া গেল।

রানীর একটা চোখে আঞ্জিনা হইয়াছিল, চোখ দিয়া তাহার এত জল পড়িতেছিল, যেন কার জন্য শোক করিতেছে। শ্যামা এবার একেবারে নিঃসন্দেহ হইয়া গেল।

এমন যোগাযোগ, এত সব অমঙ্গলের চিহ্ন, একি ব্যর্থ যায়? আজ দিনটা মেঘলা করিয়া আছে। শীত পড়িয়াছে কনকনে। খোকার জ্বরের তাপে শ্যামার কোল যত গরম হইয়া ওঠে, হাত-পা হইয়া আসে তেমনি ঠাণ্ডা। মাঝে মাঝে শ্যামার সর্বাঙ্গে কাঁপুনি ধরিয়া যায়। বেলা বারোটার সময় খোকার ভাঙ্গা ভাঙ্গা কান্না থামিল। ভয়ে ভাবনায় শ্যামা আধমরা হইয়া গিয়াছিল, তবু তাহার প্রথম ছেলেকে হারানোর শিক্ষা সে ভোলে নাই,—তাড়াতাড়ি নয়, বাড়াবাড়ি নয়। এরকম উত্তেজনার সময় ধীরতা বজায় রাখা অনভ্যস্ত অভিনয়ের সামিল, শ্যামার চিন্তা ও কার্য দুই-ই অত্যন্ত শ্লথ হইয়া গিয়াছিল। তিনবার থার্মোমিটার দিয়া সে ছেলের সঠিক টেম্পারেচার ধরিতে পারিল। একশ' তিন উঠিয়াছে। জ্বর এখনো বাড়িতেছে বুঝিতে পারিয়া রানীকে সে ওপাড়ার হারান ডাক্তারকে ডাকিতে পাঠাইয়া দিল। এতক্ষণে সে টের পাইয়াছে জ্বরের বৃদ্ধি স্থগিত হওয়ার প্রতীক্ষায় এতক্ষণ ডাক্তার ডাকিতে না পাঠানো তাহার উচিত হয় নাই। হারান ডাক্তার যেমন গম্ভীর তেমনি মন্থর। আজ যদি রোগী দেখিয়া ফিরিতে তাহার বেলা হইয়া থাকে, স্নান করিয়া খাইয়া ব্যাপার দেখিতে আসিবে সে তিন ঘণ্টা পরে। রানী কি রোগীর অবস্থাটা তাহাকে বুঝাইয়া বলিতে পারিবে? সামান্য জ্বর মনে করিয়া হারান ডাক্তার যদি বিকালে দেখিতে আসা স্থির করে? ছেলেকে ফেলিয়া রাখিয়া শ্যামা সদর দরজায় গিয়া পথের দিকে তাকায়। রানীকে দেখিতে পাইলে ডাকিয়া ফিরাইয়া একটি কাগজে হারান ডাক্তারকে সে কয়েকটি কথা লিখিয়া দিবে। রানীকে সে দেখিতে পায় না। শুধু পাড়ার ছেলে বিনু ছাড়া পথে কেহ নাই।

শ্যামা ডাকে—অ বিনু, অ ভাই বিনু শুনছ?

কি?

—খোকার বড্ড জ্বর হয়েছে ভাই, কেমন অজ্ঞানের মত হয়ে গেছে, লক্ষ্মী দাদাটি, একবার ছুটে হারান ডাক্তারকে গিয়ে বল গে—

—আমি পারব না।—বিনু বলে।

শ্যামা বলে—ও ভাই বিনু শোন ভাই একবার—

বাড়াবাড়ি? সে উতলা হইয়াছে? ঘরে গিয়া শ্যামা কাঁদে। দেখে, ছেলে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতেছে। চোখ বুজিয়া নিশ্বাস ফেলিতেছে। ওকি আর চোখ মেলিবে?

হারান ডাক্তার দেরি না করিয়াই আসিল। হারান যত মন্থরই হোক, তার পুরানো নড়বড়ে ফোর্ড গাড়িটা এখনো ঘণ্টায় বিশ মাইল যাইতে পারে। ভাত খাইয়া সে ধীরে ধীরে পান চিবাইতেছিল, ঘরে ঢুকিয়া সে প্রথমে চিকিৎসা করিল শ্যামার। বলিল, কেঁদো না বাছা। রোগ নির্ণয় হবে না।

কেমন তাহার রোগ নির্ণয় কে জানে, খোকার গায়ে একবার হাত দিয়াই হুকুম দিল—এক গামলা ঠাণ্ডা জল, কলসী থেকে এনো।

শ্যামা গামলায় জল আনিলে হারান ডাক্তার ধীরে ধীরে খোকাকে তুলিয়া গলা পর্যন্ত জলে ডুবাইয়া দিল, এক হাতে সেই অবস্থায় তাহাকে ধরিয়া রাখিয়া অন্য হাতে ভিজাইয়া দিতে লাগিল তাহার মাথা। খোকার মার অনুমতি চাহিল না, এরকম বিপজ্জনক চিকিৎসার কোনো কৈফিয়ৎও দিল না।

শ্যামা বলিল—একি করলেন?

হারান ডাক্তার বলিল—শুকনো তোয়ালে থাকলে দাও, না থাকলে শুকনো কাপড়েও চলবে।

শ্যামা বিষ্ণুপ্রিয়ার দেওয়া একটি তোয়ালে আনিয়া দিলে, জল হইতে তুলিয়া তোয়ালে জড়াইয়া খোকাকে হারান শোয়াইয়া দিল। নাড়ী দেখিয়া চৌকির পাশের দিকে সরিয়া গিয়া ঠেস দিল দেয়ালে। পান সে আজ আগাগোড়া জাবর কাটিতেছিল, এবার বুজিল চোখ।

শ্যামা বলিল—আমার কি হবে ডাক্তারবাবু?

হারান রাগ করিয়া বলিল, এই তো, এই তো তোমাদের দোষ! কাঁদবার কারণটা কি হল? ওর আরেকটা বাথ দিতে হবে বলে বসে আছি বাছা, তোমাদের দিয়ে তো কিছু হবার জো নেই, খালি কাঁদতে জানো।

হারান বুড়া হইয়াছে, তাহাকে 'ডাক্তারবাবু' বলিতে শ্যামার কেমন বাধিতেছিল। রোগীর বাড়িতে ডাক্তারের চেয়ে পর কেহ নাই, সে মানুষ নয়, সে শুধু একটা প্রয়োজন, তিতো ওষুধের মত সে একটা হিতৈষী বন্ধু। হারানকে পর মনে করা কঠিন। তাহাকে দেখিয়া এতখানি আশ্বাস মেলে, অথচ এমনি সে অভদ্র যে আত্মীয় ভিন্ন তাহাকে আর কিছু মনে করিতে কষ্ট হয়।

শ্যামা তাই হঠাৎ বলিল—আপনি একটু শোবেন বাবা?—দেয়ালে ঠেস দিয়ে কষ্ট হচ্ছে আপনার।

কষ্ট? হাসিতে গিয়া হারান ডাক্তারের মুখের চামড়া অনভ্যস্ত ব্যায়ামে কুঁচকাইয়া গেল, এতক্ষণে শ্যামার দিকে সে যেন একটু বিশেষ ভাবে চাহিয়া দেখিল, না মা, কষ্ট নেই, শোব—একেবারে বাড়ি গিয়ে শোব। দুটো পান দিতে পার, বেশ করে দোক্তা দিয়ে?

শ্যামা পান সাজিয়া আনিয়া দিল। এটুকু সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে খোকার অবস্থা বিপজ্জনক, নহিলে ডাক্তার মানুষ যাচিয়া বসিয়া থাকিবে কেন? এত জ্বরের উপর জলে ডুবাইয়া চিকিৎসাও কি মানুষ সহজে করে? তবু শ্যামা অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছে। সে তো ডাক্তারি বিদ্যার পরিচয় রাখে না, সে জানে ডাক্তারকে। জীবনমরণের ভার যে ডাক্তার পান চিবাইতে চিবাইতে লইতে পারে, সেই তো ডাক্তার,—মরণাপন্ন ছেলেকে ফেলিয়া এমন ডাক্তারকে পান সাজিয়া দিতে শ্যামা খুশীই হয়। পান আর এক খাবলা দোক্তা মুখে দিয়া হারান শীতলের কথা জিজ্ঞাসা করিল। আধ ঘণ্টা পরে খোকার তাপ লইয়া বলিল—জ্বর বাড়ে নি। তবু গাটা একবার মুছে দিই, কি বল মা?

না, হারান ডাক্তার গম্ভীর নয়। রোগীর আত্মীয়স্বজনকে সে শুধু গ্রাহ্য করে না, ওর মধ্যে যে তার সঙ্গে ভাব জমাইতে পারে, বুড়া তার সঙ্গে কথা বড় কম বলে না। 'বাবা' বলিয়া ডাকিয়া শ্যামা তাহার মুখ খুলিয়া দিয়াছে, রাজ্যের কথার মধ্যে খোকার যে কত বড় ফাঁড়া কাটিয়াছে, তাও সে শ্যামাকে শোনাইয়া দিল। বলিল—বিকাল পর্যন্ত তাহাকে না ডাকিলে আর দেখিতে হইত না। জ্বর বাড়িতে বাড়িতে এক সময়...

—গিয়ে একটা ওষুদ পাঠিয়ে দিচ্চি রানীর হাতে, পাঁচ ফোঁটা করে খাইয়ে দিও দুধের সঙ্গে মিশিয়ে চামচেয়,—গরুর দুধ নয় মা, সে ভুল যেন করে বোসো না। আধ ঘণ্টা পর পর তাপ নিয়ে যদি দ্যাখো জ্বর কমছে না, গা মুছে দিও।

—সন্ধ্যাবেলা আপনি আর একবার আসবেন বাবা।

হারান দরজার কাছে গিয়া একবার দাঁড়াইল। বলিল—ভয় পেয়ো না মা, এবার জ্বর কমতে আরম্ভ করবে।

শ্যামা ভাবিল, সাহস দিবার জন্য নয়, হারান হয়তো ভিজিটের টাকার জন্য দাঁড়াইয়াছে। কত টাকা দিবে, যাহাকে 'বাবা' বলিয়া ডাকিয়াছে, দুটো একটা টাকা কেমন করিয়া হাতে দিবে, শ্যামা ভাবিয়া পাইতেছিল না, অত্যন্ত সঙ্কোচের

সঙ্গে সে বলিল, উনি বাড়ি নেই—

—এলে পাঠিয়ে দিও—বলিয়া হারান চলিয়া গেল। স্বয়ং শীতলকে অথবা ভিজিটের টাকা, কি যে সে পাঠাইতে বলিয়া গেল, কিছুই বুঝিতে পারা গেল না।

শীতলের ফিরিবার কথা ছিল রাত্রি আটটায়। সে আসিল পরদিন বেলা বারটায় সময়। বিষ্ণুপ্রিয়া কার কাছে খবর পাইয়া এবেলা শ্যামাকে ভাত পাঠাইয়া দিয়াছিল, শীতল যখন আসিয়া পৌছিল সে তখন অনেক ব্যঞ্জনের মধ্যে শুধু মাছ দিয়া ভাত খাইয়া উঠিয়াছে এবং নিজেকে তাহার মনে হইতেছে রোগমুক্তার মত।

শীতল জিজ্ঞাসা করিল—খোকা কেমন ?

—ভাল আছে।

—কাল গাড়ি ফেল করে বসলাম, এমন ভাবনা হচ্ছিল তোমাদের জন্যে !

শ্যামার মুখে অনুযোগ নাই, সে গম্ভীর ও রহস্যময়ী। কাল বিপদে পড়িয়া কারো উপর নির্ভর করিবার জন্য সে মরিয়া যাইতেছিল, আজ বিপদ কাটিয়া যাওয়ার পর কিছু আত্মমর্যাদার প্রয়োজন হইয়াছে।

তিন

কয়েক বৎসর কাটিয়াছে।

শ্যামা এখন তিনটি সন্তানের জননী। বড় খোকার দুবছর বয়সের সময় তাহার একটি মেয়ে হইয়াছে, তার তিন বছর পরে আর একটি ছেলে। নামকরণ হইয়াছে তিনজনেরই—বিধানচন্দ্র, বকুলমালা ও বিমান বিহারী এগুলি পোষাকী নাম। এ ছাড়া তিনজনের তিনটি ডাকনামও আছে, খোকা—বুকু ও মণি।

ওদের মধ্যে বকুলের স্বাস্থ্যই আশ্চর্য রকমে ভাল। জন্মিয়া অবধি একদিনের জন্য সে অসুখে ভোগে নাই, মোটা মোটা হাত-পা, ফোলা ফোলা গাল,—দুরন্তের একশেষ। শ্যামা তাহার মাথার চুলগুলি বাবরি করিয়া দিয়াছে। খাটো জাঙ্গিয়া-পরা মেয়েটি যখন একমুহূর্ত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ঝাঁকড়া চুলের ফাঁক দিয়া মিটমিট করিয়া তাকায়, দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়। বুকুর রঙও হইয়াছে বেশ মাজা। রৌদ্রোজ্জ্বল প্রভাতে তাহার মুখখানা জলজল করে, ধূসর সন্ধ্যায় স্তিমিত হইয়া

আসে—সারাদিনের বিনিদ্র দুরন্তপনার পর নিদ্রাতুর চোখ দুটির সঙ্গে বেশ মানায়। কিন্তু দেখিবার কেহ থাকে না। শ্যামা রান্না করে, শ্যামার কোল জুড়িয়া থাকে ছোট খোকামণি। বুকু পিছন হইতে মার পিঠে বুকের ভর দিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। মার কাঁধের উপর দিয়া ডিবার শিখাটির দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার চোখ বুজিয়া যায়।

শ্যামা পিছনে হাত চালাইয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিয়া ডাকে, খোকা অ খোকা!

বিধান আসিলে বলে—ভাইকে কোলে নিয়ে বোসো তো বাবা, বুকুকে শুইয়ে দিয়ে আসি।

বিধানের হাতেখড়ি হইয়া গিয়াছে, এখন সে প্রথমভাগের পাঠক! ছেলেবেলা হইতে লিভার খারাপ হইয়া শরীরটা তাহার শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, মাঝে মাঝে অসুখে ভোগে। মুখখানি অপরিপুষ্ট ফুলের মত কোমল। শরীর ভাল না হোক, ছেলেটার মাথা হইয়াছে খুব সাফ। বুলি ফুটিবার পর হইতেই প্রশ্নে প্রশ্নে সকলকে সে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে, জগতের দিকে চোখ মেলিয়া চাহিয়া তাহার শিশু-চিত্তে যে সহস্র প্রশ্নের সৃষ্টি হয়, প্রত্যেকটির জবাব পাওয়া চাই। মনোজগতে সে দুর্জ্ঞেয় রহস্য থাকিতে দিবে না, তাহার জিজ্ঞাসার তাই সীমা নাই। সবজান্তা হইবার জন্য তাহার এই ব্যাকুল প্রয়াসে সবজান্তারা কখনো হাসে, কখনো বিরক্ত হয়। বিরক্ত বেশি হয় শীতল, বিধানের গোটা দশেক 'কেন'-র জবাব দিয়া পরবর্তী পুনরাবৃত্তিতে সে ধমক লাগায়। শ্যামার ধৈর্য অনেকক্ষণ বজায় থাকে। অনেক সময় হাতের কাজ করিতে করিতে যা মনে আসে জবাব দিয়া যায়, সব সময় খেয়ালও থাকে না, কি বলিতেছে। বিধানের চিন্তাজগৎ মিথ্যায় ভরিয়া ওঠে, মনে তাহার বহু অসত্যের ছাপ লাগে।

দিনের মধ্যে এমন কতগুলি প্রহর আছে, শ্যামাকে যখন যাচিয়া ছেলের মুখে মুখরতা আনিতে হয়। বিধান মাঝে মাঝে গম্ভীর হইয়া থাকে। গম্ভীর অন্যমনস্কতায় ডুবিয়া গিয়া সে স্থির হইয়া বসিয়া থাকে, চোখ দুটি উদাসীন হইয়া যায়। স্প্রিংএর মোটরটি পাশে পড়িয়া থাকে, ছবির বইটির পাতা বাতাসে উল্টাইয়া যায় সে চাহিয়া দেখে না। ছেলের মুখ দেখিয়া শ্যামার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া ওঠে। যেন ঘুমন্ত ছেলেকে ডাকিয়া তুলিতেছে এমনিভাবে সে ডাকে—খোকা, এই খোকা!

—উঁ?

—আয় তো আমার কাছে। ছাখ তোর জন্যে কেমন জামা করছি।

বিধান কাছেও আসে, জামাও দেখে কিন্তু তাহার কোনো রকম উৎসাহ দেখা যায় না।

শ্যামা উদ্বিগ্ন হইয়া বলে—কি ভাবছিস রে তুই? কার কথা ভাবছিস?

—কিচ্ছু ভাবছি না তো!

—মোটরটা চালা না খোকা, মণি কেমন হাসবে দেখিস।

বিধান মোটরে চাবি দিয়া ছাড়িয়া দেয়। মোটরটা চক্রাকারে ঘুরিয়া ওদিকের দেয়ালে ঠোক্কর খায়। শ্যামা নিজেই উচ্ছসিত হইয়া বলে—যাঃ, তোর মোটরের কলিশন হয়ে গেল!—বিধান বসিয়া থাকে, খেলনাটিকে উঠাইয়া আনিবার স্পৃহা তাহার দেখা যায় না। সেলাই বন্ধ করিয়া শ্যামা ছুঁচটি কাপড়ে বিঁধাইয়া রাখে। বিধানের হঠাৎ এমন মনমরা হইয়া যাওয়ার কোনো কারণই সে খুঁজিয়া পায় না। বুড়ো মানুষের মত একি উদাস গাম্ভীর্য অতটুকু ছেলের!

—ক্ষিদে পেয়েছে তোর?

বিধান মাথা নাড়ে।

—তবে তোর ঘুম পেয়েছে খোকা। আয় আমরা শুই।

—ঘুম পায় নি তো!

ওরে দুর্জ্ঞেয়, তবে তোর হইয়াছে কি!

—তবে চল, ছাদ থেকে কাপড় তুলে আনি।

সিঁড়িতে ছাদে শ্যামা অনর্গল কথা বলে। বিধানের জীবনে যত কিছু কাম্য আছে, জ্ঞানপিপাসার যত কিছু বিষয়বস্তু আছে, সব সে তাহার মনে পড়াইয়া দিতে চায়। ছেলের এই সাময়িক ও মানসিক সন্ন্যাসে শচীমাতার মতই তাহার ব্যাকুলতা জাগে। কাপড় তুলিয়া কুঁচাইয়া সে বিধানের হাতে দেয়। বিধান কাপড়গুলি নিজের দুই কাঁধে জমা করে। কাপড় তোলা শেষ হইলে শ্যামা আলিসায় ভর দিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া বলে, কুলপি-বরফ খাবি খোকা?

এমনি ভাবে কথা দিয়া পূজা করিয়া, কুলপি-বরফ ঘুষ দিয়া শ্যামা ছেলের নীরবতা ভঙ্গ করে।

বিধান জিজ্ঞাসা করে—কুলপি-বরফ কি করে তৈরি করে মা?

শ্যামা বলে—হাতল ঘোরায় দেখিস নি? বরফ বেটে চিনি মিশিয়ে ওর ওই

যন্ত্রটার মধ্যে রেখে হাতল ঘোরায়, তাইতে কুলপি-বরফ হয়।

—চিনি তো সাদা, রঙ কি করে হয়?

—একটু রঙ মিশিয়ে দেয়।

—কি রঙ দেয় মা? আলতার রঙ?

—দূর! আলতার রঙ বুঝি খেতে আছে? অন্য রঙ দেয়।

—কি রঙ?

—গোলাপ ফুলের রঙ বার করে নেয়।

—গোলাপ ফুলের রঙ কি করে বার করে মা?

—শিউলী বোঁটার রঙ কি করে বার করে দেখিস নি?

—সেদ্ধ করে, না?

—হ্যাঁ।

—তুমি আলতা পর কেন মা?

—পরতে হয় রে, নইলে লোকে নিন্দে করে যে।

—কেন?

এ কেন-র অন্ত থাকে না।···

বিধানের প্রকৃতির আর একটা অদ্ভুত দিক আছে, পশুপাখির প্রতি তার মমতা ও নির্মমতার সমন্বয়। কুকুর বিড়াল আর পাখির ছানা পুষিতে সে যেমন ভালবাসে, এক-এক সময় পোষা জীবগুলিকে সে তেমনি অকথ্য যন্ত্রণা দেয়। একবার সন্ধ্যার সময় ঝড় উঠিলে একটি বাচ্চা শালিখ পাখি বাড়ির বারান্দায় আসিয়া পড়িয়াছিল, বিধান ছানাটিকে কুড়াইয়া আনিয়াছিল, আঁচল দিয়া পালক মুছিয়া লণ্ঠনের তাপে সেঁক দিয়া তাহাকে বাঁচাইয়াছিল শ্যামা। পরদিন খাঁচা আসিল। বিধান নাওয়া খাওয়া ভুলিয়া গেল। ক্ষুদ্র বন্দী জীবটি যেন তাহারই সম্মানীয় অতিথি। হরদম ছাতু ও জল সরবরাহ করা হইতেছে, বিধানের দিন কাটিতেছে খাঁচার সামনে। কি তাহার গভীর মনোযোগ, কি ভালবাসা। অথচ কয়েকদিন পরে, এক দুপুরবেলা পাখিটিকে সে ঘাড় মটকাইয়া মারিয়া রাখিল। শ্যামা আসিয়া দেখে, মরা পাখির ছানাটিকে আগলাইয়া বিধান যেন পুত্রশোকেই আকুল হইয়া কাঁদিতেছে।

—ও খোকা, কি করে মরল বাবা, কে মারলে?

বিধান কথা বলে না, শুধু কাঁদে।

সত্যভামা আজও এ বাড়িতে কাজ করে, সে উঠানে বাসন মাজিতেছিল, বলিল—নিজে গলা টিপে মেরে ফেললে মা, এমন দুরন্ত ছেলে জন্মে দেখে নি,—সুন্দোর ছ্যানাটি গো!

—তুই মেরেছিস? কেন মেরেছিস খোকা?—শ্যামা বারবার জিজ্ঞাসা করিল, বিধান কথা বলিল না, আরও বেশি করিয়া কাঁদিতে লাগিল। শেষে শ্যামা রাগিয়া বলিল—কাঁদিস নে মুখপোড়া ছেলে, নিজে মেরে আবার কান্না কিসের?

মরা পাখিটাকে সে প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল।

রাত্রে শ্যামা শীতলকে ব্যাপারটা বলিল। বলিল, এসব দেখিয়া শুনিয়া তাহার বড় ভাবনা হয়। কেমন যেন মন ছেলেটার, এত মায়া ছিল পাখির বাচ্চাটার উপর! ছেলের এই দুর্বোধ্য কীর্তি লইয়া খানিকক্ষণ আলোচনা করিয়া তাহারা দুজনেই ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, বিধান তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। এরকম রহস্যময় প্রকৃতি ছেলেটা পাইল কোথা হইতে? ওর দেহ-মন তাদের দুজনের দেওয়া, তাদের চোখের সামনে হাসিয়া কাঁদিয়া খেলা করিয়া ও বড় হইয়াছে, ওর মধ্যে এই দুর্বোধ্যতা কোথা হইতে আসিল?

শ্যামা বলে—তোমায় এ্যাদ্দিন বলি নি, মাঝে মাঝে গম্ভীর হয়ে ও কি যেন ভাবে, ডেকে সাড়া পাই নে।

শীতল গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বলে—সাধারণ ছেলের মত হয় নি।

শ্যামা সায় দেয়—কত বাড়ির কত ছেলে তো দেখি, আপন মনে খেলাধূলো করে, খায় দায় ঘুমোয়, এ যে কি ছেলে হয়েছে, কারো সঙ্গে মিল নেই। কী বুদ্ধি দেখেছ?

শীতল বলে—কাল কি হয়েছে জান, জিজ্ঞেস করেছিলাম, দশ টাকা মণ হলে আড়াই সেরের দাম কত, সঙ্গে সঙ্গে বললে দশ আনা। কতদিন আগে বলে দিয়েছিলাম, যত টাকা মণ আড়াই সের তত আনা, ঠিক মনে রেখেছে।

বাড়িতে একটা পোষা বিড়াল ছিল, রানী। একদিন দুপুরবেলা গলায় দড়ি বাঁধিয়া জানালার শিকের সঙ্গে ঝুলাইয়া দিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বিধান তাহার মৃত্যুযন্ত্রণা দেখিতেছিল। দেখিয়া শ্যামা সেদিন ভয়ানক রাগিয়া গেল। রানীকে ছাড়িয়া দিয়া ছেলেকে সে বেদম মার মারিল। বিধানের স্বভাব কিন্তু বদলাইল

না। পিঁপড়ে দেখিলে সে টিপিয়া মারে, ফড়িঙ ধরিয়া পাখা ছিঁড়িয়া দেয়, বিড়ালছানা কুকুরছানা পুষিয়া হঠাৎ একদিন যন্ত্রণা দিয়া মারিয়া ফেলে। বারো তেরো বছর বয়স হওয়ার আগে তাহার এ স্বভাব শোধরায় নাই।

এখন শীতলের আয় কিছু বাড়িয়াছে। পিতার আমল হইতে তাহাদের নিজেদের প্রেস ছিল, প্রেসের কাজ সে ভাল বোঝে, তার তত্ত্বাবধানে কমল প্রেসের অনেক উন্নতি হইয়াছে। প্রেসের সমস্ত ভার এখন তাহার, মাহিনার উপর সে লাভের কমিশন পায়, উপরি আয়ও কিছু কিছু হয়। সেটা এই রকম : ব্যবসায়ে অনেক কিছুই চলে, অনেক কোম্পানীর যে কর্মচারীর উপর ছাপার কাজের ভার থাকে, ফর্মা পিছু আট টাকা দিয়া সে প্রেসের দশ টাকার বিল দাবী করে, এরকম বিল দিতে হয়, প্রেসের মালিক কমল ঘোষ তাহা জানে। তাই খাতাপত্রে দশ টাকা পাওনা লেখা থাকিলেও আট অথবা দশ, কত টাকা ঘরে আসিয়াছে, সব সময় জানিবার উপায় থাকে না। জানে শুধু সে, প্রেসের ভার থাকে যাহার উপর। শীতল অনায়াসে অনেক দশ টাকা পাওনাকে আট টাকায় দাঁড় করাইয়া দেয়। প্রেসের মালিক কমল ঘোষ হয়তো মাঝে মাঝে সন্দেহ করে, কিন্তু প্রেসের ক্রমোন্নতি দেখিয়া কিছু বলে না।

শীতলের খুব পরিবর্তন হইয়াছে। কমল প্রেসে চাকরি পাওয়ার আগে সে দেড় বছর বেকার বসিয়াছিল, যেমন হয়, এই দুঃখের সময় সুসময়ের বন্ধুদের চিনিতে তাহার বাকি থাকে নাই, এবার তাদের সে আর আমল দেয় না, সোজাসুজি ওদের ত্যাগ করিবার সাহস তো তার নাই, এখন সে ওদের কাছে দারিদ্রের ভান করে, দেড় বছর গরীব হইয়া থাকিবার পর এটা সে সহজেই করিতে পারে। তার মধ্যে ভারি একটা অস্থিরতা আসিয়াছে, কিছুদিন খুব স্ফূর্তি করিয়া কাটানোর পর শ্রান্ত মানুষের যে রকম আসে, কিছু ভাল লাগে না, কি করিবে ঠিক পায় না। শ্যামার সঙ্গে গোড়া হইতে মনের মিল করিয়া রাখিলে এখন সে বাড়িতেই একটি সুখ-দুঃখের সঙ্গী পাইত, আর তাহা হইবার উপায় নাই—সাংসারিক ব্যাপারে ও ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে শ্যামার সঙ্গে তাহার কতগুলি মত ও অনুভূতি খাপ খায় মাত্র, শ্যামার কাছে বেশী আর কিছু আশা করা যায় না। অথচ এদিকে বাহিরে মদ খাইয়া একা একা স্ফূর্তিও জমে না, সব কি রকম নিরানন্দ অসার মনে হয়। অনেক প্রত্যাশা করিয়া হয়তো সে তাহার পরিচিত কোনো মেয়ের বাড়ি যায়, কিন্তু নিজের মনে

আনন্দ না থাকিলে পরে কেন আনন্দ দিতে পারিবে, তাও টাকার বিনিময়ে? আজকাল হাজার মদ গিলিয়াও নেশা পর্যন্ত যেন জমিতে চায় না, কেবল কান্না আসে। কত কি দুঃখ উথলিয়া উঠে।

এক-একদিন সে করে কি, সকাল সকাল প্রেস হইতে বাড়ি ফেরে। শ্যামার রান্নার সময় সে ছেলেমেয়েদের সামলায়, বারান্দায় পায়চারি করিয়া ছোট খোকা-মণিকে ঘুম পাড়ায়, মুখের কাছে বাটি ধরিয়া বুকুকে খাওয়ায় দুধ। বুকুকে কোলে করিয়া ঘুম পাড়াইতে হয় না, সে বিছানায় শুইয়াই ঘুমায়, ঘুমাইয়া পড়িবার আগে একজনকে শুধু তাহার পিঠে আস্তে আস্তে চুলকাইয়া দিতে হয়। তারপর বাকি থাকে বিধান, সে খানিকক্ষণ পড়ে, তারপর তাহাকে গল্প বলিয়া রান্না শেষ হওয়া পর্যন্ত জাগাইয়া রাখিতে হয়। এসব শীতল অনেকটা নিখুঁতভাবেই করে। সকলের খাওয়া শেষ হইলে গর্বিত গাম্ভীর্যের সঙ্গে তামাক টানিতে টানিতে শ্যামার কি বলিবার আছে, শুনিবার প্রতীক্ষা করে। শ্যামার কাছে সে কিছু প্রশংসার আশা করে বৈকি! শ্যামা কিন্তু কিছু বলে না। তাহার ভাব দেখিয়া মনে হয়, সে রান্না করিয়াছে, শীতল ছেলে রাখিয়াছে, কোনো পক্ষেরই এতে কিছু বাহাদুরি নাই।

শেষে শীতল বলে—কি দুষ্টুই যে ওরা হয়েছে শ্যামা, সামলাতে হয়রান হয়ে গেছি, ওদের নিয়ে তুমি রান্না কর কি করে?

শ্যামা বলে—মণিকে ঘুম পাড়িয়ে নি, বুকুকে খোকা রাখে।

এত সহজ? শীতল বড় দমিয়া যায়, সন্ধ্যা হইতে ওদের সামলাইতে সে হিমসিম খাইয়া গেল, শ্যামা এমন অবলীলাক্রমে তাহাদের ব্যবস্থা করে?

শ্যামা হাই তুলিয়া বলে—এক একদিন কিন্তু ভারি মুস্কিলে পড়ি বাবু, মণি ঘুমোয় না, বুকুটা ঘ্যান ঘ্যান করে সবাই মিলে আমাকে ওরা খেয়ে ফেলতে চায়,—মরেও তেমনি মার খেয়ে। তুমি বাড়ি থাকলে বাঁচি, ফিরো দিকি একটু সকাল সকাল রোজ?

শ্যামা আঁচল বিছাইয়া শ্রান্ত দেহ মেঝেতে এলাইয়া দেয়, বলে—তুমি থাকলে ওদেরও ভাল লাগে, সন্ধ্যাবেলা তোমায় দেখতে না পেলে বুকু তো আগে কেঁদেই অস্থির হত।

শীতল আগ্রহ গোপন করিয়া জিজ্ঞাসা করে,—আজকাল কাঁদে না?

—আজকাল ভুলে গেছে। হ্যাঁগো, মুদী দোকানে টাকা দাও নি?

—দিয়েছি।

—মুদী আজ সত্যভামাকে তাগিদ দিয়েছে। তামাক পুড়ে গেছে, এবার রাখো, দেব আরেক ছিলিম সেজে?

শীতল বলে—না থাক।

—আবোল তাবোল খরচ করে কেন যে টাকাগুলো নষ্ট কর, দোতলায় একখানা ঘর তুলতে পারলে একটা কাজের মত কাজ হত, টাকা উড়িয়ে লাভ কি?

তারপর তাহারা ঘরে যায়, মণি আর বুকুর মাঝখানে শ্যামা শুইয়া পড়ে। বিধান একটা স্বতন্ত্র ছোট চৌকিতে শোয়, শোয়ার আগে একটি বিড়ি খাইবার জন্য শীতল সে চৌকিতে বসিবামাত্র বিধান চীৎকার করিয়া জাগিয়া যায়। শীতল তাড়াতাড়ি বলে, আমি রে খোকা, আমি, ভয় কি?—বিধান কিন্তু শীতলকে চায় না, সে কাঁদিতে থাকে।

শ্যামা বলে—আয় খোকা, আমার কাছে আয়।

সে রাত্রে ব্যবস্থা উল্টাইয়া যায়। শীতলের বিছানায় শোয় বিধান, বিধানের ছোট্ট চৌকিটিতে শীতল পা মেলিতে পারে না। একটা অদ্ভুত ঈর্ষার জ্বালা বোধ করিতে করিতে সে মা ও ছেলের আলাপ শোনে।

—স্বপন দেখেছিলি, না রে খোকা? কিসের স্বপন রে?

—ভুলে গেছি মা।

খুকীর গায়ে তুমি যেন পা তুলে দিও না বাবা।

—কি করে দেব? পাশ বালিশ আছে যে?

—তুই যে পাশ বালিশ ডিঙ্গিয়ে আসিস। বালিশের তলে কি হাতড়াচ্ছিস?

—টর্চটা একটু দাও না মা।

—কি করবি টর্চ দিয়ে রাত দুপুরে? এমনি জ্বেলে খরচ করে ফ্যালো, শেষে দরকারের সময় মরব এখন অন্ধকারে।

একটু পরেই ঘরে টর্চের আলো বারকয়েক জ্বলিয়া নিবিয়া যায়। দেয়ালের গায়ে টিকটিকির ডাক শুনিয়া বিধান তাকে খুঁজিয়া বাহির করে।

—নে হয়েছে, দে এবার।

—জল খাব মা।

জল খাইয়া বিধান মত বদলায়।

—আমি এখানে শোব না মা, যা গন্ধ!

শ্যামা হাসে—তোর বিছানায় বুঝি গন্ধ নেই খোকা? ভারি সাধু হয়েছিস, না?

বড়দিনের সময় রাখালের সঙ্গে মন্দা কলিকাতায় বেড়াইতে আসিল, পর পর তাহার দুটি মেয়ে হইয়াছে, মেয়ে দুইটিকে সে সঙ্গে আনিল, ছেলেরা রহিল বনগাঁয়ে। মন্দার বড় মেয়েটি একটি খোঁড়া পা লইয়া জন্মিয়াছিল, এখন প্রায় চার বছর বয়স হইয়াছে, কথা বলিতে শেখে নাই, মুখ দিয়া সর্বদা লালা পড়ে। মেয়েটাকে দেখিয়া শ্যামা বড় মমতা বোধ করিল। কত কষ্টই পাইবে জীবনে। এখন অবশ্য মমতা করিয়া সকলেই আহা বলিবে, বড় হইয়া ও যখন সকলের গলগ্রহ হইয়া উঠিবে, ফেলাও চলিবে না, রাখিতেও গা জ্বালা করিবে, লাঞ্ছনা শুরু হইবে তখন। মন্দা মেয়ের নাম রাখিয়াছে শোভা। শুনিলে মনটা কেমন করিয়া ওঠে। এমন মেয়ের ও-রকম নাম রাখা কেন?

মন্দা বলিল—ওকে ডাকি বাদু বলে।

শ্যামা ভাবিয়াছিল, সতীন আসিবার পর মন্দার জীবনের সুখ শান্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু মন্দাকে এতটুকু অসুখী মনে হইল না। সে খুব মোটা হইয়াছে, স্থানে অস্থানে মাংস থলথল করে, চলাফেরা কথাবার্তায় কেমন থিয়েটারি ধরনের গিন্নি-গিন্নি ভাব। স্বভাবে আর তাহার তেমন ঝাঁঝ নাই, সে বেশ অমায়িক ও মিশুক হইয়া উঠিয়াছে। আর বছর মন্দার শাশুড়ী মরিয়াছে, গৃহিণীর পদটা বোধ হয় পাইয়াছে সে-ই, শাশুড়ীর অভাবে ননদদের সে হয়তো আর গ্রাহ্য করে না। রাখালের উপর তাহার অসীম প্রতিপত্তি দেখা গেল। কথা তো বলে না, যেন হুকুম দেয়, আর যা সে বলে, তা-ই রাখাল শোনে।

—সতীন? হ্যাঁ, সে এখানেই থাকে বৌ, বড্ড গরীবের মেয়ে, বাপের নেই চালচুলো, এখনে না থেকে আর কোথায় যাবে বল, যাবার জায়গা থাকলে তো যাবে,—বাপ-ব্যাটা ডেকেও জিজ্ঞেস করে না। চামারের হদ্দ সে মানুষটা, ওই করে তো মেয়ে গছালে, ছল করে বাড়ি ডেকে নিয়ে যেত, আজ নেমন্তন্ন, কাল মেয়ের অসুখ,—মন্দা হাসিল, পাড়ার মেয়ে ভাই, ছুঁড়িকে এইটুকু দেখেছি, হ্যাংলার মত ঠিক খাবার সময়টিতে লোকের বাড়ি গিয়ে হাজির হত,—কে জানত বাবা, ও শেষে বড় হয়ে আমারি ঘাড় ভাঙবে!

মন্দার মেয়ে দুটিকে শ্যামা খুব আদর করিল, আর শ্যামার ছেলেকে আদর করিল মন্দা; রেষারেষি করিয়া পরস্পরের সন্তানদের তাহারা আদর করিল। মন্দার মেয়েদের জন্য শ্যামা আনাইল খেলনা, শ্যামার ছেলেদের মন্দা জামা কিনিয়া দিল। একদিন তাহারা দেখিতে গেল থিয়েটার, টিকিটের দাম দিল মন্দা, গাড়িভাড়া ও পান-লেমনেডের খরচ দিল শ্যামা। দুজনের এবার মনের মিলের অন্ত রহিল না, হাসিগল্পে আমোদ-আহ্লাদে দশ-বারোটা দিন কোথা দিয়া কাটিয়া গেল। মন্দা আসলে লোক মন্দ নয়, শাশুড়ীর অতিরিক্ত শাসনে মেজাজটা আগে কেবল তাহার বিগড়াইয়া থাকিত। শ্যামা জীবনে কারো সঙ্গে এ রকম আত্মীয়তা করার সুযোগ পায় নাই, মন্দার যাওয়ার দিন সে কাঁদিয়া ফেলিল, সারাদিন বাদুকে কোল হইতে নামাইল না, বাদুর লালায় তাহার গা ভিজিয়া গেল। মন্দাও গাড়িতে উঠিল চোখ মুছিতে মুছিতে।

শুধু রাখালকে এবার শ্যামার ভাল লাগিল না। জেলে না গিয়াও পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার সময় মানুষের কয়েদীর মত স্বভাব হয়, সব সময় একটা গোপন করা ছোটলোকামির আভাস পাওয়া যাইতে থাকে। রাখালেরও যেন তেমনি বিকার আসিয়াছে। যে কয়দিন এখানে ছিল সে, যেন কেমন ভয়ে ভয়ে থাকিত, কেমন একটা অপরাধীর ভাব, লোকে যেন তাহার সম্বন্ধে কি জানিয়া ফেলিয়া মনে মনে তাহাকে অশ্রদ্ধা করিতেছে। সে যেন তাই জ্বালা বোধ করিত, প্রতিবাদ করিতে চাহিত, অথচ সব তাহার নিজেরই কল্পনা বলিয়া চোরের মত, যে চোরকে কেহ চোর বলিয়া জানে না, সব সময় অত্যন্ত হীন একটা লজ্জাবোধ করিয়া সঙ্কুচিত হইয়া থাকিত।

পরের মাসে শীতল মাহিনা ও কমিশনের টাকা আনিয়া দিল অর্ধেক, প্রথমে সে কিছু স্বীকার করিতে চাহিল না, তারপর কারণটা খুলিয়া বলিল। কমল ঘোষের কাছে শীতল সাতশো টাকা ধার করিয়াছে, সুদ দিতে হইবে না, কিন্তু ছমাসের মধ্যে টাকাটা শোধ করিতে হইবে। সাতশো টাকা! এত টাকা শীতল ধার করিতে গেল কেন?

—রাখালকে দিয়েছি।

—ঠাকুরজামাইকে ধার করে সাতশো টাকা দিয়েছ? তোমার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে কিনা বুঝি নে বাবু, কেন দিলে?

শীতল ভয়ে ভয়ে বলিল—ছ-সাত মাস রাখালের চাকরি ছিল না শ্যামা, আশ্বিন মাসে বোনের বিয়েতে বড্ড দেনায় জড়িয়ে পড়েছে, হাত ধরে এমন করে টাকাটা চাইলে—

শ্যামার মাথা ঘুরিতেছিল! সাতশো টাকা! রাখাল যে এবার চোরের মতো বাস করিয়া গিয়াছে তাহার কারণ তবে এই? সে সত্যই তাহাদের টাকা চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে? টাকা সম্বন্ধে শীতলের দুর্বলতা রাখালের অজানা নয়, এবার সে তাহা কাজে লাগাইয়াছে। মন্দাকেও শ্যামা এবার চিনিতে পারে, অত যে মেলামেশা আমোদ-আহ্লাদ সব তাহার ছল। ওদিকে রাখাল যখন শীতলকে টাকার জন্য ভজাইতেছিল, মন্দা এদিকে তাহাকে নানা কৌশলে ভুলাইয়া রাখিয়াছিল সে যাহাতে টের পাইয়া বারণ করিতে না পারে। এতো জানা কথা যে শীতল আর সে শীতল নাই, সে বারণ করিলে টাকা শীতল কখনো রাখালকে দিত না।

রাগে দুঃখে সারাদিন শ্যামা ছটফট করিল। যতবার রাখাল ও মন্দার হীন ষড়যন্ত্রের কথা আর টাকার অঙ্কটা সে মনে করিল গা যেন তাহার জ্বলিয়া যাইতে লাগিল।

কত কষ্টের টাকা তাহার, শীতল তো পাগল, কবে তাহার কমল প্রেসের চাকরি ঘুচিয়া যায় ঠিক নাই, দুটো টাকা জমানো না থাকিলে ছেলেদের লইয়া তখন সে করিবে কি? শীতলকে সে অনেক জেরা করিল,—কবে টাকা দিয়াছে? রাখাল কবে টাকা ফেরত দেবে বলেছে? টাকার পরিমাণটা সত্যই সাতশো, না আরও বেশি?—এমনি সব অসংখ্য প্রশ্ন। শীতলও এখন অনুতাপ করিতেছিল, প্রত্যেকবার জেরা শেষ করিয়া শ্যামা যখন তাহাকে রাগের মাথায় যা মুখে আসিল বলিয়া গেল, সে কথাটি বলিল না।

শুধু যে কথা বলিল না তা নয়, তাহার বর্তমান বিষণ্ণ মানসিক অবস্থায় এ ব্যাপারটা এমন গুরুতর আকার ধারণ করিল যে সে আরও মনমরা হইয়া গেল এবং কয়েকদিন পরেই শ্যামাকে শোনাইয়া আবোল-তাবোল কি যে সব কৈফিয়ত দিতে লাগিল শ্যামা কিছুই বুঝিল না। শীতল ফাজলামি আরম্ভ করিয়াছে ভাবিয়া সে রাগিয়া গেল। শীতল অনুতপ্ত, বিষণ্ণ ও নম্র হইয়া না থাকিলে এতটা বাড়াবাড়ি করিবার সাহস হয়তো শ্যামার হইত না, এবার শীতলও রাগিয়া উঠিল। অনেকদিন পরে শ্যামাকে একটা চড় বসাইয়া দিল। তারপর সে-ই যেন মার

খাইয়াছে এমনি মুখ করিয়া শ্যামার আশেপাশে ঘণ্টাখানেক ঘোরাঘুরি করিয়া বাহির হইয়া গেল। বাড়ি ফিরিল একদিন পরে।

এত কাল পরে আবার মার খাইয়া শ্যামাও নম্র হইয়া গিয়াছিল, শীতল বাড়ি ফিরিলে সে যেভাবে সবিনয় আনুগত্য জানাইল, প্রহৃতা স্ত্রীরাই শুধু তাহা জানে এবং পারে। তবু অশান্তির অন্ত হইল না। পরস্পরকে ভয় করিয়া চলার জন্য দারুণ অস্বস্তির মধ্যে দিন কাটিতে লাগিল।

শ্যামা বলে, বেশ ভদ্রতা করিয়াই বলে—তুমি এমন মন খারাপ করে আছ কেন?

শীতলও ভদ্রতা করিয়া বলে—টাকাটা যদ্দিন না শোধ হচ্ছে শ্যামা—

হঠাৎ মাসিক উপার্জন একেবারে অর্ধেক হইয়া গেলে চারিদিকে তাহার যে ফলাফল ফুটিয়া ওঠে, চোখ বুজিয়া থাকিলেও খেয়াল না করিয়া চলে না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যেন একটা শত্রুতার সৃষ্টি হইতে থাকে।

শেষে শ্যামা একদিন বুক বাঁধিয়া টাকা তুলিবার ফর্মে নাম সই করিয়া তাহার সেভিংস ব্যাঙ্কের খাতাখানা শীতলের হাতে দিল। খাতায় শুধু জমার অঙ্কপাত করা আছে, সত্যভামাকে দিয়া পাঁচটি সাতটি করিয়া টাকা জমা দিয়া শ্যামা শ-পাঁচেক টাকা করিয়াছে, একটি টাকা কোনাদিন তোলে নাই।

—টাকাটা তুলে কমলবাবুকে দাও গে ধারটা শোধ হয়ে যাক, টাকা থাকতে মনের শান্তি নষ্ট করে কি হবে? আস্তে আস্তে আবার জমবে-খন।

খাতাখানা লইয়া শীতল সেই যে গেল সাতদিনের মধ্যে আর সে বাড়ি ফিরিল না। শ্যামা যে বুঝিতে পারিল না তা নয়, তবু একি বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় যে তার অত কষ্টের জমানো টাকাগুলি লইয়া শীতল উধাও হইয়া গিয়াছে? একদিন বিষ্ণুপ্রিয়ার বাড়ি গিয়া শ্যামা কমল প্রেসে লোক পাঠানোর ব্যবস্থা করিয়া আসিল। সে আসিয়া খবর দিল প্রেসে শীতল যায় নাই। শীতল গাড়ি চাপা পড়িয়াছে অথবা তাহার কোনো বিপদ হইয়াছে শ্যামা একবার তাহা ভাবে নাই, কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া শীতলকে ভালরকম চিনিত না বলিয়া হাসপাতালে, থানায় আর খবরের কাগজের আপিসে খোঁজ করাইল। গাড়ি-টাড়ি চাপা পড়িয়া থাকিলে শীতলের একটা সংবাদ অবশ্যই পাওয়া যাইত শ্যামাকে এই সান্ত্বনা দিতে আসিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া অবাক হইয়া বাড়ি গেল। শ্যামা যেভাবে তার কাছে স্বামীনিন্দা করিল, ছোটজাতের স্ত্রীলোকের মুখেও বিষ্ণুপ্রিয়া কোনোদিন সে-সব কথা শোনে নাই।

বিধান জিজ্ঞাসা করে—বাবা কোথায় গেছে মা ?

শ্যামা বলে—চুলোয়।

শ্যামা রাঁধে বাড়ে, ছেলেমেয়েদের খাওয়ায়, নিজে খায়, কিন্তু বাঘিনীর মত সব সময় সে যেন কাহাকে খুন করিবার জন্য উদ্যত হইয়া থাকে। জ্বালা তাহার কে বুঝিবে ? তিনটি সন্তানের জননী, স্বামীর উপর তাহার নির্ভর অনিশ্চিত। একজন পরম বন্ধু তাহার ছিল,—রাখাল। সে তাহাকে ঠকাইয়া গিয়াছে, স্বামী আজ তাহার সঞ্চয় লইয়া পলাতক। বোকার মত কেন যে সে সেভিংস ব্যাঙ্কের খাতাখানা শীতলকে দিতে গিয়াছিল। রাত্রে শ্যামার ঘুম হয় না। শীতের রাত্রি, ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দিতে হয়, শ্যামা একটা লণ্ঠন কমাইয়া রাখে, ঘরের বাতাস দূষিত হইয়া ওঠে। শ্যামা বারবার মশারি ঝাড়ে, বিধানের গায়ে লেপ তুলিয়া দেয়, বুকুর কাঁথা বদলায়, মণিকে তুলিয়া ঘরের জল বাহির হওয়ার নালিটার কাছে বসায়, আরও কত কি করে। চোখে তাহার জলও আসে।

এমনি সাতটা রাত্রি কাটাইবার পর অষ্টম রাত্রে পাগলের মত চেহারা লইয়া শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে শীতল ফিরিয়া আসিল। শ্যামা জিজ্ঞাসা করিল—খেয়ে এসেছো ?

শীতল বলিল—না।

সেই রাত্রে শ্যামা কাঠের উনানে ভাত চাপাইয়া দিল। রান্না শেষ হইতে রাত্রি তিনটা বাজিয়া গেল। শীতল ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, ডাকিয়া তুলিয়া তাহাকে খাইতে বসাইয়া শ্যামা ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। কাছে বসিয়া শীতলকে খাওয়ানোর প্রবৃত্তি হইল না বলিয়া শুধু নয়, ঘুমে তাহার শরীর অবশ হইয়া আসিতেছিল।

পরদিন শীতল শ্যামাকে একশত টাকা ফেরত দিল।

—আর কই ? বাকি টাকা কি করেছ ?

—আর তুলি নি তো ?

—তোলো নি ? খাতা কই আমার ?

—খাতাটা হারিয়ে গেছে শ্যামা, কোনখানে যে ফেললাম—

শ্যামা কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিল—সব টাকা নষ্ট করে এসে আবার তুমি মিছে কথা বলছ, আমি পাঁচশো টাকা সই করে দিলাম একশো টাকা তুমি কি করে তুললে,

মিছে কথাগুলো একটু আটকালো না তোমার মুখে,—দোতলায় ঘর তুলব বলে আমি যে টাকা জমাচ্ছিলাম গো!

শীতল আস্তে আস্তে সরিয়া গেল।

এবছর প্রথম স্কুল খুলিলেই বিধানকে শ্যামা স্কুলে ভর্তি করিয়া দিবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু এইসব টাকার গোলমালে ফাল্গুন মাস আসিয়া পড়িল বিধানকে স্কুলে দেওয়া হইল না। শহরতলীর এখানে কাছাকাছি স্কুল নাই, আনন্দমোহিনী মেমোরিয়াল হাইস্কুল কাশীপুরে, প্রায় একমাইল তফাতে। এতখানি পথ হাঁটিয়া বিধান প্রত্যহ স্কুল করিবে, শ্যামার তাহা পছন্দ হইতেছিল না। কলিকাতার স্কুলে ভর্তি করিলে বিধানকে ট্রামে-বাসে যাইতে হইবে, শ্যামার সে সাহস নাই। প্রেসে যাওয়ার সময় শীতল যে বিধানকে স্কুলে পৌঁছাইয়া দিবে তাহাও সম্ভব নয়, শীতল কোনোদিন প্রেসে যায় দশটায়, কোনোদিন একটায়। শ্যামা মহাসমস্যায় পড়িয়া গিয়াছিল। অথচ ছেলেকে এবার স্কুলে না দিলেই নয়, বাড়িতে ওর পড়াশোনা হইতেছে না। শীতলকে বলিয়া লাভ হয় না, কথাগুলি সে গ্রাহ্য করে না। শ্যামা শেষে একদিন পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে গেল বিষ্ণুপ্রিয়ার বাড়ি।

বিষ্ণুপ্রিয়া বলিল—এক কাজ কর না? আমাদের শঙ্কর যেখানে পড়ে তোমার ছেলেকে সেইখানে ভর্তি করে দাও, শঙ্কর তো গাড়িতে যায়, তোমার ছেলেও ওর সঙ্গে যাবে। তবে ওখানে মাইনে বেশি, বড়লোকের ছেলেরাই বেশির ভাগ পড়ে ওখানে, আর,—ওখানে ভর্তি করলে ছেলেকে ভাল ভাল কাপড়-জামা কিনে দিতে হবে। একদিন যে একটু ময়লা জামা পরিয়ে ছেলেকে স্কুলে পাঠাবে তা পারবে না। হেডমাস্টার সাহেব কি না, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভালবাসে।

বিষ্ণুপ্রিয়া আজও শ্যামার উপকার করিতে ভালবাসে কিন্তু আসিলে বসিতে বলে না, কথা বলে অনুগ্রহ করার সুরে। বিষ্ণুপ্রিয়ার সেই মেয়েটির বয়স এখন প্রায় এগারো, বেণী দুলাইয়া সেও স্কুলে যায়, দেখিয়া এখন আর বুঝিবার উপায় নাই কদর্য পাপের ছাপ লইয়া সে জন্মাইয়াছিল, শুধু মনে হয় মেয়েটা বড় রোগা। বিষ্ণুপ্রিয়ার আর একটি মেয়ে হইয়াছে, বছর তিনেক বয়স। বিষ্ণুপ্রিয়া এখন আবার সাজগোজ করে, তবে আগের মতো দেহের চাকচিক্য তাহার নাই, এখন চকচক করে শুধু গহনা,—অনেকগুলি।

ভাবিয়া চিন্তিয়া শ্যামা বিধানকে শঙ্করের স্কুলেই ভর্তি করিয়া দিল। শঙ্কর

বিষ্ণুপ্রিয়ার খুড়তোতো বোনের ছেলে, এবার সেকেণ্ড ক্লাশে উঠিয়াছে। বয়সের আন্দাজে ছেলেটা বাড়ে নাই, বিধানের চেয়ে মাথায় সে সামান্য একটু উঁচু, ভারি মুখচোরা লাজুক ছেলে, গায়ের রঙটি টুকটুকে। যত ছোট দেখাক সে সেকেণ্ড ক্লাশে পড়ে, স্কুলের অভিজ্ঞতাও তাহার আছে, বিধানকে শ্যামা তাহার জিম্মা করিয়া দিল, চিবুক ধরিয়া চুমা খাইয়া ছেলেকে দেখাশুনা করার জন্য শ্যামা তাহাকে এমন করিয়াই বলিল যে লজ্জায় শঙ্করের মুখ রাঙা হইয়া গেল।

সারাদিন শ্যামা অন্যমনস্ক হইয়া রহিল। ভাবিবার চেষ্টা করিল, বিধান স্কুলে কি করিতেছে। শ্যামার একটা ভয় ছিল স্কুলে বড়লোকের ছেলের সঙ্গে বিধান মানাইয়া চলিতে পারিবে কিনা। গরীবের ছেলে বলিয়া ওকে সকলে তুচ্ছ করিবে না তো? একটা ভরসার কথা, শঙ্করের সঙ্গে ওর ভাব হইয়াছে, শঙ্করের বন্ধু বলিয়া সকলে ওকে সমানভাবেই হয়তো গ্রহণ করিবে, হাসি তামাসা করিবে না। ফাল্গুনের দিনটি আজ শ্যামার বড় দীর্ঘ মনে হয়। একদিনের জন্য ছেলে তাহার বাড়ি ছাড়িয়া কোথাও গিয়া থাকে নাই, অপরিচিত স্থানে অচেনা ছেলেদের মধ্যে দশটা হইতে চারটে পর্যন্ত সে কি করিয়া কাটাইবে কে জানে!

বিকালে বিধান ফিরিয়া আসিলে শ্যামা তাহার মুখখানা ভারি শুকনো দেখিল। টিফিনের সময় খাবার কিনিয়া খাওয়ার জন্য শ্যামা তাহাকে চার আনা পয়সা দিয়াছিল, বিধান লজ্জায় কিছু খাইতে পারে নাই ভাবিয়া বলিল—ও খোকা, মুখ শুকিয়ে গেছে কেন রে? খাস নি কিছু কিনে টিফিনের সময়?

বিধান বলিল—খেয়েছি তো, পেট ব্যথা করছে মা।

শ্যামা বলিল—কেন খোকা, পেট ব্যথা করছে কেন বাবা? কি খেয়েছিলি কিনে?

পেটের ব্যথায় বিধান নানারকম মুখভঙ্গি করে। চোখে জল দেখা যায়।

শ্যামা ধমক দিয়া বলে—কি খেয়েছিলি বল।

—ফুলুরি।

—আর কি?

—আর ঝালবড়া।

—তাহলে হবে না তোমার পেট ব্যথা, মুখপোড়া ছেলে! ভাল খাবার থাকতে তুমি খেতে গেলে কিনা ফুলুরি আর ঝালবড়া! কেন খেতে গেলি—ওসব?

—শঙ্কর খাওয়ালে মা। শঙ্কর বলে, বাড়িতে ওসব তো খেতে দেয় না, শুধু দুধ আর সন্দেশ খেয়ে মর, তাই—

শঙ্কর ছেলেটা তো তবে কম দুষ্টু নয়? বাড়িতে যা নিষেধ করিয়া দেয়, চুরি করিয়া তাই করে? ওর সঙ্গে মেলামেশা করিয়া বিধানের স্বভাব খারাপ হইয়া যাইবে না তো? শ্যামার প্রথমে ভারি ভাবনা হয়, তারপর সে ভাবিয়া দেখে যে, লুকাইয়া ফুলুরি আর ঝালবড়া খাওয়াটা খুব বেশি খারাপ অপরাধ নয়, এরকম দুষ্টামি ছেলেরা করেই। তবু মনটা শ্যামার খুঁত খুঁত করে। ছেলেকে সে নানারকম উপদেশ দেয়, অসংখ্য নিষেধ জানায়। কাজ করিতে করিতে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে ছেলেকে কাছে ডাকিয়া বলে, এ যেন তুমি কখনো কোরো না বাবা, কখখনো নয়।

—কেন মা?—বিধান বলে। প্রত্যেকবার।

একদিন মন্দার একখানা পত্র আসিল, খুব দরদ দিয়া অনেক মিষ্টি মিষ্টি কথা দিয়া লিখিয়াছে। চিঠি পড়িয়া শ্যামা মুখ বাঁকাইয়া হাসিল, বলিল, বসে থাক তুমি জবাবের জন্যে হা-পিত্যেশ করে, তোমার চিঠির জবাব আমি দিচ্ছি নে। কদিন পরে শীতলের কাছে রাখালের একখানা পোস্টকার্ড আসিল, শ্যামা চিঠিখানা পুড়াইয়া ফেলিল, শীতলকে কিছু বলিল না। জবাব না পাইয়া একটু অপমান বোধ করুক লোকটা। ফাঁকি দিয়া টাকা বাগাইয়া লওয়ার জন্য শীতল তাহাকে এমন ঘৃণাই করিতেছে যে, চিঠির উত্তর দেয় না।

ফাল্গুন মাস কাবার হইয়া আসিল। শীত একেবারে কমিয়া গিয়াছে। একদিন রোদ খাওয়াইয়া লেপগুলি শ্যামা তুলিয়া রাখিল। শ্যামার শরীরটা আজকাল ভাল আছে, তিন ছেলের মার আবার শরীর—তবু, সানন্দে মনে আরেকটি সন্তানের সখ যেন উঁকি মারিয়া যায়, একা থাকিবার সময় অবাক হইয়া শ্যামা হাসে, কি কাণ্ড মেয়েমানুষের, মাগো!

বিধান দশটার সময় ভাত খাইয়া জুতা মোজা হাফপ্যান্ট আর সার্ট পরিয়া স্কুলে যায়, শ্যামা তাহার চুল আঁচড়াইয়া দেয়, আঁচল দিয়া মুখ মুছিয়া দেয়। প্রথম প্রথম ছেলের মুখে সে একটু পাউডার মাখাইয়াও দিত, বড়লোকের ছেলেদের মাঝখানে গিয়া বসিবে, একটু পাউডার না মাখিলে কি চলে? স্কুলে ছেলেরা ঠাট্টা করায় বিধান এখন আর পাউডার মাখাইতে দেয় না। বলে—তুমি কিচ্ছু জানো না মা, পাউডার

দেখলে ওরা সবাই হাসে, স্যার সুদ্ধ। কি বলে জান?—বলে চুন তো মেখেই এসেছিস, এবার একটু কালি মাখ বেশ মানাবে তোকে, মাইরি ভাই, মাইরি।

'মাইরি' বলে? বিধানের স্কুলে বড়লোকের সোনার চাঁদ অভিজাত ছেলেদের মুখে এই কথাটির উচ্চারণ শ্যামার বড় খাপছাড়া মনে হয়। এমনি কত কথা বিধান শিখিয়া আসে, মাইরির চেয়েও ঢের বেশি খারাপ কথা। অনেক বড় বড় শব্দও সে শিখিয়া আসে, আর সঙ্কেত, শ্যামা যার মানেও বুঝিতে পারে না। তাহার অজানা এক জগতের সঙ্গে বিধান পরিচিত হইতেছে, অল্প অল্প একটু যা আভাস পায়, তাতেই শ্যামা অবাক হইয়া থাকে। সে একটা বিচিত্র গর্ব ও দুঃখ বোধ করে। বাড়িতে এখন বিধানের জিজ্ঞাসা কমিয়া গিয়াছে, প্রশ্নে প্রশ্নে আর সে শ্যামাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে না। ছাদে উঠিয়া, খানিকদূরে বাঁধের উপর দিয়া যে রেলগাড়ি চলিয়া যায়, ছেলেকে তাহা দেখানোর সাধ শ্যামার কিন্তু কমে নাই, জ্ঞান ও বুদ্ধিতে ছেলে তাহাকে ছাড়াইয়া যাইতেছে বলিয়া গর্ব ও আনন্দের সঙ্গে শ্যামার দুঃখ এইটুকু।

বকুল আছে।

সে কিন্তু মেয়ে। ছেলের মত শ্যামার কাছে মেয়ের অত খাতির নাই। ছ বছরের মেয়ে, সে তো বুড়ি। শ্যামা তাহাকে দিয়া দুটি একটি সংসারের কাজ করায়, মণিকে খেলা দিতে বলে, সময় পাইলে প্রথম ভাগ খুলিয়া একটু একটু পড়ায়। মেয়েটা যেমন দুরন্ত হইয়াছে, সেরকম মাথা নাই, কিছু শিখিতে পারে না। তাহাকে অক্ষর চিনাইতেই শ্যামার একমাস সময় লাগিয়াছে, কতদিনে 'কর খল' শিখিবে, কে জানে। মাঝে মাঝে রাগ করিয়া শ্যামা মেয়ের পিঠে একটা চড় বসাইয়া দেয়। বিধানও মারে। 'প্রথম ভাগে'র পড়া যে শিখিতে পারে না, তার প্রতি বিধানের অবজ্ঞা অসীম। এক একদিন সকালবেলা হঠাৎ সে তাহার ক্লাশমাস্টার অমূল্যবাবুর মতো গম্ভীর মুখ করিয়া হুকুম দেয়—এই বুকু, নিয়ে আয় তো বই তোর,—

বুকু ভয়ে ভয়ে বই লইয়া আসে, তাহার ছেঁড়া ময়লা 'প্রথম ভাগ'খানি। ভয় পাইলে বোঝা যায়, কি বড় বড় আশ্চর্য দুটি চোখ বকুলের। পড়া ধরিয়া বোনের অজ্ঞতায় বিধান খানিকক্ষণ শ্যামার সঙ্গে হাসাহাসি করে, তারপর কখন যে সে অমূল্য-বাবুর মত ধাঁ করিয়া চাঁটি মারিয়া বসে, আগে কারো টের পাইবার জো থাকে না। শ্যামা শুধু বলে—আহা খোকা মারিস নে বাবা।

বকুল বড় অভিমানী মেয়ে, কারো সামনে সে কখনো কাঁদে না ; ছাদে চিলেকুঠির দেয়াল আর আলিসার মাঝখানে তাহার একটি হাতখানেক ফাঁক গোসাঘর আছে, সেইখানে নিজেকে গুঁজিয়া দিয়া সে কাঁদে। তারপর গোসাঘরখানাকে পুতুলের ঘর বানাইয়া সে খেলা করে। যে পুতুলটি তাহার ছেলের বৌ তার সঙ্গে বকুলের বড় ভাব, দুজনে যেন সই। তাকে শোনাইয়া সে সব মনের কথা বলে, বলে—বাবাকে সব বলে দেব, বাবা দাদাকে মারবে, মাকেও মারবে, মারবে না ভাই বৌমা? এঁ্যা করে জিব বের করে দাদা মরে যাবে—মা কেঁদে মরবে, হুঁ।

শীতলের কি হইয়াছে শ্যামা বুঝিতে পারে না, লোকটা কেমন যেন ভোঁতা হইয়া গিয়াছে, স্ফূর্তিও নাই। দুঃখও নাই। সময়মত ফিরিয়া আসে, কোনোদিন পাড়ার অখিল দত্তের বাড়ি দাবা খেলিতে যায়, কোনোদিন বাড়িতেই থাকে, বাড়িতে যতক্ষণ থাকে, রাগারাগিও করে না, দীনদুঃখীর মত মুখের ভাবও করিয়া রাখে না, স্ত্রী ও পুত্রকন্যার সঙ্গে তাহার কথা ও ব্যবহার সহজ ও স্বাভাবিক হয়, অথচ তার কাছে কারো যেন মূল্য নাই কিছুই সে গ্রাহ্য করে না। শ্যামার টাকা লইয়া পালানোর পর হইতে তাহার এই পাগলামি-না-করার পাগলামি আরম্ভ হইয়াছে। ধার করিয়া রাখালকে টাকা দেওয়ার অপরাধ, শ্যামার জমানো টাকাগুলি নষ্ট করার অপরাধ, তাহার কাছে অবশ্যই পুরানো হইয়া গিয়াছে, মনে আছে কিনা তাও সন্দেহ। মাস গেলে আগের টাকার অর্ধেক পরিমাণ টাকা আনিয়া সে শ্যামাকে দেয়, আগে হইলে এই লইয়া কত কাণ্ড করিত, হয় অনুতাপে সারা হইত, না হয় নিজে নিজে কলহ বাধাইয়া শ্যামাকে গাল দিয়া বলিত—যা সে আনিয়া দেয় তাই যেন শ্যামা সোনামুখ করিয়া গ্রহণ করে, ঘরে বসিয়া গেলা যাহার একমাত্র কর্ম, অত তাহার টাকার খাঁকতি কেন?—এখন টেরও পাওয়া যায় না কম টাকা আনিয়াছে—এটা সে খেয়াল করিয়াছে। শ্যামা যদি নিশ্বাস ফেলিয়া বলে, কি করে যে মাস চালাব,—সে অমনি অমায়িক ভাবে বলিয়া বসে ওতেই হবে গো, খুব চলে যাবে, বাড়ি ভাড়া দিতে হয় না, ইয়ে করতে হয় না, কি কর অত টাকা?

কমল ঘোষের টাকাটা মাসে মাসে কিছু কম করিয়া দিলে হয়তো চলে, শীতলকে এ কথা বলিতে শ্যামার বাধে। ঋণ যত শীঘ্র শোধ হইয়া যায় ততই ভাল। এদিকে খরচ চলিতে চাহে না। বিধানকে স্কুলে দেওয়ার পর খরচ বাড়িয়াছে, বই খাতা, স্কুলের মাহিনা, পোষাক, জলখাবারের পয়সা এ সব মিলিয়া অনেকগুলি টাকা বাহির

হইয়া যায়। যেমন তেমন করিয়া ছেলেকে শ্যামা স্কুলে পাঠাইতে পারে না, ছেলের পরিচ্ছদ ও পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে বিষ্ণুপ্রিয়া যে তাহাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিল, নিতান্ত অভাবের সময়েও শ্যামা তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারে না। খরচ সে কমাইয়াছে অন্য দিকে। সত্যভামার এতকালের চাকুরিটি গিয়াছে। নিজের জন্য সেমিজ ও কাপড় কেনা শ্যামা বন্ধ করিয়াছে, এ সব বেশি পরিমাণে তাহার কোনো দিনই ছিল না, চিরকাল জোড়াতালি দিয়া কাজ চালাইয়া আসিয়াছে, এখন বড় অসুবিধা হয়। স্বামী-পুত্র ছাড়া বাড়িতে কেহ থাকে না তাই রক্ষা, নতুবা লজ্জা বাঁচিত না। শীতল আর বিধান বাহিরে যায়, ওদের জামা-কাপড় ছাড়া শ্যামা আর কিছু ধোপাবাড়ি পাঠায় না, বাড়িতে কাচিয়া লয়। ছেলেমেয়েদের দুধ সে কমাইতে পারে নাই, কমাইয়াছে মাছের পরিমাণ। মাঝে মাঝে ফল ও মিষ্টি আনাইয়া সকলকে খাওয়ানোর সাধ সে ত্যাগ করিয়াছে। এই ত্যাগটাই সব চেয়ে কষ্টকর। শ্যামার ছেলেমেয়েরা ভাল জিনিস খাইতে বড় ভালবাসে।

তবু, এই সব অভাব অনটনের মধ্যেও শ্যামার দিনগুলি সুখে কাটিয়া যায়। ছেলে-মেয়েদের অসুখ বিসুখ নাই। শীতলের যাহাই হইয়া থাক, তাহাকে সামলাইয়া চলা সহজ। নিজের শরীরটাও শ্যামার এত ভাল আছে যে, একা সংসারের সমস্ত খাটুনি খাটিতে তাহার কিছুমাত্র কষ্ট হয় না, কাজ করিতে যেন ভালই লাগে।

চৈত্র শেষ হইয়া আসিল। ছাদে দাঁড়াইলে বসাকদের বাড়ির পাশ দিয়া রেলের উঁচু বাঁধটার ধারে প্রকাণ্ড শিমুল গাছটা হইতে তুলা উড়িয়া যাইতে দেখা যায়। পূবে খানিকটা ফাঁকা মাঠের পরে টিনের বেড়ার ওপাশে ধানকলের প্রকাণ্ড পাকা অঙ্গন, কুলিমেয়েরা প্রত্যহ ধান মেলিয়া শুকাইতে দেয়, ধান খাইতে ঝাঁক বাঁধিয়া পায়রা নামিয়া আসে। পায়রার ঝাঁকের ওড়া দেখিতে শ্যামা বড় ভালবাসে, অত-গুলি পাখি আকাশে বারবার দিক পরিবর্তন করে একসঙ্গে, সকাল ও বিকাল হইলে উড়িবার সময় একসঙ্গে সবগুলি পায়রার পাখার নিচে রোদ লাগিয়া ঝকঝক্ করিয়া উঠে, শ্যামা অবাক হইয়া ভাবে, কখন কোন দিক বাঁকিতে হইবে, সবগুলি পাখি একসঙ্গে টের পায় কি করিয়া? ধানকলের এক কোণায় ছোট একটি পুকুর, ইঞ্জিন-ঘরের ওদিকে আরও একটা বড় পুকুর আছে, বয়লারের ছাই ফেলিয়া ছোট পুকুরটির একটি তীরকে ওরা ধীরে ধীরে পুকুরের মধ্যে ঠেলিয়া আনিয়াছে। পুকুরটা বুজাইয়া ফেলিবে বোধ হয়। ছাই ফেলিবার সময় বাতাসে রাশি রাশি ছাই সাদা

মেঘের মত টিনের প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া, রেলের বাঁধ পার হইয়া কোথায় চলিয়া যায়। আজকাল এসব শ্যামা যেমন ভাবে চাহিয়া দেখে কতকাল তেমনি ভাবে সে তা দেখে নাই। বিকালে ছাদে গিয়ে সে মণিকে ছাড়িয়া দেয়, মণি বকুলের সঙ্গে ছাদময় ছুটাছুটি করে। আলিসায় ভর দিয়া শ্যামা কাছে ও দূরে যেখানে যা কিছু দেখিবার আছে, দেখিতে থাকে, বোধ করে কেমন একটা উদাস উদাস ভাব, একটা অজানা ঔৎসুক্য। পরপর অনেকগুলি গাড়ি রেল-লাইন দিয়া দুদিকে ছুটিয়া যায়, তিনটি সিগনেলের পাখা বারবার ওঠে নামে। ধানকলের অঙ্গনে কুলি মেয়েরা ছড়ানো ধান জড়ো করিয়া নৈবেদ্যের মত অনেকগুলি স্তূপ করে, তারপর হোগলার টুপি দিয়া ঢাকিয়া দেয়। ছোট পুকুরটিতে ধানকলের বাবু জাল ফেলান, মাছ বেশি পড়ে না, এতটুকু পুকুরে মাছ কোথায়?—জাল ফেলাই সার। শ্যামার হাসি পায়। তাহার মামাবাড়ির পুকুরে ও জাল ফেলিলে আর দেখিতে হইত না, মাছের লেজের ঝাপটায় জল থান থান হইয়া যাইত। পারিপার্শ্বিক জগতের দৃশ্য ও ঘটনা শ্যামা এমনিভাবে খুঁটিয়া খুঁটিয়া উপভোগ করে, বাড়ি-ঘর, ধানকল, রেল-লাইন, রাস্তার মানুষ, এসব আর কবে তাহার এত ভাল লাগিয়াছিল? অথচ মনে মনে অকারণ উদ্বেগ, দেহে যেন একটা শিথিল ভারবোধ,—হাইতোলা আলস্য। বিধান আজকাল বিকেলের দিকে শঙ্করদের বাড়ি খেলিতে যায়, ছেলেকে না দেখিয়া তার কি ভাবনা হইয়াছে?

শীতল বলে—বুড়ো বয়সে তোমার যে চেহারার খোলতাই হচ্ছে গো, বয়েস কমছে নাকি দিনকে দিন?

শ্যামা বলে—দূর দূর! কি সব বলে ছেলের সামনে!

শীতলের নজর পড়িয়াছে, শ্যামার ছেঁড়া কাপড় দেখিয়া তাহার চোখ টাটায়, শ্যামার জন্য সে রঙীন কাপড় কিনিয়া আনে। শ্যামা প্রথমে জিজ্ঞাসা করে—ক টাকা নিলে? টাকা পেলে কোথা?

—হুঁ, কটা টাকা আর পাই নে আমি, উপরি পেয়েছি কাল। একটি পয়সা তো দাও না, আমার খরচ চলে কিসে উপরি না পেলে?

খরচ চলে? শীতল তাহা হইলে আরও উপরি টাকা পায়, খুশিমত খরচ করে, তাহাকে যে টাকা আনিয়া দেয়, তা-ই সব নয়? শ্যামা রাগিয়া বলে—কি রকম উপরি পাও শুনি?

—দশ বিশ টাকা, আর কত?

—নিশ্চয় আরও বেশি, মিথ্যে বলছ বাবু তুমি, নিজে নিজে খরচ কর তো সব? আমার এদিকে খরচ চলে না, ছেঁড়া কাপড় পরে আমি দিন কাটাই।

—আরে মুস্কিল, তাই তো কাপড় কিনে আনলাম। আচ্ছা তো নেমকহারাম তুমি।

শ্যামা রঙীন কাপড়খানা নাড়াচাড়া করে, মিষ্টি করিয়া বলে, কি টানাটানি চলেছে বোঝ না তো কিছু, কি কষ্টে যে মাস চালাই ভাবনায় রাতে ঘুম হয় না—দু-চারটে টাকা যদি পাও, কেন নষ্ট কর? এনে দিলে সুসার হয়। তোমার খরচ কি? বাজে খরচ করে নষ্ট কর বইতো নয়, যা স্বভাব তোমার জানি তো! হাতে টাকা এলে আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে যায়। এবার থেকে আমায় এনে দিও, তোমার যা দরকার হবে চেয়ে নিও, আর কটা মাস মোটে, ধারটা শোধ হয়ে গেলে তখন কি আর টানাটানি থাকবে, না তুমি দশ বিশ টাকা বাজে খরচ করলে এসে যাবে?

শ্যামা বলে, শীতল শোনে। শ্যামাকে বোধ হয় সে আর একজনের সঙ্গে মিলাইয়া দেখে, যে এমনি মিষ্টি মিষ্টি কথা বলিয়া বুঝাইয়া টাকা আদায় করিত, বলিত, আমার দুখানা গয়না গড়িয়ে দে, টাকাটা তাহলে আটকা থাকবে, নইলে তুই তো সব খরচ করে ফেলবি?—দরকারের সময় তুই তোর গয়না বেচে নিস্, আমি যদি একটি কথা কই—

সে এসব বলিত মদের মুখে। শ্যামা কি?

তারপর শ্যামা বলে—এ কাপড় তো পরতে পারব না আমি ছেলের সামনে—ও অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবে, আমার লজ্জা করবে বাবু।

—না পার, ওই নর্দমা রয়েছে, ওখানে ফেলে দাও।—শীতল বলে।

রাত্রে ছেলেমেয়েরা সব ঘুমাইয়া পড়িলে শ্যামা আস্তে আস্তে শীতলকে ডাকে, বলে—হ্যাঁগা ঘুমুলে নাকি? ফুটফুটে জ্যোছনা উঠেছে দিব্যি, ছাতে যাবে একবারটি?

শীতল বলে—আবার ছাতে কি জন্যে?—কিন্তু সে বিছানা ছাড়িয়া উঠে।

শ্যামা বলে, গিয়ে একটা বিড়ি ধরাও, আমি আসছি।

রঙীন কাপড়খানা পরিয়া শ্যামা ছাদে যায়। বড় লজ্জা করে শ্যামার—শীতলকে নয়, বিধানকে। ঘুম ভাঙিয়া রাত দুপুরে তার পরনে রঙীন কাপড় দেখিলে, ও যা ছেলে, ওর কি আর বুঝিতে বাকি থাকিবে, শীতলের মন ভুলানোর জন্যে সে সাজগোজ

করিয়াছে? অথচ শীতল শখ করিয়া কাপড়খানা আনিয়া দিয়াছে, একবার না পরিলেই বা চলিবে কেন?

শ্যামা মাদুর লইয়া যায়, মাদুর পাতিয়া দুজনে বসে: চাঁদের আলোয় বসিয়া দুজনে দুটো একটা সাংসারিক কথা বলে, বেশি সময় থাকে চুপ করিয়া। বলার কি আর কথা আছে ছাই এ বয়সে! হ্যাঁ, শীতল শ্যামাকে একটু আদর করে, শীতলের স্পর্শ আর তেমন মোলায়েম নয়, কখনো যেন স্ত্রীলোকের সঙ্গ পায় নাই, এমনি আনাড়ির মত আদর করে। শ্যামা দোষ দিবে কাকে? সেও তো কম মোটা হয় নাই।

তারপর একদিন শ্যামা সলজ্জ ভাবে বলে, কি কাণ্ড হয়েছে জান?

শীতল শুনিয়া বলে, বটে নাকি!

শ্যামা বলে, হ্যাঁ গো, চোখ নেই তোমার?—কি হবে বলত এবার, ছেলে না মেয়ে?

—মেয়ে।

—উঁহু ছেলে।—বুকু বেঁচে থাক, আমার আর মেয়েতে কাজ নেই বাবু।

বলিয়া শ্যামা হাসে। মধুর পরিপূর্ণ হাসি, দেখিয়া কে বলিবে, শীতলের মত অপদার্থ মানুষ তাহার মুখে এ হাসি যোগাইয়াছে।

চার

মাঝখানে একটা শীত চলিয়া গেল, পরের শীতের গোড়ার দিকে, শ্যামার নূতন ছেলেটির বয়স যখন প্রায় আট মাস, হঠাৎ একদিন সকালবেলা মামা আসিয়া হাজির।

শ্যামার সেই পলাতক মামা তারাশঙ্কর।

ছোট খাট বেঁটে লোকটা, হাত পা মোটা, প্রকাণ্ড চওড়া বুক। একদিন ভয়ঙ্কর বলবান ছিল, এখন মাংসপেশীগুলি শিথিল হইয়া আসিয়াছে। শেষবার শ্যামা যখন তাহাকে দেখিয়াছিল মাথার চুলে তাহার পাক ধরে নাই, এবার দেখা গেল প্রায় সব

চুল পাকিয়া গিয়াছে। সে তো আজকের কথা নয়। শ্যামার বিবাহের কিছুদিন পরে জমিজমা বেচিয়া গ্রামের সব চেয়ে বনেদী ঘরের বিধবা মেয়েটিকে সাথী করিয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছিল,—শ্যামার বিবাহ হইয়াছে আজ একুশ বাইশ বছর। বিবাহের সাত বছর পরে তার সেই প্রথম ছেলেটি হইয়া মারা যায়, তার দু বছর পরে বিধানের জন্ম। গত আশ্বিনে বিধানের এগার বছর বয়স পূর্ণ হইয়াছে।

মামার বয়স ষাট হইয়াছে বৈকি! কিন্তু যে লোহার মতো শরীর তাহার ছিল, এতটা বয়সের ছাপ পড়ে নাই, শুধু চুলগুলি পাকিয়া গিয়াছে, দুটো একটা দাঁত বোধ হয় পড়িয়া গিয়াছিল মামা সোনা দিয়া বাঁধাইয়া লইয়াছে, কথা বলিবার সময় ঝিকমিক করে। এখনো সে আগের মতই সোজা হইয়া দাঁড়ায়, মেরুদণ্ডটা আজো এতটুকু বাঁকে নাই। চোখ দুটো মনে হয় একটু স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে, তা সে চোখের দোষ অথবা মানসিক শ্রান্তি বুঝা যায় না। শ্যামার বিবাহের সময় মামা ছিল সন্ন্যাসী, গেরুয়া পরিত, লম্বা আলখাল্লা ঝুলাইয়া সযত্নে বাবরি আঁচড়াইয়া ক্যাম্বিশের জুতা পায়ে দিয়া যখন গ্রামের পথে বেড়াইতে যাইত, মনে হইত মস্ত সাধু, বড় ভক্তি করিত গ্রামের লোক। এবার মামার পরনে সরু কালোপাড় ধুতি, গায়ে পাঞ্জাবি, পায়ে চকচকে জুতো—একেবারে বাবুর বাবু!

শীতল চিনিতে পারে নাই। শ্যামা প্রণাম করিয়া বলিল—ও মাগো, কোথায় যাবো, এ যে মামা! কোথা থেকে এলে মামা তুমি?

মামা হাসিয়া বলিল—এক যায়গা থেকে কি আর এসেছি মা যে নাম করব, চরকি বাজির মত ঘুরতে ঘুরতে একবার তোকে দেখতে এলাম, আপনার জন কেউ তো আর নেই, বুড়ো হয়েছি, কোন দিন চোখ বুজি তার আগে ভাগ্নীটাকে একবার দেখে যাই, এইসব ভাবলাম আর কি,—এরা তোর ছেলেমেয়ে না? কটি রে?

শ্যামাকে মামা বড় ভালবাসিত, সে তো জানিত মামা কবে কোন বিদেশে দেহ রাখিয়াছে, এতকাল পরে মামাকে পাইয়া শ্যামার আনন্দের সীমা রহিল না। কি দিয়া সে যে মামার অভ্যর্থনা করিবে! বাইশ বছর পরে যে আত্মীয় ফিরিয়া আসে তাকে কি বলিতে হয়, কি করিতে হয় তার জন্য? মামাকে সে নানারকম খাবার করিয়া দিল, বাজার হইতে ভাল মাছ তরকারি আনিয়া রান্না করিল, বেশি দুধ আনাইয়া তৈরি করিল পায়স। মামা বড় ভালবাসিত পায়স। এখনো তেমনি ভালবাসে কিনা কে জানে?

মামার সঙ্গে একটু ভদ্রতা করিয়া শীতল কোথায় পলাইয়াছিল, মামা ইতিমধ্যে শ্যামার ছেলেদের সঙ্গে ভাব জমাইয়া ফেলিয়াছে,—ভারি মজার লোক, এমন আর শ্যামার ছেলেরা দেখে নাই। রাঁধিতে রাঁধিতে শ্যামা হাসিমুখে কাছে আসিয়া দাঁড়ায়, বলে—আর তোমাকে পালিয়ে যেতে দেব না মামা, এবার থেকে আমার কাছে থাকবে। তোমার জিনিসপত্তর কই ?

মামা বলে—সে এক হোটেলে রেখে এসেছি, কে জানত বাবু তোরা আছিস এখানে ?

শ্যামা বলে—ওবেলা গিয়ে তবে জিনিসপত্তর সব নিয়ে এসো,—কলকাতা এসেছ কবে ?

মামা বলে—এই তো এলাম কাল না পরশু, পরশু বিকেলে।

বিধান আজ স্কুলে গেল না। মামা আসিয়াছে বলিয়া শুধু নয়, বাড়িতে আজ নানারকম রান্না হইতেছে, মামা কি একাই সব খাইবে ? এগারোটা পর্যন্ত কোথায় আড্ডা দিয়া আসিয়া তাড়াহুড়া করিয়া স্নানাহার সারিয়া শীতল প্রেসে চলিয়া গেল, মামার সঙ্গে একদণ্ড বসিয়া কথা বলারও সময় পাইল না। আজ তাহার এত তাড়াতাড়ি কিসের সে-ই জানে, বাড়িতে একটা মানুষ আসিলে শীতল যেন কি রকম করে, সে যেন চোর, পুলিস তাহার খোঁজ করিতে আসিয়াছে।

রাঁধিতে রাঁধিতে শ্যামা কত কি যে ভাবিতে লাগিল। সঙ্গিনীটির কি হইয়াছে ? হয়তো মরিয়া গিয়াছে, নয়তো মামার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হইয়াছে অনেকদিন আগেই। ও সব সম্পর্ক আর কতকাল টেঁকে ? মরুক, ওসব দিয়া তার কি দরকার ? কেলেঙ্কারি ব্যাপার চুকাইয়া দিয়া মামা ফিরিয়া আসিয়াছে, এই তার ঢের। আচ্ছা, এতকাল মামা কি করিতেছিল ? টাকাপয়সা কিছু সঞ্চয় করিয়াছে নাকি ? তা যদি করিয়া আসিয়া থাকে তবে মন্দ হয় না। মামার সম্পত্তি হাতছাড়া হইয়া যাওয়ায় শীতলের মনে বড় লাগিয়াছিল, মামা হয়তো এবার সুদে-আসলে সে পাওনা মিটাইয়া দিবে ? পুরুষমানুষের ভাগ্য—বিদেশে ধূলিমুঠা ধরিয়া মামার হয়তো সোনামুঠা হইয়াছে, মামার কাপড়-জামা দেখিলেও তাই মনে হয়। মামার তো আর কেউ নাই, যদি কিছু সঞ্চয় করিয়া থাকে শ্যামাই তাহা পাইবে। এই বয়সে আর একজন সঙ্গিনী জুটাইয়া মামা আর তাহার দেশান্তরী হইতে যাইবে না !

মামাকে সে ঘরবাড়ি দেখায়। পিছনে খিড়কির দিকে খানিকটা খালি জায়গা

আছে, কয়েক হাজার ইঁট কিনিয়া শ্যামা সেখানে জমা করিয়া রাখিয়াছে, রান্নাঘরের পাশে সিঁড়ির নিচে, চুন আর সুরকি রাখিয়াছে,—আর বছর শ্যামা যে টাকা জমাইয়াছিল এসব কিনিতেই তা খরচ হইয়া গিয়াছিল, এ-বছর কিছু টাকা জমিয়াছে, ভগবানের ইচ্ছা থাকিলে আগামী মাঘে দোতলায় শ্যামা একখানা ঘর তুলিবে।

—এইটুকু বাড়ি, দুখানা মোটে শোবার ঘর, কেউ এলে কোথায় থাকতে দেব ভেবে পাইনে মামা, দোতলায় ঘরটা তুলতে পারলে বাঁচি, ও আমার অনেকদিনের সাধ। খোকার বিয়ে দিয়ে ছেলে-বৌকে ও-ঘরে শুতে দেব। পাশ দিতে খোকার আর চার বছর বাকি, পোষ মাসে কেলাসে উঠলে তিন বছর, নারে খোকা?

মামা গম্ভীর হইয়া বলে—বড় বুদ্ধি তোর ছেলের শ্যামা, মস্ত বিদ্বান হবে বড় হয়ে। তামাকের ব্যবস্থা বুঝি রাখিস না, এঁ্যা? খায় না, শীতল খায় না তামাক?

—আগে খেত, কিন্তু কে অত দেবে মিনিটে মিনিটে তামাক সেজে? যা ঝি আমার, বাসন মাজতেই বেলা কাবার—আর আমার তো দেখছই মামা, নিশ্বাস ফেলবার সময় পাই নে সারাদিন—খেটে খেটে হাড় কালি হয়ে গেল। এদিকে বাবু তো কম নন, নিজে তামাক সেজে খাবার মুরোদ নেই, এখন বিড়ি-টিড়ি খায়। মরেও তেমনি খুকুর খুকুর কেসে!

—দে তবে আমাকে দুটো বিড়ি-টিড়িই আনিয়ে দে বাবু।

শ্যামা উৎসাহিতা হইয়া বলে,—দেব মামা, হুঁকো তামাক-টামাক সব আনিয়ে দেব? এই তো কাছে বাজার, যাবে আর নিয়ে আসবে। রানী, একবার শোন্ দিকি মা।

শ্যামার ঝি সত্যভামা শ্যামার ছোট ছেলেটার জন্মের কয়েক ঘন্টা আগে মরিয়া গিয়াছিল, ছেলে যদি শ্যামার না হইত, হইত মেয়ে, কারো তবে আর বুঝিতে বাকি থাকিত না যে বাড়ির ঝি পেটের ঝি হইয়া আসিয়াছে। সত্যভামার মেয়ে রানী এখন শ্যামার বাড়িতে কাজ করে। রানীর বিবাহ হইয়াছে, জামাই ভূষণ থাকে শ্বশুরবাড়িতেই, শীতল তাহাকে কমল প্রেসে একটা চাকরি জুটাইয়া দিয়াছে। রানী বাজার হইতে তামাক খাওয়ার সরঞ্জাম আনিয়া তামাক সাজিয়া হুঁকায় জল ভরিয়া দিল, মামা আরামের সঙ্গে তামাক টানিতে টানিতে বলিল—তোর ঝিটা তো বড় ছেলেমানুষ শ্যামা, কাজকর্ম পারে?

—ছাই পারে, আলসের একশেষ, আবার বাবুয়ানির সীমে নেই, ছুঁড়ির চলন

দেখছ না মামা? ওর মা আমার কাছে অনেকদিন কাজ করেছিল তাই রাখা, নইলে মাইনে দিয়ে অমন ঝি কে রাখে?

খাওয়া দাওয়া শেষ হইতে দুটো বাজিল। শ্যামা সবে পান সাজিয়া মুখে দিয়াছে, শীতল ফিরিয়া আসিল। শ্যামা অবাক হইয়া বলিল—এত শিগগির ফিরলে যে?

—মামার সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলব, প্রেসে কাজকর্মও নেই—

—বেশ করেছ। যেমন করে অফিসে চলে গেলে, মামা না জানি কি ভেবেছিল!

শীতল ইতস্তত করে, কি যেন সে বলিবে মনে করিয়াছে। সে একটা পান খায়। শ্যামার মুখের দিকে চাহিয়া মনে মনে কি সব হিসাব করে। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল—মামা কদিন থাকবেন এখন, না?

শ্যামা বলিল—কদিন কেন? বরাবর থাকবেন, আমরা থাকতে বুড়োবয়সে হোটেলের ভাত খেয়ে মরবেন কি জন্যে?

—আমিও তাই বলছিলাম!—পয়সা-কড়ি কিছু করেছেন মনে হয়, এ্যাঁ?

—মনে তো হয়, এখন আমাদের অদেষ্ট!

মামা একটা ঘুম দিয়া উঠিলে বিকালে তাহারা চারিদিকে ঘেরিয়া বসিয়া গল্প শুনিতে লাগিল, শহর গ্রাম অরণ্য পর্বতের গল্প, রাজা-মহারাজা সাধু-সন্ন্যাসী চোর-ডাকাতের গল্প, রোমাঞ্চকর বিপদ-আপদের গল্প। মামা কি কম দেশ ঘুরিয়াছে, কম মানুষের সঙ্গে মিশিয়াছে! সুদূর একটা তীর্থের নাম কর, যার নামটি মাত্র শ্যামা ও শীতল শুনিয়াছে, যেমন রামেশ্বর সেতুবন্ধ, নাসিক, বদরীনাথ—মামা সঙ্গে সঙ্গে পথের বর্ণনা দেয়, তীর্থের বর্ণনা দেয়, সব যেন রূপ ধরিয়া চোখের সামনে ফুটিয়া ওঠে। সেই বিধবা সঙ্গিনীটি কতকাল মামার সঙ্গে ছিল, কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারে না, মামার যাযাবর জীবনের ইতিবৃত্ত শুনিয়া কিন্তু মনে হয়, চিরকাল সে দেশে দেশে ঘুরিয়াছে একা, সাথী যদি কখনো পাওয়া গিয়া থাকে, সে পথের সাথী, পুরুষ। শ্যামা একবার সুকৌশলে জিজ্ঞাসা করে, গ্রাম হইতে বাহির হইয়া প্রথমে মামা কোথায় গিয়াছিল, মামা সোজাসুজি জবাব দেয়—কাশী—কাশীতে ছিলাম পাঁচ-ছটা মাস, ভুলে-টুলে গিয়েছি সে সব বাপু, সে কি আজকের কথা!

শ্যামা বলে—একা একা ঘুরে বেড়াতে ভাল লাগত মামা?

মামা বলে—একা ঘুরেই তো সুখ রে, ভাবনা নেই, চিন্তা নেই, যখন যেখানে খুশি পড়ে থাক, যেখানে খুশি চলে যাও, কারো তোয়াক্কা নেই, জুটলো খেলে না জুটলো

উপোস করলে—চিরকাল ঘরের কোণে কাটালি, সে আনন্দ তোরা কি বুঝবি? একবার কি হল,—নীলগিরি পাহাড়ের গোড়ায় একটা গ্রামে গিয়েছি এক সাধুর সঙ্গে, গ্রামটার নাম বুঝি তুড়িগোড়িয়া, পাহাড়ের সার চলে গিয়েছে গ্রামের ধার দিয়ে। পাহাড়ে উঠে দেখতে ইচ্ছা হল। গাঁ থেকে উড়িয়া মেয়েরা পাহাড়ের বনে কাঠ কাটতে যায়, তাদের সঙ্গে গেলাম। সে কি জঙ্গল রে শ্যামা, এইটুকু সরু পথ, দুপাশে এক পা সরাবার যো নেই, যেন গাছপালার দেয়াল গাঁথা। ফিরবার সময় পথে হাতীর পাল পড়ল, আর নামবার যো নেই। চারদিন হাতীর পাল পথ আটকে রইল, চারদিন আমরা নামতে পারলাম না। কি সাহস মেয়েগুলোর বলিহারি যাই, চারদিন টুঁ শব্দটি করলে না, রাত্রে আমাকে বলত ঘুমোতে, আর নিজেরা কাঠকাটা দা বাগিয়ে ধরে পাহারা দিয়ে জেগে থাকত। আর একদিন—

সেদিন আর মামার জিনিসপত্র আনা হইল না, পরদিন গিয়া লইয়া আসিল।

শ্যামা ভাবিয়াছিল, মামা কত জিনিস না জানি আনিবে, হয়তো আঁটিবেই না ঘরে। মামা কিন্তু আনিল ক্যাম্বিশের একটা ব্যাগ, কম্বলে জড়ানো একটা বিছানা,—লেপ, তোষক নয়, দুটো র‍্যাগ, খানতিনেক সুতির চাদর আর এই এতটুকু একটা বালিশ।

শ্যামা অবাক হইয়া বলিল, এই নাকি তোমার জিনিস মামা?

মামা একগাল হাসিল—ভবঘুরের কি আর রাশ রাশ জিনিস থাকে মা? ব্যাগটা হাতে করি, বিছানা বগলে নিই, চলো এবার কোথায় যাবে দিল্লী না বোম্বাই।—ব্যাগটা হাতে তুলিয়া বিছানা বগলে করিয়া মামা যাওয়ার অভিনয় করিয়া দেখাইল।

তাই হইবে বোধ হয়। আজ এখানে কাল সেখানে করিয়া যে বেড়ায়, বাক্স প্যাঁটরার হাঙ্গামা থাকিলে তাহার চলিবে কেন? কিন্তু এমন ভবঘুরেই যদি মামা হইয়া থাকে, তবে তো টাকাকড়ি কিছুই সে করিতে পারে নাই? শ্যামা ভাবিতে ভাবিতে কাজ করে। প্রথমে সে যা ভাবিয়াছিল, বিদেশে মামা অর্থোপার্জন করিয়াছে, বেড়াইয়া বেড়াইয়াছে শুধু ছুটিছাটা সুযোগ-সুবিধা মত, হয়তো তা সত্য নয়। মামার হয়তো কিছুই নাই। দেশে দেশে সম্পদ কুড়াইয়া বেড়ানোর বদলে হয়তো শুধু বাউল সন্ন্যাসীর মত উদ্দেশ্যহীনভাবেই সে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। কিন্তু এমন যে দুঃসাহসী, কত রাজা-রাজড়ার সঙ্গে যে খাতির জমাইয়াছে, পার্থিব সম্পদ লাভের সুযোগ কি সে কখনো পায় নাই? পথে ঘাটে লোকে তো হীরাও কুড়াইয়া পায়।

বিষ্ণুপ্রিয়ার বাবা পশ্চিমে গিয়াছিলেন কপর্দকহীন অবস্থায়, কোথাকার রাজার সুনজরে পড়িয়া বিশ বছর দেওয়ানী করিলেন, দেশে ফিরিয়া দশ বছর ধরিয়া পেন্সনই পাইলেন বছরে দশ হাজার টাকার। মামার জীবনে ওরকম কিছুই কি ঘটে নাই? কোনো দেশের রাজার ছেলের প্রাণ-টান বাঁচাইয়া লাখ টাকা দামের পান্না মরকত—একটা কিছু উপহার?

মামা নিঃস্ব অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে, শ্যামার ইহা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। একবার তাহাদের গ্রামে এক সন্ন্যাসী গাছতলায় মরিয়া পড়িয়া ছিল, সন্ন্যাসীর সঙ্গে ছিল পুরু কাঠের ছোট্ট একটি জল-চৌকী, তার ভিতরটা ছিল ফাঁপা, পুলিস নাকি স্ক্রুর মতো ঘুরাইয়া ছোট ছোট পায়া চারটি খুলিয়া তক্তার ভিতরে একগাদা নোট পাইয়াছিল। মামার ব্যাগের মধ্যে, কোমরের থলিতে হয়তো তেমনি কিছু আছে? নোট না হোক, দামী কোনো পাথর-টাথর?

মামা স্থায়ীভাবে রহিয়া গেল। ভারি আমুদে মিশুকে লোক, কদিনের মধ্যে পাড়ার ছেলে বুড়োর সঙ্গে পর্যন্ত তাহার খাতির জমিয়া গেল, এ-বাড়িতে দাবার আড্ডায়, ও-বাড়িতে তাসের আড্ডায় মামার পশারের অন্ত রহিল না। মামার প্রতি এখন শীতলের ভক্তি অসীম, মামার মুখে দেশ-বিদেশের কথা শুনিতে তাহার আগ্রহ যেন দিন দিন বাড়িয়া চলে, মামাকে সে চুপ করিতে দেয় না। মামা আসিবার পর হইতে সে কেমন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছে, চোখে কেমন উদাস উদাস চাউনি। শ্যামা একটু ভয় পায়। ভাবে, এবার আবার মাথায় কি গোলমাল হয় দেখো!

ঠিক শীতলের জন্য যে শ্যামার ভাবনা হয় তা নয়, শীতলের সম্বন্ধে ভাবিবার তাহার সময় নাই। তার গুছানো সংসারে শীতল কবে কি বিপর্যয় আনে, এই তার আশঙ্কা। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা অদ্ভুত সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছে তাহাদের। সংসার শ্যামার, ছেলেমেয়ে শ্যামার—ওর মধ্যে শীতলের স্থান নাই,—নিজের গৃহে নিজের সংসারের সঙ্গে শীতলের সম্পর্ক শ্যামার মধ্যস্থতায়, গৃহে শীতল শ্যামার আড়ালে পড়িয়া থাকে, স্বাধীনতা-বিহীন স্বাতন্ত্র্যবিহীন জড় পদার্থের মতো। একদিন শীতল মদ খাইত, শ্যামাকে মারিত, কিন্তু শীতল ছাড়া শ্যামার তখন কেহ ছিল না। আজ শীতলের মদ খাইতে ভাল লাগে না, শ্যামাকে মারা দূরে থাক ধমক দিতেও তাহার ভয় করে! শ্যামা আজ কত উঁচুতে উঠিয়া গিয়াছে! কোনো দিকে কোনো বিষয়ে খুঁত নাই শ্যামার, সেবায়-যত্নে, বিধি-ব্যবস্থায়, বুদ্ধি-বিবেচনায়, ত্যাগে-কর্তব্যপালনে

সে কলের মতো নিখুঁত—শ্যামার সঙ্গে তুলনা করিয়া সব সময় শীতলের যেন নিজেকে ছোটলোক বলিয়া মনে হয়, এবং সে যে অপদার্থ ছিটগ্রস্ত মানুষ, এ তো জানে সকলেই, অন্তত শ্যামা যে জানে, শীতলের তাহাতে সন্দেহ নাই। সব সময় শীতলের মনে হয়, শ্যামা মনে মনে তাহার সমালোচনা করিতেছে, তাহাকে ছোট ভাবিতেছে, ঘৃণা করিতেছে—কেবল মাস গেলে সে টাকা আনিয়া দেয় বলিয়া মনের ভাব রাখিয়াছে চাপিয়া, বাহিরে প্রকাশ করিতেছে না। বাহিরের জীবনে বিতৃষ্ণা আসিয়া শীতলের মন নীড়ের দিকে ফিরিয়াছিল, চাহিয়াছিল শ্যামাকে—কিন্তু সাত বৎসরের বন্ধ্যাজীবন-যাপিনী লাঞ্ছিতা পত্নী যখন জননী হয়, তখন কে কবে তাহাকে ফিরিয়া পাইয়াছে? বৌয়ের বয়স যখন কাঁচা থাকে, তখন তাহার সহিত না মিলিলে আর তো মিলন হয় না! মন পাকিবার পর কোনো নারীর হয় না নূতন বন্ধু, নূতন প্রেমিক। দুঃখ মুছিয়া লইবার, আনন্দ দিবার, শান্তি আনিবার ভার শ্যামাকে শীতল কোনোদিন দেয় নাই, শীতলের মনে দুঃখ নিরানন্দ ও অশান্তি আছে কিনা শ্যামা তাহা বুঝিতেও জানে না। শীতল ছিল রুক্ষ উদ্ধত কঠোর, শ্যামাকে সে কবে জানিতে দিয়াছিল যে, তার মধ্যেও এমন কোমল একটা অংশ আছে, যেখানে প্রত্যহ প্রেম ও সহানুভূতির প্রলেপ না পড়িলে যন্ত্রণা হয়? শ্যামা জানে, ওসব প্রয়োজন শীতলের নাই, ওসব শীতল বোঝেও না। তাই ছেলেমেয়েদের লইয়া নিজের জন্য যে জীবন শ্যামা রচনা করিয়াছে, তার মধ্যে শীতল আশ্রয়ের মতো, জীবিকার উপায়ের মতো তুচ্ছ একটা পার্থিব প্রয়োজন মাত্র। আপনার প্রতিভায় সৃজিত সংসারে শ্যামা ডুবিয়া গিয়াছে। শীতল সেখানে ঢুকিবার রাস্তা না খুঁজিলেই সে বাঁচে।

মামা বলে—শীতলের ভাব যেন কেমন কেমন দেখি শ্যামা?

শ্যামা বলে—ওমনি মানুষ মামা—ওমনি গা-ছাড়া গা-ছাড়া ভাব। কি এল কি গেল, কোথায় কি হচ্ছে, কিচ্ছু তাকিয়ে দেখে না,—খেয়াল নিয়েই আছে নিজের। ভগ্নীপতি চাইলে, দিয়ে দিলে তাকে হাজারখানেক টাকা ধার করে—না একবার জিজ্ঞেস করা, না একটা পরামর্শ চাওয়া! তাও মেনে নিলাম মামা, ভাবলাম, দিয়ে যখন ফেলেছে আর তো উপায় নেই—যে মানুষ ওর ভগ্নীপতি ও টাকা ফিরে পাওয়ার আশা নিমাই!—কি আর হবে? এই সব ভেবে জমানো যে কটা টাকা ছিল,—কি কষ্টে যে টাকা কটা জমিয়েছিলাম মামা, ভাবলে গা এলিয়ে আসে—দিলাম একদিন

সবগুলি টাকা হাতে তুলে, বললাম, যাও ধার শুধে এসো, ঋণী হয়ে থেকে কেন ভেবে ভেবে গায়ের রক্ত জল করা? টাকা নিয়ে সেই যে গেল, ফিরে এল সাদ্দিন পরে। ধারের মনে ধার রইল, টাকাগুলো দিয়ে বাবু সাদ্দিন ফুর্তি করে এলেন! সেই থেকে কেমন যেন দমে গেছি মামা, কোনো দিকে উৎসাহ পাই নে। ভাবি, এই মানুষকে নিয়ে তো সংসার, এত যে করি আমি, কি দাম তার, কেন মিথ্যে মরছি খেটে খেটে,—সুখ কোথা অদেষ্টে?

মামা সান্ত্বনা দিয়া বলে—পুরুষমানুষ অমন একটু আধটু করে শ্যামা—নিজেই আবার সব ঠিক করে আনে। আনছে তো বাবু রোজগার করে, বসে তো নেই!

শ্যামা বলে—আমি আছি বলে, আর কেউ হলে এ সংসার কবে ভেসে যেত মামা।

মামা একদিন কোথা হইতে শ্যামাকে কুড়িটি টাকা আনিয়া দেয়। শ্যামা বলে —একি মামা?

মামা বলে—রাখ না, রাখ—খরচ করিস। টাকাটা পেলাম, আমি আর কি করব ও দিয়ে?

সত্যই তো, টাকা দিয়া মামা কি করিবে? শ্যামা সুখী হইল। মামা যদি মাঝে মাঝে এরকম দশ-বিশটা টাকা আনিয়া দেয়, তবে মন্দ হয় না। মামাকে শ্যামা ভক্তি করে, কাছে রাখিয়া শেষ বয়সে তাহার সেবাযত্ন করার ইচ্ছাটাও আন্তরিক। তবে, তাহার কিনা টানাটানির সংসার, ইঁট-সুরকি কিনিয়া রাখিয়া টাকার অভাবে সে কিনা দোতলায় ঘর তোলা আরম্ভ করিতে পারে নাই, মেয়ে কিনা তাহার বড় হইতেছে, টাকার কথাটা সে তাই আগে ভাবে। কি করিবে সে? তার তো জমিদারি নাই। মামা থাক, হাজার দশ হাজার যদি নাই পাওয়া যায়, মামার জন্য যে বাড়িতে খরচ হইবে, অন্তত সেটা আসুক, শ্যামা আর কিছু চায় না।

দিন পনের পরে মামা একদিন বর্ধমানে গেল, সেখানে তাহার পরিচিত কোন সাধুর আশ্রম আছে, তার সঙ্গে দেখা করিবে। বলিয়া গেল, দিন তিনেক পরে ফিরিয়া আসিবে। শ্যামা ভাবিল, মামা বোধ হয় আর ফিরিয়া আসিবে না, এমনি ভাবে ফাঁকি দিয়া বিদায় লইয়াছে। শীতল ক্ষুণ্ণ হইল সব চেয়ে বেশি। বন্ধনহীন নির্বান্ধব ভ্রাম্যমাণ লোকটির প্রতি সে প্রবল একটা আকর্ষণ অনুভব করিতেছিল। মামা যখন যায়, শীতল বাড়ী ছিল না। মামা চলিয়া গিয়াছে শুনিয়া সে বারবার

বলিতে লাগিল—কেন যেতে দিলে? তোমার একফোঁটা বুদ্ধি নেই, মামার স্বভাব জানো ভাল করে, আটকাতে পারলে না? বোকা হাঁদারাম তুমি—মুখ্যুর একশেষ!

—কচি খোকা নাকি ধরে রাখব?

—ধরে আবার রাখতে হয় নাকি মানুষকে? কি বলেছ কি করেছ তুমিই জান, যা ছোট মন তোমার, আত্মীয়স্বজন দুদিন এসে থাকলে খরচের ভয়ে মাথায় তোমার টনক নড়ে যায়,—ছেলেমেয়ে ছাড়া জগতে যেন পোষ্য থাকে না মানুষের।—ছেলে তোমার কি করে দেখো, তোমার কাছেই তো সব শিখছে, তোমার কপালে ঢের দুঃখ আছে।

—পাগল হলে নাকি তুমি? কি বকছ?

শীতল যেন কেমন করিয়া শ্যামার দিকে তাকায়। খুব রাগিলে আগে যেমন করিয়া তাকাইত সেরকম নয়।—পাগল আমি হই নি শ্যামা, হয়েছ তুমি! ছেলে ছেলে করে তুমি এমন হয়ে গেছ, তোমার সঙ্গে মানুষে বাস করতে পারে না,—ছেলে না কচু, সব তোমার টাকার খাঁকতি, কি করে বড়-লোক হবে, দিনরাত শুধু তাই ভাবছ, কারো দিকে তাকাবার তোমার সময় নেই। জন্তুর মতো হয়েছ তুমি, তোমার সঙ্গে একদণ্ড কথা কইলে মানুষের ঘেন্না জন্মে যায় এমনি বিশ্রী স্বভাব হয়েছে তোমার, লোকে মরুক, বাঁচুক, তোমার কি? সময়ে মানুষ টাকা পয়সার কথা ভাবে আবার সময়ে দশজনের দিকে তাকায়, তোমার তা নেই,—আমি বুঝি নে কিছু। টাকার কথা ছাড়া এক মিনিট আমার সঙ্গে অন্য কথা কইতে তোমার গায়ে জ্বর আসে, মন খুলে স্বামীর সঙ্গে মেশার স্বভাব পর্যন্ত তোমার ঘুচে গেছে, বসে বসে খালি মতলব আঁটছ কি করে টাকা জমাবে, বাড়ি তুলবে, ঘর তুলবে, টাকার গদিতে শুয়ে থাকবে: বাজারের বেশ্যা মাগীগুলো তোমার চেয়ে ভাল, তারা হাসিখুশী জানে, ফুর্তি করতে জানে: রক্তমাংসের মানুষ তুমি নও, লোভ করার যন্তর।

বাস্ রে! শীতল এমন করিয়া বলিতে পারে? সমালোচনা করার পাগলামি এবার তাহার আসিয়াছে নাকি? এসব সে বলিতেছে কি? শ্যামার সঙ্গে মানুষ বাস করিতে পারে না? মানুষের সঙ্গে অনুভূতির আদান-প্রদান সে ভুলিয়া গিয়াছে—একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে?

সে জন্তু, যন্ত্র, বেশ্যার চেয়ে অধম? কেন, টাকা পয়সা বাড়িঘর সে

নিজের জন্য চায় নাকি! শীতল দেখিতে পায় না নিজে সে কত কষ্ট করিয়া থাকে, ভাল কাপড়টি পরে না, ভাল জিনিসটি খায় না? শ্যামা শীতলকে এই সব বলে, বুঝাইয়া বলে।

শীতল বলে—ভাল খাবে পরবে কি, মানুষ ভাল খায় ভাল পরে ভাল মানুষ। তুমি তো টাকা জমানো যন্তর!

—ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হয়—শ্যামা বলে।

শীতল বলে—তাইতো বলছি, টাকা আর ভবিষ্যত হয়েছে তোমার সব, ভবিষ্যত করে করে জন্ম কেটে গেল, অত ভবিষ্যত কারো সয় না। ভবিষ্যতের ভাবনা মানুষের থাকে, অল্প-বিস্তর থাকে, তোমার ও ছাড়া কিছু নেই, ওই তোমার সর্বস্ব—বড় বেথাপ্পা মানুষ তুমি, মহাপাপী!

শোনো একবার শীতলের কথা! কিসে মহাপাপী শ্যামা? কোন দিন চোখ খুলিয়া পরপুরুষের দিকে চাহিয়াছে? অসৎ চিন্তা করিয়াছে? দেবদ্বিজে ভক্তি রাখে নাই? শ্যামা আহত, উত্তেজিত ও বিস্মিত হইয়া থাকে। শীতল তাহাকে বকে? যার সংসার সে মাথায় করিয়া রাখিয়াছে? যার ছেলেমেয়ের সেবা করিয়া তাহার হাতে কড়া পড়িয়া গেল, মেরুদণ্ড বাঁকিয়া গেল ভারবহা বাঁকের মতো? ধন্য সংসার! ধন্য মানুষের কৃতজ্ঞতা!

মামা কিন্তু ফিরিয়া আসিল,—সাতদিন পরে।

সাতদিন পরে মামা ফিরিয়া আসিল, আরও দিন দশেক পরে শ্যামা দোতলায় ঘর তোলা আরম্ভ করিল, বলিল—জানো মামা, উনি বলেন আমি নাকি কেপ্পনের একশেষ নিজে তো ডাইনে বাঁয়ে টাকা ছড়ান, আমি মরে বেঁচে কটা রেখেছি বলে না ঘরখানা উঠছে? সংসারে ওনার মন নেই, উড়ু উড়ু কচ্ছেন। আমিও যদি তেমনি হই সব ভেসে যাবে না, ছারখার হয়ে যাবে না সব? টাকা রাখব আমি, ইঁট-সুরকি কিনব আমি, মিস্ত্রি ডাকব আমি,—তারপর ঘর হলে শোবেন কে? উনি তো? আমি তাই জন্তু জানোয়ার,—যন্তর! কথা কই নে সাধে? কইতে ঘেন্না হয়!

মামা বলিল—সেকি মা, কথা বলিসনে কি?

শ্যামা বলিল—বলি, দরকার মত বলি। পঁয়ত্রিশ বছর বয়স হল আজে বাজে কথা আর মুখে আসে না, দোষ বল দোষ, গুণ বল গুণ, যা পারিনে তা পারিই নে।

ঘর তুলিবার হিড়িকে শ্যামা, আমাদের ছেলে-পাগলা শ্যামা, ছেলেমেয়েদের যেন ভুলিয়া গিয়াছে। কত আর পারে মানুষ? সংসারে উদয়াস্ত খাটিয়া খাটিয়া আগেই তাহার অবসর থাকিত না, এখন মিস্ত্রির কাজ দেখিতে হয়, এটা ওটা আনাইয়া দিতে হয়, ঘর তোলার হাঙ্গামা কি কম! শ্যামা পারেও বটে! এক হাতে ছোট ছেলেটাকে বুকের কাছে ধরিয়া রাখে, সে ঝুলিতে ঝুলিতে প্রাণপণে স্তন চোষে, শ্যামা সেই অবস্থাতে চরকির মতো ঘুরিয়া বেড়ায়, ভাতের হাঁড়ি নামায়, তরকারি চড়ায়, ছাদে গিয়া মিস্ত্রির দেয়াল গাঁথা দেখিয়া আসে, ভাঙা কড়াইয়ে করিয়া চুন নেওয়ার সময় উঠানে এক খাবলা ফেলিয়া দেওয়ার জন্য কুলিকে বকে, শীতলকে আপিসের ও বিধানকে স্কুলের ভাত দেয়, মাসকাবারি কয়লা আসিলে আড়তদারের বিলে নাম সই করে, খরচের হিসাব লেখে, ছোট খোকার কাঁথা কাচে (রানী এ কাজটা করে না, তার বয়স অল্প এবং সে একটু শৌখিন) আবার মামার সঙ্গে, প্রতিবেশী নকুড়বাবুর স্ত্রীর সঙ্গে গল্পও করে। চোখের দিকে তাকাও, বাৎসল্য নাই, স্নেহ মমতা নাই, শ্রান্তি নাই,—কিছুই নাই! শ্যামা সত্যই যন্ত্র নাকি?

মামা বলে—খেটে খেটে মরবি নাকি শ্যামা? যা যা তুই যা, মিস্ত্রির কাজ আমি দেখব'খন।

শ্যামা বলে—না মামা, তুমি বুড়ো মানুষ, তোমার কেন এসব ঝঞ্ঝাট পোয়াবে? যা সব বজ্জাত মিস্ত্রি, বজ্জাতি করে মালমসলা নষ্ট করবে, তুমি ওদের সঙ্গে পারবে কেন? তাছাড়া, নিজের চোখে না দেখে আমার স্বস্তি নেই কাজ কতদূর এগুলো, ঘর তোলার সাধ কি আমার আজকের! তুমি ঘরে গিয়ে বোসো মামা, পিঠে কোথায় ব্যথা বলছিলে না? রানী বরং একটু তেল মালিশ করে দিক।

শীতল কোনো দিকে নজর দেয় না, কেবল সে যে পুরুষ মানুষ এবং বাড়ির কর্তা, এটুকু দেখাইবার জন্য বলা নাই কওয়া নাই মাঝে মাঝে কর্তৃত্ব ফলাইতে যায়। গম্ভীর মুখে বলে—এখানে জানালা হবে বুঝি দেয়ালের যেখানে

ফাঁক রাখছ ?

মিস্ত্রিরা মুখ টিপিয়া হাসে। শ্যামা বলে—জানালা হবে না ত কি দেয়ালে ফাঁক থাকবে ?

—তাই বলছি—শীতল বলে,—জানালা হবে কটা ? তিনটে মোটে না না, তিনটে জানালায় আলো বাতাস খেলবে না ভাল,—ওহে মিস্ত্রি এইখানে আরেকটা জানলা ফুটিয়ে দাও—এদিকে একটাও জানালা কর নি দেখছি।

শ্যামা বলে—ওদিকে জানলা হবে না, ওদিকে নকুড়বাবুর বাড়ি দেখছ না ? আর বছর ওরাও দোতলায় ঘর তুলবে, আমাদের ঘেঁষে ওদের দেয়াল উঠবে—জানলা দিয়ে তখন করবে কি ? জান না, বোঝ না, ফোঁপরদালালি কোরো না বাবু তুমি।

শীতল অপমান বোধ করে, কিন্তু যেন অপমান বোধ করে নাই এমনি ভাবে বলে—তা কে জানে ওরা আবার ঘর তুলবে !—হাঁ হাঁ, ওখানে আস্ত ইঁট দিও না মিস্ত্রি—দেখছ না বসছে না, কতখানি ফাঁক রয়ে গেল ভেতরে ? দুখানা আদ্ধেক ইঁট দাও, দিয়ে মাঝখানে একটা সিকি ইঁট দাও।

মিস্ত্রিরা কথা বলে না, মাঝখানের ফাঁকটাতে কয়েকটা ইঁটের কুচি দিয়া মসলা ঢালিয়া দেয়, শীতল আড়চোখে চাহিয়া দেখে শ্যামা ক্রূর চোখে চাহিয়া আছে। শীতল এদিকে ওদিকে তাকায়, হঠাৎ শ্যামার দিকে চাহিয়া একটু হাসে, পরক্ষণে গম্ভীর হইয়া নিচে নামিয়া আসে। দাঁড়াইয়া বিধানের একটু পড়া দেখে,—পড়িবার জন্য ছেলেকে শ্যামা গত বৈশাখ মাসে নূতন টেবিল চেয়ার কিনিয়া দিয়াছে,—পড়া দেখিতে দেখিতে শীতল টের পায় শ্যামা ঘরে আসিয়াছে। তখন সে বিধানের বইয়ের পাতায় একস্থানে আঙুল দিয়া বলে—এখানটা ভাল করে বুঝে পড়িস খোকা, পরীক্ষায় মাঝে মাঝে দেয়।

তারপর বিধান জিজ্ঞাসা করে—Circumlocutory মানে কি বাবা ?

শীতল বলে, দেখ না দেখ মানের বই দেখ।

বিধান তখন খিল খিল করিয়া হাসে। শ্যামা বলে—পড়ার সময় কেন ওকে বিরক্ত করছ বল তো ?

শীতল বলে, হাসলি যে খোকা ?—শীতলের মুখ মেঘের মতো অন্ধকার হইয়া আসে—বাপের সঙ্গে ইয়ার্কি হচ্ছে ? হারামজাদা ছেলে কোথাকার !—বলিয়া

ছেলেকে সে আথালি পাথালি মারিতে আরম্ভ করে।

বিধান চেঁচায়, বুকু চেঁচায়, বাড়িতে একেবারে হৈ-চৈ বাধিয়া যায়। শ্যামা দুই হাতে বিধানকে বুকের মধ্যে আড়াল করে, শীতল গায়ের ঝাল ঝাড়িতেই শ্যামার গায়ে দু-চারটা মার বসাইয়া দেয় অথবা সেগুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া শ্যামার গায়ে লাগে বুঝিবার উপায় থাকে না। শ্যামা তো আজ গৃহিণী, মোটাসোটা রাজরানীর মতো তাহার চেহারা, শীতল কি এখন তাহাকে ইচ্ছা করিয়া মারিবে?

এমনিভাবে দিন যায়, ঠাণ্ডায় শীতের দিনগুলি হ্রস্ব হইয়া আসে। মামা সেই যে একবার শ্যামাকে কুড়িটি টাকা দিয়াছিল আজ পর্যন্ত সে আর একটি পয়সাও আনিয়া দেয় নাই, শ্যামা তবু শীতলের চেয়ে মামাকেই খাতির করে বেশি: মামার সঙ্গে শ্যামার বনে, শ্যামার ছেলেদের মামা বড় ভালবাসে, শীতলের চেয়েও বুঝি বেশি। নিজের বাড়িতে শীতল কেমন পরের মতো থাকে, যে সব খাপছাড়া তাহার কাণ্ড, কে তাহার সঙ্গে আত্মীয়তা করিবে? শীতলকে ভালবাসে শুধু বকুল। মেয়েটার মন বড় বিচিত্র, যা কিছু খাপছাড়া, যা কিছু অসাধারণ তাই সে ভালবাসে! শীতলও বোধহয় খোঁড়া কুকুর, লোম-ওঠা ঘা-ওলা বিড়াল, ভাঙ্গা পুতুল এই সবের পর্যায়ে পড়ে, বকুল তাই শ্যামার ভাষায় 'বাবা বলিতে অজ্ঞান।'

ছেলেবেলা হইতে বকুলের স্বাস্থ্যটি বড় ভাল, চলাফেরা হাসি খেলা স্বাভাবিক নিয়মে সবই তার সুন্দর, কত প্রাণ, কত ভঙ্গি। সকলে তাহাকে ভালবাসে, তার সঙ্গে কথা বলিতে সকলেই উৎসুক, সে কিন্তু যাকে তাকে ধরা দেয় না, নির্মমভাবে উপেক্ষা করিয়া চলে! খেলনা ও খাবার দিয়া, তোষামোদের কথা বলিয়া তাহাকে জয় করা যায় না। মামা কত চেষ্টা করিয়াছে, পারে নাই। শ্যামার তিন ছেলেই মামার ভক্ত, বকুল কিন্তু তাহার ধারে কাছেও ঘেঁষে না।

শ্যামার সঙ্গেও বকুলের তেমন ভাব নাই, শ্যামাকে সে স্পষ্টই অবহেলা করে। বাড়িতে সে ভালবাসে শুধু বাবাকে, শীতল যতক্ষণ বাড়ি থাকে, পায়ে পায়ে ঘুরিয়া বেড়ায়, শীতলের চুল তোলে, ঘামাচি মারে, মুখে বিড়ি দিয়া

দেশলাই ধরাইয়া দেয়, আর অনর্গল কথা বলে। শীতল বাড়ি না থাকিলে ছাদে গিয়া তাহার গোসাঘরে পুতুল খেলে, মিস্ত্রিদের কাজ দেখে, আর শ্যামার ফরমাস খাটে। শীতল না থাকিলে মেয়েটার মুখের কথা যেন ফুরাইয়া যায়।

একদিন শ্যামা নূতন গুড়ের পায়স করিয়াছে, সকলে পরিতোষ করিয়া খাইল, বকুল কিছুতে খাইবে না, কেবলি বলিতে লাগিল—দাঁড়াও, বাবা আসুক, বাবাকে দাও?

শ্যামা বলিল—সে তো আসবে রাত্তিরে, ওই গ্যাখ বড় জামবাটিতে তার জন্যে তুলে রেখেছি, এসে খাবে। তোরটা তুই খা!

বকুল বলিল—বাবা পায়েস খেতে আসবে দুটোর সময়।

শ্যামা বলিল—কি করে জানলি তুই আসবে?

বকুল বলিল—আমি বললাম যে আসতে? বাবা বললে দুটোর সময় ঠিক আসবে,—আমি বাবার সঙ্গে খাব।

শ্যামা বলিল—দেখলে মামা মেয়ের আব্দার? বুড়ো ঢেঁকি মেয়ে, বাবাকে পায়েস খাবার নেমন্তন্ন করেছেন, আপিস থেকে তিনি পায়েস খেতে বাড়ি আসবেন।…খা বুকু, খেয়ে বাটি খালি করে দে। তিনি যখন আসবেন খাবেন এখন, তুই বরং আদর করে খাইয়ে দিস, এখন নিজে খেয়ে আমায় রেহাই দে তো।

বকুল কিছুতে খাইবে না, শ্যামারও জিদ চাপিয়া গেল, সে-ও খাওয়াবেই। পিঠে জোরে দুটো চড় মারিয়া কোনো ফল হইল না, বকুল একটু কাঁদিল না পর্যন্ত। আরো জোরে মারিলে কি হইত বলা যায় না, কিন্তু যতই হোক শ্যামার তো মায়ের মন, কতবার কত জোরে আর মায়ের মন লইয়া মেয়েকে মারা যায়? এক খাবলা পায়স তুলিয়া শ্যামা মেয়ের মুখে গুঁজিয়া দিতে গেল, বকুল দাঁত কামড়াইয়া রহিল, তার মুখ শুধু মাখা হইয়া গেল পায়সে।

হার মানিয়া শ্যামা অভিমানাহত কণ্ঠে বলিল—উঃ, কি জিদ মেয়ের! কিছুতে পারলাম না খাওয়াতে?

দুটোর আগে শীতল সত্য সত্যই ফিরিয়া আসিল। শ্যামা আসন পাতিয়া গেলাসে জল ভরিয়া দিল। ভাবিল, শীতল খাইতে বসিলে সবিস্তারে বকুলের জিদের গল্প করিবে। কিন্তু ঘরের মধ্যে বাপ-বেটিতে কি পরামর্শ ই যে দুজনে তাহারা করিল, খানিক পরে মেয়ের হাত ধরিয়া শীতল বাড়ির বাহির হইয়া গেল। যাওয়ার

আগে শ্যামার সঙ্গে তাহাদের যে কথা হইল, তাহা এই—

শ্যামা বলিল—কোথায় যাচ্ছ শুনি?

শীতল বলিল—চুলোয়।

শ্যামা বলিল—পায়েস খেয়ে যাও।

বকুল বলিল—তোমার পায়েস আমরা খাই নে।

শ্যামা বলিল—দেখো, ভাল করছ না কিন্তু তুমি। আদর দিয়ে দিয়ে মেয়ের তো মাথা খেলে।

এর জবাবে শীতল বা বকুল কেহই কিছু বলিল না। পা দিয়া পায়সের বাটি উঠানে ছুঁড়িয়া শ্যামা ফেলিল কাঁদিয়া।

রাত প্রায় ন'টার সময় দুজনে ফিরিয়া আসিল। বকুলের গায়ে নতুন জামা, পরনে নতুন কাপড়, দু-হাত বোঝাই খেলনা, আনন্দে বকুল প্রায় পাগল। আজ কিছুক্ষণের জন্য সকলের সঙ্গেই সে ভাব করিল, শ্যামার অপরাধও মনে রাখিল না, মহোৎসাহে সকলকে সে তাহার সম্পত্তি দেখাইল, বাবার সঙ্গে কোথায় কোথায় গিয়াছিল, গল্প গল্প করিয়া বলিয়া গেল।

শীতল উৎসাহ দিয়া বলিল—কি খেয়েছিস বললি না বুকু?

পরদিন রাত্রে প্রেস হইতে ফিরিয়া বকুলকে শীতল দেখিতে পাইল না। শ্যামা বলিল—মামার সঙ্গে সে বনগাঁয়ে পিসির কাছে বেড়াইতে গিয়াছে।

—আমায় না বলে পাঠালে কেন?

—বললে কি আর তুমি যেতে দিতে? যাবার জন্য কাঁদাকাটা করতে লাগল, তাই পাঠিয়ে দিলাম।

—হঠাৎ বনগাঁ যাবার জন্য ও কাঁদাকাটা করল কেন?

—কাল পরশু ফিরে আসবে।

ঝোঁকের মাথায় কাজটা করিয়া ফেলিয়া শ্যামার বড় ভয় আর অনুতাপ হইতেছিল, সে আবার বলিল—পাঠিয়ে অন্যায় করেছি। আর করব না।

শীতলের কাছে ত্রুটি স্বীকার করিতে আজকাল শ্যামার এমন বাধ বাধ ঠেকে! নিজে চারিদিকে সব ব্যবস্থা করিয়া করিয়া স্বভাবটা কেমন বিগড়াইয়া গিয়াছে, কোনো

বিষয়ে কারো কাছে যেন আর নত হওয়া যায় না। আর বকুলকে এমন ভাবে হঠাৎ বনগাঁয়ে পাঠাইয়াও দিয়াছে তো এই কারণে, মেয়ের উপর অধিকার জাহির করিতে। কাজটা যে বাড়াবাড়ি হইয়া গিয়াছে, ওরা রওনা হইয়া যাওয়ার পরেই শ্যামার তাহা খেয়াল হইয়াছে।

শীতল কিন্তু আজ চেঁচামেচি গালাগালি করিল না, করিলে ভাল হইত, ছড়ি দিয়া শ্যামাকে অমন করিয়া হয়তো সে তাহা হইলে মারিত না। মাথায় ছিটওলা মানুষ, যখন যা করে একেবারে চরম করিয়া ছাড়ে। শ্যামার গায়ে ছড়ির দাগ কাটিয়া কাটিয়া বসিয়া গেল।

মারিয়া শীতল বলিল—বজ্জাত মাগী, তোকে আমি কী শাস্তি দিই দেখ। এই গেল এক নম্বর। দু নম্বর শাস্তি তুই জন্মে ভুলবি না।

শাস্তি? আবার কি শাস্তি শীতল তাহাকে দিবে? তাহার স্বামী?

বিবাহের পরেই শ্যামা টের পাইয়াছিল শীতলের মাথায় ছিট আছে। পাগলের কাণ্ডকারখানা কিছু বুঝিবার উপায় নাই। পরদিন দশটার সময় নিয়মিতভাবে স্নানাহার শেষ করিয়া শীতল আপিসে গেল। বারটা একটার সময় ফিরিয়া আসিল। শ্যামাকে আড়ালে ডাকিয়া তাহার হাতে দিল একতাড়া নোট। শ্যামা গুনিয়া দেখিল, এক হাজার টাকা। এ কেমন শাস্তি? শীতল কি করিয়াছে, কি করিতে চায়?

—এ কিসের টাকা?—শ্যামা রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল।

শীতল বলিল—বাবু বোনাস দিয়েছেন। পরশু লাভের হিসাব হল কিনা, ঢের টাকা লাভ হয়েছে এবছর, আমার জন্যেই তো সব? তাই আমাকে এটা বোনাস দিয়েছেন।

এত টাকা! হাজার! আনন্দে শ্যামার নাচিতে ইচ্ছা হইতেছিল। সে বলিল, বাবু তো লোক বড় ভাল?—হ্যাঁগা, কাল বড্ড রেগেছিলে না? বড় মেরেছিলে বাবু কাল—পাষাণের মতো। ভাগ্যে কেউ টের পায় নি, নইলে কি ভাবত। আপিস যাবে নাকি আবার?

—যাই, কাজ পড়ে আছে। সাবধানে রেখো টাকা।

এই বলিয়া সেই যে শীতল গেল, আর আসিল না। দুদিন পরে মামা বনগাঁ হইতে একা ফিরিয়া আসিল।

—বুকু কই মামা?—শ্যামা জিজ্ঞাসা করিল।

মামা বলিল—কেন, শীতলের সঙ্গে আসে নি? শীতল যে তাকে নিয়ে এল?

তখন সমস্ত বুঝিতে পারিয়া শ্যামা কপাল চাপড়াইয়া বলিল, আমার সর্বনাশ হয়েছে মামা।

কে জানিত, পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে চারটি সন্তানের জননী শ্যামার জীবনে এমন নাটকীয় ব্যাপার ঘটিবে?

পাঁচ

বকুলকে সঙ্গে করিয়া শীতল চলিয়া গিয়াছে।

ফিরিয়া যদি সে না আসে, এ শাস্তি শ্যামা সত্যই জীবনে কখনো ভুলিবে না।

মামা বলিল—অত ভাবছিস কেন বল দিকি শ্যামা, রাগের মাথায় গেছে, রাগ পড়লে ফিরে আসবে। সংসারী মানুষ চাকরি-বাকরি ছেড়ে যাবে কোথা? আর ও-মেয়ে সামলানো কি তার কম্মো? দুদিনে হয়রান হয়ে ফিরতে পথ পাবে না।

শ্যামা বলিল—কি কাণ্ড করে গেছে মামা, সে-ই জানে। কাল অসময়ে আপিস থেকে ফিরে আমায় হাজার টাকার নোট দিয়ে গেল। বললে—আপিস থেকে বোনাস দিয়েছে। কাল তো বুঝতে পারি নি মামা, হঠাৎ এত টাকা বোনাস দিতে যাবে কেন, লাভের যা কমিশন পাবার সে তো ও পায়?

শ্যামার কিছু ভাল লাগে না, বুকের মধ্যে কি রকম করিতে থাকে, কিসে যেন চাপিয়া ধরিয়াছে বুকটা। কাজ করিয়া করিয়া এমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে অন্য মনে কলের মতো তাহা করিয়া ফেলা যায় তাই, না হইলে শ্যামা আজ শুইয়া থাকিত, সংসার হইত অচল। ন'টার সময় মিস্ত্রিরা কাজ করিতে আসিল, ঘর প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, আর সাত দিনের মধ্যে ঘর ব্যবহার করা চলিবে। বিধান খাইয়া স্কুলে গেল। মামাও সকাল সকাল খাইয়া, 'দেখি একটু খোঁজ করে', বলিয়া চলিয়া গেল। বাড়িতে রহিল শুধু শ্যামা আর তাহার দুই শিশুপুত্র, মণি ও ছোটখোকা,—যার নাম ফণীন্দ্র রাখা ঠিক হইয়াছে।

দুপুরবেলা প্রেসের একজন কর্মচারীর সঙ্গে শীতলের মনিব কমলবাবু আসিলেন।

রানীকে দিয়া পরিচয় পাঠাইয়া শ্যামার সঙ্গে দরকারি কয়েকটা কথা বলার ইচ্ছা জানাইলেন। তারপর নিজেই হাঁকিয়া শ্যামাকে শুনাইয়া বলিলেন, তিনি বুড়ো মানুষ, শীতলকে ছেলের মতন মনে করিতেন, তাঁর সঙ্গে কথা কহিতে শ্যামার কোনো লজ্জা নাই। লজ্জা শ্যামা এমনই করিত না, ঘোমটা টানিয়া সে বাহিরের ঘরে গেল। রানী সঙ্গে গিয়াছিল, কমলবাবু বলিলেন—তোমার ঝিকে যেতে বল মা।

রানী চলিয়া গেলে বলিলেন—শীতল ক'দিন বাড়ি আসে নি মা?

শ্যামা বলিল—বুধবার আপিসে গেলেন, তারপর আর ফেরেন নি।

ওইদিন একটার সময় শীতল যে বাড়ি ফিরিয়া তাহাকে টাকা দিয়া গিয়াছিল, শ্যামা সে কথা গোপন করিল।

একবারও আসে নি, দু-এক ঘণ্টার জন্যও?

—না।

—তোমায় টাকাকড়ি কিছু দিয়ে যায় নি?

—না।

কমলবাবুর গলাটি বড় মিষ্টি, ঘোমটার ভিতর হইতে আড়চোখে চাহিয়া শ্যামা দেখিল মুখের ভাবও তাঁহার শান্ত, নিস্পৃহ। শ্যামা সাহস পাইয়া বলিল—কোনো খবর না পেয়ে আমরা বড় ভাবনায় পড়েছি, আপনি যদি কিছু জানেন—

কমলবাবু বলিলেন—না বাছা, আমরা কিছুই জানি নে। জানলে তোমায় শুধোতে আসব কেন?

মনে হয় আর কিছু বুঝি তাহার বলিবার নাই, এইবার বিদায় হইবেন, কিন্তু কমলবাবু লোক বড় পাকা, কলিকাতায় ব্যবসা করিয়া খান। কথা না বলিয়া খানিকক্ষণ শ্যামাকে তিনি দেখেন। মনে যাদের পাপ থাকে এমনিভাবে দেখিলে তারা বড় অস্বস্তিবোধ করে, কাবু হইয়া আসে। তারপর তিনি একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অকস্মাৎ ভগবানের নামোচ্চারণ করেন, বলেন—এটি শীতলের ছেলে বুঝি? বেশ ছেলেটি, কি বল বীরেন?—এস তো বাবা আমার কাছে, এসো।—নাম বলতো বাবা? বল ভয় কি?—মণি? সোনামণি তুমি, না?—মণিকে এই সব বলেন আর আড়চোখে কমলবাবু শ্যামার দিকে তাকান। শ্যামা কাবু হইয়া আসে। ভাবে, হাজার টাকার কথাটা স্বীকার করিয়া কমল-

বাবুর পা জড়াইয়া ধরিবে নাকি ?

কমলবাবু বলেন—বাবা কোথায় গেছে মণি ? আপিস গেছে ? বাবা খালি আপিস যায়, ভারি দুষ্টু তো তোমার বাবা, কাল বাড়ি আসে নি বাবা ? আসে নি ? বড় পাজি বাবাটা, এলে মেরে দিও।—বাবা তবে তোমার বাড়ি এসেছিল কবে ? আসে নি ? একদিনও আসে নি ? দিদিকে নিয়ে বাবা পালিয়ে গেছে ?—

শ্যামা বলে—মেয়েকে নিয়ে বনগাঁ বোনের বাড়ি যাবেন বলেছিলেন, বোধ হয় তাই গেছেন।

কমলবাবু বনগাঁয়ে রাখালের ঠিকানা লিখিয়া লইলেন, মণির সম্বন্ধে আর তাঁহার কোনোরূপ মোহ দেখা গেল না। এবার কড়া সুরেই কথা বলিলেন। বলিলেন—স্বামী তোমার লোক ভাল নয় মা, সব জেনে শুনে ভান করছ কিনা আমরা জানি নে, তোমার স্বামী চোর,—সংসারে মানুষকে বিশ্বাস করে বরাবর ঠকেছি তবুও যে কেন তাকে বিশ্বাস করলাম। আমারই বোকামি, ভাবলাম, মাইনেতে কমিশনে মাসে দুশো আড়াইশ টাকা রোজগার করছে, সে কি আর সামান্য ক'হাজার টাকার জন্যে এমন কাজ করবে, মেশিন কেনার টাকাগুলো তাই দিলাম বিশ্বাস করে, তেমনি শিক্ষা আমায় দিয়েছে, চোরের স্বভাব যাবে কোথা ? তোমায় বলে যাই বাছা, এ ইংরেজ রাজত্ব, ক'দিন লুকিয়ে থাকবে ? পুলিসে এখনও খবর দিই নি, বোলো তোমার স্বামীকে, কালকের মধ্যে টাকাটা যদি ফিরিয়ে দেয় এবারের মতো ক্ষমা করব,—লোভে পড়ে কত ভাল লোক হঠাৎ অমন কাজ করে বসে, তাছাড়া এতকাল কাজ করে প্রেসের উন্নতি করেছে, পুলিসে-টুলিসে দেবার আমার ইচ্ছা নেই, বোলো এই কথা। কালকের দিনটা দেখে পরশু বাধ্য হয়েই পুলিসে খবর দিতে হবে।—কমলবাবু আবার শ্রান্তির একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সহসা ভগবানের নামোচ্চারণ করেন, বলেন—টাকাটা যদি তোমার কাছে দিয়ে গিয়ে থাকে ?—

শ্যামা নীরবে মাথা নাড়ে।

বিকালে মামা বাড়ি ফিরিলে শ্যামা তাহাকে সব কথা খুলিয়া বলিল। বাইশ বছর আগের কথা তুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—খুঁজে পেতে এক পাগলের হাতে আমায় সঁপে দিয়েছিলে মামা, সারাটা জীবন আমি জ্বলে

পুড়ে মরেছি, কত দুঃখ কষ্ট সয়ে কত চেষ্টায় সুখের সংসার গড়ে তুলেছিলাম, এবার তাও সে ভেঙে খান খান করে দিয়ে গেল, যন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে মেয়েটাকে তো মারছেই, আমাদেরও উপায় নেই, না খেয়ে মরতে হবে এবার, ছেলে নিয়ে কি করব আমি এখন, কি করে ওদের মানুষ করব ?

বলিল—পালিয়ে পালিয়ে আর বেড়াবে ক'দিন, ধরা পড়বেই। মেয়েটার তখন কি উপায় হবে মামা, সঙ্গে থাকার জন্য ওকেও দেবে না তো জেল-টেল ?

মামা বলিল—পাগল, ওইটুকু মেয়ের কখনো জেল হয়? শীতলকে যদি পুলিসে ধরেই, বকুলকে তারাই বাড়ি ফিরিয়ে দিয়ে যাবে।

সমস্ত বাড়িতে বিপদের ছায়া পড়িয়াছে, বিধান সব বুঝিতে পারে, মুখখানা তাহার শুকাইয়া বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। মণি কিছু বোঝে না, সেও অজানা ভয়ে স্তব্ধ হইয়া আছে। মিস্ত্রিরা বিদায় হইয়া যাওয়ার পর সকলের কাছে চারিদিক থমথম করিতে লাগিল। ছেলেদের খাইতে দেওয়া হইল না, উনানে আঁচ পড়িল না, সন্ধ্যার সময় একটা লণ্ঠন জ্বালিয়া দিয়া রানী বাড়ি চলিয়া গেল। লণ্ঠনের সামনে বিপন্ন পরিবারটি ম্লান-মুখে বসিয়া রহিল নীরবে, ছেলেরা ক্ষুধায় কাতর হইলে শ্যামা বাটিতে করিয়া তাহাদের সামনে কতগুলি মুড়ি দিয়া মুখ ঘুরাইয়া বসিল। তাহার সমস্ত সাধ-আহ্লাদ আশা-আনন্দ ভাঙিয়া পড়িয়াছে, কত বড় ভবিষ্যতকে সে মনে মনে গড়িয়া রাখিয়াছিল শ্যামা ভিন্ন কে তাহার খবর রাখে? পাগলের মতো উদয়াস্ত সে খাটিয়া গিয়াছে, শীতল তো শুধু টাকা আনিয়া দিয়া খালাস, কোনো দিন একটি পরামর্শ দেয় নাই, এতটুকু সাহায্য করিতে আসে নাই,—সংসার চালাইয়াছে সে, ছেলেমেয়ে মানুষ করিয়াছে সে, বাড়িতে ঘর তুলিতেছে সে, বিপদে আপদে বুক দিয়া পড়িয়া তাহার বুকের নীড়কে বাঁচাইয়াছে সে। এবার কি হইবে? বিধবা হইলে বুঝিতে পারিত ভগবান মারিয়াছেন, উপায় নাই। বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতো অকারণে একি হইয়া গেল? একটু কলহের জন্য মারিয়া সর্বাঙ্গে কালশিরা ফেলিয়াও শীতলের সাধ মিটিল না, সুখের সংসারে আগুন ধরাইয়া দিয়া গেল?

মামা ঘন ঘন তামাক টানে। ঘন ঘন বলে, এমন উন্মাদও সংসারে থাকে?—মামা বড় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। শ্যামা ও তাহার ছেলেদের ভারটা এবার মামার উপরেই পড়িবে বইকি? হায়, সন্ন্যাসী বিবাগী মানুষ,

বাইশ বছর সংসারের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক নাই, হতভাগাটা তাহাকে একি দুরবস্থায় ফেলিয়া গেল? বুড়ো বয়সে এই সবই তাহার অদৃষ্টে ছিল নাকি?... মামা এই সব ভাবে। অরণ্যে প্রান্তরে জনপদে তাহার দীর্ঘ যাযাবর জীবনের স্মৃতি মনে আসে, একটা গেরুয়া কাপড় পর, গায়ে একটা গেরুয়া আলখাল্লা চাপাও, গলায় ঝুলাইয়া দাও কতগুলি রুদ্রাক্ষ ও স্ফটিকের মালা, তারপর যেখানে খুশি যাও, আতিথ্য মিলিবে, অর্থ মিলিবে, ভক্তি মিলিবে, কত নারী দেহ দিয়া সেবা করিয়া পুণ্য অর্জন করিবে। ধার্মিকের অভাব কিসের? আজ ধনীর অতিথিশালায় শ্বেতপাথরের মেঝেতে খড়ম খটাখট করিয়া হাঁটা, কাল সম্মুখে অফুরন্ত পথ, ভুট্টা ক্ষেতের পাশ দিয়া, গ্রামের ভিতর দিয়া, বনের নিবিড় ছায়া ভেদ করিয়া, পাহাড় ডিঙ্গাইয়া মরুভূমির নিশ্চিহ্নতায়; সন্ধ্যায় গভীর ইঁদারার শীতল জল, সদ্য দোয়া ঈষদুষ্ণ দুধ, ঘিয়ে ভিজানো চাপাটি, আর ভীরু সলজ্জ গ্রাম্য কন্যাদের প্রণাম —একজনকে বাছিয়া বেশি কথা বলা, বেশি অনুগ্রহ দেখানো,—কে বলিতে পারে? মামা ভাবে, বুড়ো বয়সে দেশে ফিরিবার বাসনা কেন হইয়াছিল? আসিতে না আসিতে কি বিপদেই জড়াইয়া পড়িল।

মুখে কিন্তু মামা অন্য কথা বলে, বলে—এমন উন্মাদ সংসারে থাকে? আমি এসেছিলাম বলে তো, নইলে তুই স্ত্রী-পুত্রকে কার কাছে ফেলে যেতি রে হতভাগা? একেবারে কাণ্ডজ্ঞান নেই? স্ত্রী-পুত্রকে পরের ঘাড়ে ফেলে আপিসের টাকা চুরি করে মেয়ে নিয়ে তুই পালিয়ে গেলি?

শ্যামাই শেষে বিরক্ত হইয়া বলে—এখন আর ও কথা বলে লাভ কি হবে মামা? কি করতে হবে, না হবে পরামর্শ করি এসো।

অনেক রকম পরামর্শই তাহারা করে। মামা একবার প্রস্তাব করে যে শ্যামার কাছে কিছু যদি টাকা থাকে, হাজার দুই-তিন, ওই টাকাটা কমলবাবুকে দিয়া এখনকার মতো ঠাণ্ডা করা যায়, পরে শীতল ফিরিয়া আসিলে যাহা হয় হইবে। শ্যামা বলে, তাহার টাকা নাই, টাকা সে কোথায় পাইবে? তা ছাড়া শীতল যে ফিরিয়া আসিবে তার কি মানে আছে?...তখন মামা বলে, বাড়িটা বিক্রি করিয়া কমলবাবুকে টাকাটা দিয়া দিলে কেমন হয়, শীতল তাহা হইলে পুলিসের হাত হইতে বাঁচে।...শ্যামা বলে—যে শীতল যদি ফাঁসিও যায় বাড়ি সে বিক্রয় করিতে দিবে না।...এইকথা বলিয়া তাহার খেয়াল হয় যে ইচ্ছা থাকিলেও বাড়ি সে বিক্রয় করিতে

পারিবে না, বাড়ি শীতলের নামে। শুনিয়া মামা একেবারে হতাশ হইয়া বলে যে তা হলেই সর্বনাশ, টাকাগুলি খরচ করিয়া শীতল ফিরিয়া আসিয়াই বাড়িটা বিক্রয় করিয়া নিশ্চয় কমলবাবুর টাকাটা দিয়া বাঁচিবার চেষ্টা করিবে। শ্যামার মুখ শুকাইয়া যায়, সে কাঁদিতে থাকে।

পরামর্শ করিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারা যায় না, বেশির ভাগ আরো বেশি বেশি বিপদের সম্ভাবনাগুলি আবিষ্কৃত হইতে থাকে।

শেষে মামা এক সময় বলে—শ্যামা, সর্বনাশ করেছিস!—আপিসের টাকা থেকে শীতল তোকে দিয়ে যায় নি হাজার টাকা?

শ্যামা বলে—একথা জিজ্ঞেস করছ কেন মামা?

মামা বলে—কেন করছি তুই তার কি বুঝবি, পুলিসে বাড়ি সার্চ করবে না? নোট-টোট যদি দিয়ে গিয়ে থাকে তা বেরিয়ে পড়বে না? তোকে ধরে যে টানাটানি করবে রে?

শুনিয়া শ্যামার মুখ পাংশু হইয়া যায়—বলে, কি হবে মামা তবে?

এবার মামা সুপরামর্শ দেয়, বলে—দে দে, আমায় এনে দে টাকাগুলো, দেখ দিকি কি সর্বনাশ করেছিলি? ওরে নোটের যে নম্বর থাকে, দেখা মাত্র ধরা পড়বে ও-টাকা কমলবাবুর! ছি ছি, তোর একেবারে বুদ্ধি নেই শ্যামা, দে নোটগুলো আমি নিয়ে যাই, কলকাতায় মেসে হোটেলে ক'দিন গা ঢাকা দিয়ে থাকিগে। আস্তে আস্তে পারি তো নোটগুলো বদলে ফেলব, নয়তো দু-এক বছর এখন লুকানো থাক, পরে একটি দুটি করে বার করলেই হবে।

সেই রাত্রেই নোটের তাড়া লইয়া মামা চলিয়া গেল। শ্যামা বলিল—মাঝে মাঝে তুমি এলে কি ক্ষতি হবে মামা, পুলিস তোমায় সন্দেহ করবে?

মামা বলিল—আমায় কেন সন্দেহ করবে? আসব শ্যামা, মাঝে মাঝে আমি আসব।

রাত্রি প্রভাত হইল, শ্যামার ঘরের ছাদ পিটানোর শব্দে দিনটা মুখর হইয়া রহিল, দুদিন দুরাত্রি গেল পার হইয়া, না আসিল পুলিস, না আসিল মামা, না আসিল শীতল। শ্যামার চোখে জল পুরিয়া আসিতে লাগিল। কতকাল আগে তাহার বার দিনের ছেলেটি মরিয়া গিয়াছিল, তারপর আর তো কোনোদিন সে ভয়ঙ্কর দুঃখ পায় নাই, ছোটখাট দুঃখ-দুর্দশা যা আসিয়াছে স্মৃতিতে এতটুকু দাগ পর্যন্ত রাখিয়া যায়

নাই, সুখ ও আনন্দের মধ্যে কোথায় মিশাইয়া গিয়াছে। জীবনে তাহার গতি ছিল, কোলাহল ছিল, আজ কি স্তব্ধতার মধ্যে সেই গতি রুদ্ধ হইয়া গেল দেখো।

শ্যামা বসিয়া ভাবে। বকুল? কোথায় কি অবস্থায় মেয়েটা কি করিতেছে কে জানে! শীতলের সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, সময়ে হয়তো খাইতে পায় না, নরম বালিশ ছাড়া মেয়ে তাহার মাথায় দিতে পারিত না, কোথায় কি ভাবে পড়িয়া হয়তো এখন সে ঘুমায়, শীতল হয়তো বকে, চুপি চুপি অভিমানিনী লুকাইয়া কাঁদে! বিষ্ণুপ্রিয়ার মেয়ের দেখাদেখি বকুলের কত বাবুয়ানি ছিল, ময়লা ফ্রকটি গায়ে দিত না, মুখে সর মাখিত, লাল ফিতা দিয়া তাহার চুল বাঁধিয়া দিতে হইত, আঁচলে এক ফোঁটা অগুরু দিবার জন্য মার পিছনে পিছনে আব্দার করিয়া ঘুরিত। কে এখন জামায় তাহার সাবান দিয়া দেয়? কে চুলের বিনুনি করে? বকুলের মুখে কত ধূলা না জানি লাগে, আচল দিয়া সে শুধু মুখটি মুছিয়া ফেলে, কে দিবে দুধের সর!

দিন তিনেক পরে মামা আসিল। বলিল—সার্চ করে গেছে? করে নি? ব্যাপার তবে কিছু বোঝা গেল না শ্যামা, কি মতলব যেন করেছে কমলবাবু, আঁচ করে উঠতে পারছি না।

শ্যামা বলিল—টাকাটার কোনো ব্যবস্থা করে তুমি এসে থাকতে পার না মামা এখানে? এই পুলিস আসে, এই পুলিশ আসে, করে ভয়ে ভয়ে থাকি, এসে তারা কি করবে, কি বলবে, কে জানে, মার-ধোর করে যদি, জিনিসপত্র যদি নিয়ে চলে যায়?

মামা একগাল হাসিয়া বলিল—থাকব বলেই তো টাকার ব্যবস্থা করে এলাম রে।

—কোথায় রেখেছ?

—তুই চিনবি নে, মস্ত জমিদার। নতুন কাপড়ের পুলিন্দে করে সীলমোহর এঁটে জমা দিয়েছি, বলেছি গাঁয়ে আমার বাড়ি ঘর আছে না, তার দলিলপত্র,—ঘুরে ঘুরে বেড়াই হারিয়ে টারিয়ে ফেলব, তোমার সিন্দুকে যদি রেখে দাও বাবা? বড় ভক্তি করে আমায়, বলে, যোগ-তপস্যা সব ছেড়ে দিলেন, নইলে আপনি তো মহাপুরুষ ছিলেন, দীক্ষা নেব ভেবেছিলাম আপনার কাছে।...জানিস মা, পিঠের ব্যথাটা আবার চাগিয়েছে, ব্যথায় কাল ঘুম হয় নি।

—রানী একটু মালিশ করে দিক?—শ্যামা বলিল।

দশ বার দিন কাটিয়া গেল। বিষ্ণুপ্রিয়া একদিন শ্যামাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল,

রাগারাগি করিয়া মেয়ে লইয়া শীতল চলিয়া গিয়াছে—এই পর্যন্ত শ্যামা তাহাকে বলিয়াছে, টাকা চুরির কথাটি উল্লেখ করে নাই। বিষ্ণুপ্রিয়া সমবেদনা দেখাইয়াছে খুব, বলিয়াছে, ভেবে ভেবে রোগা হয়ে গেলে যে, ভেবো না ফিরে আসবে। বাড়ি-ঘর ছেড়ে ক'দিন আর থাকবে পালিয়ে ?—তারপর ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিয়াছে, সংসার খরচের টাকাকড়ি রেখে গেছে তো ?

শ্যামা জবাবে বলিয়াছে, কি কুক্ষণে যে দোতালায় ঘর তোলা আরম্ভ করেছিলাম দিদি, যেখানে যা ছিল কুড়িয়ে পেতে সব ওতেই ঢেলেছি, কাল কুলি মিস্ত্রির মজুরি দেব কি করে ভগবান জানে।—বলিয়া সজল চোখে সে নিশ্বাস ফেলিয়াছে।

তারপর বিষ্ণুপ্রিয়া খানিকক্ষণ ভাবিয়াছে, ভ্রূ কুঁচকাইয়া একটু যেন বিরক্ত এবং রুষ্টও হইয়াছে, শেষে উঠিয়া গিয়া হাতের মুঠায় কি যেন আনিয়া শ্যামার আঁচলে বাঁধিয়া দিয়াছে। কি লজ্জা তখন এ দুটি জননীর : চোখ তুলিয়া কেহ আর কারো মুখের দিকে চাহিতে পারে নাই।

বেশি কিছু নয়, পঁচিশটা টাকা। বাড়ি গিয়া শ্যামা ভাবিয়াছে, এ টাকা সে লইল কেমন করিয়া ? কেন লইল ? এখনি এমন কি অভাব তাহার হইয়াছে ? ভবিষ্যতে আর কি তাহার সাহায্য দরকার হইবে না যে এখনি মাত্র পঁচিশটা টাকা লইয়া বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিরক্ত করিয়া রাখিল ? তারপর শ্যামার মনে পড়িয়াছে টাকাটা সে নিজে চাহে নাই বিষ্ণুপ্রিয়া যাচিয়া দিয়াছে। নেওয়াটা তবে বোধহয় দোষের হয় নাই বেশি। বনগাঁয়ে মন্দাকে শ্যামা একদিন একখানা চিঠি লিখিল, সেই যে রাখাল সাতশ টাকা লইয়াছিল তার জন্য তাগিদ দিয়া। সে যে কত বড় বিপদে পড়িয়াছে এক পাতায় তা লিখিয়া, আরেকটা পাতা সে ভরিয়া দিল টাকা পাঠাইবার অনুরোধে। সব না পারুক, কিছু টাকা অন্তত রাখাল যেন ফেরত দেয়।—আমি কি যন্ত্রণায় আছি বুঝতে পারছ তো ঠাকুরঝি ভাই ? আমার যখন ছিল তোমাদের দিয়েছি, এখন তোমরা আমায় না দিলে হাত পাতব কার কাছে ?

দিন সাতেক পরে মন্দার চিঠি আসিল, অশ্রু সজল এত কথা সে চিঠিতে ছিল যে চাপ দিলে বুঝি ফোঁটা ফোঁটা ঝরিয়া পড়িত। দাদা কোথায় গেল, কেন গেল, শ্যামা কেন আগে লেখে নাই, কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন কেন দেয় নাই, দেশে দেশে খোঁজ করিতে কেন লোক ছুটায় নাই, এমন করিয়া চলিয়া

যাওয়ার সময় ছোট বোনটির কথা দাদার কি একবারও মনে পড়িল না? যাই হোক, সামনের রবিবার রাখাল কলিকাতা আসিতেছে, দাদাকে খোঁজ করার যা যা ব্যবস্থা দরকার সে-ই করিবে, শ্যামের কোনো চিন্তা নাই। টাকার কথা মন্দা কিছু লেখে নাই।

রবিবার সকালে রাখাল ভারি ব্যস্ত সমস্ত অবস্থায় আসিয়া পড়িল, যেন শীতলের পালানোর পর প্রায় একমাস কাটিয়া যায় নাই যা কিছু ব্যবস্থা সে করিতে আসিয়াছে, এক ঘন্টার মধ্যে সে সব না করলেই নয়। বাড়িতে পা দিয়াই বলিল—কি বৃত্তান্ত সব বল তো বৌঠান।

শ্যামা বলিল—বসুন, জিরোন, সব বলছি।

—জিরোব ?—জিরোবার কি সময় আছে!

মন্দার কাছে চিঠিতে শ্যামা শীতলের তহবিল তছরুপের বিষয়ে কিছু লেখে নাই, রাখালকে বলিতে হইল। রাখাল বলিল—শীতলবাবু এমন কাজ করবেন, এ যে বিশ্বাস হতে চায় না বৌঠান! রাগ করে চলে যাওয়া,—হঁ্যা সেটা সম্ভব, মানুষটা রাগী, কিন্তু—

অনেক কথাই হইল, অনেক অর্থহীন, কতক অবান্তর, কতক নিছক ব্যক্তিগত সমালোচনা ও মন্তব্য। আসল কথাটা আর ওঠেই না। শ্যামা রাখালের কথা তুলিবার অপেক্ষা করে, রাখাল ভাবে শ্যামাই কথাটা পাড়ুক; সারাটা সকাল তাহারা ঝোপের এদিক ওদিক লাঠি পিটাইল, ঝোপ হইতে বাঘ বাহির হইবে না পেখম তোলা ময়ূর বাহির হইবে, সকাল বেলা সেটা আর ঠাহর করা গেল না। বাড়িতে অতিথি আসিয়াছে, শ্যামা রাঁধিতে গেল। রাখাল গল্প জুড়িল মামার সঙ্গে। শ্যামা ভাবিল, কি আশ্চর্য পরিবর্তন আসে মানুষের জীবনে? খোলা মাঠে কি ভাবে হিংস্র শ্বাপদ-ভরা জঙ্গল গড়িয়া ওঠে কয়েকটা বছরে? মুখোমুখি বসিয়া আজ রাখালের মন ও তাহার মনের মুখদেখাদেখি নাই: দুজনের খোলা মনে যে জঙ্গল গিজগিজ করিতেছে, তারি মধ্যে দুজনে লুকোচুরি খেলিতেছে। না, ঠিক এভাবে শ্যামা ভাবে নাই? সে সোজাসুজি সাধারণ ভাবেই ভাবিল যে রাখাল কি স্বার্থপর হইয়া উঠিয়াছে!

জঙ্গলের রূপকটা তাহার অনুভূতি।

হ্যাঁ, মানুষ বদলায়। বদলায় না বাড়িঘর, বদলায় না জগৎ। এমনি শীতকালে একদিন রাত্রে বারান্দায় শীতলের বাড়ি ফেরার অপেক্ষায় শীতে তাহাকে কাঁপিতে দেখিয়া রাখাল নিজের গায়ের আলোয়ান গায়ে জড়াইয়া দিয়াছিল, হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া বলিয়াছিল, বৌঠান তুমি শোও, আমি দরজা খুলে দেব।...শ্যামার সব মনে আছে, সে সব ভুলিবার কথা নয়। রাখাল তাকে যেন দামী পুতুল মনে করিত, এতটুকু আঘাত লাগিলে সে যেন ভাঙিয়া যাইবে এমনি যত্ন ছিল রাখালের। অসুখ হইলে কপালে হাত বুলানোর আর তো কেহ ছিল না তাহার রাখাল ছাড়া!

টাকার কথাটা দুপুরে উঠিয়া পড়িল, রাখাল মাথা নিচু করিয়া বলিল, জান তো বৌঠান আমার রোজকার? পঁচানব্বই টাকা মাইনে পাই, দুটো সংসার ছেলেমেয়ে, কোনো মাসে ধার হয়। একটা বোনের বিয়ে দিয়েছি, এখনও একটা বাকি, তারও বয়স হল। দু-এক বছরের মধ্যে তার বিয়ে না দিলেও চলবে না,—এখন কি করে তোমার টাকা দিই বৌঠান?—তোমার অবস্থা বুঝি, আমার অবস্থা বুঝে দেখো।

সুতরাং তাহাদের কলহ বাধিয়া গেল, খানিক পরেই। এমন শীতের দিনে জলে হাত ভিজাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া হঠাৎ পরস্পরের গায়ে দিয়া একদিন তাহারা হাসাহাসি করিত, টাকার জন্য তাহাদের কলহ? একি আশ্চর্য কথা যে সেদিনের স্মৃতি তাহারা ভুলিয়া গেল, সংসারে রূঢ় বাস্তবতার মধ্যে যে ইতিহাস স্মরণ করা মাত্র দুদিন আগেও যাহারা অবাস্তব স্বপ্ন দেখিতে পারিত? শ্যামা কড়া কড়া অপমানজনক কথা বলিল, সেই সাত শত টাকার উল্লেখ করিয়া রাখালকে সে একরকম জুয়াচোর প্রতিপন্ন করিয়া দিল। রাখাল জবাবে বলিল, শ্যামা যদি মনে করিয়া থাকে নিজের হকের ধন ছাড়া শীতলের কাছে কোনো দিন সে একটি পয়সা নিয়াছে, শীতল জেল হইতে ফিরিলে শ্যামা যেন আর একবার তাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখে। শ্যামা বলিল, হকের ধন কিসে? রাখাল বলিল, শ্যামা তার কি জানিবে? মন্দার বিবাহ দিবার সময় শীতল যে জুয়াচুরি করিয়াছিল, রাখাল বলিয়াই সেদিন তাহার জাত বাঁচাইয়াছিল, আর কেহ হইলে বিবাহসভা হইতে উঠিয়া যাইত। শীতল অর্ধেক গয়না দেয় নাই, পণের টাকা দেয় নাই একটি পয়সা। তারপর সেই গোড়ার দিকে প্রেসের কি সব কিনিবার জন্য ভুলাইয়া সে যে রাখালের

পাঁচশত টাকা লইয়া এক পয়সা কোনোদিন ফেরত দেয় নাই শ্যামা কি তা জানে? সংসারে কে কেমন লোক জানিতে রাখালের আর বাকি নাই।

এই সব কথার আদান-প্রদান করিবার পর দুজনে বড় বিষণ্ণ হইয়া রহিল। রাখাল বিদায় হইল বিকালে।

শ্যামা বলিল—ঠাকুরজামাই! ভাবনায় চিন্তায় মাথা আমার খারাপ হয়ে গেছে, রাগের সময় দুটো মন্দ কথা বলেছি বলে আপনিও আমায় এই বিপদের মধ্যে ফেলে চললেন?

রাখাল বলিল—না না, সে কি কথা বৌঠান, রাগ কেন করব? তুমিও দুটো কথা বলেছ, আমিও দুটো কথা বলেছি, ওইখানেই তো মিটে গেছে—রাগারাগির কি আছে?

শ্যামা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—আপনারাই এখন আমার বল ভরসা, আপনারা না দেখলে কে আমায় দেখবে? ছেলেমেয়ে নিয়ে আমি ভেসে যাব ঠাকুরজামাই।

—বড়দিনের ছুটিতে আবার আসব বৌঠান—রাখাল বলিল।

গতবার বড়দিনের ছুটিতে সে আসিয়াছিল। এবারও আসিবে বলিয়া গেল। রাখাল? সেই রাখাল? একদিন যে ছিল তাহার বন্ধুর চেয়েও বড়?

শীতের হ্রস্ব দিনগুলি শ্যামার কাছে দীর্ঘ হইয়া উঠিয়াছে, দীর্ঘ রাত্রিগুলি হইয়াছে অন্তহীন। শীতলের বিছানা খালি, বকুলের বিছানা খালি। কি ভঙ্গি করিয়া মেয়েটা শুইত, ফুলের মতো দেখাইত না তাহাকে? গায়ে লেপ থাকিত না, শীতে মেয়েটা কুণ্ডলী পাকাইয়া যাইত, শুইতে আসিয়া রোজ শ্যামা তাহার গায়ে লেপ তুলিয়া দিত। জাগিয়া থাকে, চোখ দিয়া জল পড়ে। আর তো মেয়ে নাই শ্যামার, ওই একটি মেয়ে ছিল। আর কী সে মেয়ে! শ্যামার এই ছোট বাড়িতে অতটুকু মেয়ের প্রাণ যেন আঁটিত না। ও যেন ছিল আলো, ঘরের চারিদিক উজ্জ্বল করিয়া জানালা দিয়া বাহিরে ছড়াইয়া পড়িত। সে অত প্রচুর ছিল বলিয়া শ্যামা বুঝি তাকে তেমন আদর করিত না? বকুল, ও বকুল, কোথায় গেলি তুই বকুল?

একদিন রাত্রে কে যেন পথের দিকের জানালায় টোকা দিতে লাগিল। শ্যামা

জানালার খড়খড়ি ফাঁক করিয়া বলিল—কে?

মৃদুস্বরে উত্তর আসিল, আমি শ্যামা আমি, দরজা খোলো।

জানালা খুলিয়া দেখিল, শীতল। একা নয়, সঙ্গে বকুল আছে। দরজা খুলিয়া ওদের সে ভিতরে আনিল, বকুলকে আনিল কোলে করিয়া। বকুলের গায়ে একটা আলোয়ান জড়ানো, এই শীতে কি আলোয়ানে কিছু হয়, শ্যামার কোলে বকুল থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। শ্যামার মনে হইল মেয়ে যেন তাহার হাল্কা হইয়া গিয়াছে। ঘরে আসিয়া আলোতে বকুলের মুখ দেখিয়া শ্যামা শিহরিয়া উঠিল। ঠোঁট ফাটিয়া, গাল ফাটিয়া, মরা চামড়া উঠিয়া কি হইয়া গিয়াছে বকুলের মুখ! শ্যামা কথা কহিল না, লেপ কাঁথা যা হাতের কাছে পাইল তাই দিয়া জড়াইয়া মেয়েকে কোলে করিয়া বসিল, গায়ের গরমে একটু তো গরম পাইবে?

বকুল তো এমন হইয়াছে, শীতল? মাথায় মুখে কম্ফাটার জড়াইয়া আসিয়াছিল, সেটা খুলিয়া ফেলিতে শ্যামা দেখিল তার চেহারা তেমনি আছে, পুলিসের তাড়ায় পথে বিপথে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। গায়ে তাহার দামী নূতন গরম কোট, চাদরটাও নূতন। না, শীতলের কিছু হয় নাই। মেয়েটার অদৃষ্টে দুঃখ ছিল, সেই শুধু আধ-মরা হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

—ওর জ্বর হয়েছিল।—শীতল বলিল।

জ্বর? তাই বটে, অসুখ না হইলে মেয়ে কেন এত রোগা হইয়া যাইবে? শ্যামা শীতলের মুখের দিকে চাহিলে, চোখ দিয়া তাহার জল গড়াইয়া পড়িল ধরা গলায় বলিল—জন্মে থেকে ওর একদিনের জন্য গা গরম হয় নি।

শীতল কি তাহা জানে না? এ তাহাকে অনর্থক লজ্জা দেওয়া। শ্যামা এবার তাহার প্রতিকারহীন অপকীর্তির কথা তুলুক, তাহা হইলেই গৃহে প্রত্যাবর্তন তাহার সফল হয়। পরস্পরের দিকে চাহিয়া তাহারা যেন শত্রুতার পরিমাপ করিতে লাগিল। শ্যামার কি করিয়াছে শীতল? প্রেসের টাকা যদি সে চুরি করিয়া থাকে, সেজন্য জেলে যাইবে সে। সে স্বাধীন মানুষ নয়? শ্যামার তো সে কোনো ক্ষতি করে নাই! বরং বাইশ বছর মাসে মাসে ওকে সে টাকা আনিয়া দিয়াছে। এবার যদি সে ছুটিই নেয়, কি বলিবার আছে শ্যামার? এমন সব কথা ভাবিতে গিয়া শীতলের বুঝি চোখ পড়িল ঘুমন্ত ছেলে দুটির দিকে, মণি আর ছোট খোকা যার নাম ফণীন্দ্র, বকুলের গায়ে জড়ানোর জন্য ওদের গা হইতে লেপটা

শ্যামা ছিনাইয়া লইয়াছে। ওদের দেখিয়া শুধু নয়, কবে শীতল ভুলিতে পারিয়াছিল তার চেয়ে পরাধীন কেহ নাই, সৃষ্টিতত্ত্বের সে গোলাম, জেলে যাওয়ার, মরিয়া যাওয়ার অধিকার তাহার নাই, সে পাগল বলিয়াই না এ কথা ভুলিয়া গিয়াছে? জানালা বন্ধ ঘরে শীতলের শুব্ধ রাত্রি, এই ঘরে দায়ে পড়া স্নেহ মমতার সঙ্গে সুখ-শান্তির বিরাট সমন্বয়টা দিনে আসিলে বোঝা যাইত না। এই ঘরে এমনি শীতের রাত্রে লেপ মুড়ি দিয়া সে কতকাল ঘুমাইয়াছে। তুচ্ছ তুলার তোশকে, তুচ্ছ দৈনন্দিন ঘুম আজ কত দুর্লভ?

ধীরে ধীরে তাহারা কথা বলিতে লাগিল দুজনের মাঝে যেন দুস্তর ব্যবধান। একজন কথা বলিলে এতটা দূরত্ব অতিক্রম করিয়া আরেক জনের কাছে পৌঁছিতে যেন সময় লাগে।

শ্যামা বলিল—টাকা কি সব খরচ করে ফেলেছ?

শীতল বলিল—না, দু-চারশো বোধ হয় গেছে মোটে।

শ্যামা বলিল—তাহলে কালকেই তুমি যাও, কমলবাবুর হাতে পায়ে ধরে পড় গিয়ে, টাকা ফিরে পেলে তিনি বোধ হয় আর গোলমাল করবেন না।

শীতল বলিল—যদি করেন গোলমাল? তাহলে টাকাও যাবে, জেলও খাটব। তার চেয়ে আমার পালানোই ভাল। তোমায় যে টাকা দিয়ে গেছি তাইতেই এখন চলবে, আমি পশ্চিমে চলে যাই, সেখানে দোকান-টোকান দিয়ে যা করে হোক রোজগারের একটা পথ করে নিতে পারব, মাঝে মাঝে দেশে এসে এমনি রাত দুপুরে তোমার সঙ্গে দেখা করে টাকা পয়সা দিয়ে যাব। তারপর দু-চার বছর কেটে গেলে বাড়িটা বিক্রি করে তোমরা এদিক-ওদিক কিছুদিন ঘুরে আমি ফিরে যেখানে থাকব সেইখানে চলে যাবে। ছ হাজার টাকার তো মামলা, কে আর অতদিন মনে করে রাখবে, কমলবাবুও ভুলে যাবে, পুলিসেও খোঁজটোজ আর নেবে না।

শ্যামা বলিল—বাড়ি বিক্রি করব কি করে? বাড়ি তো তোমার নামে।

এতক্ষণে শীতল একটু হাসিল, বলিল—সে আমি তোমায় কবে দান করে দিয়েছি খুকী হবার সময় আমার একবার অসুখ হয়েছিল না?—সেইবার। আমার বাড়ি হলে কমলবাবু এতক্ষণ বাড়ি বিক্রি করে টাকা আদায় করে নিত।

শ্যামার মনে হয়, শীতলকে সে চিনতে পারে নাই। মাথায় একটু ছিট আছে, ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ যা তা করিয়া বসে কিন্তু বুকখানা স্নেহ-মমতায় ভরপুর।

ঘণ্টা দুই পরে সাব ইনসপেক্টর রজনী ধর আসিলেন। ভারি অমায়িক লোক। হাসিয়া বলিলেন, না মশাই না, দেশে দেশে আপনাকে আমরা খুঁজে বেড়াই নি, যত বোকা ভাবেন আমদের, অত বোকা আমরা নই বি-এ এম এটা আমরাও তো পাশ করি? আপনার বাড়িটাতে শুধু একটু নজর রেখেছিলাম—আমি নই, আমি মশাই থানায় ঘুমোচ্ছিলাম—অন্য লোক। আপনি একদিন আসবেন তা জানতাম,—সবাই আসে, স্ত্রী পরিবারের মায়া, বড় মায়া মশাই। টাকাগুলো আছে নাকি পকেটে? দেখি একবার হাতড়ে।—না থাকে তো নেই, টাকার চেয়ে আপনাকেই আমাদের দরকার বেশি, আপনাকে পাওয়া আর দুশোটি টাকা পাওয়া সমান কিনা।—জানেন না বুঝি? আপনার জন্যে কমলবাবু যে দুশো টাকা পুরস্কার জমা দিয়েছেন।—নইলে এই শীতের রাত্রে বিছানা ছেড়ে উঠে এসেও আপনার সঙ্গে এমন মিষ্টি মিষ্টি কথা কই?

শ্যামার কান্না, ছেলেমেয়ের কান্না সর্বসমেত পাঁচটি প্রাণীর কান্নার মধ্যে শীতলকে লইয়া সাব-ইন্‌সপেক্টর চলিয়া গেল।

মামা বলিল—কাঁদিস নে শ্যামা, কাল জামিনে খালাস করে আনব। তারপর চুপি চুপি বলিল, কি মুখ্যু দেখলি? টাকাগুলো পকেটে করে নিয়ে এসেছে! নিজেও গেলি, টাকাও গেল,—গেল তো?

ছয়

শীতলের জেল হইয়াছে দু বছর।

শ্যামা একজন ভাল উকিল দিয়াছিল। শীতলের এই প্রথম অপরাধ। টাকাও কমলবাবু প্রায় সব ফিরিয়া পাইয়াছিলেন,—শ্যামা যে হাজার টাকা লুকাইয়া ফেলিয়াছিল আর শীতল যে শ'তিনেক খরচ করিয়াছিল, সেটা ছাড়া। জেল শীতলের ছ মাস হইতে পারিত, এক বছর হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু শীতলের কিনা মাথায় ছিট আছে, বিচারের সময় হাকিমকে সে যেন একদিন কি সব বলিয়াছিল,—যেসব কথা মানুষকে খুশী করে না। তাই শীতলকে হাকিম কারাবাস

দিয়াছিলেন আঠার মাস আর জরিমানা করিয়াছিলেন দু হাজার টাকা,—অনাদায়ে আরও দশ মাস কারাবাস। জরিমানা দিলে কমলবাবু অর্ধেক পাইতেন, অর্ধেক যাইত সরকারি তহবিলে। এই জরিমানার ব্যাপারটা শ্যামাকে ক'দিন বড় ভাবনায় ফেলিয়াছিল। মামা না থাকিলে সে কি করিত বলা যায় না, বকুলকে শীতল যেদিন গভীর রাত্রে ফিরাইয়া দিতে আসিয়াছিল, সেদিন দুটি ঘণ্টা সময়ের মধ্যে তাদের যেন একটা অভূতপূর্ব ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া গিয়াছিল, দুই যুগ একত্র বাস করিয়াও তাহাদের যাহা আসে নাই। স্বামীর জন্য সে-রাত্রে বড় মমতা হইয়াছিল শ্যামার। কিন্তু মামা তাহকে বুঝাইয়া দিয়াছিল জরিমানার টাকা দেওয়াটা বড় বোকামির কাজ হইবে, বিশেষত বাড়ি বাঁধা না দিয়া যখন পূরা টাকাটা যোগাড় হইবে না—টাকা কই শ্যামার? হাজার টাকার নম্বর দেওয়া নোটগুলি তো এখন বাহির করা চলিবে না। বাহির করা চলিলেও আরেক হাজার টাকা?—কাজ নাই ওসব দুর্বুদ্ধি করিয়া। আঠার মাস যাকে কয়েদ খাটিতে হইবে, সে আর দশ মাস বেশি কাটাইতে পারিবে না জেলে! দশ মাসই বা কেন? বছরে ক'মাস জেল যে মকুব হয়। তারপর, শেষের চার-ছ মাস জেলে থাকিতে কয়েদীর কি আর কষ্ট হয়? তখন নামে মাত্র কয়েদী, সকালে বিকালে একবার নাম ডাকে, তারপর কয়েদীর যেখানে খুশি যায়, যা খুশি করে,—রাজার হালে থাকে।

—বাড়িতেও তো আসতে পারে, তবে এক-আধ ঘণ্টার জন্যে?

—না, তা পারে না, জেলের বাইরে আসতে দেয়, দুদণ্ড দাঁড়িয়ে এর ওর সঙ্গে কথা বলতে দেয়া, তাই বলে নজর কি রাখে না একেবারে? তাছাড়া কয়েদীর পোশাক পরে কোথায় যাবে?—কেউ ধরে এনে দিলে তো শেষ পর্যন্ত দাঁড়াবে, পালিয়ে যাচ্ছিল!—আবার দেবে ছ-মাস ঠুকে! জেলের কাণ্ডকারখানার কথা আর বলিস নে শ্যামা, মজার জায়গা জেল,—শীতল যত কষ্ট পাবে ভাবছিস, তা সে পাবে না, ওই প্রথম দিকে একটু যা মনের কষ্ট।

উৎসাহের সঙ্গে গড়গড় করিয়া মামা বলিয়া যায়, অবাধ অকুণ্ঠ! কত অভিজ্ঞতাই জীবনে মামা সংগ্রহ করিয়াছে!

শ্যামা সজল চোখে বলিয়াছিল,—এত খবর তুমি জান মামা! তুমি না থাকলে কি যে করতাম আমি, ভেবে ভেবে পাগল হয়ে যেতাম।—বছরে ক'মাস কয়েদ মুকুব করে মামা? ভাল হয়ে থাকলে বোধ হয় শিগ্‌গির ছেড়ে দেয়—একদিন

গিয়ে দেখা করে বলে আসব, ভাল হয়েই যেন থাকে।

পাড়ায় ব্যাপারটা জানাজানি হইয়া গিয়াছে। পাড়ার যেসব বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে শ্যামার জানাশোনা ছিল, শ্যামার সঙ্গে তাহাদের ব্যবহারও গিয়াছে সঙ্গে সঙ্গে বদলাইয়া। কেহ সহানুভূতি দেখায়, নীরবে ও সরবে। কেহ কোনো রকম অনুভূতিই দেখায় না, বিস্ময়, সমবেদনা, অবহেলা, কিছুই নয়। পাড়ার নকুড়বাবুর পরিবারের সঙ্গে শ্যামার ঘনিষ্ঠতা ছিল বেশি, এখন ওদের বাড়ি গেলে ওরা বসিতে বলিতে ভুলিয়া যায়, সংসারের কাজের চেয়ে শ্যামার দিকে নজর একটু বেশি দিতে মনে থাকে না, কথা বলিতে বলিতে ওদের কেমন উদাস বৈরাগ্য আসে, কত যেন শ্রান্ত ওরা, চোয়াল ভাঙ্গিয়া এখুনি হাই উঠিবে। শ্যামার বাড়িতে যারা বেড়াইতে আসিত, তাদের মধ্যে তারাই শুধু আসা যাওয়া সমানভাবে বজায় রাখিয়াছে, এমনি কি বাড়াইয়াও দিয়াছে—যারা আসিলে শ্যামার সম্মান নাই, না আসিলে নাই অপমান।

বিধান এতকাল শঙ্করের সঙ্গে বাড়ির গাড়িতে স্কুলে গিয়াছে, একদিন দশটার সময় বই-খাতা লইয়া বাহির হইয়া গিয়া খানিক পরে সে আবার ফিরিয়া আসিল। শ্যামা জিজ্ঞাসা করিল,স্কুলে গেলি নে?

—শঙ্করকে নিয়ে গাড়ি চলে গেছে মা!

—তোকে না নিয়ে চলে গেল? কেন রে খোকা দেরি করে তো যাস নি তুই?

পরদিন আরও সকাল সকাল বিধান বাহির হইয়া গেল, আজও সে ফিরিয়া আসিল খানিক পরেই, মুখখানা শুকনো করিয়া। শ্যামা তখন বকুলকে ভাত দিতেছিল। সে বলিল, আজকেও গাড়ি চলে গেছে নাকি খোকা?

বিধান বলিল—ড্রাইভার আমাকে গাড়িতে উঠতে দিলে না মা, বললে, মাসিমা বারণ করে দিয়েছে—

এমন টনটনে অপমান জ্ঞান বিধানের? থামের আড়ালে সে লুকাইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, সে যেন অপরাধ করিয়া কার কাছে মার খাইয়া আসিয়াছে। শ্যামা বকুলকে ভাত দিয়া রান্নাঘরে পলাইয়া যায়, অতবড় ছেলে তাহার অপমানিত হইয়া ঘা খাইয়া আসিল, ওকে সে মুখ দেখাইবে কি করিয়া?

দুপুরবেলা শ্যামা বিষ্ণুপ্রিয়ার বাড়িতে গেল। দোতলায় বিষ্ণুপ্রিয়ার নিভৃত শয়নকক্ষ, সিঁড়ি দিয়া শ্যামা উপরে উঠিতে যাইতেছিল, রান্নাঘরের দাওয়া

হইতে বিষ্ণুপ্রিয়ার ঝি বলিল—কোথা যাচ্ছ মা হনহন করে? যেও নি, গিন্নীমা ঘুমুচ্ছে,—এমনি ধারা সময় কারো বাড়ি কি আসতে আছে যাও মা এখন, বিকেলে এসো।

শ্যামা বলিল—দিদির হাসি শুনলাম যে ঝি? জেগেই আছেন।

ঝি বলিল—হাসি শুনবে নি তো কি কান্না শুনবে মা? ওপরে এখন যেতে মানা, যেও না।

শ্যামা অগত্যা বাড়ি ফিরিয়া গেল। ভাবিল, পাঁচটার সময় আর একবার আসিয়া বলিয়া দেখিবে, উপায় কি, বিধানের তো স্কুলে না গেলে চলিবে না? বাড়ি ফিরিতেই বিধান বলিল, কোথা গিয়েছিলে মা?

—ওই ওদের বাড়ি।

কাদের বাড়ি, বিধান জিজ্ঞাসা করিল না। ছেলেবেলা হইতে শ্যামা এই ছেলেটিকে অদ্ভুত বলিয়া জানে, রহস্যময় বলিয়া জানে, ছ বছর বয়সে এই ছেলে তাহার উদাস নয়নে দুর্বোধ্য স্বপ্ন দেখিত, ডাকিলে সাড়া মিলিত না। কথা কহিয়া, খেলা দিয়া না যাইত হাসানো, না চলিত ভোলানো। আর নিষ্ঠুর? সময় সময় শ্যামার মনে হইত, ছেলে যেন পাষাণ,—রক্তমাংসে তৈরি বুক ওর নাই। তারপর ওর প্রকৃতির কত বিচিত্র দিক স্পষ্ট হইয়া উঠিয়া আবার ওর মধ্যেই কোথায় লুকাইয়া গিয়াছে,—একটির পর একটি দুর্বোধ্যতা, রাশি রাশি মুখোশ পরিয়া যেন জন্মিয়াছিল, একে একে খুলিয়া চলিয়াছে, ওর আসল পরিচয় আজও শ্যামা চিনিল না। কত সময় সে ভয় পাইয়া ভাবিয়াছে, বাপের পাগলামিই কি ছেলের মধ্যে প্রবলতর হইয়া দেখা দিতেছে, ও কি একদিন পাগল হইয়া যাইবে? অত কি ভাবে ও? সময় সময় জননীর উন্মাদ ভালবাসাকে কেমন করিয়া দু পায়ে মাড়াইয়া চলে অতটুকু ছেলে! বিধানকে মনে মনে শ্যামা ভয় করে। বিষ্ণুপ্রিয়ার বাড়ি যাওয়ার কথা ওকে বলিতে পারিল না।

বিধান বলিল—ওদের গাড়িতে আমি আর স্কুলে যাব না মা, কখ্খনো কোনোদিন যাব না।

—ওরা যদি আদর করে ডাকতে আসে?

—ডাকতে এলে মেরে তাড়িয়ে দেব।

শুনিয়া শ্যামারও মনে হইল, এই তো ঠিক, অত অপমান তাহারা সহিবে

কেন? যাদের মোটর নাই, ছেলে কি তাদের স্কুলে যায় না? সহসা উদ্ধত আত্মসম্মান-জ্ঞানে শ্যামার হৃদয় ভরিয়া গেল। না, শঙ্করের সঙ্গে গাড়িতে তাহার ছেলেকে স্কুলে যাইতে দেওয়ার জন্য বিষ্ণুপ্রিয়ার তোষামোদ সে করিবে না।

পরদিন মামার সঙ্গে ছেলেকে সে স্কুলে পাঠাইয়া দিল। বলিল, এ মাসের ক'টা দিন মোটে বাকি আছে, এ ক'টা দিন ট্রামে নগদ টিকিট কিনে ওকে স্কুলে দিয়ে এসো, নিয়ে এসো মামা, এ ক'দিন তোমার সঙ্গে এলে গেলে তারপর ও নিজেই যাতায়াত করতে পারবে, মাস কাবারে কিনে দেব একটা মাসিক টিকিট।

বিধান অবজ্ঞার সুরে বলিল—মা তুমি খালি ভাব। আমার চেয়ে কত ছোট ছেলে একলা ট্রামে চেপে স্কুলে যায়। আমি যেখানে খুশি যেতে পারি মা,—যাই নি ভাবছ? ট্রামে কদ্দিন গেছি চিড়িয়াখানায় চলে।

শ্যামা স্তম্ভিত হইয়া বলিল—স্কুল পালিয়ে একলাটি তুই চিড়িয়াখানায় যাস্ খোকা!

বিধান বলিল—রোজ নাকি? একদিন দুদিন গেছি মোটে—স্কুল পালাই নি তো। প্রথম ঘণ্টা ক্লাশ হয়ে কদ্দিন আমাদের ছুটি হয়ে যায়, ক্লাশের একটা ছেলে মরে গেলে আমরা বুঝি স্কুল করি? এমনি হৈ-চৈ করি যে, হেডমাষ্টার ছুটি দিয়ে দেয়।

প্রথম প্রথম শীতলের জন্য বকুল কাঁদিত। দোতলার ঘরখানা শ্যামা তাহাদের শয়নকক্ষ করিয়াছে, দামী জিনিসপত্রের বাক্স প্যাঁটরা, বাড়তি বাসনকোসনও ওই ঘরে থাকে, সকালে বিকালে ও ঘরে কেহ থাকে না, শুধু বকুল আপন মনে পুতুল খেলা করে। পুতুল খেলিতে খেলিতে বাবার জন্য নিঃশব্দে সে কাঁদিত, মনের মানুষকে না দেখাইয়া অতটুকু মেয়ের গোপন কান্না স্বাভাবিক নয়, কি মন বকুলের কে জানে! কোনো কাজে উপরে গিয়া শ্যামা দেখিত মুখ বাঁকাইয়া চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে বকুল তাহার পুতুল-পরিবারটিকে খাওয়াইতে বসাইয়াছে। মেয়ে কার জন্য কাঁদে, শ্যামা বুঝিতে পারিত, এ বাড়িতে সেই জেলের কয়েদীটাকে ও ছাড়া আর তো কেহ কোনোদিন ভালবাসে নাই। মেয়েকে ভুলাইতে

গিয়া শ্যামারও কান্না আসিত।

মেয়েকে কোলে করিয়া পুরনো বাড়ির ছাদে নূতন ঘরে ঝকৃঝকে দেয়ালে ঠেস্ দিয়া শ্যামা বসিত, বুজিত চোখ। শ্যামার কি শ্রান্তি আসিয়াছে? আগের চেয়ে খাটুনি এখন কত কম, তাই সম্পন্ন করিতে সে কি অবসন্ন হইয়া পড়ে।

শীতলের জেলে যাইতে যাইতে শীত কমিয়া আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল, শীতলের জেলে যাওয়াটা অভ্যাস হইয়া আসিতে আসিতে শহরতলী যেন বসন্তের সাড়া পাইয়াছে। ধানকলের চোঙাটার কুণ্ডলী-পাকানো ধোঁয়া উত্তরে উড়িয়া যায়, মধ্যাহ্নে যে মৃদু উষ্ণতা অনুভূত হয়, তাহা যেন যৌবনের স্মৃতি। শ্যামার কি কোনোদিন যৌবন ছিল? কি করিয়া সে চারটি সন্তানের জননী হইয়াছে, শ্যামার তো তা মনে নাই! আজ সে দারুণ বিপন্ন, স্বামী তার জেল খাটিতেছে, উপার্জনশীল পুরুষের আশ্রয় তাহার নাই, ভবিষ্যৎ তাহার অন্ধকার, শহরতলীতে বন-উপবনের বসন্ত আসিলেও জীবনে কবে তাহার যৌবন ছিল, তা কি শ্যামার মনে পড়া উচিত। কি অবান্তর তার বর্তমান জীবনে এই বিচিত্র চিন্তা। মুমূর্ষুর কাছে যে নামকীর্তন হয়, এ যেন তারই মধ্যে সুর তাল লয় মান খুঁজিয়া বেড়ানো।

জেলের কয়েদী বাপের জন্য যে মেয়ের চোখের জল, তাকে কোলে করিয়া স্বামীর বিরহে সকাতর হওয়া কর্তব্য কাজ, কিন্তু জননী শ্যামা, তুমি আবার ছেলে চাও, শুনিলে দেবতারা হাসিবেন যে, মানুষ যে ছি ছি করিবে।

মামা বলে—এইবার উপার্জনের চেষ্টা শুরু করি শ্যামা, কি বলিস?

শ্যামা বলে—কি চেষ্টা করবে?

মামা রহস্যময় হাসি হাসিয়া বলে—দেখ না কি করি। কলকাতায় উপার্জনের ভাবনা। পথে ঘাটে পয়সা ছড়ানো আছে, কুড়িয়ে নিলেই হল।

—একটা দুটো করে নোটগুলো বদলানো আরম্ভ করলে হয় না?

—তুই ভারি ব্যস্তবাগীশ শ্যামা। থাক না, নোট কি পালাচ্ছে? সংসার তোর অচলও তো হয় নি বাবু এখনো!

—হয় নি, হতে আর দেরি কত?

—সে যখন হবে, দেখা যাবে তখন, এখন থেকে ভেবে মরিস কেন?

মামার সম্বন্ধে শ্যামা একটু হতাশ হইয়াছে। মামার অভিজ্ঞতা প্রচুর, বুদ্ধিও

চোখা, কিন্তু স্বভাবটি ফাঁকিবাজ। মুখে মামা যত বলে, কাজে হয়তো তার খানিকটা করিতে পারে, কিন্তু কিছু না করাই তাহার অভ্যাস। কোনো বিষয়ে মামার নিয়ম নাই, শৃঙ্খলা নাই। পদ্ধতির মধ্যে মামা হাঁপাইয়া ওঠে। গা লাগাইয়া কোনো কাজ করা মামার অসাধ্য, আরম্ভ করিয়া ছাড়িয়া দেয়। নকুড়বাবু ইন্‌সিওরেন্স বেচিয়া খান, তাঁকে বলিয়া কহিয়া শ্যামা মামাকে একটা এজেন্সী দিয়াছিল, মামারও প্রথমটা খুব উৎসাহ দেখা গিয়াছিল, কিন্তু দুদিন দু-একজন লোকের কাছে যাতায়াত করিয়াই মামার ধৈর্য ভাঙ্গিয়া গেল, বলিল, এতে কিছু হবে না শ্যামা, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে টাকার দরকার, লোককে ভজিয়ে ভাজিয়ে ইন্‌সিওর করিয়ে পয়সার মুখ দেখা দুদিনের কর্ম্ম নয় বাবু, আমার ওসব পোষাবে না। দোকান দেব একটা।

শ্যামা বলিল—দোকান দেবার টাকা কই মামা?

মামা রহস্যময় হাসি হাসিয়া বলিল—থাম না তুই, দেখ না আমি কি করি।

শ্যামা সন্দিগ্ধ হইয়া বলিল—আমার সে হাজার টাকায় যেন হাত দিও না মামা।

মামা বলিল—ক্ষেপেছিস শ্যামা তোর সে টাকা তেমনি পুলিন্দে করা আছে।

সকালে উঠিয়া মামা কোথায় চলিয়া যায়, শ্যামা ভাবে রোজগারের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। শহরে গিয়া মামা এদিক-ওদিক ঘোরে, কোথাও ভিড় দেখিলে দাঁড়ায় সঙের মতো বেশ করিয়া আধ ঘণ্টা ধরিয়া দুটি একটি সহজ ম্যাজিক দেখাইয়া যাহারা অষ্টধাতুর মাদুলি, বিষ-তাড়ানো, ভুত-তাড়ানো শিকড় বিক্রয় করে, ধৈর্য সহকারে মামা গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত তাহাদের লক্ষ্য করে। ফুটপাতে যে সব জ্যোতিষী বসিয়া থাকে তাদের সঙ্গে মামা আলাপ করে। কোনোদিন সে স্টেশনে যায়, কোনোদিন গঙ্গার ঘাটে, কোনোদিন কালীঘাটে। যে সব ছন্নছাড়া ভবঘুরে মানুষ মানুষকে ফাঁকি দিয়া জীবিকা অর্জন করিয়া বেড়ায়, দেখিতে দেখিতে তাদের সঙ্গে মামা ভাব জমাইয়া ফেলে, সুখ-দুঃখের কত কথা হয়। সাধু নিশ্বাস ফেলিয়া বলে, শহরে যেমন জাঁকজমক, রোজগারের সুবিধা তেমন নয়, বড় বেয়াড়া শহরের লোকগুলি, মফস্বলের যাহারা শহরে আসে, শহরে পা দিয়া তারাও যেন চালাক হইয়া ওঠে,—নাঃ, শহরে সুখ নাই। মামা বলে, গ্যাঁট হয়ে বসে থাকলে কি শহরে সাধুর পয়সা আছে দাদা, যাও না শিশিতে জল পুরে ধাতুদৌর্বল্যের ওষুধ বেচ না গিয়ে, যত ফেনা কাটবে মুখে, তত বিক্রি।

পথ মামা রোজই হারায়, সে আরেক উপভোগ্য ব্যাপার। পথ জিজ্ঞাসা করিলে কলিকাতার মানুষ এমন মজা করে! কেউ বিনা বাক্যে গটগট করিয়া চলিয়া যায়, কেউ জলের মতো করিয়া পথের নির্দেশটা বুঝাইয়া দিতে চাহিয়া উত্তেজিত অস্থির হইয়া ওঠে। মন্দ লাগে না মামার। শহরের পথও অন্তহীন, শহরের পথেও অফুরন্ত বৈচিত্র্য ছড়ানো, ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্তি আসিবে এতবড় ভবঘুরে কে আছে? প্রত্যহ মামা শহরেই কারো বাড়িতে অতিথি হইয়া দুপুরের খাওয়াটা যোগাড় করিবার চেষ্টা করে, কোনোদিন সুবিধা হয় কোনোদিন হয় না। বাড়িতে আজকাল খাওয়া-দাওয়া তেমন ভাল হয় না, শ্যামা কৃপণ হইয়া পড়িয়াছে।

—কিছু হল মামা?—শ্যামা জিজ্ঞাসা করে।

মামা বলে—হচ্ছে রে হচ্ছে, বলতে বলতে কি আর কিছু হয়?

এদিকে শ্যামার টাকা ফুরাইয়া গিয়াছে। নগদ যা কিছু সে জমাইয়াছিল, ঘর তুলিতে, শীতলের জন্য উকিলের খরচ দিতেই তাহা প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল, বাকি টাকায় ফাল্গুন মাস পর্যন্ত খরচ চলিল, তারপর আর কিছুই রহিল না। বড়-দিনের সময় রাখাল আসিয়াছিল, টাকা আসে নাই। ইতিমধ্যে শ্যামা তাহাকে দুখানা চিঠি দিয়াছে, দশ বিশ করিয়াও শ্যামার পাওনাটা সে কি শোধ করিতে পারে না? জবাব দিয়াছে মন্দা, লিখিয়াছে, পাওনার কথা কি লিখেছ বৌ, উনি যা পেতেন তার চেয়েও কম টাকা নিয়েছিলেন দাদার কাছ থেকে, যাই হোক, তুমি যখন দুরবস্থায় পড়েছ বৌ, তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করা আমাদের উচিত বইকি, এ মাসে পারব না, সামনের মাসে কিছু টাকা তোমায় পাঠিয়ে দেব।

কিছু টাকা, কত টাকা? কুড়ি।

সেদিন বোধ হয় চৈত্র মাসের সাত তারিখ। বাড়িতে মেছুনি আসিয়াছিল। একপোয়া মাছ রাখিয়া পয়সা আনিতে গিয়া শ্যামা দেখিল দুটি পয়সা মোটে তাহার আছে। বাক্স প্যাঁটরা হাতড়াইয়া ক'দিন অপ্রত্যাশিতভাবে টাকাটা সিকিটা পাওয়া যাইতেছিল, আজও তেমনি কিছু পাওয়া যাইবে শ্যামা করিয়াছিল এই আশা, —কিন্তু দুটি তামার পয়সা ছাড়া আর কিছুই সে খুঁজিয়া পাইল না।

মাছের দু আনা দাম মামাই দিল।

শ্যামা বলিল, এমন করে আর একটা দিনও তো চলবে না মামা? একটা কিছু উপায় কর? দু-চারখানা নোট তুমি নিয়ে এসো সেই টাকা থেকে, তারপর যা

কপালে থাকে হবে।

মামা বলিল, টাকা চাই?—নে না বাবু দু-পাঁচ টাকা আমারই কাছ থেকে, আমি তো কাঙাল নই? বলিয়া মামা দশটা টাকা শ্যামাকে দিল।

মামার তবে টাকা আছে নাকি? লুকাইয়া রাখিয়াছেন? শ্যামা বলিল—দশ টাকায় কি হবে মামা? চাদ্দিকে অভাব খাঁ খাঁ করছে, কোথায় ঢালব এ টাকা?

—এখনকার মতো চালিয়ে নে মা, ফুরিয়ে গেলে বলিস্।

—আর ক'টা দাও। খোকার মাইনে, দুধের দাম—

মামা হাসিয়া বলিল—আর কোথায় পাব?

কিন্তু শ্যামার মনে সন্দেহ ঢুকিয়াছে, কিছু টাকা মামা নিশ্চয় লুকাইয়া রাখিয়াছে, এমনি চুপ করিয়া থাকে, অচল হইলে পাঁচ টাকা দশ টাকা বাহির করে। অবিলম্বে আরও বেশি টাকার প্রয়োজন শ্যামার ছিল না, তবু মামার সঙ্গতি আঁচ করিবার জন্য সে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। মামা শেষে রাগ করিয়া বলিল, বললাম নেই, বিশ্বাস হল না বুঝি? দেখগে আমার ব্যাগ খুঁজে!

ব্যাগ মামার শ্যামা আগেই খুঁজিয়াছে। দুখানা গেরুয়া বসন, একটা গেরুয়া আলখাল্লা, কতকগুলি রুদ্রাক্ষ ও স্ফটিকের মালা, কতকগুলি কালো কালো শিকড়, কাঠের একটা কাঁকুই, টিনের ছোট একটি আরশি আর এমনি দুটো চারটে জিনিস মামার সম্বল। পয়সা কড়ি ব্যাগে কিছুই নাই। তবু মামার যে টাকা নাই শ্যামা তাহা পুরাপুরি বিশ্বাস করিতে পারিল না।

দশটা টাকা যে কোথা দিয়া শেষ হইয়া গেল শ্যামা টেরও পাইল না। মামার কাছে হাত পাতিলে এবার মামা সঙ্গে সঙ্গে টাকা বাহির করিয়া দিল না, বকিতে বকিতে বাহির হইয়া গিয়া একবেলা পরে আবার দশ টাকার একটা নোট আনিয়া দিল। শ্যামার প্রশ্নের জবাবে বলিল, শিষ্য দিয়াছে।

চৈত্র মাসের মাঝামাঝি ইংরাজী মাস কাবার হইলে একদিন সকালে শ্যামা রানীকে জবাব দিল। রানীকে সে দুমাস আগেই ছাড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিল, ঝি রাখিবার সামর্থ্য তাহার কোথায়?—মামার জন্য পারে নাই। মামা বলিয়াছিল, বড় তুই ব্যস্তবাগীশ শ্যামা, এত খরচের মধ্যে একটা ঝির মাইনে তুই দিতে পারবি নে, কত আর মাইনে ওর? আগে অচল হোক, তখন ছাড়াস, একা একা তুই খেটে খেটে মরবি আমি তা দেখতে পারব না শ্যামা।

এবার মামাকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই রানীকে শ্যামা বিদায় করিয়া দিল। সারাদিন টহল দিয়া, সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরিয়া মামা খবরটা শুনিয়া বলিল—তাই কি হয় মা! এতগুলো ছেলেমেয়ে, একা তুই পারবি কেন? ওসব বুদ্ধি করিস নে, এমনি যদি খরচ চলে একটা ঝির খরচও চলবে। আমি ওর মাইনে দেব'খন যা।

সকালে মামা নিজে গিয়া রানীকে ডাকিয়া আনিল। বলিল, এমনি তো কাজের অন্ত নেই, বাসনমাজা ঘর-ধোয়ার কাজও যদি তোকে করতে হয় শ্যামা, ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে কে তাকাবে লো, ভেসে যাবে না ওরা? এ বুড়ো যদ্দিন আছে, সংসার তোর একভাবে চলে যাবে শ্যামা, কেন তুই ভেবে ভেবে উতলা হয়ে উঠিস?

শ্যামার চোখে জল আসে। কলতলায় রানী বাসন মাজিতেছে,—এতক্ষণ ও কাজ তাকেই করিতে হইত, নিজের মামা ছাড়া তাহা অসহ্য হইত কার? সংসারে আত্মীয়ের চেয়ে আপনার কেহ নাই। মানুষ করিয়া বিবাহ দিয়াছিল, তারপর কুড়ি বছর দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া আসিয়া আত্মীয় ছাড়া কে মমতা ভুলিয়া যায় না?

শ্যামাকে উপার্জনের অনেক পন্থার কথা শুনাইবার পর যে পন্থাটি অবলম্বন করা চৈত্র মাসের মধ্যেই মামা স্থির করিয়া ফেলিল শ্যামাকে একদিন তাহার আভাসটুকু আগেই সে দিয়া রাখিয়াছিল। শুভ পয়লা বৈশাখ তারিখে মামা দোকান খুলিল।

বড় রাস্তায় গলির মোড়ের কাছাকাছি ছোট একটি দোকানঘর খালি হইয়াছিল, বার টাকা ভাড়া। গলি দিয়া বার তিনেক পাক খাইয়া শ্যামার বাড়ি পৌঁছিতে হয়, একদিন বাড়ি ফিরিবার সময় 'এই দোকান ভাড়া দেওয়া যাইবে' খড়ি দিয়া আঁকাবাঁকা অক্ষরে এই বিজ্ঞাপনটি পাঠ করিবামাত্র মামার মতলব স্থির হইয়া গেল। ঘরটি ভাড়া লইয়া মামা মনোহারি দোকান খুলিয়া বসিল। ছোট দোকান, পুতুল, খাতা, পেন্সিল, চা, বিস্কুট, লজেঞ্চুস, হারিকেনের ফিতা, মাথার কাঁটা, সিঁদুর এই সব অল্পদামী জিনিসের, দু বোতল সুবাসিত পরিশোধিত নারিকেল তৈলের বোতলের চেয়ে দামী জিনিস মামার দোকানে রহিল কিনা সন্দেহ। কাচের কেস আলমারি প্রভৃতি কিনিয়া দোকান দিয়া বসিতে দু শ টাকার বেশি লাগিল না। মামা দোকানের নাম রাখিল 'শ্যামা স্টোর্স'।

দু শ টাকা মামা পাইল কোথায়? জিজ্ঞাসা করিলে মামা বলে, শিষ্য দিয়েছে। কেমন শিষ্য জানিস শ্যামা বোম্বাই শহরের মার্চেন্ট জুয়েলার—লাখোপতি মানুষ।

প্রয়াগে কুম্ভমেলায় গিয়ে হাজার হাজার ছাইমাখা সন্ন্যাসীর মধ্যে গেরুয়া কাপড়টি শুধু পরে গায় একটা কুর্তা চাপিয়ে একধারে বসে আছি, না একরতি ভস্ম, না একটা রুদ্রাক্ষ, জটাফটা তো কস্মিন্ কালে রাখি নে—ওই,—অত সাধুর মধ্যে লাখোপতি মানুষটা করলে কি, অবাক হয়ে খানিক আমায় দেখলে, দেখে সটান এসে লুটিয়ে পড়ল পায়ে। বলল, বাবা এত ঝুটা মালের মধ্যে তুমি সাচ্চা সাধু, তোমার ভড়ং নেই, অনুমতি দাও সাধু সেবা করি।...মামা অকৃত্রিম আত্মপ্রসাদে চোখ বুজিয়া মৃদু মৃদু হাসে।

শ্যামা বলে, তা যদি বল মামা, এখনো তোমার মুখে চোখে যেন জ্যোতি ফোটে মাঝে মাঝে। কিছু পেয়েছিলে মামা, সাধনার গোড়ার দিকে সাধুরা যা পায় টায়, ক্ষেমতা না কি বলে কে জানে বাবু—তাই কিছু?

মামা নিশ্বাস ফেলিয়া বলে—পাই নি? ছেড়েছুড়ে দিলাম বলে, লেগে যদি থাকতাম শ্যামা—।

দোকান করার টাকাটা তবে ভক্তই দিয়াছে? শ্যামার সেই হাজার টাকায় হাত পড়ে নাই? শ্যামার মন খুঁতখুঁত করে। কুড়ি বছর অদৃশ্য থাকিবার রহস্য আবরণটি একসঙ্গে বাস করিতে করিতে মামার চারিদিক হইতে খসিয়া পড়িতেছিল, শ্যামা যেন টের পাইতেছিল দীর্ঘকাল দেশবিদেশে ঘুরিলেই মানুষের কতগুলি অপার্থিব গুণের সঞ্চার হয় না, একটু হয়তো খাপছাড়া স্বভাব হইয়া যায় তার বেশি আর কিছু নয়, বিনা সঞ্চয়ে ঘুরিয়া বেড়ানো ছাড়া হয়তো এসব লোকের দ্বারা আর কোনো কাজ হয় না। মামা যে এমন একটি ভক্তকে বাগাইয়া রাখিয়াছে চাহিলেই যে দু-চারশ টাকা দান করিয়া বসে, শ্যামার তাহা বিশ্বাস করিতে অসুবিধা হয়। তেমন জবরদস্ত লোক তো মামা নয়?

একদিন সন্ধ্যার পর চাদরে গা ঢাকিয়া শ্যামা দোকান দেখিয়া আসিল। দোকান চলিবে ভরসা হইল না। শ্যামা স্টোর্সের সামনে রাস্তার ওপারে মস্ত মনোহারি দোকান, চার-পাঁচটা বিদ্যুতের আলো, টিমটিমে কেরাসিনের আলো-জ্বালা মামার অতটুকু দোকানে কে জিনিস কিনিতে আসিবে? মামার যেমন কাণ্ড, দোকান দিবার আর জায়গা পাইল না।

মামার উৎসাহের অন্ত নাই, বিধান ও খুকী দোকান দোকান করিয়া পাগল, মণিরও দুবেলা দোকানে যাওয়া চাই। মামা ওদের বিস্কুট ও লজেন্স দেয়,

দোকানের আকর্ষণ ওদের কাছে তাহাতে আরও বাড়িয়া গিয়াছে। জিনিস বিক্রয় করিবার শখ বিধানের প্রচণ্ড। বলে—এবার যে খদ্দের আসবে তাকে আমি জিনিস দেব দাদু, এঁ্যা ?

মামা বলে, পারবি কি খোকা, খদ্দের বিগড়ে দিবি শেষে! কিন্তু অনুমতি মামা দেয়।

বিধান ছোট শো-কেসটির পিছনে টুলটার উপরে গম্ভীর মুখে বসে, মামা কোণের বেঞ্চিটার উপর বসিয়া চশমা চোখে দিয়া বিড়ি টানিতে টানিতে খবরের কাগজ পড়ে। ক্রেতা যে আসে হয়তো সে পাড়ার ছেলে, ঈর্ষার দৃষ্টিতে বিধানের দিকে চাহিয়া বলে, কি রে বিধু!—

বিধান বলে—কি চাই?…সে পাকা দোকানি, কেনা-বেচার সময় তার সঙ্গে বন্ধুত্ব অচল, খোশ গল্প করিবার তার সময় কই? চশমার ফাঁক দিয়া মামা সহকারীর কার্যকলাপ চাহিয়া দেখে, বলে—কালি? ওই ও কোণার টিনের কৌটোতে—দু বড়ি এক পয়সায়, কাগজে মুড়ে দে খোকা!

এদিকে দোকান চলে ওদিকে মামা আজ দশ টাকা কাল পাঁচ টাকা সংসার খরচ আনিয়া দেয়। মামার চারিদিকে রহস্যের ভাঙা আবরণটি আবার যেন গড়িয়া উঠিতে থাকে! পাড়ার লোকে এতকাল মামাকে অতিথি বলিয়া খাতির করিত, এখন প্রতিবেশী গৃহস্থের প্রাপ্য সহজ সমাদর দেয়, তবে অতটুকু দোকান দেওয়ার জন্য পাড়ার অনেক চাকুরে-বাবুর কাছে মামার আসন নামিয়া গিয়াছে, খুব যারা বাবু দু-এক পয়সার জিনিস কিনিতে মামাকে তাদের কেহ 'তুমি' পর্যন্ত বলিয়া বসে।

মামা বলে—কি চাই বললে? পরিমল নস্যি? ওই ও দোকানে যাও!

অপমান করিয়া মামার কাছে কারো পার পাওয়ার জো নাই।

বৈশাখ মাস শেষ হইলে শ্যামা একদিন বলিল—দোকানের হিসাবপত্র করলে মামা, লাভ-টাভ হল?

মামা বলিল—লাভ কিরে শ্যামা, বসতে না বসতে কি লাভ হয়? খরচ উঠুক আগে।

শ্যামা বলিল—নতুন দোকান দিয়ে বসার খরচ দু-এক মাসে উঠবে না তা জানি মামা, তা বলি নি, বিক্রির ওপর লাভ-টাভ কি রকম হল হিসাব কর নি?—

কত বেচলে, কেনা দাম ধরে কত লাভ রইল, কর নি সে হিসাব ?

মামা বলিল—তুই আমাকে দোকান করা শেখাতে আসিস নে শ্যামা।

এবার গ্রীষ্মের ছুটি হওয়ার আগে ক্লাসের ছেলেদের অনেকেই নানাস্থানে বেড়াইতে যাইবে শুনিয়া বিধানের ইচ্ছা হইয়াছিল সে-ও কোথাও যায়,—কোথায় যাইবে ? কোথায় তাহার কে আছে, কার কাছে সে গিয়া কিছুদিন থাকিয়া আসিতে পারে ? বনগাঁ গেলে হইত,—মন্দাকে শ্যামা চিঠি লিখিয়াছিল, মন্দা জবাব দিয়াছে, এখন সেখানে চারিদিকে বড় কলেরা হইতেছে,—এখন না গিয়া বিধান যেন পূজার সময় যায়।

বিষ্ণুপ্রিয়ারা এবার দার্জিলিং গিয়াছে। তখনও স্কুলের ছুটি হয় নাই,—শঙ্কর সঙ্গে যাইতে পারে নাই। বিষ্ণুপ্রিয়া এখানে থাকিবার সময় শঙ্কর বোধহয় সাহস পাইত না, বিষ্ণুপ্রিয়া দার্জিলিং চলিয়া গেলে একদিন বিকালে সে এ বাড়িতে আসিল।

শ্যামা বারান্দায় তরকারি কুটিতেছিল, বিধান কাছেই দেয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া ছেলেদের একটা ইংরাজী গল্পের বই পড়িতেছিল, মুখ তুলিয়া শঙ্করকে দেখিয়া সে আবার পড়ায় মন দিল।

শঙ্করকে বসিতে দিয়া শ্যামা বলিল—কে এসেছে দেখ খোকা।

বিধান শুধু বলিল—দেখেছি।

বিধান কি আজো সে অপমান ভোলে নাই, বন্ধু বাড়ি আসিয়াছে তার সঙ্গে সে কথা বলিবে না ? লাজুকে শঙ্করের মুখখানা লাল হইয়া উঠিয়াছিল, শ্যামা টান দিয়া বিধানের বই কাড়িয়া লইল, বলিল—নে, ঢের বিদ্যে হয়েছে, যা দিকি দুজনে দোতলায়, বাতাস লাগবে একটু,—যা গরম এখানে!

বিধান আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে গিয়া বসিল। শ্যামা বলিল, তোমাদের ঝগড়া হয়েছে নাকি শঙ্কর ?—ও বুঝি কথা বলে না তোমার সঙ্গে ? কি পাগল ছেলে!—না বাবা, যেওনা তুমি, পাগলটাকে আমি ঠিক করে দিচ্ছি!

ঘরে গিয়া শ্যামা ছেলেকে বোঝায়। বলে, যে শঙ্করের কি দোষ ? শঙ্কর তো তাদের অপমান করে নাই, যে বাড়ি বহিয়া ভাব করিতে আসে তার সঙ্গে কি এমন ব্যবহার করিতে হয়? ছি! কিন্তু এ তো বোঝানোর ব্যাপার নয়, অন্ধ অভিমানকে যুক্তি দিয়া কে দমাইতে পারে ? ছেলেকে শ্যামা বাহিরে টানিয়া আনে, সে মুখ গোঁজ

করিয়া থাকে। শঙ্কর বলে, যাই মাসিমা—

আহা বেচারীর মুখখানা ম্লান হইয়া গিয়াছে।

শ্যামা রাগিয়া বলে—ছি খোকা ছি, একি ছোটমন তোর, একি ছোটলোকের মতো ব্যবহার? যা তুই আমার সামনে থেকে সরে!—বসো, বাবা তুমি, একটা কথা শুধোই,—দিদি পত্র দিয়েছে? সেখানে ভাল আছে সব? তুমি যাবে না দার্জিলিং স্কুল বন্ধ হলে?

শ্যামা শঙ্করের সঙ্গে গল্প করে, হাঁটুতে মুখ গুঁজিয়া বিধান বসিয়া থাকে, কি ভয়ানক কথা ছেলেকে সে বলিয়াছে শ্যামার তা খেয়ালও থাকে না। তারপর বিধান হঠাৎ কাঁদিয়া ছুটিয়া দোতলায় চলিয়া যায়। লাজুক শঙ্কর বিব্রত হইয়া বলে —কেন বকলেন ওকে?—বলিয়া উসখুস করিতে থাকে।

তারপর সে-ও উপরে যায়। খানিক পরে শ্যামা গিয়া দেখিয়া আসে, দুজনে গল্প করিতেছে।

সেই যে তাহাদের ভাব হইয়াছিল, তারপর শঙ্কর প্রায়ই আসিত। শঙ্করের ক্যারমবোর্ডটি পড়িয়া থাকিত এ বাড়িতেই, উপরে খোলা ছাদে বসিয়া সারা বিকাল তাহারা ক্যারাম খেলিত! বন্ধে তাহার সহিত বিধানের দার্জিলিং যাওয়ার কথাটা শঙ্করই তুলিয়াছিল, বিষ্ণুপ্রিয়া ইহা পছন্দ করিবে না জানিয়াও শ্যামা আপত্তি করে নাই, তেমন আদর যত্ন বিধান না হয় না-ই পাইবে, সেখানে অতিথি ছেলেটিকে পেট ভরিয়া খাইতে তো বিষ্ণুপ্রিয়া দিবেই? কিন্তু রাজী হইল না বিধান। একসঙ্গে দার্জিলিং গিয়া থাকার কত লোভনীয় চিত্রই যে শঙ্কর তার সামনে আঁকিয়া ধরিল, বিধানকে বাঁকানো গেল না। যথাসময়ে শঙ্কর চলিয়া গেল সেই শীতল পাহাড়ী দেশে, এখানে বিধানের দেহ গরমে ঘামাচিতে ভরিয়া গেল!

মনে মনে শ্যামা বড় কষ্ট পাইল। অভাব অনটনের অভিজ্ঞতা জীবনে তাহার পুরানো হইয়া আসিয়াছে, এমন দিনও তো গিয়াছে যখন সে ভাল করিয়া দেহের লজ্জাও আবরণ করিতে পারে নাই, কিন্তু আজ পর্যন্ত চারটি সন্তানের কোনো বড় সাধ শ্যামা অপূর্ণ রাখে নাই,—আকাশের চাঁদ চাহিবার সাধ নয়, শ্যামার ছেলে মেয়ে অসম্ভব আশা রাখে না; শ্যামার মতো গরীবের পক্ষে পূরণ করা হয়তো কিছু কঠিন এমনি সব সাধারণ শখ, সাধারণ আব্দার। বিধান একবার সাহেবের পোশাক চাহিয়াছিল, তাদের ক্লাশের পাঁচ-ছটি ছেলে যে রকম বেশ

ধরিয়া স্কুলে আসে, দোতলার ঘরের জন্য ইট সুরকি কিনিয়া শ্যামা তখন ফতুর হইয়া গিয়াছে। তবু ছেলেকে পোশাক তো সে কিনিয়া দিয়াছিল।

শ্যামার চোখে আজকাল সব সময় একটা ভীরুতার আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। শীতলের উপরেও কোনোদিন সে নিশ্চিন্ত নির্ভর রাখিতে পারে নাই, কমল প্রেসের চাকরিতে শীতল যখন ক্রমে ক্রমে উন্নতি করিতেছিল তখনও নয়, তবু তখন মনে যেন তাহার একটা জোর ছিল। আজ সে জোর নষ্ট হইয়া গিয়াছে। চোরের বৌ? জীবনে এ ছাপ তাহার ঘুচিবে না, স্বামীর অপরাধে মানুষ তাহাকে অপরাধী করিয়াছে, কেহ বিশ্বাস করিবে না, কেহ সাহায্য দিবে না, সকলেই তাহাকে পরিহার করিয়া চলিবে। যদি প্রয়োজন ও হয়, ছেলেমেয়েদের দুবেলার আহার সংগ্রহ করিবার সঙ্গত উপায় খুঁজিয়া পাইবে না, বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন সকলে যাহাকে এড়াইয়া চলিতে চায়, নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা সে করিবে কিসের ভরসায়? বিধবা হইলেও সে বোধহয় এতদূর নিরুপায় হইত না। দু বছর পরে শীতল হয়তো ফিরিয়া আসিবে, হয়তো আসিবে না। আসিলেও শ্যামার দুঃখ সে কি লাঘব করিতে পারিবে? নিজের প্রেস বিক্রয় করিয়া কতকাল শীতল অলস অকর্মণ্য হইয়া বাড়ি বসিয়াছিল সে ইতিহাস শ্যামা ভোলে নাই। তবু তখন শীতলের বয়স কম ছিল, মন তাজা ছিল। এই বয়সে দু বছর জেল খাটিয়া আসিয়া আর কি সে এত বড় সংসারের ভার গ্রহণ করিতে পারিবে? নিজেই হয়তো সে ভার হইয়া থাকিবে শ্যামার।

এক আছে মামা। সে-ও আবার খাঁটি একটি রহস্য, ধরা ছোঁয়া দেয় না। কখনো শ্যামার আশা হয় মামা বুঝি লাখপতিই হইতে চলিয়াছে, কখনো ভয় হয় মামা সর্বনাশ করিয়া ছাড়িবে। সংসারে শ্যামা মানুষ দেখিয়াছে অনেক, এরকম খাপছাড়া অসাধারণ মানুষ একজনকেও তো সে স্থায়ী কিছু করিতে দেখে নাই। সংসারে সেটা যেন নিয়ম নয়। সাধারণ মোটা-বুদ্ধি সাবধানী লোকগুলিই শেষ পর্যন্ত টিঁকিয়া থাকে, শীতলের মতো যারা পাগলা, মামার মতো যারা খেয়ালী, হঠাৎ একদিন দেখা যায় তারাই ফাঁকিতে পড়িয়াছে। জীবন তো জুয়া খেলা নয়।

স্কুল খুলিবার কয়েকদিন পরে শঙ্কর দার্জিলিং হইতে ফিরিয়া আসিল। শ্যামার সাদর অভ্যর্থনা বোধ হয় তাহার ভাল লাগিত, একদিন সে দেখা করিতে আসিল শ্যামার সঙ্গেই। শ্যামা দেখিয়া অবাক, পকেটে ভরিয়া সে দার্জিলিং-এর কয়েক

রকম তরকারি লইয়া আসিয়াছে। বিধান তখন দোকানে গিয়াছিল, হাতের কাজ ফেলিয়া রাখিয়া শ্যামা শঙ্করের সঙ্গে আলাপ করিল। বকুল নামিয়া আসিল নীচে, মা'র গা ঘেঁসিয়া বসিয়া বড় বড় চোখ মেলিয়া সে সবিস্ময়ে শঙ্করের দার্জিলিং বেড়ানোর গল্প শুনিল। শুধু বিধানকে নয়, শঙ্কর বকুলকেও ভালবাসে। কেবল সে বড় লাজুক বলিয়া বিধানের কাছে যেমন বকুলের কাছে তেমনি ভালবাসা কোথায় লুকাইবে ভাবিয়া পায় না। পকেটে ভরিয়া সে কি শ্যামার জন্য শুধু তরকারিই আনিয়াছে? মুখ লাল করিয়া বকুলের জিনিসও সে বাহির করিয়া দেয়। কে জানিত দার্জিলিং গিয়া বকুলের কথা সে মনে রাখিবে?

শ্যামা বড়ই খুশী হয়। সোনার ছেলে, মাণিক ছেলে। কি মিষ্টি স্বভাব? আম কাটিয়া শ্যামা তাহাকে খাইতে দেয়, তারপর রঙীন স্ফটিকের মালা গলায় দিয়া বকুল গল গল করিয়া কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে দেখিয়া হাসিমুখে কাজ করিতে যায়, পাঁচ মিনিট পরে দেখিতে পায় দুজনে দোতলায় গিয়াছে। রানীকে শোনাইয়া শ্যামা বলে, বড় ভাল ছেলে রানী, একটু অহঙ্কার নেই।...তারপর দোতলায় দুমদাম করিয়া ওদের ছুটাছুটির শব্দ ওঠে, বকুলের অজস্র হাসি ঝরনার মতো নিচে ঝরিয়া পড়ে, এ ওর পিছনে ছুটিতে ছুটিতে একবার তাহারা একতলাটা পাক দিয়া যায়, দুরন্ত মেয়েটার পাল্লায় পড়িয়া লাজুক শঙ্করও যেন দুরন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

পরদিন বিধান স্কুলে চলিয়া গেল শ্যামা বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে দেখা করিতে গেল। দাসী তখন স্নানের আগে বিষ্ণুপ্রিয়ার চুলে গন্ধ-তেল দিতেছিল, চওড়া পাড় কোমল শাড়িখানি লুটাইয়া বিষ্ণুপ্রিয়া আনমনে বসিয়াছিল শ্বেতপাথরের মেঝেতে, কে বলিবে সে-ও জননী। এত বয়সে ওর ঢঙ দেখিয়া মনে মনে শ্যামার হাসি আসে। প্রথম কন্যার জন্মের পর ও আবার সন্ন্যাসিনী সাজিয়াছিল! আজ প্রতিদিন তিনটি দাসী মিলিয়া ওই স্থূল দেহটাকে ঘষিয়া মাজিয়া ঝক্‌ঝকে করিবার চেষ্টায় হয়রান হয়। গালে রঙটঙ দেয় নাকি বিষ্ণুপ্রিয়া?

বিষ্ণুপ্রিয়া বলিল—বসো।

শ্যামা মেঝেতেই বসিয়া বলিল—কবে ফিরলেন দিদি? দিব্যি সেরেছে শরীর, রাজরানীর মতো রূপ করে এসেছেন, রঙ যেন আপনার দিদি ফেটে পড়ছে।... অসুখ শরীর নিয়ে হাওয়া বদলাতে গেলেন, আমরা এদিকে ভেবে মরি কবে দিদি আসবেন, খবর পেয়ে ছুটে এসেছি।

বিষ্ণুপ্রিয়া হাই তুলিল, উদাস ব্যথিত হাসির সঙ্গে বলিল, এসেই আবার গরমে শরীরটা কেমন কেমন করছে, উঠতে বসতে বল পাই নে, বেশ ছিলাম সেখানে,—খুকী তো কিছুতে আসবে না, কিন্তু ইস্কুল-টিস্কুল সব খুলে গেল, কত আর কামাই করবে? তাই সকলকে নিয়ে চলেই এলাম।

—দার্জিলিং-এ শুনেছি খুব শীত?—শ্যামা বলিল।

—শীত নয়? শীতের সময় বরফ পড়ে—বিষ্ণুপ্রিয়া বলিল।

একথা সেকথা হয়, ভাঙা ভাঙা ছাড়া ছাড়া আলাপ। শ্যামার খবর বিষ্ণুপ্রিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করে না। শ্যামার ছেলেমেয়েরা সকলে কুশলে আছে কি না, শ্যামার দিন কেমন করিয়া চলে জানিবার জন্য বিষ্ণুপ্রিয়ার এতটুকু কৌতুহল দেখা যায় না। শ্যামার বড় আপসোস হয়। কে না জানে বিষ্ণুপ্রিয়া যে একদিন তাহাকে খাতির করিত সেটা ছিল শুধু খেয়াল, শ্যামার নিজের কোন গুণের জন্য নয়। বড়লোকের অমন কত খেয়াল থাকে। শ্যামাকে একটু সাহায্য করিতে পারিলে বিষ্ণুপ্রিয়া যেন কৃতার্থ হইয়া যাইত। না মিটাইতে পারিলে বড়লোকের খেয়াল নাকি প্রবল হইয়া ওঠে শ্যামা শুনিয়াছে, আজ দুঃখের দিনে শ্যামার জন্য কিছু করিবার শখ বিষ্ণুপ্রিয়ার কোথায় গেল? তারপর হঠাৎ এক সময় শ্যামার একটা অদ্ভুত কথা মনে হয়, মনে হয় বিষ্ণুপ্রিয়া যেন প্রতীক্ষা করিয়া আছে। কিছু কিছু সাহায্য বিষ্ণুপ্রিয়া তাহাকে করিবে, কিন্তু আজ নয়,—শ্যামা যে দিন ভাঙিয়া পড়িবে, কাঁদিয়া হাতে পায়ে ধরিয়া ভিক্ষা চাহিবে, এমন সব তোষামোদের কথা বলিবে ভিখারির মুখে শুনিতেও মানুষ যাহাতে লজ্জা বোধ করে,—সেইদিন।

বাড়ি ফিরিয়া শ্যামা বড় অপমান বোধ করিতে লাগিল, মনে মনে বিষ্ণুপ্রিয়াকে দুটি একটি শাপান্তও করিল। তবু, একদিক দিয়া সে যেন খুশীই হয়, একটু যেন আরাম বোধ করে। অন্ধকার ভবিষ্যতে এ যেন ক্ষীণ একটি আলোক, বিষ্ণুপ্রিয়ার এই অপমানকর নিষ্ঠুর প্রত্যাশা। একান্ত নিরুপায় হইয়া পড়িলে বিষ্ণুপ্রিয়ার হাতে পায়ে ধরিয়া কাঁদা-কাটা করিয়া সাহায্য আদায় করা চলিবে এ চিন্তা আঘাত করিয়াও শ্যামাকে যেন সান্ত্বনা দেয়।

দিনগুলি এমনিভাবে কাটিতে লাগিল। আকাশে ঘনাইয়া আসিল বর্ষার মেঘ, মানুষের মনে আসিল সজল বিষণ্ণতা। ক'দিন ভিজিতে ভিজিতে স্কুল হইতে বাড়ি

ফিরিয়া বিধান জ্বরে পড়িল, হারান ডাক্তার দেখিতে আসিয়া বলিল, ইনফ্লুয়েঞ্জা হইয়াছে। রোজ একবার করিয়া বিধানকে সে দেখিয়া গেল। আজ পর্যন্ত শ্যামার ছেলেমেয়ের অসুখে-বিসুখে অনেকবার হারান ডাক্তার এ বাড়ি আসিয়াছে, শ্যামা কখনো টাকা দিয়াছে, কখনো দেয় নাই। এবার ছেলে ভাল হইয়া উঠিলে একদিন সে হারান ডাক্তারের কাছে কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল—বাবা, এবার তো কিছুই দিতে পারলাম না আপনাকে?

হারান বলিল—তোমার মেয়েকে দিয়ে দাও, আমাদের বকুলরানীকে?

কান্নার মধ্যে হাসিয়া শ্যামা বলিল, তা নিন, এখুনি নিয়ে যান।

শ্যামার জীবনে এই আরেকটি রহস্যময় মানুষ। শীর্ণকায় তিরিক্ষে মেজাজের লোকটির মুখের চামড়া যেন পিছন হইতে কিসে টান করিয়া রাখিয়াছে, মনে হয় মুখে যেন চকচকে পালিশ করা গাম্ভীর্য। সর্বদা কি যেন সে ভাবে, বাস যেন সে করে একটা গোপন সুরক্ষিত জগতে,—সংসারে মানুষের মধ্যে চলাফেরা কথাবার্তা যেন তাহার কলের মতো, আন্তরিকতা নাই, অথচ কৃত্রিমও নয়। শ্যামার কাছে সে যে টাকা নেয় না, এর মধ্যে দয়ামায়ার প্রশ্ন নাই, মহত্ত্বের কথা নাই, টাকা শ্যামা দেয় না বলিয়াই সে যেন নেয় না, অন্য কোনো কারণে নয়। শ্যামা দুরবস্থায় পড়িয়াছে এ কথা কখনো সে কি ভাবে?

মনে হয় বুঝি বকুলকে হারান ডাক্তার ভালবাসে। শ্যামা জানে তা সত্য নয়। এ বাড়িতে আসিয়া হারানের বুঝি অন্য এক বাড়ির কথা মনে পড়ে, শ্যামা আর বকুল বুঝি তাহাকে কাহাদের কথা মনে পড়াইয়া দেয়। বকুলকে কাছে টানিয়া হারান যখন তাহার মুখের দিকে তাকায় শ্যামাও যেন তখন আর একজনকে দেখিতে পায়, গায়ে শ্যামার কাঁটা দিয়া ওঠে। এ বাড়িতে রোগী দেখিতে আসিবার জন্য হারান তাই লোলুপ, একবার ডাকিলে দশবার আসে না ডাকিলেও আসে। মানুষকে অপমান না করিয়া যে কথা বলিতে পারে না, রোগের অবস্থা সম্বন্ধে আত্মীয়ের ব্যাকুল প্রশ্নে পর্যন্ত যে সময় সময় আগুনের মতো জ্বলিয়া উঠে, বহুদিন আগে শ্যামার কাছে সে পোষ মানিয়াছিল। শ্যামা তখন হইতে সব জানে। একটা হারানো জীবনের, পুনরাবৃত্তি এইখানে হারানের আরম্ভ হইয়াছিল, একান্ত পৃথক, একান্ত অমিল পুনরাবৃত্তি, তা হোক, তাও হারানের কাছে দামী। শ্যামা ছিল হারানের মেয়ে সুখময়ীর ছায়া, সুখময়ীর কথা শ্যামা শুনিয়াছে। এই ছায়াকে ধরিয়া

হারান শ্যামার সমান বয়সের সময় হইতে সুখময়ীর জীবনস্মৃতির বাস্তব অভিনয় আবিষ্কার করিয়াছে,—বকুলের মতো একটি মেয়েও নাকি সুখময়ীর ছিল। শ্যামার ছেলেরা তাই হারানের কাছে মূল্যহীন, ওদের দিকে সে চাহিয়াও দেখে না। এ বাড়িতে আসিয়া শ্যামা ও বকুলকে দেখিবার জন্য সে ছটফট করে।

অথচ শ্যামা ও বকুলকে সে স্নেহ করে কিনা সন্দেহ। ওরা তুচ্ছ, ওরা হারানের কেউ নয়, হারান পুলকিত হয় শ্যামার কণ্ঠ ও কথা বলার ভঙ্গিতে,—শ্যামার চলন দেখিয়া, বকুলের দুরন্তপনা ও চাঞ্চল্য দেখিয়া তাহার মোহের সীমা থাকে না। মমতা যদি হারানের থাকে তাহা অবাস্তবতার প্রতি,—শ্যামার উচ্চারিত শব্দ ও কয়েকটি ভঙ্গিমায় এবং বকুলের প্রাণের প্রাচুর্যে,—মানুষ দুটিকে হারান কখনো ভালবাসে নাই; শোকে যে এমন জীর্ণ হইয়াছে সে কবে রক্ত মাংসের মানুষকে ভালবাসিতে পারিয়াছে?

শ্যামা তাই হারানের সঙ্গে আত্মীয়তা করিতে পারে নাই, হারানের কাছে অনুগ্রহ দাবী করিতে আজো তাহার লজ্জা করে। বিধানের চিকিৎসা ও ওষুধের বিনিময়ে কাঞ্চন মুদ্রা দিবার অক্ষমতা জানাইবার সময় হারান ডাক্তারের কাছে শ্যামা তাই কাঁদিয়া ফেলিল।

বিধানের পরে অসুখে পড়িল বকুল। বকুলের অসুখ? বকুলের অসুখ এ বাড়িতে আশ্চর্য ঘটনা। মেয়েকে লইয়া পালাইয়া গিয়া সেই যে শীতল তাহার জ্বর করিয়া আনিয়াছিল সে ছাড়া জীবনে বকুলের কখনো সামান্য কাসিটুকু পর্যন্ত হয় নাই, রোগ যেন পৃথিবীতে ওর অস্তিত্বের সংবাদই রাখিত না। সেই বকুলের কি অসুখ হইল এবার? ছোটখাট অসুখ তো ওর শরীরে আমল পাইবে না। প্রথম ক'দিন দেখিতে আসিয়া হারান ডাক্তার কিছু বলিল না, তারপর রোগের নামটা শুনাইয়া শ্যামাকে সে আধমরা করিয়া দিল। বকুলের টাইফয়েড হইয়াছে।

—জান মা, এই যে কলকেতা শহর, এ হল টাইফয়েডের ডিপো, এবার যা শুরু হয়েছে চাদ্দিকে জীবনে এমন আর দেখি নি, তিরিশ বছর ডাক্তারি করছি সাতটি টাইফয়েড রোগীর চিকিচ্ছে কখনো আর করি নি একসঙ্গে,—এই প্রথম।

এমনি, ছেলেদের চেয়ে বকুলের সম্বন্ধে শ্যামা ঢের বেশী উদাসীন হইয়া থাকে, সেবাযত্নের প্রয়োজন মেয়েটার এত কম, নিজের অস্তিত্বের আনন্দেই মেয়েটা সর্বদা এমন মশগুল, যে ওর দিকে তাকানোর দরকার শ্যামার হয় না। কিন্তু

বকুলের কিছু হইলে শ্যামা সুদ সমেত তাহাকে তাহার প্রাপ্য ফিরাইয়া দেয়, কি যে সে উতলা হইয়া উঠে বলিবার নয়। বকুলের অসুখে সংসার তাহার ভাসিয়া গেল, কে রাঁধে কে খায় কোথা দিয়া কি ব্যবস্থা হয়, কোনোদিকে আর নজর রহিল না, অনাহারে অনিদ্রায় সে মেয়েকে লইয়া পড়িয়া রহিল। এদিকে রানীও বকুলের প্রায় তিনদিন পরে একই রোগে শয্যা লইল। মামা কোথা হইতে একটা খোট্টা চাকর আর উড়িয়া বামুন যোগাড় করিয়া আনিল, পোড়া ভাত আর অপক্ক ব্যঞ্জন খাইয়া মামা, বিধান আর মণির দশা হইল রোগীর মতো, শ্যামার কোলের ছেলেটি অনাদরে অনাদরে মরিতে বসিল। বালক ও শিশুদের চেয়ে কষ্ট বোধহয় হইল মামারই বেশি। দায়িত্ব, কর্তব্য আর পরিশ্রম, মামার কাছে এই তিনটিই ছিল বিষের মতো কটু, মামা একেবারে হাঁপাইয়া উঠিল। এতকাল শ্যামার সচল সংসারকে এখানে ওখানে সময় সময় একটু ঠেলা দিয়াই চলিয়া যাইতেছিল, এবার অচল বিপর্যস্ত সংসারটি মামাকে যেন গ্রাস করিয়া ফেলিতে চাহিল, তারপর রহিল অসুখের হাঙ্গামা, ছুটাছুটি, রাতজাগা, দুর্ভাবনা এবং আরও কত কিছু। ওদিকে রানীর খবরটাও মাঝে মাঝে মামাকে লইতে হয়। ন'দিনের দিন মামা লুকাইয়া কলিকাতা হইতে একজন ডাক্তার আনিয়াছিল, রানীর কতকগুলি খারাপ উপসর্গ দেখা দিয়াছে, সে বাঁচিবে কিনা সন্দেহ। দীর্ঘ যাযাবর জীবনে ভদ্র অভদ্র মানুষের ভেদাভেদ মামার কাছে ঘুচিয়া গিয়াছিল, কত অস্পৃশ্য পরিবারের সঙ্গে মামা সপ্তাহ মাস পরমানন্দে যাপন করিয়াছে,—যেটুকু ভাসা ভাসা স্নেহ করিবার ক্ষমতা মামার আছে, রানী কেন তাহা পাইবে না? রানী মরিবে জানিয়া মামার ভাল লাগে না, বহুকাল আগে শ্যামার বিবাহ দিয়া সে শূন্য ঘরে যে বেদনা ঘনাইয়া আসিয়া মামাকে গৃহছাড়া করিয়াছিল যেন তারই আভাস মেলে। আর বকুল? শ্যামার মেয়েটাকে নিস্পৃহ সন্ন্যাসী মামা কি এত ভালবাসিয়াছে যে ওর রোগকাতর মুখখানি দেখিলে সে পীড়া বোধ করে, তাহার ছুটিয়া পলাইতে ইচ্ছা হয় অরণ্যে প্রান্তরে, দূরতম জনপদে,—মানুষের হৃদয় যেখানে স্বাধীন, শোক দুঃখ স্নেহ ভালবাসার সঙ্গে মানুষের যেখানে সম্পর্ক নাই। মামার মুখ দেখিয়া শ্যামা সময় সময় ভয় পাইয়া যায়। বকুলের অসুখের ক'দিনেই মামা যেন আরও বুড়া হইয়া পড়িয়াছে। মিনতি করিয়া মামাকে সে বিশ্রাম করিতে বলে, যুক্তি দেখাইয়া বলে যে মামার যদি কিছু

হয় তবে আর উপায় থাকিবে না। কিন্তু মামা যেন কেমন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া গিয়াছে, সে বিশ্রাম করিতে পারে না, প্রয়োজনের খাটুনি খাটিয়া খাটিয়া তো সারা হয়ই, বিনা প্রয়োজনেও খাটিয়া মরে।

স্বামী যথাসময়ে মারা গেল, বকুলের সেদিন জ্বর ছাড়িয়াছে। বর্ষার সেটা খাপছাড়া দিন,—কি রোদ বাহিরে, মেঘশূন্য কি নির্মল আকাশ! কেবল শ্যামার নিদ্রাতুর আরক্ত চোখে জল আসে। এ ক'দিন শ্যামা যেন ছিল একটা কামনার রূপক, সন্তানকে সুস্থ করার একটি জ্বলন্ত ইচ্ছা-শিখা—আজ তাহাকে চেনা যায় না। চৌদ্দ দিনে বকুলের জ্বর ছাড়িয়াছে? কিসের চৌদ্দ দিন,—চৌদ্দ যুগ!

শ্রাবণের শেষে মামা একদিন দোকানটা বেচিয়া দিল। দোকান করা মামার পোষাইল না। ভদ্রলোক দোকান করিতে পারে?

শ্যামা হাসিয়া বলিল—তখনি বলেছিলাম মামা, দিও না দোকান, তুমি কেন দোকান চালাতে পারবে?—কত টাকা লোকসান দিলে?

মামা বলিল—লোকসান দেব আমি? কি যে তুই বলিস শ্যামা।

—তাহলে কত টাকা লাভ হল তাই বল?

—না লাভ হয় নি, টায়-টায় দেনা-পাওনায় মিল খেয়েছে, ব্যস। যে দিনকাল পড়েছে শ্যামা, আমি বলে তাই, আর কেউ হলে ঘর থেকে টাকা ঢেলে খালি হাতে ফিরে আসত, কত কোম্পানী এবার লালবাতি জ্বেলেছে জানিস?

দোকান বেচিয়া মামা এবার করিবে কি? যে দুর্নির্ণেয় উৎস হইতে দরকার হইলেই দশ-বিশটা টাকা উঠিয়া আসে, চিরকাল তাহা টিকিবে তো? মামা কিছু বলে না। করুণভাবে মামা শুধু একটু হাসে, উৎসুক চোখে আকাশের দিকে তাকায়। শরৎ মানুষকে ঘরের বাহির করে, বর্ষান্তে নবযৌবনা ধরণীর সঙ্গে মানুষের পরিচয় কাম্য, কিন্তু বর্ষা তো এখনো শেষ হয় নাই মামা, ওই দেখো আকাশে নিবিড় কালো সজল মেঘ, শরৎ কোথায় যে তুমি দেশে দেশে নিজের মনের মৃগয়ায় যাইতে চাও? মামার বিষণ্ণ হাসি, উৎসুক চোখ, শ্যামাকে ব্যথা দেয়। শ্যামা ভাবে, কিছু করিতে না পারিয়া হার মানার দুঃখে মামা ম্রিয়মাণ হইয়া গিয়াছে, ভাগ্নীর ভার লইবে বলিয়া অনেক আস্ফালন

করিয়াছিল কিনা, এখন তাহার লজ্জা আসিয়াছে। চোরের মতো মামা তাই অস্বস্তিতে উসখুস করে। আহা, বুড়া মানুষ, সারাটা জীবন ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাটাইয়া আসিয়া, সংসারের পাকা, উপার্জনে অভ্যস্ত লোকগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কেন পারিয়া উঠিবে? টাকা তো পথে ছড়ানো নাই, ঘরে ঘরে যুবক বেকার হাহাকার করিতেছে। ষাট বছরের ঘরছাড়া বিবাগী এতগুলি প্রাণীর জীবিকা অর্জনের পথ খুঁজিয়া পাইবে কোথায়? শ্যামা বড় মমতা বোধ করে। বলে—অত ভেবো না মামা, ভগবান যা হোক একটা উপায় করবেন।

ভগবান? মামার বোধহয় ভগবানের কথা মনে ছিল না। ভগবান যে মানুষের যাহোক একটা উপায় করেন, এও বোধহয় এতদিন তাহার খেয়াল থাকে নাই। শ্যামা মনে পড়াইয়া দিলে মামা বোধহয় নিশ্চিন্ত মনেই শ্যামা ও তাহার চারিটি সন্তানকে ভগবানের হাতে সমর্পণ করিয়া ভাদ্রের তিন তারিখে নিরুদ্দেশ হইয়া গেল! যাওয়ার আগে শুধু বলিয়া গেল, কিছু মনে করিস নে শ্যামা, তোর সেই হাজার টাকাটা খরচ করে ফেলেছি,—শ দেড়েক মোটে আছে, নে। বুড়ো মামাকে শাপ দিসনে মা—একটি টাকা মোটে আমি সঙ্গে নিলাম।

শাপ শ্যামা দেয় নাই, পাগলের মতো কি যেন সব বলিয়াছিল। কথাগুলি মিষ্টি নয়, কোন ভাগ্নীই সাধারণত মামাকে ওসব কথা বলে না। ক্যাম্বিশের ব্যাগটি হাতে করিয়া কম্বলের গুটানো বিছানাটা বগলে করিয়া মামা যখন চলিয়া গেল, শ্যামা তখন পাগলের মতো কি সব যেন বলিতেছে।

সাত

পরের বছর শরৎকালে,—শ্যামা প্রথম সন্তানের জননী হওয়ার সময় পৃথিবীতে শরৎকালটা যেমন ছিল এখনও তেমনি থাকার মত আশ্চর্য। শরৎকালে, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে লইয়া শ্যামা বনগাঁ গেল। বলিল—ঠাকুরঝি, আমার আর তো কোথাও আশ্রয় নেই, খেতে না পেয়ে আমার ছেলেমেয়ে মরে যাবে,

ওদের তুমি দুটি দুটি খেতে দাও, আমি তোমার বাড়ী দাসি হয়ে থাকব।

মন্দা মুখ ভার করিয়া বলিল—এসেছ থাকো, ওসব বোলো না বৌ। তোষামুদে কথা আমি ভালবাসি নে।

শ্যামা বনগাঁয়ে রহিয়া গেল।

শ্যামার গত বছরের ইতিহাস বিস্তারিত লিখিলে সুখপাঠ্য হইত না বলিয়া ডিঙাইয়া আসিয়াছি: এ তো দারিদ্র্যের কাহিনী নয়। শ্যামা যে একবার দুদিন উপবাস করিয়াছিল সে কথা লিখিয়া কি হইবে? ব্রত-পূজা করিয়া কত জননী অমন অনেক উপবাস করে, শ্যামা খাদ্যের অভাবে করিয়াছিল বলিয়া তো উপবাসের সঙ্গে উপবাসের পার্থক্য জন্মিয়া যাইবে না? শ্যামার গহনাগুলি গিয়াছে। বিবাহের সময় মামা শ্যামাকে প্রায় হাজার টাকার গহনাই দিয়াছিল, নিজের প্রেস বিক্রয় করিয়া শীতলের দীর্ঘকাল বেকার বসিয়া থাকার সময় চুড়ি হার বালা, আর নাক ও কানের দুটি একটি ছুটকো গহনা ছাড়া বাকি সব গিয়াছিল, কমল প্রেসের চাকরির সময় দোতলায় ঘর তুলিবার ঝোঁকে শ্যামা টাকা জমাইয়াছে, হাঙরমুখো পুরনো প্যাটার্নের বালা ভাঙিয়া আর একটু ভারি তারের বালা গড়ানো ছাড়া নূতন কোনো গহনা সে কখনো করে নাই। এক বছরে তাই ঘরের বিক্রয়যোগ্য আসবাবের সঙ্গে শ্যামার গহনাগুলিও গিয়াছে। থাকিবার মধ্যে আছে একটি আংটি আর দুহাতে দুগাছি চুড়ি।

বিধানকে বড়লোকের স্কুল হইতে ছাড়াইয়া কাশীপুরের সাধারণ স্কুলটিতে ভর্তি করিয়া দিয়াছিল, বিধান হাঁটিয়াই স্কুলে যাইত। ধোপার সঙ্গে শ্যামা কোনো সম্পর্ক রাখিত না, বাড়িতে সিদ্ধ করিয়া কাপড়জামা সাফ করিত—কাপড়জামা দুই-ই সে কিনিত কমদামী, মোটা, টেঁকিত অনেকদিন। খোকার জন্য দুধ কিনিত এক পোয়া, দু বছর বয়সের আগেই খোকা দিব্যি ভাত খাইতে শিখিয়াছিল, পেট ভরিয়া খাইয়া টিঙটিঙে পেটটি দুলাইয়া দুলাইয়া শ্যামার পিছু পিছু সে হাঁটিয়া বেড়াইত,—শ্যামা তাহাকে স্তন দিত সে-ই অপরাহ্নে, সারাদিন বুকে যে দুধটুকু জমিত বিকালে তাহাতেই খোকার পেট ভরিয়া যাইত। কত হিসাব ছিল শ্যামার, ব্যাপক ও বিস্ময়কর। ভাতের ফেনটুকু রাখিলে যে ভাতের পুষ্টি বাড়ে এটুকু পর্যন্ত সে খেয়াল রাখিত। তাহার এই

আশ্চর্য হিসাবের জন্য ছোট খোকার পেটটা একটু বড় হওয়া ছাড়া ছেলেমেয়েদের কারো শরীর তেমন খারাপ হয় নাই। রোগা হইয়াছে শুধু শ্যামা। শেষের দিকে শ্যামার যে মখমলের মতো মসৃণ উজ্জ্বল চামড়াটি দেখা দিয়াছিল তাহা মলিন বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। এক বছরে কারো বয়স এক বছরের বেশি বাড়ে না, শ্যামারও বাড়ে নাই, কিন্তু তাহাকে দেখিয়া কে তাহা ভাবিতে পারে! গত যে বসন্ত ব্যর্থ গিয়াছে তার আগেরটি উতলা করিয়াছিল কোন শ্যামাকে? বনগাঁয়ে এই যে শীর্ণা নিষ্প্রভজ্যোতি শ্রান্ত নারীটি আসিয়াছে, শহরতলীর সেই বাড়িটির দোতলায় সমাপ্তপ্রায় নতুন ঘরটির ছায়ায় দাঁড়াইয়া বসন্তের বাতাসে ধানকলের ছাই উড়িতে দেখিয়া জেলের কয়েদী স্বামীর জন্য এরই যৌবন কি ক্ষোভ করিয়াছিল?

শেষের দিকে হারান ডাক্তার বারো টাকা ভাড়ায় একতলাতে একটি ভাড়াটে জুটাইয়া দিয়াছিল, সরকারী অফিসের এক কেরানী, সম্প্রতি স্ত্রী ও শিশুপুত্র লইয়া দাদার সঙ্গে পৃথক হইয়া আসিয়াছে। কেরানী বটে কিন্তু বড়ই তাহারা বিলাসী। হাঁড়ি কলসী, পুরানো লেপ-তোষক, ভাঙা রঙচটা বাক্স প্রভৃতিতে শ্যামার ঘর ভরা থাকিত। ওরা আসিয়া ঝকঝকে সংসার পাতিয়া বসিল, জিনিসপত্র তাহাদের বেশি ছিল না, কিন্তু যা ছিল সব দামী ও সুদৃশ্য। বৌটি, শ্যামা শুনিল বড়লোকের মেয়ে, স্কুলেও নাকি পড়িয়াছিল, স্বাধীন ভাবে একটু ফিটফাট থাকিতে ভালবাসে—বড় ভাইয়ের সঙ্গে ওদের পৃথক হওয়ার কারণটাও তাই। পৃথক হইয়া বৌটি যেন বাঁচিয়াছে। নিজের সংসার পাতিতে কি তাহার উৎসাহ! পথের দিকে যে ঘরে শ্যামা আগে শুইত তার জানালায় জানালায় সে নতুন পর্দা দিল, চিকণ কাজ করা দামী খাটটি, বোধহয় বিবাহের সময় পাইয়াছিল; দক্ষিণের জানালা ঘেঁসিয়া পাতিল। আয়না বসানো টেবিলটি রাখিল ঘরে ঢুকিবার দরজার সোজা, অপর দিকের দেয়ালের কাছে। খাট টেবিল আর কাঠের একটি চেয়ার তাহার সমগ্র আসবাব, তাই যেন তার ঢের। ভাঁড়ারে তাকের উপর মসলাপাতি রাখিবার কয়েকটি নতুন চকচকে টিন, কাচের জার, স্টোভ, চায়ের বাসন আর দুটি একটি টুকি-টাকি জিনিস রাখিয়া, রাখিবার আর কিছুই তাহার রহিল না, সমস্ত ঘরে একটি রিক্ত পরিচ্ছন্নতা ঝকঝক করিতে লাগিল। সংসার করিতে করিতে

একদিন হয়তো সে শ্যামার মতোই ঘরবাড়ি জঞ্জালে ভরিয়া ফেলিবে, শুরুতে আজ সবই তাহার আনকোরা ও সংক্ষিপ্ত। বাড়াবাড়ি ছিল শুধু তাহাদের প্রেমের। এমন নির্লজ্জ নিবিড় প্রেম শ্যামা জীবনে আর দেখে নাই। বিবাহ তাহাদের হইয়াছিল চার-পাঁচ বছর আগে, এতকাল কে যেন তাহাদের প্রেমের উৎস-মুখটিতে ছিপি আঁটিয়া রাখিয়াছিল, এখানে মুক্তি পাইয়া তাহা উথলিয়া উঠিয়াছে। ভাল শ্যামার লাগিত না। নিরানন্দ বিমর্ষ তাহার জীবন, সন্তানের তাহার অন্নবস্ত্রের অভাব, তারই পায়ের তলে, তারই বাড়ির একতলায় এ কি বিসদৃশ প্রণয়রস-রঙ্গ? কই, বয়সকালে শ্যামা তো ওরকম ছিল না? স্বামীর সঙ্গে মেয়েমানুষের এত কি ছেলেমানুষী, হাসা-হাসি, খেলা ও ছলকরা কলহ? একটি ছেলে হইয়াছে, সম্মুখে অন্ধকার ভবিষ্যৎ, কত দুশ্চিন্তা কত দায়িত্ব ওদের, এমন হালকা ফাজলামিতে দিন কাটাইলে চলিবে কেন?

বৌটির নাম কনকলতা। শ্যামা জিজ্ঞাসা করিত, তোমার স্বামী কত মাইনে পান?

কনক বলিত—কত আর পাবে, মাছিমারা কেরানী তো, বেড়ে বেড়ে নব্বইয়ের মত হয়েছে,—খরচ চলেনা দিদি। একটা ছেলে পড়ালে আরও কিছু আসে, আমি বারণ করি,—সারাদিন আপিস করে আবার ছেলে পড়াবে না কচু,—কি হবে বেশি টাকা দিয়ে? যা আসে তাই ঢের,—নয়? মাসের শেষে বড্ড টানাটানি পড়ে দিদি, খরচ চলে না।

কনক এমনিভাবে কথা বলিত, উল্টাপাল্টা পূর্ব-পশ্চিম। বলিত, একা স্বাধীনভাবে সে মহা স্ফূর্তিতে আছে, আবার বলিত, একা একা থাকতে ভাল লাগে না দিদি, আত্মীয়-স্বজন দু-চারটি কাছে না থাকলে বড্ড যেন ফাঁকাফাঁকা লাগে,—নয়?

শ্যামা বুঝিত, আনন্দে আহ্লাদে সোহাগে সে ডগমগ, কথা সে বলে না শুধু বকবক করে, ওর কথার কোনো অর্থ নাই। কনকের বয়স বোধহয় ছিল কুড়ি-বাইশ বছর, শ্যামা যে বয়সে প্রথম মা হইয়াছিল,—এই বয়সে বৌটির অবিশ্বাস্য খুকী-ভাবে শ্যামা থ' বনিয়া যাইত, কেমন রাগ হইত শ্যামার। ছেলেমানুষ এমন নির্ভয়, এমন নিশ্চিন্ত, এমন আহ্লাদী? এই বুদ্ধি-বিবেচনা লইয়া সংসারে ও টিঁকিবে কি করিয়া? বড়লোকের মেয়ে বুঝি এমনি অসার হয়?

তবু বিরুদ্ধ সমালোচনা-ভরা শ্যামার মন, কি দিয়া কনক যেন আকর্ষণ করিত। চৌবাচ্চার ধারে ওরা যখন পরস্পরের গায়ে জল ছিটাইয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়িত, কনকের স্বামী যখন তাহাকে শূন্যে তুলিয়া চৌবাচ্চায় একটা চুবানি দিয়া, আবার বুকে করিয়া ঘরে লইয়া যাইত, খানিক পরে শুকনো কাপড় পরিয়া আসিয়া কনকের কাজের ছন্দে আবার অকাজের ছন্দ মিশিতে থাকিত, তখন শ্যামার—কে জানে কি হইত শ্যামার, চোখের জল গাল বাহিয়া তাহার মুখের হাসিতে গড়াইয়া আসিত।

কনকের স্বামী আপিস গেলে সে নীচে নামিয়া বলিত, সব দেখে ফেলেছি কনক!

কনকের লজ্জা নাই, সে হাসিয়া ফেলিত,—জ্বালিয়ে মারে দিদি, আপিস গেলে যেন বাঁচি।

দোতলার ঘরখানা আর ছাদটুকু ছিল শ্যামার গৃহ, জিনিসপত্রসহ সে বাস করিত ঘরে, রাঁধিত ছাদে, একখানা করোগেটেড টিনের নীচে। পাশে শুধু নকুড়বাবুর ছাদ নয়, আশে পাশের আরও কয়েক বাড়ির ছাদ হইতে উদয়াস্ত শ্যামার সংসারের গতিবিধি দেখা যাইত। প্রথম প্রথম অনেকগুলি কৌতূহলী চোখ দেখিতেও ছাড়িত না। যখন তখন ছাদে উঠিয়া নকুড়বাবুর বৌ জিজ্ঞাসা করিত, কি করছ বকুলের মা?·· শ্যামা বলিত, রাঁধছি দিদি,—বলিত, সংসারের কাজকর্ম করছি দিদি,—কি রাঁধলেন এবেলা? রাঁধিত এবং সংসারের কাজকর্ম করিত, শ্যামা আর কিছু করিত না? ধানকলের ধূমোদ্গারী চোঙটার দিকে চাহিয়া থাকিত না? রাত্রে ছেলেমেয়েরা ঘুমাইয়া পড়িলে জাগিয়া বসিয়া থাকিত না, হিসাব করিত না দিন মাস সপ্তাহের, টাকা আনা পয়সার?

উদ্‌ভ্রান্ত চিন্তাও শ্যামা করিত, নিশ্বাসও ফেলিত। জননীত্ব কেমন যেন নীরস অর্থহীন মনে হইত শ্যামার কাছে। কোথায় ছিল এই চারিটি জীব, কি সম্পর্ক ওদের সঙ্গে তাহার, অসহায়া স্ত্রীলোক সে, মেরুদণ্ড বাঁকানো এ ভার তার ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে কেন? কিসের এই অন্ধ মায়া? জগজ্জননী মহামায়া কিসের ধাঁধায় ফেলিয়া তাহাকে দিয়া এত দুঃখ বরণ করাইতেছেন? সুখ কাকে বলে একদিনের জন্য সে তাহা জানিতে পারিল না, তাহার একটা

প্রাণ নিঙড়াইয়া চারটি প্রাণীকে সে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে,—কেন? কি লাভ তাহার? চোখ বুজিয়া সে যদি আজ কোথাও চলিয়া যাইতে পারিত।—ওরা দুঃখ পাইবে, না খাইয়া হয়তো মরিয়া যাইবে, কিন্তু তাহাতে কি আসিয়া যায় তার? সে তো দেখিতে আসিবে না। পেটের সন্তানগুলির প্রতি শ্যামা যেন বিদ্বেষ অনুভব করিত,—সব তাহার শত্রু, জন্ম-জন্মান্তরের পাপ! কি দশা তাহার হইয়াছে ওদের জন্য।

শেষের দিকে শ্যামা আর চালাইতে পারিত না, মাসিক বারো টাকায় এতগুলো মানুষের চলে না। তাই কুড়ি টাকা ভাড়ায় সমস্ত বাড়িটা কনকলতাকে ছাড়িয়া দিয়া সে বনগাঁয়ে রাখালের আশ্রয়ে চলিয়া আসিয়াছে।

বড় রাস্তা ছাড়িয়া ছোট রাস্তা, পুকুরের ধারে বিঘা পরিমাণ ছোট একটি মাঠ, লাল ইটের একতলা একটি বাড়ি ও কলাবাগানের বেড়ার মধ্যবর্তী দু হাত চওড়া পথ, তারপর রাখালের পাকা ভিত, টিনের দেয়াল ও শনের ছাউনির বৈঠকখানা। তিনখানা তক্তপোষ একত্র করিয়া তার উপরে শতরঞ্চি বিছানো আছে। তিন জাতের মানুষের জন্য হুঁকা আছে তিনটি। কাঠের একটা আলমারিতে পুরাতন বিবর্ণ দপ্তর, কাঠের একটি বাক্সের সামনে শীর্ণকায় টিকিসমেত একজন মুহুরী। রাখালের মুহুরী? নিজে সে সামান্য চাকরী করে, মুহুরী দিয়া তাহার কিসের প্রয়োজন? বাহিরের ঘরখানা দেখিলেই সন্দেহ হয় রাখালের অবস্থা বুঝি খারাপ নয়, অনেকটা উকিল মোক্তারের কাছারি ঘরের মতো তাহার বৈঠকখানা। বৈঠকখানার পরেই বহিরাঙ্গন, সেখানে দুটা বড় বড় ধানের মরাই। তারপর রাখালের বাসগৃহ, আট-দশটি ছোট বড় টিনের ঘরের সমষ্টি, অধিবাসীদের সংখ্যাও বড় কম নয়।

ক'দিন এখানে বাস করিয়াই শ্যামা বুঝিতে পারিল রাখাল তাহাকে মিথ্যা বলিয়াছিল, সে দরিদ্র নয়! মধ্যবিত্তও নয়। সে ধনী। চাকরি রাখাল সামান্য মাহিনাতেই করে কিন্তু সে অনেক জমিজমা করিয়াছে, বহু টাকা তাহার সুদে খাটে। রাখালের সম্পত্তি ও নগদ টাকার পরিমাণটা অনুমান করা সম্ভব নয়, তবু সে যে উঁচুদরের বড়লোক, চোখ কান বুজিয়া থাকিলেও তাহা বোঝা

যায়। মোটরগাড়ী, দামী আসবাব, গৃহের রমণীবৃন্দের বিলাসিতার উপকরণ—গ্রাম্য গৃহস্থের ধনবত্তার পরিচয় নয়, তাহাদের অবস্থাকে ঘোষণা করে পোষ্যের সংখ্যা, ধানের মরাই, খাতকের ভিড়। রাখালের তিনটি জোড়া তক্তপোষ সকালবেলা খাতকের ভিড়ে ভরিয়া যায়।

দেখিয়া শুনিয়া শ্যামা নিশ্বাস ফেলিল। রাগ ও বিদ্বেষ এবার যেন তাহাদের হইল না, অনেক অভিজ্ঞতা দিয়া শ্যামা এখন বুঝিতে পারিয়াছে রাখাল একা নয়, এমনি জগৎ। এমন করিয়া মিথ্যা বলিতে না জানিলে, ছল ও প্রবঞ্চনায় এমন দক্ষতা না জন্মিলে, সকালে উঠিয়া দশ-বিশটি খাতকের মুখ দেখিবার সৌভাগ্য মানুষের হয় না। রাখালের দোষ নাই। মানুষের মাঝে মানুষের মতো মাথা উঁচু করিবার একটিমাত্র যে পন্থা আছে তাই সে বাছিয়া নিয়াছে। রাখাল তো ধর্মযাজক নয়, বিবাগী সন্ন্যাসী নয়, সে সংসারী মানুষ। সংসারে দশজনে যে ভাবে আত্মোন্নতি করে সেও তেমনি ভাবে অর্থসম্পদ সঞ্চয় করিয়াছে!

শ্যামা সব জানে। বড়লোক হইবার সমস্ত কলা-কৌশল। কেবল স্ত্রীলোক করিয়া ভগবান তাহাকে মারিয়া রাখিয়াছেন।

রাখালের দ্বিতীয় পক্ষের বৌ সুপ্রভাকে দেখিয়া প্রথমে শ্যামা চোখ ফিরাইতে পারে নাই। রাখালের দুবার বিবাহ করার কারণটাও তখন সে বুঝিতে পারিয়াছিল। এত রূপ দেখিলে মাথার ঠিক থাকে পুরুষ মানুষের! একটি ছেলে আর একটি মেয়ে হইয়াছে সুপ্রভার; শ্যামা আসিবার আগে সে নাকি অনেকদিন অসুখেও ভুগিয়াছিল, তবু এখনও সে ছবির মতো, প্রতিমার মতো সুন্দরী। এমন সতীন থাকিতে মন্দা যে কেমন করিয়া এখানে গৃহিণীর পদটি অধিকার করিয়া আছে, চারিদিকে সকলকে হুকুম দিয়া বেড়াইতেছে—সুপ্রভাকে পর্যন্ত, ভাবিয়া প্রথমটা শ্যামা আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিল। তারপর সে টের পাইয়াছে যতই রূপ থাক সুপ্রভার বুদ্ধি নাই, বড় সে বোকা। পুতুলের মতো সে পরের হাতে নড়ে-চড়ে, সাহস করিয়া যে তাহার উপর কর্তৃত্ব করিতে যায় তারই কর্তৃত্ব স্বীকার করে, একেবারে সে মাটির মানুষ, ঘোরপ্যাঁচ বোঝে না, নিজের পাওনা গণ্ডা বুঝিয়া লইতে জানে না। তবু রাখাল কিনা আজও ছোটবৌ বলিতে অজ্ঞান, মনে মনে সকলেই সুপ্রভাকে ভয় করে, এ বাড়িতে আদরের তাহার সীমা নাই। সুপ্রভা প্রভুত্ব করার চেয়ে নির্ভর করিতেই ভালবাসে বেশি,

আদর পাওয়াটাই তার জীবনে সব চেয়ে বড় প্রাপ্য। মন্দার গৃহিণীপনার ভিত্তিও ওইখানেই,—সুপ্রভাকে সে নয়নের মণি করিয়া রাখিয়াছে। কে বলিবে সুপ্রভা তাহার সতীন? স্নেহে-যত্নে সুপ্রভার দিনগুলিকে সে ভরাট করিয়া রাখে, নিজের হাতে সে সুপ্রভাকে সাজায়, সুপ্রভার ঘরখানা সাজায়, সুপ্রভার শয্যা রচনা করিয়া দেয়, সতীনের প্রতি স্বামীর গভীর ভালবাসাকে হাসিমুখে গ্রহণ করে।

সতীনের সংসারেও তাই এখানে কলহ-বিবাদ মান-অভিমান মন-কষাকষি নাই। মন্দা ভুলিয়া গিয়াছে সে বধূ। এই মূল্য দিয়া সে হইয়াছে গৃহিণী।

কলিকাতার চেয়ে ঢের বেশি সুখেই শ্যামা এখানে বাস করিতে লাগিল। পরের বাড়ি পরের আশ্রয়ে থাকিবার একটু যা লজ্জা। এখানে আসিবার আগে শ্যামা ভাবিয়াছিল এমন নিরুপায় হইয়া আত্মীয়ের বাড়ি যাইতেছে, পদে পদে কত অপমান সেখানে না জানি তাহার জুটিবে, এখানে কিছু দিন ভয়ে ভয়ে থাকিবার পর দেখিল গায়ে পড়িয়া অপমান কেহ করে না, সে যে এখানে আশ্রিতা, সময়ে অসময়ে সেটা মনে করাইয়া দিবারও কেহ এখানে নাই, মানাইয়া চলিতে পারিলে এখানে বাস করা কঠিন নয়।

এখানকার গ্রাম্য আবহাওয়াটিও শ্যামার বেশ লাগিল। শহরতলীর যে বাড়িতে বিবাহের পর হইতে এতকাল সে বাস করিয়াছিল সেখানটা শহরের মতো ঘিঞ্জি নয়, তবু সেখানেও তাহারা যেন বন্দীজীবন যাপন করিত, ইটের অরণ্যের মধ্যে প্রকৃতির যেটুকু প্রকাশ ছিল তা যেন শহরের পার্কের মতো ছেলে-ভুলানো ব্যাপার। তাছাড়া, সেখানে তাহারা ছিল কুণো, ঘরের কোণে নিজেদের লইয়া থাকিত, প্রতিবেশী থাকিয়াও ছিল না। এখানে জীবনের সঙ্গে জীবনের বড় নিবিড় মেশামিশি। মিতালি যেখানে নাই সেখানেও অজস্র মেলামেশা আছে, সহজ বাস্তব মেলামেশা, শহরের মেলামেশার মতো কোমল ও কৃত্রিম নয়, খাঁটি জিনিস। শ্যামার ছেলেমেয়েরা যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে। এখানে তাহারা প্রকাণ্ড অঙ্গন পাইয়াছে, বাগান পুকুর পাইয়াছে, ধুলামাটিতে খেলা করার সুযোগ পাইয়াছে, আর পাইয়াছে সঙ্গী। বাড়িতেই শ্যামার প্রত্যেকটি

ছেলেমেয়ের সাথী আছে, বিধানের জন্মের সময় মন্দা যে কোলের ছেলেটিকে লইয়া কলিকাতায় গিয়াছিল তার নাম অজয়, সকলে 'অজু' বলিয়া ডাকে, বিধানের সঙ্গে তাহার খুব ভাব হইয়া গেল। অজয় এক ক্লাশ নিচে পড়ে। পড়াশুনায় বিধান বড় ভাল, মন্দার ছেলেদের মাস্টার একদিন বিধানকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া এই রায় দিয়াছেন। মন্দা জানিয়া খুশী হইয়াছে, বিধান কলকাতার ছেলে বলিয়া অজয়ের সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠতায় মন্দার যেটুকু ভয় ছিল, মাস্টারের মন্তব্য শোনার পর আর তাহা নাই।

সুপ্রভা বকুলকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে।

বলে—কি মেয়ে আপনার বৌদিদি, দিয়ে দিন মেয়েটাকে আমাকে, দেবেন ?

বলে—মেয়ে বলে ওকে কিছু শেখাচ্ছেন না, এ তো ভাল কথা নয় ? আজকালকার দিনে লেখাপড়া গানটান না জানলে কে নেবে মেয়েকে ? একটু একটু সবই শেখাতে হবে ঠাকুরঝি।

সুপ্রভাই উদ্যোগ করিয়া বকুলকে মেয়েস্কুলে ভর্তি করিয়া দিল বলিল, স্কুলের মাহিনা সে-ই দিবে। গানটান শিখাইবার যখন উপায় নাই, লেখাপড়াই একটু শিখুক। বকুলকে সে যত্ন করে, লুকাইয়া ভাল জিনিস খাইতে দেয়, যে সব জিনিস শুধু মন্দা ও তার ছেলেমেয়ের জন্য বরাদ্দ। কিন্তু একা বকুল ওসব খাইতে চায় না, বলে, দাদাকে দাও, ভাইকে দাও ? সুপ্রভা তাতে বড় খুশী হয়। কি নিঃস্বার্থপর মেয়েটার মন ? যেমন দেখিতে সুন্দর, তেমনি মিষ্টি স্বভাব, ও যেন রাজরানী হয় ভগবান।

রাজরানী ? এতবার সুপ্রভা এই আশীর্বাদের পুনরাবৃত্তি করে—কেন, বকুলকে রাজরানী করিতে এত তাহার উৎসাহ কিসের ? রাজরানী হওয়ার সখ ছিল নাকি সুপ্রভার, মনে সেই ক্ষোভ রহিয়া গিয়াছে ? কিছু বুঝিবার উপায় নাই। সুপ্রভাকে অসুখী মনে হয় কদাচিৎ। চুপচাপ বসিয়া সে অনেক সময়ই থাকে, সেটা তার স্বভাব, মুখ তাহার সব সময় বিমর্ষ দেখায় না, চোখে তাহার সব সময় ঘনাইয়া আসে না উৎসুক দিবা-স্বপ্নাতুরার দৃষ্টি। তবু শ্যামা মাঝে মাঝে সন্দেহ করে। অত যার রূপ সে কি একেবারেই নিজের মূল্য জানে না, কুমারী জীবনের আশা কি সে করে নাই, কল্পনা কি তার ছিল না ? বুড়া বয়সে রাখাল যখন তাহাকে বিবাহ করিয়া তিন পুত্রের জননী সতীনের সংসারে

আনিয়াছিল গোপনে সে কি দু-একবিন্দু অশ্রুপাত করে নাই?

বাড়ি ভাড়ার কুড়িটা টাকা নিয়মিত আসে। দুমাস টাকা পাঠাইয়া কনক একবার শ্যামাকে একখানা পত্র লিখিল। পাশে কোনো বাড়িতে বিদ্যুতের আলো নেওয়া হইতেছে, দেখিয়া কনকের সখ জাগিয়াছে তারও বিদ্যুতের আলো চাই। বাড়িটা তাদের পছন্দ হইয়াছে, স্থায়িভাবে তারা ওখানে রহিয়া গেল, এক কাজ করলে হয় না দিদি? খরচপত্র করিয়া তারা বিদ্যুৎ আনাক, মাসে মাসে বাড়ি ভাড়ার টাকায় সেটা শোধ হইবে? এই পত্র পাইয়া শ্যামা বড় চিন্তায় পড়িয়া গেল। এখানে তাহার নানা রকম খরচ আছে, স্কুলের মাহিনা, জামা-কাপড় এসব তাহাকেই দিতে হয়, এটা ওটা খুচরা খরচও আছে অনেক, বাড়িভাড়ার টাকা না আসিলে সে করিবে কি? অথচ বিদ্যুৎ আনিতে না দিলে ওরা যদি অন্য বাড়িতে উঠিয়া যায়? সঙ্গে সঙ্গে আবার কি ভাড়াটে মিলিবে? শেষে শ্যামা মিনতি করিয়া কনককে চিঠি লিখিল। লিখিল, ওই কুড়িটা টাকা তাহার সম্বল, ওই টাকা ক'টির জোরে সে পরের বাড়ি পড়িয়া আছে, বাড়িতে বিদ্যুৎ আনিবার তার ক্ষমতা কই? শ্যামা যে কি দুঃখে পড়িয়াছে কনক যদি তাহা জানিত—

এ চিঠি ডাকে দিবারও প্রয়োজন হইল না, কনকলতার স্বামীর নিকট হইতে সবিনয় নিবেদন ভণিতার আর একখানা পত্র আসিল, শ্যামার বাড়ি হইতে আপিসে যাতায়াত করা বড়ই অসুবিধা, একটি ভাল বাড়ি পাওয়া গিয়াছে শহরের মধ্যে, ইংরাজী মাসটা কাবার হইলে তাহারা উঠিয়া যাইবে। কলিকাতার কেরানী-ভাড়াটের বাসা-বদলানো রোগের খবর তো শ্যামা জানিত না, তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। কনকলতার উপর রাগ ও অভিমানের তাহার সীমা রহিল না। শ্যামার সঙ্গে না তাহার অত ভাব হইয়াছিল, দুঃখের কথা বলিতে বলিতে শ্যামার চোখে জল আসিলে সে না সান্ত্বনা দিয়া বলিত, ভেবো না দিদি, ভগবান মুখ তুলে চাইবেন?...শ্যামা কত নিরুপায় সে তাহা জানে, কলিকাতায় বাড়িভাড়া করিয়াই সে থাকিবে তবু শ্যামার বাড়িতে থাকিবে না। এতকাল অসুবিধা ছিল না, আজ হঠাৎ অসুবিধা হইয়া গেল?

রাখালকে চিঠিখানা দেখাইয়া শ্যামা বলিল, ঠাকুরজামাই এবার কি হবে? কুড়িটে করে টাকা পাচ্ছিলাম, ভগবান তাতেও বাদ সাধলেন।

রাখাল বলিল—আহা, কলকাতায় কি আর ভাড়াটে নেই। যাক না ওরা, ফের ভাড়াটে আসবে,—ওপরে একখানা নিচে তিনখানা ঘর, কুড়ি টাকায় ও-বাড়ি লুপে নেবে না? পাড়ার কাউকে চিঠি দাও না?

হারান ডাক্তারকে শ্যামা একখানা পত্র লিখিয়া দিল। হারান জবাব দিল, ভয় নাই, বাড়ি শ্যামার খালি থাকিবে না, দু-এক মাসের মধ্যে আবার অবশ্যই ভাড়াটে জুটিবে।

ইংরাজী মাসের পাঁচ ছয় তারিখে শ্যামা ভাড়ার টাকার মণিঅর্ডার পাইত, এবার দশ তারিখ হইয়া গেল টাকা আসিল না। কনকলতারা কোথায় উঠিয়া গিয়াছে শ্যামা জানিত না। নিজের বাড়ির ঠিকানাতেই সে তাগিদ দিয়া চিঠি লিখিল, ভাবিল পোস্টাপিসে ওরা কি আর ঠিকানা রাখিয়া যায় নাই? এ পত্রের কোনো জবাব শ্যামা পাইল না।

মন্দা বলিল—দিচ্ছে ভাড়া! এতকাল যে দিয়েছিল তাই ভাগ্যি বলে জেনো বৌ! কলকাতার লোকে বাড়ি ভাড়া দেয় নাকি? একমাস দু মাস দেয় তারপর য'দিন পারে থেকে অন্য বাড়িতে উঠে যায়,—কর ভাড়া আদায় মোকদ্দমা করে।

শ্যামা বিবর্ণ মুখে বলিল—আমার যে একটি পয়সা নেই ঠাকুরঝি? আমি যে ওই ক'টা টাকার ভরসা করছিলাম?

মন্দা বলিল—জলে তো পড় নি?

তারপর বলিল, বাড়িটা বেচে দিলেই পার তো বৌ? এত কষ্ট সয়ে ও বাড়ি রেখে করবে কি? থাকতেও তো পারছ না নিজে? টাকাটা হাতে এলে বরং লাগবে কাজে,—তারপর কপালে থাকে বাড়ি আবার হবে, না থাকে হবে না! দাদা বেরিয়ে এসে কিছু একটা করবে নিশ্চয়। নাও যদি করে বৌ, ছেলে তো উপযুক্ত হয়ে উঠবে তোমার বাড়ির টাকা শেষ হতে হতে,—তখন আর তোমার দুঃখ কিসের?

মুখখানা মন্দা ম্লান করিয়া আনিল, দুঃখের সঙ্গে বলিল, ও বাড়ি বেচতে বলতে আমার ভাল লাগছে ভেবো না বৌ,—আমার বাপের ভিটে তো। কিন্তু কি করবে বল? নিরুপায় হলে মানুষকে সব করতে হয়।

বাড়িটা বিক্রয় করিয়া ফেলার কথা শ্যামা ভাবিতেও পারে না। একটা

বাড়ি না থাকিলে মানুষের থাকিল কি? দেশে একটা ভিটা থাকিলেও শহরতলীর এই বাড়িটা সে বিক্রয় করিয়া ফেলিতে পারিত, কিন্তু দেশ পর্যন্ত কি শ্যামার আছে! যে গ্রামে সে জন্মিয়াছিল, তার কথা ভাল করিয়া মনেও নাই। মামার ভিটেখানা নিজের মনে করিয়াছিল, বেচিয়া দিয়া মামা নিরুদ্দেশ হইয়া গেল। স্বামীর ওই একরত্তি বাড়িটুকু সে পাইয়াছে, বুকের রক্ত জল করা টাকায় বাড়ির সংস্কার করিয়াছে, আজ তাও সে বিক্রি করিয়া দিবে? ও-বাড়ির ঘরে ঘরে জমা হইয়া আছে তাহার বাইশ বছরের জীবন, ওইখানে সে ছিল বধূ, ছিল জননী, চারিটি সন্তানকে প্রসব করিয়া ওইখানে সে বড় করিয়াছে, ও-বাড়ির প্রত্যেকটি ইট যে তার চেনা, দেয়ালের কোথায় কোন পেরেকের গর্তে কবে সে চুন লেপিয়া দিয়াছিল তাও যে তার স্মরণ আছে। পরের হাতে বাড়ি ছাড়িয়া দিয়া আসিতে তার মন যে কেমন করিয়াছিল, জগতে কে তা জানিবে! হায়, ও-বাড়ির প্রত্যেকটি ইটের জন্য শ্যামার যে অপত্যস্নেহ!

অথচ এদিকেও আর চলে না। নাই বলিয়া শ্যামার হাতে কিছুই যে নাই, অপরে তাহা বিশ্বাস করে না, শ্যামাও মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না, বকুলের জমানো একটি চকচকে আধুলি ছাড়া আর একটি তামার পয়সাও তাহার নাই। মাসকাবারে সুপ্রভা গোপনে বিধানের স্কুলের মাহিনাটা দিয়া দিল, চাহিলে সুপ্রভার কাছে আরও কিছু হয়তো পাওয়া যাইত, শ্যামার চাহিতে লজ্জা করিল। এবার বড় শীত পড়িয়াছে। বিধানের গরম জামা গতবার ছোট হইয়া গিয়াছিল, ছেলেটা হু-হু করিয়া বড় হইয়া উঠিতেছে, এ-বছর নূতন একটা জামা কিনিয়া দিতে পারিলে ভাল হইত। আলোয়ানটাও তাহার ছিঁড়িয়া গিয়াছে। ওদের বেশ-ভূষা চাহিয়া দেখিতে শ্যামার চোখে জল আসে। বাড়িবার মুখে বছর বছর ওদের পোশাক বদলানো দরকার, পুরনো সেলাই-করা আঁটো জামা পরিয়া ওদের ভিখারির সন্তানের মতো দেখায়, শুধু সাবান দিয়া জামাকাপড়গুলি আর যেন সাফ হইতে চায় না, কেমন লালচে রঙ ধরিয়া যায়! পূজার সময় রাখাল ওদের একখানি করিয়া তাঁতের কাপড় দিয়াছিল, মানাইয়া পরা চলে এমন জামা নাই বলিয়া বিধান লজ্জায় সে কাপড় একদিনও পরে নাই।

মনটা শ্যামা ঠিক করিতে পারে না। মন্দার কথাগুলি মনের মধ্যে ঘুরিতে থাকে। রাখালের সঙ্গে একদিন সে এ বিষয়ে পরামর্শ করিল। রাখালও বাড়িটা বিক্রি করার পরামর্শই দিল। বলিল—বাড়িভাড়া দিবার হাঙ্গামা কি সহজ। অর্ধেক বছর বাড়ি হয়তো খালিই পড়িয়া থাকিবে, ভাড়াটে জুটিলেও ভাড়া যে নিয়মিত পাওয়া যাইবে তারও কোনো মানে নাই, একেবারে না পাওয়াও অসম্ভব নয়। তারপর বাড়ির পিছনে খরচ নাই? পুরানো বাড়ি, মাঝে মাঝে মেরামত করিতে হইবে, বছর বছর চুনকাম করিয়া না দিলে ভাড়াটে থাকিবে না,—ড্রেন নেওয়া হইয়াছে শ্যামার বাড়িতে? এবার হয়তো ড্রেন না লইলে কর্পোরেশন ছাড়িবে না, সে অনেক খরচের কথা, শ্যামা কোথা হইতে খরচ করিবে?

—বাড়ি পোষা, হাতী পোষার সমান বৌঠান, বাড়ি তুমি ছেড়ে দাও।

বিধান রাত প্রায় এগারোটা অবধি পড়ে, বকুল মণি ওরা ঘুমাইয়া পড়ে অনেক আগে। সেদিন রাত্রে শ্যামা বিধানকে বলিল—খোকা, সবাই যে বাড়ি বিক্রি করে দিতে বলছে বাবা?

বিধানের সঙ্গে শ্যামা আজকাল নানা বিষয়ে পরামর্শ করে, ভবিষ্যতের কত জল্পনা কল্পনা যে তাদের চলে তাহার অন্ত নাই। বিধান বলে, বড় হইয়া সে মস্ত চাকরি করিবে, তারপর শঙ্করের মতো একটা মোটর কিনিবে। শঙ্করের মোটর? শীতলের জেল হইবার পর শঙ্করের মোটরে তার যে স্কুলে যাওয়া বন্ধ হইয়াছিল সে অপমান বিধান কি মনে করিয়া রাখিয়াছে? রাত জাগিয়া তাই এত ওর পড়াশোনা? শীতলের কথা বিধান কখনো বলে না। পড়া শেষ করিয়া ছেলে শুইতে আসিলে শ্যামা কতদিন প্রতীক্ষা করিয়াছে, চুপি চুপি বিধান হয়তো জিজ্ঞাসা করিবে—বাবা কবে ছাড়া পাবে মা? কিন্তু কোনোদিন বিধান এ প্রশ্ন করে না। যে তীব্র অভিমান ওর, হয়তো বাপের জেল হওয়ার লজ্জা ওকে মূক করিয়া রাখে, পরের বাড়ি তারা যে এভাবে পড়িয়া আছে, এজন্য বাপকে দোষী করিয়া মনে হয়তো ও নালিশ পুষিয়া রাখিয়াছে।

আলোটা নিবাইয়া শ্যামা বিধানের মাথার কাছে লেপের মধ্যে পা ঢুকাইয়া বসে। একপাশে ঘুমাইয়া আছে বকুল, মণি ও ফণী। এপাশে অবোধ বালক বুকে ক্ষোভ ও লজ্জা পুরিয়া এত রাত্রে জাগিয়া আছে।

শ্যামা ছেলের বুকে একখানা হাত রাখে। বেড়ার ফুটা দিয়া জ্যোৎস্নার কতকগুলি রেখা ঘরের ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছে। বাগানে শিয়ালগুলি ডাক দিয়া নীরব হইল। বেড়ার ব্যবধান পার হইয়া পাশের ঘরে রাখালের মামাতো বোন রাজবালার স্বামীর সঙ্গে ফিস্ ফিস্ কথা শোনা যায়, রাজবালার স্বামী আদালতে পঁচিশ টাকায় চাকরি করে। পঁচিশ টাকায় অত ফিস্ ফিস্ কথা? শ্যামার স্বামী মাসে তিনশ' টাকাও রোজগার করিয়াছে, নিজের বাড়িতে নিজের পাকা শয়নঘরে স্বামীর সঙ্গে অত কথা শ্যামা বলে নাই।—আর ওই চাপা হাসি? শ্যামা শিহরিয়া ওঠে।

ক'দিন পরে শ্যামার বাড়ি-বিক্রয়-সমস্যার মীমাংসা হইয়া গেল। হারান ডাক্তার মনিঅর্ডারে পঁচিশটা টাকা পাঠাইয়া লিখিলেন, বাড়িতে তিনি নূতন ভাড়াটে আনিয়াছেন, তাঁর পরিচিত লোক। ভাড়া আদায় করিয়া মাসে মাসে তিনিই শ্যামাকে পাঠাইয়া দিবেন।

শ্যামার মুখে হাসি ফুটিল। পঁচিশ টাকা? পাঁচ টাকা ভাড়া বাড়িয়াছে? এখন তাহার রাজবালার স্বামীর সমান উপার্জন! কপাল হইতে কয়েকটা দুশ্চিন্তার চিহ্ন এবার মুছিয়া ফেলা চলে।

মাসখানেক পরে একদিন সকালে কোথা হইতে শঙ্কর আসিয়া হাজির। গায়ে রেজারের কোট, তলায় স্ট্রাইপ দেওয়া সার্ট, পরনে শান্তিপুরের ধুতি, পায়ে মোজা,—কলিকাতায় বোঝা যাইত না, এখানে তাহাকে শ্যামার ভারি বাবু মনে হইল, রাখালের এই বাড়িতে। শ্যামা রাঁধিতেছিল, পরনের কাপড়খানা তাহার ছেঁড়া হলুদমাখা, হাতে দুটি শাঁখা ছাড়া কিছু নাই। কলিকাতা হইতে কে একটি ছেলে তার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে শুনিয়া সে কি ভাবিতে পারিয়াছিল সে শঙ্কর! শঙ্কর কেন বনগাঁ আসিবে?

শ্যামাকে শঙ্কর প্রণাম করিল। শ্যামার গর্বের সীমা রহিল না। মোটা হলুদমাখা ছেঁড়া কাপড় পরনে? কি হইয়াছে তাহাতে! সুপ্রভা, মন্দা, রাজবালা সকলের কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে রাজপুত্র প্রণাম তো করিল তাহাকে! খুশী হইয়া শ্যামা বলিল—ষাট ষাট, বেঁচে থাক্ বাবা, বিদ্যাদিগ্‌গজ হও?

কি আবেগ শ্যামার আশীর্বচনে! শঙ্করের মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া গেল।

তারপর শ্যামা জিজ্ঞাসা করিল—বনগাঁ এসেছ কেন শঙ্কর?

শঙ্কর বলিল—ক্রিকেট খেলতে এসেছি মাসিমা, এখানকার স্কুলের সঙ্গে আমাদের স্কুলের ম্যাচ!

শ্যামা, বিধান, মণি সকলেই শঙ্করকে দেখিয়া খুশী হইয়াছে। অভিমান করিয়াছে বকুল।—পূজোর সময় আসব বলে এখন বাবু এলেন, বলিয়া সে মুখ ভার করিয়া আছে। কবে শঙ্কর বকুলের কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল পূজোর সময় সে বনগাঁ আসিবে সে খবর কেহ রাখিত না। বকুলের কথায় বড়রা হাসে, শঙ্কর শ্যামার দিকে চাহিয়া সলজ্জভাবে কৈফিয়ত দিয়া বলে—পূজোর সময় মধুপুরে গেলাম যে আমরা!—তোকে চিঠি লিখি নি বিধান সেখানে থেকে?

বকুল অর্ধেক ক্ষমা করিয়া বলে—তোমার জিনিসপত্র কই?

শঙ্কর বলে—বোর্ডিংএ আমাদের থাকতে দিয়েছে, সেখানে রেখেছি।

বকুল বলে—বোর্ডিং কি জন্যে, আমাদের বাড়ি থাক না?

শঙ্কর মুখ নীচু করিয়া একটু হাসে। শ্যামা তাকায় মন্দার দিকে।

শঙ্করকে এখানে থাকার নিমন্ত্রণ জানায় কিন্তু সুপ্রভা। প্রথমে শঙ্কর রাজী হয় না, ভদ্রতার ফাঁকা ওজর করে, কলিকাতার ছেলে সে, ওসব কায়দা তার দুরন্ত। শেষে সুপ্রভার হাসি ও মিষ্টি কথার কাছে পরাজয় মানিয়া সে আতিথ্য স্বীকার করে। লজ্জার যে আবরণটি লইয়া সে এ-বাড়িতে ঢুকিয়াছিল ক্রমে ক্রমে তাহা খসিয়া যায়, কানু ও কালুর সঙ্গে তাহার ভাব হয়, বিধানের পড়ার ঘরে খানিক হৈ-চৈ করিয়া উঠানে তাহারা মার্বেল খেলে, তারপর স্কুলের বেলা হইলে সকলে স্নান করিতে যায় পুকুরে।

শ্যামা বারণ করিয়া বলে—সাঁতার জান না, তুমি পুকুরে যেও না শঙ্কর। জল তুলে এনে দিক, তুমি ঘরে স্নান কর।

শঙ্কর বলিয়া যায়—বেশি জলে যাব না মাসিমা।

তবু শ্যামার বড় ভয় করে। বিধান, বকুল, মণি এরা সাঁতার শিখিয়াছে। কালু ও কানু তো পাকা সাঁতারু, পুকুরের জল তোলপাড় করিয়া ওরা স্নান করিবে; উৎসাহের মাথায় শঙ্করের কি খেয়াল থাকিবে সে সাঁতার জানে না? বাড়ির একজন চাকরকে সে পুকুরে পাঠাইয়া দেয়। খানিক পরে হৈ-চৈ

করিতে করিতে সকলে ফিরিয়া আসে, শঙ্কর আসে বিধান ও চাকরটার গায়ে ভর দিয়া এক পায়ে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে। শামুকে না কিসে শঙ্করের পা কাটিয়া দরদর করিয়া রক্ত পড়িতেছে।

বকুল দুরন্ত দুঃসাহসী মেয়ে, বকিলে, মারিলে, ব্যথা পাইলে সে কাঁদে না কিন্তু রক্ত দেখিলে সে ভয় পায়, ধূলা-কাদা ধুইয়া শ্যামা যতক্ষণ শঙ্করের পা বাঁধিয়া দেয় সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে থাকে।

মন্দা ধমক দিয়া বলে—তোর পা কেটেছে নাকি, তুই অত কাঁদছিস কি জন্যে? কেঁদে মেয়ে একেবারে ভাসিয়ে দিলেন!

শঙ্কর বলে—কেঁদো না বুকু, বেশি কাটে নি তো!

আগে বিধান হয়তো শঙ্করের জন্য অনায়াসে সাতদিন স্কুল কামাই করিত, এখন পড়াশোনার চেয়ে বড় তাহার কাছে কিছু নাই, সে স্কুলে চলিয়া গেল। কানু ও কালু কোনো উপলক্ষে স্কুল কামাই করিতে পারিলে বাঁচে, অতিথির তদ্বিরের জন্য বাড়িতে থাকিতে তারা রাজী ছিল, মন্দার জন্য পারিল না। স্কুলে গেল না শুধু বকুল! সারা দুপুরে এক মুহূর্তের জন্যে সে শঙ্করের সঙ্গ ছাড়িল না। এ যেন তার বাড়ি-ঘর, শঙ্কর যেন তারই অতিথি, সে ছাড়া আর কে শঙ্করকে আপ্যায়িত করিবে। ফণীকে ঘুম পাড়াইয়া তাহার অবিশ্রাম বকুনি শুনিতে শুনিতে শ্যামার চোখও ঘুমে জড়াইয়া আসে,—বকুলের মুখে যেন ঘুমপাড়ানি গান। বাড়ির কারোর সঙ্গে ও মেয়েটার স্নেহের আদান-প্রদান নাই, কারো সোহাগ-মমতায় ও ধরা-ছোঁয়া দেয় না, অনুগ্রহের মতো করিয়া সুপ্রভার ভালবাসাকে একটু যা গ্রহণ করে, শঙ্করের সঙ্গে এত ওর ভাব হইল কিসে, পরের ছেলে শঙ্কর? এক তার পাগল ছেলে বিধান, আর এক পাগলী মেয়ে বকুল,—মন ওদের বুঝিবার জো নাই। শ্যামা যে এত করে মেয়েটার জন্য, দু মিনিট ওর অদ্ভুত অনর্গল বাণী শুনিবার জন্য লুব্ধ হইয়া থাকে, কই শ্যামার সঙ্গে কথা তো বকুল বলে না? কাছে টানিয়া আদর করিতে গেলে মেয়ে ছটফট করে, জননীর দুটি স্নেহ-ব্যাকুল বাহু যেন ওকে দড়ি দিয়া বাঁধে। জগতে কে কবে এমন মেয়ে দেখিয়াছে?

শ্যামা একটা হাই তোলে। জিজ্ঞাসা করে—হ্যাঁ শঙ্কর। আমাদের বাড়ির দিকে কখনো যাও-টাও বাবা? হারান ডাক্তার ভাড়াটে এনে দিলেন, তার নামটাও জানি নে।

শঙ্কর বলে—ভাড়াটে কই, কেউ আসে নি তো? সদর দরজায় তালা বন্ধ।

শ্যামা হাসিল—তুমি জান না শঙ্কর—এক মাসের ওপর ভাড়াটে এসেছে, পঁচিশ টাকা ভাড়া দিয়েছে,—ওদিকে তুমি যাও নি কখনো।

শঙ্কর বলে—না মাসিমা, আপনাদের বাড়ি খালি পড়ে আছে, কেউ নেই বাড়িতে। জানলা কপাট বন্ধ, সামনে বাড়িভাড়ার নোটিশ ঝুলছে—আমি কদ্দিন দেখেছি।

শ্যামা অবাক হইয়া বলে—তবে কি ভাড়াটে উঠে গেল?

—আপনি যাদের ভাড়া দিয়েছিলেন তারা যাবার পর কেউ আসে নি মাসিমা। আমি যাই যে মাঝে মাঝে নকুড়বাবুর বাড়ি, আমি জানি নে?—শঙ্কর হাসে, ভাড়াটে এলে কি বাইরে তালা দিয়ে লুকিয়ে থাকত?

হারান তবে ছুতা করিয়া তাহাকে অর্থ-সাহায্য করিতেছে? হারানের কাছে কোনোদিন টাকা সে চাহে নাই, কেবল ভাড়াটে উঠিয়া যাওয়া উপলক্ষে হারানকে সেই যে সে চিঠি লিখিয়াছিল, সেই চিঠিতে দুঃখের কাঁদুনি গাহিয়াছিল অনেক। তাই পড়িয়া হারান তাহাকে পঁচিশ টাকা পাঠাইয়া দিয়াছে, যতদিন বাড়িতে তাহার ভাড়াটে না আসে, মাসে মাসে নিজেই তাহাকে এই টাকাটা দেওয়া ঠিক করিয়াছে হারান? সংসারে আত্মীয় পর সত্যই চেনা যায় না। শ্যামা কে হারানের? শ্যামার মতো দুঃখিনীর সংশ্রবে হারানকে সর্বদা আসিতে হয়, শ্যামার জন্য এত তার মমতা হইল কেন?

তিন দিন পরে শঙ্কর কলিকাতা চলিয়া গেল। এই তিন দিন সে ভাল করিয়া হাঁটিতে পারে নাই, ঘরের মধ্যে সে বন্দী হইয়া থাকিয়াছে। মজা হইয়াছে বকুলের। বাড়ির ছেলেরা বাহিরে চলিয়া গেলে একা সে শঙ্করকে দখল করিতে পারিয়াছে। শঙ্কর চলিয়া গেলে ক'দিন বকুল মনমরা হইয়া রহিল।

তিন-চারদিন পরে হারানের মনিঅর্ডার আসিল। সই করিয়া টাকা নেওয়ার সময় শ্যামার মনে হইল গভীর ও গোপন একটি মমতা দূর হইতে তাহার মঙ্গল কামনা করিতেছে, স্বার্থ ও বিদ্বেষ ভরা এই জগতে যার তুলনা নাই। দুঃখের দিনে কোথায় রহিল সেই বিষ্ণুপ্রিয়া, স্বামীর পাপের ছাপ-মারা সন্তান গর্ভে লইয়া একদিন যে ভিখারিণীর মতো জননী শ্যামার সখ্য চাহিয়াছিল? যার এক মাসের পেট্রোল খরচ পাইলে সন্তানসহ শ্যামা দুমাস বাঁচিয়া থাকিতে পারিত?

টাকার প্রাপ্তিসংবাদ দিয়া হারানকে সে একখানা পত্র লিখিল। হারানের ছল সে যে ধরিতে পারিয়াছে সে সব কিছু লিখিল না, লিখিল আর জন্মে সে বোধ হয় হারানের মেয়ে ছিল, হারান তার জন্য যা করিয়াছে এবং করিতেছে জীবনে কখনো কি শ্যামা তাহা ভুলিবে? এমনি আবেগপূর্ণ অনেক কথাই শ্যামা লিখিল।

হারান জবাবও দিল না!

না দিক। শ্যামা তো তাহাকে চিনিয়াছে। শ্যামার দুঃখ নাই।

শীতলের সঙ্গে শ্যামার যোগসূত্র শীতলের কয়েদ হওয়ার গোড়াতেই ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, জেলে গিয়া কখনো সে শীতলের সঙ্গে দেখা করে নাই, চিঠিপত্রও লেখে নাই। কোথায় কোন জেলে শীতল আছে তাও শ্যামা জানে না। আগে জানিবার ইচ্ছাও হইত না! এখন শীতলের ছাড়া পাওয়ার সময় হইয়া আসিয়াছে। সে কোথায় আছে, কবে খালাস পাইবে মাঝে মাঝে শ্যামার জানিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু জানিবার চেষ্টা সে করে না। শীতলকে কাছে পাইবার বিশেষ আগ্রহ শ্যামার নাই। সব সময় সে যে স্বামীর উপর রাগ ও বিদ্বেষ অনুভব করে তাহা নয়, বরং কোথায় লোহার শিকের অন্তরালে পাথর ভাঙিয়া সে মরিতেছে ভাবিয়া সময় সময় মমতাই সে বোধ করে, তবু মনে তাহার কেমন একটা ভয় জন্মিয়া গিয়াছে। শীতল ফিরিয়া আসিলে আবার সে দারুণ কোনো বিপদে পড়িবে। তা ছাড়া ব্যস্ত হইয়া লাভ কি! ছাড়া পাইলে স্ত্রী-পুত্রকে শীতল খুঁজিয়া লইবে নাকি?

বেশ শান্তিতে আছে সে। নাইবা রহিল তাহার নিজের বাড়িতে থাকিবার আনন্দ, আর্থিক স্বচ্ছলতার সুখ? এখানে ছেলেমেয়েদের শরীর ভাল আছে, বিধানের অদ্ভুত পড়াশোনার ফল ফলিতেছে, স্কুলের হেডমাস্টার নিজে রাখালকে বলিয়াছেন বিধানের মতো ছেলে ক্লাশে দুটি নাই। শ্যামা আবার আশা করিতে পারে, ধূসর ভবিষ্যতে আবার রঙের ছাপ লাগিতে থাকে। নাইবা রহিল তাহার নিকট আশা ভরসা, একদিন ছেলে তাহাকে সুখী করিবে।

কেবল পড়িয়া পড়িয়া বিধান রোগা হইয়া যাইতেছে, এত ও রাত জাগিয়া

পড়ে! যেমন পরিশ্রম করে তেমন খাওয়া ছেলেটা পায় না। পরের বাড়িতে কেই বা হিসাব করে যে একটা ছেলে দিবারাত্রি খাটিতেছে একটু ওর ভাল-মতো খাওয়া পাওয়া দরকার, দুধ-ঘির প্রয়োজন ওর সবচেয়ে বেশি? শ্যামা কি করিবে? চাহিয়া চিন্তিয়া চুরি করিয়া যতটা পারে ভাল জিনিস বিধানকে খাওয়ায়, কিন্তু বেশি বাড়াবাড়ি করিতে সাহস পায় না। এ আশ্রয় ঘুচিয়া গেলে তার তো উপায় থাকিবে না।

মন্দা যখন চেঁচামেচি করিতে থাকে: একি কাণ্ড বাবা এ বাড়ির, ভূতের বাড়ি নাকি এটা, সন্দেশ করে পাথরের বাটি ভরে রাখলাম বাটি অর্ধেক হল কি করে? এ কাজ মানুষের, বড় মানুষের, বিড়েলেও নেয় নি, ছেলেপিলেও খায় নি—নিয়ে দিব্যি আবার থাপরে-থুপরে সমান করে রাখার বুদ্ধি ছেলে-পিলের হবে না—শ্যামার বুকের মধ্যে তখন টিপ টিপ করে। অর্ধেক? অর্ধেক তো সে নেয় নাই! যৎসামান্য নিয়াছে। মন্দা টের পাইল কেমন করিয়া?

সুপ্রভা বলে—অমন করে বোলো না দিদি, লক্ষ্মী—যে নিয়েছে, খাবার জিনিস নিয়েছে তো, বড় লজ্জা পাবে দিদি।

মন্দা বলে—তুই অবাক করলি বোন, চোর লজ্জা পাবে বলে বলতে পারব না চুরির কথা?

সুপ্রভা মিনতি করিয়া বলে—বলে আর লাভ কি দিদি? এবার থেকে সাবধানে রেখো।

তবু শ্যামা পরিশ্রমী সন্তানের জন্য খাদ্য চুরি করে। দুধ জাল দিতে গিয়া সুযোগ পাইলেই দুধে সরে খানিকটা লুকাইয়া ফেলে, দুধ গরম করিলে সর তো যায় গলিয়া, টের পাইবে কে? রাঁধিতে রাঁধিতে দুখানা মাছভাজা শ্যামা শালপাতায় জড়াইয়া কাপড়ের আড়ালে গোপন করে, ঘরে গিয়া কখন সে তাহা লুকাইয়া আসে কে জানিবে? এমনি সব ছোট ছোট চুরি শ্যামা করে, গোপনে চুরি করা খাবার বিধানকে খাওয়ায়। একবার খানিকটা গাওয়া ঘি যোগাড় করিয়া সে বড় মুস্কিলে পড়িয়াছিল। রাখালের ছেলেমেয়ে ছাড়া আর সকলকে একসঙ্গে বসিয়া খাইতে হয়, আগে অথবা পরে। একা খাইলেও রান্নাঘরে খাইতে হয় ভাত, দাওয়ায় খাইতে হয় জলখাবার, সকলের

চোখের সামনে। কেমন করিয়া ঘিটুকু ছেলেকে খাওয়াইবে শ্যামা ভাবিয়া পায় নাই। বলিয়াছিল, এমনি একটু একটু খেয়ে ফেলো না খোকা, পেটে গেলেই পুষ্টি হবে!

তাই কি মানুষ পারে, কাঁচা ঘি শুধু খাইতে?

শেষে মুড়ির সঙ্গে মাখিয়া দিয়া একটু একটু করিয়া শ্যামা ঘিটুকুর সদ্‌গতি করিয়াছিল।

খোকার তখন বাৎসরিক পরীক্ষা চলিতেছে, একদিন সকালে শ্যামাকে ডাকিয়া রাখাল বলিল—জান বৌঠান, শীতলবাবু তো খালাস পেয়েছেন আট-দশদিন হল। নকুড়বাবু পত্র লিখেছেন। তোমাদের কলকাতার বাড়িতে এসেই নাকি আছে, দিনরাত ঘরে বসে থাকে, কোথাও যায়-টায় না—

—পত্রখানা দেখি ঠাকুরজামাই?

নকুড়বাবু লিখিয়াছেন—শীতলের চেহারা কেমন পাগলের মতো হইয়া গিয়াছে, বোধ হয় সে কোনো অসুখে ভুগিতেছে, এতদিন হইয়া গেল কেহ তাহার খোঁজ খবর লইতে আসিল না দেখিয়া জ্ঞাতার্থে এই পত্র লিখিলাম।

রাখাল বলিল—তোমাদের বাড়িতে না ভাড়াটে আছে বৌঠান? শীতলবাবু ওখানে আছেন কি করে?

—কি জানি ঠাকুরজামাই, কিছু বুঝতে পারছি না। আপনি একবার যান না কলকাতা?

কথাটা এখানে প্রকাশ করিতে শ্যামা রাখালকে বারণ করিয়া দিল। বিধান পরীক্ষা দিতেছে, এখন এই সংবাদ পাইলে হয়তো সে উত্তেজিত হইয়া উঠিবে, ভাল লিখিতে পারিবে না।

—বছরকার পরীক্ষা সহজ তো নয় ঠাকুরজামাই, এখন কি ওকে ব্যস্ত করা উচিত?

পাগলের মতো চেহারা হইয়া গিয়াছে? অসুখে ভুগিতেছে? বিধানের পরীক্ষা না থাকিলে শ্যামা নিজে দেখিতে যাইত। কিন্তু এখানে শীতল আসিল না কেন? লজ্জায়? কি অদৃষ্ট মানুষটার? দু বছর জেল খাটিয়া বাহির হইয়া আসিল, ছেলেমেয়ের মুখ দেখিবে, স্ত্রীর সেবা পাইবে, তার বদলে খালি বাড়িতে মুখ লুকাইয়া একা অসুখে ভুগিতেছে! এত লজ্জাই

বা কিসের? আত্মীয়স্বজনকে মুখ কি দেখাইতে হইবে না।

শনিবারের আগে রাখালের কলিকাতা যাওয়ার উপায় ছিল না। দু দিন ধরিয়া শ্যামা তাহার দুর্ভাগ্য স্বামীর কথা ভাবিল। ভাবিতে ভাবিতে আসিল মমতা।

শ্যামা কি জানিত নকুড়বাবুর চিঠির কথাগুলি যে ছবি তাহার মনে আঁকিয়া দিয়াছিল পরীক্ষায় ব্যস্ত সন্তানের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবার সময়ও তাহা সে ভুলিতে পারিবে না, এত সে গভীর বিষাদ বোধ করিবে? শনিবার রাখালের সঙ্গে সে কলিকাতা রওনা হইল। সঙ্গে লইল শুধু ফণীকে। বিধানকে বলিয়া গেল সে বাড়িটা দেখিয়া আসিতে যাইতেছে, কলি ফেরানোর ব্যবস্থা করিয়া আসিবে, যদি কোনো মেরামতের দরকার থাকে তাও করিয়া আসিবে।

—আমার কথা ভেবো না বাবা, ভাল করে পরীক্ষা দিও, কেমন? ছোট পিসীর কাছে খাবার চেয়ে খেও? আর বকুলকে যেন মেরো না খোকা।

বাড়ি পৌঁছিতে সন্ধ্যা পার হইয়া গেল। সদর দরজা বন্ধ, ভিতরে আলো জ্বলিতেছে কিনা বোঝা যায় না, শীতের রাত্রে সমস্ত পাড়াটাই স্তব্ধ হইয়া আছে, তার মধ্যে শ্যামার বাড়িটা যেন আরও নিঝুম। অনেকক্ষণ দরজা ঠেলাঠেলির পর শীতল আসিয়া দরজা খুলিল। রাস্তার আলোতে তাকে দেখিয়া শ্যামা কাঁদিয়া ফেলিল। চোখ মুছিয়া ভিতরে ঢুকিয়া সে দেখিল চারিদিকে অন্ধকার, একটা আলোও কি শীতল জ্বালায় না সন্ধ্যার পর? ফণী ভয়ে তাহাকে সবলে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল, অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়াইয়া শ্যামা শিহরিয়া উঠিল। এমনি সন্ধ্যাবেলা একদিন সে এখানে প্রথম স্বামীর ঘর করিতে আসিয়াছিল, সেদিনও এমনি ছাড়াবাড়ির আবহাওয়া তাহার নিশ্বাস রোধ করিয়া দিতেছিল, সেদিনও তাহার কান্না আসিতেছিল এমনি ভাবে। শুধু, সেদিন বারান্দায় জ্বালানো ছিল টিমটিমে একটা লণ্ঠন।

শীতল বিড় বিড় করিয়া বলিল—মোমবাতি ছিল, সব খরচ হয়ে গেছে।

রাখাল গিয়া মোড়ের দোকান হইতে কতকগুলি মোমবাতি কিনিয়া আনিল। এই অবসরে শ্যামা হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া ঘরে গিয়া বসিয়াছে, বাহিরে বড় ঠাণ্ডা।

শীতলকে দুটো একটা কথাও সে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, প্রায় অবান্তর কথা, জ্ঞাতব্য প্রশ্ন করিতে কি জানি শ্যামার কেন ভয় করিতেছিল। ভিতরে ঢুকিবার আগে রাস্তার আলোতে শীতলের পাগলের মতো মূর্তি দেখিয়া শ্যামা তো কাঁদিয়াছিল, অন্ধকার ঘরে সে বেদনা কি ভয়ে পরিণত হইয়াছে?

রাখাল ফিরিয়া আসিয়া একটা মোমবাতি জ্বালিয়া জানালায় বসাইয়া দিল। ঘরে কিছু নাই, তক্তপোষের উপর শুধু একটা মাদুর পাতা, আর ময়লা একটা বালিশ। মেঝেতে একরাশ পোড়া বিড়ি আর কতকগুলি শালপাতা ছড়ানো। যে জামাকাপড়ে দু বছর আগে শীতল রাত দুপুরে পুলিসের সঙ্গে চলিয়া গিয়াছিল তাই সে পরিয়া আছে, কাপড় বোধ হয় তাহার ওই একখানা, কি যে ময়লা হইয়াছে বলিবার নয়, রাত্রে বোধ হয় সে শুধু আলোয়ানটা মুড়ি দিয়া পড়িয়া থাকে, চৌকির বাহিরে অর্ধেকটা এখন মাটিতে লুটাইতেছে। এসব তবুও যেন চাহিয়া দেখা যায়, তাকানো যায় না শীতলের মুখের দিকে। চোখ উঠিয়া, মুখ ফুলিয়া বীভৎস দেখাইতেছে তাহাকে, হাড় ক'খানা ছাড়া শরীরে বোধ হয় কিছু নাই।

শীতল দাঁড়াইয়া থাকে, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে কাঁপে। তারপর সহসা শ্যামার কি হয় কে জানে, ফণীকে জোর করিয়া নামাইয়া দিয়া জননীর মতো ব্যাকুল আবেগে শীতলকে জড়াইয়া ধরিয়া টানিয়া আনে, শিশুর মতো আলগোছে শোয়াইয়া দেয় মাদুরে, বলে—এমন করে ভুগছ, আমাকে একটা খপরও তুমি দিলে না গো।

পরদিন সকালে সে হারান ডাক্তারকে ডাকিয়া পাঠাইল। হারানকে খবর দিলে পঁচিশ টাকা বাড়িভাড়া পাঠানোর ছলনাটুকু যে ঘুচিয়া যাইবে শ্যামা কি তা ভাবিয়া দেখিল না। ভাবিল বৈকি। রাত্রে কথাটা মনে মনে নাড়াচাড়া করিয়া সে দেখিয়াছে, হারানের মহৎ ছলনাকে বাঁচাইয়া রাখার জন্য হারানকে তার ছলনা করা উচিত নয়। সে যে এখানে আসিয়া জানিতে পারিয়াছে বাড়িতে তাহার ভাড়াটে আসে নাই, হারান দয়া করিয়া মাসে মাসে তাকে টাকা পাঠায়—এটা হারানকে জানিতে দেওয়াই ভাল। পরে যদি হারান জানিতে পারে শ্যামা কলিকাতা আসিয়াছিল? তখন কি হইবে? হারান কি তখন মনে করিবে না যে সব জানিয়াও টাকার লোভে শ্যামা চুপ করিয়া আছে?

হারান আসিলে শ্যামা তাহাকে প্রণাম করিল। বলিল—ভাল আছেন

বাবা আপনি? কাল সন্ধ্যাবেলা এসে পৌঁছেচি আমি, আগে তো জানতে পারি নি কবে খালাস পেয়ে এখানে এসে পড়ে রয়েছে,—বিপদের ওপর কি যে আমার বিপদ আসছে বাবা কোনো দিকে কূল-কিনারা দেখতে পাই নে। সমস্ত মুখ ফুলে গিয়েছে, শরীরে দারুণ জ্বর, ডাকলে ডুকলে সাড়াও ভাল করে দেয় না বাবা।—শ্যামা চোখ মুছিতে লাগিল।

হারান যেন অপরিবর্তনীয়, মাথার চুলে পাক ধরিবে, দেহে বার্ধক্য আসিবে তবু সে কণামাত্র বদলাইবে না, বিধানের প্রথম অসুখের সময় দেখিতে আসিয়া যেমন নির্মমভাবে শ্যামাকে সে কাঁদিতে বারণ করিয়াছিল, আজও তেমনি ভাবে বারণ করিল। শ্যামার জীবনে রহস্যময়, দুর্বোধ্য মানুষের পদার্পণ আরও ঘটিয়াছে বৈকি, গোড়ায় ছিল রাখাল, তারপর আসিয়াছিল মামা তারাশঙ্কর, কিন্তু এই লোকটির সঙ্গে তাদের তুলনা হয় না, একে একে তাদের রহস্যের আবরণ খসিয়া গিয়াছে, হারান শুধু চিরকাল যবনিকার আড়ালে রহিয়া গেল। শ্যামাকে যদি সে স্নেহ করে, স্নেহের পাত্রীকে দেখিয়া একবিন্দু খুশী কি তাহার হইতে নাই? আজ হারান ডাক্তার শুধু রোগী দেখিতে আসার মতো শ্যামার বাড়ী আসিবে, আত্মীয় বলিয়া ধরা দিবে না?

শীতলকে হারান অনেকক্ষণ পরীক্ষা করিল।

বাহিরে আসিয়া রাখাল ও শ্যামাকে বলিল—কদ্দিন জ্বরে ভুগছে জানি নে বাবু আমি, জিজ্ঞাসা করলে বলতে চায় না। অনেকদিন থেকে না খেয়ে শুকোচ্ছে সেটা বুঝতে পারি! তারপর লাগিয়েছে ঠাণ্ডা। সব জড়িয়ে অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে সারতে সময় নেবে,—বড় ডাক্তার ডাকতে চাও ডাকো আমি বারণ করি নে, কিন্তু, ডাক্তার ফাক্তার ডাকা মিছে, তাও বলে রাখছি,—ওর সব চেয়ে দরকার বেশি সেবাযত্নের।

বড় ডাক্তার? হারানের চেয়ে বড় ডাক্তার কে আছে শ্যামা তো জানে না! শুনিয়া হারান খুশী হয়। বলে, দাও দিকি কাগজ কলম, ওষুদ লিখি। আর মন দিয়ে শোন যা যা বলে যাই, এতটুকু এদিক ওদিক হলে চলবে না,—টুকেই নাও না কথাগুলো আমার? মনে যা থাকবে আমার জানা আছে।

একে একে হারান বলিয়া যায়,—ওষুদ, পথ্য, সেবার নির্দেশ। ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া সময় বাঁধিয়া দেয়। বারবার সাবধান করে, এতটুকু এদিক ওদিক নয়,

আটটায় যে ওষুদ দেওয়ার কথা দিতে যেন আটটা বাজিয়া পাঁচ মিনিটও না হয়, যখন দু চামচ ফুড দেওয়ার কথা, তিন চামচ যেন তখন না পড়ে।

শ্যামা ভয়ে ভয়ে বলে—কোনো ব্যবস্থাই তো নেই এখানে, খালি বাড়িতে এসে উঠেছি আমরা, বনগাঁ কি নিয়ে যাওয়া যাবে না?

হারান যেন আনমনেই বলে—বনগাঁ? তা চল, বনগাঁতেই নিয়ে যাই,—একটা দিন আমার নষ্ট হবে, হলে আর উপায় কি? জ্বর করে, না খেয়ে, ঠাণ্ডা লাগিয়ে কি কাণ্ডই বাধিয়ে রেখেছে হতভাগা। ক'টায় গাড়ি? দেড়টায়? তবে সময় আছে ঢের, যাও দিকি তুমি রাখাল ওষুদপত্রগুলি নিয়ে এসো কিনে, আমি রোগী দেখে আসছি ঘুরে এগারোটার মধ্যে। —দুটো পান আমায় দিতে পার ছেঁচে? দোক্তা থাকে তো দিও খানিকটা।

হারান বুড়া হইয়া গিয়াছে, পান চিবাইতে পারে না, ছেঁচা পান খায়। কিন্তু হারান বদলায় নাই। বুড়া হইতে হইতে সে মরিয়া যাইবে, তবু বোধহয় বদলাইবে না। শ্যামা কি জানে না আত্মীয়তা করিয়া শীতলকে সে বনগাঁ পৌঁছাইয়া দিতে যাইতেছে না, যাইতেছে ডাক্তার হইয়া রোগীর সঙ্গে? শ্যামার বলার অপেক্ষা রাখে নাই! তা সে কোনো দিনই রাখে না। সেই প্রথমবার বিধানের অসুখের সময় জ্বরতপ্ত শিশুটিকে সে যে গামলার ঠাণ্ডা জলে ডুবাইয়াছিল, সেদিনও সে শ্যামার বলার অপেক্ষা রাখে নাই। যা করা উচিত হারান তাই করে। হারানের স্নেহ নাই, আত্মীয়তা নাই, কোমলতা নাই, কতবার ভুল করিয়া শ্যামা ভাবিয়াছে হারান তাহাকে মেয়ের মতো ভালবাসে! তাই যদি সে বাসিবে তবে বাড়িভাড়ার নাম করিয়া টাকা শ্যামাকে সে পাঠাইবে কেন? সোজাসুজি পাঠাইতে কে তাকে বারণ করিয়াছিল? পরের দান গ্রহণ করিতে অন্য সকলের কাছে শ্যামা লজ্জা পাইবে, এই জন্য? হারানের মধ্যে ওসব দুর্বলতা নাই। কে কোথায় কি কারণে লজ্জা পাইবে হারান কি কখনো তা ভাবে? স্নেহ মনে করিয়া শ্যামা পাছে কাছে ঘেঁষিতে চায়, শ্যামা পাছে মনে করে অযাচিত দানের পেছনে হারানের মমতার উৎস লুকাইয়া আছে, আত্মীয়তা দাবী করার সুযোগ পাছে শ্যামাকে দেওয়া হয়, তাই না হারান তাহার দানকে শ্যামার প্রাপ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল!

অভিমানে শ্যামার কান্না আসে। অভিমানে কান্না আসিবার বয়স তাহার নয়, তবু মনের মধ্যে আজো যে অবুঝ কাঁচা মেয়েটা লুকাইয়া আছে যে বাপের স্নেহ জানে নাই, অসময়ে মাকে হারাইয়াছে, ষোল বছর বয়স হইতে জগতে একমাত্র আপনার জন মামাকে খুঁজিয়া পায় নাই, স্বামীর ভয়ে দিশেহারা হইয়া থাকিয়াছে, সে যদি আজ কাঁদিতে চায় প্রৌঢ়া শ্যামা তাহাকে বারণ করিতে পারিবে কেন ?

তাহারা বনগাঁ পৌঁছিলে মন্দা শীতলকে দেখিয়া একটু কাঁদিল, তারপর তাড়াতাড়ি তার জন্য বিছানা পাতিয়া দিল, এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিয়া ভারি ব্যস্ত হইয়া পড়িল সে, সেবাযত্নের ব্যবস্থা করিল, ছেলেমেয়েদের সরাইয়া দিল, শ্যামাকে বলিতে লাগিল—ভেবো না তুমি বৌ, ভেবো না,—ফিরে যখন পেয়েছি দাদাকে ভাল করে আমি তুলবই !

বকুল বিস্ফারিত চোখে শীতলকে খানিকক্ষণ চাহিয়া দেখিল, তারপর সে যে কোথায় গেল কেহ আর তাহাকে খুঁজিয়া পায় না। হারান ডাক্তারকেও নয়। কোথায় গেল দুজনে? শেষে সুপ্রভাই তাদের আবিষ্কার করিল বাড়ির পিছনে ঢেঁকিঘরে। ওমা, বকুল খেলাঘর পাতিয়াছে? ঢেঁকিটার উপরে পাশাপাশি বসিয়া গম্ভীর মুখে কি যে তাহারা আলোচনা করিতেছিল তারাই জানে, সুপ্রভা দেখিয়া হাসিয়া বাঁচে না। ডাক্তার নাকি বুড়া? জগতে এত জায়গা থাকিতে, কথা বলিবার এত লোক থাকিতে, বুড়া ঢেঁকিঘরে বসিয়া আলাপ করিতেছে বকুলের সঙ্গে !

—যা তো খোকা ডেকে আন ওদের। বুড়োকে বল মুখহাত ধুয়ে নিতে,—খেতে-টেতে দি। তোর বাবা কি খাবে তাও তো বলে দিলে না, ঢেঁকিঘরে গিয়ে বসে রয়েছে ?

হারান আসে, মুখ হাত ধোয়, সুপ্রভা ঘোমটা টানিয়া তাহাকে জলখাবার দেয়। বকুল কিন্তু ঢেঁকিঘরেই বসিয়া থাকে। সুপ্রভা গিয়া বলে—ও বুকু, খাবি নে তুই ? তোর বাবা এল, তুই এখেনে বসে আছিস ?

—ও আমার বাবা নয় !

—শোন কথা মেয়ের !—সুপ্রভা হাসে—আয়, চলে আয় আমার সঙ্গে, একলাটি এখানে তোকে বসে থাকতে হবে না।

রাত্রিটা এখানে থাকিয়া পরদিন সকালে হারান কলিকাতা চলিয়া গেল। শ্যামা সাবধান হইয়া গিয়াছিল, হারানকে অতিরিক্ত আত্মীয়তা জানাইবার কোনো চেষ্টাই সে করিল না। যাওয়ার সময় শুধু ঘটা করিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—মেয়েকে ভুলবেন না বাবা।

খুব ধীরে ধীরে শীতল আরোগ্যলাভ করিতে লাগিল। সে নিঝুম নিশ্চুপ হইয়া গিয়াছে। আপনা হইতে কথা সে একেবারেই বলে না, অপরে বলিলে কখনো দু-এক কথায় জবাব দেয়, কখনো কিছু বলে না। কেহ কথা বলিলে বুঝিতে যেন তাহার দেরি হয়। ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধও যেন তাহার নাই, খাইতে দিলে খায়, না দিলে কখনো চায় না। চুপচাপ বিছানায় পড়িয়া থাকিয়া সে যে ভাবে তা তো নয়। এখানে আসিয়া ক'দিনের মধ্যে চোখ-ওঠা তাহার সারিয়া গিয়াছে, সব সময় সে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। দু বছর জেল খাটিলে মানুষ কি এমনি হইয়া যায়? কবে ছাড়া পাইয়াছিল শীতল? কলিকাতার বাড়িতে আসিয়াই সে তো ছিল দশ বারো-দিন, তার আগে? প্রথমে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া কিছু জানা যায় না। পরে অল্পে অল্পে জানা গিয়াছে, পনের কুড়ি দিন কোথায় কোথায় ঘুরিয়া শীতল কলিকাতার বাড়িটাতে আশ্রয় লইয়াছিল। জানিয়া শ্যামার বড় অনুতাপ হইয়াছে। এই দারুণ শীতে একখানা আলোয়ান মাত্র সম্বল করিয়া স্বামী তাহার এক মাসের উপর কপর্দকহীন অবস্থায় যেখানে সেখানে কাটাইয়াছে। জেলে থাকিবার সময় শীতলের সঙ্গে সে যোগসূত্র রাখে নাই কেন? তবে তো সময় মতো খবর পাইয়া ওকে সে জেলের দেউড়ি হইতে সোজা বাড়ি লইয়া আসিতে পারিত?

প্রাণ দিয়া শ্যামা শীতলের সেবা করে। শ্রান্তি নাই, শৈথিল্য নাই, অবহেলা নাই। চারিটি সন্তান শ্যামার? আর একটি বাড়িয়াছে। শীতল তো এখন শিশু।

পরীক্ষার ফল বাহির হইলে জানা গিয়াছে বিধান ক্লাশে উঠিয়াছে প্রথম হইয়া।

আট

বনগাঁয়ে শ্যামার একে একে আরও চার বছর কাটিয়া গেল।

কলিকাতার বাড়িটা তাহাকে বিক্রয় করিয়া দিতে হইয়াছে। মাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া বিধান যখন কলিকাতায় পড়িতে গেল—শীতলের প্রত্যাবর্তনের এক বছর পর।

শীতলের অসুখের জন্য অনেক টাকা খরচ করিতে না হইলে রাখাল হয়তো শেষ পর্যন্ত বিধানের পড়ার খরচ দিতে রাজী হইত। বড় খারাপ অসুখ হইয়াছিল শীতলের। বেশী জ্বর, অনাহার, দারুণ শীতে উপযুক্ত আবরণের অভাব, মানসিক পীড়া, এই সব মিলিয়া শীতলের স্নায়ুরোগ জন্মাইয়া গিয়াছিল, দেহেরে সমস্ত স্নায়ু তাহার উঠিয়াছিল ফুলিয়া। চিকিৎসার জন্য তাহাকে কলিকাতা লইয়া যাইতে হইয়াছিল। তিনমাস সে পড়িয়া ছিল হাসপাতালে। তারপর শ্যামার কাঁদা-কাটায় রাখাল আরও তিনমাস তাহার বৈদ্যুতিক চিকিৎসা চালাইয়াছিল। তার ফলে যতদূর সুস্থ হওয়া সম্ভব শীতল তো হইয়াছে। কিন্তু জীবনে সে যে কাজকর্ম কিছু করিতে পারিবে সে ভরসা আর নাই। যতখানি তাহার অক্ষমতা নয়, ভান করে সে তার চেয়ে বেশি। শুইয়া বসিয়া অলস অকর্মণ্য দায়িত্বহীন জীবন যাপনের সুখটা টের পাইয়া হয়তো সে মুগ্ধ হইয়াছে। হয়তো সে সত্যই বিশ্বাস করে দারুণ সে অসুস্থ, কর্মজীবনের তাহার অবসান হইয়াছে। হয়তো সে হিষ্টিরিয়াগ্রস্থ, অসুখের অজুহাতে সকলের দয়া ও সহানুভূতি, মমতা ও সেবা লাভ করার চেয়ে বড় আর তার কাছে কিছুই নাই। তবে সবটা শীতলের ফাঁকি নয়, শরীরে তাহার গোলমাল আছে, মাথাটা ভোঁতা হইয়া যাওয়াও কাল্পনিক নয়, অসুখের যে বাড়াবাড়ি ভানটুকু সে করে তার ভিত্তিও তো মানসিক রোগ।

তবু ছেলের পড়া চালানোর জন্য বাড়িটা শ্যামার হয়তো বিক্রয় করিতে হইত না, যদি বাঁচিয়া থাকিত হারান ডাক্তার। বিধানকে হারানের বাড়ি পাঠাইয়া সে লিখিত, বাবা, জীবনপাত করে ওর স্কুলের পড়া সাঙ্গ করেছি, আর তো আমার সাধ্য নেই, এবার দিন বাবা ওর আপনি কলেজে পড়ার একটা ব্যবস্থা করে। হারান তা দিত। শ্যামার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু হারানের অনেক

বয়স হইয়াছিল, বিধানের স্কুলের পড়া শেষ হওয়া পর্যন্ত সে বাঁচিয়া থাকিতে পারিল কই?

হারান মরিয়াছে। মরিবে না? কপাল যে শ্যামার মন্দ! হারান বাঁচিয়া থাকিলে শ্যামার ভাবনা কি ছিল? বাড়িতে শ্যামার ভাড়াটে আসিয়াছিল, তারা কুড়ি টাকা পাঠাইত শ্যামাকে, আর হারান পাঠাইত পঁচিশ। হারানের মনিঅর্ডারের কুপনে কোনো অজুহাতের কথা লেখা থাকিত না, শুধু অপাঠ্য হাতের লেখায় স্বাক্ষর থাকিত—হারানচন্দ্র দে। শ্যামা তো তখন ছিল বড়লোক। কয়েক মাসে শ' দেড়েক টাকাও জমাইয়া ফেলিয়াছিল। কেন মরিল হারান? কত মানুষ সত্তর আশি বছর বাঁচিয়া থাকে, পঁয়ষট্টি পার হইতে না হইতে হারানের মরিবার কি হইয়াছিল?

শ্যামা কি করিবে? ভগবান যার প্রতি এমন বিরূপ, বাড়ি বিক্রি করিয়া না দিয়া তার উপায় কি!

শহরতলীর বাড়ি, তাও বড় রাস্তার উপরে নয়, দক্ষিণ খোলা নয়। একতলা পুরনো। বাড়ি বেচিয়া শ্যামা হাজার পাঁচেক টাকা পাইয়াছিল।

টাকা থাকিলে খরচ কেন বাড়িয়া যায় কে জানে। আগে ছোট-বড় অনেক খরচ মন্দার উপর দিয়া চালানো যাইত, কিন্তু পুঁজি যার পাঁচ হাজার টাকা সে কেন তা পারিবে? মন্দাই বা দিবে কেন? দুধের কথাটা ধরা যাক। দুধ অবশ্য কেনা হয় না, বাড়িতে পাঁচ-ছটা গরু আছে। কিন্তু গরুর পিছনে খরচ তো আছে? শ্যামার ছেলেমেয়েরা দুধ তো খায়? শ্যামা পাঁচ হাজার টাকা পাওয়ার মাসখানেক পরে মন্দা বলে—পয়সা কড়ি হাতে নেই বৌ, এ-মাসের খোল-কুঁড়োর দামটা দিয়ে দাও না,—সামনের মাসে আনাব'খন আমি।

কুঁড়ো কেনা হইবে কেন? সেদিন যে দু মণ চাল করা হইল তার কুঁড়ো গেল কোথায়? এবার মন্দা ধান ভানার মজুরি নগদ দেয় নাই। ধান যে ভানিয়াছে কুঁড়ো পাইয়াছে সে। মন্দা তাহা হইলে শ্যামার টাকাগুলি খরচ করাইয়া দিবার মতলব করিয়াছে? ঘরের ধানের কুঁড়ো পরকে দিয়া শ্যামাকে দিয়া কুঁড়ো কিনাইবে!

মাসের শেষে মুদি তাহার সাঁইত্রিশ টাকা পাওনা লইতে আসিয়াছে, মন্দা

তিনখানা দশ টাকার নোট গুনিয়া দেয়, একটু ইতস্তত করিয়া নগদ টাকাও দেয় একটা, তারপর শ্যামাকে বলে, ছটা টাকা কম পড়ল, দাও না বৌ টাকাটা দিয়ে?

বর্ষাকালে জল পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে শ্যামার ঘর দিয়া, দুখানা টিন বদলানো দরকার,—কে বদলাইবে টিন? বাড়ি মন্দার, ঘরখানা মন্দার, শ্যামা তো শুধু আশ্রিতা অতিথি,—মন্দারই তো উচিত ঘরখানা সারাইয়া দেওয়া। বলিলে মন্দা চুপ করিয়া থাকে। একটু পরেই সংসার খরচের দুটি একটি টাকা বাহির করিয়া দিবার সময় মন্দা এমন করিয়া বলিতে থাকে যে আর সে পারিয়া উঠিল না, এ যেন রাজার বাড়ি ঠাওরাইয়াছে সকলে, খরচ খরচ খরচ, চারিদিকে শুধু খরচ, খরচ ছাড়া আর কথা নাই—যে মনে হয় সে বুঝি শ্যামার ঘর সারাইয়া দিবার অনুরোধেরই জবাব দিতেছে এতক্ষণ পরে।

বাড়ি বেচিয়া এমনি কত খরচ যে শ্যামার বাড়িয়াছে। বলিবার নয়।

বিধানের কলিকাতার খরচ, মণি স্কুলে যাইতেছে তার খরচ, শীতলের জন্য খরচ, অসুখ-বিসুখের খরচ—শ্যামার তো মনে হইত মন্দার নয়, খরচ খরচ খরচ, চারিদিকে শুধু খরচ, তার।

আর বকুল? বকুলের জন্য শ্যামার খরচ হয় নাই?

গত বৈশাখে তেরশ' টাকা খরচ করিয়া বকুলের শ্যামা বিবাহ দিয়াছে। কমিতে কমিতে পাঁচ হাজারের যা অবশিষ্ট ছিল, বকুল একাই প্রায় তা শেষ করিয়া দিয়াছে।

বকুলের বিবাহ হইয়াছে, আমাদের সেই বকুলের? কার সঙ্গে বিবাহ হইয়াছে বকুলের, শঙ্করের সঙ্গে নাকি? পাগল! শঙ্করের সঙ্গে বকুলের বিবাহ হয় না।

যে বৈশাখে আমাদের বকুলের বিবাহ হইল, তার আগের ফাল্গুনে বিবাহ হইয়াছিল সুপ্রভার মেয়েটির, বিবাহের তিন-চারদিন আগে কলিকাতা হইতে বিধানের সঙ্গে শঙ্করও আসিয়াছিল। বয়সের আন্দাজে বকুল মস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, শঙ্কর ভাবিতে পারে নাই বকুল এত বড় হইয়াছে, আর এত লজ্জা হইয়াছে বকুলের, আর এত সুন্দর হইয়াছে সে। মেয়ের সম্বন্ধে শ্যামা যে এত সাবধান হইয়াছে তাও কি শঙ্কর জানিত? বিবাহের পরদিন দুপুরবেলা বকুলকে আর শ্যামা দেখিতে পায় না। কোথায় গেল বকুল? বাড়িতে পুরুষ গিজগিজ

করিতেছে, যেখানে যেখানে মেয়েরা একত্র হইয়াছে বকুল তো সেখানে নাই? হাতের কাজ ফেলিয়া রাখিয়া শ্যামা এখানে খোঁজে ওখানে খোঁজে, একে তাকে জিজ্ঞাসা করে। একজন বলিল, এই তো দেখলাম এখানে খানিক আগে, দেখ না কলাবাগানে গেছে নাকি?

বাড়ির পিছনে কলাবাগান, কলাবাগানে সেই ঢেঁকিঘর। তাই বটে, ঢেঁকিঘরে ঢেঁকিটার উপর বসিয়া শঙ্কর আর বকুল কথা বলিতেছে বটে। ঘরের কোণে এখানে বকুল আর এখন পুতুল খেলা করে না, খেলাঘর তার ভাঙিয়া গেছে, শুধু আছে চিহ্ন, কত বার ঘর লেপা হইয়াছে। আজো চারিদিকে উঁচু আলের চিহ্ন, পুকুরের গর্ত মিলাইয়া যায় নাই, বেড়ায় যে শিউলিবোঁটার রঙে ছোপানো ন্যাকড়াটি গোঁজা আছে সে তো বকুলের পুতুলেরই জামা। পুতুল খেলার ঘরে কি ছেলেখেলা আজ করিতেছে বকুল? একটু বাড়াবাড়ি রকম কাছাকাছি বসিয়া আছে ওরা, আর কিছু নয়। না, বকুলের হাতটিও শঙ্করের হাতে ধরা নাই। শ্যামা বলিয়াছিল—ও বকুল, এখানে বসে আছিস তুই? মেয়ে-জামাই যাবে যে এখন, আয়, চলে আয়।

বকুল তো আসিল, কিন্তু মেয়ের মুখ রাঙা কেন, চোখ কেন ছলো ছলো?—শঙ্কর আসিয়াছে চার-পাঁচদিন, সকলের সামনে শঙ্করের সঙ্গে কত কথা বকুল বলিয়াছে, দু-চার মিনিট একা কথা বলিবার সময়ও কতবার শ্যামা হঠাৎ আসিয়া ওদের দেখিয়াছে, শ্যামাকে দেখিয়াও কথা শঙ্কর বন্ধ করে নাই, বকুল হাসি থামায় নাই। ঢেঁকি-ঘরে আজ ওরা কোন্ নিষিদ্ধ বাণীর আদান-প্রদান করিতেছিল, বকুলের মুখে যা রঙ আনিয়াছে, চোখে আনিয়াছে জল? কি বলিতেছিল শঙ্কর বকুলকে?

শ্যামা একবার ভাবিয়াছিল বকুলকে জিজ্ঞাসা করিবে। শেষে কিছু না বলাই ভাল মনে করিয়াছিল। কিছুই হয়তো নয়। হয়তো নির্জন ঢেঁকি-ঘরে শঙ্করের কাছে বসিয়া থাকার জন্যই বকুল লজ্জা পাইয়াছিল, ওখানে ও ভাবে বসিয়া থাকা যে তার উচিত হয় নাই, বকুল কি আর তা বোঝে না।

তারপর যে ক'দিন শঙ্কর এখানে ছিল, আর তিনটি দিন মাত্র, বকুলকে শ্যামা একদণ্ডের জন্য চোখের আড়াল করে নাই।

বকুল রাগ করিয়া বলিয়াছিল, সারাদিন পেছন পেছন ঘুরছ কেন বল তো?

বকুলের বোধ হয় অপমান বোধ হইয়াছিল।

শ্যামা বলিয়াছিল, পেছন পেছন আবার তোর ঘুরলাম কখন?

তারপর বকুল কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল, গিয়া বসিয়া ছিল শীতলের কাছে, সারাটা দিন।

দুমাস পরে বৈশাখ মাসে বকুলের বিবাহ হইয়াছিল। ছেলের নাম মোহিনী, ছেলের বাপের নাম বিভূতি, নিবাস কৃষ্ণনগর। বিভূতি ছিল পোস্টমাস্টার, এখন অবসর লইয়াছে। মোহিনী পঞ্চাশ টাকায় ঢুকিয়াছে পোস্টাপিসে, আশা আছে বাপের মতো সেও পোস্টমাস্টার হইয়া অবসর লইতে পারিবে। মোহিনী কাজ করে কলিকাতায়, থাকে কাকার বাড়ি, যাঁর নাম শ্রীপতি এবং যিনি মার্চেন্ট আপিসের কেরানী।

ছেলেটি ভাল, আমাদের বকুলের বর মোহিনী। শান্ত নম্র স্বভাব, পঞ্চাশ টাকার চাকরি করে বলিয়া এতটুকু গর্ব নাই, প্রায় শঙ্করের মতোই লাজুক। দেখিতে মন্দ নয়, রঙ একটু ময়লা কিন্তু কি চোখ!—বকুলের চোখের মতোই বড় হইবে।

জামাই দেখিয়া শ্যামা খুশী হইয়াছে, সকলেই হইয়াছে। জামাইয়ের বাপ-খুড়ার ব্যবহারেও কারও অসুখী হওয়ার কারণ ঘটে নাই, শ্বশুরবাড়ি হইতে বকুল ফিরিয়া আসিলে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানা গিয়াছে, শাশুড়ী ননদেরাও বকুলের মন্দ নয়, বকুলকে তারা পছন্দও করিয়াছে, আদর যত্ন মিষ্টি কথারও কমতি রাখে নাই, কেবল এক পিসশাশুড়ী আছে বকুলের সেই যা রূঢ় কথা বলিয়াছে দু-একটা—বলিয়াছে, ধেড়ে মাগী, বলিয়াছে তালগাছ! ধোয়া পাকা মেঝেতে পা পিছলাইয়া পড়িয়া গিয়া বকুল যখন ডান হাতের শাঁখাটি ভাঙিয়া ফেলিয়াছিল বিশেষ কিছু কেহ তখন তাহাকে বলে নাই, কেবল ওই পিসশাশুড়ী অনেকক্ষণ বকাবকি করিয়াছিল, বলিয়াছিল অলক্ষ্মী, বলিয়াছিল বজ্জাত।

বলুক, পিস্‌শাশুড়ী কে? শাশুড়ী ননদই আসল, তারা ভাল হইলেই হইল।

বকুল বলিয়াছিল—না মা, পিসশাশুড়ীর প্রতাপ ওখানে সবার চেয়ে বেশি, সবাই তার কথায় ওঠে বসে। ঘরদোর তার কিনা সব, নগদ টাকা আর সম্পত্তিও নাকি অনেক আছে শুনলাম, তাইতে সবাই তাকে মেনে চলে।

বুড়ির ভয়ে কেউ জোরে কথাটি কয় না মা।

তাহা হইলে ভাবনার কথা বটে। শ্যামা অসন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিল—ক'দিন ছিলি তার মধ্যে শাঁখা ভেঙে বুড়ির বিষনজরে পড়লি! বৌ-মানুষ তুই, সেখানে একটু সাবধানে চলাফেরা করতে হয়।

বকুল বলিয়াছিল—পা পিছলে গেল, আমি কি করব? আমি তো ইচ্ছে করে পড়ি নি!

সুপ্রভা বলিয়াছিল, মরুক পিসশাশুড়ী, জামাই ভাল হইলেই হইল। সব তো আর মনের মতো হয় না।

তা বটে। স্বামীই তো স্ত্রীলোকের সব, স্বামী যদি ভাল হয়, স্বামী যদি ভালবাসে, হাজার দজ্জাল পিসশাশুড়ী থাক, কি আসিয়া যায় মেয়ে-মানুষের?

মোহিনী ভালবাসে না বকুলকে?

মোটা মোটা চিঠি তো আসে সপ্তাহে দুখানা! ভালবাসার কথা ছাড়া কি আর লেখে মোহিনী অত সব? আর কি লিখিবার আছে তাহার?

সুপ্রভার মেয়েকে বকুল বরের চিঠি পড়িতে দেয়। শ্যামা, সুপ্রভা, মন্দা সকলে আগ্রহের সঙ্গে একবার তাকে প্রশ্ন করিয়াছিল, সে হাসিয়া বলিয়াছিল, ভেবো না মামী ভেবো না, যা কবিত্ব করে চিঠিতে, জামাই তোমার ভেড়া বনে গেছে।

তবু লুকাইয়া মেয়ের একখানা চিঠিতে শ্যামা চোখ বুলাইতে ছাড়ে নাই। টাঙানো লেপের বস্তার কোথায় কোন ফাঁকে চিঠিখানা আপাতত গোপন করিয়া বকুল স্নান করিতে গিয়াছিল, শ্যামার কি তা নজর এড়াইয়াছে! চোরের মতো চিঠিখানা পড়িয়া শ্যামা তো অবাক। এসব কি লিখিয়াছে মোহিনী? সব কথার মানেও যে শ্যামা বুঝিতে পারিল না?

কে জানে, হয়তো ভালবাসার চিঠি এমনি হয়। শীতল তো কোনোদিন তাকে প্রেমপত্র লেখে নাই, সে কি জানে প্রেমপত্রের?

না জানুক, জামাই যে মেয়েকে পছন্দ করিয়াছে, তাই শ্যামার ঢের। একটি শুধু ভাবনা তাহার আছে। বকুল তো পছন্দ করিয়াছে মোহিনীকে? কে জানে কি পোড়া মন তাহার, ঢেঁকিঘরে সেই যে বকুল আর শঙ্করকে সে একসঙ্গে দেখিয়াছিল, বার বার সে কথা তাহার মনে পড়িয়া যায়।

বকুলের সে রাঙা মুখ আর ছল ছল চোখ সর্বদা চোখের সামনে ভাসিয়া আসে।

পূজার সময় বকুলকে নেওয়ার কথা ছিল। পূজার ছুটির সঙ্গে আরও কয়েকদিনের ছুটি লইয়া মোহিনী ষষ্ঠীর দিন বনগাঁ আসিল। বিধানের কলেজ অনেক আগে বন্ধ হইয়াছিল, কিন্তু সে শঙ্করের সঙ্গে কাশী গিয়াছে। শঙ্করের কে এক আত্মীয় থাকেন কাশীতে, সেখানে পূজা কাটাইয়া বিধান বাড়ি আসিবে।

মোহিনী থাকিতে চায় না। অষ্টমীর দিনই বকুলকে লইয়া বাড়ি যাইবে বলে। সকলে যত বলে, তাকি হয়? এসেছ, পূজোর ক'দিন থাকবে না? —লাজুক মোহিনী ততই সলজ্জভাবে একটু হাসিয়া বলে, না, তার যাওয়াই চাই।

—কেন, যাওয়াই চাই কেন?—সকলে জিজ্ঞাসা করে।—পনের দিনের ছুটি তো নিয়েছ, দুদিন এখানে থেকে গেলে ছুটি তো তোমার ফুরিয়ে যাবে না?

শেষে মোহিনী স্বীকার করে, এটা তার ইচ্ছা অনিচ্ছার ব্যাপার নয়, পিসিমার হুকুম অষ্টমীর দিন রওনা হওয়াই চাই।

সুপ্রভা অসন্তুষ্ট হইয়া বলে—এ কি রকম হুকুম বাছা তোমার পিসির? বেয়াই বর্তমানে পিসিই বা হুকুম দেবার কে? বেয়াইকে টেলিগ্রাম করে আমরা অনুমতি আনিয়ে নিচ্ছি, লক্ষ্মীপূজো পর্যন্ত তুমি থাকবে এখানে।

মোহিনী ভয় পাইয়া বলে—টেলিগ্রাম যদি করতে হয়, পিসিকে করুন। কিন্তু তাতে কিছু লাভ হবে না, অনুমতি পিসি দেবে না, মাঝ থেকে শুধু চটবে।

কেহ আর কিছু বলে না, মনে মনে সকলে অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে। বুঝিতে পারিয়া মোহিনী বড় অস্বস্তি বোধ করে। সুপ্রভার মেয়েকে সে বুঝাইবার চেষ্টা করে যে, এ ব্যাপারে তার কোনো দোষ নাই, পিসি তিনখানা চিঠিতে লিখিয়াছে অষ্টমীর দিন সে যেন অবশ্য অবশ্য রওনা হয়, কোনো কারণে যেন অন্যথা না ঘটে, কথা না শুনিলে পিসি বড় রাগ করে। সুপ্রভার মেয়ে শুনিয়া বলে—বোঝো তো ভাই, আসার মতো আসা এই তো তোমার প্রথম, দুদিন না থাকলে কেমন লাগে আমাদের?

মোহিনী কয়েক ঘণ্টা ভাবে, তারপর সুপ্রভার মেয়েকে ডাকিয়া বলে—আচ্ছা

দশমী পর্যন্ত থাকব।

শুনিয়া শ্যামা আসিয়া বলে—থাকলে পিসি রাগ করবে বলছিলে?

—গিয়ে বুঝিয়ে বলব'খন।—মোহিনী বলে।

শ্যামা তবু ইতস্তত করে।—জোর করে ধরে রেখেছি বলে পিসি তো শেষে—?

মনটা শ্যামার খুঁত খুঁত করে। কি যে জবরদস্তি সকলের! যাইতে দিলেই হইত অষ্টমীর দিন। তার মেয়ে-জামাই, পিসির নাম শুনিয়া সে চুপ করিয়া গেল, সকলের এত মাথাব্যথা কেন? ওরা কি যাইবে পিসির রাগের ফল ভোগ করিতে? ভুগিবে তার মেয়ে। সুপ্রভার মেয়ে একসময় তাহাকে একটা খবর দিয়া যায়। বলে—জান মামী, জামাই তোমার তার পাঠালে পিসির কাছে। কি লিখেছে জান, এখানে এক গণৎকার বলেছে পূজোর ক'দিন ওর যাত্রা নিষেধ।

শ্যামা নিশ্বাস ফেলিয়া বলে, কি সব কাণ্ড মা, আমার ভাল লাগছে না খুকী, এমন করে কাউকে রাখতে আছে!

—আমরা রেখেছি নাকি? জামাই নিজেই তো বললে থাকবে।

তখন শ্যামা হাসিয়া সুপ্রভার মেয়ের চিবুক ধরিয়া বলে, আরেকটি জামাই তো আমার এল না মা?

সে লক্ষ্মীপূজার পরেই আসিবে, শ্যামা তাই হাসিয়া একথা বলে, ব্যথার সঙ্গে বলিবার প্রয়োজন হয় না।

পূজা উপলক্ষে মন্দা সাধারণ ভাবে খাওয়া-দাওয়ার ভাল ব্যবস্থা করিয়াছে, শ্যামা খরচপত্র করিয়া আরও বেশি আয়োজন করিল, আসার মতো আসা এই তো জামাইয়ের প্রথম। মোহিনীকে সে একপ্রস্থ ধুতি-চাদর-জামা-জুতা কিনিয়া দিল, দিল দামী জিনিস, জামাই যে পঞ্চাশ টাকার চাকরে। শ্যামার টাকা ফুরাইয়া আসিয়াছে, কিন্তু কি করিবে, এসব তো না করিলে নয়।

কাজ করিতে করিতে শ্যামা বকুলের ভাবভঙ্গি লক্ষ করে। মোহিনী আসিয়াছে বলিয়া খুশী হয় নাই বকুল? এমন চাপা মেয়েটা তার, মুখ দেখিয়া কিছু কি বুঝিবার জো আছে। খাওয়া-দাওয়া শেষ হইতে অনেক রাত্রি হয়, বকুল আসিয়া শ্যামার বিছানায় শুইয়া পড়ে, শ্যামা বলে—রাত্ অনেক

হল, আর এখানে কেন মা? ঘরে যাও।

—এখানে শুই-না আমি?—বকুল বলে।

শ্যামা ভয় পাইয়া সুপ্রভার মেয়েকে ডাকিয়া আনে। সে টানাটানি করে, বকুল যাইতে চায় না, শ্যামার বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করিতে থাকে। শেষে ধৈর্য হারাইয়া শ্যামা দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলে,—পোড়ারমুখি কেলেঙ্কারি করে সকলের মুখে তুই চুনকালি দিবি? যা—বলছি যা, মেরে ছেঁচে ফেলব তোকে আমি!

সুপ্রভার মেয়ে বলে—আহা মামী, বাকো না গো, যাচ্ছে।

তারপর বকুল উঠিয়া যায়। শ্যামা চুপ করিয়া তক্তপোষে বসিয়া ভাবে। নানা কারণে সে বড় বিষাদ বোধ করে। কে জানে কি আছে মেয়েটার মনে। পূজার সময়, চারিদিকে আনন্দ উৎসব, বিধানও কাছে নাই যে ছেলের মুখ দেখিয়া মনটা একটু শান্ত হয়। ছেলে বড় হইয়াছে তাই আর কলেজ ছুটি হইলে ছুটিয়া মার কাছে আসে না, বন্ধুর সঙ্গে বেড়াইতে যায়।

শীতল বোধ হয় বাহিরে তাসের আড্ডায় বসিয়া আছে, শ্যামার বারণ না মানিয়া সে আজ সিদ্ধি গিলিয়াছে একরাশি। কে আছে শ্যামার? সারা-দিনের খাটুনির পর শরীর শ্রান্ত অবসন্ন হইয়া আসিয়াছে, মনের মধ্যে একটা দুঃসহ ভার চাপিয়া আছে, কত যে একা আর অসহায় মনে হইতেছে নিজেকে, সেই শুধু তা জানে, এতটুকু সান্ত্বনা দিবারও কেহ নাই।

ভাল করিয়া আলো হওয়ার আগে উঠিয়া শ্যামা বকুলের ঘরের দরজায় চোখ পাতিয়া দাঁওয়ায় বসিয়া রহিল। বকুল বাহির হইলে একবার সে তাহার মুখখানা দেখিবে। খানিক বসিয়া থাকিয়া শ্যামার লজ্জা করিতে লাগিল, এদিক ওদিক সে একটু ঘুরিয়া আসিল, পুকুর ঘাটে গিয়া মুখে চোখে জল দিল। এও এক শরৎকাল, শ্যামার জীবনে এমন কত শরৎ আসিয়া গিয়াছে। পুকুরের শীতল জল, ঘাসের কোমল শিশির শ্যামার মুখে আর চরণে কত কি নিবেদন জানায়। সে কি একদিন বকুলের মতো ছিল? কবে?

তারপর ভিতরে গিয়া শ্যামা দেখিল, বকুলের ঘরের দরজা খোলা। কিন্তু বকুল কোথায়? শ্যামা এদিক ওদিক তাকায়, সম্মুখ দিয়া পার হইয়া যাওয়ার সময় ভিতরে চাহিয়া দেখে মশারি তোলা, বিছানা খালি, বকুল বা মোহিনী কেউ ঘরে নাই। এত ভোরে কোথায় গেল ওরা? শ্যামা গালে হাত দিয়া

সিঁড়িতে বসিয়া রহিল।

রান্নাঘরের পাশ দিয়া চোরের মতো বাড়িতে ঢুকিয়া শ্যামাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া দুজনেই তাহারা লজ্জা পাইল। মোহিনী ঘরে চলিয়া গেল। বকুল শ্লথ পদে মার কাছে আসিল।

—কোথা গিয়েছিলি বকুল?

বকুল কথা বলে না। পাশে বসাইয়া শ্যামা একটা হাতে তাহাকে বেষ্টন করিয়া থাকে। তাই বটে, তেমনি রাঙা বটে বকুলের মুখ, ঢেঁকিঘরে সেদিন শ্যামা যেমন দেখিয়াছিল। শুধু আজ ওর চোখ দুটি ছলছল নয়।

দশমীর দিন বেলা দশটার সময় অপ্রত্যাশিত ভাবে বিধান আসিল। শ্যামা আনন্দে অধীর হইয়া বলিল—তুই যে চলে এলি খোকা? মন টিকিল না বুঝি সেখানে তোর?

হঠাৎ শ্যামার মন হালকা হইয়া গিয়াছে। সেদিন সঙ্গে বেড়াইয়া আসিয়া বকুলের মুখ যে রাঙা হইয়াছিল তা দেখিবার পরেও শ্যামার মন কি ভার হইয়াছিল? হইয়াছিল বৈকি! শ্যামার ভাবনা কি শুধু বকুলের জন্য। এমনি শরৎকালে যাকে শ্যামা কোলে পাইয়াছিল, সোনার টুকরার সঙ্গে লোকে যাকে তুলনা করে, তাকে না দেখিলে শ্যামার ভাল লাগে না। মোহিনীর জন্য মাছ মাংস রাঁধিতে রাঁধিতে উন্মনা হইয়া চোখের জল সে ফেলিয়াছিল কার জন্য?

বিধান আসিয়াছে। আর শ্যামার দুঃখ নাই। পৃথিবীতে শরৎ আসিয়াছে হাসির মতো, এতদিন শ্যামা হাসিতে পারে নাই। এবার শ্যামার মুখেও হাসি ফুটিয়াছে।

পরদিন বকুলকে বিদায় দিয়াও শ্যামার মুখ তাই বেশিক্ষণ ম্লান রহিল না। রান্না ঘরে গিয়া তার কাছে পিঁড়ি পাতিয়া বিধান বসিতে না বসিতে কখন যে সে ভুলিয়া গেল মেয়ের বিরহ।

নয়

শ্যামার মনে আবার নিবিড় হইয়া আর্থিক দুর্ভাবনা ঘনাইয়া আসিয়াছে।

এবার আর কোনোদিকে সে উপায় দেখিতে পায় না। আগে দুরবস্থায় পড়িয়া একটা ভরসা সে করিতে পারিত, বাড়িটা বিক্রয় করিয়া দিলে মোটা কিছু টাকা পাওয়া যাইবে। এখন সে ভরসাও নাই। বাড়ি বিক্রির অতগুলি টাকা কেমন করিয়া নিঃশেষ হইয়া গেল? অপচয় করিয়াছে নাকি সে? হয়তো আরও হিসাব করিয়া খরচ করা উচিত ছিল। এক সঙ্গে অনেকগুলি টাকা হাতে পাইয়া নিজেকে হয়তো সে বড়লোক ঠাওরাইয়াই বসিয়াছিল।

তবে একথা সত্য যে এ ক'বছর একটি পয়সাও ঘরে আসে নাই। ফোঁটা ফোঁটা করিয়া ঢালিলেও কলসীর জল একদিন শেষ হইয়া যায়। বিধানের পড়ার খরচও কি সহজ! বকুলের বিবাহেও ঢের টাকা লাগিয়াছে।

কিন্তু এখন উপায়?

শ্যামা এবার একটু মন দিয়া শীতলের ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করিতে লাগিল। খায় দায় তামাক টানিয়া তাস পাশা খেলিয়া দিন কাটায়, হাঁটে একটু খোঁড়াইয়া, বদহজমে ভোগে, রাত্রে ভাল ঘুম হয় না। তবু কিছু কি শীতল করিতে পারে না? ঘরে বসিয়া থাকিয়াই হয়তো সে একেবারে সারিয়া উঠিতে পারিতেছে না, কাজে কর্মে মন দিলে হয়তো সুস্থ হইবে!

চুলে শীতলের পাক ধরিয়াছে। বিবর্ণ কপালের ঠিক উপরে একগোছা চুল একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছে। না, বয়স শীতলের কম হয় নাই। বিবাহ সে বেশি বয়সেই করিয়াছিল, বয়স এখন ওর পঞ্চাশের কাছে গিয়াছে বৈকি। তবু, পঞ্চাশ বছর বয়সে পুরুষ মানুষ কি রোজগার করে না? হারান পঁয়ষট্টি বছর পর্যন্ত কত টাকা উপার্জন করিয়াছে, শীতল কি কিছু ঘরে আনিতে পারে না, যৎসামান্য? পঞ্চাশটাকা অন্ততঃ? আর কিছু হোক বা না হোক, বিধানের পড়ার খরচ তো দিতে হইবে।

মৃদু মৃদু শীত পড়িয়াছে। কোঁচার খুঁট গায়ে জড়াইয়া বাহিরের অঙ্গনের জাম গাছটার গোড়ায় বেতের মোড়াতে বসিয়া শীতল তামাক টানে। বাড়ির পোষা কুকুরটা পায়ের কাছে মুখ গুঁজিয়া চুপচাপ শুইয়া থাকে, মাঝে

মাঝে শীতলের পা চাটিয়া দেয়। কুকুরটার সঙ্গে শীতলের বড় ভাব। কুকুরটাও তার বড় বাধ্য। শ্যামা কাছে আসিয়া মানুষ ও পশুর চোখ-বোজা নিবিড় তৃপ্তির আলস্য চাহিয়া দেখে।

কিন্তু উপায় কি? শ্যামার আর কে আছে, কে তার জন্য বাহির হইবে উপার্জন করিতে?

ধীরে ধীরে মিষ্টি করিয়াই কথাগুলি সে বলে, ভীত বিস্মিত চোখে তার মুখের দিকে চাহিয়া শীতল শুনিয়া যায়। কিছু সে যেন বুঝিতে পারে না, সংসার, কর্তব্য, টাকার অভাব, খোকার পড়া—সব জড়াইয়া শ্যামা যেন তাকে ভয়াবহ শাসনের ভয় দেখাইতেছে।

শীতল মাথা নাড়ে, সন্দিগ্ধভাবে। সে কি করিবে? কি করিবার ক্ষমতা তার আছে? শিশুর মতো আহত কণ্ঠে সে বলে, আমার যে অসুখ গো?

—অসুখ তা জানি, সেরে তো উঠেছ খানিকটা, ঠাকুরজামাইকে বলে কম খাটুনির একটা কাজ-টাজ তুমি করতে পারবে। আমি আর কতকাল চালাব?

—বাড়ির টাকা পেলে, বাড়িটা কার?—শীতল বলে।

বটে! তাই তবে শীতল মনে করিয়াছে, তার বাড়ির টাকায় এতকাল চলিয়াছে আর তাহার কিছু করিবার প্রয়োজন নাই? এতকাল সে-ই সংসার চালাইয়াছে, এই কথা ভাবিয়া রাখিয়াছে শীতল? এবার তাই তাহার বসিয়া থাকার অধিকার জন্মিয়াছে!

—এসব জ্ঞান তো টনটনে আছে দেখি বেশ?—শ্যামা বলে।

কুকুরটা উঠিয়া যায়। শীতলের দৃষ্টি তাহাকে অনুসরণ করে। তারপর আবার কাতর কণ্ঠে সে বলে, আমার অসুখ যে গো?

একদিনে হাল ছাড়িবার পাত্রী শ্যামা নয়। বার বার শীতলকে সে তাহাদের অবস্থাটা বুঝাইবার চেষ্টা করে। কড়া কথা সে বলে না, লজ্জা দেয় না, অপমান করে না। আবার বাহির হইয়া ঘরে টাকা আনা শীতলের পক্ষে এখন কত কঠিন সে তা বোঝে, পারুক না পারুক গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া শীতল একবার চেষ্টা করুক, এইটুকু শুধু তার ইচ্ছা।

রাখালকে শ্যামা একদিন বলিয়াছিল—ঠাকুরজামাই, আবার তো আমি

নিরুপায় হলাম ?

—কেন ? অতটাকা কি করলে বৌঠান ? বলেছিলাম টাকা তুমি রাখতে পারবে না—

—ঠাকুরজামাই, ছেলেকে আমার বি-এটা আপনি পাশ করিয়ে দিন।

—পড়ার খরচ দেবার কথা বলছ বৌঠান ?

হ্যাঁ, রাখাল এবার রাগ করিয়াছিল। সে কি রাজা না জমিদার ? কতটাকা মাহিনা পায় সে শ্যামা জানে না ? একি অন্যায় কথা যে শ্যামা ভুলিয়া যায় ক্ষমতার মানুষের একটা সীমা আছে, আজ কতবছর শ্যামা সকলকে লইয়া এখানে আছে, কত অসুবিধা হইয়াছে রাখালের, কত টানাটানি গিয়াছে তাহার, কিন্তু কিছু সে বলে নাই, বলে নাই এই ভাবিয়া যে যতদিন তার দুমুঠা ভাত জুটিবে, শ্যামার ছেলেমেয়েকে একমুঠা তাকে দিতে হইবে, সেটা তার কর্তব্য। তাই কি শ্যামা যথেষ্ট মনে করে না একটা ছাপোষা মানুষের পক্ষে ?

—ঠাকুরজামাই, একবছর আমিও তো কিছু কিছু সংসার খরচ দিয়েছি ?

বলিয়া শ্যামা সঙ্গে সঙ্গে অনুতাপ করে। অনুগ্রহ চাহিতে আসিয়া এমন কথা বলিতে আছে! মুখখানা তাহার শুকাইয়া যায়! রাখাল বলে, তা জানি বৌঠান, আজ বলে নয় গোড়া থেকে জানি কৃতজ্ঞতা বলে তোমার কিছু নেই। যাক, আমার কর্তব্য আমি করেছি, নিন্দা প্রসংশার কথা তো আর ভাবি নি, এখানে থাকতেও তোমাদের আমি বারণ করি নে, তার বেশি আমি কিছু পারব না বৌঠান, আমায় মাপ কর—এই হাত জোড় করলাম তোমার কাছে।

শীতলের একটা ব্যবস্থা ? বিধানের পড়ার খরচ না দিক, শীতলের জন্য রাখাল কিছু করিতে পারে না ?

শীতল ? রাখাল অবাক হইয়া থাকে। শীতল চাকরি করিবে, ওই অসুস্থ আধপাগলা মানুষটা !—কি বলছ বৌঠান তুমি, তোমার কি মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেছে ?

—আমার যে উপায় নেই ঠাকুরজামাই ?

শেষে রাখাল বলে, আচ্ছা দেখি।

রাখাল সত্যই চেষ্টা করিল। শীতল বহুকাল কলিকাতার প্রেসে বড় চাকরি করিয়াছে, এই সব বলিয়া কহিয়া বোধ হয় স্থানীয় একটা ক্ষুদ্র ছাপাখানায় একটা কাজ সে যোগাড়ও করিয়া ফেলিল শীতলের জন্য। বেতন পনের টাকা। কাজ কর্ম দেখিবে, খাতা পত্র লিখিবে, মফস্বলের ছোট ছাপাখানা, কাজ সামান্যই হয়, শীতল পারিবে হয়তো।

খবর শুনিয়া শীতল বিবর্ণ হইয়া বলিল—অসুখ যে আমার, আমি পারব কেন? কলম ধরলে আমার যে হাত কাঁপে, আমি যে লিখতে পারি নে রাখাল?

শ্যামা বলিল—আগে থেকে ভড়কাচ্ছ কেন বলতো? গিয়েই গ্যাখ না পার কিনা, দুদিন যেতে আরম্ভ করলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

কোথায় পঞ্চাশ, কোথায় পনের। পঞ্চাশই বা কেন? ছাপাখানার কাজ করিয়া তিনশ' টাকাও তো শীতল একদিন মাসে মাসে ঘরে আনিয়াছে। তবে আজ সে কথা ভাবা মিছে। সেদিন আর ফিরিবে না, সে শীতল নাই, সে শ্যামাও নাই। পঞ্চাশ টাকার আশা করিয়া পনের টাকাতেই শ্যামা এখন খুশী হইতে জানে।

শীতল অফিসে যায়। ছাপাখানা প্রায় আধ মাইল দূরে। স্নান করিয়া খাইয়া শীতল ছেঁড়া কোটটি গায়ে চাপায়, বিষণ্ণ সকাতর মুখে হুঁকায় কয়েকটা শেষটান দিয়া মোটা লাঠিটা বাগাইয়া ধরে। বড় দুর্বল পা দুটি শীতলের, লাঠিতে ভর দিয়া সে গুটিগুটি হাঁটিতে আরম্ভ করে। পোষা কুকুরটি তখন উঠিয়া দাঁড়ায়, লেজ নাড়িতে নাড়িতে সে শীতলের সঙ্গে যায়। পুকুর ঘুরিয়া গলি পথ পার হইয়া বড় সদর রাস্তা পর্যন্ত শীতলকে আগাইয়া দিয়া আসে।

বকুল চিঠি লিখিয়াছে, সে ভাল আছে। বিধান চিঠি লিখিয়াছে সেও ভাল আছে। সকলে ভাল আছে।

শরীরটা শ্যামারও বহুকাল ভালই আছে। দুবেলা রাঁধে, সংসারের কাজকর্ম করে, অবিশ্রাম খাটুনি শ্যামার, শক্ত সবল দেহ না থাকিলে কবে শ্যামা ক্ষয় হইয়া যাইত। এত খাটিতে হয় কেন শ্যামাকে? আশ্রিতার সমস্ত অবসর মুহূর্তগুলি কেমন করিয়া কর্তব্যে ভরিয়া ওঠে কেহ টেরও পায় না।

একদিন দেখা যায় ভোর পাঁচটা হইতে রাত এগারোটা অবধি যত কাজ তার পক্ষে করা সম্ভব সব সে করিতেছে একা।

কস্তাপাড় মোটা একখানা শাড়ি পরিয়া শ্যামা কাজ করে, দেখিয়া কে বলিবে সে এ বাড়ির দাসী নয়। হাতের চামড়া তাহার কর্কশ হইয়াছে, থাবা হইয়াছে বড়, আধমণ জলের বালতি সে অবলীলাক্রমে তুলিয়া নেয়, গায়ে এত জোর। ছেলেমেয়েরা বড় হইয়াছে, রাত্রে তাহাকে বারবার উঠিতে হয় না, বিধানও এখানে নাই যে জাগিয়া বসিয়া সে তাহার পাঠরত পুত্রের দিকে চাহিয়া আকাশ পাতাল ভাবিবে, কাজকর্ম শেষ করিয়া শোয়া মাত্র শ্যামা ঘুমাইয়া পড়ে, কোথা দিয়া রাত কাটিয়া যায় সে টেরই পায় না। টাকার চিন্তা করে না শ্যামা? শীতলের পনের টাকার চাকরিতেই সে নির্ভাবনা হইয়া গিয়াছে নাকি! চিন্তার তাহার শেষ নাই। তবে রাত জাগিয়া কোনো ভাবনাই সে ভাবিতে পারে না। সারাদিন সহস্র কাজের সঙ্গে ভাবনার কাজটাও সে করিয়া যায়, অনেকটা কলের মতো, পাঠাভ্যাসের মতো। এমনি হইয়াছে আজকাল। আজীবন শ্যামা যে একা, কারো সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া ভাবিবার সুযোগ সে কোনোদিন পায় নাই, অতীতের স্মৃতিতে, বর্তমানের সম্পদে বিপদে, ভবিষ্যতের জল্পনা-কল্পনায় চিত্ত তাহার নিঃসঙ্গ, নির্ভরহীন।

ফণী একবার নিউমোনিয়ায় মরমর হইয়া বাঁচিয়া উঠিল, মন্দার যমজ ছেলে দুটির একজন, সে কালু, মরিল জ্বর-বিকারে। পড়াশোনা ভাই দুটি বেশি দূর করে নাই, পাটের ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিল। গত বছর একদিনে এক লগ্নে দুই ভাইয়ের বিবাহ দিয়া মন্দা আনিয়াছিল দুটি বৌ! শ্যামার জীবনে ওদের বিশেষ কোনো স্থান ছিল না, কালুর মরণ শ্যামার কাছে বিশেষ কিছু শোচনীয় ব্যাপার নয়, তবু সেও যেন গভীর শোক পাইল। মন খারাপ হইয়া যাওয়া আশ্চর্য ছিল না। মামী বলিয়া কোনোদিন খাতির না করুক, আশ্রিতা বলিয়া মাঝে মাঝে অপমানজনক ব্যবহার করুক, যত্ন করিয়া ওকে তো দুবেলা সে ভাত বাড়িয়া দিয়াছে। কিন্তু এমন শোক কেন, পুত্রশোকের মতো? কালুকে মনে করিয়া, কচি বৌটার বিধবার বেশ দেখিয়া, শ্যামার

বুকের ভিতরটা পাক দিয়া যেন ভাঙিয়া যাইতে লাগিল, উন্মাদিনী মন্দাকে দুটি সবল বাহু দিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিয়া অসহ্য বেদনায় শ্যামাও অজস্র চোখের জল ফেলিল। কেন তার এই অস্বাভাবিক ব্যথা ?

পরে, মন্দার শোকও যখন শান্ত হইয়া আসিয়াছে, তখনও শ্যামা যেন অশান্ত হইয়া রহিল মনে মনে। রহস্যময় মনোবেদনা নয়, সাময়িক মনোবিকার নয়, একটা দিনও যে হাসিয়া কথা বলে নাই সেই কালুর জন্য স্পষ্ট দুরন্ত জ্বালা! শ্যামার মতো কালুর বৌও অল্প বয়সে বাপ-মাকে হারাইয়াছিল, হঠাৎ শ্যামা যেন তার জন্য পাগল হইয়া উঠিল, নিজের মেয়েকেও সে বুঝি এত ভাল কখনো বাসে নাই। বৌয়ের বিধবা বেশ মন্দা দেখিতে পারে না, নিজের শোক লইয়াই সে বিব্রত, বৌ সামনে গেলে কখনো সে শাপিতে আরম্ভ করে, বৌকে বলে মানুষখেকো রাক্ষুসী, আবার কখনো বুকে জড়াইয়া হা হা করিয়া কাঁদে, তার পরেই দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দেয়, —চোখের সামনে থেকে সরে যা তুই, সরে যা অলক্ষ্মী।—শ্যামার মমতায় কালুর বৌ বড় একটি আশ্রয় পাইল। শ্যামার প্রশস্ত বুকে মাথা রাখিয়া সজল চোখে সে ঘুমায়, জাগিয়া ওঠে শ্যামারই বুকে, সারারাত ঠায় একভাবে কাটাইয়া শ্যামার পিঠের মাংসপেশী খিঁচিয়া ধরিয়াছে, তবু সে নড়ে নাই, কর্ণ যে ভাবে বজ্রকীটের কামড় সহিয়াছিল তেমনি ভাবে দেহের যাতনা সহিয়াছে,—নড়িতে গেলে ঘুম ভাঙিয়া বৌ যদি আবার কাঁদে ?

কালুর জন্য শ্যামার শোক কেন বুঝিতে না পারা যাক, কালুর বৌয়ের জন্য তার ভালবাসা নিশ্চয় বকুলের বিরহ ? কিন্তু তা যদি হয় তবে কালুর জন্য শ্যামার এই শোক, বিধানের বিরহ হইতে পারে তো!

ওসব নয়। আসলে শ্যামার মনটাই আলগা হইয়া আসিতেছে, পচিয়া যাইতেছে। গোড়াতে সাত বছর একদিকে পাগলা শীতলের সঙ্গে বাস করিতে করিতে কাঁচা বয়সের মনটা তাহার কুঁকড়াইয়া গিয়াছিল, অন্যদিকে ছিল মাতৃত্বলাভের প্রাণপণ প্রয়াসের ব্যর্থতা—দুটি একটি সঙ্গী অথবা আত্মীয়স্বজন থাকিলে যাহা তাহার এতটুকু ক্ষতি করিতে পারিত না, কিন্তু একা পাইয়া সাত বছরে যাহা তাহাকে প্রায় কাবু করিয়া আনিয়াছিল,—এতকাল পরে এখন, জীবন-যুদ্ধে পরিশ্রান্ত মনটাতে যখন তাহার আর তেমন তেজ নাই,

সেই অস্বাভাবিকতা, সেই বিকার আবার অধিকার বিস্তার করিতেছে।

মানুষ নয় শ্যামা? জীবনের তিনভাগ কাটিয়া গেল, এর মধ্যে একদিন সে বিশ্রাম পাইয়াছে? দেহের বিশ্রাম নয়। দেহ তার ভালই আছে, গর্ভের নবাগত সন্তানকে বহিয়া সে কাতর নয়। বিশ্রাম পায় নাই তার মন। এখন তাহার একটু সুখ শান্তি ও স্বাধীনতার প্রয়োজন আছে বৈকি। প্রসবের তিনদিন আগেও শ্যামা একা একশ জনের ভোজ রাঁধিয়া দিবে, শুধু পরের আশ্রয় হইতে এবার তাকে লইয়া চল, ভবিষ্যতকে একটু নিরাপদ করিয়া দাও, আর ওষুধের মতো পথ্যের মতো একটু স্নেহ দাও শ্যামাকে। একটু নিঃস্বার্থ অকারণ মমতা।

স্বামী আর আত্মীয়স্বজন শ্যামার সেবা লইয়াছে। সন্তান লইয়াছে সেবা ও স্নেহ। প্রতিদানে সেবা শ্যামা চায় না। আজ শ্যামাকে কেহ একটু স্নেহ দাও!

বড়দিনের সময় বিধান আসিলে সুপ্রভা বলিল—বড় হয়েছ তুমি, তোমার সব বোঝা উচিত বাবা, বাপ তো তোমার সাতেও নেই পাঁচেও নেই—মার দিকে একটু তাকাও? কি রকম হয়ে যাচ্ছে দেখতে পাও না? চাউনি দেখলে বুকের মধ্যে কেমন করতে থাকে, সেদিন দেখি বিড়বিড় করে কি সব বকছে আপন মনে, আমার তো ভাল মনে হয় না।

বিধানের দু চোখ ভরা রোষ, বলিল—তবু তো খাটিয়ে মারছেন।

সুপ্রভা আহত হইয়া বলিল—আমাকে তুমি এমন কথা বললে বিধান, কত বলেছি আমি, তুমি তার কি জানবে? মাকে তোমার একদণ্ড বসিয়ে রাখার সাধ্যি আছে কারো? নইলে এতলোক বাড়িতে, তোমার মা কিছু না করলে কিছু কাজ কি এ বাড়ির আটকে থাকবে?—সুপ্রভা অভিমান করিল, বেশ, আমরা না হয় পর, তুমি তো এসেছ এবার, পার যদি রাখ না মাকে তোমার বসিয়ে?

বিধান কারো অভিমানকে গ্রাহ্য করে না, বলিল—না ছোটপিসি, মাকে আর এখানে আমি রাখব না, আমি নিতে এসেছি মাকে।

—ওমা, কোথায়? কোথায় নিয়ে যাবে?

খবর রটিবামাত্র সুপ্রভার মুখের এই প্রশ্ন সকলের মুখে গুঞ্জরিত হইতে থাকে। বিধান শ্যামাকে লইতে আসিয়াছে? মাকে আর এখানে সে রাখিবে

না? কোথায় লইবে? কার কাছে? অতটুকু ছেলে, এখনো বি-এটা পর্যন্ত পাশ দেয় নাই, এসব কি মতলব সে করিয়াছে?

—পড়া ছেড়ে দিয়েছিস খোকা? চাকরি নিয়েছিস? আমাকে না বলে এমন কাজ কেন করতে গেলি বাবা,—বলিয়া শ্যামা কাঁদিতে আরম্ভ করে।

বিধান বলে—কাঁদছ কেন, এঁ্যা? ভাল খবর আনলাম কোথায় আহ্লাদ করবে তা নয় তুমি কান্না জুড়ে দিলে? পাশ তো দিতাম চাকরির জন্যে? ভাল চাকরি পেয়ে গেলাম আর পাশ দিয়ে কি করব? ব্যাঙ্কে লোক নেবার জন্যে পরীক্ষা হল, শঙ্কর আমাকে পরীক্ষা দিতে বললে, পাশ-টাশ করব ভাবিনি মা, তিনশ ছেলের মধ্যে থার্ড হয়ে গেলাম। প্রথম সাতজনকে নিলে—নব্বই টাকায় শুরু।

নব্বই? বিশ-পঁচিশ টাকার কেরানী বিধান তবে হয় নাই? শ্যামা একটু শান্ত হয়, বলে—আমায় কিছু লিখিসনি যে?

এটা বোঝানো একটু কঠিন শ্যামাকে। পড়াশোনা করিয়া বিধান একদিন বড় হইবে, এত বড় হইবে যে চারিদিকে রব উঠিবে ধন্য ধন্য—শ্যামার এ স্বপ্নের খবর বিধানের চেয়ে কে ভাল করিয়া রাখে। তাই পড়া ছাড়িয়া চাকরি লইয়াছে চিঠিতে শ্যামাকে একথা লিখিতে বিধানের ভয় হইয়াছিল। শুধু তাই নয়। বিধান ভাবিয়াছিল সে দু'শ-চারশ' টাকার চাকরি করিবে এই প্রত্যাশায় শ্যামা দিন গুনিতেছে, নব্বই টাকার চাকরি শুনিয়া সে যদি ক্ষেপিয়া যায়?

পরীক্ষা পর্যন্ত আরও একটা বছর ছেলের পড়ার খরচ দিতে পারিবে না ভাবিয়াই শ্যামা যে ক্ষেপিয়া যাইতে বসিয়াছিল বিধান তো তাহা জানিত না, চাকরিটা তাহার নব্বই টাকার শুনিয়াই শ্যামা এমনভাবের কৃতার্থ হইয়া গেল যে বিধান অবাক হইয়া রহিল। সন্দিগ্ধভাবে সে জিজ্ঞাসা করিল—খুশী হওনি মা তুমি?

খুশী হয় নাই! খুশীতে শ্যামা আবোল-তাবোল বকিতে আরম্ভ করে, এতকাল শ্যামাকে যারা অবহেলা অপমান করিয়াছে তাদের টিটকারি দেয়, কলিকাতায় মস্ত বাড়ি ভাড়া নেয়, বকুলকে আনে, বিধানের বিবাহ দেয়, দাস-দাসীতে ঘরবাড়ি ভরিয়া ফেলে। তারপর হাসিমুখে সকলকে ডাকিয়া

বিধানের চাকরির কথা শোনায়, তার দুধের ছেলে নব্বই টাকার চাকরি যোগাড় করিয়াছে, কারো সাহায্য চায় নাই, কারো তোষামোদ করে নাই—বল তো বাছা এবার তাদের মুখ রইল কোথায় ছেলেকে আমার পড়ার খরচটুকু পর্যন্ত যারা দিতে চায়নি? কথাবার্তা শুনিয়া মনে হয় শ্যামা সত্যই বড় অকৃতজ্ঞ! এতগুলি বছর যার আশ্রয়ে সে থাকিয়াছে এখন ছেলের চাকরি হওয়ামাত্র নিন্দা আরম্ভ করিয়াছে তার। এরা যে কত করিয়াছে তার জন্য সব সে ভুলিয়া গিয়াছে, মনে রাখিয়াছে শুধু ত্রুটি-বিচ্যুতি, অপমান অবহেলা!

মন্দা রাগিয়া বলে,—ধন্যি তুমি বৌ, এতও ছিল তোমার পেটে-পেটে! এত যদি কষ্ট পেয়েছ তুমি এখানে থেকে, থাকলে কেন? নিজের রাজ্যপাটে গিয়ে বসলে না কেন রাজরানী হয়ে? আজ পাঁচ বছর তোমাদের পাঁচটি প্রাণীকে আমি পুষলাম, ছেলে পড়ালাম, মেয়ের বিয়ে দিলাম তোমার, আজ দিন পেয়ে আমাদের তুমি শাপছ!

অবাক হইয়া শুনিয়া শ্যামা কাঁদিতে কাঁদিতে বলে—না ঠাকুরঝি, তোমাদের কিছু বলিনি তো আমি, কেন বলব তোমাদের? কম করেছ আমার তোমরা! আমাকে কিনে রেখেছ ঠাকুরঝি, তোমাদের ঋণ আমি সাত জন্মে শোধ দিতে পারব না। তোমাদের নিন্দে করে একটি কথা কইলে মুখ আমার খসে যাবে না, কুষ্ঠ হবে না আমার জিভে!—বলে আর হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া শ্যামা ভাসাইয়া দেয়।

শ্যামা কি পাগল হইয়া গিয়াছে? এতদিনে তার আবার সুখের দিন সুরু হইল, এমন সময় মাথাটা গেল তার খারাপ হইয়া? অনেক বলিয়া বিধান তাহাকে শোয়াইয়া রাখিল, বারবার জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কি হয়েছে মা? —তারপর শ্যামা অসময়ে আজ ঘুমাইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ ঘুমাইয়া সে যখন জাগিল আর তাকে অশান্ত মনে হইল না। সে শান্ত নীরব হইয়া রহিল।

কত কথা শ্যামার বলিবার ছিল, কত হিসাব কত পরামর্শ কিন্তু এক অসাধারণ নীরবতায় সব চাপা পড়িয়া রহিল। বিধান বলিল, কলিকাতায় সে বাড়ি ভাড়া করিয়া আসিয়াছে, শ্যামা জিজ্ঞাসাও করিল না কেমন বাড়ি, ক'খানা ঘর, কত ভাড়া। এতকাল এখানে থাকিয়া তার চাকরি হওয়ামাত্র একটা মাসও অপেক্ষা না করিয়া সকলের চলিয়া যাওয়াটা বোধ হয় ভাল

দেখাইবে না, বিধান এই কথা বলিলে শ্যামা সায় দিয়া গেল। কিন্তু ঝোঁকের মাথায় বাড়িটাড়ি যখন সে ঠিক করিয়াই আসিয়াছে দু'চার দিন পরে চলিয়া তাদের যাইতে হইবে, বিধান এই কথা বলিলে শ্যামা তাতেও সায় দিল। ছেলের সব কথাতেই সে সায় দিয়া গেল।

শেষে বিধান বলিল—পড়া ছেড়েছি বলে তুমি নিশ্চয়ই রাগ করেছ মা।

শ্যামা একটু হাসিল,—না খোকা রাগ করিনি, বড় হয়েছ এখন তুমি বুঝে শুনে যা করবে তাই হবে বাবা, তোমার চেয়ে আমি তো ভাল বুঝিনে, আমার বুদ্ধি কতটুকু?

কাজে যোগ দিতে বিধানের দিন দশেক দেরি ছিল, যাই যাই করিয়াও দিন সাতেক এখানে তাহারা রহিয়া গেল। শীতল চাকরি ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত মনে জামগাছের তলে বসিয়া তামাক টানিতে লাগিল, পোষা কুকুরটি শুইয়া রহিল তাহার পায়ের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া। শীতলের ইচ্ছা আছে কুকুরটিকেও সঙ্গে লইয়া যাইবে কলিকাতায়, কিন্তু মনের ইচ্ছা প্রকাশ করিতে তার সাহস হইল না।

পাগল হওয়ার আর কোন লক্ষণ শ্যামার দেখা গেল না, সেদিন ঘুমাইয়া উঠিয়া তার যে অসাধারণ নীরবতা আসিয়াছিল তাই শুধু কায়েমি হইয়া রহিল। আর যেন তাহার কোন বিষয়ে দায়িত্ব নাই, মতামত নাই সে মুক্তি পাইয়াছে! জীবন-যুদ্ধ তাহার শেষ হইয়া গিয়াছে, এবার বিধান লড়াই চালাক, বিধান সব ব্যবস্থা করুক, সংসারের ভালমন্দের দায়িত্ব থাক বিধানের, শ্যামা কিছু জানে না, জানিতে চাহে না,—ঘরের মধ্যে অন্তঃপুরের গোপনতায় তার যা কাজ এবার তাই শুধু সে করিবে; উপকরণ থাকিলে রাঁধিয়া দিবে পোলাও, না থাকিলে দিবে শাক ভাত। বিধান তাহাকে এখানে রাখিলে এখানেই সে থাকিবে, কলিকাতা লইয়া গেলে কলিকাতা যাইবে, সব সমান শ্যামার কাছে। বিধানের চাকুরি-লাভও শ্যামার কাছে যেন আর উল্লাসের ব্যাপার নয়, খুবই সাধারণ ঘটনা। এই তো নিয়ম সংসারের? স্বামী-পুত্র উপার্জন করে, স্ত্রী ও জননী ভাত রাঁধে। আর ভালবাসে। আর সেবা-যত্ন করে। আর নির্ভয় নিশ্চিন্ত হইয়া থাকে অক্ষয় অমর একটি নির্ভরে।

শহরতলিতে নয়, এবার খাস কলিকাতায় নূতন বাড়িতে শ্যামা নূতন সংসার

পাতিল। বাড়িটা নূতন সন্দেহ নাই, এখনো রঙের গন্ধ মেলে। দোতলা বাড়ি, একতলাতে বাড়িওয়ালা থাকে। দোতলার মাঝামাঝি কাঠের ব্যবধান, প্রত্যেক ভাগে দু'খানা ঘর। রান্নার জন্য ছাদে দুটি ছোট ছোট টিনের চালা। শ্যামারা থাকে দোতলার সামনের অংশটিতে, রাস্তার উপরে ছোট একটু বারান্দা আছে। একটি স্বামী ও দু'টি কন্যা সহ অপর অংশে বাস করে শ্রীমতী সরযূবালা দে, পাশকরা ধাত্রী।

সরযূ যেমন বেঁটে তেমনি মোটা, ফুটবলের মত দেখিতে। দেহের ভারেই সে যেন সব সময় হাঁপায়। কাজে যাওয়ার সময় সে যখন সাদা কাপড়-ঢাকা রিক্সায় চাপে শীর্ণকায় কুলিটি রিক্সা টানিয়া লইয়া যায়, উপর হইতে দেখিয়া শ্যামা হাসি চাপিতে পারে না।

সরযূর মেয়ে দুটি সুন্দরী। বড় মেয়েটির নাম বিভা, বিধানের সে সমবয়সীই হইবে, মেয়ে-স্কুলে গান শেখায়। ছোট মেয়েটির নাম শামু, বিধানের বৌ হইলে মানায় এমনি বয়স, পড়ে স্কুলে। সরযূর সাধ শামুকে মেডিকেল কলেজ হইতে পাশ করাইয়া একেবারে ডাক্তার করিয়া ছাড়িবে—পাশ করা ধাত্রী নয়, লেডি ডাক্তার। লেডি ডাক্তাররা বড় অবজ্ঞার চোখে দেখে সরযূকে, এতটুকু নিজের বুদ্ধি খাটাইতে গেলেই বকে। মেয়েকে এম, বি করিতে পারিলে গায়ের জ্বালা সরযূর হয়ত একটু কমিবে—অন্তত তাই আশা।

ওমা, সে কি, মেয়েদের বিয়ে দেবেন না দিদি ?—শ্যামা বলে।

করুক না বিয়ে ? আমি কি ধরে রেখেছি ?—বলিয়া সরযূ হাসে।

ওদের ব্যাপারটা শ্যামা ভাল বুঝিতে পারে না। সরযূর স্বামী নৃত্যলাল কিছু করে না, বসিয়া বসিয়া খায় শীতলের মত, তবু গরীব ওরা নয়। সরযূ নিজে মন্দ রোজগার করে না, বিভাও পঞ্চাশ টাকা করিয়া পায়। কানা খোঁড়া কুৎসিতও নয় মেয়ে দুটি সরযূর। বিবাহ দেয় না কেন ওদের ? বাধা কিসের ? বিভার মত বয়স পর্যন্ত বকুলকে অবিবাহিতা রাখিলে শ্যামা তো ক্ষেপিয়াই যাইত! ভাবনা হয় না সরযূর ?

কি আনন্দেই ওরা দিন কাটায়! সাজিয়া গুজিয়া ফিটফাট হইয়া থাকে, গান করে, গ্রামোফোন বাজায়, দিবারাত্র শ্যামার কানে ভাসিয়া আসে ওদের হাসির শব্দ। মেয়ে দুটি শুধু নয়, মোটা সরযূ পর্যন্ত যেন উল্লাসের একটা

হালকা হিল্লোলে ভাসিয়া বেড়ায়। বাপ মা আর মেয়েরা যেন বন্ধু, সমানভাবে তাহারা হাসি-তামাসা করে, তাস খেলে চারজনে মিলিয়া, একসঙ্গে সিনেমা দেখিতে যায়। বাড়িতে লোকজনও কি আসে কম! সকলে তাহারা ধাত্রী ডাকিতে আসে না। অনেক বন্ধুবান্ধব আছে ওদের,—স্ত্রী ও পুরুষ! তাদের মধ্যে কয়েকটি যুবক যে প্রায়ই কেন আসে শ্যামা তাহা বেশ বুঝিতে পারে। কাঠের বেড়ার একটি ফোকরে চোখ রাখিয়া ও-বাড়িতে পুরুষ ও নারীর নিঃসঙ্কোচ মেলামেশা দেখিয়া শ্যামা থ বনিয়া যায়, গান শুনিতে শুনিতে তাহার ভাত পোড়া লাগে।

বিভা-এ বাড়িতে বেশি আসে না, সে একটু অহঙ্কারী। শামু হরদম আসা-যাওয়া করে। শামুর প্রকৃতিটা শ্যামার একটু অদ্ভুত মনে হয়, একদিকে যেমন সে সরল অন্যদিকে আবার তেমনি পাকা। পোকায় কাটা ফুলের মত সে, খানিক অসাধারণ ভাল খানিক অসাধারণ মন্দ। এমনি বয়সে বিবাহ হইয়া বকুল শ্বশুরবাড়ি গিয়াছে, মেয়েটাকে শ্যামার একটু ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়, শিশুর মত সরল আগ্রহের সঙ্গে শামু তাহার ভালবাসাকে গ্রহণ করে, শ্যামা হয় খুশী। কিন্তু বিধানের সঙ্গে শামুর আলাপ করিবার ভঙ্গিটা শ্যামার ভাল লাগে না। কেমন সব হেঁয়ালিভরা ঠাট্টা শামু করে, কেমন দুষ্টু দুষ্টু মুচকি হাসি হাসে, আড়চোখে কেমন করিয়া সে যেন বিধানের দিকে তাকায়,—সকলের সামনে কি একটা অদ্ভুত কৌশলে সে যেন গোপন একটা ভাবতরঙ্গ তার আর বিধানের মধ্যে প্রবাহিত করিয়া রাখে। অতিশয় দুর্বোধ্য, সূক্ষ্ম ও গভীর একটা লুকোচুরি খেলা। শ্যামা কিছু বুঝিতে পারে না, তবু ভালও তাহার লাগে না। একটু সে সতর্ক হইয়া থাকে। শামু বিধানের ঘরে গেলে মাঝে মাঝে নানা ছলে দেখিয়া আসে ওরা কি করিতেছে। কোনদিন শামুকে বিধান পড়া বলিয়া দেয়, সেদিন শামুর শ্রদ্ধাপূর্ণ নিরীহ ভাবটি শ্যামার ভাল লাগে। কোনদিন বিধান জ্ঞানবিজ্ঞানের কথা বলে, বুঝিতে না পারিয়া শামু ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকায়, আর থাকিয়া থাকিয়া ঢোক গেলে, সেদিনও শ্যামার মন্দ লাগে না। সে অসন্তুষ্ট হয় সেদিন, যেদিন শামু করে দুষ্টামি। দরজার বাহিরে শ্যামা থমকিয়া দাঁড়ায়। চোখ ঘুরাইয়া মুখভঙ্গি করিয়া শামু কথা বলে, বিধানের মুখের কাছে তর্জনী তুলিয়া শাসায়,

তারপর হাসিয়া যেন গলিয়া পড়ে—দেখিয়া রাগে শ্যামার গা রি রি করিতে থাকে। একি নির্লজ্জ ব্যবহার অতবড় আইবুড়ো মেয়ের! এত কিসের অন্তরঙ্গতা? বিধান ওকে এত প্রশ্রয় দেয় কেন?

ঘরে ঢুকিয়া শ্যামা বলে—কি হচ্ছে তোদের!—খুব সাবধানে বলে। বিধান না টের পায় সে অসন্তুষ্ট হইয়াছে।

শামু বলে, মাসিমা, আপনার ছেলে বাজী হেরে দিচ্ছে না—দিন তো শাসন করে?

—কিসের বাজি বাছা?—শ্যামা বলে।

—বললে জিভ দিয়ে আমি যদি নাক ছুঁতে পারি দু'টাকার সন্দেশ খাওয়াবে। নাক ছুঁলাম, এখন দিচ্ছে না টাকা।

জিভ দিয়া নাক ছোঁয়া? এই ছেলেমানুষী ব্যাপার লইয়া ওদের হাসাহাসি? ছি, কি সব ভাবিতেছিল সে! তার সোনার টুকরো ছেলে, তার সম্বন্ধে ও কথা মনে আনাও উচিত হয় নাই। শ্যামা অপ্রতিভ হইয়া যায়।

বিভা আসিলে বসে না, দাঁড়াইয়া দু'চারটি কথা বলিয়া চলিয়া যায়। আঁচল লুটানো শিথিল-কবরী বিলাসী বাবু মেয়ে সে, উদাসী আনমনা তার ভাব, এ বাড়ির সকলের কত গভীর অপরাধ সে যেন ক্ষমা করিয়াছে এমনি উদার ও নম্র তাহার গর্ব। রাজরাণী যেন সখ করিয়া দরিদ্র প্রজার গৃহে আসিয়াছে, স্মিত একটু হাসি, ছেঁড়া লেপ তোষক ভাঙ্গা বাক্স প্যাঁটরা ময়লা জামা কাপড় দেখিয়াও নাক-না সিঁটকানোর মহৎ উদারতা, এই সব উপহার দিয়া সে চলিয়া যায়। বসিতে বলিলে বলে, এই যে বসি, বসার জন্য কি, বসেই তো আছি সারাদিন! এদিক ওদিক তাকায় বিভা শ্যামার হাঁড়ি কলসী, লোহার চায়ের কাপ, ছেঁড়া চটের আসন, গোবরলেপা ন্যাতা সব লক্ষ্য করে,—কিন্তু না, বিভার স্বপণ-লাগা চোখে সমালোচনা নাই। কৃত্রিম না-থাকা নয়, সত্যই নাই। শ্যামা গামছা পরিয়া গা ধোয় বলিয়া বিভা তাকে অসভ্য মনে করে না, হাসে না মনে মনে। সে শুধু দুঃখ পায়। তার দয়া হয়। খাঁটি সমবেদনার সঙ্গেই সে মনে করে যে আহা, একটু শিক্ষা দীক্ষা পাইলে এমনটা হইত না, সকলের সামনে গামছা পরিতে শ্যামা লজ্জা পাইত।

হাসি যদি কখনো পায় বিভার, সে বিধানের জন্য। হঠাৎ ঘর হইতে

বাহির হইয়া বিভাকে দেখিলে আবার সে ঘরে ঢুকিয়া যায়, বিভা যেন অসূর্যম্পশ্যা অন্তঃপুরচারিণী, নিচের বাড়িওয়ালার মেয়ে-বৌয়ের মত লজ্জাশীলা। বিধান নিজে লজ্জা পাইয়া সরিয়া গেলে কথা ছিল না, বিভার লজ্জা বাঁচানোর জন্য ভদ্রতা করিয়া সে সরিয়া যায় বলিয়াই বিভার হাসি পায়।

আপনার বড় ছেলে বুঝি ?—সে জিজ্ঞাসা করে।

শ্যামা বলে, হ্যাঁ।

—এত অল্প বয়সে পড়া ছেড়ে চাকরিতে ঢুকেছেন ?

—দুঃখের সংসার মা, উপায় কি! নইলে ছেলে আমার বড় ভাল ছিল পড়াশোনায়, ওর কি এ সামান্য চাকরি করার কথা ?—বলিয়া শ্যামা নিশ্বাস ফেলে, কি পরীক্ষা দিয়ে ডেপুটি হয় না, তাই দেবার জন্যে তৈরী হচ্ছিল, ভগবান বিরূপ হলেন।

বিভা বলে,—ও।

শ্যামার একদিকের প্রতিবেশিরা এমনি। নিচের তলার মতই ঘরোয়া গৃহস্থ মানুষ, সরযূদের মত উড়ু উড়ু পাখী নয়। শ্যামার মত তাদেরও ছোট ছেলের গন্ধ-ভরা ছেঁড়া লেপতোষক। কর্তা ছিলেন আদালতের পেস্কার, পেনসন লইয়া এখন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেন। প্রতি মাসের দুই তারিখে সকাল-বেলা ভাড়ার রসিদ হাতে সিঁড়ির শেষ ধাপে উঠিয়া ডাকেন, বিধানবাবু! নেত্যবাবু! আছেন নাকি ?

বাড়িওলার ছেলেমেয়ে বৌ নাতিনাতনিতে একতলাটা বোঝাই হইয়া থাকে,—ক'খানা মাত্র ঘর, কি করিয়া ওদের কুলায় কে জানে! তিনটি বিবাহিত পুত্রকে তিনখানা ঘর ছাড়িয়া দিলে বাকি সকলে থাকে কোথায়? বাকি ঘর তো থাকে মোটে একখানি। কর্তা গিন্নি, একটি বিধবা মেয়ে, ছোট মেয়ে আর মেয়ের জামাইও এখানে থাকে তারা, পেটেন্ট ওষুদের ক্যানভাসার ভাইপোটি, সকলে ওই একখানা ঘরে থাকে নাকি? প্রথমটা শ্যামার বড় দুর্ভাবনা হইত। তারপর একদিন রাত্রে রাঁধিয়া বাড়িয়া বাড়িওলা গিন্নির সঙ্গে খানিক আলাপ করিতে গিয়া সে ব্যাপার বুঝিয়া আসিয়াছে। বড় দু'খানা ঘরের প্রত্যেকটির মাঝামাঝি এ দেয়াল হইতে ও-দেয়াল পর্যন্ত তার টাঙানো আছে, তাতে ঝুলানো আছে ছিটের পর্দা। দিনের বেলা পর্দা গুটানো

থাকে, রাত্রে পর্দা টানিয়া দু'খানা ঘরকে চারখানা করিয়া তিন ছেলে আর মেয়ে-জামাই শয়ন করে। পর্দার উপরে একটি বিদ্যুতের বাতি জ্বালিয়া দু'দিকের দম্পতিকে আলো দেয়।

সিঁড়ির নিচে যে স্থানটুকু আছে ক্যানভাসার ভাইপোটি সেখানে থাকে। নাম তাহার বনবিহারী। সিঁড়ির উপরে রেলিং ঘেঁষিয়া দাঁড়াইলে নিচে বনবিহারীকে দেখিতে পাওয়া যায়। সারাদিন বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া রাত্রি আটটা ন'টার সময় সে ফিরিয়া আসে। ওষুধের সুটকেশটি চৌকির নিচে ঢুকাইয়া জামাটি খুলিয়া সে পেরেকে টাঙ্গাইয়া দেয়, কাপড় গায়ে দিয়া চৌকিতে বসিয়া জুতার ফিতা খোলে। তার পর চৌকিতে পা তুলিয়া নিজের পা টিপিতে আরম্ভ করে নিজেই। হঠাৎ বাড়িওলা গিন্নি ডাক দেয়, বনু এলি, বনু? পাঁউরুটি আনা হয়নি, ভোলা ভুলে এসেছে, যা তো বাবা মোড়ের দোকান থেকে চট করে একটা রুটি নিয়ে আয়,—সকালে উঠে খাই খাই করে সবাই তো খাবে আমায়। কোনদিন বড়বৌ কোলের ছেলেটিকে দিয়া যায়, বলে, দেখতো ভাই পার নাকি ঘুম পাড়াতে হেঁটে হেঁটে? ডানা আমার ছিঁড়ে গেল। কোনদিন বাড়িওলা স্বয়ং আসেন দাবার ছক লইয়া, বলেন,—আয় বনু বসি একদান।—বনুর ভাত ঢাকা দিয়ে রাখো বৌমা, দুধ থাকে তো দিও দিকি বনুকে একটু, দু'হাতাই দিও, ক্ষীর করে রাখ বাকিটা। কালকের মত ঘন কারো না বাছা ক্ষীর, ঘন ক্ষীর খেয়ে আজ পেট কামড়েছে,—পাতলাই রেখো আর চিনি দিও একটু। ভানু, ও ভানু, তামাক দে দিকি মা—বড় কলকেতে দিস বেশি তামাক দিয়ে।

এসব দেখিয়া শুনিয়া শ্যামার চোখে যদি জল আসিত, সে জল সোজা গিয়া পড়িত বনবিহারীর মাথায় পথের ধুলায় ধুসর রুক্ষ চুলে। এক একদিন বিভা আসিয়া দাঁড়ায়। ঝুঁকিয়া দেখিয়া ফিস ফিস করিয়া বলে, অনেক মানুষ দেখেছি, এমন বোকা কখনো দেখিনি মাসিমা। এমন করে এখানে তোর পড়ে থাকা কেন? মেসে গিয়ে থাকলেই হয়!

রোজগারপাতি বুঝি নেই।—শ্যামা বলে।

কুড়ি পঁচিশ ও যা পায় মাসিমা, একজনের পক্ষে তাই ঢের। তাছাড়া এমন করে থাকার চেয়ে না খেয়ে মরাও ভাল।—পুরুষ-মানুষ নয় ও!

রাগে বিভা গরগর করে। শ্যামা একটু অবাক হয়, এত রাগ কেন বিভার? কোথায় কোন কাপুরুষ যুবক ক্রীতদাসের জীবন যাপন করে খেয়াল করিয়া বিচলিত হওয়ার স্বভাব তো বিভার নয়! হঠাৎ বিভা করে কি, ঝুঁকিয়া ডাক দেয়,—বনুবাবু, মা আপনাকে ডাকছেন, উপরে আসবেন একবার?

বনবিহারী মুখ তুলিয়া তাকায়, বলে,—যাই।

সে উঠিয়া আসিলে শ্যামাকে অবাক করিয়া দিয়া বিভা তাহাকে বকে। রীতিমত ধমকায়। বলে,—কি যে প্রবৃত্তি আপনার বুঝিনে কিছু, একেবারে আপনার ব্যাক্‌বোন নেই, সারাদিন ঘুরে এত রাত্রে ফিরে এলেন এখনও আপনাকে সংসারের কাজ করতে হবে? কেন করেন আপনি? আমি হলে তো সবাইকে চুলোয় যেতে বলে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়তাম, এত কি আহ্লাদ সকলের! বিনে মাইনের চাকর নাকি আপনি!—এমনি ভাবে কত কথাই যে বিভা তাহাকে বলে। বলে, সংসারে এমন নিরীহ হইয়া থাকিলে চলে না। একটু শক্ত হইতে হয়। অপদার্থ জেলিফিশ তো নয় বনবিহারী!

বলিতে বলিতে এত রাগিয়া ওঠে বিভা যে হঠাৎ মুখ ঘুরাইয়া গটগট করিয়া সে ভিতরে চলিয়া যায়। মুখ নীচু করিয়া বনবিহারী নামে নীচে। শ্যামা দাঁড়াইয়া ভাবিতে থাকে যে বিভা অনেকদিন এখানে আছে, বনবিহারীর সঙ্গে পরিচয় তাহার অনেক দিনের, বিভার গায়ে পড়িয়া বকাবকি করাটা যেমন বিসদৃশ শোনাইল আসলে হয়ত তা তেমন খাপছাড়া নয়।

এখানে আসিয়া অল্পে অল্পে শ্যামার মন কিছু সুস্থ হইয়াছে।

তবে শ্যামা আর সে শ্যামা নাই। বনগাঁয়ে হঠাৎ সে যেরকম শান্ত ও নির্বাক হইয়া গিয়াছিল, এখানেও সে প্রায় তেমনি হইয়া আছে, শুধু তার এই পরিবর্তন এখন আর অস্বাভাবিক মনে হয় না। আসন্ন সন্তান সম্ভাবনার সঙ্গে পরিবর্ত্তনটুকু খাপ খাইয়া গিয়াছে। চলাফেরা কাজকর্ম সমস্তই তার ধীর মন্থর, সংসারটাকে ঠেলিয়া তুলিবার জন্য তার ধৈর্যহীন উৎসাহ আর নাই, নিজের সংসারে থাকিবার সময় সে একদিন ছেলেমেয়ের জামার ছাঁটটি পর্যন্ত ক্রমাগত উন্নততর করিতে না পারিলে স্বস্তি পাইত না, সংসারের তুচ্ছতম খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলি পর্যন্ত তার কাছে ছিল গুরুতর, এখন সে শুধু মোটা-মুটি সংসারটা চালাইয়া যায়, ছোটখাট ত্রুটি ও ফাঁকি সে অবহেলা করে।

সংসারের যেখানে বোতাম ছিঁড়িয়া ফাঁক বাহির হয় সেখানে সেফটিপিন গুঁজিয়া কাজ চালাইতে তাহার বাধে না। ছেলেদের জীবনের প্রত্যেকটি মিনিটের হিসাব রাখা আর হইয়া ওঠে না, বিধান দেরি করিয়া বাড়ি ফিরিলে কারণ জিজ্ঞাসা করিতে সে ভুলিয়া যায়, শীতের সন্ধ্যায় ফণীর পায়ে মোজা না উঠিলেও তার চলে। ঘরের আনাচে কানাচে ধূলাবালি, জামা-কাপড়ে ময়লা, চৌবাচ্চায় শ্যাওলা জমিতে পারে।

নূতন যারা শ্যামাকে দেখিল তারা কিছু বুঝিতে পারে না, আগে যারা তাহাকে দেখিয়াছে তারাই শুধু টের পায় বনগাঁ তাহাকে কি ভাবে বদলাইয়া দিয়াছে।

আবার শীত শেষ হইয়া আসিল। ফাল্গুন মাসে একটি কন্যা জন্মিল শ্যামার। বকুল বুঝি আবার সুরু হইল গোড়া হইতে। কিন্তু বকুলের কি সুন্দর দু'টি ডাগর চোখ ছিল। এ মেয়ের চোখ কোথায়? হায়, শ্যামার মেয়ে জন্মিয়াছে অন্ধ হইয়া। গর্ভের অনাদিকালের অন্ধকারে তাকে ঘিরিয়া রহিল, এ জগতের আলো সে চিনিবে না কোনদিন।

জন্মান্ধ? কার পাপের ফল ভোগ করিতে তুই পৃথিবীতে আসিলি খুকি! দৃষ্টি তোর হরণ করিল কে? ভাবিতে ভাবিতে শ্যামা স্মরণ করে, বনগাঁয়ে একদিন সন্ধ্যার সময় কলাবাগানের ছায়ার মত কি যেন দেখিয়া তার গা ছম্‌ছম্‌ করিয়াছিল, স্নানের আগে এলোচুলে তেল মাখিবার সময় আর একদিন পাগলা হাবুর বুড়ি দিদিমা তাহাকে দেখিয়া ফেলিয়াছিল, অজ্ঞাতসারে আরও কবে কি ঘটিয়াছিল কে জানে!

কি আর করা যায়, অন্ধ মেয়েকে শ্যামা সমান আদরেই মানুষ করে, যেমন সে করিয়াছিল বকুলকে, যার ডাগর দুটি চোখ শ্যামাকে অবিরত অবাক করিয়া রাখিত। দু'মাস বয়স হইতে না হইতে শীতল মেয়েকে বড় ভাল বাসিল। বিধান একটা ঠাকুর আনিয়াছিল, তাহাকে ছাড়াইয়া দিয়া শ্যামা আবার রান্না আরম্ভ করিলে মেয়ে কোলে করিয়া বসিয়া থাকার কাজটা পাইয়া শীতল ভারি খুশী। এখানে আসিয়া বনগাঁর পোষা কুকুরটির জন্য শীতলের মন কেমন করিত, খুকিকে কোলে পাইয়া কুকুরের শোক সে ভুলিয়া গেল। শীতলের বাঁ পায়ের বেদনাটা আবার চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। এ জন্য

দোষী করে সে শ্যামাকে। শ্যামার জন্যই তো চাকরি করিতে দুর্বল পা লইয়া দু'বেলা তাহাকে হাঁটাহাঁটি করিতে হইত বনগাঁয়।

অবসর সময়টা শ্যামা তার পায়ে তার্পিন তেল মালিশ করিয়া দেয়। অসুস্থ স্বামীকে চাকরি করিতে পাঠাইয়া অপরাধ যদি তার হইয়া থাকে, এ তার অযোগ্য প্রায়শ্চিত্ত নয়।

মোহিনী কলিকাতায় চাকরী করে কিন্তু শ্বশুরবাড়ি বেশি সে আসে না, বোধ হয় পিসির বারণ আছে। শ্যামা তাকে দু'দিন নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, দু'দিন আসিয়া সে খাইয়া গিয়াছে, নিজে হইতে একদিনও খোঁজখবর নেয় নাই। বিধান প্রথম প্রথম কাকার বাড়ি গিয়া মোহিনীর সঙ্গে সর্বদা দেখাসাক্ষাৎ করিত, এখন সেও আর যায় না। রাগ করিয়া শ্যামাকে সে বলে, এমনি লাজুক হলে কি হবে, মোহিনী বড় অহঙ্কারী মা,—কতবার গিয়েছি আমি, কত বলেছি আসতে, এল একবার? নেমন্তন্ন না করলে বাবুর আসা হয় না, ভারি জামাই আমার!—এদিকে তো মাছিমারা কেরানী পোষ্টাপিসের।

কিন্তু মোহিনী একদিন বিনা আহ্বানেই আসিল। লজ্জায় মুখ রাঙা করিয়া বিধানের কাছে সে স্বীকার করিল যে বকুলের চিঠি পাইয়া সে আসিয়াছে। বকুলকে এখন একবার আনা দরকার। পনের দিনের ছুটি লইয়া সে বাড়ি যাইতেছে, ইতিমধ্যে শ্যামা যদি তাহার পিসিকে একখানা চিঠি লিখিয়া দেয় আর চিঠির জবাব আসার আগেই বিধান যদি সেখানে গিয়া পড়ে, বকুলকে পাঠানোর একটা ব্যবস্থা মোহিনী তবে করিতে পারে।

মোহিনীর কথাবার্তা বিধানের কাছে হেঁয়ালির মত লাগে, সে বলে,—বোসো তুমি, মাকে বলি।

মোহিনী বলে, না না, আমি গেলে বলবেন।

কিন্তু তা হয় না, শ্যামাকে না বলিলে এসব সাংসারিক ঘোরপ্যাঁচ কে বুঝিতে পারিবে?

বিধান শ্যামাকে সব শোনায়। শুনিবামাত্র ব্যাপার আঁচ করিয়া শান্ত নির্বাক শ্যামার সহসা আজ দেখা দেয় অসাধারণ ব্যস্ততা।

—কই মোহিনী? ডাক খোকা, মোহিনীকে ডাক।

শ্যামার চোখ ছল ছল করে। আনিবার জন্য তাই বকুল ইদানিং এত

করিয়া লিখিতেছিল! তারা আনিবার ব্যবস্থা করিতে পারে নাই বলিয়া মেয়ে তার জামাইকে এমন চিঠি লিখিয়াছে যে, বিনা নিমন্ত্রণে যে কখনো আসে না সে যাচিয়া আসিয়াছে বকুলকে আনানোর ষড়যন্ত্র করিতে, ছুটি লইয়া যাইতেছে বাড়ি! মোহিনীকে কত জেরাই যে শ্যামা করে! সজল চোখে কতবার যে সে মোহিনীকে মনে করাইয়া দেয় তার হাতে যেদিন মেয়েকে সঁপিয়া দিয়াছিল সেইদিন হইতে শ্যামার ছেলের সঙ্গে তার কোন পার্থক্য নাই, বিধান যেমন মোহিনীও তেমনি শ্যামার কাছে। অনুযোগ দিয়া বলে, তোমার বাড়ির কারুর কি উচিত ছিল না বাবা একথাটা আমায় লিখে জানায়! আমি তার মা, আমি জানতেও পেলাম না ক'মাস কি বৃত্তান্ত? পিসি না বুঝুক, তুমি তো বোঝ বাবা মার দুঃখু?

মোহিনীকে সে-বেলা এখানেই খাইয়া যাইতে হয়। জামাই কোনদিন পর নয়, তবু আজ মোহিনী যেন বিশেষ করিয়া আপন হইয়া যায়। মনটা ভাল মোহিনীর, বকুলের জন্য টান আছে মোহিনীর, না আসুক সে নিমন্ত্রণ না করিলে, অবুঝ গোঁয়ার সে নয়, মধুর স্বভাব তার।

চার পাঁচদিন পরে বিধান গিয়া বকুলকে লইয়া আসিল। বলিল,—উঃ মাগো, কি গালটা পিসি আমাকে দিলে! বাড়িতে পা দেয়া থেকে সেই যে বুড়ি মুখ ছুটাল মা, থামল গিয়ে একেবারে বিদায় দেবার সময়, অমঙ্গল হবে ভেবে তখন বোধ হয় কিছু বলতে সাহস হ'ল না, মুখ গোমড়া করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি আর যাচ্ছিনে বাবু খুকির শ্বশুরবাড়ি এ জন্মে।

বকুল তো আসিল, এ কোন বকুল? একি রোগা শরীর বকুলের, নিষ্প্রভ কপোল, ভীরু চোখ, কান্তিবিহীন মুখ, লাবণ্যহীন বর্ণ? মেয়েকে তার এমন করিয়া দিয়াছে ওরা!—পেট ভরে খেতেও ওরা দিত না বুঝি খুকি? খাটিয়ে মারত বুঝি দিনরাত? আমি কি জানতাম মা এত তোকে কষ্ট দিচ্ছে! আনবার জন্যে লিখতিস, ভাবতাম আসবার জন্যে মন কেমন কচ্ছে তাই ব্যাকুল হয়েছিস,—পোড়া কপাল আমার!

শ্যামার মুখে হঠাৎ যে খিল পড়িয়াছিল, বকুল আসিয়া যেন তা খুলিয়া দিয়াছে। সেটা আশ্চর্য নয়। মনের অবস্থা অস্বাভাবিক হইয়া আসিলে এই তো তার সবার বড় চিকিৎসা, এমনি ভাবে মশগুল হইতে পারা জীবনের

স্বাভাবিক বিপদে সম্পদে, যার মহা সমন্বয় সংসারধর্ম। বহু দিনের দুর্ভাবনায়, বনগাঁর পরাশ্রিত জীবনযাপনে, শ্যামার মনে যদি বৈকল্য আসিয়া থাকে, ছেলের চাকরি, অন্ধ মেয়ের জন্ম, বকুলের এভাবে আসিয়া পড়া, এততেও সেটুকু কি শোধরাইবে না? আগের মত হওয়া শ্যামার পক্ষে আর সম্ভব নয়, তবু পরিবর্তিত, পরিশ্রান্ত ক্ষয় পাওয়া শ্যামার মধ্যে একটু শক্তি ও উৎসাহ, একটু চাঞ্চল্য ও মুখরতা এখন আসিতে পারে, আসিতে পারে জীবনের হাসি-কান্নার আরও তেজী মোহ, সুখের নিবিড়তর স্বাদ।

মহোৎসাহে শ্যামা বকুলের সেবা আরম্ভ করিল।

বনগাঁয়ে চুরি করিয়া বিধানকে সে ভাল জিনিস খাওয়াইত, এখানে নিজের মুখের খাবারটুকু সে মেয়ের মুখে তুলিয়া দিতে লাগিল। নব্বই টাকা আয়ে তো কলিকাতা শহরে রাজার হালে থাকা যায় না, নিজেকে বঞ্চিত না করিয়া মেয়েকে দিবার দুধটুকু ঘিটুকু ফলটুকু কোথায় পাইবে সে? কচি মেয়ে মাই খায়, শ্যামার নিজেরও দারুণ ক্ষুধা, পাতের মাছটি তবুও বকুলের পাতে তুলিয়া দেয়, মণিকে দিয়া চিনিপাতা দই আনায় দু'পয়সার, বলে, দই মুখে, রুচবে লো, ভাতকটা সব মেখে খেয়ে নে চেঁছেপুঁছে, লক্ষ্মী খা। দই খেলে আমার বমি আসে, তুই খা তো। ওমণি, দে বাবা, একটু আচার এনে দে দিদিকে।

বকুলকে সে বসাইয়া রাখে, কাজ করিতে দেয় না।

দেখিতে দেখিতে বকুলের চেহারার উন্নতি হয়।

কিন্তু মুস্কিল বাধায় সরযূ। বলে,—মেয়েকে কাজকর্ম করতে দিচ্ছ না, এ কিন্তু ভাল নয় ভাই।

শ্যামা বলে, খেটে খেটে সারা হয়ে এল, ওকে আর কাজ করতে দিতে কি মন সরে দিদি? অল্পবিস্তর কাজ ধরতে গেলে করে বৈকি মেয়ে, বিছানা টিছানা পাতে। বিকেলে খানিকক্ষণ হেঁটেও বেড়ায় ছাতে, তা তো দেখতেই পাও?

মনে হয় সরযূর অনধিকার চর্চায় শ্যামা রাগ করে। পাশকরা ধাত্রী! পাঁচটি সন্তানের জননী সে মেয়ের কিসে ভাল কিসে মন্দ সে তা বোঝে না, পাশকরা ধাত্রী তাহাকে শিখাইতে আসিয়াছে!

শ্যামা প্রাণপণে মেয়েকে এটা ওটা খাওয়াইবার চেষ্টা করে, বকুলের কিন্তু অত খাওয়ার সখ নাই, তার সবচেয়ে জোরালো সখটি দেখা যায়, বিধানের বিবাহ সম্বন্ধে। শ্যামাকে সে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। বলে, কি করছ মা তুমি? চাকরী বাকরী করছে, এবার দাদার বিয়ে দাও? শামুর সঙ্গে দাদার এত মাথামাখি দেখে ভয়ও কি হয়না তোমার?

কিসের মাথামাখি লো?—শ্যামা সভয়ে বলে।

—নয়? বিয়ের যুগ্যি মেয়ে, ও কেন রোজ পড়া জানতে আসবে দাদার কাছে? পড়া জানবার দরকার হয় মাষ্টার রাখুক না! না মা, দাদার তুমি বিয়ে দাও এবার।

শামুর আসা যাওয়া শ্যামার চেয়েও বকুল বেশি অপছন্দ করে। কি পাকা গিন্নিই বকুল হইয়াছে! সাংসারিক জ্ঞান বুদ্ধিতে কচি মনটি যেন তার টইটম্বুর, আঁটিতে চায় না। শামুর কাপড় পরা বেণীপাকানো, পাউডার মাখার ঢং দেখিয়া গা যে তার জলিয়া যায় শ্যামা ভিন্ন কার সাধ্য আছে তা টের পাইবে, মনে হয় শামুর সঙ্গে সখিত্বই বুঝি তার গড়িয়া উঠিল। বনগাঁর সেই ঢেঁকি ঘরখানার চালায় ইতিমধ্যে বুঝি নূতন খড়ও ওঠে নাই এক আঁটি, শঙ্করের গায়ের সেই জামাটি বুঝি আজও ছেঁড়ে নাই, অশ্রুমুখী সেই অবোধ বালিকা বকুল আজ এই বকুল হইয়াছে, দুটি ছেলেমানুষ ছেলেমেয়ের সহজ বন্ধুত্বে সে আঁষটে গন্ধ পায় এবং বেমালুম তাহা গোপন রাখিয়া ওদের দেখায় হাসিমুখ, নাক সিঁটকায় মার কাছে আর করে ষড়যন্ত্র। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা গড়িয়া পিটিয়া বকুলকে মানুষ করিয়া দিয়াছে সন্দেহ নাই।

ষড়যন্ত্রে শ্যামার সায় আছে। মিথ্যা নয়, বিধানের এবার বিবাহ দেওয়া দরকার বটে।

বিধান শুনিয়া হাসে। বলে, পিসির গাল সয়ে নিয়ে এলাম কি না, মাকে বুঝি তাই এসব কুপরামর্শ দিচ্ছিস খুকী?—তারপর গম্ভীর হইয়া বলে, এদিকে খরচ চলে না সে খবর রাখিস তুই? ট্রামের টিকিট না কিনে মণির স্কুলের মাইনে দিয়েছি এবার, তুই আছিস কোন তালে!

বকুল বলে, আমাকে এনে তোমার খরচ বাড়ল দাদা।

—তবু তো আছিস আমায় ডুবিয়ে যাবার ফিকিরে।

বকুল অভিমান করে। সে আসিয়া খরচ বাড়াইয়াছে বিধান একবার প্রতিবাদ করিলে সে খুশী হইত। কারো মন বুঝিয়া একটা কথা যদি বিধান কোনোদিন বলিতে পারে। খানিক পরে আবার উল্টা কথা ভাবিয়া বকুলের অভিমান কমিয়া যায়। তাই বটে দাদা কি পর যে তোষামদ করিয়া কথা কহিবে তার সঙ্গে? আবার সে প্যান প্যান শুরু করিয়া দেয়। যুক্তি দেখায় যে ও-সব বাজে ওজোর বিধানের, এই যে সে আসিয়াছে, সংসার অচল হইয়াছে কি? একটা বৌ আসিলেও স্বচ্ছন্দে সংসার চলিবে। তার চেয়ে বেশি ভাত বৌ খাইবে না নিশ্চয়।

সংসারের ভার গ্রহণ করার আনন্দ বিধানের এদিকে কয়েক মাসের মধ্যেই তিতো হইয়া গিয়াছিল: এই বয়সে ভায়ের স্কুলের মাহিনা দিতে রোজ হাঁটিয়া আপিস করা যদি বা সহ্য হয়, একেবারে নব্বই নব্বইটা টাকাতেও যে মাসের খরচ কুলায় না এটুকু মাথা গরম করিয়া দেয় তরুণ মানুষের। বকুলকে একদিন বিধান ভয়ানক ধমকাইয়া দিল। বলিল, বিয়ে! বিয়ে। একটা ট্যুসনি খুঁজে পাচ্ছি না, বিয়ে বিয়ে করে পাগল করে দিলি আমায়। ফের ও কথা বললে চড় খাবি খুকী।

বলিয়া সে আপিস গেল। বকুল নাইল না, খাইল না, গোসা করিয়া শুইয়া রইল। বিকালে বাড়ী ফিরিয়া বিধান শুনিল শ্যামার বকুনি, তারপর সে বকুলকে তুলিয়া খাওয়াইতে গেল।

আজ বিভা বসিয়াছিল বকুলের কাছে।

বিধানের সঙ্গে আগে সে কোনোদিন কথা বলে নাই, আজ দয়া করিয়া বলিল, পালাচ্ছেন কেন, আসুন না? কি বলেছেন বোনকে, বোন আজ রাগ করে সারাদিন খায় নি?

তারপর বিভা বলিল, শামু খুব প্রশংসা করে বিধানের। জগতে নাকি এমন বিষয় নাই বিধান যা জানে না? পড়াটড়া জানিতে আসিয়া শামু বোধ হয় খুব বিরক্ত করে বিধানকে? আশ্চর্য মেয়ে, মানুষকে এমন জ্বালাতন করিতে পারে ও! বিভা এই সব বলে, বিধান মুখ লাল করিয়া আড়ষ্ট ভাবে শোনে। শ্যামাও তো পিছু পিছু আসিয়াছিল বিধানের, সে আর বকুল ভাবে শামুর কথা ওঠায় বিধানের মুখ লাল হইয়াছে। তারা তো বুঝতে পারে না

জীবনে যে কখনো মেয়েদের ধারে কাছে ঘেঁষে নাই, বিভার মতো গান-জানা মন-টানা আধুনিক মেয়ের কাছে কি তার দারুণ অস্বস্তি।

গভীর বিষাদে শ্যামার মন ভরিয়া যায়। এইবার বুঝি তার একেবারে হাল ছাড়িয়া দিবার দিন আসিয়াছে। অন্ধ মেয়ে দিয়া ভগবানের সাধ মিটিল না, ছেলে কাড়িয়া নেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবার। বিধানের স্নেহের স্রোত আর কি তার দিকে বহিবে? তার কড়া হাতের সেবা আর কি ভাল লাগিবে বিধানের? জননীকে আর তো বিধানের প্রয়োজন নাই। নিজের জীবন এবার নিজেই সে গড়িয়া তুলিবে, যে অধিকার এতদিন শ্যামার ছিল নিজস্ব। শ্যামা বুঝিতে পারে, জগতে এই পুরস্কার মা পায়। বকুলকে বড় করিয়া দান করিয়াছে পরের বাড়ি, তার চোখের সামনে বিধানের নিজের স্বতন্ত্র জগৎ গড়িয়া উঠিতেছে, যেখানে তার ঠাঁই নাই এতটুকু। মণির বেলা ফণীর বেলাও হইবে এমনি। আপন হইয়া কেহ যদি চিরদিন থাকে শ্যামার, থাকিবে ওই অন্ধ শিশুটি, যার নিমীলিত আঁখি দুটির জন্য শ্যামার আঁখি সজল হইয়া থাকিবে আজীবন।

এক বাড়িতে বাস করিলে পরের জীবনের গোপন ও গভীর জটিলতাগুলি, কেহ বলিয়া না দিলেও, ক্রমে ক্রমে সকলেই টের পাইয়া যায়। বিভা ও বনবিহারীর ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া শ্যামা ও বকুল হাসাহাসি করে নিজেদের মধ্যে। বিভার জন্য ভেড়া বনিয়া এখানে পড়িয়া আছে বনবিহারী, একটু চোখের দেখা, একটু গান শোনা, বিভার যদি দয়া হয় কখনো দুটি বলা এইটুকু সম্বল বনবিহারীর! মাগো মা, কি অপদার্থ পুরুষ! না জানিস ভালরকম লেখা-পড়া, করিস ক্যানভাসারি, থাকিস পরের বাড়ি দাস হইয়া, তোর একি দুরাশা! সিঁড়ির নিচে ভাঙা চৌকিতে যার বাস তার কেন আকাশের চাঁদ ধরার সাধ? বনবিহারীর পাগলামি বিশেষ অস্পষ্ট নয়, সকলেই জানে: সে নিজেই শুধু তা জানে না; ভাবে গোপন কথাটি তার গোপন হইয়াই আছে, ছড়াইয়া পড়ে নাই বাহিরে। টের পাওয়া অবশ্য কারো উচিত হয় নাই, কারণ বনবিহারী কিছুই করে না প্রেমিকের মতো, বিভা সিঁড়ি দিয়া নামিলে শুধু চাহিয়া থাকে, বিভা গান ধরিলে যদি আশেপাশে কেহ না থাকে তবেই সে সিঁড়ি দিয়া গুটি গুটি উপরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, আর যা কিছু সে করে সব চুরি করিয়া, কারো তা দেখিবার কথা নয়।

ক্যানভাস করিতে বাহির হইয়া বিভার স্কুলের কাছাকাছি কোথাও সে রোজই দাঁড়াইয়া থাকে ছুটির সময়, কোনোদিন সাহস করিয়া সামনে গিয়া বলে, ছুটি হয়ে গেল আপনার?—কোনোদিন দূর হইতেই সরিয়া পড়ে। এইটুকু যে সকলে জানিয়া ফেলিয়াছে টের পাইলে লজ্জায় বনবিহারী মরিয়া যাইবে। তারপর বিভার কাজ করিয়া দিতেও সে ভালবাসে বটে। লণ্ড্রিতে কাপড় দিয়া লইয়া আসে, ফর্দ মাফিক মার্কেট হইতে জিনিসপত্র কিনিয়া আনে, যে দুটি ছোট ছোট মেয়ে সকালবেলা গান শিখিতে আসে বিভার কাছে, দরকার হইলে তাদের বাড়ি পৌঁছাইয়া দেয়। এখন, এসব ছোটখাট উপকার কে না কার করে জগতে? বাড়ির কাজও তো সে কম করে না। বিভার দুটি একটি কাজ করিয়া দেওয়ার মধ্যে তার গোপন মনের প্রতিচ্ছবি যে সকলে দেখিয়া ফেলিবে কেমন করিয়া সেটুকু অনুমান করিবে বনবিহারী? বিভার যে ফটোখানা সে চুরি করিয়াছে সেখানা সে লুকাইয়া রাখিয়াছে ক্যানভাসিংএ যাওয়ার সুটকেশটির মধ্যে আর পুরনো ব্লাউজটি রাখিয়াছে তার ট্রাঙ্কে তালা-চাবি দিয়া। চুপি চুপি লুকাইয়া এগুলি সকলে যে আবিষ্কার করিয়াছে তাই বা সে জানিবে কিরূপে?

বিভা বিব্রত হইয়া থাকে। বনবিহারী এমন নিরীহ, যত স্পষ্টই হোক এমন মূক ও নিষ্ক্রিয় তার প্রেম, তার বিরুদ্ধে নালিশ খাড়া করিবার তুচ্ছতম প্রমাণটিরও এমন অভাব যে এ বিষয়ে সকলের যেমন তারও তেমনি কিছু বলিবার অথবা করিবার উপায় নাই। মনে মনে সে কখনো রাগে কখনো বোধকরে মমতা, সিঁড়ি দিয়া নামার সময় কোনোদিন তাকায় ক্রুদ্ধ ভৎর্সনার চোখে কোনো দিন দুটি একটি স্নিগ্ধ কথা বলে। ভাল যে লাগে না একেবারে তা নয়। একটা কুকুরও কুকুরের মতো পোষ মানিলে মানুষের তাতে কত গর্ব কত আনন্দ, এ তো একটা মানুষ। অথচ এরকম পূজা গ্রহণ করিবার উপায় না থাকিলে কি বিশ্রীই যে লাগে মানুষের, মনে যার একফোঁটা দয়ামায়া থাকে।

বকুলের সঙ্গে হাসাহাসি করে বটে মনে শ্যামা কিন্তু ব্যথা পায়। শক্ত সমর্থ যুবক, একি ব্যাধি তার মনের। মেরুদণ্ডটা পর্যন্ত যে ওর গলিয়া গেল, সুযোগ পাইয়া কি ব্যবহারটাই বাড়ির লোকে করে ওর সঙ্গে, নিজের মনুষ্যত্ব

যে বিসর্জন দিয়াছে কে তাকে মানুষ জ্ঞান করিবে, দোষ কারো নাই।

আচ্ছা, শামুর জন্য বিধানও যদি অমনি হইয়া যায়? অমনি উন্মাদ? ও ভগবান, শ্যামা তবে নিজেই পাগল হইয়া যাইবে!

অনেক ভাবিয়া শ্যামা শেষে একদিন বকুলকে বলে, শোন খুকী বলি, ছাখ শামুকে যদি খোকার পছন্দ হয়ে থাকে, ওর সঙ্গেই না হয় দিই খোকার বিয়ে? স্বঘর তো, দোষ কি।

বকুল স্তম্ভিত হইয়া যায়, বলে, ক্ষেপেছ নাকি তুমি মা, কি বলছ তার ঠিক ঠিকানা নেই, ওই মেয়ের সঙ্গে তুমি বিয়ে দিতে চাও দাদার! শামু ভাল নয় মা—শয়তানের একশেষ। এমন কথা মনেও ঠাঁই দিও না।

কি হইবে তবে? একদিন শ্যামু না আসিলে বিধান যে উসখুস করিতে থাকে। শামুর হাসির হিল্লোলে সংসার যে শ্যামার ভাসিয়া যাইতে বসিয়াছে।

ভগবান মুখ তুলিলেন।

অনেক দুঃখ শ্যামা পাইয়াছে, আর কি তিনি তাকে কষ্ট দিতে পারেন। একদিন বিধান বলিল, শঙ্করের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম মা, আমাদের বাড়িটা দেখে আসতে ইচ্ছে হল, গিয়ে দেখি ভাড়ার নোটিশ ঝুলছে। যাবে ও বাড়িতে?

আমাদের বাড়ি! আজও সে-বাড়ির কথা বলিতে ইহারা বলে আমাদের বাড়ি।

শ্যামা সাগ্রহে বলিল, সত্যি খোকা?—যাব, চল সামনের মাসেই আমরা চলে যাই, পয়লা তারিখে।

সামনের মাসে পয়লা তারিখে ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করিয়া তাহারা বাড়ি বদলাইয়া ফেলিল। বিধান ছুটি লইল একদিনের। সকালে একা গিয়া জিনিসপত্র রাখিয়া আসিতে বেলা তার বারোটা বাজিয়া গেল। শামু আর বিভা দুজনেই তখন স্কুলে গিয়াছে, বাড়িওয়ালার ছেলেরা গিয়াছে আপিস, বনবিহারী গিয়াছে ওষুধ ক্যানভাস করিতে। দুপুরে এখানেই পাতা পাতিয়া তাহারা ভাত খাইল। তারপর বাকি জিনিসপত্র সমেত রওনা হইয়া গেল সহরতলীর সেই বাড়ির উদ্দেশে, শ্যামার জীবনের দুটি যুগ যেখানে কাটিয়াছিল।

তেমনি আছে ঘরবাড়ি শ্যামার। এবাড়ি হইতে সে যখন বিদায় লইয়াছিল তখন বাড়িটা শুধু ছিল একটু বিবর্ণ, বাড়ির মালিক এখন আগাগোড়া চুনকাম করিয়াছে, রঙ দিয়াছে। শ্যামা সোজা উঠিয়া গেল উপরে। উপরের ঘরখানাকে আর নূতন বলিয়া চেনা যায় না, বাড়ির বাকি অংশের সঙ্গে মিশ খাইয়া গিয়াছে। নকুড়বাবু দোতলায় ঘর তুলিয়াছে একখানা। রেলের বাঁধটার খানিকটা আড়াল পড়িয়া গিয়াছে। আর কিছুই বদলায় নাই। ধানকলের বিস্তৃত অঙ্গনে তেমনি ধান মেলা আছে, পায়রার ঝাঁক তেমনি খাইতেছে ধান, উঁচু চোঙাটা দিয়া তেমনি অল্প অল্প ধোঁয়া বাহির হইয়া উড়িয়া যাইতেছে বাতাসে।

দশ

বকুলের একটি মেয়ে হইয়াছে।

প্রথম বারেই মেয়ে? তা হোক! শ্যামার শেষবারের মেয়ের মতো ও তো অন্ধ হইয়া জন্মায় নাই, বকুলের চেয়েও ওর বুঝি চোখ দুটি ডাগর! কাজল দিতে দিতে ওই চোখ যখন গভীর কালো হইয়া আসিবে দেখিয়া অবাক মানিবে মানুষ। কি আসিয়া যায় প্রথমবার মেয়ে হইলে, মেয়ে যদি এমন ফুটফুটে হয়, এমন অপরূপ চোখ যদি তার থাকে?

শ্যামার একটু ঈর্ষা হইয়াছিল বৈকি! বকুলের মেয়ের চোখ আশ্চর্য সুন্দর হোক শ্যামার তাতে আনন্দ, আহা তার মেয়েটির চোখ দুটি যদি অন্ধ না হইত!

বকুলের মেয়ে মানুষ করে শ্যামা, প্রসবের পর বকুলের শরীরটা ভাল যাইতেছে না, তা ছাড়া সন্তান পরিচর্যার সে কি জানে? নিজের মেয়ে, বকুল আর বকুলের মেয়ে, শ্যামা তিন জনেরই সেবা করে। বকুলের মেয়ে আর নিজের মেয়েকে হয়তো সে কোনোদিন কাছাকাছি শোয়াইয়া রাখে, বকুলের মেয়ে তাকায় বড় বড় চোখ মেলিয়া, শ্যামার মেয়ের অন্ধ আঁখি দুটিতে পলকও পড়ে না,—পলক পড়িবে কিসে, চোখের পাতা যে মেয়েটার জড়ানো। শ্যামার মনে পড়ে বাছুর

কথা—মন্দার সেই হাবা মেয়েটা, দিনরাত শুধু লালা ফেলিত। এমন সন্তান কেন হয় মানুষের,—অন্ধ, বোবা, অঙ্গহীন, বিকল? কেন এই অভিশাপ মানুষের? এক একবার শ্যামার মনে হয়, হয়তো বকুলের মেয়ে তার মেয়ের চোখ দুটি হরণ করিয়াছিল তাই ওর ডবল চোখের মতো অতবড় চোখ হইয়াছে। তারপর সবিষাদে শ্যামা মাথা নাড়ে। না, এসব অন্যায় কথা মনে আনা উচিত নয়। কিসে কি হইয়াছে কে তা জানে, সত্য মিথ্যা কিছু তো জানিবার উপায় নাই, আবোল তাবোল যা তা ভাবিলে বকুলের মেয়ের চোখ দুটি যদি কিছু হয়! প্রথম সন্তান বকুলের, বড় সে আঘাত পাইবে।

মেয়ের দুমাস বয়স করিয়া বকুল শ্বশুরবাড়ি গেল। যাওয়ার আগে কি কান্নাই যে বকুল কাঁদিল। বলিল, চেহারা তোমার বড্ড খারাপ হয়েছে মা, এবার তাকাও একটু শরীরের দিকে, এখনও এত খাটুনি তোমার সইবে কেন এ শরীরে? বিয়ে দিয়ে বৌ আনো এবার দাদার, সারা জীবন তো প্রাণ দিয়ে করলে সকলের জন্যে এবার যদি না একটু সুখ করে নেবে—

বলিল, আমার যেমন কপাল! সেবা নিয়েই চল্লাম, তোমার কাছে থেকে একটু যে যত্ন করব তা কপালে নেই?

কি গিন্নী-ই বকুল হইয়াছে। ছাঁচে ঢালা হইয়া আসিতেছে তাহার চালচলন, কথার ধরণ! যেন দ্বিতীয় শ্যামা।

শীতকাল। বকুল শ্বশুরবাড়ি গেল শীতকালে। শীতে সংসারের কাজ করিতে এবছর শ্যামার সত্যই যেন কষ্ট হইতে লাগিল। ছেলেকে আপিসের ভাত দিতে হয়, শীতের সকাল দেখিতে দেখিতে বেলা হইয়া যায়, খুব ভোরে উঠিতে হয় শ্যামার। আগুনের আঁচে রান্না করিয়া আসিয়া রাত্রে লেপের নীচে গা যেন শ্যামার গরম হইতে চায় না, যত সে জড়সড় হইয়া শোয় হাতে পায়ে কেমন একটা মোচড় দেওয়া ব্যথা জাগে, কেমন একটা কষ্ট হয় তাহার। ভোরে এই কষ্ট দেহে লইয়া সে লেপের বাহিরে আসে, আঁচল গায়ে জড়াইয়া হি-হি করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে নিচে যায়! ঠিকা ঝি আসিবে বেলায়, তার আগে কিছু কিছু কাজ শ্যামাকে আগাইয়া রাখিতে হয়। বিধান বাহিরের ঘরে শোয়! ঝি আসিয়া ডাকাডাকি করিলে তাহার ঘুম ভাঙিয়া যায়—শ্যামা তাই আগে সন্তর্পণে সদর দরজাটা খুলিয়া রাখিয়া আসে! ঘুম সে

ভাঙায় মণির। মণির পরীক্ষা আসিতেছে, নিচের যে ঘরে আগে শ্যামা সকলকে লইয়া থাকিত, সেই ঘরে মণি একা থাকে—পড়াশোনা করে, ঘুমায়। ভোর ভোর ছেলেকে ডাকিয়া তুলিতে বড় মমতা হয় শ্যামার কিন্তু আজও তো তার কাছে ভবিষ্যতের চেয়ে বড় কিছু নাই, জোর করিয়া মণিকে সে তুলিয়া দেয়। বলে, ওঠ বাবা ওঠ, না পড়লে পরীক্ষায় যে ভাল নম্বর পাবিনে?

মণি কাতর কণ্ঠে বলে, আর একটু ঘুমোই মা, কত রাত পর্যন্ত পড়েছি জানো?

জানে না! শ্যামা জানে না তার ছেলে কত রাত অবধি পড়িয়াছে! দোতলা একতলার ব্যবধান কি ফাঁকি দিতে পারে শ্যামাকে!—কতবার উঠিয়া আসিয়া সে উঁকি দিয়া গিয়াছে মণি তার কি জানে!

একটু চা বরঞ্চ তোকে করে দি চুপি চুপি, খেয়ে চাঙ্গা হয়ে পড়তে শুরু কর। পড়ে শুনে মানুষ হয়ে কত ঘুমোবি তখন—ঘুম কি পালিয়ে যাবে!

কনকনে হাড় কাঁপানো শীত, বকুলকে সঙ্গে করিয়া শীতল যেবার পালাইয়া গিয়াছিল সেবার ছাড়া শীত শ্যামাকে কোনোবার এমন কাবু করিতে পারে নাই। উনানে আঁচ দিয়া ডালের হাঁড়িটা মাজিতে বসিয়া হাত পা শ্যামার যেন অবশ হইয়া আসে। কি হইয়াছে দেহটার? এই ভাল থাকে এই আবার খারাপ হইয়া যায়? মাঝে মাঝে এক একদিন তো শীত লাগে না, ঝরঝরে হাল্কা মনে হয় শরীরটা, আবছা ভোরে ঘুমন্ত-পুরীতে মনের আনন্দে কাজে হাত দেয়? কোনোদিন মনে হয় বয়সটা আজও পঁচিশের কোঠায় আছে, কোনোদিন মনে হয় একশো বছরের সে বুড়ি! এমন অদ্ভুত অবস্থা হইল কেন তাহার?

রোদের সঙ্গে বিধান ওঠে। এখুনি সে ছেলে পড়াইতে বাহির হইয়া যাইবে কিন্তু তাহার হৈ-চৈ হাঁক ডাক নাই। নিঃশব্দে মুখ হাত ধুইয়া জামা গায়ে দেয়, নীরবে গিয়া রান্না ঘরে বসে, শ্যামা যদি বলে, ডালটা হয়ে এল, নামিয়ে রুটি সেঁকে দি?—সে বলে না দেরি হইয়া যাইবে, আগে রুটি চাই। দুটো একটা কথা সে বলে, বেশির ভাগ সময় চুপ করিয়া ভোরবেলাই শ্যামার শ্রান্ত মুখখানার দিকে চাহিয়া থাকে। সে বুঝিতে পারে শ্যামার শরীর ভাল নয়, ভোরে উঠিয়া সংসারের কাজ করিতে শ্যামার কষ্ট হয়, কিন্তু কিছুই সে

বলে না। মুখের কথায় যার প্রতিকার নাই সে বিষয়ে কথা বলিতে বিধানের ভাল লাগে না। ভোরে উঠিতে বারণ করিলে শ্যামা কি শুনিবে?

বিধান চলিয়া গেলে খানিক পরে শ্যামা দোতলায় যায়, এতক্ষণে ছাদে রোদ আসিয়াছে। জানালা খুলিয়া দিতে শীতলের গায়ে রোদ আসিয়া পড়ে। শীতল ক্ষীণকণ্ঠে বলে, কটা বাজল গা?

শ্যামা বলে, আটটা বাজে। শীতলকে শ্যামা ধরিয়া তোলে, জানলার কাছে বালিশ সাজাইয়া তাহাকে রোদে ঠেস দিয়া বসায়, লেপ দিয়া ঢাকিয়াও দেয় গলা পর্যন্ত। শরীরটা শীতলের ভাঙিয়া গিয়াছে। দুর্বল পা-টি তাহার ক্রমে ক্রমে একেবারে অবশ হইয়া গিয়াছে, আর সারিবে না। দেহের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিও দুর্বল হইয়া আসিতেছে, ক্রমে ক্রমে তারাও নাকি অবশ হইয়া যাইবে,—যাইবেই। কে জানে সে কতদিনে? শ্যামা ভাবিবারও চেষ্টা করে না। জীবনের অধিকাংশ পথ সেও তো অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, ভাবিবার বিষয়বস্তু খানিক খানিক বাছিয়া লইবার শক্তি তাহার জন্মিয়াছে—কত অভিজ্ঞতা শ্যামার, কত জ্ঞান! সধবা থাকিবার জন্য এ বয়সে আর নিরর্থক লড়াই করিতে নাই। এ তো নিয়মের মতো অপরিহার্য। আশা যদি থাকিত, শ্যামা কোমর বাঁধিয়া লাগিত শীতলের পিছনে, অবশ পা-টিকে সবল করিয়া তাহাকে খাড়া করিয়া দিত।

মিছামিছি হল্লা শ্যামা আর করিতে চায় না। ক্ষমতাও নাই শ্যামার—অর্থহীন উদ্বেগ, ব্যর্থ প্রয়াসে ব্যয় করিবার মতো জীবনীশক্তি আর কই? কতকাল পরে সে সুখের মুখ দেখিয়াছে। এবার সংসারের বাঁধা নিয়মে যতখানি আনন্দ ও শান্তি তাহার পাওয়ার কথা সে শুধু তাই খুঁজিবে, যেদিকে দুঃখ ও পীড়ন চোখ বুজিয়া সেদিকটাকে করিবে অস্বীকার।

ভাল কথা। শ্যামার এতটুকু প্রার্থনা অনুমোদন করিবে কে? স্বামীর আগামী মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করুক, ক্ষমা সে পাইবে সকলের। কিন্তু সন্তানের কথা এত সে ভাবিবে কেন? ঝড়ঝাপ্টা আসিলে ওদের আড়াল করিবার জন্য আজও সে থাকিবে কেন উদ্যত হইয়া? পঙ্গু স্বামীর কাছে বসিয়া খুকীর অন্ধ চোখ দুটি দেখিতে দেখিতে কেন সে হিংসা করিবে বকুলের মেয়ের পদ্মপলাশ আঁখি দুটিকে? একি অন্যায় শ্যামার! জননী হিসাবে শ্যামা

তো দেবীর চেয়েও বড়, এত সে মন্দ স্ত্রী কেন? শ্যামার এ পক্ষপাতিত্ব সমর্থনের যোগ্য নয়।

শীতলের অবস্থার জন্য শ্যামার মনে সর্বদা আকুল বেদনা না থাকাটা হয়তো দোষের, তবে সেবাযত্নে শীতলকে সে খুব আরামে রাখে, শীতলের কাছে থাকিবার সময় এত সে শান্ত এত তার সন্তোষ যে রোগযন্ত্রণার মধ্যে শীতল একটু শান্তি পায়। আদর্শ পত্নীর মতো স্বামীর অসুখে শ্যামা যে উতলা নয়, এইটুকু তার সুফল।

খুকীকে দুধ দিয়া শ্যামা নিচে যায়। পথ্য আনে শীতলের। ঘটিভরা জল দেয়, গামলা আগাইয়া ধরে, বিছানায় বসিয়া মুখ ধোয় শীতল। মুখ-মোছে শ্যামার আঁচলে। কাঁচা-পাকা দাড়ি-গোঁফে শীতলের মুখ ঢাকিয়া গিয়াছে, ঋষির মতো দেখায় তাহাকে। দীর্ঘ তপস্যা যেন সাঙ্গ হইয়াছে, এবার মহামৃত্যুর সমাধি আসিবে।

কখন? কেহ জানে না। শ্যামা কাজের ফাঁকে ফাঁকে শতবার উপরে আসে, ডাক্তার বলিয়াছে শেষ মুহূর্ত আসিবে হঠাৎ সে সময়টা কাছে থাকিবার ইচ্ছা শ্যামার।

মোহিনী মাঝে মাঝে আসে।

ওরা ভাল আছে বাবা? বকুল আর খুকী?

চিঠি পান নি মা?—মোহিনী জিজ্ঞাসা করে।

শ্যামা একগাল হাসিয়া বলে, হ্যাঁ বাবা, চিঠি তো পেয়েছি—পরশু পেয়েছি যে চিঠি। লিখিছে বটে ভালই আছে—এমনি দশা হয়েছে বাবা আমার, সব ভুলে যাই। কখন কোথায় কি রাখি আর খুঁজে পাইনে, খুঁজে খুঁজে মরি সারা বাড়িতে।

বিধানবাবুর বিয়ে দেবেন না মা?—মোহিনী এক সময় জিজ্ঞাসা করে। বকুল বুঝি চিঠি লিখিয়াছে তাগিদ দিতে। এই কথা বলিতেই হয়তো আসিয়াছে মোহিনী।

শ্যামা বলে—ছেলে যে বিয়ের কথা কানে তোলে না বাবা? বলে মাইনে বাড়ুক। ছেলের মত নেই, বিয়ে দেব কার?

এ বাড়িতে আসিয়া বিবাহের জন্য ছেলেকে শ্যামা যে পীড়াপীড়ি করিয়াছে তা নয়, ভয়ে সে চুপ করিয়া আছে, ধরিয়া লইয়াছে বিবাহ বিধান এখন করিবে না। এর মধ্যে শামুকে বিধান কি আর ভুলিতে পারিয়াছে? যে মায়াজাল ছেলের চারিদিকে কুহকী মেয়েটা বিস্তার করিয়াছিল কয়েক মাসে তাহা ছিন্ন হইবার নয়। শামুর অজস্র হাসি আজও শ্যামার কানে লাগিয়া আছে। এখন ছেলেকে বিবাহের কথা বলতে গিয়া কি হিতে বিপরীত হইবে? যে রহস্যময় প্রকৃতি তাহার পাগল ছেলের, কিছুদিন এখন চুপচাপ থাকাই ভাল।

মোহিনী—বলে, বিধানবাবুর অমত হবে না মা, আপনি মেয়ে দেখুন।

মোহিনীর বলার ভঙ্গিতে শ্যামা অবাক হইয়া যায়। এত জোর গলায় মোহিনী কি করিয়া ঘোষণা করিতেছে বিধানের অমত হইবে না? বিধানের মন সে জানিল কিসে?

তারপর মোহিনী কথাটা পরিষ্কার করিয়া দেয়। বলে যে ক'দিন আগে বিধান গিয়াছিল তাহার কাছে, বিবাহের ইচ্ছা জানাইয়া আসিয়াছে।

যেচে বিয়ে করতে চান শুনে প্রথমটা অবাক হয়ে গিয়েছিলাম মা, তারপর ভেবে দেখলাম কি জানেন,—আপনার শরীর ভাল নয়, কাজকর্ম করতে কষ্ট হয় আপনার! ভেবে চিন্তে তাই সম্মত হয়েছেন। ওসব কিছু বললেন না অবশ্যি, বলবার মানুষ তো নন্,—

শ্যামা জানে না! পড়া ছাড়িয়া বিধান একদিন হঠাৎ চাকরি গ্রহণ করিয়াছিল, আজ বিবাহে মত দিয়াছে। সেদিন অভাবে অনটনে শ্যামা পাগল হইতে বসিয়াছিল, আজ সংসারে কাজ করিতে তাহার কষ্ট হইতেছে। সেবার বিধান ত্যাগ করিয়াছিল বড় হওয়ার কামনা, এবার ত্যাগ করিয়াছে মত। শুধু মত হয়তো নয়। মত আর শামুর স্মৃতি হয়তো আজও একাকার হইয়া আছে ছেলের মনে।

তা হোক, ছেলেরা এমনি ভাবেই বিবাহের মত দিয়া থাকে, মায়ের জন্য। নহিলে স্বপন দেখিবার বয়সে কেহ কি সাধ করিয়া বিবাহের ফাঁদে পড়িতে চায়। তারপর সব ঠিক হইয়া যায়। বৌয়ের দিকে টান পড়িলে তখন আর মনেও থাকে না কিসের উপলক্ষে বৌ আসিয়াছে, কার জন্য। চোখের জলের মধ্যে শ্যামা হাসে। খুঁজিয়া পাতিয়া ছেলের জন্য বৌ সে আনিবে পরীর

মতো রূপসী, মা'র জন্য বিবাহ করিতে হইয়াছিল বলিয়া দু'দিন পরে আর আপসোস থাকিবে না ছেলের—মনে থাকিবে না শামুকে।

শ্যামার মনে আবার উৎসাহ ভরিয়া আসিল। জীবনে কাজ তো এখনো তার কম নয়! আনন্দ উৎসবের পথ তো খোলা কম নয়! এত সে শান্ত হইয়া গিয়াছিল কেন? কত বড় সংসার গড়িয়া উঠিবে তাহার। এখনি হইয়াছে কি! বিধানের বৌ আসিবে, মণির বৌ আসিবে, ফণীর বৌ আসিবে,—যে ঘরে ওদের সে প্রসব করিয়াছিল সেই ঘরে এক একটি শুভদিনে আসিতে থাকিবে নাতিনাতনির দল। দোতলায় সে আরও ঘর তুলিবে, পিছন দিকের উঠানে দালান তুলিয়া আরও বড় করিবে বাড়ি! অত বড় বাড়ি তাহায় ভরিয়া যাইবে নবীন নরনারীতে—ও-বাড়ির নকুড়বাবুর শাশুড়ির মতো মাথায় শনের নুড়ি ঝুলাইয়া কুঁজো হইয়া সে দাঁড়াইয়া থাকিবে জীবনের সেই বিচিত্র উজ্জল আবর্তের মাঝখানে!

সবই তো এখনো তাহার বাকি?

কেবল একটা দুঃখ তাহাকে আজীবন দহন করিবে। তার অন্ধ মেয়েটা। ওর জন্য অনেক চোখের জল ফেলিতে হইবে তাহাকে!

শ্যামা মেয়ে খুঁজিতে লাগিল। সুন্দরী, সদ্বংশজাতা, স্বাস্থ্যবতী, গৃহকর্মনিপুণা, কিছু কিছু গানবাজনা লেখাপড়া সেলাইয়ের কাজ জানা, চোদ্দ-পনর বয়সের একটি মেয়ে। খানিকটা শামুর মতো, খানিকটা শ্যামার ভাড়াটে সেই কনকের মত আর খানিকটা শ্যামার কল্পনার মতো হইলেই ভাল হয়। টাকা শ্যামা বেশি চায় না, অসম্ভব দাবী তার নাই।

কয়েকটি মেয়ে দেখা হইল, পছন্দ হইল না। তারপর পাড়ার একবাড়ির গৃহিণী, শ্যামার সঙ্গে তার মোটামুটি আলাপ ছিল, একটি খুব ভাল মেয়ের সন্ধান দিলেন। শহরের অপর প্রান্তে গিয়া মেয়েটিকে দেখিবামাত্র শ্যামা পছন্দ করিয়া ফেলিল। বড় সুন্দরী মেয়েটি, যেমন রঙ তেমনি নিখুঁত মুখ চোখ। আর কোমল আর ক্ষীণ আর ভীরু। শ্যামাকে যখন সে প্রণাম করিল মনে হইল দেহের ভার তুলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না, এমন নরম সে মেয়ে, এত তার কোমলতা।

মেয়ে পছন্দ করিয়া শ্যামা বাড়ি ফিরিল। সে বড় খুশী হইয়াছে! এমন

মেয়ে যে খুঁজিলেও মেলে না! কি রূপ, কি নম্রতা! ওর কাছে কোথায় লাগে শামু?

মোহিনীর সঙ্গে বিধানকে সে একদিন জোর করিয়া মেয়ে দেখিতে পাঠাইয়া দিল। ফিরিয়া আসিয়া মোহিনী বলিল, না মা, পছন্দ হল না মেয়ে।

শ্যামা যেন আকাশ হইতে পড়িল।

কার পছন্দ হল না, তোমার?

আমার পছন্দ হয়েছে। বিধানবাবুর পছন্দ নয়?

পছন্দ নয়? ওই মেয়ে পছন্দ নয় বিধানের? বাংলাদেশ খুঁজিলে আর অমন মেয়ে পাওয়া যাইবে? বিধান বলে কি?

কেন পছন্দ হল না খোকা?

বিধান বলিল, দূর, ওটা মানুষ নাকি? ফুঁ দিলে মটকে যাবে।

না, শামুকে ছেলে আজও ভোলে নাই। শামুর নিটোল গড়ন, শামুর চপল চঞ্চল চলা-ফেরা, শামুর নির্লজ্জ দুরন্তপনা আজও ছেলের দৃষ্টিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, আর কোনো মেয়েকে তার পছন্দ হইবে না। শ্যামার মুখে বিষাদ নামিয়া আসে। ফুঁ দিলে মটকাইয়া যাইবে? মেয়েমানুষ আবার ফুঁ দিলে মটকায় নাকি! শামুর মত সবল দেহ থাকে কটা মেয়ের? থাকা ভালও নয়। কাঠ কাঠ দেখায়, পাকা পাকা দেখায়, অসময়ে সর্বাঙ্গে যৌবন আসিলে কি বিসদৃশ দেখায় মেয়েমানুষকে বিধান তার কি জানে? ও যে ধ্যান করিতেছে শামুর, শামুর পুরন্ত সুঠাম দেহটা যে চোখের সামনে ভাসিয়া বেড়াইতেছে ওর।

লজ্জায় দুঃখে ছেলের মুখের দিকে শ্যামা চাহিতে পারে না। রূপ ও সুষমাই যথেষ্ট নয়, ছেলে তার যৌবন চায়। দেহ অপরিপুষ্ট হইলে ছবির মতো সুন্দরী মেয়েও ওর পছন্দ হইবে না। ছি, একি রুচি বিধানের!

ওরকম বৌ আসিলে শ্যামা তো তাকে ভালবাসিতে পারিবে না!

আবার মেয়ে খোঁজা হইতে লাগিল। মেয়ে খুঁজিতে খুঁজিতে কাবার হইয়া গেল মাঘ মাস।

ফাল্গুনের গোড়ায় শীত কমিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে শ্যামা সতেজ সুস্থ হইয়া উঠিল।

ফাল্গুনের শেষের দিকে বাগবাজারের উকিল হারাধনবাবুর মা-হারা মেয়েটার সঙ্গে বিধানের বিবাহ হইয়া গেল। মেয়ের নাম সুবর্ণলতা।

শ্যামা যা ভাবিয়াছিল তাই। মস্ত ধাড়ি মেয়ে, যৌবনের জোয়ার নয় একেবারে বান ডাকিয়াছে! রঙ মন্দ নয়, মুখ চোখ মন্দ নয়, কিন্তু শ্যামার চোখে ওসব পড়িল না, সে সভয়ে শুধু বৌয়ের সুস্থ ও সুন্দর শরীরটি দেখিয়া মনে মনে সকাতর হইয়া রহিল।

বাড়ন্ত বৌ এনেছ, না গো?—বলিল সকলে।

হ্যাঁ বাছা, জেনে শুনেই এনেছি, ছোট মেয়ে ছেলেরও পছন্দ নয়, আমারও নয়। একা আর পেরে উঠিনে মা সংসারের ঘানি টানতে, বড় সড় বৌটি এল শেখাতে হবে না কিছু, নিজেই সব পারবে।—বলিয়া শ্যামা কষ্টে একটু হাসিল।

তা, মন্দ কি হয়েছে বৌ? প্রিতিমের মতো মুখখানা, সকলে বলিল।

তাই নাকি? শ্যামা ভাল করিয়া সুবর্ণের মুখের দিকে চাহিল। তা হইবে!

বিবাহ উপলক্ষে বকুল আসিয়াছিল, রাখালের সঙ্গে মন্দাও আসিয়াছিল। বকুল আসিয়াছিল তিন দিনের জন্য, বিবাহের হৈ-চৈ থামিবার আগেই সে চলিয়া গেল। বৌকে ভাল লাগিয়াছে বকুলের। যাওয়ার সময় এই কথা সে শ্যামাকে বলিয়া গেল।

শ্যামা বলিল—তোর কি পছন্দ বুঝিনে বাপু, এত কি ভাল যে একেবারে গদগদ হয়ে গেলি?

বকুল বলিল, দেখো, ও বৌ যদি ভাল না হয় কান কেটে নিও আমার, মা-মরা মেয়ে একটু আদরযত্ন পাবে যার কাছে প্রাণ দেবে তার জন্যে। কি বলছিল জান? বলছিল তুমি নাকি ওর মার মতো।

তাই নাকি? তা হইবে!

বকুল চলিয়া গেল, বৌ চলিয়া গেল, বিবাহ বাড়ি নিঝুম হইয়া আসিল, রহিয়া গেল মন্দা। এই তো সেদিন শ্যামা মন্দার আশ্রয় ছাড়িয়া আসিয়াছে, দাসীর মতো খাটিয়াছে মন্দার সংসারে, অহোরাত্র মন জুগাইয়া চলিয়াছে, সে স্মৃতি ভুলবার নয়। একবিন্দু কৃতজ্ঞতা নাই শ্যামার, মন্দা রহিয়া গেল

বলিয়া সে এতটুকু কৃতার্থ হইয়া গেল না। কয়েক বছর আশ্রয় দিয়াছিল বলিয়া শ্যামার কাছে কি সমাদর মন্দা আশা করিয়াছিল সে-ই জানে, বোধ হয় ভাবিয়াছিল আজও শ্যামার উপর কর্তৃত্ব করিতে পারিবে। কিন্তু সে না পাইল মনের মতো সমাদর, না পাইল কোনোদিকে কর্তৃত্ব করিতে। শ্যামার সংসারে কি কর্তৃত্ব আর সে করিতে চাহিবে, ভাল করিয়া আবার শীতলের চিকিৎসা করানোর জন্যই তাহার উৎসাহ দেখা গেল সব চেয়ে বেশি। বলিল—রয়ে কি গেলাম সাধে? কি করে রেখেছ তোমরা দাদাকে। দাদাকে ভাল না করে আমি এখান থেকে নড়ছিনে বৌ!

কত সে দরদী বোন, কত তার ভাবনা। কে জানে, হইতেও পারে। আজ তো সপুত্র সকন্যা শ্যামার ভবিষ্যৎ অন্ধকার নয়, কিছুই তো ওদের জন্য আর তাহাকে করিতে হইবে না, শীতলের জন্য হয়তো তাই আন্তরিক ব্যাকুলতাই মন্দার জাগিয়াছে। শ্যামাকে সে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল।

শ্যামা বলিল, ওর আর চিকিচ্ছে নেই ঠাকুরঝি, ওর চিকিচ্ছে এখন সেবাযত্ন।

মন্দা স্তম্ভিত হইয়া বলিল—মুখ ফুটে এমন কথা তুমি বলতে পারলে বৌ! তুমি কি গো, এঁ্যা?

শ্যামা বলিল, কি বলতে হবে তুমিই না হয় তবে বলে দাও?

মন্দা রাগিয়া উঠিল, কাঁদিয়াও ফেলিল। কে জানে অকৃত্রিম বেদনায় মন্দা কাতর হইয়াছে কিনা। এ তো অর্থ সাহায্যের কথা নয় ভারবহনের কথা নয়, ভাইয়ের জীবন তাহার। চিকিৎসা নাই, ভাই তাহার বাঁচিবে না? মন্দার হয়তো ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। শীতলের অসংখ্য পাগলামি আর অজস্র স্নেহ,—বড় ভালবাসিত শীতল তাহাকে। সেই দিনগুলি কোথায় হারাইয়া গিয়াছে, কিন্তু এই বাড়িতেই সে সব ঘটিয়াছিল। এখানে বসিয়া অনায়াসে কল্পনা করা চলে সে সব ইতিহাস। হয়তো তাই মন্দার কান্না আসে।

বলে—দাদার জন্যে কিছুই করবে না তুমি? ডাক্তার কবরেজ দেখাবে না?

শ্যামা বলে—ডাক্তার কি দেখানো হয়নি ঠাকুরঝি? ডাক্তার না দেখিয়ে

চুপ করে বসে আছি আমি? ষোল টাকা ভিজিট দিয়ে ডাক্তার এনেছি, কলকাতার সেরা কবরেজকে দেখিয়েছি—জবাব দিয়েছে সবাই। আমি আর কি করব?

তবে আর কি, কর্তব্য করেছ এবার টান দিয়ে ফেলে দাও দাদাকে রাস্তায়! আজ বুঝতে পারছি বৌ দাদা কেন বিবাগী হয়ে গিয়েছিল।

এতকাল পরে মন্দা তবে শ্যামাকে চিনিতে পারিয়াছে?

শীতলের পায়ের কাছে বসিয়া মন্দা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। চমকাইয়া উঠিয়া বড় ভয় পায় শীতল। দাড়ির ফাঁকে একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করে,—আমার সেই কুকুরটা আছে মন্দা?

—দাদা গো!—বলিয়া মন্দা হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ওঠে।

শীতল থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে। মনে হয় আর কিছুদিন যদি বা সে বাঁচিত মন্দার বুকফাটা কান্নায় এখুনি মরিয়া যাইবে। বড় কষ্ট হয় শীতলের, বড় ভয় করে। বড় বড় কালো লোমশ পা ফেলিয়া নিজের মরণকে সে যেন আগাইয়া আসিতে দেখিতে পায়! বিহ্বল দৃষ্টিতে সে চাহিয়া থাকে মন্দার দিকে।

দরজার কাছে দাঁড়াইয়া শ্যামা বলে,—ঠাকুরঝি, শোন, বাইরে এসো একবার—

সকলেই বুঝিতে পারে মরণাপন্ন মানুষের কাছে এভাবে কাঁদিতে নাই এই কথা বলিতে চায় শ্যামা। মন্দা চোখ মুছিয়া উদ্ধত ভঙ্গিতে সোজা হইয়া বসে। বেশ করিয়াছে কাঁদিয়া। শীতলও বুঝি তাই মনে করে। মন্দার আকস্মিক কান্নায় আঁতকাইয়া উঠিয়া তাহার দম বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল, তবু শ্যামার বুদ্ধি বিবেচনার চেয়ে যে দরদের কান্না মারিয়া ফেলার উপক্রম করে তাই বুঝি ভাল শীতলের কাছে। কি উৎসুক চোখে সে মন্দার অশ্রুসিক্ত মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। ছেলেবেলা বকুল আর বনগাঁয় মন্দার সেই কুকুরটা ছাড়া এ জগতে সকলে ফাঁকি দিয়াছে শীতলকে।

দিন কুড়ি থাকিয়া মন্দা চলিয়া গেল। আসিল নববর্ষ আর গ্রীষ্ম। শীতের শেষে শ্যামার শরীরটা ভাল হইয়াছিল, গরমে আবার যেন সে দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। কাজ করিতে শ্রান্তি বোধ হয়। সন্ধ্যার সময় হাত-পা

চিবাইতে থাকে। কিন্তু কাহাকেও সে তাহা বুঝিতে দেয় না, চুপ করিয়া থাকে। কেন, দুর্ব্বল শরীরে খাটিয়া মরে কেন শ্যামা? তার সেবা করার জন্য ছেলে না তার বিবাহ করিয়াছে? বৌকে আনাইয়া লইলেই তো এবার সে অনায়াসে বসিয়া বসিয়া আয়স করিতে পারে। কিন্তু কেন যেন বৌকে আনিবার ইচ্ছা শ্যামার হয় না। না আনিলে অবশ্য চলিবে না, ছেলের বৌকে কি বাপের বাড়ি ফেলিয়া রাখা যায় চিরদিন? যাক্, দুদিন যাক্!

একদিন বিধান আপিস গিয়াছে, কোথা হইতে রঙীন খাম আসিল একখানা, আকাশের মত নীল রঙের। শ্যামা অবাক হইয়া গেল। এর মধ্যে চিঠি লিখিতে শুরু করিয়াছে বৌ? ওদের ভাব হইল কবে? ক'দিনেরই বা দেখা-শোনা! বিধান লুকাইয়া লুকাইয়া যায় না তো শ্বশুরবাড়ি? নিজের মনে শ্যামা হাসে। লুকাইয়া শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার ছেলেই বটে তার। কি লিখিয়াছে বৌ! চিঠিখানা সে বিধানের মশারির উপর রাখিয়া দিল।

বিধান আসিলে বলিল,—তোর একখানা চিঠি এসেছে খোকা রেখে দিয়েছি মশারির ওপর।

বিধান চিঠি পড়িয়া পকেটে রাখিয়া দিল।

—বাগবাজারের চিঠি বুঝি? ওরা ভাল আছে?—শ্যামা জিজ্ঞাসা করিল। বিধান বলিল, আছে।

ছেলের সংক্ষিপ্ত জবাবে শ্যামা যেন একটু রাগ করিয়াই সরিয়া গেল।

কয়েকদিন পরে একটা ছুটির দিনে শ্যামা একটু বিশেষ আয়োজন করিয়াছিল রান্নার। রাঁধিতে রাঁধিতে অনেক বেলা হইয়া গেল। রান্নাঘরের ভিতরটা অসহ্য গরম, শ্যামা যেই বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে অমনি মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গেল। সামান্য ব্যাপার, মূর্ছাও নয়, সন্ন্যাস-রোগও নয় মাথায় একটু জলটল দিতেই শ্যামা সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিল। বিধান কিন্তু তাহাকে সেদিন আর উঠিতে দিল না, শোয়াইয়া রাখিল। বিকালে বিধান বাহির হইয়া গেল। রাত্রি আটটার সময় ফিরিয়া আসিল সুবর্ণকে সঙ্গে করিয়া।

বিধানের নিষেধ অমান্য করিয়া শ্যামা তখন রাঁধিতে গিয়াছে। সুবর্ণ প্রণাম করিতে সে একেবারে উত্তেজিত হইয়া উঠিল!

—একি রে খোকা? বলা নেই কওয়া নেই বৌমাকে নিয়ে এলি যে তুই?

জিজ্ঞেস করা দরকার মনে করলি নে বুঝি একবার ?

এরকম অভ্যর্থনার জন্য বিধান প্রস্তুত ছিল না। সে চুপ করিয়া রহিল। সুবর্ণকে দেখিয়া শ্যামা খুশী হয় নাই? তার সেবা করার জন্য সে যে হঠাৎ বৌকে লইয়া আসিয়াছে এটা সে খেয়াল করিল না? বিধান দুঃখিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সুবর্ণের কি হইল বোঝা গেল না।

শ্যামা মণিকে বলিল, যা ত মণি, তোর বৌদিকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসা গে।...কি সব কাণ্ড বাবা এদের রাতদুপুরে হুট করে নতুন বৌকে এনে হাজির—কিসে কি ব্যবস্থা হবে এখন ?

বিধান ভয়ে ভয়ে বলিল—বাইরে তোমার বেয়াই বসে আছেন মা।

—আমি পারবো না বাবু রাত দুপুরে রাজ্যের লোকের আদর আপ্যেন করতে, মাথা বলে ছিঁড়ে যাচ্ছে,—কি বলে ওদের তুই নিয়ে এলি খোকা ? এক ফোঁটা বুদ্ধি কি তোর নেই ?

কি রাগ শ্যামার! ছেলেবেলায় যাকে সে ধমক দিতে ভয় পাইত সেই ছেলেকে কি তার শাসন! গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়াই সে রাঁধিতে রাঁধিতে আসিয়াছিল। সুবর্ণকে দেখিয়াই তার মাথা ধরিয়া গেল, বেশ গা-হাত চিবাইতে আরম্ভ করিল, শ্যামার অন্ত পাওয়া ভার। কি শোচনীয় ভাবে তার মনের জোর কমিয়া গিয়াছে! তারই সেবার্থে পরিণীতা পত্নীকে তারই সেবার জন্য অসময়ে বিধান টানিয়া লইয়া আসিয়াছে,—শুধু অনুমতি নেয় নাই, আগে ছেলের এই কাণ্ডে শ্যামা কত কৌতুক বোধ করিত, কত খুশী হইত, আজ শুধু বিরক্ত হওয়া নয়, বিরক্তিটুকু চাপা পর্যন্ত রাখিতে পারিতেছে না। এ আবার কি রোগ ধরিল শ্যামাকে? ছেলে একটি যৌবনোচ্ছলা মেয়েকে বাছিয়া বিবাহ করিয়াছে বলিয়া জননীর কি এমন অবুঝ হওয়া সাজে।

ছেলে তো এখনো পর হইয়া যায় নাই? মেনকা উর্বশী তিলোত্তমার মোহিনী মায়াতেও পর হইয়া যাওয়ার ছেলে তো সে নয়? শ্যামা কি তা জানে না? এমন অন্ধ জ্বালাবোধ কেন তার?

বোধ হয় হঠাৎ বলিয়া, ওরা খবর দিয়া আসিলে এতটা হইত না। ক্রমে ক্রমে শ্যামা শান্ত হইল। একবার পরনের কাপড়খানার দিকে চাহিল,—না, হলুদ-কালি-মাখা এ কাপড়ে কুটুমের সামনে যাওয়া যায় না।—যা ত' খোকা চট

করে ওপোর থেকে একটা সাফ করা কাপড় এনে দে তো আমায়। কাপড় বদলাইয়া শ্যামা বাহিরের ঘরে গেল। হারাধন বিধানের বিছানায় বসিয়াছিল, শীর্ণদেহ লম্বাকৃতি লোক, হাতের ছাতিটার মত জরাজীর্ণ, দেখিতে অনেকটা সেই পরাণ ডাক্তারের মত।

শ্যামাকে দেখিয়া হারাধন বুঝি একটু অবাক হইল। বলিল, আহা আপনি কেন উঠে এলেন? কেমন আছেন এখন?

শ্যামা বলিল, খোকা বুঝি বলেছে আমার খুব অসুখ?

হারাধন বলিল, তাই তো বললে, গিয়ে একদণ্ড বসলে না, তাড়াহুড়ো করে সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল,—কাপড় ক'খানা গুছিয়ে আনার সময়ও মেয়েটা পায় নি। মেয়ের মাসি কেঁদে মরছে, অমন করে কেউ মেয়ে পাঠাতে পারে বেয়ান?

বোঝা গেল, শ্যামাকে সুস্থ দেখিয়া হারাধন অসন্তুষ্ট হইয়াছে। হারাধনের অসন্তোষে শ্যামা কিন্তু খুশী হইল। মধুর কণ্ঠে বলিল, অমনি পাগল ছেলে আমার বেয়াই, আমার একটু কিছু হ'লে কি করবে দিশে পায় না। সকালে উনুনের ধার থেকে বাইরে এসে মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল, পড়ে গেলাম উঠানে, তাইতে ভড়কে গেছে ছেলে।—বড় তো কষ্ট হ'ল আপনাদের?

শ্যামা মিষ্টি আনাইল, খাইতে পীড়াপীড়ি করিল, হারাধন কিছু খাইল না। খাইতে নাই। বলিয়া গেল, নাতি হইলে যাচিয়া আসিয়া পাত পাড়িবে। হারাধনকে বিদায় করিয়া শ্যামা সুবর্ণের খোঁজে গেল।

কোথায় গেল সুবর্ণ? সে তো একতলায় নাই!

সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া শ্যামা উপরে গেল। শীতলের পায়ের কাছে মাথা নত করিয়া সুবর্ণ বসিয়া আছে, তার কোলে শ্যামার অন্ধ মেয়েটি। থাবা পাতিয়া বসিয়া ফণী হাঁ করিয়া বৌদিদির মুখখানা দেখিতেছে, আহ্লাদে গদগদ হইয়া মণি কথা কহিতে গিয়া ঢোঁক গিলিতেছে। ধীরে ধীরে শীতল কি যেন জিজ্ঞাসা করিতেছে সুবর্ণকে। সুবর্ণের মুখখানা ঈষৎ আরক্ত, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, চন্দনের স্বচ্ছ ফোঁটার মত।

ঘরের মেয়ে? তাই তো বটে! তার স্বামী-পুত্রের মাঝখানে ওকে তো অনভ্যস্ত, আকস্মিক আগন্তুক মনে হয় না। ঘরের মেয়ের মতই যে দেখাইতেছে

সুবর্ণকে ?

শ্যামা আগাইয়া গেল, বলিল, বৌমা, কিছু খাও নি বিকেলে, এসো তোমায় খেতে দি।

নতুন বৌয়ের আর ভাল মন্দ কি, সে তো শুধু এতকাল লজ্জা, ভয়, নম্রতা, তবুও ওর মধ্যেই মনটা বোঝা যায়, সরল না কুটিল, কুড়ে না কাজের লোক। মা-হারা মেয়ে? কথাটা শ্যামার মনে থাকে না,—তুমিই আমার হারাণো মা, বলিয়া শ্যামার স্নেহের ভাণ্ডারে ডাকাতি করিবার মেয়েও সুবর্ণ নয়, সে সরল কিন্তু বুদ্ধিমতী, কাজের মানুষ কিন্তু কুলরমণী নয়। দরকার মত একখানা দুখানা বাসন সে বাসন-মাজার মতই মাজিয়া আনে, কাজটুকু করিতে পাইয়া এমন উৎফুল্ল হইয়া ওঠে না যে মনে হইবে পুষ্প-চয়ন করিতে পাইয়াছে। শাশুড়ীর হাতের কাজ কাড়িয়া যে বৌ কাজ করে কোনো শাশুড়ীই তাকে দেখিতে পারে না, সুবর্ণ সে চেষ্টা করে না, স্বাভাবিক নিয়মে যে সব কাজ শ্যামার হাত হইতে খসিয়া তাহার হাতে আসে মন দিয়া সেইগুলিই সে করিয়া যায়, আর একটি সজাগ দৃষ্টি পাতিয়া রাখে শ্যামার মুখে, আলো নিভিয়া মেঘ ঘনাইয়া আসিবার উপক্রমেই চালাক মেয়েটা ত্রুটি সংশোধন করিয়া ফেলে।

নেহাত দোষ করিয়া ফেলিলে প্রয়োগ করে একেবারে চরম অস্ত্র। চোখ দুটা জলে টাবুটুবু ভর্তি করিয়া শ্যামার সামনে মেলিয়া ধরে। ভাল করিয়া শুরু করার আগেই শ্যামার মুখের কথাগুলি জমিয়া যায়।

শ্যামা হঠাৎ সুর বদলাইয়া সস্নেহে হাসিয়া বলে, আ আবাগীর বেটি, এই কথাতে চোখে জল এল! কি আর বলেছি মা তোকে এঁ্যা?

চোখ! অশ্রুসজল চোখকে শ্যামা বড় ডরায়। মানুষের চোখের সম্বন্ধে সে বড় সচেতন। চোখ ছিল তার বকুলের আর চোখ হইয়াছে বকুলের মেয়েটার! শ্যামার মেয়েটি অন্ধ, এত যে আলো জগতে একটি রেখাও তার খুকীর চেতনায় পৌঁছায় না। সজল চোখে চাহিয়া যে-কোন দৃষ্টিমতী শ্যামাকে সম্মোহন করিতে পারে।

বড় দোটানায় পড়িয়াছে শ্যামা।

ছেলের বৌটাকে ভালবাসিবে কি বাসিবে না।

এমনি মন্দ লাগে না, মায়া করিতে ইচ্ছা হয়, বকুল যে ফাঁকটা রাখিয়া গিয়াছে সুবর্ণকে দিয়া তাহা ভাবিয়া তুলিবার কল্পনা প্রিয়ই মনে হয় শ্যামার। কিন্তু হঠাৎ তাহার চমক ভাঙ্গে, উঃ একি হিল্লোল তুলিয়া সামনে দিয়া হাঁটিয়া গেল বৌ, একি আগুন ওর দেহময়? এমন করিয়া কে ওকে গড়িয়াছিল, রক্ত-মাংসের এই মোহিনীকে? সুবর্ণ স্নান করে, চাহিয়া দেখিয়া শ্যামার বুকের রক্ত যেন শুকাইয়া যায়। বড় ভয় করে শ্যামার। কে জানে ওর ওই ভয়ানক সুন্দর দেহের আকর্ষণে কোথা দিয়া অমঙ্গল ঢুকিবে সংসারে।

কড়া শীতে যেমন হইয়াছিল, চড়া গরম পড়িতে শ্যামার শরীর আবার তেমনি খারাপ হইয়া গেল। এবার একটা অতিরিক্ত উপসর্গ দেখা দিল— তিরিক্ষে মেজাজ। অল্পে অল্পে আরম্ভ করিয়া জ্যৈষ্ঠের শেষে বকুনি ছাড়া কথা বলাই যেন সে বন্ধ করিয়া দিল। থাকে থাকে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া ওঠে, যাকেই পায় তাকেই যত পারে বকে, তারপর অদৃষ্টের নিন্দা করিতে করিতে কাঁদিয়া ফেলে। শ্যামার ভয়ে বাড়িশুদ্ধ সকলের মুখ সর্বদা শুকনো দেখায়। সবচেয়ে মুস্কিল হয় সুবর্ণের। অন্য সকলে শ্যামার সম্মুখ হইতে পালাইয়া বাঁচে, তার তো পালানোর উপায় নাই। তার উপর বিধান আবার তাহাকে হুকুম দিয়া রাখিয়াছে, সব সময় কাছে কাছে থাকবে মার, যা বলেন শুনবে, আগুনের আঁচে বেশি যেতে দেবে না, ওপোর-নিচ করতে দেবে না, সেবাযত্ন করবে—মার শরীর ভাল নয় জান ত? বিধান বলিয়াই খালাস, সকালে উঠিয়া ছেলে পড়াইতে যায়, বাড়ি ফিরিয়াই ছোটে আপিসে, ফেরে সন্ধ্যার পর, সারাদিন শ্যামা কি কাণ্ড করে সে তো দেখিতে আসে না, সুবর্ণের অবস্থা সে কি বুঝিবে! কিছু বলিবার উপায়ও সুবর্ণের নাই। কি বলিবে? যদি বলিতে যায়, বিধান যে ভাবিয়া বসিবে,—দ্যাখো এর মধ্যে নালিশ করা শুরু হইয়াছে।

কিন্তু বিধান সব বোঝে। চিরকাল বুঝিয়া আসিয়াছে। সুবর্ণ এখনো-জানে না যে বুঝিয়াও বিধান কোনদিন কিছু বলে না, চুপচাপ নিজের কাজ করিয়া যায়, চুপচাপ উপায় ঠাওরায়। বনগাঁয় শ্যামা একবার পাগল হইতে বসিয়াছিল এবারও সেই রকম আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়া বিধান কম ভয় পায় নাই, প্রতিবিধানের কোন উপায় শুধু সে খুঁজিয়া পাইতেছে না। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যঘটিত,

শ্যামাকে লইয়া কোথাও চেঞ্জে যাইতে পারিলে ভাল হইত, কোন ঠাণ্ডা দেশে, দার্জিলিং অথবা সিমলা। সে অনেক টাকার কথা। অত টাকা কোথায় পাইবে সে ?

সংসার চালানোর ভাবনাতেই এই বয়সে সে বুড়ো হইয়া গেল। এ বাড়িতে সে ছাড়া আর সকলেই বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছে বাড়িটা পর্যন্ত তাদের নয়, মাসে মাসে ভাড়া গুণিতে হয় বিধানকে।

সত্যই কি শ্যামার আবার সেইরকম হইতেছে, বনগাঁয়ে যেমন হইয়াছিল, যেজন্য পড়া ছাড়িয়া চাকরি লইতে হইয়াছিল বিধানকে ? শ্যামার চোখের দিকে তাকাও, বাহিরে দুরন্ত রোদের যেমন তেজ তেমনি জ্বালা শ্যামার চোখে। এ বুঝি জীবনব্যাপী দুঃখের অভিশাপ। আজীবন শান্ত আবেষ্টনীর মধ্যে সুরক্ষিত আশ্রয়ের আড়ালে বাস করিতে না পারিলে এমনি বুঝি হইয়া যায় অসহায়া নারী, আজীবন দুঃখ দুর্দশার পীড়ন সহিয়া শেষে যখন সুখী হওয়ার সময় আসে তখন তুচ্ছ আবহাওয়ার উত্তাপেই গলিয়া যায়। আঁচল গায়ে জড়াইয়া শ্যামা কত শীত কাটাইয়া দিয়াছে, তিনটি উনানের আঁচে বসিয়া পার করিয়া দিয়াছে কত গ্রীষ্ম। এবার সে এত কাবু হইয়া গেল !

তারপর একদিন আকাশে ঘনঘটা আসিল। মাটি জুড়াইল, জুড়াইল মানুষ। বিকারের শেষের দিকে ধীরে ধীরে চুপ করিয়া মানুষ যে ভাবে ঘুমাইয়া পড়ে শ্যামাও তেমনি ভাবে ক্রমে ক্রমে শান্ত ও বিষণ্ণ হইয়া আসিল।

সকলে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

তবু সুবর্ণকে শ্যামা পুরাপুরি সুনজরে দেখিতে পারিল না। একটা বিদ্বেষের ভাব রহিয়াই গেল। বিধান কত আদরের ছেলে শ্যামার, সাত বছর বন্ধ্যা থাকিয়া, প্রথম সন্তানকে বিসর্জন দিয়া ওকে শ্যামা কোলে পাইয়াছিল—সুবর্ণ তার বৌ! তবুও সুবর্ণকে বুকের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিল না, কি দুর্ভাগ্য শ্যামার।

শীতল তেমনি অবস্থায় এখনো বাঁচিয়া আছে, ডাক্তারের ভবিষ্যদ্বাণী বুঝি ব্যর্থ হইয়া যায়। এতদিনে তার মরিয়া যাওয়ার কথা। মৃত্যু কিন্তু দু'টি একটি অঙ্গ গ্রাস করিয়া, সর্বাঙ্গের প্রায় সবটুকু শক্তি শুষিয়া তৃপ্ত হইয়া আছে, হঠাৎ কবে আবার ক্ষুধা জাগিবে এখনো কেহ তাহা বলিতে পারে না।

শ্যামা বলে,—হ্যাঁ গা, বড় কি কষ্ট হচ্ছে? কি করবে বল দেখি? বৌমা বসবে একটু কাছে? গায়ে হাত বুলিয়ে দেবে? কোন্‌খানে কষ্ট তোমার? ও মণি ডাক তো তোর বৌদিকে, ওষুদ মালিশ করে দিয়ে যাক।—কোথায় যে যায়, ফাঁক পেয়েই কি ছেলের সঙ্গে ফুসফাস গুজগাজ করতে চলল—কি মন্ত্র দিচ্ছে কানে কে জানে!

সুবর্ণ ওষুধ মালিশ করিতে বসে।

শ্যামা বলে, দেখ তো মণি ও-বাড়ির ছাদে কে? নকুড়-বাবুর বাঁশি বাজানো ভাইটে বুঝি? দেতো দরজাটা ভেজিয়ে, বৌমা, আরেকটু সামলে সুমলেই না হয় বসতে বাছা, একটু বেশি লজ্জা থাকলে ক্ষেতি নেই কারো।

সুবর্ণ জড়সড় হইয়া যায়, রাঙা মুখ নত করে। শ্যামা যখন এমনিভাবে বলে কোন উপায়ে মিশাইয়া যাওয়া যায় না শূন্যে?

ভাল লাগে না, বলিয়া শ্যামারও ভাল লাগে না! সুবর্ণের ম্লান মুখখানা দেখিয়া কত কি সে ভাবে! ভাবে, সে যদি আজ অমনি বৌ হইত এবং আর কেহ যদি অমনি করিয়া তাকে বলিত, কেমন লাগিত তার? বিধানের কানে গেলে কত ব্যথা পাইবে সে। মণি বড় হইতেছে, কথাগুলি তার মনে না-জানি কি ভাবে কাজ করে। একি স্বভাব, একি জিহ্বা হইয়াছে তার? কেন সে না বলিয়া থাকিতে পারেনা? শ্যামা বাহিরে যায়। বর্ষার মেঘলা দিন। ধানকলের অঙ্গনে আর ধান মেলিয়া দেয় না, অতবড় অঙ্গনটা জনহীন, কুলিরমণী নাই, পায়রার ঝাঁক নাই। খুকিকে শ্যামা বুকের কাছে আরও উঁচুতে তুলিয়া ধরে। বিধানের বৌকে কি কটু কথা শ্যামা বলিয়াছে, কি বিষাদ শ্যামার মনে—দিগ্‌দিগন্ত চোখের জলে ঝাপসা হইয়া গেল।

আশ্বিনের গোড়ায় হারাধন মেয়েকে লইয়া গেল।

যাওয়ার সময় সুবর্ণ অবিকল মা-হারা মেয়ের মতই ব্যবহার করিয়া গেল। শ্যামা ভালবাসে না, শ্যামা কটু কথা বলে, তবু মনে হইল সুবর্ণ যাইতে চায় না, এখানে থাকিতে পারিলেই খুশী হইত। শ্যামা নির্বিবাদে ভাবিয়া বসিল, এ টান বিধানের জন্য—সে যা ব্যবহার করিয়াছে তার জন্য সুবর্ণের কিসের মাথাব্যথা?

পূজার পরেই আমায় আনাবেন মা।—সুবর্ণ সজল চোখে বলিয়া গেল।

শ্যামা শুধু বলিল,—আনব।

বিধানের বৌ। সে বাপের বাড়ি যাইতেছে। বুকে জড়াইয়া একটু তো শ্যামা কাঁদিতে পারিত? কিন্তু কি করিবে শ্যামা, যাওয়ার জন্য সুবর্ণ তখন সাজগোজ করিয়াছে, বৌয়ের চোখ ঝলসানো মূর্তির দিকে শ্যামা চাহিতে পারিতেছিল না, মনে হইতেছিল, যাক্, ও চলিয়া যাক্, দু'দিন চোখ দু'টা একটু জুড়াক শ্যামার।

পূজার সময় মন্দা আসিয়া কয়েকদিন রহিল। শীতলকে দেখিতে আসিয়াছে। মন্দার জন্য সুবর্ণকেও দু'দিন আনিয়া রাখা হইল। সুবর্ণ ফিরিয়া গেলে, একদিন মন্দা বলিল, হ্যাঁ বৌ, একটা কথা বলি তোমায়, ভাল করে তাকিয়ে দেখেছ বৌমার দিকে? আমার যেন সন্দেহ হ'ল বৌ।

শ্যামা চমকাইয়া উঠিল। তারপর হাসিয়া বলিল,—না, ঠাকুরঝি, ও তোমার চোখের ভুল।

মন্দার চোখের ভুলকে শ্যামা কিন্তু ভুলিতে পারিল না, দিবারাত্রি মনে পড়িতে লাগিল সুবর্ণকে আর মন্দার ইঙ্গিত। কি বলিয়া গেল মন্দা? সত্য হইলে শ্যামা কি অন্ধ, তার চোখে পড়িত না? শ্যামা বড় অন্যমনস্ক হইয়া গেল। সংসারের কাজে বড় ভুল হইতে লাগিল শ্যামার। কি মন্ত্র মন্দা বলিয়া গিয়াছে, সুবর্ণকে দেখিবার জন্য শ্যামার মন ছটফট করে, সে ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারে না। একদিন মণিকে সঙ্গে করিয়া সে চলিয়া গেল বাগবাজারে। মন্দার মন্ত্র কি শ্যামার চোখে অঞ্জনও পরাইয়া দিয়াছিল? কই, সুবর্ণের দিকে চাহিয়া এবার তো শ্যামার চোখ পীড়িত হইয়া উঠিল না?

শ্যামা বলিয়া আসিল, সামনের রবিবার দিন ভাল আছে, ওইদিন বিধান আসিয়া সুবর্ণকে লইয়া যাইবে। না, তাকে বলা মিছে, বৌকে সে আর বাপের বাড়ি ফেলিয়া রাখিতে পারিবে না।

সুবর্ণের মাসি বলিল, এই তো সেদিন এল, এর মধ্যে এত তাড়া কেন? আরেকটা মাস থেকে যাক।

শ্যামা বলিল,—না, বাছা না, তুমি বোঝ না,—যার ছেলের বৌ সে ছাড়া কারো বুঝবার কথা নয়—ঘর আমার আঁধার হয়ে আছে।

একে একে দিন গেল। ঋতু পরিবর্তন হইল জগতে। শীত আসিল, শীতল পরলোকে গেল, শ্যামা ধরিল বিধবার বেশ, তারপর শীতও আর রহিল না। সুবর্ণকে শ্যামা যেন বুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া একটি দিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, কোথায় গেল ক্ষুদ্র বিদ্বেষ, তুচ্ছ শত্রুতা! সুবর্ণের জীবন লইয়া শ্যামা যেন বাঁচিয়া রহিল তারপর এক চৈত্র নিশায় এ বাড়ির যে ঘরে শ্যামা একদিন বিধানকে প্রসব করিয়াছিল সেই ঘরে সুবর্ণ অচৈতন্য হইয়া গেল, ঘরে রহিল কাঠকয়লা পুড়িবার গন্ধ, দেয়ালে রহিল শায়িত মানুষের ছায়া, জানালার অল্প একটু ফাঁক দিয়া আকাশের কয়েকটা তারা দেখা গেল আর শ্যামার কোলে স্পন্দিত হইতে লাগিল জীবন।

সমাপ্ত

সহরতলী

প্রথম পর্ব্ব

এক

এদিকের সহরতলীর এই অঞ্চলে বড় রাস্তায় বিদ্যুতের আলো আছে, —অনেকটা দূরে দূরে। ছোট গলিতে আলকাতরা মাখানো কাঠের থামের মাথায় আজও টিমটিমে তেলের বাতি জ্বলে। কোন বাড়ীতে ভাড়াটে কেরাণীবাবুর বৌ অপরিচ্ছন্ন কিন্তু বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত রান্নাঘরে উনানে ভাতের হাঁড়ি চাপাইয়া চামচ দিয়া কণ্ঠার নীচে ঘামাচি মারেন, রাত্রে খোকা কাঁদিয়া উঠিলে বেড্ সুইচ টিপিয়া বদলান তার কাঁথা; হয়ত ঠিক পিছনেই আরও বড় বাড়ীর রীতিমত বড়লোক মালিকের রান্নাঘরে ডিবরি বার বার বাতাসে নিভিয়া যায়, রাত্রে খোকা কাঁদিলে টর্চ্চ হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া খোকার মা প্রায় কাঁদিয়া ফেলেন নিজেও।

একটু বেশী রাত্রে আর রাত্রির শেষভাগে ট্রামের আওয়াজ কানে আসে, বন্ধ ঘরের বাহিরে ঝড়ের অন্তিম অবস্থায় হা-হুতাশ ভরা একটা অস্বস্তিকর একটানা আহ্বানের মত। মোটরের হর্ণ দূরেও বাজে কাছেও বাজে, সময় অসময় নাই,—কেবল সময় বিশেষে বাজে বেশী, সময় বিশেষে কম। পথের দু'পাশে স্বচ্ছলতা ও দারিদ্র্যের, স্বাচ্ছন্দ্য ও দুর্ভোগের, রুচি ও অরুচির, সুন্দর ও কুৎসিতের, পরিচ্ছন্নতা ও নোংরামির, সম্মুখ ও পিছনের, অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের (যথা—গৃহ-নির্ম্মাণোপকরণের সন্নিবেশ) কত যে আশ্চর্য্য সমন্বয় ও গলাগলি ভাব! নাম লেখা গেট, বাগান ও লন, আধুনিক ফ্যাসানের সুদৃশ্য দোতলা বাড়ী, বিচিত্র শাড়ী, সুন্দরী নারী, রেডিওর গান, ইঁট বাহির করা পুরাণো একতলা বাড়ী, সামনে সিমেন্ট-ফাটা রোয়াকে ছেঁড়া ন্যাকড়া, কাগজের টুকরা, আধপোড়া বিড়ি, কোমরে ঘুন্সী বাঁধা উলঙ্গ শিশু। পথের এদিকে ছবির মত সাজানো মনিহারী দোকান—সাবান, কেশ তৈল, পাউডার, স্নো, ক্রিমে ঠাসা; পথের অপর দিকে নিছক একটা কয়লার আড়ৎ, খুচরা ও পাই-কারী বিক্রয় হয়, মালিক শ্রীভূষণচন্দ্র নন্দী। তিনটি মহিষের গাড়ী কয়লা আনিয়া

আড়তে জমা করে, পুরীষ ও পাঁকের কোমল গভীর স্নেহে দেহের ভার নামাইয়া এই তিন জোড়া মহিষ অবসর সময়টা জাবর কাটে আড়তের ঠিক পিছনে—রাস্তা হইতে অনেকটা চোখে পড়ে, গন্ধও পাওয়া যায় কিছু কিছু। কাছেই ডাইমণ্ড র‍্যাষ্টুর‍্যান্ট; ফাষ্টকেলাশ চা রুটি মাখন চপ কাটলেট ডবল ডিমের মামলেট (মাত্র তিন পয়সা) ইত্যাদি পাইবেন বলিয়া মালিক রাধানাথ দে স্বহস্তে সাইনবোর্ড লিখিয়া রাখিয়াছে। একরকম গা ঘেঁষিয়াই টিনের চালার নীচে লোচন সাউ-এর মুড়িচিড়ার দোকান, কাচ বসানো টিনের পাত্রে বাতাসা, দড়িতে ঝুলানো তিলুড়ি, এক ছড়া চাঁপা কলা···। ছোট স্যাকরার দোকান, কামারের দোকান, টিনের মগ-বালতি তৈরী আর ঘটিবাটি ঝালাই করার দোকান, সাইকেল মেরামতের দোকান এসবও আছে।

আর কিছু দূরে আছে বড় বড় কারখানা।

হাপরের দড়ি টানিতে টানিতে তিনু রক্তবর্ণ লোহার পাতে হাতুড়ি পিটাইতে পিটাইতে বিশু আর অবাধ্য লোহার পাতকে মনোমত আকৃতি দিবার চেষ্টা করিতে করিতে বেন্দা যখন হাঁপাইয়া পড়ে, তখন বেন্দাই হয়ত চোখ তুলিয়া তাকায় সেইদিকে, যেদিকে আছে বড় বড় কারখানাগুলি। প্রকাণ্ড একটা লাল দালানের লাগাও বিরাট একটি টিনের শেড আর তিনটি মোটা মোটা চোঙা পরিষ্কার দেখা যায়, অন্যগুলি একটু আড়ালে পড়িয়াছে। একি কাণ্ড, এঁ্যা? কত বিঘা জমি জুড়িয়া না জানি কারখানাগুলি গড়া হইয়াছে? নিবিড় কালো কি ধোঁয়াটাই উঠিয়া যাইতেছে চোঙাগুলি দিয়া আকাশের দিকে। বেন্দা জানে, বিদ্যুতে যেমন কাচের ভিতরে অবিরাম শিখাহীন আলো জ্বলে, তেমনি অবিরাম কলও চলিতে পারে, সব কল ধোঁয়া ছাড়ে না। কিন্তু উর্দ্ধমুখী চোঙা দিয়া যে ধোঁয়া বাহির হয়, বেন্দার কাছে তাই কেবল কলকারখানার প্রতীক।

যশোদা যখন একসঙ্গে তিনটি বড় বড় কয়লার উনুনে আঁচ দেয় তখনও বড় কম ধোঁয়া হয় না। শীতকালে ধোঁয়াটা যেন যশোদার বাড়ী ছাড়িয়া নড়িতে চায় না, যশোদার বাড়ীর ছোট উঠানে, ইঁট আর টিনের ছোট-বড় কাঁচা পাকা ঘরগুলির মধ্যে স্থায়ীভাবে আটকাইয়া থাকিতে চেষ্টা করে। কিন্তু এখন, বৈশাখের প্রথমে, অনেক দূরের সমুদ্র হইতে ফুরফুরে বাতাস আসিয়া সকাল

সন্ধ্যায় খনি-গন্ধী ধোঁয়া উড়াইয়া লইয়া যায়।

এ বাড়ীতে অল্প যায়গায় যশোদা অনেকগুলি ঘর তুলিয়াছে, অনেকগুলি মানুষকে থাকিবার যায়গা দিতে হয়। আগে কেবল পাঁচটি ইঁটের ঘর ছিল, তখন উঠানটিও ছিল মস্ত বড়। পশ্চিম কোণে কল আর চৌবাচ্চার কাছে খানিকটা স্থান ছিল বাঁধান, বাকীটা কাঁচা। তার পর দু'টি টিনের ঘর তুলিবার ফলে উঠান তার এক রকম অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, আছে কেবল ওই বাঁধান স্থানটুকু। কয়েক বছর কাটিয়া গিয়াছে কিন্তু এখনও উঠানের সঙ্কীর্ণতা যশোদার অভ্যাস হইয়া যায় নাই, মাঝে মাঝে পীড়ন করে। দু'হাতে জলভরা প্রকাণ্ড দু'টি বালতি ঝুলাইয়া উঠানে দাঁড়াইয়া আকাশের দিকে মুখ করিয়া সশব্দে তাকে নিশ্বাস ফেলিতে দেখা গিয়াছে, ফাঁপর ফাঁপর লাগিলে মানুষ যেমন করে। বোঝা গিয়াছে, ফাঁপর ফাঁপর লাগাটা যশোদার মানসিক, বালতি দু'টি ভারি বলিয়া নয়। এ-রকম দু-চারটি জলভরা বালতির ভারে কাবু হওয়ার মত শরীর যে যশোদার নয়, দেখিলেই সেটা বোঝা যায়। সাধারণ বাঙালী ঘরের গোটা কয়েক পরম স্বাস্থ্যবতী যুবতীকে অনায়াসে গড়া চলিত এতখানি মাল-মসলা দিয়া ভগবান তাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

নিজের বা নিজের ভাই-এর জন্য আজ এবেলা যশোদার উনানে আঁচ দিবার দরকার ছিল না, পাড়ায় বৌভাতের নিমন্ত্রণ আছে। কিন্তু আরও যে বিশ বাইশজন লোক বাড়ীতে আছে তাদের জন্য যশোদাকে রাঁধিতে হইল। এরা সকলেই ভাড়াটে এবং পোষ্য। কারণ অনেকে নিয়ম মত ভাড়াও দেয় না, ভরণপোষণের খরচও দেয় না—দিতে পারে না। এতগুলি লোককে উপবাসী রাখিয়া ভাইকে নিয়া কি নিমন্ত্রণ খাইতে যাওয়া চলে ?

সকাল সকাল যশোদা রান্না শেষ করিয়া ফেলিল। বড় গরম পড়িয়াছে আজ। রাঁধিবার সময় ঘামে যশোদার ভালমতেই স্নান হইয়া গিয়াছিল, রান্না শেষ করিয়াই তবু একবার স্নান করিয়া নিল। শরীরের ঘাম না শুকাইয়া স্নান করিলে অসুখ হয়, এসব যশোদা মানে না, অত তুচ্ছ কারণে অসুখ হইবে এমন শরীর যশোদার নয়। তাছাড়া, ঘাম ধুইয়া ফেলার জন্যই স্নান করা, ঘাম শরীরে বসিয়া গেলে আর স্নান করিয়া লাভ কি ?

তখন সন্ধ্যা পার হইয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি রান্না শেষ করার ব্যস্ততায়

সময়মত সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়া শাঁখে ফুঁ দেওয়া হয় নাই বলিয়া যশোদার মনটা খুঁত খুঁত করিতে থাকে। শাঁখ বাজাইয়া সামনে ভাইকে দেখিয়া বলে, 'হ্যারে নন্দ, কোথায় থাকিস সারাদিন? বাবুটি সেজে ঘুরে বেড়ালেই তোর দিন কাট্‌বে?'

নন্দকে দেখিলে যশোদার ভাই বলিয়াই মনে হয় না। বাইশ তেইশ বছর বয়স, অপরিপুষ্ট শরীর, মুখে মেয়েদের মত তেলতেলা ধরণের কোমলতা। পাশে না বাড়ুক উপরের দিকেও যদি ভালরকম বাড়িয়া উঠিত তবু আশা করা চলিত, এককালে মোটা সোটা হইয়া যশোদার ভাই হিসাবে মোটামুটি মানানসই হইলেও হইতে পারে ছেলেটা। কিন্তু এ রকম একটা আশা পোষণ করার সুযোগও সে রাখে নাই। মতি নামে একজন ভাড়াটে আছে যশোদার, বয়স পঞ্চাশের কাছে গিয়াছে কিন্তু মানুষের সঙ্গে ভাব করিয়া তাদের সঙ্গে সে পেশাদার রসও পান করে রসিকতাও করে। একদিন নূতন বন্ধু সুধীরের কাণে কাণে সে বলিয়াছিল, ওই যে ওরা দু'জন যশুদা আর নন্দ, এ মায়ের পেটের ভাই বোন না হয় হল, কিন্তু বাপ কি ওদের একটা রে দাদা!'

সেইদিন যশোদা ও নন্দের তফাৎটা ভালভাবে খেয়াল করিয়া সুধীরের মনে সত্যই খটকা লাগিয়াছিল যে, কথাটা কি তবে সত্যি নাকি, কে জানে।

নন্দ এক গাল হাসিয়া বলিল, 'বৌ দেখতে গিয়েছিলাম দিদি। সুন্দর বৌ হয়েছে—এইটুকু বাচ্চা!'

'সত্যি?'

যশোদা ভাবিতেছিল, যারা বাড়ী ফিরিয়াছে তাদের ভাত দিয়া বৌ দেখিতে যাইবে কিনা, নন্দর মুখে নতুন বৌ-এর রূপ বর্ণনা শোনার পর আর ধৈর্য্য ধরা গেল না।—তোর ধনাদাকে ডাক তো নন্দ।'

ধনঞ্জয় আসিলে যশোদার ঘরখানা যেন ভরাট হইয়া গেল। নন্দের বদলে যশোদার ভাই হইলে তাকেই মানাইত ভাল। মাস দুই আগে ধনঞ্জয় দেশ হইতে চাকরীর খোঁজে আসিয়া যশোদার বাড়ীতে ডেরা বাঁধিয়াছে। প্রথম দিন সাবান-কাচা লালচে ধুতির উপর গেঁয়ো ধোপার সাফ করা অতিরিক্ত নীল লাগানো সার্ট গায়ে দিয়া, বগলে ময়লা সতরঞ্চি মোড়া বিছানা আর রঙচটা টিনের বাক্স হাতে করিয়া সে যখন বাড়ীতে ঢুকিয়াছিল, মনে হইয়াছিল একটা দৈত্য আসিয়াছে। বুড়ো মতি তাকে এখানে আনিয়াছে, মতির সে দেশের লোক।

সেই দিন সুধীরের কাণে কাণে মতি বলিয়াছিল 'যশোদা একলাটি থাকে, ওর দুঃখু আর সয় না মাইরি, তাই ধনাকে নিয়ে এলাম। দু'টিতে মানাবে ভাল, আঁ?' রসিকতা করিয়া মতি নিজে প্রাণপণে হাসে, সেদিনও হাসিয়াছিল। কিন্তু এমন একটা লাগসই রসিকতাও সুধীরের ভাল লাগে নাই দেখিয়া হাসিটা তার থামিয়া গিয়াছিল হঠাৎ।

যশোদা দু'টি কাজের খোঁজ দিয়াছে, কিন্তু একটিও ধনঞ্জয়ের পছন্দ হয় নাই। লোকটার উপর যশোদা সেই জন্য বিশেষ খুসী ছিল না। গরীবের এত বাছবিচার থাকিলে চলিবে কেন, পেটের ভাত যখন তাকে যোগাড় করিতেই হইবে?

ধনঞ্জয় আসিলে যশোদা বলিল, 'একটা উপকার করবে আমার? রেঁধে বেড়ে রেখে দিইছি, সুধীরকে ডেকে দু'জনায় মিলে সবাইকে পরিবেশনটা করবে? এঁটো বাসন তুলব'খন আমি এসে। তিনটে থালা কম পড়বে—তিনজনকে পাতায় দিও, কেমন?'

ধনঞ্জয় রাগে আগুন হইয়া বলিল, 'সবাইকে ভাত বেড়ে দিতে বলছ আমায়? আস্পদ্ধা তো কম নয় তোমার! মাইনে করা বামুন নাকি তোমার আমি?'

শুনিয়া যশোদাও রাগিয়া গেল।—'ও বাবা, একটা কাজ করতে বললে এ যে দেখি ফোঁস করে ওঠে! এ কোন দেশী নবাব বাদ্‌শা রে বাবা! যাও বাবু তুমি, যাও, বসে বসে বিড়ি টানোগে।'

ধনঞ্জয় গট গট করিয়া চলিয়া গেল। নন্দ বলিল, 'ও বাড়ী থেকে চাঁপার মা নয় কুমুদ মাসিকে ডেকে আনব দিদি?

যশোদা বলিল কেন? ও বাড়ীর মানুষকে আবার টানাটানি কি জন্যে? এতগুলো মদ্দ পুরুষ রয়েছে এ বাড়ীতে, একটা বেলা কেউ ভাত বেড়ে দিতে পারবে না ক'টা মানুষকে? গলায় দড়ি অমন অকম্মার ধাড়িদের! দূর করে তাড়িয়ে দেব সবক'টাকে বাড়ী থেকে। মতি আর সুধীরকে ডাক দিকি।'

মতি আর সুধীরকে বলা মাত্র তারা রাজী হইয়া গেল। সুধীর একটু বেঁটে, ঘাড়ে গর্দ্দানে জড়ানো শক্ত মজবুত শরীর, গুণ্ডার মত দেখিতে। পরিবেশনের ভার পাইয়া অতি মাত্রায় খুসী হইয়া সে বলিল, 'একটু সেজেগুজে বৌ-ভাতে যেও কিন্তু চাঁদের মা।'

যশোদা বলিল, 'তামাসা রাখো তো বাবু তুমি। কচি খুকী নাকি যে সাজব

গুজব ?'

কচি খুকী না হোক, সাজগোজের সমস্যাটা একটু বিপদে ফেলিয়া দিল বৈকি যশোদাকে। সাজগোজের ধার সত্যই যশোদা ধারে না, সে বয়সও নাই সখও নাই, বয়স থাকার সময়েও সখ ছিল কিনা সন্দেহ। তবু নিমন্ত্রণ বাড়ীতে একখানা ভাল কাপড় তো অন্ততঃ পরিয়া যাইতে হইবে? ভাল কাপড় কি ছাই আছে যশোদার! বাক্স খুলিয়া অনেক দিনের পুরাণো খান তিনেক রঙীন শাড়ী নাড়াচাড়া করিতে করিতে যশোদা যেন ফাঁপরে পড়িয়া গেল। কোন বিষয়ে মন স্থির করিতে যশোদার সময় লাগে না, দ্বিধা করিতে হয় না, কোন্ শাড়ীখানা পরিবে ঠিক করিতে গিয়া তার যেন আজ মাথা ঘুরিয়া গেল। সস্তা দামের শাড়ী, চাকচিক্য নাই, তবু তো রঙীন! রঙীন কাপড় পরা কি তার ঠিক হইবে? কি রকম অদ্ভুত, খাপছাড়া না জানি দেখাইবে তাকে! এমনিই তো যে চেহারা তার।

'কোন্‌টা পরি বলত নন্দ?'

'আমি কি জানি?'

বাক্সের তলায় একখানা ফিকে রঙের শাড়ী পাওয়া গেল। যশোদা যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। একদিকের আঁচলের কাছে একটু ছেঁড়া আছে। তা হোক।

সত্যপ্রিয় মিলস্ এবং আরও কতকগুলি ব্যবসার মালিক সত্যপ্রিয় এদিকে সহরতলীর এক পাশে প্রকাণ্ড বাগান-বাড়ীতে বাস করে। সত্যপ্রিয়ের প্রচার বিভাগের পরিচালক জ্যোতির্ময়ও এ পাড়াতে বাস করে, যশোদার বাড়ীর কাছেই। সম্প্রতি জ্যোতির্ময় অপরাজিতা নামে একটি মেয়েকে হঠাৎ বিবাহ করিয়া বসিয়াছে। এই নতুন বৌটির-ই আজ বৌ-ভাত।

আপিসের অনেককে বলিতে হইয়াছে, বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনকে বলিতে হইয়াছে। জ্যোতির্ময়ের বাড়ীতে লোক গিজ গিজ করিতেছিল। আয়োজন ভালই হইয়াছে, চাকুরে জামাইকে টাকা মেয়ের বাপ ভাল রকমেই দিয়াছেন, সুতরাং আয়োজন খারাপ হওয়ার কথা নয়। বৌ দেখিয়া যশোদা খুসী হইতে পারিল না। বৌ বাচ্চাই বটে, পনেরর বেশী বয়স হইবে না। বয়সের চেয়ে ঢের বেশী কচি দেখায়, কারণ শরীরের পুষ্টি হয় নাই। জ্যোতির্ময়ের বয়স ডবলেরও বেশী, এতটুকু মেয়ে কি তার সঙ্গে মানায়?

নিজের ইচ্ছায় নয়, বাড়ীর লোকের অনুরোধে নয়, জ্যোতির্ময় নাকি

সত্যপ্রিয়কে খুসী করিতে বিবাহ করিয়াছে। সত্যপ্রিয়র একটা মত আছে, বিবাহ না করিলে দায়িত্বজ্ঞান জন্মায় না। দায়িত্বজ্ঞান জন্মায় নাই যার চাকুরীর উন্নতি দূরে থাক চাকুরীটা বজায় রাখাই কি তার পক্ষে কঠিন নয়? সুতরাং—

একদিন যশোদাকে জ্যোতির্ম্ময় নিজেই এই ধরণের কথা বলিয়াছিল, মেয়ে খোঁজার সময়।

বিয়ের জন্য কর্ত্তা বড় খোঁচাচ্ছেন চাঁদের মা। কেবলি বলছেন, এবার একটা বিবাহাদি করে ফেলুন জ্যোতির্ম্ময়বাবু, বিবাহাদি না করলে কি দায়িত্ব-জ্ঞান জন্মায়, দায়িত্বজ্ঞান না জন্মালে কি—'

যশোদা হাসিয়া বলিয়াছিল, 'তা বিয়ে করুন না, ভাল কথাই তো বলছেন উনি, খোঁটা ছাড়া কি পুরুষ মানুষের চলে?'

'তুমিও ওই দলের চাঁদের মা? কর্ত্তার মতামত জান না কিনা, তাই বলছ। ওর মতে বিয়ে করতে হলে কি করতে হবে জান, একটি সাত বছরের খুকীকে বিয়ে করতে হবে।'

শেষ পর্য্যন্ত তাই করিয়াছে নাকি জ্যোতির্ম্ময়? সত্যপ্রিয়কে খুসী করার জন্য একটি খুকীকে বৌ করিয়া আনিয়াছে? যশোদার বড় আপশোষ হয়। একটি বড় সড় মেয়ে হইলে কেমন মানাইত জ্যোতির্ম্ময়ের সঙ্গে! মনিবকে খুসী করিতে কেউ যে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ করিতে পারে, তাও এমন বেমানান একটি মেয়েকে, যশোদা কল্পনাও করিতে পারে না। তবে হয়তো সত্যপ্রিয় নিছক মনিব নয় জ্যোতির্ম্ময়ের। সে ন্যাকি জ্যোতির্ম্ময়কে খুব স্নেহ করে। সত্যপ্রিয়ের মত ধনীর স্নেহের মূল্য জ্যোতির্ম্ময়ের মত মানুষেরা হয়ত এইভাবেই দেয়। এই সব লেখাপড়া শেখা ভদ্রলোকদের রকমই আলাদা।

জ্যোতির্ম্ময়ের বোন সুবর্ণ জিজ্ঞাসা করে, 'কেমন বৌ হয়েছে যশোদাদিদি?'

'তা মন্দ কি!'

সুবর্ণের বিবাহ হয় নাই, কিন্তু এমন সাজাটাই সে সাজিয়াছে যেন বিয়ের কনেটি, আজিকার উৎসবটি যেন তারই বিবাহের ভূমিকা—সাজগোজেই যেখানে যত বর আছে সকলকে আজ সে আয়ত্ত করিয়া রাখিবে। আনন্দে ও উত্তেজনায় মেয়েটা ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল, যশোদার জবাবে

একটু দমিয়া গেল।

'বৌ বুঝি তোমার পছন্দ হয়নি যশোদাদিদি?'

এত বড় মেয়ের নেকামিতে যশোদার গা জ্বলিয়া যায়। সে বলিল, 'আমার পছন্দ অপছন্দ কি বোন, আমি তো বিয়ে করিনি? তোমার দাদার পছন্দ হলেই হল।'

দিদির পিছনে পিছনে আরও একবার বৌ দেখিতে আসিয়া নন্দ হাঁ করিয়া স্নবর্ণকে দেখিতেছিল, এবার সে যশোদার কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিল, 'কেন, বৌ তো সুন্দর, আমার খুব পছন্দ হয়েছে।'

যশোদা মুখ ঘুরাইয়া বলিল, 'ফোঁড়ন না কেটে তুই যা তো এখান থেকে নন্দ, এত বয়স হল তোর কথা বলতে শিখলি না এখনো?'

অন্যায় কথাটা কি বলিয়াছে বুঝিতে না পারিয়া নন্দ মুখ ভার করিয়া সরিয়া গেল।

বৌকে দেওয়ার জন্য যশোদা একখানা সস্তা রঙীন শাড়ী আনিয়াছিল, শাড়ীখানা বৌ-এর হাতে দিতে একটা অদ্ভুত মুখভঙ্গী করিয়া স্নবর্ণও সরিয়া গেল। কেবল স্নবর্ণ নয়, আরও অনেকের মনে হইতে লাগিল, বৌ-এর জন্য উপহার আনিয়া এবং এমন সস্তা একখানা শাড়ী বৌ-এর একেবারে হাতে দিয়া, যশোদা সকলকে অপমান করিয়াছে।

একে দু'য়ে আসিয়া সকলে বৌ গ্যাখে। কেউ একখানা বই দেয়, কেউ সিঁদুরের কৌটা, কেউ কিছুই দেয় না। জ্যোতির্ম্ময়ের দিদি আর বৌদিদি মেয়েদের অভ্যর্থনা করেন, পুরুষদের অভ্যর্থনা করেন জ্যোতির্ম্ময়ের কাকা এবং দাদা। জ্যোতির্ম্ময় নিজে একটি মটকার পাঞ্জাবী পরিয়া এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়ায়, সহকর্ম্মী আর বন্ধুদের সঙ্গে একটু হাসি-তামাসা করে, কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে সদরে গিয়া দাঁড়ায়, রাস্তায় চোখ পাতিয়া রাখে। বড় অন্যমনস্ক মনে হয় জ্যোতির্ম্ময়কে, বড় চঞ্চল মনে হয়।

একজন বন্ধু জিজ্ঞাসা করে, 'সত্যপ্রিয় আসবে নাকি হে?'

জ্যোতির্ম্ময় চমকাইয়া বলে, 'আঁ? কে, কর্ত্তা? হ্যাঁ, আসবেন।'

ঠিক অবহেলা নয়, স্পষ্ট বোঝা যায় সত্যপ্রিয়ের আগমনের আশায় অথবা আশঙ্কায় জ্যোতির্ম্ময় কারও দিকে ভাল করিয়া চাহিয়াও দেখিতে পারিতেছে

না। আপিসের লোকেরা ব্যাপারটা বুঝিতে পারে, অন্য সকলে বুঝিতে না পারিলেও খানিক খানিক অনুমান করিতে পারে।

তারপর সত্যই সত্যপ্রিয় আসিল।

সত্যপ্রিয় এত বড় ধনী, যত না ধন তার আছে মানুষের কল্পনায় তার পরিমাণটা এত বেশী বাড়িয়া গিয়াছে যে, সাধারণ লোকের বাড়ী সামাজিক নিমন্ত্রণ রাখিতে গেলে, সকলে অতিমাত্রায় ব্যস্ত ও বিব্রত হইয়া পড়ে। এইজন্য এইসব বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার একটি সুন্দর পদ্ধতি তার নিজেকেই ঠিক করিয়া লইতে হইয়াছে, সকলের আদর, অভ্যর্থনা ও ভদ্রতা করিবার ব্যাকুলতাকে লোকটা এমন কৌশলে নিজেই খানিক খানিক পরিচালনা করে বলিবার নয়। যেখানে প্রতিনিধি পাঠাইয়া কাজ সারা যায়, সেখানে অবশ্য সত্যপ্রিয় কখনও যায় না, সকলকে সামলাইয়া চলিবার হাঙ্গামাও পোহাইতে হয় না।

মস্ত মোটর আসিয়া থামে, সত্যপ্রিয় নামিয়া আসে—খালি হাতে। জ্যোতির্ময়ের বৌ-এর মুখ দেখিবার জন্য উপহার একটা সে আনিয়াছে, কিন্তু এত বড়লোক সত্যপ্রিয়, সে কি উপহার হাতে করিয়া নামিতে পারে? উপহার হাতে থাকে ভূষণের, সে সত্যপ্রিয়ের আত্মীয়, বন্ধু, চর বা অনুচর একটা কিছু হইবে। মখমলে মোড়া দামী সুদৃশ্য একটি বাক্স, দেখিলেই বোঝা যায় ভিতরে দামী কিছু আছে।

সত্যপ্রিয় নামিবামাত্র কয়েকটি চাপা গলায় উচ্চারিত হয়, 'ঐ যে উনি,' 'ঐ যে উনি'—'কর্ত্তা এসে গেছেন।' জ্যোতির্ম্ময়ের কাকা আর জ্যোতির্ম্ময় অভ্যর্থনা করিবার জন্য আগাইয়া যায়। আর হাসিমুখে অগ্রসর হইয়া, নিজের আগমনটা সহজ করিয়া দিবার জন্য, নিজে তিনি যে কতদূর নিরহঙ্কারী সরল সহজ মানুষ এটা প্রমাণ করার জন্য, সত্যপ্রিয় বলে, 'না, না, আপনারা ব্যস্ত হবেন না। আমারি তো অপরাধ হয়ে গেল, আমাদের জ্যোতির্ম্ময়বাবুর বাড়ীর কাজ, প্রথম থেকে এসে আমারি তো সব দেখাশোনা করা উচিত ছিল—বড় দেরী করে ফেললাম।' তারপর জ্যোতির্ম্ময়ের দিকে চাহিয়া, 'কেমন লাগছে জ্যোতির্ম্ময়বাবু নব-বিবাহের স্বাদ? মা-লক্ষ্মীকে দেখতে পাব তো?'

বেশীক্ষণ থাকা তো উচিত হবে না, তাই ধীরে ধীরে সত্যপ্রিয় উপরের

দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, কিন্তু সমস্তক্ষণ হাসিমুখে এদিকে ওদিকে চাহিয়া ছাখে, নিরুদ্বেগ শান্তভাবে এর সঙ্গে ওর সঙ্গে কথা বলে, যেন তাড়াহুড়া কিছুই নাই, সে বহুক্ষণ থাকিবে। পিছনে পিছনে উপহার হাতে চলিতে থাকে ভূষণ।

উপরে উঠিয়া নতুন বৌ-এর সামনে দাঁড়াইয়া সানন্দ কণ্ঠে সত্যপ্রিয় বলে, 'বাঃ বাঃ, সুন্দর মুখশ্রী, চমৎকার লাবণ্য। বেঁচে থাক মা, সুখী হও।' বলিয়া ভূষণবাবুর হাত হইতে মখমল মোড়া কেসটি লইয়া অপরাজিতার হাতে দেয়।

এবার প্রত্যাবর্ত্তনের পালা, অথচ ব্যস্ততা দেখাইলে চলিবে না। সুতরাং দূরের একজন পরিচিত ব্যক্তির দিকে চাহিয়া সত্যপ্রিয় উচ্চকণ্ঠে বলে, 'আমাদের জ্যোতির্ম্ময়বাবুর কেমন ঘরটান হয়েছে দেখেছেন যোগেনবাবু? আর কি আমরা জ্যোতির্ম্ময়বাবুর কেমন ঘর-টান হয়েছে পাব? ঘরের টানে চাকরী ছেড়ে আমাদের না ডুবিয়ে দেন!'

পরিহাসের সুরে কথাগুলি বলিতে বলিতে সিঁড়ির দিকে আগাইয়া গিয়া তেমনি নিরুদ্বেগ, অচঞ্চল মন্থরগতিতে অবতরণ।

'কিছু খেতে হবে? আপনি তো জানেন জ্যোতির্ম্ময়বাবু, আমরা সেকেলে বামুন, সন্ধ্যাহ্নিক না করে কিছু খাই না। যে ভিড় কাজের, কখন্ বা বাড়ী ফিরি কখন্ বা সন্ধ্যাহ্নিক করি। বেশ তো বেশ তো, সেজন্য কি, পাঠিয়ে দিন না বাড়ীতে কি খাওয়াতে চান। সেকেলে মানুষের খাওয়াও জানেন তো,—যাই পাঠান, দু'চার মণের নীচে যেন না নামে, দেখবেন।' হাসিতে হাসিতে সত্যপ্রিয় গাড়ীতে উঠিল, গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

সত্যপ্রিয়র নিমন্ত্রণ রক্ষার এই পদ্ধতির সঙ্গে জ্যোতির্ম্ময়ের পরিচয় আছে, আরও দু'একটি বাড়ীতে প্রায় এই রকমভাবেই সত্যপ্রিয়কে সে নিমন্ত্রণ রাখিতে দেখিয়াছে। কিন্তু একটা ব্যাপার সে আগে ছাখে নাই, সত্যপ্রিয়ের এত দামী উপহার দেওয়া, কর্ম্মচারীর বৌকে। একটু পরেই তার কানে আসিল, সত্যপ্রিয় একটি নেকলেশ দিয়া বৌ দেখিয়াছে। চোখ ঝলসানো নেকলেশ, হাজার দেড়েকের বেশীই দাম হইবে। বিস্ময়ে, আনন্দে অভিভূত হইয়া জ্যোতির্ম্ময় নিজের চোখে দেখিতে গেল। দেখিয়া আরও বেশী অভিভূত

হইয়া গেল। এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার!

সুবর্ণ আবার প্রায় আত্মহারা হইয়া বলিল, 'দেখেছ যশোদাদিদি, দেখেছ?'

যশোদা সংক্ষেপে বলিল, 'দেখেছি।'

সোজাসুজি চেনা না থাক, সত্যপ্রিয়র পরিচয় যশোদা কিছু কিছু জানে। এত দামী জিনিষের দাম না তুলিয়া কি সত্যপ্রিয় ছাড়িবে? হয়তো ইতিমধ্যেই কিছু দাম তুলিয়া নিয়াছে। যে খাটুনিটাই জ্যোতির্ম্ময় খাটে, মানুষ হইয়া গাধার মত।

সকাল সকাল খাইয়া যশোদা বাড়ী ফিরিবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু সেটা সম্ভব হইল না। মেয়েদের খাইতে বসানোর সময় এমনি বিশৃঙ্খল দেখা গেল চারিদিকে যে কখন মেয়েদের দেখিয়া শুনিয়া খাওয়ানোর ভারটা যশোদার ঘাড়ে আসিয়া চাপিয়া গেল সে নিজেই টের পাইল না, যশোদাকে দেখিয়া মেয়েদের মধ্যে ফিস্‌ফাস্ গুজ্‌গাজের অন্ত ছিল না, মাঝে মাঝে হাসাহাসিও চলিতে লাগিল, কোন্ ফাঁকে কোথা হইতে একটা ফাজিল মেয়ে ডাকিয়াও বসিল, 'ওগো হিড়িম্বা, এদিকে একটু চাটনি।'

এসব যশোদা গায়ে মাখে না, অভ্যাস আছে। যেদিক হইতে ডাক আসিয়াছিল, সেদিকে মুখ ফিরাইয়া হাসিমুখে সে বলিল, 'খুকী-পুতুল কে চাটনী চাইলে গা? পাঁপর নেবে?'

অনেক রাত্রে নিজের অন্ধকার ঘুমন্ত পুরীতে ফিরিয়া যশোদার কিন্তু কেমন একটু অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। হিড়িম্বা? হিড়িম্বার মত দেখায় নাকি তাকে? আলো জ্বালিয়া যশোদা আয়নায় নিজের মুখখানা একবার দেখিল, কিন্তু এতটুকু আয়নায় শুধু নিজের মুখ দেখিয়া কি বোঝা যায় তাকে হিড়িম্বার মত দেখায় কিনা! আয়নাটি দেয়ালে লটকাইয়া দিয়া বাহিরে আসিয়া যশোদা এঁটো থালা আর পাতা গুনিয়া দেখিল। একজন খায় নাই। ধনঞ্জয় না কি?

ভাবিতে ভাবিতে ধনঞ্জয় কোথা হইতে সামনে আসিয়া দাঁড়ায়। বলে, 'শোন বলি চাঁদের মা, কাল ভোরে আমি দেশে ফিরে যাব।'

'বটে নাকি? তা বেশ তো।'

'কত পাবে বল দিকি, পাওনাটা মিটিয়ে দিই তোমার।'

'পাওনা মিটিয়ে দেবার জন্যে না খেয়ে রাত দুটো পর্যন্ত জেগে বসে রয়েছ?

মাথা খারাপ নাকি তোমার ?'

ধনঞ্জয় একটু দমিয়া যায়, এদিক ওদিক চাহিয়া বলে, 'ভোর ভোর রওনা দেব কিনা, তুমি আবার এক রাত জাগলে উঠতে তোমার বেলা হবে কিনা, এইজন্যে।'

'আমার চেয়ে ভোরে উঠবে তুমি ? কখন উঠে উনুনে আঁচ দিই টের পেয়েছ একদিন ?'

ধনঞ্জয় আরও দমিয়া গিয়া বলে, 'রাত জাগলে কিনা—'

'একরাত জাগলে আমরা কাজে ঢিল দিই না, তোমাদের মত নবাব বাদশা তো নই আমরা ? তা ভাত খেলে না কি জন্যে ? পরিবেশন করতে বলেছিলাম বলে অপমান হয়েছে বুঝি ?'

ধনঞ্জয় চুপ করিয়া থাকে, যশোদা কড়া দৃষ্টিতে তার বিরাট দেহটা দেখিতে দেখিতে অবজ্ঞা মেশানো কড়া গলায় বলে, 'রোজগার করতে এসে লেজ গুটিয়ে দেশে পালাচ্ছ, ধিক তোমাকে। অত বড় দেহটা রেখেছ কি জন্যে, কাজের নামে যদি শিউরে ওঠ, দুটো পয়সা যদি না উপায় করতে পার ? রোগা প্যাঁটকা এইটুকু টুকু বাচ্চাগুলো পর্য্যন্ত চানাচুর খপ্‌রের কাগজ বেচে পয়সা কামাচ্ছে সহরে, তুমি পারলে না ?'

এবার ধনঞ্জয় রাগ করিয়া বলিল, 'তোমার অত মুরুব্বিপানা কি জন্যে শুনি ? মানুষকে মান্যি করে কথা কইতে না পার, চুপ মেরে থাক।'

যশোদাও রাগ করিয়া বলিল, 'কাজের মুরোদ নেই, তেজ তো আছে দেখি ষোল আনা ? যেও তুমি কাল সকালে দেশে ফিরে, আমার কি।'

পরদিন সকালে ধনঞ্জয় দেশে চলিয়া গেল।

কেবল যশোদার উপর রাগ করিয়া নয়, সহর আর সহরতলী তার সহ্য হইতেছিল না। আরও বেশী সহ্য হইতেছিল না চাকরীর জন্য চেষ্টা করিতে গেলে যা সব সহ্য করিতে হয়।

দুই

যশোদার বাড়ীটি যেখানে, তারই কাছাকাছি শেষ হওয়া উচিত ছিল সহরতলীর কিন্তু সহরতলী যেন নিজেকে ডিঙ্গাইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। সহর যেন। নিজেকে ছড়াইয়া দিয়াছে দূরে, বহু দূরে—সহরের দিকে পিছন করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলে ক্রমে ক্রমে পথের, পথের দু'পাশের বাড়ী-ঘর মাঠ-পুকুর ঝোপ-ঝাড়ের, পথচারী মানুষের মুখের ভাব ও আলাপের সহুরে ভাবটা কমিয়া আসিতে থাকে বটে, কিন্তু একেবারে লুপ্ত যেন হয় না। ধনঞ্জয় একদিন প্রায় দশ বার মাইল হাঁটিয়া গিয়াছিল ঝোঁকের মাথায়, যশোদার সঙ্গে ঝগড়া করিবার পরেই যে ঝোঁকটা আসিয়াছিল; চলিতে চলিতে তার মনে হইয়াছিল, সহরের শেষ চিহ্নটুকু পিছনে ফেলিয়া যাইতে হইলে তিনশ' মাইল তফাতে তার গ্রামের নদীটি পর্য্যন্ত তাকে হাঁটিতে হইবে, তারপর সাঁতার দিয়া পার হইতে হইবে নদী, নদী যাতে তার দেহলগ্ন শেষ সহুরে ধূলিকণাটি ধুইয়া মুছিয়া লইতে পারে। যশোদার সঙ্গে কলহের পরেই সহরের উপর ধনঞ্জয়ের বিতৃষ্ণা বাড়িয়া যাইত। একটু বসিয়া থাকিতে দেখিলেই যশোদা যে তাকে খোঁচায় এটাও ধনঞ্জয় সহুরে অমানুষিকতার পর্য্যায়ে ফেলিয়াছিল। যশোদা যে তার চাকরী জুটাইয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল, দু'টি কাজ যোগাড়ও করিয়া দিয়াছিল, এজন্য ধনঞ্জয় কিছুমাত্র কৃতজ্ঞতা বোধ করে নাই। যাদের দেওয়ার ক্ষমতা আছে, তাদের কাছ হইতে যশোদার ভাড়া আর খাওয়ার খরচ আদায় করিবার কড়াকড়িতেও সে স্তম্ভিত হইয়া যাইত। যাদের কাজ গিয়াছে, কাজের খোঁজে আসিয়া যারা কাজ পাইতেছে না, তাদের যে যশোদা বিনা পয়সায় থাকিতেও দেয়, খাইতে পরিতেও দেয়, এতটুকু অবহেলা দেখায় না, চেষ্টা করিয়া কাজও জুটাইয়া দেয়, এদিকটা সে সময় ধনঞ্জয়ের খেয়ালও হইত না, তার শুধু মনে হইত, সহুরে মেয়েমানুষ কি ভয়ানক! তবু যশোদার সঙ্গে কলহ করিলে মনটা বড় খারাপ হইয়া যাইত ধনঞ্জয়ের; যশোদার সেঁতসেঁতে বাড়ীর মধ্যে থাকিতেও তার দম আটকাইয়া আসিত, বাড়ীর বাহিরে সহরতলীর আবেষ্টনীতেও ফাঁপর ফাঁপর লাগিত।

জ্যোতির্ম্ময়েরও মাঝে মাঝে এরকম হয়, কারও সঙ্গে কলহ না করিলেও। সহরের চেয়েও এখানকার সহরতলীর জীবনের গতি তার যেন মনে হয় অনেক

বেশী উর্দ্ধশ্বাসী। কাছাকাছি অনেকগুলি কল কারখানা থাকার জন্য নয় কেবল, কাছাকাছি অনেকগুলি কলের চাকা ঘুরিতেছে বলিয়াই মানুষ জীবনের গতি বাড়ায় না, কলের চাকার গতিবেগ হাজার মাইল দূরে মানুষের জীবনেও সঞ্চারিত হইতে জানে। দুপুরবেলা বড় রাস্তায় গাড়ীগুলি যেভাবে পরস্পরের গতিবেগ সংযত করে, থামিয়া থামিয়া যেভাবে অগ্রসর হয় শ্লথ গতিতে, তাতে বরং মনে হওয়ার কথা জীবনের গতি এখানে কল-কারখানার কল্যাণেই বুঝি মন্থর। কিন্তু জীবনের গতি তো চলাফেরা ছুটাছুটি নয়, বিমানে যে বোঁ করিয়া পৃথিবীটা পাক দিয়া আসিল জীবন হয়তো তার অলস ও শান্ত, ছোট একটি ডিঙ্গি ভাসাইয়া গা এলাইয়া পৃথিবীটা পাক দিতে জীবনের বেশীরভাগ ব্যয় হইয়া গেলেও হয়তো তার কিছু আসিয়া যায় না। সহরের চেয়ে সহরতলীর মানুষের জীবনীশক্তি বেশী, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যের উগ্রতা বেশী, অভাবও বেশী। বাস্তব অভাব, পার্থিব অভাব, রক্ত-মাংসের মানুষের জীবনকে যে অভাব করিয়া দেয় একেবারে অভিশপ্ত। অভাবের তাড়নায় সহরের চেয়ে সহরতলীর সমবেত জীবনীশক্তি অনেক বেশী তাড়াতাড়ি নিজেকে ক্ষয় করিয়া ফেলে। নূতন জীবন সে ক্ষয়ের পূরণ করিয়া চলে ক্রমাগত, সে নূতন জীবন এখানে যত-না সৃষ্টি হয় তার চেয়ে ঢের বেশী পরিমাণে আসে বাহির হইতে, নিকট ও দূর হইতে।

ধনঞ্জয় চলিয়া যাওয়ার পর আরও দু'জন বৈশাখ মাসের মধ্যে চলিয়া গেল যশোদার বাড়ী হইতে ; একজন দেশে আরেকজন স্বর্গে অথবা নরকে মৃত্যুর যদি অন্য কোন দেশ থাকে সেইখানে। সত্যপ্রিয় মিল এবং আরও কয়েকটা মিলে বড় রকমের একটা ধর্ম্মঘটের উপক্রম হইয়া থামিয়া গেল। পাড়ায় ছেলেদের 'মডার্ণ ক্লাব ও লাইব্রেরী'র প্রতিষ্ঠা দিবসের উৎসব হইয়া গেল, সত্যপ্রিয় আসিয়া একটি স্বলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিল। আমাদের দেশের আগেকার অবস্থার সঙ্গে বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিয়া কত যে তাতে হা-হুতাশ আর বার তিনেক ইংরাজের সঙ্গে ঝগড়া না করিয়া দেশের প্রকৃত উন্নতির চেষ্টা করিবার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ। 'মডার্ণ ক্লাব ও লাইব্রেরী'র পক্ষে প্রবন্ধটি একটু খাপছাড়া হইল বটে, কিন্তু পাঁচশত টাকা দান করিয়া যিনি প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাকে নিজের ইচ্ছামত প্রবন্ধ পাঠ করিতে না দিলে তো চলে না। তাছাড়া মতামত

যেমনই হোক, আগাগোড়া দেশের জন্য কি গভীর মমতা প্রবন্ধটিতে প্রকাশ পাইয়াছে? দেশের দুরবস্থার, বিশেষতঃ যুবকগণের বেকার সমস্যার যে শোচনীয় বর্ণনা আছে, শুনিতে শুনিতে কী গভীর হতাশায় মন ভরিয়া যায়? কেমন একটা প্রেরণা জাগে মনের মধ্যে যে অন্য চিন্তা চুলোয় পাঠাইয়া হাসিমুখে আদর্শের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দেওয়ার মত বাজে গোঁয়ার্ত্তামি ভুলিয়া গিয়া, বড় কিছু করা আর বড় কিছু হওয়ার মরীচিকাকে প্রশ্রয় না দিয়া, ভবিষ্যতে যাতে কোন রকমে খাইয়া পরিয়া সুখে থাকা যায় প্রথম বয়স হইতেই প্রাণপণে সেই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য?

নন্দ উৎসবে গিয়াছিল, বাড়ী ফিরিয়াই বলিল, 'একটা চাকরী না হলে আর চলবে না দিদি।'

রাত তখন দশটা বাজিয়াছে। যশোদা বলিল, 'তুমি যদি চাকরী করবে তো কেত্তন গেয়ে দিন কাটাবে কে? কাল সকালতক সুবুদ্ধি টিঁকিবে না, টেঁকে তো কাল সকালে চাকরীর ভাবনা ভাবিস। এখন খেয়ে নিয়ে আমায় ছুটি দে তো, গরমে সিদ্ধ হলাম।'

ভাইকে ভাত বাড়িয়া দিয়া বলিল, 'মতি বুড়ো আর সুধীর এখনো ফেরেনি। জ্বালিয়ে খেলো দুটোতে আমাকে—চাকরাণী পেয়েছে আমায়। কাল যদি না তাড়াই দুটোকে—'

আজ গুমোট দিয়া এমন গরম পড়িয়াছে যে, রাত্রে ঘরের মধ্যে যশোদার ঘুম আসিল না। ঘণ্টাখানেক এপাশ ওপাশ করিয়া আর প্রাণপণে হাতপাখা চালাইয়া সে উঠিয়া গেল ছাতে, ভাবিল বাকী রাতটা ছাতেই মাদুর পাতিয়া শুইয়া থাকিবে। ছাতে গিয়া ভাখে কি, তিল ধারণের স্থান নাই। দশ-বারজন মানুষ এলোমেলো-ভাবে মাদুর আর ছেঁড়া সতরঞ্চি বিছাইয়া সমস্ত ছাতটি দখল করিয়া আছে, কেউ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, কেউ বসিয়া বসিয়া টানিতেছে বিড়ি।

দু-চারজন মানুষ হইলে যশোদা হয়তো গ্রাহ্য করিত না, একপাশে মাদুর বিছাইয়া শুইয়া পড়িত। কিন্তু এতগুলি পুরুষের সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া মেয়েমানুষ কি ঘুমাইতে পারে?

মতি আর সুধীর খানিক আগে ফিরিয়া আসিয়াছে, ঘরের ভিতর হইতেই যশোদা সেটা টের পাইয়াছিল। কিছু না বিছাইয়াই দু'জনে একপাশে শুইয়া পড়িয়াছে, বোধ হয় যশোদাকে ছাতে আসিতে দেখিয়া। দু'জনে নেশা করিয়া

আসিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু রাত বারোটা বাজিতে না বাজিতে ফিরিয়া আসিয়াছে কেন? কি কাণ্ড করিয়া আসিয়াছে দু'জনে কে জানে!

আলিসায় বসিয়া একজন বিড়ি টানিতেছিল, বলিল, 'বড় গরম, না চাঁদের মা?'

যশোদা ঠাহর করিয়া দেখিল, তার অন্য বাড়ীর ভাড়াটে জগৎ। একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, 'তুমি এ বাড়ীতে ঢুকলে কখন?'

জগৎ বলিল, 'মতি আর সুধীর দরজা খোলার জন্যে ডাকছিল, শুনতে পেয়ে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। ভাবলাম কি, তোমার এ বাড়ীর ছাতে যদি একটুকু হাওয়া পাই, তা শালার হাওয়া কই! ই কি গুমটো গরম গো চাঁদের মা, এঁ্যা?'

যশোদা কাছে আগাইয়া গেল, 'গরম তো বটে, কিন্তু তোমার কি চোখে ঘুম নেই, রাতদুপুরে বসে বসে বিড়ি টানছ? সকাল সকাল যেতে হবে না কাজে?'

'ঘুম না এলে করব কি বল? ঘরে গরমে সিদ্ধ করে দিল, ছাতে এলাম, তা এখানে যেমনি গরম তেমনি মশা।'—বিড়িটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া কাঁধের কাছে সশব্দে চড় মারিয়া জগৎ মশা মারে; গরমটা যশোদা নিজেও অনুভব করিতেছে, মশার উৎপাতও যে কম নয় তারও তো একটা প্রমাণ দেওয়া চাই! আলিসায় ভর দিয়া যশোদা কিন্তু ভাবে যে, কে জানে গরম আর মশা-ই তোমায় জাগিয়ে রেখেছে না কারুর কথা ভেবে তোমার চোখে ঘুম নেই!

'দেশে মশা নেই তোমাদের?'

'আছে না? মানুষ টেনে নিয়ে যেতে পারে এমন মশা।'

'আমায় টেনে নিতে পারবে না, কি বল? তেমন গতর আমার নয়।' বলিয়া আলিসায় ঠেসান দিয়া যশোদা একটু হাসিল। মাঝে মাঝে সম্পূর্ণ অকারণে নিজের দেহের বিপুলতার কথাটা যশোদার মনে পড়িয়া যায়। ক্ষীণ চাঁদের আলোয় ঘুমন্ত মানুষগুলিকে আবছা দেখা যাইতেছিল। সকলেই ঘুমের মধ্যে অল্প-বিস্তর নড়িতেছিল, কেবল মতি আর সুধীর মটকা মারিয়া থাকায় দু'জনে হইয়াছিল কাঠের মূর্ত্তির মত স্থির।

'গতর বড় হলে গরমটা বেশী লাগে, না জগৎ? সবাই ঘুমুচ্ছে ভাখো, আমার গরমে প্রাণটা বেরিয়ে গেল।'

'গতরের জন্যে নয়, গরমটা সত্যি যেন কেমন খারাপ হেথা, গায় সয় না।

দেশের গরম এমন নয়।'

যশোদা তা জানে। যারা অল্পকাল সহরে আসিয়াছে দেশ ছাড়িয়া, দেশের গরমটা পর্য্যন্ত তাদের ভাল লাগে। তা না হইলে ধনঞ্জয় অমনভাবে দেশে পলাইয়া যায়?

'আচ্ছা, একটা কথা তোমায় শুধোই জগৎ, ঠিক মত জবাব দিও, মন রাখা কথা বোলো না, এঁ্যা? আমি খুব মোটা, না?'

'মোটা? উঁহুঁ, মোটাতো তুমি নও চাঁদের মা? একটু বাড়ন্ত গড়ন তোমার, বাস্।'

শুনিয়া খুসী হইয়া জগৎকে শুইয়া পড়িতে বলিয়া যশোদা নীচে নামিয়া গেল। ঘরের মধ্যে প্রাণপণে পাখা নাড়িতে নাড়িতে এক সময় ঘুমাইয়াও পড়িল।

সকালে কলতলার কাজ সারিয়া রান্নাঘরে জলের বালতি দু'টি নামাইয়া রাখিয়া যশোদা আবার ছাতে গেল। প্রায় সাতটা বাজে, জ্যোতির্ম্ময়ের দোতলা বাড়ীর পাশ কাটাইয়া যশোদার ছাতের অর্দ্ধেকটাতে রোদ আসিয়া পড়িয়াছে। রোদের মধ্যেই এখনও পড়িয়া ঘুমাইতেছে তিনজন—জগৎ, মতি আর সুধীর। জগৎ মন কেমন করায় রাত জাগিয়াছিল, অন্য দু'জন করিয়াছিল নেশা। দরদ অথবা মদ, যে নেশার ফলেই হোক মানসিক কোমলতা আনিবার কি সুন্দর আরামজনক পরিণাম! যশোদা প্রথমে মতি আর সুধীরকে ঝাঁকানি দিয়া তুলিয়া দিল, তারপর ডাকিয়া তুলিল জগৎকে।

মতি আর সুধীর হাই তুলিয়া গা হাত মোড়া দিয়া বিড়ি ধরাইয়া একটু আরাম করিতে যাইতেছিল, যশোদা বলিল, 'তোমরা দু'জন ভাত পাবে না এবেলা। চানটি করে নিয়েই দৌড়ে কাজে চলে যাও। ছুটতে ছুটতে গেলে ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারবে।'

দু'জনেই বিড়ি কোমরে গুঁজিয়া উঠিয়া পড়িল। মতি একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, 'ভাত হয়নি যশোদা? খিদেয় নাড়ীতে পাক দিচ্ছে।'

যশোদা ছাতে ছড়ানো মাদুর ও চাটাইগুলি একটি একটি করিয়া গুটাইয়া তুলিতেছিল। সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া একগাল হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'যশোদা, কে গো মতিবাবু মশায় জিজ্ঞেস করি তোমাকে?'

মতির চুল প্রায় সাদা হইয়া আসিয়াছে, কুলী মজুরও তাকে ঠিক বলা যায় না, কারণ সত্যপ্রিয় মিলে গাঁটের উপর আলকাতরা দিয়া সঙ্কেত, অক্ষর ও সংখ্যা আঁকিয়া দেওয়া তার কাজ। সে নাম ধরিয়া ডাকিলে যশোদার রাগ করা উচিত নয়, সব সময় রাগ সে করেও না। কিন্তু যশোদার মেজাজ বোঝা ভার। হাসি ও প্রশ্নে মতি কাবু হইয়া পড়ায় যশোদা নিজেই আবার বলিল, 'আমাকে ডাকৃছ নাকি যশোদা বলে? কাল একপেট গিলে সাহস বেড়ে গিয়েছে, নয়? সবাই চাঁদের মা বলে, তুমিও না হয় তাই বললে। একবার বলোতো কেমন শোনায় দেখি?'

মতি ভয়ে ভয়ে বলিল, 'ভাত হয়নি চাঁদের মা?'

যশোদা বলিল, 'ভাত হবে না কেন, তোমরা এবেলা পাবে না ভাত। চান করে মাথা ঠাণ্ডা করে নিয়ে ছুটে যাও দিকি কাজে, কাজে না গেলে একটি বেলাও ভাত জুটবে না মতি।'

কাজ গেলে যে যশোদাই তাকে দু'বেলা ভাত জোগাইবে যতদিন আবার কাজ না হয়, মতিও তা জানে যশোদাও জানে। তবে সেটা তর্কের বিষয় নয়, মতি ও সুধীর কথা না বলিয়া নীচে চলিয়া গেল। এখানে বাস করিলে মদ খাওয়া চলিবে না। এই ধরণের একটা নিয়ম যশোদা করিয়া রাখিয়াছে কিন্তু নিয়মটা ভাঙ্গিলেই সে যে সব সময় শাস্তির ব্যবস্থা করে তা নয়। এদের জীবনের সঙ্গে যশোদার পরিচয় আছে, জীবনের যে স্তরে যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে এরা বাস করে তাও তার অজানা নয়। কঠোর নিয়ম করিলে চলিবে কেন? কে সে নিয়ম মানিয়া চলিবে? কি দরকার সে নিয়ম মানিয়া চলিবার জীবন যাদের সবদিক দিয়া ফাঁকিতে ভরা? কেবল একটা বিষয়ে সাধু হইলেই কি দিনগুলি ওদের সুখে আর আরামে ভরিয়া উঠিবে! অতিরিক্ত অবিশ্রাম খাটুনি, পেটভরা খাদ্য আর বিরাম ও আরামের অভাব, সমস্তই যাদের বিষের সমান, দু-এক চুমুক বাড়তি বিষ পান করিলে, তাদের কি আসিয়া যায়। কেবল বাড়াবাড়িটা বন্ধ করিবার জন্য যশোদা মাঝে মাঝে রাগ দেখায়, শাস্তি দেয়, তবে শাস্তিটা হয় একটু খাপছাড়া ধরণের, যেন দুরন্ত ছেলেকে শাসন করিতেছে এমনি।

নীচে নামিয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়া যশোদা ডাক দিল, 'নন্দ, একটু পরিবেশন

করবি আয় দিকি দাদা।'

নন্দ আসিলে ভাত বাড়িতে বাড়িতে যশোদা বলিল, 'কাল তো বলছিলি চাকরী নইলে চলবে না, আজ যা না একবার জ্যোতিবাবুর আপিসে ?'

'কি হবে গিয়ে ? কাজ দেবার মতলব ওদের নেই।'

যশোদা রাগ করিয়া বলিল, 'কাজ দেবার মতলব কার থাকে রে ছোঁড়া ? কাজ আদায় করে নিতে হয়। যা চেহারাটি করেছ নিজের, ভরসা করে কে তোমাকে কাজে লাগাতে চাইবে ? জ্যোতিবাবুকে বলছি গিয়ে আরেকবার, দুপুর বেলা একবার যাস। পয়সা চেয়ে নিয়ে যাস্ ট্রামের।'

নন্দ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া পাঁচটি থালায় যশোদার ভাত বাড়া দেখিতে লাগিল। দরজা দিয়া দেখা যায় খাইতে বসিয়াছে তিনজন, পাঁচ থালা ভাত বাড়িবার দরকার ? চাকরীর সমস্যার চেয়ে এই সমস্যাটাই যেন নন্দকে পীড়ন করিতে লাগিল বেশী। শেষে থাকিতে না পারিয়া যশোদার ভুল সংশোধনের জন্য বলিল, 'পাঁচ থালা বাড়ছ যে ? তিনজন বসেছে মোটে—কেষ্ট যতীন আর বলাই।'

'য থালা বাড়ি তোর তাতে কি ? তিনজন বসেছে তো আর কেউ বসতে জানে না ?' থালায় ভাজা, আলুসিদ্ধ আর চচ্চড়ি সাজাইয়া দিয়া যশোদা বাহির হইয়া গেল। রান্নাঘরেই যে কথা নন্দকে অনায়াসে বলা চলিত, উঠানে দাঁড়াইয়া সেই কথাগুলি পাড়াশুদ্ধ লোককে শুনাইবার মত জোর গলায় বলিল, 'যার যা লাগে দিসরে নন্দ, আমি বাজারে গেলাম।' —মতি আবার একটু কানে কম শোনে, ঘন্টাখানেকের মত যশোদা বাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছে না জানিলে তাড়াতাড়ি দু'টি ভাত খাইয়া কাজে যাইবার সাহস বুড়োর হইবে না।

বাজারে যশোদা যায় বটে, এ সময় কোনদিন যায় না। এত সকালে বাজারও ভালরকম বসে নাই, বাড়ীতেও দু'য়ে-চারে উনিশটি মানুষকে ভাত দিবার হাঙ্গামা। নন্দ একা কেন সামলাইতে পারিবে ? তবু যশোদা বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। পেট ভরিয়া দু'টি ভাত-তরকারী খাইতে পাওয়া যাদের জীবনের চরম বিলাসিতা, পেট ভরাইয়া কাজে গেলেও দিনটা অর্দ্ধেক কাবার হইতে না হইতে যাদের পেটে আবার ক্ষুধার আগুন জ্বলিতে থাকিবে, নিজে ভাত বাড়িয়া তাদের খাওয়ানোর দায়িত্বটা যশোদা হঠাৎ যেন ভুলিয়া গিয়াছে !

যশোদার এ বাড়ীর সদর দরজাটি সরু ও সেঁতসেঁতে গলিতে, দুপাশে টিন আর খোলার বাড়ী। আরও একটি বাড়ী আছে যশোদার, কতগুলি টিনের ঘরের সমষ্টি। গলিটি হাততিনেক চওড়া, যশোদার বাড়ী দুটির মধ্যে ব্যবধানও হাত তিনেক, দু'টি বাড়ীর সদরদরজাও প্রায় মুখোমুখি।

ও-বাড়ীটাকে যশোদা চিড়িয়াখানা বলে, এই চিড়িয়াখানায় জীবগুলির বাস করিবার ব্যবস্থা প্রধানতঃ স্ত্রী-পুরুষে জোড়ায় জোড়ায়! মাঝে মাঝে জোড় ভাঙ্গিয়া যায়, যশোদার চেষ্টাতেও আর জোড়া লাগে না, মাঝে মাঝে নূতন জোড়া বাস করিতে আসে পুরাণ জোড়া বিদায় নেয়। জোড় ভাঙিয়া হোক, এক সঙ্গে হোক, বিদায় যারা নেয় হয়তো পাড়াতেই কোন বাড়ীতে তাদের দেখা যায়, হয়তো কোনদিন আর তাদের পাত্তাও মেলে না। সহরের চারিদিকেই সহরতলী, একদিকের সহরতলী হইতে আরেকদিকের সহরতলীতে গেলেও দূরদেশে যাওয়ার মতই মানুষ হারাইয়া যায়।

বাড়ীটাতে ছেলেমেয়ে আছে এক গাদা—বাহির হইতেই নানা বয়সের ছেলে-মেয়ের হৈ-চৈ হুল্লোড় ও কান্না শুনিতে পাওয়া যায়। একখানা ঘর আর রান্নার জন্য আনাচে কানাচে একটু জায়গা, এই তো রাজ্য এক-একটি ভাড়াটের, এত রাশি রাশি ছোট-বড় ছেলে-মেয়ে কোথায় গুদামজাত করা থাকে ভাবিতে সত্যই বিস্ময় বোধ হয়।

আগে, দু'টি বাড়ীই যশোদা স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিচারে ভাড়া দিত, ভাড়াটেরা কি করে না করে সে বিষয়ে মাথা না ঘামাইয়া মাসে মাসে ভাড়াটা পাইলেই খুসী থাকিত। অভিজ্ঞতা জন্মিতে জন্মিতে ক্রমে ক্রমে যশোদার জ্ঞান হইয়াছে যে, সংসারে যত গণ্ডগোলের গোড়া মেয়েমানুষ। জ্ঞান জন্মিবার পর এদিকের বাড়ীটাকে ঘরোয়া মেস বা হোটেল বা ঐ ধরণের একটা কিছুতে পরিণত করিয়া স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষেধ করিয়া দিয়াছে।

বলিয়াছে, 'না বাবু, সুখের চেয়ে আমার স্বস্তি ভাল।'

কোন্‌টা যে তার সুখ ছিল আর কোন্ স্বস্তিটা যে তার ভাল হইয়াছে, দু'বাড়ীর আবহাওয়া পার্থক্যই সেটা পরিষ্কার ঘোষণা করিয়া দেয়।

এ-বাড়ীতে দু'খানা পাকা ঘর সে নিজের দখলে রাখিয়াছে। একটি ঘরে থাকে তার আসবাবপত্র, অন্য ঘরটিতে থাকে সে আর তার ভাই নন্দ। ঘর দু'খানা একটু

পিছনের দিকে, মাঝখানে সিঁড়ির নীচে একটা দরজা আছে সেটা বন্ধ করিলে বাড়ীর সঙ্গে ঘর দু'খানার আর যোগ থাকে না। আগে যশোদা দরজাটা নিয়মমত বন্ধ করিত, আজকাল গ্রাহ্যও করে না। এর দু'টি প্রধান কারণ আছে। প্রথমতঃ তার গায়ে এত জোর যে এ বাড়ীতে এমন একটিও পুরুষ নাই যে, তার হাতের একটা চড় খাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে, দ্বিতীয়তঃ নিজে সে যে স্ত্রীলোক এটা তার সব সময় খেয়ালও থাকে না।

শেষোক্ত কারণটা যশোদার শত্রুও স্বীকার করে। যশোদার সবচেয়ে বড় শত্রু তার ছেলেবেলার সখী কুমুদিনী, পাড়াতেই স্বামীপুত্র সংসার লইয়া সে বাস করে। যশোদার কথা উঠিলেই তাকে বলিতে শোনা যায়: 'ওটা কি মেয়েমানুষ? ও মেয়েমানুষের বাবা!' আরও অনেক কথা সে বলে, বলিতে বলিতে ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হইয়া উঠে। তারই সংজ্ঞা অনুসারে যশোদা যে মেয়েমানুষ নয় মেয়েমানুষের বাবা, এ কথাটা ভুলিয়া গিয়া নাক সিঁটকাইয়া তীব্র আবেগের সঙ্গে সে আবার বলে, 'পুরুষের গাদি বাড়ীতে, তার সবকটা হয় মাতাল নয় গুণ্ডা, মেয়েমানুষ হয়ে কি করে যে ওদের মধ্যে থাকে, মাগো!'

একটু খাপছাড়া জীবন-যাপন করে বৈকি যশোদা, একটু অনন্যসাধারণ হয় বৈকি তার রীতিনীতি চাল-চলন, কিন্তু খুব বেশী বে-মানান যেন তার পক্ষে হয় না। এরকম অবস্থায় অন্য কোন স্ত্রীলোক হয় পুরুষের আশ্রয় খুঁজিত, নয় মানুষের মতবাদ ও নির্দ্দেশের চাপে ধ্বংস হইয়া যাইত, যশোদা কিছুই করে নাই। জীবন-যাপন করে সে স্বাধীন, কারও কাছে তার কোন প্রত্যাশা নাই, নিন্দা প্রশংসা সে গ্রাহ্য করে না, কারও দরদের জন্য কাঁদিয়াও মরে না। বিপদে-আপদে তারই কাছে মানুষ উপকার পায়, পুরুষের কাছে যে কাজ পাওয়া কঠিন যশোদার কাছে তাই পাওয়া যায়। লম্বা-চওড়া শক্ত-সমর্থ শরীরটাতে তার নারীসুলভ লাবণ্য ও কোমলতার চিরদিন এমন অভাব যে, বয়স যখন আরও কম ছিল তখনও কোনও পুরুষের সঙ্গে তার বৈধ বা অবৈধ প্রেমের সম্পর্ক থাকিতে পারে একথাটা মনে আনিতেও লোকের কেমন সঙ্কোচ বোধ হইত, মনে হইত, না, তা হয় না।

একটা গুজব শোনা যায়। দশ-বার বছরের আগেকার কথা, যশোদা যখন সবে ভদ্র অভদ্র নির্ব্বিশেষে ঘর-ভাড়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে। সত্যপ্রিয়ের বাগানবাড়ীটা তখন নাকি কেবল ঝোপ-ঝাপে ভরা বাগান ছিল, চারিদিকের প্রাচীর ছিল ভাঙ্গা।

বাগানের মধ্যে গাছপালার আড়ালে একটা আখড়া ছিল কুস্তীর এবং সেই আখড়ার ওস্তাদ ছিল কেদার নামে একটি মাঝবয়সী লোক। মাথা গিয়া ঠেকিত ঘরের ছাতে, দরজা দিয়া যাতায়াত করিতে হইত পাশ ফিরিয়া, রাস্তায় ষাঁড়কে সরাইয়া সে পথ চলিত। মানুষ যে অমন যোয়ান হয় তাকে যারা চোখে না দেখিয়াছে তাদের কি তা বিশ্বাস হয়? রূপকথার রাজপুত্রের মত কোথা হইতে আসিয়া দু-একটা বছর এ পাড়ায় বাস করিয়া, পাড়ার ছেলেদের কুস্তী শিখাইয়া, পদক্ষেপে দু'পাশের বাড়ী কাঁপাইয়া পথ দিয়া হাঁটিয়া কে জানে আবার সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে! সে চলিয়া যাওয়ার পর বিশ্বসংসারে যশোদা নাকি আর পুরুষ দেখিতে পায় না, সকলে তার কাছে শিশু। আজও যশোদা তার সেই ভালবাসার লোকটির পথ চাহিয়া আছে।

যশোদা শুনিয়া হাসে—'তা নয়? চেয়ে চেয়ে চোখ ভেরে গেল সত্যি। ইবারে যদি না চশমা লি—'

অনেকেই মনে মনে বলে, 'মরণ তোমার বেহায়া!' কিন্তু দু-চার জন ভাবপ্রবণ যারা আছে তারা মনে মনে বলে, 'আহা!' ব্যাকুল আগ্রহে তারা যশোদার মুখে একটু বেদনার ছাপ খোঁজে, চোখের দৃষ্টিতে একটু ব্যথার আভাষ দেখিতে চায়। কিন্তু হায়রে যশোদার হাতীর দেহে হাতীর প্রাণ, এক মুহূর্তের জন্য যদি তার চোখে-মুখে স্বপ্নময় ব্যথিত বেদনার ছাপ দেখা গেল!

বাড়ী দু'টিতে যশোদা যদি কেবল গরীব ভদ্রগৃহস্থদের ভাড়াটে রাখিত তবে কোন কথা ছিল না। প্রথমে কিছুকাল ঐরকম ভাড়াটেই যশোদা খুঁজিত, মাল সরকার, ট্রামের কণ্ডাক্টর, প্রেসের কম্পোজিটার এই শ্রেণীর ভাড়াটের নীচে সে নামিত না। তারপর সমস্ত বাছ-বিচার তুলিয়া দিয়াছে। ভদ্রলোকেরা নাকি বড় বেশী ছোটলোক, যারা পুরা ভদ্রলোকও নয় খাঁটি ছোটলোকও নয়, তারা নাকি একটা অদ্ভুত অপদার্থ জীব। তার চেয়ে কুলি-মজুরও ভাল। বাবুদের চক্ষুলজ্জা আছে, কুলি-মজুরের ভয়ডর আছে, কিন্তু না-বাবু না-কুলি-মজুদের চক্ষুলজ্জাও নাই, ভয়ডরও নাই। সাহসের অভাব হইলে যে ভয়ডর হয় সে ভয়ডরের কথা যশোদা বলিতেছে না, ও-রকম ভয়ডর এ শ্রেণীর লোকগুলির পুরামাত্রাতেই আছে, সে হিসাবে ওরা সব কেঁচোর মত অপদার্থ জীব, ওদের ভয়ডর নাই ধর্ম্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধে, তিল তিল করিয়া আত্মহত্যা করা সম্বন্ধে আর

ওদের উপর যাদের বাঁচিয়া থাকা নির্ভর করে তিল তিল করিয়া তাদেরও হত্যা করা সম্বন্ধে। কেমন যেন চালচলন ওদের, কেমন যেন ভাল-মন্দ পাপ-পুণ্যের হিসাব, কোকেনখোরদের মত। মা বোন যখন খাইতে পায় না, বৌ যখন জ্বরে ধুঁকিতে ধুঁকিতে রান্না করে, পথ্য না দিয়া ছেলেকে কেবল ওষুধ খাওয়াইতে হাসপাতালের ডাক্তার যখন বারণ করিয়া দেন, তখনও সকলের কথা ভুলিয়া গিয়া বাহিরে পুরুষমানুষের স্ফূর্তি করিবার ব্যাপারটা যশোদা বুঝিতে পারে। কিন্তু তখন দুশ্চিন্তায় মুখ পাংশু করিয়া কপাল চাপড়াইতে চাপড়াইতে অদৃষ্টকে গাল দিয়া চকচকে জুতাটি পরিয়া চুলে সিঁথি কাটিতে দেখিলে যশোদার রক্তে আগুন ধরিয়া যায়। সাজিতে পার, হাসিতে পার না লক্ষীছাড়া? গুণ গুণ করিয়া গান ধরিতে পার না আপনজনের রোগ দুঃখ দুর্দ্দশাকে উপেক্ষা করিয়া? তবে তো যশোদার কিছুই বলিবার থাকে না! সর্ব্বাঙ্গে বাবুত্বের অভ্যাসকে আমল দিয়া দোকান ঘরের সাইনবোর্ডের মত কেবল মুখে দুর্ভাবনার বিজ্ঞাপন লটকাইয়া আবার কোন্ দেশী দরদ দেখানো?

বাজারে যশোদা গেল না, এ বাড়ীর সদর দরজা দিয়া বাহির হইয়া ও বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িল। ঢুকিয়াই মনে হইল একটা যেন নূতন জগতে আসিয়া পড়িয়াছে। স্ত্রী-পুরুষ একসঙ্গে বাস করিলে আর সৃষ্টিরক্ষায় মন দিলেই কি তাদের জগৎ এমনভাবে বদলাইয়া যায়? এই সকালবেলাই ছেলে-মেয়ের কলরবে আর স্ত্রী-পুরুষের কলহে বাড়ীটা সরগরম হইয়া উঠিয়াছে। কলতলাতে মেয়েদের মধ্যেই ঝগড়া বেশী। পিছনের ছোট পুকুরটি বুজাইয়া দিবার পর আজকাল উঠানে কলের জলের জন্য রীতিমত মারামারি হয়। চার পাঁচজন ছাই দিয়া প্রাণপণে বাসন মাজিতেছে, একজন কলসীতে জল ভরিতেছে, দু'জন দাঁড়াইয়া আছে স্থান খালি হইবার প্রতীক্ষায়। আরেকটা কল এ বাড়ীতে করিয়া না দিলে চলিবে না। দরখাস্ত যশোদা অনেকদিন আগেই করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু কি যে হইয়াছে তার দরখাস্তের, আর কোন পাত্তাই মিলিতেছে না। তাগিদ দিতে গেলে প্রকাণ্ড আপিসের এ বলে ওর কাছে যাও, ও বলে তার কাছে যাও, ভাল করিয়া কথার জবাবটাও দিতে চায় না কেউ। একটা জলের কল বসাইবার

অনুমতি চাহিয়া এত হাঙ্গামা সহিতে হয়, কে জানে সহরের জলের দেবতারা এমন উদাসীন কেন!

এ বাড়ীতে ঢুকিলেই একটা ভাপ্‌সা ধোঁয়াটে দুর্গন্ধ যশোদার নাকে লাগে। একা মানুষ যশোদা কিন্তু একাই সে তার ও বাড়ীটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখে, এ বাড়ীতে মেয়েমানুষ দু'গণ্ডার কম নয়, কিন্তু নোংরামি কিছুতেই ঘুচিতেই চায় না। উঠানের একপাশে এক গাদা আবর্জ্জনা জমিয়া আছে, রাস্তার একটা লোমওঠা কুকুর কোন ফাঁকে ভিতরে ঢুকিয়া আবর্জ্জনা ঘাঁটিয়া খাবার খুঁজিতেছে, কারও সেদিকে নজর নাই।

ওদিকের ভিজা রোয়াকে চিৎ হইয়া পড়িয়া পরেশের সাত মাসের ছেলেটা হাত-পা ছুঁড়িয়া চেঁচাইতেছে, তার দিকেও নজর দিবার কারও অবসর নাই। কাছেই তার মা পরেশের বাঁ পায়ের হাঁটুর নীচে মস্ত একটা ঘায়ে মলম লাগাইয়া ময়লা ন্যাকড়া জড়াইয়া দিতেছে। মাসখানেক শয্যাগত থাকিয়া পরেশ এখন খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া হাঁটিতে পারে। মোটরের ধাক্কা লাগিয়া পড়িয়া গিয়া নাকি ঘা হইয়াছে। কথাটা যশোদা বিশ্বাস করে নাই। বছর দুই আগে ঠিক এইরকম অকস্মাৎ একবার পরেশের একটা হাতও ভাঙ্গিয়াছিল, সহরের অপরদিকের সহরতলীতে প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া একটা বাড়ীতে চুরির উদ্দেশ্যে ঢুকিবার জন্য কয়েকমাসের জেলও হইয়াছিল। তারপর এতদিন যশোদার এখানে থাকিয়া নিয়মমত কাজে গিয়া ভালভাবেই সে দিন কাটাইতেছিল; হঠাৎ আবার চুরি করার ঝোঁক চাপায় বোধ হয় এই দুর্দ্দশা হইয়াছে। লোকটার সম্বন্ধে কি যে করিবে যশোদা ভাবিয়া পায় না। চোরকে বাড়ীতে থাকিতে দেওয়া কি উচিত, আরও কতগুলি পরিবার যে বাড়ীতে থাকে? চুরি করিতে গিয়াই হাঁটুর নীচে ঘা হইয়াছে এটা নিশ্চিতভাবে না জানিয়া ছেলে বৌ শুদ্ধ একটা লোককে তাড়াইয়া দেওয়াও কি উচিত? বিশেষতঃ একমাস ঘরে বসিয়া থাকার জন্য লোকটার যখন চাকরী নাই?

'তোমার পা কেমন আছে পরেশ?'

সঙ্কোচ ও অপরাধ ভরা হাসি হাসিয়া পরেশ বলিল, 'একটু ভাল চাঁদের মা। আর সাতটা দিন, তারপর—'

'নিজে তো ন্যাকড়াটা জড়িয়ে নিতে পার পায়ে? হাত দুটো তো যায় নি তোমার? ছেলেটা চেঁচিয়ে মরল, কোলে নাওনা খোকার মা? কি যে তোমাদের

কাণ্ডজ্ঞান বাছা, বুঝিনে কিছু।'

পরেশ তবু হাসে, আরও বেশী সঙ্কোচ, আরও বেশী অপরাধভরা হাসি। মানুষের কাছে এই একটিমাত্র মুখভঙ্গি পরেশ করিতে জানে, তার বড় বড় টানা চোখ দু'টির খাপছাড়া সৌন্দর্য্যের মত এ মুখভঙ্গি অর্থহীন।

ওদিকের কোণের ঘরে নদেরচাঁদের বৌ অনেকদিন জ্বরে ভুগিতেছে। তার খবরটা জানিবার জন্য যশোদা পা সবে বাড়াইয়াছে, কলতলায় এক কাণ্ড হইয়া গেল। জগতের বোন কালো একটু স্থান করিয়া বাসন মাজিতেছিল, কোথা হইতে নদেরচাঁদের মেয়ে চাঁপা আসিয়া তাকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিয়া নিজে সেখানে বসিয়া পড়িল।

'আমি আগে বাসন রেখে গেছি।'

কালো মুখ কালো করিয়া বলিল, 'ধাক্কা দিলে কেন? মুখে বলতে পারতে না?'

কালোর স্বাস্থ্য ভাল, চাঁপার মত সে রোগা নয়। কিন্তু সহরতলীতে সে আসিয়াছে অল্পদিন আগে দেশের গাঁ হইতে, এখনো সহরতলীর সহুরে মেয়েদের সঙ্গে কলতলার যুদ্ধে আঁটিয়া উঠিতে পারে না। মুখ ভার করিয়া সে একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল। বাসন মাজিতে আরম্ভ করিয়া চাঁপা মুখ ফিরাইয়া বলিল, 'রাগিস কেন? কতখন লাগবে এ'কটা বাসন মাজতে?'

ধাক্কাটা যে চাঁপা শুধু আগে বাসন মাজিবার সুযোগ পাওয়ার জন্য দেয় নাই, যশোদা তা জানে। একবার ভাবিল চাঁপাকে ধমক দেয়, তারপর ভাবিল, কি হইবে ধমক দিয়া? শক্ত-সমর্থ যে মেয়ে মুখ বুজিয়া এমন ধাক্কাটা সহ্য করে, তার হইয়া কিছু করিতেও যশোদার ভাল লাগে না। কালোর উপর চাঁপার বড় দ্বেষ, কোন দোষ নাই কালোর, তবু চাঁপা তাকে দেখিতে পারে না। প্রকারান্তরে দোষ আছে কালোর, চাঁপার সুখের পথে সে কাঁটা হইয়া আছে। চাঁপার মা ক্রমাগত জ্বরে ভোগে, চাঁপার বাবা নদেরচাঁদ নেশার ফাঁদে পড়িয়া অকালে বুড়ো হইয়া পড়িয়াছে, বড় কষ্টে দিন কাটে চাঁপার। এতদিনে একটু সুখের সম্ভাবনা ঘটিয়াছে চাঁপার। জগতকে সে কি করিয়া বাগ মানাইয়াছে সেই জানে, বোধ হয় সেও অল্পদিন সহরে আসিয়াছে বলিয়া সহুরে মেয়েটাকে আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই। মাস ছয়েক আগে জগতের বৌ মরিয়া গিয়াছিল, তার তিনমাস পরে সকলে জানিয়াছে, চাঁপার সঙ্গে

জগতের বিবাহ হইবে।

কোন্ কালে বিবাহটা হইয়া যাইত, ওঘর হইতে জগতের এঘরে আসিয়া জগতের রোজগারে ভাগ বসাইয়া আরামে চাঁপা দিন কাটাইতে পারিত, পোড়ারমুখী কালোর জন্য সব আটকাইয়া আছে। কালোর বিবাহ না দিয়া জগৎ নিজে আবার বিবাহ করিতে পারিতেছে না। একদিকে বাধা দিতেছে তার আধ-পাগলা মা, অন্যদিকে আটকাইতেছে টাকায়।

'তোর মা কেমন আছে লো চাঁপা?' যশোদা জিজ্ঞাসা করিল।

'জ্বর নেই গো যশোদাদিদি।'

চাঁপার মার ঘরে উঁকি দিয়া যশোদা জগতের ঘরে গেল। ঘরের কোণায় ময়লা ছেঁড়া কাপড়ে নতুন বৌটির মত মস্ত ঘোমটা টানিয়া জগতের মা বসিয়াছিল আর আপনমনে বিড়-বিড় করিয়া বকিতেছিল। বৌ সাজিবার পাগলামীটাই জগতের মার বেশী প্রবল।

দরজার কাছে বসিয়া হুঁকা টানিতে টানিতে খোলা দরজা দিয়া জগত চাহিয়াছিল কলতলার দিকে। যশোদাকে দেখিয়া দৃষ্টিও সরাইয়া নিল, একটু ভিতরের দিকে সরিয়াও বসিল। চাঁপাকেই দেখিতেছিল বোধ হয় এতক্ষণ। সকালবেলা কোথা হইতে একটা কলকে ফুল যোগাড় করিয়া খোঁপায় গোঁজায় জগতের চোখে চাঁপার রূপটা বোধ হয় আজ বাড়িয়া গিয়াছে।

জগৎ বলিল, 'কালোকে কেমন ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল, দেখলে চাঁদের মা?'

যশোদা বলিল, 'তুমি তো দেখেছ? তাতেই হবে।'

'কালোর সঙ্গে মোটে বনিবনা নেই চাঁপার।'

'কার সঙ্গে বা আছে? যা স্বভাব মেয়ের।'

চাঁপার নিন্দায় ক্ষুণ্ণ হইয়া জগৎ মুখ ভার করিয়া থাকে আর তার মুখের দিকে চাহিয়া যশোদা মনে মনে বলে, 'ধিক্ তোমাকে। বোনটাকে অমন করে ঠেলে সরিয়ে দিলে, একটুকালের জন্যে না হয় একটু তুমি বিরাগ হতে চাঁপার ওপোর?'

ফিরিয়া যাওয়ার সময় যশোদার চোখে পড়ে, তখনও কালো মুখ ভার করিয়া কলতলার একপাশে দাঁড়াইয়া আছে। এরকম নীরব দুর্ব্বল অভিমানও যশোদার দু'চোখে দেখিতে পারে না। কার উপর তুই মুখভার করিয়া

আছিস ছুঁড়ি, কে তোর মুখভারের মর্য্যাদা রাখিবে ?

নিজের বাড়ীতে যশোদা ঢুকিল না, মতি আর সুধীরকে ভাত খাওয়ার জন্য আরও একটু সময় দেওয়া দরকার। গলি ধরিয়া যশোদা আগাইয়া গেল। একটু গেলেই এ পাড়ার রাজপথ, দু'টি গাড়ী পাশাপাশি চলিতে পারে এতখানি চওড়া, পিচঢালা এবং বিদ্যুৎবাহী তারের থাম বসানো। গলির ভিতর হইতে এ রাস্তায় পা দিলেই যশোদার মনে হয়, ভিজা কাপড়ের মত সর্ব্বাঙ্গে ল্যাপটানো একটা অশুচি আবরণ যেন খোলা আলোবাতাসের স্পর্শে খসিয়া গেল। তবে আরাম যশোদার হয় না, খুসিও সে হইতে পারে না। এই রাস্তাটি তৈরী হইয়াছে বলিয়াই তো তার বাড়ী দু'টি এমনভাবে আড়ালে পড়িয়াছে, সঙ্কীর্ণ গলির স্থানটুকু বাদ রাখিয়া দু'পাশে এমন ঘিঞ্জিভাবে টিন আর খোলার বাড়ী উঠিয়াছে। বছর দশেক আগে এখানে পথও ছিল না, গলিও ছিল না, দূরে যে রাস্তা দিয়া আজ ট্রাম আসিয়া ঘুরিয়া যায়, সেই রাস্তা পার হইয়া আসিলেই মানুষ ছড়ানো বাড়ীগুলির আনাচ কানাচ দিয়া, কলা বাগান ভেদ করিয়া পুকুরের পাড় ঘুরিয়া যেদিকে খুসি চলিতে পারিত। দশ বছরে সহতলীর সহরে ভাবটা কি হু হু করিয়াই না বাড়িয়া গিয়াছে।

জ্যোতির্ম্ময়কে নন্দের চাকরীর কথাটা মনে করাইয়া দিয়া যশোদা বাড়ী ফিরিবে ভাবিয়াছিল। জ্যোতির্ম্ময়ের বাড়ীর পাশ দিয়া যশোদার বাড়ীর ছাতে রোদ আসিয়া পড়ে বটে, যাইতে হয় একটু ঘুরিয়া। যাওয়ার সময় চোখে পড়ে সত্যপ্রিয়ের বিরাট বাড়ীর বিরাটতর বাগানের পিছনদিকের খানিকটা প্রাচীর। এতবড় বাগানের ফুল-ফল আর কৃত্রিম নির্জ্জনতার শোভা একটি পরিবারের কি কাজে লাগে কে জানে।

জ্যোতির্ম্ময় রান্নাঘরের বারান্দায় খাইতে বসিয়াছিল। খানিক দূরে বসিয়া ভাইয়ের খাওয়া দেখিতেছে জ্যোতির্ম্ময়ের দিদি, ঘরের মধ্যে গলা সাধিতেছে সুবর্ণ। পরিবেশন করিতেছে বামুন। বিবাহ উপলক্ষে যে সব আত্মীয়স্বজন আসিয়াছিলেন তাঁরা চলিয়া গিয়াছেন।

'এসো চাঁদের মা।'

জ্যোতির্ম্ময়ের আহ্বানটি মিষ্টি। গোলগাল তামাটে রঙের মানুষ সে, মুখের চামড়া মসৃণ ও কোমল। দেখিলেই মনে হয় লোকটি বুঝি তাদেরই একজন,

যারা শান্ত ও সহিষ্ণু, ভীরু ও সাবধানী, ভোঁতা ও হিসাবী। কিছুক্ষণ আলাপ করিলেই কিন্তু এ ধারণায় গোল বাধিয়া যায়। মনে হয়, মানুষটা সে চালাক-চতুরও বটে, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, তেজ, অহঙ্কার আর একগুঁয়েমিও যেন আছে। মনটা কোমল কিন্তু মায়া-মমতা যেন বড় কম। এই বৈশিষ্ট্যগুলি সাময়িক প্রেরণার মত জ্যোতির্ম্ময়ের কথাবার্ত্তা চালচলনের মধ্যে ভাসিয়া ভাসিয়া আসিয়া উঁকি দিয়া আবার কোথায় হারাইয়া যায়, ব্যাপারটা ঠিকমত বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না, কেমন একটা অবিশ্বাস ও সন্দেহের ভাব জাগে। অবিশ্বাস ও সন্দেহকে প্রশ্রয় দিতেও কিন্তু ইচ্ছা হয় না। ভয় আর দুর্ব্বলতা, সাহস আর তেজ, বিষাদ আর হাসিখুসী ভাব, ভোঁতামি আর ধারালো বুদ্ধি, এলোমেলোভাবে এ সমস্তের ভাসা ভাসা আবির্ভাব অস্থিরচিত্ততার মতই লাগে বটে, কিন্তু এমন একটা সংযম আর আন্তরিকতার প্রচ্ছন্ন আবরণ সব সময় তাকে ঘিরিয়া থাকে যে, অতিরিক্ত উদারতার সঙ্গে তাকে বিচার করিতে বড় ভাল লাগে মানুষের।

'তোমার ভায়ের চাকরী চাঁদের মা? চেষ্টা তো করছি, দেখি কি হয়।'

'নন্দকে আজ একবার পাঠিয়ে দেব আপনার আপিসে?'

'পাঠিয়ে দেবে? তা দিও।' বলিয়া জ্যোতির্ম্ময় এক গ্রাস ভাত গেলে, গিলিয়াই চিন্তিতভাবে বলে, 'আজকেই পাঠাবে? কদিন পরে পাঠাতে পার না?'

ভাই-এর জন্য চাকরী ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে যশোদা, জ্যোতির্ম্ময় যেন একটি অনুগ্রহ ভিক্ষা করে যশোদার কাছে, দয়া করিয়া যশোদা কি আজ তার ভাইকে আপিসে না পাঠাইয়া পারে না?

যশোদা বলে, 'তা আপনি যদি বলেন—'

জ্যোতির্ম্ময় সঙ্গে সঙ্গে খুসী হইয়া বলে, 'হ্যাঁ, সেই ভাল। আমি এদিকে কর্ত্তাকে বলে কয়ে রাখি একটু, তার পর একদিন তোমার ভাইকে নিয়ে যাব, কেমন?'

'বলে কয়ে রাখবেন তো ঠিক? না ভুলে যাবেন?'

'ভুলব কেন? আমি সহজে কোন কথা ভুলি না চাঁদের মা। তুমি যে আগে একদিন বলেছিলে, আমি কি ভুলে গেছি? ভুলি নি। তোমার আসবার কোন দরকার ছিল না, তোমার ভায়ের চাকরীর জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করছি, মনে না করিয়ে দিলেও চেষ্টা করতাম।'

কথা শুনিয়া মনে হয়, নন্দর একটা চাকরী করিয়া দিবার চেষ্টায় জ্যোতির্ম্ময়ের

দিনে বিশ্রাম নাই, রাত্রে ঘুম নাই। সেই যে কবে একদিন যশোদা তাকে এ বিষয়ে অনুরোধ জানাইয়াছিল, তারপর হইতে জ্যোতির্ম্ময় বাঁচিয়াই আছে এই একটিমাত্র উদ্দেশ্য নিয়া নন্দর একটি চাকরী।

বিরক্তির সঙ্গে যশোদার কৌতুক বোধ হয়, কৌতুক বোধের সঙ্গে একটু দরদও জাগে। নিজের কোন একটা সমস্যা নিয়া বেচারী হয়তো দিবারাত্রি ব্যতিব্যস্ত হইয়া আছে, এখনো হয়তো সেই কথাই ভাবিতেছে, এই সব জমা করা চিন্তা আর উদ্বেগ যশোদার মন রাখার ব্যাকুলতায় কেন্দ্রচ্যুত হইয়া কিছুক্ষণের জন্য নন্দর চাকরীর দুর্ভাবনায় দাঁড়াইয়া গিয়াছে। অতিমাত্রায় ভক্তি নিয়া মানুষ যখন মন্দিরে ঠাকুরকে প্রণাম করিতে যায়, পথের ধারে ফেলিয়া রাখা পথ বাঁধানোর বাড়তি পাথরটাকে ব্যাকুল আগ্রহে প্রণাম করা তার পক্ষে সম্ভব বৈকি।

যশোদাকে পিঁড়ি পাতিয়া জাঁকিয়া বসিয়া জ্যোতির্ম্ময়ের সঙ্গে আলাপ জুড়িতে দেখিয়া তার দিদি গম্ভীরমুখে কোথায় উঠিয়া চলিয়া গিয়াছিল, এতক্ষণে একটা কলাই-করা প্লেটে আম কাটিয়া আনিয়া সামনে রাখিল। নাম তার সুধীরা। গাম্ভীর্য্য ও ধীরতার তার সত্যই তুলনা নাই। যশোদাকে সে পছন্দ করে না, আমলও দেয় না—আমল পাওয়ার জন্য যশোদার কিছুমাত্র চেষ্টা না থাকায় যশোদাকে সে আরও বেশী অপছন্দ করে। এককালে একজন আধাহাকিমের গৃহিণী ছিল, এখন বিধবা হইয়াছে। বিধবাও হইয়াছে প্রায় পাঁচ-সাত বছর, কিন্তু গিন্নী গিন্নী ভাবটা এত বেশী বজায় আছে বলিবার নয়। বাড়াবাড়িটা বোধ হয় এইজন্য যে আসল যা ছিল তার ভিতরটা হইয়া গিয়াছে ফাঁপা, বজায় আছে শুধু ভাবটুকু ফাঁকি ফাঁকিতে সেটা উঠিয়াছে ফাঁপিয়া।

যশোদা বলে, 'নতুন বৌকে দেখছি না, আসে নি বৌ বাপের বাড়ী থেকে?'

পাখা নাড়িয়া আমের মাছি তাড়াইতে তাড়াইতে মুখ না ফিরাইয়াই সুধীরা সংক্ষেপে বলে, 'এসেছে।'

'ওমা, কবে এল? জানি নি তো!'

'পরশু এসেছে।'

যশোদা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলে, 'ওপরে আছে বুঝি? যাই, চেনা করে আসি।'

সুধীরা অসন্তুষ্ট হইয়া বলে, 'নতুন বৌ-এর সঙ্গে আবার চেনা করবে কি বাছা?'

এসব বিকারগ্রস্ত মানুষের অপমান যশোদা সহজে গায়ে মাখে না, সে হাসিয়া বলে, 'নতুন বৌ বলেই তো চেনা করা। ভয় নেই গো দিদি, বৌকে তোমাদের চুরি করে নিয়ে পালাব না।'

যশোদা উপরে উঠিতে থাকে, সুধীরা বোনকে ডাক দিয়া বলে, 'সুবর্ণ ও সুবর্ণ?—ও বাড়ীর যশোদা বৌ দেখবে, নিয়ে যা তো সঙ্গে করে বৌ-এর কাছে।'

যশোদা কতবার এ বাড়ীতে আসিয়াছে, পথ চিনিয়া সে কি যাইতে পারিবে না উপরে, দোতলার দু'খানা ঘরে খুঁজিয়া পাইবে না নতুন বৌ অপরাজিতাকে? সাজা-গৃহিনীদের গিন্নীপনার মানে বোঝা সত্যই কঠিন।

বাড়ী ফিরিয়া যশোদা দেখিল, মোটে তিনটি এঁটো থালা পড়িয়া আছে, আরও দু'জন খাইতে বসিয়াছে এবং তাদের জন্য নতুন করিয়া ভাত বাড়িতে নন্দ একেবারে গলদঘর্ম্ম।

'আরে নিষ্কর্ম্মার ঢেঁকি, হাতায় ক'রে হাঁড়ি থেকে ভাত তুলে থালায় দেবে, তাও পার না? পালা তুই, ভাগ্।'

নন্দকে রেহাই দিয়া যশোদা জিজ্ঞাসা করিল, 'কে কে খেয়েছে রে নন্দ?'

নন্দ গড়গড় করিয়া বলিয়া গেল, 'কেষ্ট, বলাই আর যতীন।'

যশোদা একটু আশ্চর্য হইয়া বলিল, 'মতি আর সুধীর খায় নি? কি হ'ল তবে আর দু'থালা ভাত, বেড়ে যে রেখে গেলাম পাঁচ থালা?'

নন্দ বিব্রত হইয়া এদিক ওদিক তাকায়, 'ওই তো খেয়ে গেল ওরা।'

'কারা? মতি আর সুধীর?'

'হু।'

'এঁটো থালা গেল কই?'

যশোদার জেরায় কাবু হইয়া এবার নন্দ সব বলিয়া ফেলে। মতি আর সুধীরের ভাত খাওয়া শেষ হওয়া মাত্র সুধীর তাড়াতাড়ি এঁটো কাঠা সাফ করিয়া থালা দু'টি মাজিয়া ধুইয়া রাখিয়া গিয়াছে আর নন্দকে বলিয়া গিয়াছে অনেক করিয়া, সে যেন যশোদকে না বলে।

'খুব বুদ্ধিমান তো সুধীর!—তুই না বললেও টের পেতে যেন আমার বাকী থাকত।' বলিয়া যশোদা হাসিল।

তারপর গম্ভীর হইয়া ভৎর্সনার সুরে বলিল, 'পেটের জ্বালায় ওরা না হয় বারণ

না মেনে খেয়ে গেল, বলবি না বলে তুই যে আমায় বলে দিলি বড় ? ধিক্ তোকে বিশ্বাসঘাতক। বিশ্বাসের মান যে রাখে না মানুষের মধ্যে তাকেই বলি সবচেয়ে হীন, চোর-জোচ্চোর ভাল তার চেয়ে।'

এরকম সময়ে যশোদাকে বড়ই দুর্ব্বোধ্য মনে হয়। কি যে তার মনের ভাব, রাগ সে সত্যই করিয়াছে না সবটাই তার ভাণ, কিছুই বোঝা যায় না। হাসি-তামাসা করা চলে এমন একটা তুচ্ছ ব্যাপারে কথা দিয়া কথা রাখে নাই, তাও যশোদারই জোরালো জেরার ফাঁদে পড়িয়া, এটা কখনও নন্দর এতবড় অপরাধ বলিয়া যশোদা ভাবিতে পারে ? মুখ দেখিয়া কথা শুনিয়া মনে হয় কিন্তু তাই সে ভাবিতেছে !

নন্দ ভয়ে ভয়ে বলে, 'তুমি যে জিজ্ঞেস করলে ?'

'জিজ্ঞেস করব না ? জিজ্ঞেস তো আমি করবই—আমি কি গুণে জানি একজনের কাছে তুমি পিতিজ্ঞে করেছ আমায় কিছু বলবে না ? চুপ করে থাকতে পারতে না তুমি ?'

'চুপ করে থাকলেও তো তুমি বকতে।'

'বকতাম তো কি হয়েছে ? পিতিজ্ঞে রক্ষার জন্যে মুখ বুজে একটু বকুনি যদি না সইতে পার, তুমি মানুষ কিসের শুনি ?'

এক জায়গায় কাজ করে বটে, তবু মতির সঙ্গে সুধীরের বন্ধুত্ব হওয়াটা সত্যই বড় খাপছাড়া ব্যাপার। মতির চুলে পাক ধরিয়াছে, মানুষটা সে শান্ত, ভীরু এবং একটু মতলববাজ। সুধীরের বয়স ত্রিশেরও কম, বেঁটে আর চওড়া শরীরটা তার লোহার মত শক্ত, যেমন অশান্ত তেমনি নিষ্ঠুর তার প্রকৃতি এবং পৃথিবীর সকল গোঁয়ারের মত সে বোকা। তবু মতির সঙ্গেই সুধীর ভিড়িয়া গিয়াছে, দু'জনে একসঙ্গে হাসি-তামাসা গল্প-গুজব করে, নেশা আর আমোদ করিতে যায়,—দু'টিতে যেন সমবয়সী ইয়ার।

রাস্তায় পা দিয়াই সুধীর এক গাল হাসিয়া বলিল, 'চাঁদের মাকে ফাঁকি দিয়ে কেমন দুজনে পেট পূজাটি সেরে এলাম মতিদা !'

'ফাঁকি না তোর মাথা। আমরা যাতে খাই তাই জন্যে তো ও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল, তাও বুঝিস না পাঁঠা ?'

'বটে নাকি, হঁ্যা ?'

সুধীর বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল। এমন খাপছাড়া প্যাঁচালো দরদের ব্যাপারগুলি সে ভাল বুঝিতে পারে না। পরের সুখ-দুঃখের কথা যে সংসারে কেউ ভাবে এ ধারণাটাই তার কেমন অদ্ভুত ও অসম্ভব মনে হয়, জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে খাপ খাইতে চায় না। তার সমস্ত জীবনটাই একটা একটানা পেষণের ইতিহাস, পরের আশ্রয়ে মানুষ হইয়াছে, পরের অবজ্ঞা, উপেক্ষা, অন্ধ স্বার্থপরতা ও ক্ষমাহীন নির্ম্মমতাকে জানিয়াছে সংসারের স্বাভাবিক নিয়ম, সুস্থ শরীরে খাটিতে পারিলে খাইয়াছে, অসুস্থ শরীরে খাটিতে না পারিলে উপবাস করিয়াছে, ভিক্ষা করিয়াছে, চুরি করিয়াছে, জেলেও গিয়াছে। একবার অনেক কষ্টে কিছু টাকা জমাইয়া বিবাহ করিয়াছিল, দু'মাসের মধ্যে বৌটা একজনের সঙ্গে উধাও হইয়া গিয়াছে। তার আগে এবং পরে যে কয়েকটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে সে বাস করিয়াছে, তারা যেমন তার কাছে প্রাণপণে আদায় করিয়াছে সেও তেমনি তাদের কাছে প্রাণপণে আদায় করিয়াছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের যেভাবে হোক নিজের প্রাপ্য আদায় করার সহজ সরল সম্পর্কটা সুধীর বুঝিতে পারে, আর কিছু তার মাথায় ঢোকে না। নিজেও সে চিরদিন নিজের সুখদুঃখ ভালমন্দের হিসাব ছাড়া আর কোন হিসাব করে নাই, অন্য কেউ এই হিসাব লইয়া মাথা ঘামাইবে এ আশাও করে নাই। জীবনে যে কারও অকারণ দরদ পায় নাই এজন্য তার তাই কোন আপশোষও নাই। হয়ত কখনও পাইয়াছিল দরদ, হয়ত মানুষকে দরদী করিবার সুযোগ আসিয়াছিল, কিন্তু সে বুঝিতেও পারে নাই কি পাইতেছে, কিসের সুযোগ আসিয়াছে।

কেহ তাহাকে কোনদিন বুঝাইয়াও দেয় নাই, বুঝিতেও দেয় নাই।

চলিতে চলিতে নানা কথা মনে হয় সুধীরের। একটি দু'টি করিয়া যশোদার কতগুলি কাজের কথা মনে পড়ে, আজকের আশ্চর্য্য ব্যবহারের সঙ্গে যার কেমন যেন একটা মিল আছে। কিছুদিন আগে তার জ্বর হওয়ায় যশোদা তার সেবা করিয়াছিল, খুবই সাধারণ সেবা, মাথাটা ধোয়াইয়া মুছিয়া দেওয়া, জোর করিয়া বার্লি আর ওষুধ খাওয়ানো, আর কিছু নয়,—তবু ওরকম সেবাও কি সুধীরকে কোনদিন কেউ করিয়াছে? মারামারি করায় একবার পঁচিশ টাকা জরিমানা হইয়াছিল সুধীরের, যশোদা জরিমানাটা না দিলে জেলে যাইতে

হইত। তারপর দু-এক টাকা করিয়া মাস তিনেকের মধ্যে যশোদা প্রায় দশ বারো টাকা আদায় করিয়া নিয়াছে বটে, কিন্তু যাচিয়া জরিমানার টাকা দিয়া কেউ কি সুধীরকে কোনদিন জেল হইতে বাঁচাইয়াছে ?

'সত্যি বলছ মতিদা ?'

কি সত্যি বলিয়াছে মতি ? অ, যশোদার কথা ! সত্য বৈকি, যশোদাকে তো চেনে না সুধীর, ওসব সে বুঝিবে না। মেজাজটা একটু যা খারাপ যশোদার, চেহারাটাও হাতীর মত, কিন্তু সকলের জন্য বড় মায়া যশোদার, অমন মেয়েমানুষ হয় ?—'একটা বিড়ি দে তো। গা'টা কেমন করছে সুধীর, কালকের নেশাটা এখনো কাটে নি।'

'বিড়ি নেই।'

'দে-না একটা ? কেমন ধারা মানুষ যেন তুই সুধীর।'

সুধীর বিরক্ত হইয়া বলিল, 'নেই তো দেব কোথা থেকে ? গড়াব ?'

একটা বিড়ির জন্যেই দুজনের মধ্যে যেন মনোমালিন্য ঘটিবার উপক্রম হয়। মতি খানিক আগে আর সুধীর খানিক পিছনে চলিতে থাকে।

এত সকালেই বড় রাস্তায় গাড়ী আর মানুষের ভিড় হইতে আরম্ভ করিয়াছে। দশটা এগারটার সময় এ রাস্তায় চলাই দুষ্কর হইয়া পড়ে। ঠেলা গাড়ী, মহিষের গাড়ী, লরী আর বাসের সংখ্যা বাড়িতে বাড়িতে এমন হইয়া দাঁড়ায় যে থাকিয়া থাকিয়া মোটর গাড়ীকেও গরুর গাড়ীর সঙ্গে সমান তালে শামুকের গতিতে চলিতে হয়, মাঝে মাঝে জমাট বাঁধিয়া সমস্ত গাড়ীর গতিই কিছুক্ষণের জন্য একেবারে স্থগিত হইয়া যায়। তখন পথের দিকে চাহিলে মনে সংশয়ই জাগে, একি সহরতলীর পথ না সহরের কেন্দ্র ? সংশয় দূর হয় যখন মনে পড়ে সহরের কেন্দ্র এ রকম অপরিচ্ছন্ন নোংরা নয়, সেখানে পথের ধারে বুদ্‌বুদ্‌ তোলা পচা পাঁকে ভরা ছোটখাট খালের মত এ রকম নর্দ্দমা নাই, গেঁয়ো ধরণের দোকানপাট আর সেকালের ধরণের আড়ৎ নাই, এত বড় বড় মিল নাই, এ ধরণের মালবাহী গাড়ী সেখানে এভাবে জড়াজড়ি করে না, সেখানে দামী ও সুদৃশ্য প্রাইভেট কারের স্রোত কেবল রঙীন বৈদ্যুতিক আলোর ইঙ্গিতে কিম্বা ট্রাম-বাস প্রভৃতি মানবজাতীয় মালবাহী গাড়ী আর মানুষের ভিড়ে গতিহীন হয়, সেখানে পথের ধারে প্রত্যেকটি বাড়ী রাজপুরী, প্রত্যেকটি দোকান শুধু এই বাণীর রূপক যে ধনী ছাড়া পৃথিবীতে মানুষ

নাই, থাকা উচিত নয় ।

কারখানায় গিয়া মতি সবে খাকি সার্টটি খুলিয়া রাখিয়া আলকাতরার বালতি আর বুরুষটি তুলিয়া লইয়াছে, মাল চালানের কুলীদের সর্দার ভরদ্বাজ আসিয়া বলিল, 'ওই বিশঠো গাঁটমে কাল লিখা নাই কাহে ?' ভরদ্বাজ চমৎকার বাঙ্গলা বলিতে পারে, কিন্তু রাগের সময় বলে না ।

'সব গাঁটমে তো কালকে আমি লিখেছি ?'

'লিখেছো ? তোমার মুণ্ডু করিয়েছো। কাল চালান বরবাদ গেলো, কাশীবাবু হামাকে দুষছে। কাম যদি না করবে শালা, চলা যাওনা কাম ছোড়কে ?'

বুরুষটা ছিনাইয়া লইয়া মতির গালে আঘাত করিয়া ভরদ্বাজ গজরাইতে গজরাইতে চলিয়া গেল। আঘাত যত না লাগিল মতির, আলকাতরা লাগিল তার চেয়ে অনেক বেশী। সাদা চুল আর কালো গালের রং দেখিয়া আশে পাশে যারা কাজ করিতেছিল তারা হাসিয়া বাঁচে না।

গালের আলকাতরা মুছিতে মুছিতে মতি ভাবিতে থাকে কাশীবাবুর কাছে গিয়া নালিশ জানাইবে কি না। কিন্তু গাঁটে লেখা হয় নাই বলিয়া কাশীবাবু নিজেই যদি চটিয়া থাকেন, নালিশ জানাইয়া লাভ কি হইবে? কাশীবাবু হয়তো অন্য গালে আলকাতরা মাখাইয়া দিবেন।

কিন্তু এই গাঁটগুলি কোথায় ছিল কাল ? এখানে যে ছিল না মতির তাতে সন্দেহ নাই, এতকাল সে এ কাজ করিতেছে একেবারে কুড়িটা গাঁট বাদ পড়িবার মত ভুল কি তার হইতে পারে? তাছাড়া, কালই যদি গাঁটগুলি চালান দিবার এত বেশী দরকার ছিল, আগে এইগুলিতে লিখিবার জন্য তাকে নিশ্চয় বলিয়া দেওয়া হইত—চিরকাল যেমন বলা হইয়াছে। একটু ধাঁধায় পড়িয়া যায় মতি, ব্যাপারটা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। সে কয়েকটা আলকাতরার দাগ আঁকিয়া দেয় নাই বলিয়া একেবারে চালান বরবাদ হইয়া গেল ?

ভাবিতে ভাবিতে সমস্যাটি মতির কাছে জল হইয়া যায়। দোষ তার নয়। হয় কাশীবাবু নয় ভরদ্বাজের গাফিলতিতে কাল গাঁটগুলি চালান দেওয়া হয় নাই এবং চিরদিনের রীতি অনুসারে যারা উপরে থাকে তাদের ঘাড় হইতে পিছলাইয়া দোষটা আসিয়া চাপিয়াছে তার ঘাড়ে। দোষ দিতে ছুতাও তো চাই একটা ? কি চালাক কাশীবাবু আর কি শয়তান ভরদ্বাজ ব্যাটা !

গালে আলকাতরা মাখাইয়া দেওয়ার জন্য একটু রাগ আর একটু দুঃখ মতির হইয়াছিল বৈকি, তবে আঘাত আর অপমান সম্বন্ধে অনুভূতিগুলি তার অনেকটা ভোঁতা হইয়া আসিয়াছে কি না, রাগ দুঃখ অপমান অভিমান খুব সহজেই সে ভুলিয়া যাইতে পারে। এমন কি, আসল ব্যাপারটা বুঝিয়া এবার একটু কৌতুকও মতির বোধ হয়। দোষ ঘাড়ে চাপানোর জন্য এতগুলি লোকের ভিতর হইতে তাকেই বাছিয়া নেওয়া হইয়াছে, এজন্য একটু গর্ব্বও কি মতি বোধ করিতে আরম্ভ করে ?

মেঝে হইতে বুরুষটি তুলিয়া বালতির উপর আড়াআড়িভাবে রাখিয়া গাঁটগুলিতে কি অক্ষর আর কি নম্বর লেখা হইবে তার নমুনা আনিতে ভরদ্বাজের কাছেই মতি যাইবে ভাবিতেছে, সুধীর আসিয়া হাঙ্গামা বাধাইয়া দিল।

প্রথমটা খুব এক চোট হাসিল সুধীর, তারপর ব্যাপারটা শুনিয়া রাগিয়া হইয়া গেল আগুন। খানিক তফাতে কোথা হইতে কি কাজে ভরদ্বাজ কোথায় যাইতেছিল, সুধীর গিয়া তাকে টানিয়া হ্যাঁচড়াইয়া এদিকে নিয়া আসিল, গালাগালি চোটপাট চলিল মিনিটখানেক, তারপর আলকাতরার বালতিটা সুধীর কাত করিয়া দিল ভরদ্বাজের মাথার উপর।

একটা হৈ চৈ বাধিয়া গেল। কাশীবাবু ছুটিয়া আসিল এবং গোলমালের মধ্যে কাশীবাবুর গায়েও কি করিয়া যে আলকাতরা লাগিয়া গেল খানিকটা! ভরদ্বাজের একজন পার্শ্বচরের সঙ্গে তখন সুধীরের মারামারি চলিতেছে এবং আট-দশজন তাদের ছাড়াইবার চেষ্টা করায় মনে হইতেছে মারামারি বুঝি বাধিয়াছে দশ বারজনের মধ্যে। কাশীবাবু কার গালে যেন একটা চড় বসাইয়া দিল। বোধ হয় যাকে সামনে পাইল তারই গাল। ঠিক তার পরেই পিছন দিকে না চাহিয়া একজন দু'পা পিছু হটায় আসিয়া পড়িল একেবারে কাশীবাবুর ঘাড়ে। মনে হইল, একজনের গালে চড় মারার শোধটাই বুঝি আরেকজন নিয়াছে।

গোলমাল থামিবার এক ঘণ্টার মধ্যে মতি, সুধীর এবং আরও আটজন শ্রমিক বরখাস্ত হইয়া গেল। অন্য আটজনের অপরাধ? প্রকাশ্য অপরাধ কারখানার মধ্যে মারামারি করা, যা তারা কেউ করে নাই। ওদের মধ্যে পাঁচ জন তো যেখানে গোলমাল চলিতেছিল তার ধারে কাছেও ছিল না। গোলমাল থামিবার পরে তারা আসিয়াছিল, যোগ দিয়াছিল শুধু জটলায়। কিন্তু কিছুদিন আগে সত্যপ্রিয় মিলে যে ধর্ম্মঘট হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল, সেই সময় এই আট জনের নাম উঠিয়াছিল

মিলের পক্ষে অবাঞ্ছিতদের লিষ্টে। আজকের গণ্ডগোলের সুযোগে মতি আর সুধীরের সঙ্গে এদেরও কাশীবাবু তাড়াইয়া দিল। ওরা মারামারি করে নাই? কাশীবাবু নিজের চোখে ওদের মারামারি করিতে দেখিয়াছে, আলকাতরার জন্ম ভরদ্বাজ চোখের পাতা ভাল করিয়া খুলিতে পারিতেছিল না, তবু সেও দেখিয়াছে, কাশীবাবুর আরও কত পার্শ্বচরও যে দেখিয়াছে তার হিসাব হয় না।

দশজনের কাজ গেল। কাশীবাবুর কড়া হুকুমে মিলের মধ্যে কর্ম্মব্যস্ততা আবার চরমে উঠিয়া গেল, মানুষ আর যন্ত্র সমানে কাজ করিতে লাগিল। কি যেন একটা উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইবে কিন্তু হাতে যথেষ্ট সময় নাই, তাই উর্দ্ধশ্বাসে কাজ করা। এত ব্যস্ততার মধ্যে একটুও আবেগ নাই, ব্যাকুলতা নাই, নাকে মুখে ভাত গুঁজিয়া কারখানার দিকে ছুটিবার সময় একজন মাত্র মানুষের মধ্যে যতখানি আবেগ আর ব্যাকুলতা সৃষ্টি হয়, এখানে এতগুলি মানুষের সমবেত ব্যস্ততার মধ্যে সেটুকু ভাবোচ্ছ্বাসের ছন্দও নাই।

তবু মানুষ তো যন্ত্রের অধীন নয়, যন্ত্রই মানুষের অধীন, প্রভুত্বটা এখনও ঠিক মত আয়ত্ত হয় নাই মানুষের, এই যা আপশোষ। তাই টিফিনের ছুটির সময় কারখানার প্রাঙ্গণে দশ জন বরখাস্ত শ্রমিককে ঘিরিয়া সকলে জটলা করিতে লাগিল, একটু বক্তৃতাও বুঝি করিল দু-একজন। টিফিনের সময় শেষ হওয়ার পরেও জটলা থামিল না। মিলের কাজ বন্ধ হইয়া রহিল। কাশীবাবু ভড়কাইয়া গিয়া ক্রমাগত ফোন করিতে লাগিল হেড অফিসে আর সত্যপ্রিয়ের কাছে।

কিন্তু কিছুতেই এবার ধর্ম্মঘট ঠেকানো গেল না। যে দশজনকে বরখাস্ত করা হইয়াছে তাদের আবার কাজে না নিলে কেহ কাজ করিবে না। হেড অফিসে ফোনটা সত্যপ্রিয়ের কানেই প্রায় লাগান ছিল, সমস্তক্ষণ, মিনিটে মিনিটে খবর যাইতেছিল। মন্তব্য প্রায় কিছুই করিতেছিল না, কেবল শুনিতেছিল। একবার শুধু বলিয়াছিল—ব্যাখ্যা আপনাকে করতে হবে না কাশীবাবু, যা ঘটেছে তাই শুধু বলে যান। না, এখনও পুলিশ ডাকবেন না, আরেকটু দেখা যাক। ভয় পাবেন না মশায়, পুলিশ রেডি হয়েই আছে, ডাকামাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে হাজির হবে। অনাথ পৌঁছয়নি? দেখুন তো।

অনাথ সত্যপ্রিয়ের সেক্রেটারী। কাশীবাবু দেখিয়া আসিয়া জানাইল, অনাথবাবু

ওদের বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু ওরা তাকে কথাই বলতে দিচ্ছে না, হৈচৈ করছে। একজন একটা ঢিল ছুঁড়েছে অনাথবাবুর দিকে, গায়ে লাগে নি।'

জবাবে সত্যপ্রিয় বলিল, আপনি একটি আস্ত গর্দ্দভ কাশীবাবু! ওই দশজনকে দাঙ্গা করার জন্য পুলিশে দিলেই চুকে যেত—বরখাস্ত করে ছেড়ে দিলে ওরা মিলের মধ্যে এসে গোল বাধাবে এটুকু বুঝবার মত বুদ্ধিও আপনার ঘটে নাই? শুধু বরখাস্তই যদি করবেন, এতকাল করতে পারতেন না, সুযোগের জন্য অপেক্ষা করার কি দরকার ছিল?'

'আজ্ঞে অনাথবাবুকে ফোন করলাম, অনাথবাবু বললেন—'

'অনাথ আপনার মতই গাধা। ডেকে আনুন অনাথকে, বুঝিয়ে আর কিছু হবে না। পুলিশকে খবর দিচ্ছি, পুলিশ এলেই মিল খালি করে গেট বন্ধ করে দেবেন।'

সন্ধ্যার পর মতি, সুধীর আর ওই দশজন বরখাস্ত শ্রমিকের সঙ্গে প্রায় শ'দুই শ্রমিক যশোদার বাড়ীতে আসিয়া হাজির। উঠানে স্থান হইল ত্রিশ পঁয়ত্রিশজনের, বাকী সকলে সরু গলিটুকুর মধ্যে গাদাগাদি করিয়া আর গলির মোড়ে রাস্তায় ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সুধীর খুব লাফালাফি করিতেছিল, যশোদার ধমকে থামিয়া গেল। খুন্তি হাতে রান্না ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া প্রথমে যশোদা একরকম হুড়মুড় করিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়ার জন্য একচোট গালাগালি দিল সকলকে, তারপর মন দিয়া ব্যাপারটা সব শুনিল, তারপর আবার গালাগালি দিয়া বলিল, 'তোমরা সবাই পাঁঠা, এক ফোঁটা বুদ্ধি নেই তোমাদের কারু ঘটে। দল বেঁধে হল্লা করলেই হবে? দু'নম্বর মিলে ছুটে যেতে পারলে না সবাই মিলে, সেখানেও ধর্ম্মোঘট করাতে পারলে না?'

'তাইতো বটে,—এটা তো খেয়াল হয় নাই কারো। কি করা যায় এখন?'

'কি আবার করবে? পাঁচ দশজন মিলে খুঁজে খুঁজে বার করগে দু'নম্বরের যতজনকে পার। কাল ভোর না হতে তোমরা সবাই গিয়ে দু'নম্বরে ধর্ণা দেবে। এবার ভাগো সবাই আমার বাড়ী থেকে, দম আটকে মারবে নাকি?'

বাছিয়া বাছিয়া কয়েকজনকে একটু বসিয়া যাইতে বলিয়া বাকী সকলকে যশোদা বাড়ীর বাহির করিয়া দিল। তারপর ওই বাছা বাছা কয়েকজনের সঙ্গে পরামর্শ করিল দু'ঘন্টা ধরিয়া।

পরদিন দুপুরবেলা ডাক আসিল যশোদার, মিলে মজলিস বসিয়াছে, একবার যাইতে হইবে যশোদাকে। কাশীবাবু নিজে গাড়ী নিয়া আসিয়াছে।

'আমি গিয়ে কি করব ?'

'আপনি মাতিয়ে দিয়েছেন ওদের, আপনি না গেলে ওরা কারও কথা শুনবে না।'

যশোদা উদাসভাবে বলিল, 'ওদের দাবী মিটিয়ে দিলেই কথা শুনবে।'

সেই তো সমস্যা দাঁড়াইয়াছে এখন। ইতিমধ্যে শ্রমিকদের দাবী বাড়িয়া গিয়াছে, দশজন বরখাস্ত শ্রমিককে ফিরাইয়া নিলেই আর চলিবে না, আগের বার যে সব দাবী উপলক্ষে ধর্ম্মঘট বাধিবার উপক্রম হইয়াছিল সেই গুলিও মিটাইয়া দেওয়া চাই।

'আপনার পরামর্শে এটা হয়েছে।'

'আমার পরামর্শ কি ওরা শোনে ? শুনলে কি আর এ দুর্দ্দশা হয় ওদের ? কত বলি যে কাজ কর্ম্মো যখন থাকে, পয়সা জমা দুটো, অসময়ে কাজে লাগবে। কানেও তোলে না কেউ আমার কথা।'

গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়া গম্ভীরভাবে যশোদা মাথা নাড়ে, 'কথায় বলে না অভাবে স্বভাব নষ্ট, তাই হয়েছে ওদের। মজুরী হাতে পেলেই আর ছেঁড়া ন্যাকড়াটি পরা চলবে না, নতুন একটি কাপড় কেনা চাই। একটি গামছা কেনা চাই, জলপানি খাওয়া চাই, গায়ে তেল মাখা চাই—'

যশোদা তামাসা করিতেছে কিনা কাশীবাবু ঠিক বুঝিতে পারে না, দ্বিধাভরে বলে, 'তাড়ি খেয়ে খেয়েই ওদের যত দুর্দ্দশা।'

তাড়ি খেয়ে ? তাড়ি না খেলে ওরা বাঁচত ? খাওয়ার মধ্যে খায় তো শুধু একটু তাড়ি, নয়তো একটু দিশী, তও যদি না খাবে, খিদে-তেষ্টা মিটবে কিসে ?' শুনিয়া সেই যে কাশীবাবু চুপ করিয়া গেল, আর কথাটি বলিল না। মিলের সামনে পাঁচ ছ'শ শ্রমিক এলোমেলোভাবে ভিড় করিয়া আছে, যশোদাকে দেখিয়া তাদের কি উৎসাহ। ধর্ম্মঘটের চেয়ে আজ সারাদিন যশোদার কথাই তারা বেশী আলোচনা করিয়াছে। মুখে মুখে কত কথাই যে রটিয়াছে যশোদার সম্বন্ধে!

মিলের ভিতরে আপিসঘরে বৈঠক বসিয়াছে। বৈঠকে অনাথ, হেড অফিসের আরও দু'জন বড় কর্ম্মচারি এবং শ্রমিক সমিতির দু'জন প্রতিনিধি আছে।

একটি চেয়ারে যশোদাকে বসিতে দেওয়া হইল। এমন অস্বস্তি যশোদা জীবনে কখনও ভোগ করে নাই। তারপর কত কথা আর কত আলোচনাই যে আরম্ভ হইল, যশোদা কিন্তু শুনিল বেশী, কথা বলিল কম।

শ্রমিক সমিতির একজন প্রতিনিধি অনুযোগ দিয়া বলিল, 'আমাদের না জানিয়ে ধর্ম্মঘট আরম্ভ করা কি আপনার উচিত হয়েছে ?'

যশোদা বলিল, 'ধর্ম্মঘট আরম্ভ করার ধ-ও জানি না আমি। সে হোক্, শেষ পর্য্যন্ত আপনারা তো জেনেছেন ?'

কিন্তু এরকম জানায় তারা খুসী নয়, শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট করিয়াছে বটে, ধর্ম্মঘটটা আসলে যেন যশোদার। এতক্ষণ আলোচনা করিয়া একটা মিটমাট হইয়াছিল, শ্রমিক সমিতি মীমাংসাটা মানিয়া লইয়াছে, কিন্তু শ্রমিকরা মানিতে চাহিতেছে না। এভাবে ডিসিপ্লিন নষ্ট হইলে—

মীমাংসাটা কি হইয়াছে? দশজনের মধ্যে ন'জন বরখাস্ত শ্রমিককে ফিরাইয়া নেওয়া হইবে, আরও পঁচিশজন নূতন শ্রমিক নিয়া কাজের চাপ কমানো হইবে, কিন্তু কাজের সময় আর মজুরী সম্বন্ধে অন্য যে দাবী করা হইয়াছে, সেগুলি মেটানো হইবে না।

শুনিয়া যশোদা বলিল, 'তবে তো খুব হ'ল !'

তবু এই মীমাংসাই যশোদা মানিয়া নিল, নতুন লোকের সংখ্যাটা কেবল পঁচিশ হইতে চল্লিশে উঠিল এবং ঠিক হইল এর মধ্যে ত্রিশজনকে যশোদা ঠিক করিয়া দিবে। মানিয়া নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। যশোদা জানিত এ ধর্ম্মঘট টিকিবে না, বড় অসময়ে ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইয়াছে, ঝোঁকটা কাটিয়া গেলেই অনেকে কাজে যোগ দিতে চাহিবে, অনেকে নিরুপায় হইয়া কাজে যোগ দিবে। যশোদা তো জানে ওদের অবস্থা।

'দশজনের মধ্যে বাদ যাবে কে ?'

অনাথ বলিল, 'সুধীর। ওকে নেওয়া চলে না। আমাদেরও তো প্রেষ্টিজ আছে একটা। প্রেষ্টিজ মানে—'

যশোদা একটু হাসিল। প্রেষ্টিজ শব্দটা এতবেশী কানে আসে!

যশোদা সর্ত্ত মানিয়া নেওয়ামাত্র অনাথ ফোনটা তুলিয়া নিল। সত্যপ্রিয় সংবাদের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। সত্যপ্রিয় মিলে আসে নাই, কোনদিন

এসব ব্যাপারের ধারে কাছেও সে আসে না, শ্রমিকদের সে বড় ভয় করে। সেই তো মালিক মিলের, উত্তেজিত অবস্থায় সকলে মিলিয়া তাকে যদি আক্রমণ করে, যদি প্রথমে গায়ের জামা-কাপড় টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া তারপর তার দেহটাকে ছিঁড়িতে আরম্ভ করে ঠিক ওইভাবে? এই কল্পনা আর সেই সঙ্গে গভীর একটা আতঙ্ক সত্যপ্রিয়ের মনে স্থায়ীভাবে বাসা বাঁধিয়া আছে।

রাত্রে সকলে খাইয়া গেল, সুধীর আসে না। নন্দকে ডাকিয়া পাঠান হইল তবু আসে না। সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিয়া সে ছাতে গিয়া গুম খাইয়া বসিয়া আছে। শেষে যশোদা নিজেই ডাকিতে গেল।

যশোদা কাছে আসিয়া দাঁড়ানো মাত্র, সুধীর গট গট করিয়া নামিয়া গেল নীচে। কিন্তু যশোদাও ছাড়িবার মেয়ে নয়, সেও পিছু পিছু ধাওয়া করিয়া সুধীরকে পাকড়াও করিল তার ঘরে।

'ভাত খাবে না?'

সুধীর কথা বলে না. চৌকীতে বসিয়া চুপচাপ দেয়ালের দিকে চাহিয়া থাকে, যেখানে একটা টিকটিকির লেজ শিকার করিবার উত্তেজনায় এ-পাশ ও-পাশ নড়িতেছিল। সহজ রাগটা সুধীরের হইয়াছে যশোদার উপর। আজ সকালে যে যশোদার দরদের পরিচয়ে তার মাথা প্রায় ঘুরিয়া গিয়াছিল, সেই যশোদাই শেষ পর্য্যন্ত তার এমন সর্ব্বনাশ করিল।

দশজনের মধ্যে আর সকলকে ফিরাইয়া নেওয়া হইল, বাদ পড়িল শুধু সে। মতির হইয়া সে লড়াই করিয়াছে. মতির কাজটা পর্য্যন্ত বজায় রহিল, বরখাস্ত করা হইল একা তাকে।

'মাথা গরম ক'রো না বাবু ছেলেমানুষের মত। মাথা গরম করে কাজটির মাথা তো খেলে নিজের।' খোঁচা না দিলে সুধীরের মুখ খুলিবে না জানিয়াই যশোদা খোঁচা দিয়া কথা বলে। সুধীর মুখ ফিরাইয়া বলে 'আমি খেলাম না তুমি খেলে?'

'মারামারি করলে তুমি, চাকরী খেলাম আমি? বেশ তো বিচার তোমার বাবু?'

যশোদা হাসে, গলা নামাইয়া গোপন কথা বলার মত সুরে বলে, 'তবে

কি জান, শুনে আমি বড় খুসী হয়েছি—সত্যি বলছি তোমায়। মতি চুপচাপ সয়ে গেল কথাটি কইলো না, ছিছি, ওটা কি মানুষ? ভীরু অপদার্থ ওটা। তোমার সাহস আছে, তুমি তাই রুখে দাঁড়ালে—আর কেউ পরের অপমান গায়ে মেখে নিত অমনি করে?'

শুনিতে শুনিতে বাতাসে মেঘ উড়িয়া যাওয়ার মত সুধীরের মুখের উপর হইতে রাগ দুঃখ অভিমানের ছায়া মিলাইয়া যাইতে থাকে। একটু নরম গলায় সে বলে, 'তুমি বললেই ওরা আমায় রাখত।'

'তাতে লাভটা কি হ'ত বল? এরপর ওখানে আর কাজ করতে পারতে তুমি? ও কাজ গেছে যাক—আমি তোমায় ভাল কাজ জুটিয়ে দেব। বেশী মাইনে, কম খাটুনি। মানুষের মত তেজ আর বুকের পাটা কটা লোকের থাকে? তোমার তো আছে জেনে ভাবলাম তুমি আরও ভাল কাজের যুগ্যি—এইসব ভেবে আর বললাম না তোমায় ফিরিয়ে নিতে।'

বড় শ্রান্তি বোধ হইতেছিল যশোদার। যতবড় শরীর হোক, সহ্যের তো একটা সীমা আছে? ঘরের কাজে যশোদাকে যে সাহায্য করিতে আসে, অসুখ হইয়া তিনদিন সে আসে নাই। ঘরে বাহিরে কি খাটুনি আর হাঙ্গামাই তাকে পোয়াইতে হইতেছে। তার উপর আবার এই বোকা হাবা ধাড়ী শিশুকে বুঝাইয়া শান্ত করিবার দায়িত্বটা পর্য্যন্ত তার। চৌকীর এক পাশে বসিয়া হাই তুলিয়া যশোদা আবার বলে, 'কাজ গিয়ে শাপে বর হ'ল তোমার।'

সুধীর অভিভূত হইয়া যশোদাকে দেখিতে থাকে, সে দৃষ্টিতে অন্য কারও হয়তো রোমাঞ্চ হইত, যশোদা দেখিয়াও দেখে না। আবার হাই তুলিয়া বলে, 'এবার ভাত খাবে চল—দু'টি খেয়ে নিয়ে রেহাই দাও আমায়।'

সুধীর মিনতি করিয়া বলে, 'একটু বোসো চাঁদের মা, একটু গল্প করি তোমার সঙ্গে।'

'কি বললে? গল্প? বসে বসে গল্প করবো তোমার সঙ্গে? খাবে তো খেয়ে যাও সুধীর, নয় তো উপোসে রাত কাটিবে বলে রাখলাম।'

তিন

প্রচার বিভাগটা সত্যপ্রিয়ের ব্যবসার উন্নতির নাম করিয়াই খোলা হইয়াছে বটে, বড় বড় বিজ্ঞাপনও দেওয়া হইতেছে সত্য, কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ের আসল কাজ সত্যপ্রিয়ের নাম ও মত প্রচার করা। সত্যপ্রিয়ের এমন ব্যবসা নয় যে পেটেন্ট ওষুধের মত তার জন্য বিজ্ঞাপন দিয়া দেশ ছাইয়া ফেলা প্রয়োজন, সাময়িকপত্রে সত্যপ্রিয়ের প্রবন্ধ আর বক্তৃতার রিপোর্ট প্রকাশ করিবার মূল্যস্বরূপ বিজ্ঞাপনগুলির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সত্যপ্রিয়ের প্রত্যেক প্রবন্ধ আর বক্তৃতায় ভারতবর্ষের শোচনীয় অধঃপতনের জন্য কি হা-হুতাশটাই থাকে আর সমাজ, ধর্ম্ম ও দেশকে সুনিশ্চিত সর্ব্বনাশের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য কি ব্যাকুলতাটাই প্রকাশ পায়—তবু যে প্রবন্ধ আর বক্তৃতার রিপোর্ট প্রকাশ করিবার জন্য প্রকারান্তরে মূল্যের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে, এও কি দেশের অধঃপতনের একটা জলন্ত দৃষ্টান্ত নয়! কেবল কি তাই? কতগুলি কাগজ আছে মূল্য দিয়াও তাদের বাগান যায় না।

'এসব পাগলামি আমাদের কাগজে ছাপান চলবে না মশায়।'

'ঠিক পাগলামি নয়, একটু খাপছাড়া মতামত আছে মাঝে মাঝে, সেটা মিথ্যা নয়। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে কি জানেন, লেখাটা না ছাপলে উনি হয় তো চটে যাবেন, বিজ্ঞাপনের কন্ট্রাক্টটা—' একটু হাসে জ্যোতির্ম্ময়—'বোঝেন তো সব? যার যেদিকে খেয়াল চাপে। তা ছাড়া, ওঁর নাম দিয়ে ছাপা হবে, মতামতের দায়িত্ব তো আপনাদের নয়।'

'মতামতের দায়িত্ব না থাক, মতটা প্রচারের দায়িত্ব তো আছে? দেশের জন্য যারা জীবন উৎসর্গ করেছেন, অর্দ্ধেক জীবন জেলে কাটিয়েছেন, তাঁরা সবাই ভুল করে দেশকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন সর্ব্বনাশের দিকে, আর টাকার গদীতে শুয়ে আপনারা পাগলা জগাই আবিষ্কার করছেন দেশোদ্ধারের একমাত্র উপায়। দু'জায়গায় লিখেছেন, গবর্ণমেন্টের সঙ্গে বিবাদ করা অন্যায়, আরেক জায়গায় লিখেছেন, প্রকৃতির নিয়মে যখন যে জাতি রাজপদে অধিষ্ঠান করে তাদের প্রাপ্য রাজ-সম্মান না দিলে দেশের কখনও উন্নতি হবে না! রাজার জাতিকে রাজ-সম্মান দিতে থাকলে প্রকৃতির নিয়মে আমরা একদিন নিজেরাই

রাজার জাত হতে পারব, নয় তো কোনদিন পারব না। এসব কোন্ দেশী কথা মশাই?'

'যুক্তিও তো দিয়েছেন।'

'যুক্তি? অমন যুক্তি আমরাও দিতে পারি শুনবেন? দেয়ালটা শাদা দেখছেন তো? আপনি ভুল দেখছেন। বিজ্ঞানে বলে, সবগুলি রঙ মিশে শাদা হয়, বিজ্ঞান অবশ্য সত্যকে বিকৃত করে দেখে, আপনি যদি বেদের সপ্তম অধ্যায়টা পাঠ করেন, দেখবেন সেখানে লেখা আছে সমস্তই অস্থায়ী। সুতরাং রঙ মিশে শাদা হয়নি, রঙগুলি অস্থায়ী বলে সাদা দেখায়—চোখের ভুল। এবার দেখতে পাচ্ছেন দেয়ালের রঙটা লাল? এই নীল হয়ে গেল, এই আবার সবুজ হ'ল, দেখতে দেখতে হলদে হয়ে গেল—'

তামাটে মুখ প্রায় কালো করিয়া জ্যোতির্ম্ময়কে ফিরিতে হইয়াছে। কিন্তু উপায় কি? তবু তাকে চেষ্টা করিতে হয়, চাকরী তো বজায় রাখিতে হইবে?

বন্ধুদের কাছে জ্যোতির্ম্ময় অনুচ্চারিত অভিযোগের জবাব দিবার মত সবিনয়ে বলে, 'ব্যাপারটা কি জান? সকলের হ'ল দলাদলি মাতামাতি নিয়ে কারবার, কর্ত্তার মতামত প্রচলিত মতামতের বিরোধী। তাছাড়া, কর্ত্তা বড়ই তেজস্বী আর স্বাধীনচেতা পুরুষ,—এইজন্য কর্ত্তাকে অনেকে পছন্দ করে না।'

অপরাধ কার, সে নিজে কেন অপরাধী সাজিয়া থাকে, জ্যোতির্ম্ময় বুঝিতে পারে না। তবুও সত্যপ্রিয়কে যারা মহাপুরুষ বলিয়া স্বীকার করে না, সত্যপ্রিয়ের মতামত নিয়া হাসাহাসি করে নিজেদের মধ্যে, তাদের কাছে কেমন যেন ছোট মনে হয় নিজেকে।

জ্যোতির্ম্ময়কে সত্যপ্রিয়ের সব সময়েই প্রায় দরকার হয়। কেবল আপিসে কাজ করিয়াই তার রেহাই নাই, সকালে ও সন্ধ্যায় প্রায়ই বাগানবাড়ীতে ছুটিতে হয়, ছুটির দিনগুলিও অধিকাংশই বাগানবাড়ীতে কাটে। হয়তো ঘণ্টাখানেক সত্যপ্রিয় তার সঙ্গে কাজের কথা বলে, বাকী সময়টা অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। তবে অসময়ে খাওয়ার জন্য বাড়ীতে জ্যোতির্ম্ময়কে ছুটিতে হয় না, খাওয়াটা সত্যপ্রিয়ের ওখানেই হয়। মানুষজনকে খাওয়ানো সম্বন্ধে সত্যপ্রিয় বড়ই উদার। হয়তো সত্যপ্রিয়ের ধারণা আছে, মানুষকে দিয়া গুণ গাওয়ানোর একটা খুব সহজ উপায় মানুষকে ঠাসিয়া নুন খাওয়ানো।

চাকরী জ্যোতির্ম্ময়কে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। মুখে সে বলে বটে যে, খাটিতে খাটিতে প্রাণ গেল, এত খাটুনি মানুষের সহ্য হয় না,—বাড়ীর চেয়ে আপিসে থাকিতেই সে ভালবাসে, বাড়ীর লোকের ভাবনা ভাবার চেয়ে কাজের ভাবনা ভাবিতেই তার আরাম বোধ হয় বেশী। অনেক বয়সে বিবাহ করিলে লোকে নাকি একটু বৌ-পাগলা হয়, জ্যোতির্ম্ময়েরও হয়তো এরকম পাগলামি একটু আসিয়াছে, কিন্তু সেটা প্রকাশ পায় রাত্রে শয্যা গ্রহণ করিবার সময়, যখন আর কোন কাজ করিবার থাকে না, আর কিছু ভাবিবার থাকে না। আগে বিশ্রাম ছিল শুধু ঘুম, এখন জুটিয়াছে পুতুল নিয়া খেলা করার আমোদ, —অপরিপুষ্ট ও অপরিণত অপরাজিতার বিবর্ণ মুখ ও উৎসুক দৃষ্টি শ্রান্তি দূর করিতে সাহায্য করে। সারাদিন মনের রাশ টানিয়া রাখিবার পর আলগা দেওয়া মাত্র প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয় প্রচণ্ডভাবে, মনের একটা সাময়িক বিকারের মত। কি যে সে করে অপরাজিতাকে নিয়া আর কি যে করে না, কিছুই ঠিক থাকে না। কথা শুনিতে শুনিতে অপরাজিতার মাথা ঘুরিয়া যায়, আদরে সোহাগে দম আটকাইয়া আসে,—শান্ত, সহিষ্ণু ও অন্যমনস্ক মানুষটার আকস্মিক প্রণয়মূলক উন্মত্ততার ভয়ে তার বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করিতে থাকে। কোন-দিন তার মূর্চ্ছা হওয়ার উপক্রম হয়, ফ্যাকাসে মুখে চটচটে ঘাম দেখা দেয়, চোখ স্তিমিত হইয়া আসে। জ্যোতির্ম্ময় খেয়ালও করে না অপরাজিতার মুখে একটি কথা নাই, আধমরা মানুষের মত সে শিথিল হইয়া গিয়াছে। এক গ্লাস জল দিতে বলিলে সে যে নাড়িতেছে না সেটা দুষ্টামিও নয়, অবাধ্যতাও নয়, আলস্যও নয়। আপিসের পিয়ন কথা না শুনিলে জ্যোতির্ম্ময় যেমন বিরক্ত হয়, অপরাজিতার উপর তার তেমনি বিরক্তি জাগে। নেহাৎ ভদ্রলোক বলিয়াই আপিসের পিয়নের মত বৌকে গালাগালি করে না, মৃদু অনুযোগ ও উপদেশ দিতে দিতে ঘুমাইয়া পড়ে।

অপরাজিতার গা এলানো নিৰ্ব্বাক শিথিল ভাবটা জ্যোতির্ম্ময় যে অসুস্থ দেহ-মনের দুর্ব্বলতার লক্ষণ বলিয়া চিনিতে পারে না, হয়তো তার আরও একটা কারণ আছে। মাঝে মাঝে আপরাজিতাও ক্ষেপিয়া যায়, কি অফুরন্তই মনে হয় সেদিন তার জীবনীশক্তি। গল গল করিয়া ক্রমাগত কথা বলিয়া যায়, অপরিমিত হাসে, প্রাণহীন জড়বস্তুর মত কেবল সোহাগ গ্রহণ করার বদলে সোহাগের বন্যায়

স্বামীকে একেবারে ভাসাইয়া দিবার চেষ্টা করে, এমন লজ্জাহীন বেহায়ার মত আচরণ করে যে, জ্যোতির্ময় প্রায় স্তম্ভিত হইয়া যায়। আবেগের আতিশয্যে কোনদিন নিজের চুল টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবার উপক্রম করে; অস্বাভাবিক ফর্সা মুখখানা তাহার দেখায় রক্তবর্ণ, চোখ হইয়া থাকে বিস্ফারিত।

পরিসমাপ্তিটাই জ্যোতির্ময়কে সবচেয়ে বেশী বিব্রত করে। অকারণে কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া অপরাজিতা বলিতে থাকে, 'লোকে বৌকে কত ভালবাসে, তুমি আমায় একটুও ভালবাস না।' কিছুতেই কি সে থামে! জ্যোতির্ময় যতই বুঝাইবার চেষ্টা করে যে, অন্য যত স্বামী আছে পৃথিবীতে তাদের সকলের চেয়ে সেই বেশী ভালবাসে তার বৌকে, অপরাজিতা তত বেশী কাঁদে আর তত বেশী অনুযোগ করে।

পরদিন নটা দশটার আগে কোনমতে অপরাজিতাকে তোলা যায় না, সুবর্ণ গিয়া জাগাইয়া দিলেও তার হাত ছুঁড়িয়া দিয়া পাশ ফিরিয়া তৎক্ষণাৎ আবার ঘুমাইয়া পড়ে। ঘুম যখন ভাঙ্গে, বুঝিতে যখন পারে, সে কে এবং কোথায় আছে, তাড়াতাড়ি উঠিতে গিয়া মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হয়। কোন রকমে সে নীচে যায়, লজ্জায় ভয়ে কাঠ হইয়া থাকে। অন্য সময়, অন্য অবস্থায়, অন্য লোক তার মুখ আর কালিপড়া চোখ দেখিয়াই তৎক্ষণাৎ হয়তো তাকে বিছানায় ফেরত পাঠাইয়া তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকিয়া আনিত, কিন্তু এসময়, এ অবস্থায়, এ বাড়ীতে কে অনুমান করিবে অসুখের ঝড়েই একরাত্রে মেয়েটার অবস্থা হইয়াছে দুমড়ানো মোচড়ানো চাবার মত? প্রতিদিনকার মত কালও সে নিয়মিত খাইয়া-দাইয়া ঘরে গিয়াছিল, কাল বরং অন্যদিনের চেয়ে তাকে মনে হইয়াছিল একটু বেশী সজীব আর হাসি-খুসী। তা ছাড়া, অনেক রাত্রে তার হাসি আর কথার শব্দও তো বাড়ীর লোকের কানে আসিয়াছে কিছু কিছু।

তাই সুধীরা মুখ বাঁকাইয়া শুধু বলে, 'হুঁঃ।' আর সুবর্ণ কেবলি মুচকি মুচকি হাসে, আড়ালে ডাকিয়া নিয়া গত রজনীর ইতিহাস সব না হোক কিছু শুনিবার জন্য কেবলি খোঁচায়, তোষামোদ করে আর কেবলি ভয় দেখায়, 'না যদি বল বৌদি, আমার বিয়ে হলে একটি কথা তোমায় বলব না।'

জ্যোতির্ময় কিছু ত্মাখেও না, বলেও না। ঘুম ভাঙ্গিবার পর আর

অপরাজিতার দিকে তাকানোর অবসর তার হয় না। কত দায়িত্ব তার, কত দুশ্চিন্তা! মন পড়িয়া থাকে আপিসের দিকে। অপরাজিতা উঠিবার আগেই হয়তো সে বাহির হইয়া যায়।

হেড আপিসটি বেশ বড়, কয়েকটি বিভাগ আছে, শ'চারেক লোক কাজ করে। জ্যোতির্ম্ময়ের আপিস যে ঘরে তার মাঝামাঝি মানুষ-সমান উঁচু কাঠের পার্টিসন তুলিয়া দু'ভাগে ভাগ করিয়া ফেলা হইয়াছে, একভাগে জ্যোতির্ম্ময় বসে, অন্যভাগে অনাথের বড়শালা কেষ্টবাবু। কেষ্টবাবুর কাজটা যে ঠিক কি, এত কাছাকাছি থাকিয়া এতদিনেও জ্যোতির্ম্ময় ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। এককালে স্বদেশী করিত, অনেকগুলি স্বদেশী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগ ছিল, সভা-সমিতি ও নেতাদের মজলিসে সব সময়েই প্রায় তাকে দেখা যাইত। কেবল, জেলে যাওয়ার আশঙ্কা আছে এমন কোন বিপজ্জনক সম্ভাবনার সময় আর তার পাত্তা মিলিত না। প্রৌঢ় বয়সে বোধ হয় কতকটা দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করার পুরস্কার স্বরূপ আর কতকটা অনাথের খাতিরে এখানে একটা চাকরী পাইয়া এখন একটু আরাম করিতেছে। শ্রোতা পাইলেই নিজেদের গৌরবময় অতীত জীবনের গল্প আরম্ভ করে, সগর্ব্বে বলে, ছেড়ে দিয়ে এলাম সাধে? আর সইল না মশায়। ওরা সব ক'টা হামবড়া, কেবল দলাদলি আর নিজে কি করে বড় হবে সেই চেষ্টা। চক্রোত্তিমশায়ের কথাই ঠিক, ওরাই দেশের সর্ব্বনাশ করছে।' শ্রোতা না পাইলে টেবিলের সামনে মুখ গম্ভীর করিয়া বসিয়া থাকে, মাঝে মাঝে ফোনটা তুলিয়া নিয়া কথা বলে, আর যখন তখন নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীদের মধ্যে একে ওকে ডাকিয়া অর্থহীন প্রশ্ন করে এবং উপদেশ ও ধমক দেয়। এইসব পরিশ্রমের কাজ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে সত্যপ্রিয়ের দামী মোটর আপিসের সামনে আসিয়া দাঁড়ানোমাত্র তাকে ডাকিয়া দিবার জন্য পিয়ন পাঁচুকে সতর্ক করিয়া দিয়া টেবিলে পা তুলিয়া একটু ঘুমোয়।

ঘুমানোর আগে হয়তো জোর গলায় জিজ্ঞাসা করে, 'কি করছেন জ্যোতির্ম্ময়-বাবু?'

'প্রুফ দেখছি।'

'চক্কোত্তিমশায়ের নতুন প্রবন্ধটার প্রুফ? সংস্কৃত কোটেশনগুলি ভাল করে মিলিয়ে দেখবেন কিন্তু অনেক খুঁজেপেতে বার করেছি।'

জ্যোতির্ম্ময় জবাব দেয় না। প্রবন্ধগুলিতে সংস্কৃত সাহিত্যে সত্যপ্রিয়ের অগাধ পাণ্ডিত্যের যে পরিচয় থাকে, তার উৎস যে কেষ্টবাবু নয়, কেষ্টবাবু শুধু সত্যপ্রিয়ের কোন বিষয়ে কি ধরণের শাস্ত্রীয় বাক্য প্রয়োজন জানিয়া নিয়া কয়েকজন আসল পণ্ডিতের কাছ হইতে সেগুলি সংগ্রহ করিয়া আনে, জ্যোতির্ম্ময়ের তা জানা আছে। তবু মোটামুটি সংস্কৃত জানা থাকায় সংগ্রহের কাজটা কেষ্টবাবু করে এবং করিতে পারে বলিয়া লোকটার উপর জ্যোতির্ম্ময় বড়ই ঈর্ষা বোধ করে।

পিছনের ঘরখানা খাতাপত্রের গুদাম। আপিস-ঘরে ঢুকিলেই জ্যোতির্ম্ময় পুরাণো কাগজের সোঁদা গন্ধ পায়—কয়েক বছর নাকে লাগিতে লাগিতে সবদিন গন্ধটা সে আজকাল সচেতনভাবে অনুভব করিতে পারে না, কিন্তু অভ্যস্ত আবেষ্টনীর আরামটা সঙ্গে সঙ্গে বোধ করে। টেবিলের উপর বাঁধান খাতা, ফাইল, কাগজপত্র, অভিধান পর্য্যায়ের কয়েকটি ইংরাজী বাংলা বই, কতকগুলি মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা, আজকের তারিখের সাত-আটখানা ইংরাজী বাংলা ছোটবড় সংবাদপত্র, কাগজচাপার তলে কয়েকটি প্রুফ, কাঁচের দোয়াতদান, ব্লটিংপ্যাড, কলিংবেল, পিনকুশন এই সমস্ত খুঁটিনাটির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত যেন চোখের পলকে অনুভব করিয়া সে খুসী হইয়া ওঠে।

নিজের রাজ্য পরিদর্শনরত রাজার মতই তৃপ্তিভরা এক অপরূপ গাম্ভীর্য্য তার গোলগাল মুখখানিতে ফুটিয়া ওঠে। নূতন ও পুরাতন চেয়ারগুলি, এক কোণে বইভরা বুক সেল্‌ফ ও অন্য কোণে বাদামী কাগজে বাঁধান পাহাড় সমান পুরাতন সংবাদপত্রের ফাইল এ সমস্ত যে তাকে ঘিরিয়া আছে কাজ করিতে করিতেও সে যেন মাঝে মাঝে তা অনুভব করিতে পারে। কাজের সময় এবং অন্য সময়েও, অনুভব করিতে পারে না কেবল পার্টিসনটার ওপাশে কেষ্টবাবুর অস্তিত্ব। বোধ হয় কেষ্টবাবুর উপর তার রাগ আছে বলিয়া।

নন্দকে জ্যোতির্ম্ময় একটি চাকরী দিয়াছে, সত্যপ্রিয় মিলে ধর্ম্মঘটের কিছুদিন পরেই। যশোদার আর ইচ্ছা ছিল না নন্দ এখানে চাকরী করে, ধর্ম্মঘটের

সঙ্গে সে যে ভাবে জড়াইয়া পড়িয়াছিল তারপর তার ভাইকে এখানে চাকরী করিতে দেওয়াটা একটু খারাপ দেখায়। কিন্তু এদিকে ভাইটাও তার দিন দিন বড়ই বখাটে হইয়া যাইতেছে। গানবাজনা করিয়া আর তাস পিটাইয়া অলস বেকার জীবন যাপন করিতে করিতে অমানুষ হইয়া পড়িতেছে দিন দিন। যশোদার নিজের হাতে মানুষ করা ছেলে, সেই ছেলের চোখে কি না মাঝে মাঝে ধরা পড়িতেছে ভাবাবেশে ঢুল ঢুল চাউনি! বারণ তাই যশোদা করে নাই। সত্যপ্রিয় মিলের কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে ঝগড়া তো তার হয় নাই, এমন আর কি খারাপ দেখাইবে তার ভাই সত্যপ্রিয়ের আপিসে সামান্য মাহিনায় কাজ করিলে। বাস্তব জগতের সংস্পর্শে একটু আসুক নন্দ, নরম মনটা তার গলিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে, একটু শক্ত হোক।

'একটা ছোটখাট দোকান করে দি, তাই চালা তুই নন্দ, কেমন?'

'না দিদি। চাকরীই করি।'

তা করিবে না? চাকরী ছাড়া আর কিইবা করিবার ক্ষমতা তোমার আছে!

নন্দর কাজটা জ্যোতির্ম্ময়কে সাহায্য করা। সহকারী সে নয়, সাহায্যকারী। নানা ঠিকানায় যেসব চিঠিপত্র পুস্তিকা প্রভৃতি যায় তার উপর ঠিকানা লেখা, কোথায় কি পাঠান হইল সেটা খাতায় টুকিয়া রাখা, যেখানে জ্যোতির্ম্ময়ের নিজে না গেলেও চলে অথচ পিয়ন পাঠান যায় না সেখানে ছুটাছুটি করা, জ্যোতির্ম্ময়ের প্রয়োজন মত হাতের কাছে এটা ওটা আগাইয়া দেওয়া, এই ধরণের সব ছোট ছোট সাধারণ কাজ। এই কাজ পাইয়া নন্দ কিন্তু ভারি খুসী। সে চাকরী করে কেবল এই জন্যই তার গর্ব্বের সীমা নাই, তার উপর জীবনের হঠাৎ একটা অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কি একটা অজানা রহস্যময় জগতে সে আসিয়া পড়িয়াছে যেখানে চলাফেরা ওঠাবসা কথা বলা চুপ করিয়া থাকা সব কিছুরই নিয়ম নতুন!

এককোণে ছোট একটি টেবিল তার রাজ্য। জ্যোতির্ম্ময়ের টেবিলের তুলনায় তার টেবিলটিকে অবশ্য দেখায় সমৃদ্ধিশালী সাম্রাজ্যের কাছে জংলী দেশের জমিদারীর মত, তবু মোটা মোটা খাতা, দোয়াতদান, ব্লটিংপ্যাড, পিনকুশন এসব সম্পদপূর্ণ এমন একটি সম্পত্তিই বা নন্দের কবে ছিল। অতি যত্নে নন্দ সব সাজাইয়া গুছাইয়া রাখে, মসৃণ ও সমতল করিয়া লাল নীল পেন্সিলের

দু'টি মুখ কাটে, লাল কালির কলম ভুলিয়াও কখনও কালো কালিতে ডুবায় না, খাতার কাগজে লিখিবার সময় ধরিয়া ধরিয়া সাবধানে লেখে, খামে ভরিবার আগে প্রচারপত্রটির সঙ্গে জ্যোতির্ম্ময়ের লিখিত পত্রটি ক্লিপ্ দিয়া আঁটিবে না পিন দিয়া আঁটিবে এ কথাটি পর্য্যন্ত জ্যোতির্ম্ময়কে জিজ্ঞাসা করিয়া নেয়। আর পরম উৎসাহে আপিসের নিয়মকানুন আয়ত্ত করার চেষ্টা করে।

জ্যোতির্ম্ময় গম্ভীর মুখে বলে, 'অনাথবাবু ঘরে এলে উঠে দাঁড়িও।'

নন্দর মুখ ম্লান হইয়া যায়, ভয়ে ভয়ে বলে, 'উনি রাগ করেন নি তো? আর কে কে এলে উঠে দাঁড়াব?'

'বলে দেবখ'ন।'

বাড়ী ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া যায়। তার শুকনো মুখ দেখিয়া যশোদা মনে মনে রাগ করিয়া ভাবে, সামান্য একটা চাকরীর পরিশ্রম পর্য্যন্ত সইবার ক্ষমতা নেই শরীরে, কেন জন্মেছিলি তুই পৃথিবীতে? ভাইকে সে দুধ খাওয়ায়, কলা খাওয়ায়, সন্দেশ খাওয়ায়,—চাকরীর শ্রমে ক্লান্ত শরীরটা যদি ভাল ভাল খাদ্য পাইয়া একটু পুষ্ট হইতে রাজী হয়। সন্ধ্যার সময় যশোদা রাঁধাবাড়া নিয়া ব্যস্ত থাকে, তখন অবসর হয় না, রাত্রে নন্দ চাকরীর গল্প করে—সমস্ত-দিনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ব্যাপারের বিস্তারিত কাহিনী। নন্দর আনন্দ ও আগ্রহ যশোদাকে পীড়ন করে। শুনিতে শুনিতে মনে তার খটকা লাগে যে, চাকরী করিতে গিয়া বাস্তব জগতের সংস্পর্শে আসিয়া নন্দর মন শক্ত হইবে এ আশা বোধ হয় মিথ্যা। যে জগতে নন্দ মানুষ হইয়াছে সেখানকার বাস্তবতা কি কম কঠোর, কম সর্ব্বগ্রাসী? তা-ই যদি নন্দকে স্পর্শ করিতে না পারিয়া থাকে, সত্যপ্রিয়র আপিসের বাস্তবতা কি পারিবে? এক একটা ছেলে বোধ হয় এইরকম বর্ম্ম পরা মন নিয়া জন্মায়, পৃথিবীর ধূলা কাদা সে মনের নাগাল পায় না। পাপ পর্য্যন্ত তারা করে পুণ্য করার মত নির্দ্দোষ আগ্রহের সঙ্গে। যে সব ছেলের সঙ্গে নন্দ এতকাল আড্ডা দিত, এখনও সকাল সন্ধ্যায় দিতেছে, তাদের কাছে বখামি পাকামি শিখিতে কি কিছু তার বাকী আছে? কিন্তু কি কাজে লাগিয়াছে তার ওসব শিক্ষা? ছেলেমানুষী ঘোচে নাই, মন পাকে নাই, কয়েকটা কেবল বিকার জন্মিয়াছে মনের, কদর্য্য এবং কুৎসিৎ। বসিয়া বসিয়া স্বপ্ন দেখার তাতে তার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইয়াছে

বলিয়া মনে হয় না। খারাপ দিকেও কিছু অভিজ্ঞতা জন্মিয়া নন্দর মনটা যদি একটু শক্ত হইত, শিশু ভিখারী আর কিশোরী মেয়ের মত ভয়, লজ্জা অভিমান, বিনয়, নির্ভরশীলতা, সঙ্কোচ, স্বপ্ন দেখা এসব যদি একটু কমিত, বাঁচিয়া থাকাই যে একটা ভীষণ লড়াই এ বিষয়ে সামান্য একটু জ্ঞান জন্মিয়া ভাবপ্রবণতাটা খানিকটা নিস্তেজ হইয়া আসিত, তাতেও বোধ হয় যশোদা খুসী হইত।

একদিন সত্যপ্রিয় মহাসমারোহে বাপের বার্ষিক শ্রাদ্ধের আয়োজন করিয়াছে, রাজ্যের লোককে আহারের নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে, এক দলকে মধ্যাহ্নে আরেক দলকে রাত্রে। আপিসের সকলে রাত্রে সত্যপ্রিয়র বাড়ী খাইতে যাইবে। হঠাৎ দুপুর বেলা সত্যপ্রিয় আপিসে আসিয়া হাজির। কেউ স্বপ্নেও ভাবে নাই সেদিন সে আপিসে আসিবে। সকলেই কম বেশী গা এলাইয়া দিয়াছিল—কেরাণীরা পর্য্যন্ত। কেরাণীদের সঙ্গে সত্যপ্রিয়র একরকম কোন সম্পর্কই নাই, তাদের উপর অনেক উপরওয়ালা আছে, অন্যদিন যারা তাদের এক মুহূর্ত্তের জন্য ঘাড় তুলিতে দেয় না। সত্যপ্রিয় না আসিলেও তাদের কাজে ঢিল পড়িবার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু কেবল একজনের কড়াকড়িতে সেখানে নিয়মতান্ত্রিকতা জেলখানার অত্যাচার হইয়া দাঁড়ায়, একটি মাত্র স্ক্রু আঁট থাকিলে যেখানে সংগঠন খাড়া থাকে, সেই একজনের স্ক্রুতে ঢিল পড়িলেই নিয়ম শিথিল হয়, সংগঠনে আলগা পড়ে। অন্যদিন সত্যপ্রিয় না আসিলেও কিছু আসিয়া যায় না, তার আসিবার সম্ভাবনাতেই যথারীতি কাজ চলিতে থাকে। কিন্তু আজ সত্যপ্রিয়র আবির্ভাব একরকম অসম্ভব জানা থাকায় কাজে কারও মন নাই, মাষ্টার আসিবে না জানিয়া স্কুলের ছেলেদের যেমন হয় সকলের মনে সেই রকম একটা মুক্তির আনন্দ আসিয়াছে, উপরওয়ালারাও হঠাৎ বিস্ময়কর উদারতার সঙ্গে কেরাণীদের অনেকটা স্নেহাই দিয়াছে, ধমক দিবার পরিশ্রমটুকুও তারা আজ করিতে নারাজ। অনাথ ও আরও তিনজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী সিঁড়ির ঠিক পাশের ঘরে দরোয়ানকে দিয়া দরোয়ানের শিল-নোড়াতেই সিদ্ধি বাটাইতেছে, আপিসের দলাদলিতে এরা অনাথের দল। অন্য ঘরে উপরওয়ালাদের আরেকটি দলের গোপন পরামর্শের আসর বসিয়াছে,

আলোচ্য বিষয়—আপিসের কূটনীতি এবং অনাথের প্রতিপত্তি ক্ষয় করিবার উপায় উদ্ভাবন। দুটি ছেলেমানুষ কেরাণী বারান্দায় দাঁড়াইয়া সিগারেট টানিতে টানিতে গল্প করিতেছে। কর্ম্মব্যস্ততার গুঞ্জনধ্বনির বদলে আজ আপিস জুড়িয়া উঠিয়াছে গল্পগুজবের চাপা কলরব। কয়েকজন বৃদ্ধ কর্ম্মচারী শ্রান্ত চোখ বুজিয়া ঝিমাইতেছে আর পাঁচুকে যথারীতি সতর্ক করিয়া না দিয়া টেবিলে পা তুলিয়া দিয়া কেষ্টবাবু হইয়া পড়িয়াছে নিদ্রাগত।

সত্যপ্রিয়র দামী মোটরটি নিঃশব্দে আসিয়া দাঁড়াইল, হাতীর দাঁতের ছড়িটি হাতে করিয়া সত্যপ্রিয় নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। আপিসের আবহাওয়ায় যেন একটা বৈদ্যুতিক প্রবাহ বহিয়া গেল। কি ভাগ্যে মোটর আসিয়া দাঁড়ানমাত্র পাঁচুর চোখে পড়িয়াছিল, চাপা গলায় অনাথকে খবরটা দিয়াই সে উপরে ছুটিয়া গেল। তারপর চওড়া একটা কাগজের তলে চাপা পড়িয়া গেল শিল-নোড়া, যুবক কেরাণী দুটির হাতের সিগারেট পায়ের তলে পিষিয়া গিয়া হাতে দেখা দিল কলম, বৃদ্ধ কর্ম্মচারী ক'জন চমকিয়া সজাগ হইয়া উঠিল, কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিয়া কেষ্টবাবু পরীক্ষা করিতে লাগিল মোটা একটা হিসাবের খাতা; আপিসটা হঠাৎ হইয়া গেল অস্বাভাবিক রকম স্তব্ধ। সত্যপ্রিয় মৃদু একটু হাসিল। এরকম নিঃশব্দ পূজায় সে বড় তৃপ্তি পায়। এক একটি ঘরের সম্মুখ দিয়া সত্যপ্রিয় যায় আর ঘরের ভিতরের কর্ম্মচারীরা তড়াক তড়াক করিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়, সত্যপ্রিয় চাহিয়াও দেখে নাই। তবে এ ঘরে ঢুকিবামাত্র পার্টিসনের ওপারে কেষ্টবাবু যে লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে গিয়া চেয়ারটাই উল্টাইয়া দিল, আর এপারে জ্যোতির্ম্ময় ঘাড় গুঁজিয়া লিখিতেই লাগিল, এটা চাহিয়া দেখিল। একটুক্ষণের জন্য মনে হইল, দেয়াল আর পার্টিসনের শেষপ্রান্তের কয়েকহাত ব্যবধানের মধ্যে দাঁড়াইয়া সত্যপ্রিয় ঠিক করিতে পারিতেছে না কার অংশে পদার্পণ করিবে। এ ধরণের সমস্যায় সত্যই সত্যপ্রিয়র বিরক্তিও জাগে, কৌতুকও বোধ হয়। ব্যাপারটা হাস্যকর বটে, কিন্তু তুচ্ছ নয়। যার অংশে পা দিবে সেটা হইবে তার সম্মান ও পুরস্কার, অন্যজনের পক্ষে যা তিরস্কারের সমান!

'এদিকে আসুন কেষ্টবাবু, দুজনে জ্যোতির্ম্ময়বাবুর অতিথি হওয়া যাক। কি লিখছেন জ্যোতির্ম্ময়বাবু?'

মুখ তুলিয়া দেখিয়া জ্যোতির্ম্ময়ও তড়াক করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

'বসুন, বসুন। অত ফর্ম্মালিটি করবেন না, এ যুগে এসব ফর্ম্মালিটি অচল, কি বলেন?'

বলিয়া নিজে সত্যপ্রিয় দাঁড়াইয়া থাকে, বসে না। হাসি মুখে উচ্চারিত সহজ সরল মন্তব্য আর প্রশ্নটি যে তার কতবড় ফাঁদ, সত্যপ্রিয়র কাছে যে অনেকদিন কাজ করে নাই, তার পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন। সে দাঁড়াইয়া আছে, শুধু বসিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে বলিয়াই জ্যোতির্ম্ময় বসে কিনা হঠাৎ তাই পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সাধ হইয়াছে সত্যপ্রিয়র। কিন্তু ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শনের পরীক্ষায় জ্যোতির্ম্ময় কখনও ফেল করে না। সে ঠায় দাঁড়াইয়া রহিল। সত্যপ্রিয়র কথার ফাঁদের জবাবও তার জানা আছে— 'আজ্ঞে না এটা ঠিক ফর্ম্মালিটি নয়, আপিসের সুপিরিয়ার আপিসারের সামনে দাঁড়ানই নিয়ম।'

এই কথাগুলি জ্যোতির্ম্ময় উচ্চারণ করিল বটে, কিন্তু বলিল কি শুধু এইটুকু? কেবল সুপিরিয়র আপিসার বলিয়া দাঁড়ায়, আর কোন কারণ নাই? কত কারণ আছে আরও। সত্যপ্রিয় অসাধারণ মানুষ, এজগতে তার মত মানুষ আর নাই, তার অতুলনীয় বিদ্যাবুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, কর্ম্মশক্তি, চরিত্রবল, নিষ্ঠা সমস্ত মিলিয়া জ্যোতির্ম্ময়কে শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে গদগদ করিয়া দিয়াছে, এইগুলিই আসল কারণ। তবে এসব কথা মুখে বলিতে নাই, নির্জ্জলা স্তোকবাক্যের মত শোনায়, এরকম সস্তা মোসাহেবী সত্যপ্রিয়র ভাল লাগে না। না বলিয়াও এই কথাগুলি বলিবার একটা কায়দা আছে, দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে, মুখের ভাবে, চোখের দৃষ্টিতে, বলার ধরণে কথাগুলি নেপথ্যে থাকিয়াও সুন্দর অভিব্যক্তি লাভ করে। কায়দাটা আয়ত্ত করিতে একটু সময় লাগে, কিন্তু তারপর আর বিশেষ অসুবিধা হয় না। মনের কথা বলাও হইয়াছে, সত্যপ্রিয়র শোনাও হইয়াছে, টের পাইয়া তখন বড়ই আনন্দ হয়। সরব পূজাও অবশ্য আছে সত্যপ্রিয়র, কিন্তু নীরব পূজা যখন জানাইয়া দেয় পূজা যথাস্থানে পৌঁছিয়াছে, তখন প্রায় পুলকের শিহরণের সঙ্গেই মনে হয়, দেবতার সঙ্গে যেন রীতিমত একটা সম্পর্কই স্থাপিত হইয়া গেল।

কেষ্টবাবুর পূজাটা প্রধানতঃ সরব, জ্যোতির্ম্ময়ের নীরব পূজার মত মার্জ্জিতও

নয়, সরসও নয়। কেষ্টবাবুর ঈর্ষাতুর মুখের দিকে এক নজর চাহিয়া জ্যোতির্ম্ময়ের পূজায় পরিতৃপ্ত দেবতা উপবেশন করে। তারপর অনাথ আসিয়া জোটে। নিজের ঘরে না গিয়া সত্যপ্রিয় জ্যোতির্ম্ময়ের ঘরে গিয়াছে টের পাইয়া আপিস পরিচালনায় যে ক'জন সত্যপ্রিয়র ডান হাত আর বাঁ হাত তারাও আসিয়া জোটে। প্রথমে দাঁড়াইয়া থাকে, বসিতে বলিলে বসে। সত্যপ্রিয় কথা বলে এমনভাবে যেন এ আপিসটির সঙ্গে তার বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই, সে কেবল একজন মাননীয় অতিথি, একটু বেড়াইতে আসিয়াছে, গল্পগুজব করিতে আসিয়াছে। বাহিরের লোকের মতই এক সময় সে ভদ্রতার কুশল জিজ্ঞাসা করার মত বলে, 'কাজকর্ম্ম চলছে কেমন আপনাদের, ঠিকভাবে চলছে তো?' বলিয়া মুখটা এদিকের কাঁধের সান্নিধ্য হইতে ধীরে ধীরে ওদিকের কাঁধের কাছে লইয়া গিয়া নিজেই আবার বলে, 'একটু যেন ঢিল পড়েছে মনে হ'ল। তা হোক, তা হোক, তাই স্বাভাবিক, মাঝে মাঝে হঠাৎ দু'একটা দিন এরকম ঢিল পড়ে। আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে স্বাস্থ্য বজায় রেখে পাশ্চাত্য প্রথায় কাজ করা বড় কঠিন, মানুষকে একেবারে যন্ত্র বানিয়ে দিচ্ছে দিনকে দিন—স্বাস্থ্য, শান্তি সব রসাতলে গেল।'

এই ভয়টাই সকলের মনে জাগিতেছিল। আজ যখন তার পিতৃশ্রাদ্ধ, কেহ কল্পনাও করিবে না সে আপিসে আসিবে, অতএব আজই একবার দেখিয়া আসা যাক কাজকর্ম্ম কেমন চলিতেছে। সকলেই মুখ কাঁচু-মাচু করিয়া ক্লিষ্ট হাসি হাসে। অনাথ বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ, একটু কাজে ঢিল পড়েছে আজ, কারও মন বসছে না কাজে। ওবেলা আপনার ওখানে যাবার কথা ভেবে—

'এখন ছুটি দিয়ে দিলে কেমন হয় অনাথ?'

জবাব দেওয়ার আগে অনাথ এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সত্যপ্রিয়র মুখের ভাবটি অধ্যয়ন করিয়া ফেলে, তারপর দৃঢ়স্বরে বলে, 'আজ্ঞে না, খেতে যাবে রাত্রে, এখন থেকে ছুটি কেন?'

সত্যপ্রিয় সকলের দিকে চাহিয়া বলে, দেখলেন আপনারা? আপিসের ওপর এতটুকু জোরও আমার নেই, একদিন হাফ হলিডে দিতে চাইলে দিতে পারি না!'

সত্যই যেন আপিসের উপর সত্যপ্রিয়র কিছুমাত্র জোর নাই, এইরকমভাবে সকলে নিঃশব্দে হাসিল। এভাবে হাসাই নিয়ম, কারণ এটা রসিকতা। ইচ্ছে

করলে এক দিন কেন, যতদিন খুসী আপিস ছুটি দিতে পারেন—' এধরণের কোন কথা বলা নিষেধ। কারণ, তাতে দিনকে রাত বলিয়া যে রসিকতা করা হইয়াছে তার জোর কমিয়া যায়। সত্যপ্রিয় সাধারণভাবেই কথা বলিয়া যায়, রাগ করিয়াছে কিনা বোঝা যায় না, কিন্তু আপিসের কাজে শৈথিল্য দেখিয়া যে খুসী হয় নাই, সেটা টের পাইতে কারও বাকী থাকে না। খুসী না হওয়ার মধ্যেই এ ব্যাপারের শেষ নয়, বেতনভোগী কর্ম্মচারীদের সম্বন্ধে অমন নিষ্ক্রিয় খুসী অ-খুসীর ধার সত্যপ্রিয় ধারে না। কিছু একটা ঘটিবেই। হয় তো সপ্তাহ কাটিবে, মাস কাটিবে, আজিকার আকস্মিক অপিস পরিদর্শনের কথা সত্যপ্রিয়র মনে আছে কিনা টেরও পাওয়া যাইবে না। হঠাৎ একদিন কয়েকটা পরিবর্ত্তন, কয়েকটা নূতন নিয়ম বিনা সমারোহে চালু হইয়া যাইবে। কিন্তু কি পরিবর্ত্তন? কি নিয়ম?

কিছুক্ষণ পরে সত্যপ্রিয় উঠিল। বুক-শেলফের আড়ালে আধ-ঢাকা নন্দর দিকে কখন চোখ পড়িয়াছিল কেউ জানে না, উঠিয়া দাঁড়াইয়াই কিন্তু জিজ্ঞাসা করিল, 'ছেলেটি কে জ্যোতির্ম্ময়বাবু?'

জ্যোতির্ম্ময়ও এই সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল। একজন হেল্‌পার নিতে বলেছিলেন, ওই ছেলেটিকে নিয়েছি। নন্দ এদিকে এসো। এঁকে প্রণাম কর।

ঝুঁকিয়া পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করবার সময় মনে হইল নন্দর শিরদাঁড়াটা বুঝি জামা ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিবে, আশীর্ব্বাদ করার ছলে সত্যপ্রিয় আলগোছে তারই উপরে একটু হাত বুলাইয়া দিল। হঠাৎ-জাগা ছেলেমানুষী খেয়ালের হাত হইতে মানুষ হইয়া কে রেহাই পায়? সংযমের জন্য সময় পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না।

বোধ হয় নিজের এই আকস্মিক ও অকারণ দুর্ব্বলতার কাছে হার মানার জন্যই নন্দর স্বাস্থ্যের শোচনীয় অভাবটা সত্যপ্রিয় ক্ষমা করিয়া ফেলিল। বোধ হয় আপিসের তুচ্ছতম কেরাণীটিকেও সে তুচ্ছ করে না, ডান-হাত বাঁ-হাতগুলিকে এটা বুঝাইয়া দিবার জন্যই বিদায় নেওয়া কয়েক মিনিট পিছাইয়াও দিল। নন্দকে জিজ্ঞাসা করিল দু'একটা কথা, উপদেশ ও উৎসাহ দিল যথেষ্ট, সামান্য অবস্থা হইতে মানুষ যে শুধু নিজের চেষ্টাতেই বড় হইতে পারে এই সুপ্রাচীন মিথ্যাটি কয়েকবার কয়েকভাবে নন্দর মাথায় ঢুকাইবার চেষ্টা করিল—সমস্তই স্নেহ ও শুভেচ্ছার সঙ্গে।

তারপর হঠাৎ সে যেন চিরকালের মত বিদায় গ্রহণ করিতেছে, সকলের সঙ্গে এই তার শেষ দেখা এমনি উদাস ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, 'আচ্ছা যাওয়া

যাক এবার, কাজ করুন আপনারা। যে সমস্যাতে আপনারা আমাকে ফেলে দিলেন মশায়! মাঝে মাঝে দশ জনকে ডেকে খাওয়াতে পারলে তো আমি বাঁচব না মশায়, পয়সা যে রোজগার করছি দুটো, আর কিসে তার সার্থকতা বলুন? কিন্তু আমার বাড়ীতে নেমন্তন্ন থাকলেই যদি কাজে ঢিল পড়ে, তবে তো ভাবনার কথা। পয়সাই যে রোজগার হবে না তা হলে, দশজনকে খাওয়াবো কি!'

সে চলিয়া গেলে সকলে মুখ চাওয়াচায়ি করে। এ আপিসে সব চেয়ে বেশী মাহিনা পায় বীরেনবাবু নামে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। সত্যপ্রিয়র সম্বন্ধে বেশী মাথা ঘামানোর বদলে কাজের দিকেই তার ঝোঁক বেশী। একরকম তারই চেষ্টায় সত্যপ্রিয়র নূতন একটি ব্যবসায় এবং আপিসের নূতন একটি বিভাগ গড়িয়া উঠিয়াছে। এই গড়িয়া তোলার কাজে সত্যপ্রিয়র সঙ্গে কয়েকবার তার মনোমালিন্যও হইয়া গিয়াছে! সত্যপ্রিয় যে তাকে পছন্দ করে না, তাকে ছাড়া চলিবে না বলিয়াই সে টিঁকিয়া আছে, অনেকেই তা জানে। বীরেনবাবু সকলকে আশ্বাস দিয়া বলিল, 'ভয় নেই, কেউ আপনারা জবাই হবেন না। উনি শুধু ওয়ার্ণিং দিয়ে গেলেন। উনি কাউকে জবাই করেন না।'

কথাটা সেই রাত্রেই প্রমাণ হইয়া গেল অদ্ভুতভাবে।

সত্যপ্রিয়র প্রকাণ্ড বাড়ীর প্রকাণ্ড হল, বড় বড় তিনটি ঘর আর উপর ও নীচের লম্বাচওড়া বারান্দায় নিমন্ত্রিতেরা সারি সারি বসিয়া গিয়াছে, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ঝুলাইয়া স্ফটিকের জপমালা হাতে করিয়া খড়ম পায়ে সত্যপ্রিয় একে একটু হাসি, ওকে দু'টি কথা দিয়া কৃতার্থ করিয়া বিনয় ও ভদ্রতা রক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে। পরিবেষণ আরম্ভ হওয়ামাত্র হঠাৎ যেন একটা গুরুতর কথা মনে পড়িয়া গেল।

নন্দ সারাক্ষণ ছায়ার মত জ্যোতির্ম্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছিল, হল ঘরের এক প্রান্তে জ্যোতির্ম্ময়ের কাছেই সে খাইতে বসিয়াছে। কাছে গিয়া সত্যপ্রিয় বলিল, 'ছি ছি, এঁকে এখানে বসালে কে? ওঁর দিদি শুনলে রাগ করবেন যে! তোমাদের কারও ঘটে এক কোঁটা বুদ্ধি নেই ভূষণ—সকলকে কুশাসনে বসিয়েছ, পাতায় খাওয়াচ্ছ বলে এর বেলাও তাই

করবে? কার্পেটের আসন নিয়ে এসো একটা, আর রূপোর থালা গেলাস বাটি বার করে দিতে বল।

পরিবেশণ বন্ধ হইয়া রহিল, হলের একদিকে কয়েক হাত যায়গা খালি ছিল সেইখানে লাল ঘাসের মধ্যে সবুজ বাঘ আঁকা কার্পেটের আসন পাতা হইল, সত্যপ্রিয়র সবিনয় অনুরোধে ভীত সন্ত্রস্থ নন্দ পায়ে পায়ে উঠিয়া গিয়া আসনে বসিল। সামনে ঝকঝকে রূপার থালা দেওয়া হইয়াছে, সাধারণ থালার তিনগুণ তার আকার।

'তুমি শুধু এঁকে পরিবেশণ করবে ভূষণ—আর কারো দিকে তোমার তাকাবার দরকার নেই।'

ঘরের শ'দেড়েক মানুষের কারও মুখে কথা নাই। জ্যোতির্ম্ময়ের মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। বিহ্বল নন্দ এদিক ওদিক তাকায়, মনে হয় বুঝি কাঁদিয়াই ফেলিবে। কাল সাহেবী পোষাকে যে সত্যপ্রিয়কে আপিসে আসিতে দেখিয়াছিল, আজ বাড়ীতে আধা সাধকের বেশে সত্যপ্রিয়কে চেনা তার পক্ষে যেমন কঠিন, আজ দুপুরে আপিসে নন্দকে স্নেহকোমলকণ্ঠে আশীর্ব্বাদ উপদেশ ও উৎসাহ দিতে যে দেখিয়াছিল, এখন বাড়ীতে সেই নন্দকে এই অপরূপ উপায়ে পীড়নের আনন্দে মস্‌গুল সত্যপ্রিয়কে চেনাও তার পক্ষে কম কঠিন নয়। সকলেই বেতন পায় কাজের বদলে, সকলেই দাস। তাই ঘরভরা মানুষ স্তব্ধ হইয়া এখনকার সত্যপ্রিয়কে চিনিবার চেষ্টা করে।

'দাঁড়িয়ে রইলে কেন, পরিবেশণ আরম্ভ কর? আপনারা খান।'

সরিয়া আসিয়া জ্যোতির্ম্ময়কে উদ্দেশ করিয়া সত্যপ্রিয় বলে, 'সত্যি বলছি জ্যোতির্ম্ময়বাবু, ওনার পরিচয় জানতাম না। এই খানিক আগে শুনলাম। তাই ক্রটি হয়ে গেছে, যথাযোগ্য সম্মান দেখাতে পারিনি।'

জ্যোতির্ম্ময় নীরবে লুচি ভাঙ্গিয়া এক টুকরা লুচি আর কিছু বেগুন ভাজা মুখে তোলে। না জানিয়া সত্যই অপরাধ হইয়া গিয়াছে। যার প্ররোচনায় সত্যপ্রিয়র দু'টি মিলে ধর্ম্মঘট হইয়াছিল মাত্র কিছুদিন আগে, তার ভাইকে চাকরীটা দেওয়া উচিত হয় নাই।

সত্যপ্রিয়র সংযম আছে, কোন বিষয়ে বাড়াবাড়ি করে না—একমাত্র অর্থোপার্জ্জনের বিষয়টি ছাড়া। নন্দর সামনে থালা বাটিতে ভিন্ন ভিন্ন খাদ্য

জমিতে থাকে, নন্দ হাত গুটাইয়া চুপচাপ বসিয়া থাকে। কিন্তু সত্যপ্রিয় আর তার দিকে তাকায় না, আর কিছুই তাকে বলে না। আগের মত একে একটু হাসি এবং ওকে দু'টি কথা দিয়া বেতনভোগী অতিথিদের আপ্যায়ন করিতে থাকে।

বাড়ী ফিরিবার সময় জ্যোতির্ম্ময় বলে, 'কাল থেকে তুমি আর আপিসে যেও না ভাই। যদি পারি অন্য কোথাও তোমার একটা চাকরী করে দেব।'

নন্দ চুপ করিয়া থাকে। জ্যোতির্ম্ময় একটু সঙ্কোচের সঙ্গে বলে, 'আমার কোন দোষ নেই বুঝতে পারছ তো? এক মাসের মাইনেটা তোমায় পাইয়ে দেব।'

'মাইনে চাইনে।'

বিছানায় শুইয়া নন্দ আর সেদিন প্রতিদিনকার মত ঘুমানোর আগে খানিকক্ষণ এপাশ ওপাশ করে না, চুপচাপ শুইয়া থাকে। নিজের হাতে মানুষ করা ভাই সম্বন্ধে যশোদার অনুভূতি একটু বেশী রকম তীক্ষ্ণ। অন্ধকার ঘরে নন্দর অভ্যস্ত নড়ন চড়নের সাড়া না পাইয়া সে ঘরের অন্য প্রান্তের বিছানা হইতে জিজ্ঞাসা করে, 'ঘুমোলি নন্দ।'

'না, ঘুমোই নি।'

নন্দ রাগ করিয়াছে? কি হইল নন্দর?—'কি আবার হল তোর?'

'সকলের সঙ্গে ঝগড়া করবে তুমি, আর চাকরী যাবে আমার। সর্ব্বোনাশ করে ছাড়বে তুমি আমার।'

নন্দর উল্টা পাল্টা কথা জোড়া দিয়া ঘটনাটা আগাগোড়া গঠন করিতে যশোদার একটু সময় লাগে। তখন সে বিছানায় উঠিয়া বসিয়া বলে, 'আর তুই কি করলি? ঘাড় হেঁট করে খেয়ে এলি পেট পুরে? মরণ হয় না তোর নচ্ছার হারামজাদা ছেলে!'

'খেয়েছি নাকি আমি কিছু?'

'খাস নি? কিছু খাস নি? বসেই বা রইলি কেন অমন অপমানের পর? কার্পেটের আসন আর রূপোর থালাবাটি যখন আনতে বলল, গট গট করে উঠে চলে আসতে পারলি না তুই? বলে আসতে পারলি না, তোমার মত লোকের বাড়ীতে আমি—'

উঠিয়া আলো জ্বালিয়া: 'যাক গে মরুক গে। যা করেছিস, বেশ করেছিস। কি খেতে দি' তোকে এখন আমি! লুচি পোলাউ ফেলে এলি, ঘরে যা আছে তা কি তোর মুখে রুচবে? দাঁড়া, আনিয়ে দিচ্ছি।'

রাত তখন এগারটা বাজিয়া গিয়াছে। সুধীরকে সঙ্গে নিয়া গিয়া সেই রাত্রে যশোদা তার শত্রু ও সখি কুমুদিনীকে ডাকিয়া তুলিয়া তার স্বামীর সাইকেলে সুধীরকে খাবার আনিতে পাঠাইয়া দিল। কুমুদিনীর স্বামীর টিফিন ক্যারিয়ারটিও সঙ্গে দিল।

'যত্ত শীগগির পার ফিরে আসবে কিন্তু—জোরে জোরে চালিয়ে যাও।'

এক ঘন্টা পরে সুধীর ফিরিয়া আসিল। যশোদার ফরমাস মত সব জিনিষ সে পায় নাই, তবে অনেক কিছুই আনিয়াছে। লুচি, তরকারী, ডাল, মাংস, ডিম ভাজা, মামলেট, সাতরকম মিষ্টি, দই এবং রাবড়ী। রাগ ও ঝোঁকের মাথায় এত সব খাদ্য যশোদা আনিতে দিয়াছিল বটে, এত রাত্রে নন্দকে সব খাইতে দেওয়ার সাহস তার হইল না।

অর্দ্ধেকের বেশী তুলিয়া রাখিল, বাকীটা ভাগ করিয়া দিল সুধীর আর নন্দকে।

'পেট ভরেনি দিদি।'

'খুব ভরেছে, এবার ওঠ।'

'সন্দেশ দাও আরেকটা।'

'উঁহুঁ, যা খেয়েছ তাতেই তোমার অসুখ হয় কিনা ত্যাখো, আর সন্দেশ খায় না।' ধনঞ্জয়ের কথা যশোদার মনে পড়িতেছিল। সমস্ত খাবারটাই তাকে নির্ভাবনায় দেওয়া চলিত, অসুখের কথা ভাবিতে হইত না। মানুষটা খাওয়ায় ছিল ভীম, হজমশক্তিতে অগস্ত্য। ভাবিতে ভাবিতে যশোদার মনে পড়ে যে, খাইয়া ধনঞ্জয়ের পেট ভরিত কিনা একথা তো একদিনও সে তাকে জিজ্ঞাসা করে নাই! এ বাড়ীর সকলেই যতক্ষণ ক্ষুধা না মেটে চাহিয়া খায়, এ বিষয়ে যে সঙ্কোচ করিবার কিছু থাকিতে পারে কারও তা মনেও আসে না। কিন্তু ধনঞ্জয়ের মত যে বেশী খায়, একজনে তিন চার জনের ভাত, তার হয় তো একটু লজ্জা করিত বার বার চাহিয়া খাইতে। মোটামুটি আন্দাজ করিয়াই অবশ্য যশোদা তাকে সব দিত, তবু পরের পেটের খবর কি আন্দাজে লোকে

সঠিক জানিতে পারে ?

এতরাত্রে হঠাৎ এত সব ভাল ভাল খাদ্য আনাইবার কারণটা জানিবার জন্য সুধীর ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, কয়েকবার জিজ্ঞাসা করিয়া ভাল রকম জবাব পায় নাই। নন্দ শুইয়া পড়িলে যশোদা যখন ঘরে দরজা দিবার উপক্রম করিতেছে, তাকে বাহিরে ডাকিয়া আনিয়া চুপি চুপি সুধীর আরেকবার জিজ্ঞাসা করিল, 'ব্যাপার কি বল তো চাঁদের মা ? এতরাত্রে খাবার আনালে, নিজে কিছু খেলে না, আমাদের খাইয়ে সব তুলে রাখলে ?' যশোদা একটু হাসিয়া বলেন, 'মাথাটা হঠাৎ বিগড়ে গেল কিনা—'

সুধীর ভয় পাইয়া বলিল, 'মাথার অসুখ আছে নাকি তোমার।'

'নেই ? রাত দুপুরে যারা খালি খালি বাজে কথা সুধোয় একবার ছেড়ে দশবার, তাদের মাথাটা ছেঁচে ফেলতে সাধ যায় সুধীর। ভালয় ভালয় শুয়ে পড়গে যাও।'

শুনিয়া সুধীর ক্ষুণ্ণ হইয়া ফিরিয়া গেল। কী অকৃতজ্ঞ যশোদা ! এতরাত্রে প্রাণপণে সাইকেল চালাইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে খাবারগুলি নিয়া আসিল, এত জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও খাবার আনিবার কারণটা তাকে কিছুতেই খুলিয়া বলিল না। ভাল ভাল জিনিষগুলি পেট পুরিয়া তাকে অবশ্য খাইতে দিয়াছে যশোদা, তবু—

পরদিন সকালে উঠিয়াই নন্দ ছুটিয়া গেল জ্যোতির্ম্ময়ের বাড়ী।

'আমার এক মাসের মাইনেটা পাইয়ে দেবেন তো ?'

যশোদা নিজের হাতে মানুষ করিয়াছে বটে, কিন্তু কেবল একজন মানুষ তো আরেকজনকে মানুষ করে না, আরও অনেক কিছু করে। দাবীটা অবশ্য নন্দের অন্যায় নয়, নিজের প্রাপ্য সে দাবী করিতে শিখিয়াছে জানিলে যশোদা খুসীই হইবে, কিন্তু এমন সসঙ্কোচে ভিক্ষা চাওয়ার মত দাবী করা কেন ? কাল রাত্রেই বেতনের যে টাকা কয়েকটা সে নিবে না বলিয়াছিল, সকাল হইতে সে টাকার উপর এত লোভ কেন, ফস্কাইয়া যাওয়ার এত ভয় কেন ?

চার

বর্ষার পরে একদিন ধনঞ্জয় আসিয়া হাজির।

সেইরকম জামা কাপড়, সেই সতরঞ্জি মোড়া বিছানা আর রঙ-চটা টিনের বাক্স, কেবল আগের বারের চেয়ে ধনঞ্জয় নিজে একটু কাবু হইয়া পড়িয়াছে মনে হয়। এই শরীরে সামান্য জোয়ার-ভাঁটা ধরাই কঠিন, সুতরাং দেখিয়াই যখন টের পাওয়া যায়, ভাঁটাটা সম্ভবতঃ বেশ একটু জোরালই হইয়াছে।

যশোদা খুসী হইয়া বলিল, 'তুমি কোথা থেকে গো নবাবসায়েব? এসো, এসো। বাড়ীর আমার মান্যি বাড়ল।'

ধনঞ্জয় একটা পিঁড়িতে বসিয়া বলিল, 'আবার ফিরে এলাম চাঁদের মা।'

'তা বেশ করেছ, ফিরে আসবে বৈকি। সবাই আসছে, তুমি আসবে না কোন্ দুঃখে?'

বিকালে একটু অবসর পাইয়া কালো আসিয়া যশোদাকে তার দুঃখের কাহিনী শুনাইতেছিল। জগৎ বড় খারাপ ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছে তার সঙ্গে। আর সহ্য হয় না। কি রকম ব্যবহার? খাইতে দেয় না? মারে? না, সে সব নয়, ভাল করিয়া কথা বলে না, বকে, খোঁটা দেয়, আরও কত কি করে! নালিশ শুনিতে যশোদার ভাল লাগে না, বিশেষতঃ এই সব অভিমান আর ভাবপ্রবণতার নালিশ। তবু সে মন দিয়া শুনিবার চেষ্টা করিতেছিল আর কালোর কাঁদ' কাঁদ' মুখ দেখিয়া ভাবিতেছিল, এমনি নরম মন না হলে আর চাঁপা তোমায় কলতলায় ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়, তুমি চুপ ক'রে থাকো! ধনঞ্জয় আসিবামাত্র কালোর কথা শুনিতে আর তার কিছুমাত্র আগ্রহ দেখা গেল না। দুঃখের কথা বলিতে না পাইয়া মনের দুঃখে কালো ঘরে ফিরিয়া গেল।

যশোদা ধনঞ্জয়ের খারাপ চেহারা আর সঙ্কোচ লক্ষ্য করিতেছিল, কিন্তু অনর্থক মিষ্টি কথা বলা যশোদার ধাতে নাই।—'কাজ করবার মন করে এসেছো তো এবার, না আবার লেজ গুটিয়ে পালাবে?'

'না, কাজ করব। উপায় কি।'

যশোদাও তো এই কথাই বলিয়া আসিয়াছে চিরকাল, কাজ যখন করিতেই

হইবে কাজ না করিয়া উপায় কি! দেশের জন্য মন অবশ্য কাঁদে, সহর আর সহরতলী ভাল অবশ্য লাগে না সকলের, কিন্তু এসব মন-কাঁদা আর ভাল লাগা-না-লাগাকে প্রশ্রয় দিলে মানুষের চলিবে কেন?

'বেশ, থাকো এখানে, কাজ একটা জুটিয়ে দেব'খন।'

এখানে থাকার কথায় ধনঞ্জয়ের সঙ্কোচ বাড়িয়া যায়, সে উসখুস করিতে থাকে। যশোদা চিন্তিতভাবে বলিতে থাকে যে, কোন্ ঘরে ধনঞ্জয়কে থাকিতে দেওয়া যায়? টিনের ঘরে তার জায়গাটা আবার বে-দখল হইয়া গিয়াছে, সুধীর যে ঘরে থাকে সেখানে একজনের জায়গা হইতে পারে বটে, কিন্তু বড়ই ঘেঁষাঘেঁষি হইবে। তার চেয়ে—'পাকা ঘরে জায়গা আছে, সেখানে থাক না তুমি? ভাড়া কিন্তু একটু বেশী।'

ধনঞ্জয় বিপন্নভাবে ডান হাতের তালুটা হাঁটুতে ঘষিতে ঘষিতে বলে, 'আমি বলছিলাম কি, যদ্দিন কাজকম্ম না জোটে আমি বরং অন্য কোথাও—'

'এখানে থাকবে না? বেশী ভাড়া না দিতে চাও—'

'বেশী ভাড়ার জন্যে নয়। মানে, কি জান চাঁদের মা, সঙ্গে এবার—'

আর কিছু বলিতে হয় না, যশোদা সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা অনুমান করিয়া বলে, 'অ! পয়সা-কড়ি সঙ্গে নেই, ট্যাঁক এবার টিক্ টিক্ করছে।'—যশোদা হাসে, 'কোথায় থাকবে তবে? মিনি পয়সায় থাকতে দেবে জানাশোনা আছে কেউ?'

ধনঞ্জয় ছেলেমানুষের মত বিব্রত হইয়া পড়ে, গলাটা সাফ করিয়া বলে, 'কাজটা যদ্দিন না হয় একরকম করে—'

যশোদা গম্ভীর মুখে বলে, 'রাস্তায় ঘুরে ঘুরে কাটিয়ে দেবে আর কলের জল খেয়ে পেট ভরাবে। তাই করোগে যাও, আমার কাছে এসেছ কেন? আমি কাজ জুটিয়ে দেব, সে পর্য্যন্ত আমার অন্ন খেতে মানে বাধবে—এমন যদি মানী দুর্য্যোধন তুমি, রোজগার করতে বেরিয়েছ কেন ঘর থেকে? বৌয়ের আঁচল ধরে বসে থাকলেই পারতে ঘরে!'

ধনঞ্জয় হঠাৎ গরম হইয়া বলিল, 'বৌ কোথা যে বৌয়ের খোঁটা দিচ্ছ!'

যশোদা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, 'বৌ নেই তোমার? আরবার যে বললে ছেলেমেয়ে আছে চারটি?'

ছেলেমেয়ে থাকিলেই যে বৌ থাকিবে তার কি মানে আছে? বৌ মরিতে জানে না? কেবল একটি নাকি, দু'টি বৌ মরিয়াছে ধনঞ্জয়ের। চারটি ছেলে-মেয়েই তার প্রথম বৌ এর, পাঁচ নম্বর সন্তানকে জন্ম দিতে গিয়া সে বৌ মরিয়া যায় পাঁচ বছর আগে। তারপর ধনঞ্জয় যাকে বিবাহ করিয়াছিল, প্রথম সন্তানকে জন্ম দিতে গিয়া সেও মরিয়া গিয়াছে আজ প্রায় দু'বছর। সেই হইতে ধনঞ্জয়ের বৈরাগ্য আসিয়াছে, আর সে বিবাহ করিবে না।

'আমার বৌ বাঁচবে না চাঁদের মা, ছেলে-মেয়ে হতে গেলেই মরে যাবে। মোদের গাঁয়ের রাধাচরণ কবরেজ নিজে বলেছে।'

'এক চড়ে মাথাটি ঘুরিয়ে দিতে পারনি তোমাদের গাঁয়ের রাধাচরণ কবরেজের? কথা শোন একবার!'

দেহ বড় হইলে বুদ্ধি নাকি কম হয়। এই হিসাবে ধনঞ্জয়ের এক ফোঁটা বুদ্ধি থাকাও উচিত নয়। সে যেন তারই প্রমাণ দিবার জন্য বলে, 'না না, কথাটা সত্যি। তবে যদি তোমার মত বড় সড় কাউকে—'

পাকা ঘরে ধনঞ্জয়ের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া রাত্রে রান্নাঘরে তাকে ডাকিয়া যশোদা তার দেশের গল্প শুনিতেছিল। উনানে মস্ত কড়াই চাপাইয়া সে তখন তেল গরম করিতেছে, ডাল সম্বার দিবে। কি বলিতেছে খেয়াল করিয়াই ধনঞ্জয় সভয়ে থামিয়া গিয়াছিল, কে জানে এবার যশোদা রাগের মাথায় কড়াই-এর গরম তেলটাই তার গায়ে ঢালিয়া দিবে কি না! কিন্তু যশোদা রাগিল না, প্রচণ্ড শব্দে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, 'তাই করো তবে এবার, আমাকেই বিয়ে করে ফেলো।' বলিয়া হাসি আর যশোদার থামে না। জগতে যত মানুষ প্রাপ্য হাসি প্রত্যাখ্যান করিয়া হাসে না, তদের সকলের ভাগের হাসি যশোদা যেন একাই বে-দখল করিয়াছে। হাসির শব্দে সুধীর আসিয়া রান্না-ঘরের দরজায় দাঁড়াইল, হাসির ধমক কিছুতেই সামলাইতে না পারিয়া কোনমতে কড়াইটা নামাইয়া রাখিয়া যশোদা পালাইয়া গেল উঠানে।

উঠানে বড় তাড়াতাড়ি যশোদার হাসি থামিয়া গেল। এতটুকু উঠানে দাঁড়াইয়া প্রাণ ভরিয়া হাসা যশোদার পক্ষে অসম্ভব। এখানে দাঁড়াইলেই যেন চারিদিকের ঘরগুলি সরিয়া সরিয়া আসিয়া তার হাসি-কান্না চাপা দিবার চেষ্টা করে। ঘরে তো এরকম হয় না? এখানে তবু মাথার উপরে আকাশ

আছে, ঘরে শিক বসানো জানালা ছাড়া কোথাও এতটুকু ফাঁক নাই। হয় তো ঘরের পক্ষে খাঁচা হওয়াটাই স্বাভাবিক বলিয়া পীড়ন করে না, উঠান ফাঁকা হওয়া উচিত বলিয়া এখানকার সঙ্কীর্ণতা বাগে পাইলেই যশোদার দম আটকাইয়া দিতে চায়।

'বাপ্‌রে বাপ্—কি হাসাতেই পারে লোকটা। দম আটকে মরলাম হাসতে হাসতে!' বলিয়া আর একটুও না হাসিয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়া যশোদা আবার উনানে কড়াইটা চাপাইয়া দেয়। ভাবিতে থাকে যে, কি কুক্ষণে বেশী লোককে থাকতে দেবার জন্যে উঠানে ঘর তুলেছিলাম! ঘর থেকে বেরিয়ে একটু হাঁপ ছাড়বার যায়গা নেই। এই কথা ভাবিয়া মনে মনে আপশোষ করিতে করিতে চাঁদের কথা মনে পড়িয়া যশোদার বড় কষ্ট হয়। প্রবল বন্যার মত যেভাবে হাসি আসিয়াছিল, সেইভাবে পুত্রশোক ভিতর হইতে ঠেলিয়া উঠিতে থাকে। কিন্তু এমন খাপছাড়া অদ্ভুত সংযম যশোদার যে, হাসি ঠেকাইতে না পারিলেও শোকটা অনায়াসে চাপিয়া রাখিয়া রান্না করিয়া যায়।

ধনঞ্জয়ের সঙ্গে এত হাসাহাসি সুধীরের ভাল লাগে নাই, এক ফাঁকে সে যশোদাকে জিজ্ঞাসা করে, 'ওকে যে দালান ঘরে থাকতে দিলে, ভাড়া দিতে পারবে? মতি কি বলছিল জান, ওর একটি কাণাকড়ি সম্বল নেই।'

রেলের ইয়ার্ডে যশোদা সুধীরের একটি চাকরী করিয়া দিয়াছে। কাজটি ভাল, আগের চেয়ে সুধীরের উপার্জ্জন বাড়িয়াছে। সুধীরের গর্ব্ব ও গৌরবের সীমা নাই।

যশোদা বলে, 'তোমার সেকথা ভাববার দরকার? কাজকর্ম্ম হলেই সম্বল হবে।'

সুধীর সবজান্তার মত হাসিয়া বলে, 'হচ্ছে! কাজ করার মতলব ওসব লোকের থাকে? রোজগার করলেও একটি পয়সা আদায় করতে পারবে ভেবেছো? যদ্দিন পারে থেকে তোমার ঘাড়টি ভেঙে পালাবে।'

যশোদা রাগিয়া বলে, 'পালায় পালাবে, তোমার কি ক্ষেতি হবে শুনি? তোমরা বড় বাকী রেখেছ আমার ঘাড় ভাঙ্‌তে? কতগুনো টাকা পাব তোমার কাছে একবারটি মনে পড়ে?'

শুনিয়া অপমানে মুখ কাল করিয়া সুধীর সরিয়া যায়। শক্ত অকথ্য গাল

দিলেও সুধীরের এরকম অপমান বোধ হইত না, আপন জনের মত ভাল পরামর্শ দিতে আসিয়া এরকম আঘাত খাইলে মানুষের সহ্য হয়? মনে মনে গর্জ্জাইতে গর্জ্জাইতে সুধীর ভাবে কি, এ মাসের বেতনটা একবার হাতে পাইলে হয়, যশোদার একটি পয়সা বাকী রাখিবে না। কিন্তু এক মাসের বেতনে তো কুলাইবে না! যশোদার কাছে সে যে অনেক টাকা ধারে! যশোদার পাওনাটা অবিলম্বে সংগ্রহ করিয়া তার গায়ের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিবার সুখটা অনুভব করিবার আগ্রহে কত মতলবই যে সে মনে মনে ঠাওরাইতে থাকে। মানুষের পাওনা ফাঁকি দিবার মতলব ঠাওরানই যার চিরদিনের অভ্যাস একেবারে উল্টো ধরণের ভাবনা ভাবিবার সময় তার চিন্তাক্লিষ্ট মুখে এমন একটা আশ্চর্য্য দুঃখের ছাপ পড়ে যে, দেখিলে অবাক হইয়া যাইতে হয়, মনে হয় এইমাত্র লোকটার কোন আপনজন মরিয়া গেল নাকি?

মানুষকে কাজ জুটাইয়া দিতে যশোদা বড় ওস্তাদ। অনেক বছর ধরিয়া ধীরে ধীরে আপনা হইতে অনেকগুলি ছোট বড় কলকারখানার সঙ্গে তার একটা যোগাযোগ গড়িয়া উঠিয়াছে, অনেক কারখানার ম্যানেজার হইতে সর্দ্দার কুলী পর্য্যন্ত তাকে চেনে—চোখে না দেখিলেও নাম শুনিয়াছে। অনেক শ্রমিকের সঙ্গে যশোদার মুখোমুখি পরিচয় আছে, অনেকে তাকে কেবল দু'একবার চোখে দেখিয়াছে, অনেকে সহকর্ম্মীদের মুখে তার নাম শুনিয়াছে। কার কাজ নাই, কার কাজ চাই, কে কাজের লোক, কে অকেজো, কোথায় কোন কারখানায় কি ধরণের লোক নেওয়া হইতেছে বা হইবে, এসব খবর ঘরে বসিয়াই এত বেশী পাওয়া যায় যে খাতাপত্রের সাহায্য ছাড়া মনে রাখা অসম্ভব। কিন্তু ওসব হিসাব রাখার বালাই যশোদার নাই, সেটা তার পেশাও নয়। কোনো আদর্শ, উদ্দেশ্য বা স্বার্থসিদ্ধির জন্য সে চেষ্টা করিয়া সংগ্রহ করে নাই, শ্রমিক-জগতে আপনা হইতে তার একটা স্থান জুটিয়া গিয়াছে, প্রথমে খুবই সঙ্কীর্ণ ছিল এখন পরিসর বাড়িয়াছে।

কিন্তু নিজের স্থানটির সীমা যশোদা কখনও অতিক্রম করে না, চেষ্টা করিয়া পরিসর বাড়াইবার চেষ্টাও করে না। যাদের সঙ্গে তার সংযোগ আছে, সোজাসুজি পরিচিত না হোক অন্ততঃ পরিচিত কারও মধ্যস্থতায় যাদের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত যোগাযোগ একটা স্থাপিত হইয়াছে অথবা হয়, কেবল তাদের

সম্বন্ধে যেসব খবর কানে আসে সেইগুলিই সে বাছিয়া বাছিয়া মনে রাখে। চেষ্টা করিয়া সে মনে রাখে তা নয়, মনে থাকিয়া যায়। হয়তো কানে আসিল ভারত-লক্ষ্মী মিলের লুমে কাজ করিবার জন্য কয়েকজন লোক চাই; সঙ্গে সঙ্গে যশোদার মনে পড়িয়া গেল ভারতলক্ষ্মী মিলের সহকারী ম্যানেজারের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় না থাকিলেও লোকটি তাকে বড় বিশ্বাস করে, আজ পর্য্যন্ত যত লোককে সে পাঠাইয়াছে প্রত্যেককে ওখানে নেওয়া হইয়াছে; সেই সঙ্গে যশোদার আরো মনে পড়িয়া গেল লুমে কাজ করিয়াছে এমন সাতজন বেকারকে সে জানে তাদের দু'জন একেবারে অপদার্থ, দু'জন সুবিধা জনক নয়, তিনজন ভাল। একটুকরা কাগজ ছিঁড়িয়া পেন্সিল দিয়া যশোদা তখন আঁকা-বাঁকা অক্ষরে সাতজনের নাম লেখে, তিনজনের নামের পর লেখে good, দু'জনের নামের পরে লেখে not good, আর দু'জনের নামের পর লেখে bad; লিখিয়া not good ও bad চারজনকে একটু সুযোগ দিবার অনুরোধ করিতে গিয়া যশোদার ইংরাজী জ্ঞানে কুলায় না, চোখ কান বুজিয়া বাঙলাতেই অনুরোধটা জানায়, তারপর নিজের নাম স্বাক্ষর করে। অনুরোধটা কাকে করিতেছে, কি জন্য করিতেছে, সাতটি নাম ও নামের পাশের মন্তব্যের অর্থ কি এ সব কিছুই কাগজের টুকরাটি পড়িয়া বুঝিবার উপায় থাকে না, কিন্তু ভারতলক্ষ্মী মিলেরই একজন শ্রমিকের সঙ্গে সাতজন কর্ম্মপ্রার্থীকে মিলে পাঠাইয়া দিলে সেখানকার গুজরাটি সহকারী ম্যানেজার জলের মত সমস্ত পরিষ্কার বুঝিয়া ফেলে। কাগজের টুকরাটি যত্ন করিয়া রাখিয়া সাতজনকেই হয় তো কাজে লাগাইয়া দেয়, হয় তো পাঁচজনকে কাজে লাগাইয়া বাকি দুজনকে ফিরাইয়া দেয়।

যশোদার মতে যারা bad কাজ না পাইলে অথবা কাজ পাইয়া কিছুদিন পরে বরখাস্ত হইলে তারা যশোদার কাছে নালিশ জানাইতে আসে। যশোদা বলে, 'আমি কি করব? কাজ জানো না, তার ওপর কাজে ফাঁকি দেবে, কে রাখবে তোমাদের? তার চেয়ে এক কাজ কর না তোমরা, অন্য কাজে লেগে যাও। অন্য কাজে হয় তো তোমাদের মন বসবে।'

তারা রাজী হয় না, কিছুতেই রাজী হয় না, রাগ করিয়া যশোদাকে প্রথমে কড়া কড়া কথা বলিয়া গাল দিবার উপক্রম করিয়াই যশোদার মুখ দেখিয়া থামিয়া যায়। তারপর একমাস কাটে, দুমাস কাটে। মুখ কাচু-মাচু করিয়া

একদিন তারা আবার আসিয়া দাঁড়ায় যশোদার কাছে। কিছুদিন পরে হয় তো তাদের একজনকে দেখা যায় একটি আপিসের বারান্দায় বুকের কাছে লাল ওরফে অফিসের নামের সঙ্কেত লেখা লম্বা কোট গায়ে চাপাইয়া কলিংবেলের টুং টুং আওয়াজের প্রতীক্ষায় টুলে বসিয়া ঢুলিতেছে, আরেকজনকে দেখা যায় পাড়ারই ডায়মণ্ড র‍্যাষ্টুরেন্টে (ডবল ডিমের মামলেট মাত্র ৵১৫ পয়সা) পাড়ার চা-প্রিয় ছেলে-বুড়োকে চা সরবরাহ করিতেছে। মুখের উপর হইতে একটা পর্দ্দা যেন সরিয়া গিয়াছে দু'জনেরই, জীবন-যাপনে দু'জনেই বেশ মশগুল।

যশোদা কি করিয়া টের পায় ভগবান জানেন, বোধ হয় অনেকদিন এদের সঙ্গে এদেরই একজন হইয়া বাস করিতেছে বলিয়া, কয়েক জন অলস ও অকর্ম্মণ্যকে কেবল জীবিকা অর্জ্জনের ভিন্ন পথ ধরাইয়া সে কাজের মানুষ করিয়া তুলিয়াছে। তার সখি কুমুদিনীর বাড়ীর ঠিক পাশে ন'কড়ি ছিল কুঁড়ে, একমাসের বেশী ন'কড়ি কোথাও চাকরীতে টিকিয়া থাকিতে পারিত না, তার ছেলেমেয়ে বৌ-এর সে কি দুর্দ্দশা! একবার যশোদার একখানা শাড়ী মাঝামাঝি ভাগ করিয়া ন'কড়ির বৌ আর মেয়ের তিনদিন ঘরের মধ্যে আটক থাকিবার পর বাহিরে আসিতে পারিয়াছিল। তারপর যশোদা ন'কড়ির তাড়িখানায় চাকরী করিয়া দিয়াছে, এবং জীবন যুদ্ধে এই চাকরীর কর্ম্মটী ন'কড়ির গায়ে যেন আঁটিয়া বসিয়া গিয়াছে, কোনোদিন খসিয়া পড়িবে না। আর সম্প্রতি ন'কড়ির বৌ একখানা নতুন ডুরে শাড়ি পরিয়া সমস্ত পাড়া ঘুরিয়া সকলকে দেখাইয়া বেড়াইয়াছে, যশোদাকে পর্য্যন্ত!

ধনঞ্জয়ের জন্য কাজ জোগাড় করিতে গিয়া যশোদা কিন্তু বিপদে পড়িয়া গেল। একেবারে আনাড়ি মানুষটা, কোন কাজ জানে না, কাজ শিখিবার বয়সও চলিয়া গিয়াছে। গায়ে জোর আছে, মাথায় মোট বহা আর ঠেলাগাড়ী ঠেলার মত যেসব কাজ শুধু গায়ে জোর থাকিলেই মোটামুটি করা যায়, সে সব কাজও লোকটা করিবে না—অপমান হইবে। সহ্যও বোধ হয় হইবে না, প্রকাণ্ড একটা দেহ থাকিলেই তো কষ্ট সহ্য করার শক্তি জন্মায় না। চাষবাসের কাজ জানে, কিন্তু এখানে চাষবাসের কাজ যশোদা কোথায় পাইবে!

'নিজের হাতে চাষ করতে তো? না অন্যকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিজে ফপরদালালি করতে?'

'নিজে কিছু করতাম বৈ-কি।'

'কিছু কিছু করতে!'

সেটা যশোদা আগেই টের পাইয়াছিল, মানুষটা একটু আরামপ্রিয় অর্থাৎ সহজ ভাষায় কুঁড়ে। আরামপ্রিয় মানুষ না হইলে রাগ অভিমান এমন প্রবল হয়, কথায় কথায় বোধহয় অপমান! নিখুঁত সৃষ্টি ভগবানের কুষ্ঠিতে নাই ভাবিয়া যশোদার বড় আপ্‌শোষ হয়। কি অপরূপ একটা শরীর! ধরাবাঁধা কাজে অলস কিন্তু বাজে কাজে পরিশ্রম করিতে খুব পটু, পনের মাইল হাঁটিয়া বেড়াইয়া আসে, না বলিতেই বালতি বালতি জল তুলিয়া ছাতে বর্ষার শ্যাওলা সাফ করিয়া দেয়—রাত্রে চিৎ হইয়া শুইয়া শরৎ কালের আকাশ দেখিবে! দেহের গড়নটা তাই তার বিকৃত হয় নাই, কেবল ভাল করিয়া খাইতে না পাওয়ার জন্যই বোধ হয় একটু—ধনঞ্জয়ের সর্ব্বাঙ্গে চোখ বুলাইয়া যশোদা আন্দাজ করিবার চেষ্টা করে ভাল করিয়া খাইতে না পাওয়ার জন্য এতটুকু ক্ষতি তার দেহের হইয়াছে, খাওয়া পাইলে আরও কতখানি পরিপুষ্ট দেখাইত তাকে।

কিন্তু কাজ? উপার্জ্জনের ব্যবস্থা? বসাইয়া বসাইয়া লোকটাকে পেট ভরিয়া খাওয়াইলেই ত চলিবে না, যতই ভাল লাগুক ওর খাওয়া দেখিতে। অনেক ভাবিয়া যশোদা একদিন বলিল, 'এক কাজ কর তুমি।' সুধীরের সঙ্গে রেলের ইয়ার্ডে যাও, চাদ্দিক ঘুরে ফিরে কাজ কম্মো ত্যাখো গিয়ে, তারপর ওখানেই সুবিধামত একটা কাজ তোমাকে জুটিয়ে দেব।'

'কাজ হবে কিনা না জেনে—'

যশোদা জোর দিয়া বলিল, 'হবে। নইলে মিছিমিছি তোমায় পাঠাব, মাথা খারাপ নাকি আমার? কাজ তুমি করতে পারবে কিনা সে হ'ল ভিন্ন কথা।'

ধনঞ্জয়ের সঙ্গে যশোদা এইসব আলোচনা করে আর সুধীর এদিক হইতে ওদিক যাওয়ার সময় আর ওদিক হইতে এদিক আসার সময় তীব্র দৃষ্টিতে দু'জনকে দেখিয়া যায়। গা জ্বালা করে সুধীরের। না খাইয়া কাজে গেলে ক্ষুধায় সে কষ্ট পাইবে বলিয়া এই যশোদাই কি একদিন তাকে খাওয়ার সুযোগ দিতে

চুপ করিয়া বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল? তার জন্য নিশ্চয় নয়, বুড়া মতির জন্য। বুড়ো মানুষকে যশোদা কষ্ট দিতে চায় নাই। তা ছাড়া, দু'বেলা খাইতে দেওয়ার জন্য যশোদা টাকা নেয়, জোর জবরদস্তি করিয়া খাওয়া বন্ধ করিবার তার কি অধিকার আছে, তাতে গোলমাল হইতে পারে। এই সব ভাবিয়াই হয় তো যশোদা সেদিন ওরকম বুদ্ধি আঁটিয়া তাদের খাওয়ার সুযোগ দিয়াছিল, নিজেরও মান বাঁচাইয়া ছিল। চালাক তো কম নয় যশোদা। অসুখের সময় সেবা করা? জরিমানার টাকা দেওয়া? এ সমস্তের চমৎকার ব্যাখ্যা সুধীর এখন আবিষ্কার করিতে থাকে। কি আর এমন সেবাটা যশোদা তার করিয়াছিল, ওরকম সে তো অসুখ-বিসুখের সময় সকলেই করে। যাদের কাছে থাকা আর খাওয়ার জন্য টাকা নেয় দুবেলা রাঁধিয়া তাদের খাওয়ানোর মত অসুখের সময় সেবা করাটাও তো যশোদার সাধারণ কর্ত্তব্য।

জরিমানার টাকাটা যশোদা দিয়াছিল, নিছক তাকে হাতে রাখিবার জন্য। সে কাজের লোক, তার মত কাজের লোক আর কটা আছে? সে হাতে থাকিলে ধীরে ধীরে জরিমানার টাকাটাও আদায় হইয়া যাইবে, অন্যদিকেও অনেক সুবিধা হইবে, এই সব হিসাব করিয়াই যশোদা তার সেই উপকারটা করিয়াছিল সন্দেহ নাই। রেলের ইয়ার্ডে তাকে কাজটা জুটাইয়া দিয়া মাঝখান হইতে যশোদা কিছু টাকা মারিয়াছে কিনা তাই বা কে জানে!

সুধীর চিরকাল জানিয়া আসিয়াছে মানুষের চালচলনই এই রকম, এই ধরণের ব্যবহারই মানুষ মানুষের সঙ্গে করিয়া থাকে, অন্য সময় অন্য কারও সঙ্গে হইলে রাগ করার কিছু আছে বলিয়া সে ভাবিতে পারিত না। এখন যশোদার সম্বন্ধে একটির পর একটি পরিবর্তনশীল মানসিক ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া তার যেন ধাঁধাঁ লাগিয়া যাইতে থাকে। অভিনব প্রত্যাশা ও প্রার্থনার মন্দিরে গোঁয়ার-গোবিন্দরা চিরদিন হরিজনের মত ভীরু, সঙ্কোচ আর অস্বস্তিতে মৃতপ্রায়—যতদিন না ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া মনের সুখে মন্দিরটাই ভাঙিয়া চুরমার করিবার সুযোগ পায়।

কাজে যাওয়ার সময় ধনঞ্জয়কে সঙ্গে নিয়া গিয়া চারিদিক দেখাইয়া শুনাইয়া দিবার প্রস্তাবে সে চোখে অন্ধকার দেখে।—'আমার কাজটি ওকে দেবার মতলব করছ বুঝি?'

'তোমার কাজটি ছাড়া জগতে আর কাজ নেই?'

শরৎকালে আসিবার পর অন্যান্য বছরের মত এবারও চারিদিকে সকলের মধ্যে যশোদার একটা বিস্ময়কর মানসিক উদ্বেগ লক্ষ্য করে। চাঁপা ও কালোর বিবাদ চরমে উঠিয়াছে, ঠেলাঠেলি ও গালাগালির বদলে চাঁপা এখন নিজে কালোর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে আর একদিকে জগৎকে দিয়া তাকে পীড়ন করায় অন্যদিকে সকলের কাছে তার নামে অকথ্য কুৎসা রটায়। জগৎকে হারানোর ভয়ে ব্যাকুল হইবার কোন কারণ ঘটে নাই, জগৎ নিজেও বরং বিবাহের দিনটি আগাইয়া আনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে, তবু চাঁপার দুর্ভাবনার যেন সীমা নাই। তা ছাড়া, মাঝে মাঝে সম্পূর্ণ অকারণে তার মুখে এমন একটা হতাশার ছাপ দেখা যায় যে, কালোর সম্বন্ধে তার বাড়াবাড়িটা একটু কমানোর জন্য তাকে ধমক দিবে ভাবিয়াও যশোদা ধমক দিতে পারে না।

পরেশকে একদিন পুলিশ ধরিয়া নিয়া যায়।

এতকালের মধ্যে এই দ্বিতীয় বার চুরির জন্য যশোদার ভাড়াটে পুলিশের হাতে পড়িল। যশোদার মনটা বড়ই খারাপ হইয়া যায়। পরেশকে চলিয়া যাইতে বলাই উচিত ছিল। আগে কোনদিন চুরি করে নাই বা ভবিষ্যতে সুযোগ পাইলে করিবে না, কিন্তু চুরি করা যে কোনদিন এদের কারও পেশা ছিল না, রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া গোপন অভিযানে বাহির হইবার ত্রাস ও উত্তেজনার স্বাদ যে এরা কেউ পায় নাই, যশোদা তা জানে। পরেশের মত সে সব এরা কেউ পায় নাই, যশোদা তা জানে। পরেশের মত সে সব মানুষের জাতই আলাদা, তাদের চিনিতেও যশোদার বিশেষ কষ্ট হয় না। তবু জানিয়া বুঝিয়াও পরেশের সম্বন্ধে কেন যে মনের দুর্ব্বলতা আসিয়াছিল!

পরেশের বৌকে সে জিজ্ঞাসা করিল, 'এবার তুমি কি করবে?'

পরেশের বৌ বলিল, কালীঘাটে আমার বাপের বাড়ী, আমায় যদি কালীঘাটে দিয়ে এসো যশোদাদিদি?'

কালীঘাটে তার বাবার বাড়ীর ঠিকানা পরেশের বৌ জানে না, কিন্তু মন্দিরের কাছে গেলে সেখান হইতে চিনিয়া যাইতে পারিবে। নন্দর সঙ্গে

তাকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবে বলায় পরেশের বৌ আপত্তি করিল, মিনতি করিয়া বলিল, 'না দিদি, পুরুষের সঙ্গে যাব না।'

'নন্দ তো ছেলেমানুষ, খোকার মা?'

হোক ছেলেমানুষ, পুরুষমানুষ তো, নন্দর সঙ্গে তাকে যাইতে দেখিলেই তার বাবা সন্দেহ করিবে, পাড়া-প্রতিবেশী সন্দেহ করিবে।

'তুমি আমায় দিয়ে এসো দিদি, পায়ে পড়ি তোমার।'

ধনঞ্জয়কে সঙ্গে করিয়া যশোদা পরেশের বৌকে পরদিন সকালবেলা তার বাপের বাড়ী পৌঁছিয়া দিল। তারপর গেল মন্দিরে। এককালে এ অঞ্চলও নাকি সহরতলী ছিল। কবে? যখন এখানে সবে সহরের পত্তন হইয়াছিল, তখন?

ধনঞ্জয় মস্ত বিদ্বান, স্কুলে ইতিহাস পড়িয়া যত বড় শরীর প্রায় তত বড় ঐতিহাসিকে পরিণত হইয়া গিয়াছে। সে বলিল, 'কলকাতা সহর যখন পত্তন হয়, সেই ইংরেজ আমলে, এটা তখন গাঁ ছিল?'

'সেই ইংরেজ আমল মানে? এটা কোন আমল?'

'ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে গো। ঐ যে ভবানীপুর না, যেখানটা এখন আসল সহর, ঐখানটাও আগে সহরতলী ছিল, শ্যাল ডাকত দিনদুপুরে।'

'দ্যুৎ!'

'দ্যুৎ? কেন, দ্যুৎ কেন? তিনটে গাঁ নিয়ে হল কলকাতা সহর, তা হলে একদিন ভবানীপুর কেন চৌরঙ্গীতে তো শ্যাল ডাকতে পারত অনায়াসে, ওখানটা যখন গাঁ ছিল?'

কথাটা বিবেচনা করিয়া যশোদা বলিল, 'সে হিসাবে সব জাগাই তো এককালে গাঁ ছিল।'

ধনঞ্জয় করুণার হাসি হাসিয়া বলিল, 'তা কেন হবে? কলকাতা হল বাংলার রাজধানী, ভারতবর্ষের রাজধানী হল দিল্লী। কলকাতার যখন চিহ্নও ছিল না তখনও দিল্লী সহর ছিল। এটা সহর নাকি? এটা হল—এটা হল নরক। বাঙালীরা খুব বজ্জাত কিনা তাই ইংরেজরা তাদের জন্যে এই নরক বানিয়েছে, কলকাতা শহর আছে বলেই তো বাঙালীর এই দুর্দ্দশা। ছেলে-গুলো একবার কলকাতা আসে আর বিগড়ে যায়, আমাদের গাঁয়ে কত ছেলে অমন গেছে। একটা বছর তুমি কলকাতা থাক, বাস্ আর গাঁয়ে গিয়ে বাস

করতে পারবে না। কলকাতার মত পাজী জায়গা আছে! পেটভরে মানুষ খেতে পর্য্যন্ত পায় না বাছা তোমাদের কলকাতায়, এ্যাঁ!'

যশোদা ফোঁস করিয়া উঠিল, 'কেন, পেটভরে খেতে দিই না তোমাকে?'

ধনঞ্জয় লজ্জিত হইয়া বলিল, 'আমার কথা বলছি নাকি? যেমন ধর ওই খাবারের দোকানটা, চার আনার খাবার কেনো, একবারটি মুখে দিতে কুলোবে না।'

'ভারি খাইয়ে তুমি তাই বলছ। একসের রসগোল্লা খেলে ঢেকুর তুলবে।'

যশোদা আর একটু খোঁচাইতেই ধনঞ্জয় রাগ করিয়া তার খাওয়ার শক্তির পরিচয় দিতে স্বীকার হইয়া গেল। পাঁচ টাকার একটা নোট সঙ্গে করিয়া যশোদা বাহির হইয়াছিল, নতুবা সে এ পরীক্ষা দেওয়ার জন্য ধনঞ্জয়কে ক্ষেপাইয়া তুলিত কিনা সন্দেহ। নিজেরও যশোদার ক্ষুধা পাইয়াছিল বৈকি, ভাল খাবার খাইতে তার নিজেরও তলে তলে বেশ একটু লোভ ছিল বৈকি। যশোদা ভাত খায় তার সব চেয়ে যোয়ান ভাড়াটের তিনগুণ, সেই জন্যই সে মাঝে মাঝে রীতিমত সঙ্কোচ বোধ করে, প্রাণ ভরিয়া ভাল খাবার খাওয়ার সাধটা তার সাধারণতঃ চাপাই থাকে। আজ ধনঞ্জয়ের সঙ্গে নিশ্চিন্ত মনে পেট ভরিয়া খাবার খাইল—ধনঞ্জয়ের খাওয়ার পরিমাণটা তার চেয়েও বেশী, এই জন্য ধনঞ্জয়ের কাছে বসিয়া খাইতে তার লজ্জা করে না।

দু'জনকে একত্র দেখিলেই লোকের একটু অবাক হইয়া চাহিয়া থাকার কথা, দোকানী সবিস্ময়ে দু'জনের খাওয়া দেখিতে লাগিল। তারপর হাসিয়া ফেলিল।

চোখে পড়ায় ধনঞ্জয় রাগিয়া বলিল, 'হাসি কি জন্যে শুনি?'

যশোদা বলিল, 'আমাদের খাওয়া দেখে হাসছে আর কি।'

দোকানীর হাসি নিভিয়া গিয়াছিল, হাত জোড় করিয়া সে তাড়াতাড়ি বলিল, 'আজ্ঞে না গিন্নিমা, খাওয়া দেখে কি হাসতে পারি! আপনারা খাবেন আজ্ঞে, তবে তো আমাদের দুটো পয়সা! আপনাদের দেখে বড় আনন্দ হল কিনা মনে, তাই হাসলাম একটু মনের সুখে। আমার একটি দিদি আছে গিন্নিমা, আমার পিসতাতো দিদি, তেনাও আপনারি মত আজ্ঞা।'

যশোদা বলিল, 'বটে নাকি?'

দোকানী বলিল, 'আজ্ঞা। তবে তেনার বয়েসটা কিছু বেশী হবে, চুলে পাক ধরে গেছে। আমরা যাই, তা তামাসা করে বলেন কি যে গুরুজন আমি, আমায় পেন্নাম কর রসিক। যেই পেন্নাম করতে মাটিতে মাথা ঠেকাই, মাথার পরে পা'টি তুলে দেয়। বাস্ সব নড়নচড়ন বন্ধ। পা'টি না সরালে আর মাথাটি সরাবার যো নেই।'

বেশ বুঝা যায় শেষটুকু বাড়ান ও বানান গল্প। যত শক্তিমতী পিসতুতো বোনই মাথায় পা রাখুক, মাথা নাড়ান চলিবে না এত জোরে পায়ের চাপ দিয়া তামাসা করার শক্তি তার থাকিতে পারে না, কারণ মাথায় ওরকম চাপ পড়িলে ডাক্তার ডাকিবার দরকার হয়। রসিক কেবল রসালো খাবারের দোকান করে নাই, মানুষটাও সে রসিক বটে। যশোদার শুনিতে বেশ মজা লাগিতেছিল।

রসিক বলিল, 'কিন্তু হায় অদেষ্ট! বোনাইটি আমার এই এইটুকুন মনিষ্যি—একটা বাচ্চা ছোকরার সমান। মা কালী আপনাদের কেমন সুন্দর মিল করেছেন দেখে তার কথাটা মনে পড়ল কি না, তাই হাসছিলাম গিন্নিমা।'

অনেক বেলা হইয়াছে, গঙ্গার ঘাটে বসিবার আর সময় ছিল না, তবু দু'জনে একটু বসিল। খাওয়াটা বড় বেশী হইয়াছে। অনেক নারী-পুরুষ ঘাটে স্নান করিতেছে, লজ্জাটা নারী ও পুরুষ উভয়েরই কম, মানুষের যতটা থাকা দরকার প্রায় ততটুকু—দেখিলে কে বলিবে তারা সহর বা সহরতলীর অধিবাসী, স্নানের সময় অন্ততঃ স্বাভাবিকতার পবিত্রতাটুকু পাওয়ার জন্যই যেন তারা বাড়তি সভ্যতা ত্যাগ করিয়াছে।

'আমি সত্যি হাতীর মত দেখতে, না?'

'কই না, তুমি তো মোটা নও।'

হাতী কি আর মোটা, হাতীর চেহারাই হাতীর মত। কোত্থেকে যে হলাম এমন! আমার বাপ-মা তো এমন ছিল না, আমার ভাইটা তো এমন নয়, বোন আছে একটা সে রীতিমত সুন্দরী—হ্যাঁ, মাইরি বলছি তোমায়। বিশ্বাস হল না?'

ধনঞ্জয় কি একবার যশোদাকে বলিতে গেল, তুমিও রীতিমত সুন্দরী? কথাটা কেমন শোনাইত কে জানে, জীবনে প্রথম একজন মানুষের কাছে কথাটা

শুনিতে যশোদার কেমন লাগিত তাই বা কে জানে! কিন্তু ধনঞ্জয় কথাটা জলো করিয়া ফেলিল এইভাবে যে, 'তুমিও তো খুব বেশী খারাপ নও।'

'খুব বেশী না হই—খারাপ তো?'

'কে বললে খারাপ?'

যশোদা হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে, তিনটি যুবতী তৈরি করা চলিত এতগুলি হাড়মাংসের পুতুলের মত। একটু বুঝি বিশ্বাস তার হয় কথাটাতে, বড় সাধ কিনা বিশ্বাস করার। দেখিতে সে খারাপ নয় একথা বিশ্বাস করিবার সাধ ছিল না কি যশোদার? হয়ত ছিল এতদিন খেয়াল করিয়াও খেয়াল করে নাই, খেয়াল করিতে সাহস পায় নাই। ধনঞ্জয় তাকে স্পষ্ট সুন্দরী বলিলে সে বোধহয় এই খেয়াল-খুসীর রসালো ফাঁদে পড়িত না, শুনিতে ভাল লাগা আলাদা কথা, সে মিঠা কথায় কাবু হওয়ার মানুষ যশোদা নয়, কিন্তু ধনঞ্জয় যেভাবে যা বলিয়াছে, সে কথাটা তো সত্য হওয়া আশ্চর্য্য নয়। তবু উঠিবার আগে ছড়া কাটিয়া রসিকতা করিতে যশোদা ছাড়িল না—

'ছদ্মবেশী ভীমকে পেয়ে কীচক খুসী ভারী,
ছদ্মবেশী ভীমকে পেয়ে কীচক খুসী নারী।'

ধনঞ্জয় রসিকতা না বুঝিয়া ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল, 'আহা, কীচক তো ভীমকে আর দেখতে পায় নি চোখে, ভেবেছিল দ্রৌপদী বুঝি। আমি তো তোমায় চোখে দেখে বলছি, দেখতে তুমি খারাপ নও।'

যশোদা হাসিয়া বলিল, 'আ মর! এ দেখি কচি খোকার মত অভিমান করে। তুমি কি বাবু কীচক, না আমি সৈরিন্ধ্রী, যে গায়ে লাগল?—নাও ইবারে বাড়ী চল, যা রোদটা উঠেছে।'

এদিকে পাড়ার দু'জন স্ত্রীলোকের উপর রান্নার ভার দিয়া ধনঞ্জয়ের সঙ্গে যশোদাকে বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়া সুধীর চোখে অন্ধকার দেখিতে থাকে। কেন গেল যশোদা, কি দরকার ছিল যশোদার যাওয়ার? যদি বা গেল, নন্দ থাকিতে ধনঞ্জয়ের সঙ্গেই বা গেল কেন? সুধীরকে তো সে বলিতে পারিত, আমার সঙ্গে চলো সুধীর। একদিন না হয় সুধীর কাজে যাইত না।

নন্দ কীর্ত্তন শিখিতে যাইতেছিল তার কাছে সুধীর পরেশের বৌ-এর

বিবরণ এবং যশোদার কালীঘাট যাওয়ার প্রয়োজন খুঁটিয়া খুঁটিয়া জানিয়া একটু যেন শান্ত হইল মনটা। যশোদা বাধ্য হইয়া গিয়াছে। হয়তো সুধীরের কাজে যাওয়া হইবে না ভাবিয়াই বেকার ধনঞ্জয়কে সঙ্গে নিয়া গিয়াছে গিয়াছে। তবু, সব কথা একবার তো সে বলিতে পারিত যে, এই দরকারে আমি এখানে যাচ্ছি সুধীর, তোমার কাজ কামাই হবে তাই ধনঞ্জয়কে সঙ্গে নিয়ে গেলাম!...এ ভাবে তাকে জানাইয়া যাওয়ার অর্থই যে তার অনুমতি নিয়া যশোদার কালীঘাটে যাওয়া এবং তার অনুমতি নিয়া যশোদার কোন কাজ করার সঙ্গত বা অসঙ্গত কোন কারণই থাকিতে পারে না, এসব সুধীরের মাথায় আসে না। অত সব ভাবিবার জানিবার বা বুঝিবার ক্ষমতা তো তার নাই। সে রাগ করিতে জানে, তাই সোজাসুজি যশোদার উপর রাগ করে।

তারপর সে ইয়ার্ডে যায় কাজ করিতে।

ওয়াগনে কুলীরা মাল বোঝাই দেয়, সুধীর সর্দারি করে। মাল তুলিতে একটু সাহায্য করে, কুলীদের তাড়া দেয়, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বিড়ি টানে, হঠাৎ ওয়াগনের ভিতরে ঢুকিয়া একটা মাল এদিকে একটা মাল ওদিকে কয়েক ইঞ্চি সরাইয়া দেয়, থাকিয়া থাকিয়া বস্তাগুলি গোণে আর রসিককে জিজ্ঞাসা করে, 'কটা বস্তা যাবে বললেন আজ্ঞে এটাতে?'

রাজেন যশোদার সখি কুমুদিনীর স্বামী, রাজেনকে বলিয়াই যশোদা এখানে সুধীরের কাজ জুটাইয়া দিয়াছে। কুমুদিনী জানিলে অবশ্য যশোদার লোককে কাজ দেওয়ার সাহস রাজেনের হইত না, কিন্তু কুমুদিনী জানে না। যশোদাকে রাজেন পছন্দ করে, ভয় আর খাতিরও করে—কিন্তু সেটা কুমুদিনীর অজ্ঞাতই আছে। আড়ালে যাই বলুক দেখা হইলে কুমুদিনী সখির মত আলাপ করে যশোদার সঙ্গে, তখন তার কথা শুনিয়া আর মুখের ভাব দেখিয়া কে অনুমান করিবে যশোদাকে সে দু'চোখে দেখিতে পারে না, যশোদার নাম শুনিলেই তাঁর মোটা শরীরের ঢিলা চামড়ায় জ্বালা ধরিয়া যায়। যশোদার কাছে কোন উপকার পাওয়ার সম্ভাবনা ঘটিলে নির্ব্বিবাদে সেটা আদর করিয়া নিতেও কুমুদিনীকে কোন দিন কুণ্ঠিত দেখা যায় নাই। উপকার পাওয়ার পরেই যশোদার নিন্দায় কুমুদিনী মুখর হইয়া উঠিলে রাজেন প্রায় নির্ব্বিকারভাবেই স্ত্রীর কথাগুলি শুনিয়া যায়, মাঝে মাঝে সায় দিয়া বিস্ময় ও বিরাগের

দু'একটা সংক্ষিপ্ত মন্তব্য হয়তো করে। কাঁচা-পাকা চুলে ঢাকা মাথাটি নাড়িতে নাড়িতে বলে, 'ছি ছি, ওকে আর বাড়ীতে ঢুকতে দিও না।'

তারপর কাজে যাওয়ার সময় হয়তো যশোদার বাড়ীতে একবার উঁকি দিয়া যায়, জীর্ণ-শীর্ণ মুখের চামড়া কৌতুকের হাসিতে কুঁচকাইয়া কুমুদিনীর নিন্দাগুলি সব যশোদাকে শোনায়, বলে, 'শুনলে যশোদা, কিসব বলে তোমার নামে?'

যশোদা কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বলে, 'বলুগে যাক্, মরুকগে যাক্, আজ তো নতুন নয়। ছেলেবেলা থেকে এমনি করে বলছে আমার নামে। তবে কি জান সরকারমশায়, আমার জন্যে ওর সত্যি মায়া আছে। এমনি বলে মুখে, কিন্তু—'

বাড়ীতে যতই নিরীহ হইয়া থাক, যশোদার কাছে যতই কৌতুকের হাসি হাসুক, মেজাজ কিন্তু রাজেনের একেবারেই ঠাণ্ডা নয়। সুধীর কয়েকবার বোকার মত প্রশ্ন করিলেই তার মেজাজ গরম হইয়া যায়।

'মনে থাকে না তোর নম্বার? ক'বার বলব?'

নাকের মাঝখানে আঁটা চশমার ভিতর দিয়া রাজেন হাতের খাতাটির বাদামী রঙের পাতায় চোখ বুলাইয়া বলে, 'তেইশটা।'

'যায়গা থাক্‌বে।'

'থাকবে তো তোর কি? তোর বাবার ওয়াগন?' নির্দ্দোষ মন্তব্যের জবাবটা একটু কড়া হইয়া গিয়াছে ভাবিয়াই হয়তো রাজেন একটু মৃদু গলায় বলে, ছেচল্লিশটা বস্তা দুটো ওয়াগনে যাবে, তেইশ ভাগ হবে না-রে পাঁঠা কোথাকার!'

'অ!' সুধীর তাড়াতাড়ি আর একবার ওয়াগনের ভিতরে গিয়া বস্তাগুলি গুণিয়া ফেলে। আরও কয়েকটি ওয়াগনে একই সময়ে মাল বোঝাই হইতেছিল। চটে মোড়া, কাঠের বাক্সে প্যাক করা, চৌকো গোল ছোট বড় কত মাল এখানে আসিয়া জমা হইয়াছে, কাছে ও দূরে কত বিভিন্ন তাদের গন্তব্য স্থান। প্রতিদিন রাশি রাশি মাল বাহিরে চলিয়া যায়, কিন্তু সহরের মাল ভাণ্ডার যেন অফুরন্ত। কথাটা ভাবিতে গেলে মাঝে মাঝে বিব্রত হইয়া সুধীরকে মাথা চুলকাইতে হয়, ব্যাপারটা সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। মাল যে কেবল এখান হইতে বাহিরে চলিয়া যায় তা অবশ্য নয়, ধুঁকিতে ধুঁকিতে ইঞ্জিন যে লম্বা ওয়াগনের সারি বাহির হইতে টানিয়া আনে সেগুলিও

মালে বোঝাই থাকে, কিন্তু যে মাল বাহিরে যায় তার সঙ্গে এইসব মালের তফাৎটা অনায়াসেই সুধীর বুঝিতে পারে। একই বস্তা হয়তো ফিরিয়া আসে, ওয়াগনে তুলিবার সময় যে প্যাকিং কেসটির উপর সে পানের পিক্ ফেলিয়াছিল, কয়েক মাস পরে সেই প্যাকিং কেসটিই হয়তো অন্য এক ওয়াগন হইতে নামানো হয়, কিন্তু তবু সুধীর জানিতে পারে ভিতরের মাল বদলাইয়া গিয়াছে। কারণ—সুধীর এইভাবে মনের মধ্যে যুক্তি খাড়া করে—যে জিনিষ এখান হইতে দুশো তিনশো মাইল দূরে চালান গিয়াছিল সেই জিনিষ কিছুকাল পরে আবার ফিরিয়া আসিবে কেন? মানুষ তো পাগল নয় যে মিছিমিছি গাড়ী ভাড়া গুণিবে!

সুধীরের শ্লথ অপরিণত মস্তিষ্কে এই সহরের মাল আনাগোনার ব্যাপারটার বিরাটত্ব সমুদ্র দর্শনার্থীর প্রথম সমুদ্র দর্শনের মত একটা আয়ত্তাতীত বিস্ময় ও আনন্দে চিরদিন স্তম্ভিত ও মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এ সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা আছে, ব্যাপক ও বিচিত্র। ভাবিতে গেলে তার মনে হয়, চিরটা জীবন সে বুঝি কেবল এই সহরের আমদানী রপ্তানীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজই করিয়া আসিয়াছে। জেটিতে সে কুলীর কাজ করিয়াছে, চোখ মিটমিট করিতে করিতে চাহিয়া দেখিয়াছে ক্রেনের সাহায্যে বিদেশী জাহাজে মাল ওঠানো নামানোর সশব্দ প্রক্রিয়া, ছোট-বড় ষ্টীমার আর পানসী নৌকোয় নিজে সে তাড়া-হুড়া হৈ-চৈ করিয়া মাল বোঝাই দিয়াছে, মাল নামাইয়া নিয়াছে, সহরতলীর খালগুলির দুপাশে গুদাম ও আড়তে কাজ করিবার সময় নৌকায় ধীরে-সুস্থে মাল আনা-নেওয়া দেখিয়াছে; রেলের ইয়ার্ডে কাজ করার সময় দেখিয়াছে, মালগাড়ীর আশ্রয়ে মালের দুমুখী স্রোত আর কাজের অবসরে সহরতলীর প্রধান পথের ধারে দাঁড়াইয়া দেখিয়াছে, মালবোঝাই লরী ও গরু মহিষের গাড়ীর আনাগোনা, ঝাঁকা ও মোট মাথায় মানুষের যাতায়াত। বিদেশে কি যায়, বিদেশ হইতে কি আসে, মফঃস্বলে কি যায়, মফঃস্বল হইতে কি আসে সে সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট আবছা ধারণা সুধীরের আছে। ধারণাটি লইয়া সময়ে অসময়ে সে মনে মনে খেলা করে, সৃষ্টি করে অর্থহীন অবাস্তব কতগুলি সমস্যা এবং ভাবিতে ভাবিতে বিফল ও বিরক্ত হইয়া ওঠে। কত সমস্যাই যে মনে জাগে সুধীরের! নদীটা যদি হঠাৎ মজিয়া যায়, জাহাজ ষ্টীমার

নৌকার আনাগোনা যদি হইয়া যায় বন্ধ, কি হয় তাহা হইলে? রেল কোম্পানী যদি হাঙ্গামা সহিতে নারাজ হইয়া একদিন বলিয়া বসে, 'ধুত্তোর' এবং বলিয়া রেলগাড়ীর চলাচল বন্ধ করিয়া দেয়, কি হয় তাহা হইলে? বাজার-গাড়ীতে, লরীতে, মানুষের মাথায় সহরে মাছ তরকারী আসা বন্ধ হয়, সহরের লোকের মাছ তরকারী সংগ্রহ করিবার কি উপায় হইতে পারে? এইরকম আরও কত দুর্ভাবনাই আসে সুধীরের মাথায়। পচা জিনিষ সম্বন্ধে মাছি যতটুকু জানে ব্যবসা ব্যাণিজ্যের সঙ্গে এতকাল এতভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া বেচারী ব্যাপারটা ততটুকুও বোঝে না কিনা।

কাজে ফাঁকি দিলে যতটা না হয় সুধীরকে চিন্তিত দেখিলে রাজেন রাগিয়া আগুন হইয়া যায়।

'তুই বড় বজ্জাত সুধীর, এক নম্বর বজ্জাত।'

এত গরমে ক্রমাগত গালাগালি কাঁহাতক মানুষের সহ্য হয়? সুধীরের রক্ত আর মাথা এক সঙ্গে গরম হইয়া ওঠে। মনে মনে রাজেনকে অকথ্য গালাগালি দিতে দিতে ওয়াগনের দরজা বন্ধ করিতে যায়। দরজা সিলমোহর করিতে হইবে, খড়ি দিয়া ওয়াগনের গায়ে সঙ্কেত ও নির্দ্দেশ লিখিতে হইবে, তারপর সরাইয়া দিতে হইবে পাশের লাইনে। প্রথম কাজ দু'টি অন্য লোকের, শেষ কাজটা করিতে হইবে সুধীরকে। দরজা বন্ধ করিয়া সুধীর তীব্র দৃষ্টিতে রাজেনকে দেখিতে থাকে—শুকনো মোচার মত শীর্ণ মুখ তুলিয়া রাজেন তার দিকে চাহিলেই সে মুখ ফিরাইয়া নিবে, সেটুকু বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা সুধীরের আছে, কিন্তু যশোদার উপর নিরুপায় ক্রোধের জ্বালায় পেট ভরিয়া সুধীর খাইতে পারে নাই, যার চেয়ে তার রাগের বড় প্রমাণ বোধ হয় আর কিছুই হইতে পারে না, কিন্তু কাজে আসিয়া সুধীর তার অতীত ও বর্ত্তমান জীবনের কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এইসব কথাই ভাবে। কাজ যারা করে তাদের জীবনে এই জন্যই কি রোমান্স থাকে না?

কাজে সুধীর ফাঁকি দেয় না কিন্তু তাকে ফাঁকে চিন্তিত মুখে বিড়ি টানিতে দেখিলে রাজেন বড় রাগিয়া যায়। নিজের জানা একটি লোক ছিল রাজেনের এই কাজটা সে তাকে জুটাইয়া দিবে ভাবিয়াছিল, যশোদার অনুরোধে সুধীরকে কাজটা জুটাইয়া দিতে হওয়ায় সুধীরের উপরেই বোধ হয় তার মেজাজটা একটু

বিগড়াইয়া আছে।

'এক নম্বর ফাঁকিবাজ তুমি সুধীর—একনম্বর বজ্জাত।'

সুধীরের রক্ত আর মাথা একসঙ্গে গরম হইয়া উঠে। পেটটাও বুঝি তার ক্ষুধার জ্বালা অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, মাঝ-দুপুর পার হইয়া গিয়াছে। চোখ তুলিয়া চাহিয়া স্থাখে, ধনঞ্জয় কখন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, বিড়ির ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে রাজেনের গালাগালিতেই বোধহয় আমোদ পাইয়া মুখে হাসিও ফুটাইয়াছে। শুকনো মোচার মত শীর্ণকায় রাজেনের উপর যে রাগটা হইয়াছিল, সে রাগটা সুধীরের তাই গিয়া পড়ে দৈত্যের মত বিশাল-দেহ মানুষটার উপর। মনে মনে রাজেনের বদলে ধনঞ্জয়কে অকথ্য গালাগালি দিতে দিতে সে ওয়াগনের আরও কাছে সরিয়া যায়। ধনঞ্জয়কে সুধীর ভয় করে। ভূতপ্রেত দৈত্য-দানার যে ভয় আচমকা ছোট ছেলেদের ঘুম ভাঙ্গাইয়া দেয়, অন্ধকারে মাকে জড়াইয়া ধরিয়া যে ভয়ে ছোট ছেলে থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ফুপাইয়া ফুপাইয়া কাঁদে। সেই সঙ্গে হিংসা তো আছেই। গত কয়েকদিনের মধ্যে যে হিংসার তীব্রতা মারাত্মক গোপন রোগের মত ভিতরে ভিতরে একটা দুর্বোধ্য যাতনায় সুধীরকে প্রায় পাগল করিয়া তুলিয়াছে।

ধনঞ্জয় কাছে আগাইয়া আসে। 'কালীঘাট গেলাম ভাই যশোদার সঙ্গে—যা মিষ্টিটাই একপেট খাওয়ালে যশোদা। যত বলি আর খাব না, তত খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে খাওয়ায়, বলে, এই খাওয়ার ক্ষমতা নিয়ে তোমার এত গব্বো! আর কটা রসগোল্লা যদি না খাও তুমি, চাদ্দিকে তোমার নিন্দে রটিয়ে বেড়াব। —বাড়ী এসে ফের বলে কি, নাও চান করে, ভাত খেয়ে নাও চটপট, তারপর সুধীরের সঙ্গে কাজকম্মে দেখবে যাও।'

সুধীর এখান হইতে ওখানে যায়, মাল গোণে, ওয়াগনের দরজা বন্ধ করে, কুলীদের সঙ্গে ঠেলিয়া এ লাইন হইতে ওয়াগন পাশের লাইনে সরাইয়া দেয়। এই সব গোলমালের মধ্যে যে ওয়াগনটির কিছুক্ষণের জন্য নড়িবার কথা ছিল না সেটাকে সুধীর কিভাবে কখন ঠেলিয়া দেয় আর কিভাবে ওয়াগনের চাকা ধনঞ্জয়ের একটি পায়ের উপর দিয়া চলিয়া যায় ঠিক মত কেউ বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

হাসপাতালে যশোদার কাছে ধনঞ্জয় বলে 'সরতে পেলাম কৈ? পাশের লাইনে একটা ইঞ্জিন যাচ্ছিল তাই দেখছি, পাশ থেকে গাড়ীটার ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলাম। লাইনের বাইরে পড়েছিলাম গো যশোদা, দুটো পা-ই যদি গুটিয়ে নিতাম তাড়াতাড়ি, হায় হায়! কেমন যেন হকচকিয়ে গেলাম।'

ধনঞ্জয় কাতরায় আর কাঁদে। এতবড় একটা দৈত্যের মত মানুষের চোখ দিয়া জল পড়িতে দেখিয়া যশোদারও মনে হয়, একমাত্র চাঁদের শোকে দু'একটা দিন সে যা করিয়াছিল, আজ বুঝি তাই করিয়া বসিবে—সোজাসুজি কাঁদিয়া ফেলিবে। তবু সে জেরা করে।

'একটা পা গুটিয়ে নিলে, আরেকটা নিলে না কেন?'

তা কি ধনঞ্জয় জানে? অনেক ভাবিয়া সে আন্দাজে বলে, 'পড়বার সময় একটা পায়ে চোট লেগেছিল বলে বোধ হয়।'

সেটা সম্ভব। যশোদা কয়েকবার যে প্রশ্ন করিয়াছে, আবার তাকে সেই কথাই জিজ্ঞাসা করে, 'কিন্তু গাড়ীটা ঠেলে দিলে কে?'

'কে জানে। দু'একজন সুধীরের নাম করছিল, কিন্তু তারাও ঠিক ছাখে নি, জোর করে বলতে নারাজ।'

কিন্তু সুধীর ওয়াগনটা ঠেলিয়া দিবে কেন ধনঞ্জয়ের গায়ের উপর? দিলেও ইচ্ছা করিয়া নিশ্চয় দেয় নাই। ভ্রূ কুঁচকাইয়া যশোদা ভাবিতে থাকে, তার মনের মধ্যে এই প্রশ্নটা বার বার জাগিতে থাকে যে, ধনঞ্জয়ের গায়ের উপর সুধীর ইচ্ছা করিয়া ওয়াগনটা ঠেলিয়া দিবে কেন?

নন্দ বড় চমৎকার কীর্ত্তন গাহিতে পারে। ছেলেবেলা হইতেই তার গানের দিকে ঝোঁক, গান শোনার সুযোগ পাইলে সে আর সব ভুলিয়া যাইত। এখনও ভুলিয়া যায়, গান শোনার সময় আর নিজে গাওয়ার সময়। মাইলখানেক দূরে কদমতলার বিখ্যাত কীর্ত্তনীয়া দীননাথ তাকে কীর্ত্তন শিখাইয়াছে। শিক্ষা এখনও শেষ হইয়াছে বলা যায় না, তবে যেটুকু নন্দ শিখিয়াছে সাধারণ লোকের পক্ষে তাই যথেষ্ট, আর কিছু শিখাইবার মত বিদ্যা গুরুরও তার আছে কিনা সন্দেহ। তবু নন্দ এখনও নিয়মিতভাবে শিখিতে যায়, দিননাথ যা শেখায় ব্যাকুল আগ্রহে তাই শেখে, মাঝে মাঝে দু'চার টাকা গুরুদক্ষিণা দেয়। কীর্ত্তন দীননাথের জীবিকার উপায়ও বটে, জীবনের একমাত্র নেশাও বটে, এখন পর্য্যন্ত নন্দর

এটা শুধু নেশা হইয়াই আছে। নন্দর ইচ্ছা শুধু কীর্ত্তন করিয়াই জীবনটা কাটাইয়া দিবে—কীর্ত্তনের মত আর কি আছে জগতে? সোণার মত নাম বলিয়া সুবর্ণ যার নাম, তার কথা অবশ্য আলাদা। তবে নন্দর কল্পনার চিরন্তনী রাধার সঙ্গে ভাবভঙ্গি চালচলন কোনদিক দিয়াই সুবর্ণের মিল নাই বলিয়া নন্দর বড় আপশোষ। কথা সুর ভাব ও আবেগ এই সব নিয়া যে কীর্ত্তন, নন্দর মনে সত্যসত্যই তার একটা মূর্ত্তি আছে, কখনও স্পষ্ট দেখিতে পায় কখনও আবছা হইয়া যায়; সুবর্ণের সঙ্গে কতকটা মিল আছে মূর্ত্তিটির, কিন্তু সে মিল কোন কাজের মিল নয়, তার কোন দাম নাই। নন্দর রূপধরা কীর্ত্তন বিজনে বসিয়া মালা গাঁথে, ফুল গাছের পাতাটি খসিয়া পড়ার শব্দে চকিত হইয়া ওঠে, উৎসুক চোখে চাহিয়া থাকে, চুল আর আঁচল উড়াইয়া যমুনা নামক নদীর তীরে (সহরের কয়েক মাইল উজানে গঙ্গার ধারে নন্দর একটি চেনা স্থানের সঙ্গে যার আশ্চর্য্য মিল আছে) ছুটিয়া যায়, ধূলায় সোণার অঙ্গ লুটাইয়া কাঁদে, অভিমানে মুখ ভার করিয়া থাকে, আরও কত কি করে। সুবর্ণকে নন্দ কোনদিন এসব করিতে দেখে নাই।

মাঝে মাঝে এখানে ওখানে দীননাথ দলবলসহ কীর্ত্তন গাহিতে যায়, নন্দও সঙ্গে যায়। কোনদিন গুরু আসর জমায়, কোনদিন শিষ্য। সাধারণ জীবনে নন্দ ভীরু ও লাজুক, চোখ তুলিয়া লোকের সঙ্গে কথা বলিতে পারে না, কিন্তু কীর্ত্তনের আসরে শ্রোতাদের মধ্যে আবেগ, রোমাঞ্চ ও শিহরণ বিতরণ করার করার সময় তার সবটুকু আড়ষ্ট ভাব কাটিয়া যায়, লজ্জা-ভয়ের চিহ্নও থাকে না। সর্ব্বাঙ্গের ভাবভঙ্গির মধ্যে শব্দে যা সম্পূর্ণ প্রকাশ করা গেল না, তারই অভিব্যক্তি দিবার চেষ্টাটা যেন আপনা হইতেই চলিতে থাকে। কীর্ত্তনের কথায় হঠাৎ রাধিকার লজ্জা পাওয়ার সময় নন্দকে দেখিতে দেখিতে সত্যই মনে হয় ভিজা কাপড়ে পরপুরুষের সামনে পড়িয়া গৃহস্থ বধূ যেন নিজের মধ্যে নিজেই লুকাইতে চাহিতেছে, কাপড়টি এখানে ওখানে একটু টানিয়া না দিলেই নয়, কিন্তু আঁচলের তলা হইতে হাতটি বাহির করিতে যাওয়ায় হাতটিই তার লজ্জায় অবশ হইয়া গেল, মচকান ডালের মত মরিয়াই গেল নাকি কে জানে!

কোন কোনদিন রাধার বিরহে কৃষ্ণের কি অবস্থা হইয়াছিল আত্মহারা

হইয়া সকলকে তাই বুঝাইতে থাকে, শুনিতে শুনিতে দীননাথ কাঁদিয়া ফেলে। নন্দকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলে, 'আমি কি পারি? এমন কিশোর কোমল কণ্ঠ আমি কোথায় পাব? বিরহ যাতনায় শ্যামের যখন আমার চেতনা লোপ পেয়ে এসেছে, রাধার নাম নিতে নিতেই শেষ নিশ্বাস ফেলবেন ভেবে অস্ফুটস্বরে বলছেন রাধা রাধা, আর নিজের মুখে রাধার নাম শুনে দেহে যেন জীবন ফিরে আসছে—তখনকার সেই আকুল মিনতিভরা ডাক আমার এই কর্কশ কণ্ঠে আমি কেমন করে ফোটাবো গো।'

সত্য সত্যই এমনিভাবে বলে দীননাথ, নাটকের পার্টের মত আগে হইতে যেন মুখস্থ করা ছিল। আসরে যে আবহাওয়াটা তখন সৃষ্টি হইয়া আছে, শ্রোতারা যে রকম মুগ্ধ ও বিভোর হইয়া গিয়াছে, তাতে দীননাথের কথা ও কান্নায় সকলের চোখ সজল হইয়া আসে, অনেকে ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিতে চায়, কেউ কেউ কাঁদেও।

বড় আসরে অনেকক্ষণ জমজমাট কীর্ত্তন করিয়া আসিবার পর দু'তিন দিন নন্দ হাসে না, কথা বলে না, খাইতে চায় না, নড়াচড়া করিতে চায় না, প্রাণহীন জড়পিণ্ডের মত শুইয়া বসিয়া সময় কাটায়। যশোদা ভয়ে ভয়ে ভাবে যে, কি জানি কি হইবে, এরকম প্রচণ্ড ভাবাবেগ আর তার প্রতিক্রিয়া এই রোগদুর্ব্বল ছেলেমানুষের কতদিন সহ্য হইবে? নন্দর কীর্ত্তনের মোহ কাটাইতে কত চেষ্টাই যে যশোদা করিয়াছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। জোর করিয়া আটকাইয়া রাখিলে দিন দিন নন্দর ভাবপ্রবণতা আর অবরুদ্ধ উত্তেজনার চাঞ্চল্য এমনভাবে বাড়িয়া যাইতে থাকে যে, তাতেও যশোদা ভয় পাইয়া যায়।

একি অপদার্থ একটা জন্মিয়াছিল তার ভাই হইয়া? এর চেয়ে কোকেন-খোর আফিমখোরেরাও ভাল, তারা কেবল নিজেদেরই সর্ব্বনাশ করে, এ ছোঁড়া আরও কত ছেলে-মেয়েকে গোল্লায় পাঠাইতেছে তার হিসাব নাই।

একদিন সত্যপ্রিয় নন্দর কীর্ত্তন শুনিবার আগ্রহ জানাইয়া অনুরোধ করিয়া পাঠাইল। অনুরোধটা আসিল জ্যোতির্ম্ময়ের মারফতে। সেদিন পিতৃশ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে নন্দকে নিয়া একটু নির্দ্দোষ পরিহাস করায় নন্দ যে রাগ করিয়া চাকরী ছাড়িয়া দিয়াছে, একথা জানিয়া সত্যপ্রিয়র নাকি দুঃখের সীমা নাই। নন্দর জায়গায় অবশ্য আরেকজন লোক নেওয়া হইয়াছে, কিন্তু সত্যপ্রিয় যত

শীঘ্র সম্ভব নন্দকে আরেকটি চাকরী দিবে। আগামী রবিবার সত্যপ্রিয়র বাড়ীতে একটু খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করিয়াছে, ঐদিন নন্দ যদি একটু কীর্ত্তন করে তার বাড়ীতে, আর যশোদা যদি দু'টি শাকান্ন গ্রহণ করে, সত্যপ্রিয় বড়ই বাধিত হইবে। বলিলেন, 'মিল আর শ্রমিকদের অবস্থা সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে একটু কথাবার্ত্তা বলতে চান।'

সত্যপ্রিয় মিলে আবার একটা ধর্ম্মঘটের গুজব চলিতেছিল, দু'চারজন পাণ্ডা আসিয়া যশোদার সঙ্গে দেখাও করিয়াছে। হঠাৎ নন্দ আর তাকে সত্যপ্রিয়র এতখানি খাতির করার কারণটা অনুমান করিতে যশোদার অবশ্য দেরী হইল না, তবু সে রাজী হইয়া গেল। এখন ধর্ম্মঘট করার পক্ষপাতী সে নয়, মিলে কাজ খুব কম, এখন ধর্ম্মঘট করিয়া বিশেষ কিছু লাভ হইবে না। তা' ছাড়া, ধর্ম্মঘট হইবে কি-না তাও এখনও ঠিক নাই। এদিকে সত্যপ্রিয়কে শ্রমিকদের অনেকদিনের ন্যায়সঙ্গত দাবীর কিছু কিছু অন্ততঃ মিটাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করার যদি সুযোগ পাওয়া যায়, সেটা গ্রহণ করিতে দোষ কি? লাভ হয়তো কিছুই হইবে না, তবু চেষ্টা করিতে দোষ নাই।

নন্দর কীর্ত্তন করা সম্বন্ধেই কেবল যশোদার মনটা খুঁত খুঁত করিতে লাগিল। অনেক লোকের মধ্যে কীর্ত্তন করিতে গেলেই নন্দর বড় বেশী উত্তেজনা হয়। কিন্তু বাধা দিয়াই বা কি হইবে? এখানে না হোক দু'দিন পরে অন্য একটা বড় আসরে নন্দ কীর্ত্তন করিতে যাইবে—আধমরা হইয়া বাড়ী ফেরার আগে সে হয়তো জানিতেও পারিবে না নন্দ কীর্ত্তন করিতে গিয়াছিল।

উপলক্ষ্য সামান্য, সত্যপ্রিয়র পিতার মাসিক শ্রাদ্ধ। শোনা যায়, জীবনের শেষ দশ বৎসর সত্যপ্রিয়র পিতা ছেলের মুখ দর্শন করেন নাই, মুখ দর্শন করিবার পর বাঁচিয়াছিলেন মোটে কয়েকমাস। কেউ কেউ নেহাৎ তামাসা করিয়াই বলে বটে যে, সত্যপ্রিয় নিজের মুখটা না দেখাইলে বুড়া আরও কয়েকটা বছর হয়তো টিঁকিয়া যাইত। কিন্তু এসব কথা সত্যপ্রিয়র কানে যায় কি না সন্দেহ, গেলেও পিতৃহত্যার পাপ মাথায় চাপিয়াছে এ ধরণের খুঁতখুঁতানির জন্যই সে বার্ষিক বা মাসিক একটা শ্রাদ্ধও বাদ দেয় না, একথা মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

জ্যোতির্ম্ময় এবং তার বাড়ীর মেয়েদেরও নিমন্ত্রণ হইয়াছে। উপলক্ষ্য যত

সামান্যই হোক, নিমন্ত্রিতের সংখ্যা শ'তিনেকের নীচে নামিবে না। সত্যপ্রিয়র বাড়ীতে কোন উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রিতের সংখ্যা এর কম বড় একটা হয় না, কম করা চলে না। লোকে বলিবে কি ?

রবিবার সকালে জ্যোতির্ম্ময় অপরাজিতাকে বলিল, 'কীর্ত্তন যদি শুনতে চাও তিনটের আগে যেতে হবে, তা যদি না শোনো তাহলে সন্ধ্যার সময় গেলেই চলবে। আর শোনো, উনি যে নেকলেশটা দিয়েছিলেন বিয়ের সময়, সেটা পরে যেও।'

'আমি যাব ?'—অপরাজিতা বিবর্ণ মুখে জিজ্ঞাসা করিল।

'যাবে না ? ওঁর বাড়ী নেমন্তন্ন, এত কাছে থেকে না গেলে চলবে কেন ?'

তবে অবশ্য কোন কথা নাই, না গেলে যখন চলিবেই না তখন যাইতে হইবে বৈকি। 'না, এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম যাব কি না।' গভীর শ্রান্তিতে অপরাজিতার হাই ওঠে, আবার শুইয়া পড়িতে ইচ্ছা হইতেছে।

'নেকলেশটা কিন্তু পরা চলবে না।'

জ্যোতির্ম্ময় একটু হাসিয়া বলিল, 'কেন ? সাজবার সাধ নেই ? না না, পোরো নেকলেশটা, কর্ত্তা দেখলে খুসী হবেন। চোখে অবশ্য ওঁর পড়বে কি না সন্দেহ, তবু যদি সামনে পড়েন কখনো, প্রণাম করবার সময় পড়তে পারে চোখে। সামনে পড়লে প্রণাম কোরো কিন্তু পায়ে হাত দিয়ে।'

'নেকলেশটা কেমন কালো হয়ে গেছে, ও আর পরা যাবে না।'

জ্যোতির্ম্ময় আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, 'কালো হয়ে গেছে মানে ? দেখি।'

অপরাজিতা অপরাধীর মত মকমলের কেসটা বাহির করিয়া আনে। কেসটি তেমনি উজ্জ্বল আছে, কিন্তু নেকলেশটির কেমন যেন জ্যোতি নাই। সোণাটা পিতলের মত দেখাইতেছে, পাথর আর মুক্তাগুলি যেন কাঁচ আর পুঁতি।

'কাউকে দেখাইনি এ্যাদ্দিন, লুকিয়ে রেখেছিলাম। তোমায় বলতেও কেমন—'

জ্যোতির্ম্ময় বিহ্বলের মত চাহিয়াই থাকে। অপরাজিতা আবার বলে, 'আমাদেরি ভুল হয়েছিল, জিনিষটা নকল।'

জ্যোতির্ম্ময় যেন চোখে দেখিয়াও বিশ্বাস করিতে পারে না, 'তাই কি হয়, উনি আসল জিনিষ বলে নকল দেবেন ?'

'আসল জিনিষ বলে তো দেন নি।'

জ্যোতির্ম্ময় নেকলেশটা নাড়াচাড়া করিতে থাকে, তার মুখের খানিকটা জ্যোতিও যেন নিভিয়া গিয়াছে।

অপরাজিতা মিনতি করিয়া বলে, 'আচ্ছা, নাইবা গেলাম আমি? শরীরটা একটু—'

শুনিবামাত্র কি রাগটাই যে জ্যোতির্ম্ময়ের হয়! চোখ পাকাইয়া সে বলে, 'বড় ছোট মন তো তোমার? যদি দিয়েই থাকেন একটা নকল জিনিষ, তাই বলে ওঁর বাড়ী যাবে না তুমি? মাস গেলে উনি মাইনে দেন বলে দু'বেলা পেট ভরছে সেটা খেয়াল আছে?'

অন্য কেউ হয়তো বলিত যে, একা সত্যপ্রিয় নয়, কাজ করিলে সকলেই মাস গেলে মাহিনা দিয়া থাকে, এটা এমন কিছু সৃষ্টিছাড়া উদারতার পরিচয় নয়। অপরাজিতা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মকমলের কেসটা বন্ধ করিয়া তার হাতে দিয়া জ্যোতির্ম্ময় বলিল, 'বাক্সে তুলে রেখে দাও, কেউ যেন না ছাখে। কাউকে বোলো না।'

নেকলেশটা নকল বলিয়াই যেন জ্যোতির্ম্ময় রাগ করিয়া বেলা একটা বাজিতে না বাজিতে গাড়ী আনিয়া সকলকে সঙ্গে করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। কেবল নিমন্ত্রণ রাখিতে যাওয়া নয়, এখন হইতে রাত্রি দশটা এগারটা পর্য্যন্ত অপরাজিতাকে সত্যপ্রিয়র বাড়ীতে থাকিতে হইবে। যশোদার সরু গলির মুখে গাড়ী দাঁড় করাইয়া তাকে ডাকা হইল, কিন্তু যশোদার এখন গেলে চলিবে না। ওবেলার রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করিয়া যাইতে হইবে।

সন্ধ্যার সময় যশোদা যখন সত্যপ্রিয়র বাড়ীতে গেল, নীচের হল ঘরটিতে নন্দর কীর্ত্তন চলিতেছে। হল ঘরটি পুরুষ শ্রোতায় ভরিয়া গিয়াছে, পাশের দু'টি ঘরের বড় বড় চারটি দরজার কাছে মেয়েদের ভীড়। নন্দর কীর্ত্তন শুনিবার লোভ যশোদার কম নয়, তবু সে না শুনিয়া এড়াইয়া চলিবার চেষ্টাই করে, পাড়ায় কোথাও নন্দর কীর্ত্তন হইলেও সহজে যাইতে চায় না। সে ভাবিয়াছিল এতক্ষণে কীর্ত্তন শেষ হইয়া গিয়াছে। একটি দরজার কাছে মেয়েদের মধ্যে বসিয়া কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে সে ভাবিতে থাকে, আজ তো বিভোর হইয়া নন্দ ঘণ্টার পর ঘণ্টা কীর্ত্তন করিয়া চলিয়াছে, কাল তার কি অবস্থাটাই না জানি হইবে! কিন্তু বেশীক্ষণ যশোদা এসব দুশ্চিন্তা মনের মধ্যে পুষিয়া

রাখিতে পারে না।

নন্দর কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে যশোদারও মানসিক জগতটা ধীরে ধীরে একেবারে বদলাইয়া যায়। কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হয়, বুকের মধ্যে আকুলি বিকুলি করিতে থাকে আর যত সব আবোল-তাবোল খাপ্‌ছাড়া কথা মনে আসে। নন্দ এদিকে নিজেই রাধা হইয়া তার কৃষ্ণের মত কালো তমালকে কত যে মনের কথা বলে আর যশোদা এদিকে ভাবিতে থাকে যে ধনঞ্জয়টা সত্যই কি নিষ্ঠুর, এ জগতে কেবল সেই পারে যশোদাকে বুকে তুলিয়া লইতে কিন্তু একবারও কি সে বলিল, এসো যশোদা, আমার বুকে এসো? 'যাইতে বলিলেই যে চলিয়া যায় সে কেমন ধারা প্রেমিক গো!' বলিয়া নন্দ এদিকে যত অনুযোগ করে, যশোদার তত মনে হয়, তাই তো বটে, ঠিক তো, সে কাছে ঘেঁষিতে দেয় না বলিয়া কাছে ঘেঁষিবে না, কেমন ধারা মানুষ ধনঞ্জয়?

তারপর এক সময় সুবর্ণের দিকে চোখ পড়ায় যশোদা যেন চেতনা ফিরিয়া পায়, মনটা ছ্যাঁৎ করিয়া ওঠে। মুখখানা লম্বাটে হইয়া গিয়াছে সুবর্ণের, ছোট একটু হাঁ করিয়া আছে, দু'চোখ বড় বড় করিয়া খোলা, কি একটা রোগের যন্ত্রণায় মেয়েটা যেন মুখ ভেংচি দিয়াছে। একটু আগে তার নিজের মুখ-ভঙ্গিটা কি রকম হইয়াছিল কে জানে! আর ধনঞ্জয়ও তো কাটা পা নিয়া পড়িয়া আছে হাসপাতালে।

জোর করিয়া যশোদা বাড়ীর কথা ভাবিতে আরম্ভ করে, এসব পাগলামিকে আর প্রশ্রয় দিবে না। সকাল সকাল সে রান্না সারিয়া রাখিয়া আসিয়াছে, ও বাড়ীর নদেরচাঁদের বৌকে পরিবেশন করিতে বলিয়া আসিয়াছে, কিন্তু খাওয়ার সময় বোধহয় গোলমাল বাধিবে, যা সয়তান তার বাড়ীর লোকগুলি, হৈ চৈ এত ভালবাসে! এসব কথা ভাবে বটে যশোদা, কিন্তু ভাবিতে যেন ভাল লাগে না, আবেগে ব্যাকুল হওয়ার জন্য মনটা আকুলি বিকুলি করিতে থাকে—ঘরবাড়ী, ভাড়াটে, ডালভাত পরিবেশণ এ সমস্তের চিন্তায় রস কৈ, নেশার মত রস?

এদিকে কাশীবাবুর সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে মাঝে মাঝে সত্যপ্রিয় জ্যোতির্ম্ময়কে জিজ্ঞাসা করিতেছিল যশোদা আসিয়াছে কি না। যশোদার সম্বন্ধে আজ তার আগ্রহের সীমা নাই। কীর্ত্তন শেষ হইবার পর যশোদাকে

সঙ্গে করিয়া জ্যোতির্ম্ময় দোতলার একপ্রান্তে একটি মাঝারি আকারের ঘরে নিয়া গেল। এটি সত্যপ্রিয়র অবসর যাপনের ঘর, একপাশে চৌকীর মত সাদাসিদে ছোট একটি খাটে বিছানা, একটি রিভলভিং বুক সেল্‌ফে কতগুলি বই আর মেঝেতে আসন করিয়া বসিয়া লিখিবার জন্য একটি ডেস্ক ছাড়া আর কোন আসবাবের বালাই নাই। একটি চেয়ারও চোখে পড়ে না। বাড়ীর অন্যান্য অংশে গৃহস্বামীর ঐশ্বর্য্যের নির্লজ্জ বিজ্ঞাপন দুই চোখ ভরিয়া দেখিতে দেখিতে এ ঘরে আসিয়া ঢুকিলে মনে হয়, এখানে বুঝি কোন সংসারবিরাগী নিস্পৃহ সন্ন্যাসী বাস করে। সত্যপ্রিয়র বেশ আর ঝকঝকে মেঝেতে তার বসিবার ভঙ্গি দেখিয়া কথাটা আরও বেশী করিয়া মনে হয়।

সত্যপ্রিয়র বেশ দেখিয়া জ্যোতির্ম্ময় পর্য্যন্ত আজ একটু অবাক হইয়া গেল। যশোদাকে ডাকিয়া আনিতে যাওয়ার সময় সত্যপ্রিয়র পরনে সাদা কাপড় ছিল, গায়ে জামা ছিল—দূরে কোথায় অসময়ে বাদলা দেখা দেওয়ায় সহরতলীতে শীতের আমেজ টের পাওয়া যাইতেছিল। এখন কিন্তু খালি গায়ে হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া সত্যপ্রিয় মেঝেতে আসন-পিঁড়ি হইয়া বসিয়াছে, পরনের কাপড়খানা গরদের। কাঁধে মোটা পৈতা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, বাহুতে অনেকগুলি কবজ ও তাবিজ, কব্জির কাছে স্ফটিকের জপমালা জড়ানো। মনটা হঠাৎ যেন কেমন করিয়া উঠিল জ্যোতির্ম্ময়ের, সত্যপ্রিয় কি দর্শক অনুসারে বেশ বদলায়? সত্যপ্রিয়কে নানা বেশে সে দেখিয়াছে, কোন-দিন হ্যাটকোট পরা খাঁটী সাহেবী পোষাক, কোনদিন মাথায় টুপি, গায়ে লম্বা কোট খানিকটা—পশ্চিম ভারতীয়ের পোষাক, কোনদিন মটকার পাঞ্জাবী, কোঁচানো ধুতি, কাঁধে ভাঁজ-করা চাদর—বাঙ্গালী পোষাক, কোনদিন মাঝে মাঝে সত্যপ্রিয়র বেশে মুসলমান ভদ্রলোকের বেশের একটু ধাঁচ যে কি করিয়া আমদানী হয় জ্যোতির্ম্ময় বলিতে পারে না। আজ হঠাৎ জ্যোতির্ম্ময়ের মনে পড়িয়া গেল, যতবার সত্যপ্রিয়কে সে ভিন্ন ভিন্ন পোষাকে দেখিয়াছে তার প্রত্যেকবার বিশেষ প্রয়োজনে হয় ভিন্ন দেশীয় কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির তার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবার অথবা তার নিজের গিয়া দেখা করিবার কথা ছিল।

ঘরের রিক্ততা ও সত্যপ্রিয়র বেশ যশোদাকেও একটু কাবু করিয়া ফেলিয়াছিল। মানুষটাকে প্রণাম করিবার কোন সঙ্কল্পই তার ছিল না, কিন্তু ঘরে ঢুকিয়া

প্রৌঢ় ও সাধুবেশধারী ব্রাহ্মণকে সে একেবারে পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিয়া ফেলিল, কারও বলিয়া দিবার দরকার হইল না—যশোদা, ইনিই তিনি, একে প্রণাম কর। দেখিয়া জ্যোতির্ম্ময় ভাবিতে থাকে, এই জন্যই কি সত্যপ্রিয় তাড়াতাড়ি বেশ বদলাইয়াছে, যশোদার মনে শ্রদ্ধা জাগাইবার জন্য? একটু পিছাইয়া আসিয়া মেঝেতে হাতের ভর দিয়া একটু কাত হইয়া যশোদা সসম্রমে বসে আর জ্যোতির্ম্ময় মনের মধ্যে নকল নেকলেশের দীপ জ্বালিয়া নতুন দৃষ্টিতে সত্যপ্রিয়কে দেখিতে থাকে। এ কি সম্ভব? মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী দেখা করিতে আসিবে বলিয়া সত্যপ্রিয় ইচ্ছা করিয়া বেশের খানিকটা বাঙ্গালীত্ব লোপ করিয়া দেয়, পুরাপুরি মাড়োয়ারী সাজে না সেটা মাড়োয়ারীরও দৃষ্টিকটু হইবে বলিয়া? কেবল এইটুকু বেশ পরিবর্ত্তন করে যার অলক্ষ্য প্রভাব আগন্তুকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হইতে তাকে সাহায্য করিবে, অজ্ঞাতসারে তার দৃষ্টিকে তৃপ্তি দিবে?

'আপনিও বসুন জ্যোতির্ম্ময়বাবু।'

জ্যোতির্ম্ময় বসিলে সত্যপ্রিয় বলিল, 'তোমার ভাই বড় সুন্দর কীর্ত্তন করে বাছা, শুনে মুগ্ধ হয়ে গেছি। কিন্তু—তুমি প্রায় আমার মেয়ের বয়সীই হবে তোমায় বলতে দোষ নেই—ছেলেটির স্বাস্থ্য ভাল নয়।'

মেয়ের বয়সী না হইলে নন্দর স্বাস্থ্য ভাল নয় একথাটা তাকে বলিলে কি দোষ হইত যশোদা বুঝিতে পারে না বটে, কিন্তু খুসী সে হয়।

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, ওর জন্য মাঝে মাঝে বড় ভাবনা হয়।'

'বয়স বাড়লে হয়তো স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। পড়াশোনা কতদূর করেছে?'

'প্রথম পাশের পরীক্ষায় ফেল করেছে।'

'বেশ, বেশ। পাশ করে তো সব রাজা হচ্চে আজকাল। দেশের বেকার সমস্যা যে কি উৎকট হয়ে দাঁড়িয়েছে তা টের পাই বাছা আমরা, চাকরীর জন্য রোজ দলে দলে ছেলেরা আসছে, তাদের দেখে কি দুঃখই যে হয়। আমার দেশের সোনারচাঁদেরা, দেশের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা, দু'টি অন্নের জন্য তারা হাহাকার করে বেড়াচ্ছে। সকলের আগে এখন আমাদের কি করা দরকার জান বাছা, দেশের বেকার সমস্যা দূর করা। খেতেই যদি না পায় মানুষ তবে সে করবে কি, আগে পেটের ভাতের যোগাড় করে তবে না অন্য

কথা ?'—কথা বলিতে বলিতে সত্যপ্রিয় যশোদার মুখের ভাব-পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে থাকে পেটের ভাতের কথাটা যশোদার খুব প্রিয় বুঝিতে পারিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করে, 'কিন্তু দেশকে যারা চালায়, তারা কি তা বুঝতে পারে, না বুঝতে চায় ? সব ভেসে চলেছে স্রোতে, নাম চাই, হাততালি চাই। না, না, সবাই ফাঁকিবাজ আমি তা বলছি না বাছা, দেশের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেছেন, এ রকম মহৎ লোক কি নেই দেশে, অনেক আছে—কিন্তু বল তো বাছা, তুমিই বল, চোখ-কান বুজে শুধু ত্যাগ করলেই কি কাজ হয় ? না খেয়ে যে মরতে বসেছে যথা-সর্ব্বস্ব বিক্রি করে, বিলেত থেকে দামী ওষুধ এনে খাওয়ালে সে কি বাঁচে। 'ইংরেজকে তাড়াও,' 'ধর্ম্মঘট কর,' 'স্বাধীনতা চাই'—এইসব বলে বাবুরা চেঁচাচ্ছেন, এদিকে দেশের চাষী-মজুররা খেতে পাচ্ছে না, ছেলেরা সব বেকার যন্ত্রণা সইতে না পেরে আত্মহত্যা করছে—'

প্রথমটা যশোদা একটু ভড়কাইয়া গিয়াছিল, এখন সামলাইয়া উঠিয়া গম্ভীর মুখে শুনিয়া যায়। মিলের কথা শান্তভাবে আলোচনা করিয়া মিলের শ্রমিকদের সম্বন্ধে কোন অনুরোধ করিয়া যে লাভ হইবে না, বুঝিতে যশোদার আর বাকী থাকে না। ভদ্রলোক ভাবপ্রবণতা আনিয়াছে। আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, এ বর্ম্ম ভেদ করিয়া শ্রমিকদের দুঃখের কাহিনী দিয়া তার মর্ম্ম ভেদ করার ক্ষমতা কারও নাই। কথা বলিতে বলিতে আবেগের আতিশয্যে কারও মুখ দিয়া যখন থুতু ছুটিতে আরম্ভ করে, পরের কথায় সে তখন কান দেয় না।

একটু আত্মসম্বরণ করিয়া সত্যপ্রিয় বলে, 'যাক্, যাক্। দেশের অবস্থা তোমারও অজানা নয়, আমারও অজানা নয়। তোমার ভাইকে একটি চাকরী দিতে হবে, না ? ছেলে মানুষ ঝোঁকের মাথায় কাজটা ছেড়ে দিল, নইলে ওই কাজেই ওর উন্নতি হত। বেশ কাজ করছিল ছেলেটি, না জ্যোতির্ম্ময়বাবু ? তা, কয়েকটা মাস যাক এখন, ক'মাস পরে তোমার ভাইকে একটি ভাল চাকরী বোধ হয় দিতে পারব। আমার মিল দু'টোতে ক'মাস পরে আগাগোড়া সংস্কার করব ভাবছি, নতুন লোকজন নিয়ে কাজের ভাল ব্যবস্থা করে ফেলব। মিলের লোকেরাও নানা রকম দাবীদাওয়া করছে, সে বিষয়েও একটু বিবেচনা করে দেখতে হবে।'

উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছয়টা দরজার একটার দিকে পা বাড়াইয়া বলে, এবার সকলকে

খেতে বসানো দরকার, দেখি গিয়ে কি ব্যবস্থা হল। দু'টি শাকান্ন মুখে দিয়ে যেও কিন্তু বাছা।'

সত্যপ্রিয় চলিয়া গেলে জ্যোতির্ম্ময় নেকলেসের কথা, সত্যপ্রিয়র বেশ পরিবর্ত্তনের গোপন রহস্যের কথা, সব ভুলিয়া গিয়া প্রায় গদ গদ কণ্ঠে বলিল, 'দেখলে চাঁদের মা, শুনলে ? এমন মানুষ আর দেখেছ ?'

যশোদা স্বীকার করিয়া বলিল, 'খানিক খানিক দেখেছি—এমন তুখোড় দেখিনি।'

তারপর যশোদা অন্দরে গেল। তাকে দেখিয়াই সুবর্ণ উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল, 'কী সুন্দর কীর্ত্তন করে তোমার ভাই, যশোদাদিদি! এমন আর জীবনে শুনিনি!'

কত সুদীর্ঘ জীবন সুবর্ণের, কত কীর্ত্তনই সে শুনিয়াছে! সে আর জীবনে কখনও এমনটি শোনে নাই, নন্দর এতবড় সার্টিফিকেট যেন আর হয় না।

'গলাটা মিষ্টি বলে শুনতে ভাল লাগে, নইলে শিখেচে কচু।'

সুবর্ণ উত্তেজিত হইয়া বলে, 'না, না, তুমি জান না যশোদাদিদি, ভাল করে না শিখলে কেউ এমন করে গাইতে পারে ? সবাই কি বলছে জান ? কীর্ত্তন যে এমন হয় এ্যাদ্দিন কেউ ভাবতেও পারে নি।'

যশোদা একটু হাসে আর মনে মনে বলে, সবাই তো তোমারি মত পণ্ডিত। কীর্ত্তন যে গাহিয়াছে যশোদাই তার দিদি শুনিয়া মেয়েরা কেউ কেউ আসিয়া তার সঙ্গে কথা বলে, কীর্ত্তনের প্রশংসা জানায়। যশোদা প্রতিবাদ করে না, মৃদু একটু হাসিয়া কতকটা কথা বদলানোর উদ্দেশ্যে আর কতকটা মেয়েমানুষের প্রকৃতিগত কৌতূহলের জন্য জিজ্ঞাসা করে, এ মেয়েটি কে, ও বৌটি কে। অল্প সময়ের মধ্যেই অধিকাংশ মেয়ের পরিচয় যশোদার জানা হইয়া যায়। নিমন্ত্রিতের সংখ্যা আজ খুব কম, কিন্তু সত্যপ্রিয়র অন্দরেই যত নারী বাস করে একটি সাধারণ কাজের বাড়ী ভরাট করিয়া তুলিবার পক্ষে তারাই যথেষ্ট। কেউ বসিয়া থাকে, কেউ ঘুরিয়া বেড়ায়, কোথাও দল বাঁধিয়া কয়েকজন গল্পগুজব করে। বেশীর ভাগ মেয়েকে সুবর্ণ-ই যশোদাকে চিনাইয়া দেয়, কোনটি সত্যপ্রিয়র মেয়ে, কোনটি তার বৌ, কোনটি তার বোন, কোনটি ভাগ্নী অথবা ভাইঝি অথবা দূরসম্পর্কের আত্মীয়া।

সত্যপ্রিয়র অন্দরের কমবয়সী মেয়েদের সম্বন্ধে সাধারণভাবে সুবর্ণ মন্তব্য করে, 'কি বিচ্ছিরি করে সেজেছে, এমন গেঁয়ো ওরা! গায়ে রাশ রাশ গয়না চাপিয়ে দিলেই যেন সাজা হয়!'

যশোদা ভাবে, 'থাকলে তুমিও গায়ে চাপাতে ছাড়তে না।' সুবর্ণের মন্তব্য শুনিয়া নয়, আপনা হইতেই এবাড়ীর মেয়েদের সম্বন্ধে যশোদার একটা অস্পষ্ট ধারণা গড়িয়া উঠিতে থাকে। বাড়ীর লোকের কাছে বাড়ীর কর্ত্তা কতকটা রাজার মত, সেই একজন মানুষের ব্যক্তিত্বের ও কর্ত্তৃত্বের চাপে কারও স্বাভাবিক বিকাশ হয় নাই, সকলেই অল্প-বিস্তর বিকার পাইয়াছে। তা'ছাড়া আছে বড়লোকের অন্দরমহলের অধিবাসিনী হওয়ার অপরিহার্য্য পরিণাম। এ বাড়ীর মেয়ে হওয়ার অর্থ-ই যে অন্য বাড়ীর মেয়ের মত না হওয়া, এটা সকলেই জানে। আশ্রিতা আছে বহু, কারও দাবীর জোর বেশী, মানমর্য্যাদাও বেশী, কারও দাবীর জোর কম, মানমর্য্যাদাও কম এবং এই হিসাব মত এ ওর মন জোগাইয়া চলে, এ ওকে অবজ্ঞা করে, হিংসাটা হইয়া থাকে বিশ্বব্যাপী। আশ্রিতারাই কি বাড়ীর মেয়েদের মন বিগড়াইয়া দেয় বেশী, আবহাওয়াটা করিয়া তোলে বেশী বিকৃত? সত্যপ্রিয়র সেজমেয়ে আর মেয়েটির সমবয়সী পিসতুতো বোনটির আজন্ম একসঙ্গে লালিতপালিত হওয়ার ফলটা কয়েক মিনিট চোখে দেখিয়াই যশোদার তাক লাগিয়া যায়। সেজমেয়ের কাপড়খানার দাম অনেক বেশী, গয়নাও তার গায়ে অন্যজনের চেয়ে দশগুণ। আজ একটি নতুন দুল পরিয়াছে সেজমেয়ে।

সেজমেয়ে (মুখ ভার) : সবাই চলে গেলেই তোমার দুল ফিরিয়ে দেব।

পিসতুতো বোন (ভীতা) : কেন ভাই?

সেজমেয়ে : দিদির কানবালা ধার করে পরতে পারবে বলেই তো যেচে যেচে নিজের বিচ্ছিরি দুল দুটো আমায় পরালে।

পিসতুতো বোন : তুই নিজেই তো চেয়ে নিলি ভাই?

সেজমেয়ে : কখন চাইলাম?

পিসতুতো বোন : না ঠিক, এমন বোকা আমি।

সেজমেয়ে : বোকা তুমি নও। দুল দুটো পরলে নিজেকে খুব সুন্দর দেখায় জানো কিনা তাই আমি যেই দুলদুটো নিয়ে এলাম, ওমনি ফন্দি এঁটে

দিদির কানবালা নিয়ে পরলে, যাতে আরও সুন্দর দেখায়। ফর্সা রঙের অহঙ্কারে ফেটে পড়ছো, বোকা হতে যাবে কোন দুঃখে?

পিসতুতো বোন: আমার রঙটা তো ফ্যাকাসে সাদা ভাই, তোর মত দুধে আলতা তো নয় ভাই? কানবালা খুলে ফেলব?

বাড়ীর একটি বিশেষ শ্রেণীর আশ্রিতাদের সঙ্গে যশোদাকে খাইতে বসানো হইল, দাসী চাকরাণী নয়, সত্যপ্রিয়র সঙ্গে সত্যই তাদের সম্পর্ক আছে, তারা আত্মীয়া। তবে, সত্যপ্রিয়র মেয়ে আর বৌরা যে যশোদাকে একেবারে খাতির করিল না তা নয়, একটু দূরে দাঁড়াইয়া যশোদা আর যশোদার খাওয়া চাহিয়া দেখিয়া তাদের কি ফিস্ ফাস্ কথা আর চাপা হাসি। সুবর্ণ বোধ হয় অন্য ঘরে খাইতে বসিয়াছিল।

পিসতুতো বোনের সঙ্গে কলহের পর সেজমেয়ের মনটা ভাল ছিল, কে একজন যশোদার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া ফেলিল। যশোদা তখন বড় বড় লেডিকিনি মুখে তুলিতেছিল। খাওয়া বন্ধ করিয়া সে বলিল, 'এই ছুঁড়ি এদিকে শোন্।'

মেয়েদের হাসিগল্পের গুঞ্জন থামিয়া গেল, সেজমেয়ে কয়েক পা' আগাইয়া আসিয়া মুখ লাল করিয়া বলিল, 'তোমার তো আস্পদ্দা কম নয়!'

'তোমারি বা কম কি দিদি? আমায় নেমন্তন্ন করে এনেছ, বয়সে আমি তোমার মা মাসীর সমান, আমার খাওয়া দেখে কি বলে তুমি হাসলে? এরকম যে হাসতে নেই, ছোটলোকের বাড়ীর মেয়েরও সেটুকু শিক্ষে আছে।'

'আমায় তুমি ছোটলোকের মেয়ে বললে! দাঁড়াও, বাবাকে বলে তোমায় মজা দেখাচ্ছি।' সেজমেয়ে ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল।

যশোদা খাইয়া উঠিয়া বাড়ীর পিছনের বারন্দায় সত্যপ্রিয়র স্ত্রীর কাছে একটু বসিল। রাত প্রায় এগারটা বাজে, জ্যোতির্ম্ময়ের বাড়ীর সকলে কোথায় যে উধাও হইয়া গিয়াছে। একসঙ্গে ফেরা যাইত।

সত্যপ্রিয়র স্ত্রী বড় শান্ত ও নিরীহ মানুষ, কিছুক্ষণ আগে তার সঙ্গে দু'একটা কথা বলিয়াই যশোদা এটা টের পাইয়াছিল। সব সময়েই কেমন যেন ভ্যাবাচেকা লাগিয়া আছে।

'মেয়ে নাকি কি বলেছে আপনাকে?'

'কি আবার বলবে? ছেলেমানুষ, ওর কথার ভারি দাম!'—যশোদা একটু হাসিল।

'আপনি রাগ করবেন না, ছেলেমেয়েগুলো আমার বড় বেয়াড়া। বলুন রাগ করবেন না?' বলিয়া সত্যপ্রিয়র স্ত্রী যশোদার হাত ধরিল। ইস্, এইজন্য সে এখানে একা বসিয়া আছে, বাড়ীর গিন্নী সে! ধনীর গৃহিণীতে পরিণত হইতে না পারায় স্বামী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, দাস-দাসী কারও সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে না পারায় একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়া নিজের একটা মানসিক বিকারের অবাস্তব জগতে ভাসিয়া গিয়াছে, সকলের অপরাধে নিজেকে যেখানে সে অপরাধী মনে করে, তার হাত ধরিয়া ক্ষমা চায়।

কিছুক্ষণ পরে সত্যপ্রিয় আসিল।

'খাওয়া হয়েছে? বড় রাত হয়ে গেল। গাড়ী বলে দিয়েছি।'

'গাড়ী কি হবে? এইটুকু পথ হেঁটেই চলে যাব।'

কিন্তু তা হয় না, যশোদা যে সত্যপ্রিয়র অতিথি। পথ যতটুকুই হোক, রাত্রি-কাল, স্ত্রীলোক, হাঁটিয়া যাওয়া চলে?

যশোদা জিজ্ঞাসা করিল, 'জ্যোতির্ম্ময়বাবুর বাড়ীর সবাই কি চলে গেছে?'

'আধ ঘণ্টা আগে। আমিই বললাম জ্যোতির্ম্ময়বাবুকে, একটু পরে তোমাকে পাঠিয়ে দেব তোমার ভায়ের সঙ্গে। গাড়ীটা একটু আটকা ছিল। তা তোমার ভাইকে তো কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না যশোদা।'

'সে তবে আগেই চলে গেছে। কেত্তন করলে ওর শরীর বড় দুর্ব্বল লাগে।'

সত্যপ্রিয় নিজেই সঙ্গে করিয়া যশোদাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিল। বোধ হয় সেদিন নন্দকে যে অপমান করা হইয়াছিল, আজ সুদে আসলে নন্দর দিদিকে সম্মান দিয়া তার ক্ষতিপূরণ হইতেছে। যশোদা ভাবিল, কি মতলব আঁটছ তুমি কে জানে! সত্যপ্রিয়কে একটু বেশী গম্ভীর ও অন্যমনস্ক মনে হইতেছিল। যশোদাকে আরেকদিন আসিবার জন্য অনুরোধ করিল।

'শুনলাম বেয়াদবির জন্য মেয়েকে নাকি ধমক দিয়েছ। আমার কাছে নালিশ করতে এসেছিল, আমিও ধমক দিয়েছি। তবু আমার বাড়ীতে আমার মেয়েকে অমন করে বলবার সাহস কারও হতে পারে, ভাবতেও পারিনি যশোদা।'

'ছেলেমানুষের দোষ দেখিয়ে দেব, তাতে আর সাহসের কি আছে!'

সত্যপ্রিয় হঠাৎ যেন বড় সরল হইয়া গিয়াছে, যশোদার সঙ্গে যেন তার অনেকদিনের পরিচয়। ম্লানমুখে একটু হাসিয়া বলিল, 'তুমি জান না যশোদা, আমার চাকরবাকরের দোষ দেখিয়ে দেবার সাহস পর্য্যন্ত অনেকের হয় না। যাদের কোনদিন একটি পয়সা পাবার ভরসা নেই যারা চায়ও না একটি পয়সা, তারা পর্য্যন্ত ভয়ে মরে আমি পাছে চটে যাই।'

একথার জবাবে যশোদা কিছু বলিল না। প্রত্যাশা না থাকে, সত্যপ্রিয় চটিলে যে ভয়ের কারণ আছে এটুকু সেও বোঝে। টাকা অনেক কিছু করিতে পারে। তার বাড়ীর কাছেই এমন দু'একজন মানুষ বাস করে যাদের হাতে মোটে শ'খানেক টাকা গুঁজিয়া দিলে একদিন এই সত্যপ্রিয়র মাথাটা ফাটাইয়া কয়েক মাস জেল খাটিয়া আসিতে রাজী হইয়া যাইবে। টাকার পরিমাণটা বেশী করিলে একেবারে খুন করিয়া ফাঁসি-কাঠে ঝুলিবার ঝুঁকিটা নিতেও হয়তো রাজী হইয়া যাইতে পারে। এরা সব নীচুস্তরের জীব, কিন্তু উঁচুস্তরেও এমন কত জীব আছে, যারা এদেরই রকমফের, হাতে কিছু টাকা গুঁজিয়া দিলে যারা খুন না করিয়াও মানুষের এমন সর্ব্বনাশ করিতে পারে, যা খুন করার ও বাড়া। এমন শক্তি যে টাকার, সত্যপ্রিয় সেই টাকা গাদা করিয়াছে। প্রত্যাশা যারা করে না, তারাও তাকে ভয় করিবে বৈকি। তা'ছাড়া, প্রত্যাশা করা না করার প্রশ্নই কেবল নয়, গেরুয়া কাপড় দেখিলেই ধর্ম্মভীরু গৃহস্থের যেমন পায়ে লুটাইতে ইচ্ছা হয়, বড়লোককে ভয় আর খাতির করা সেইরকম একটা সংস্কারে দাঁড়াইয়া গিয়াছে মানুষের।

পরদিন দুপুরবেলা কীর্ত্তনের অবসাদে নন্দ ঝিমাইতেছে, কোথা হইতে স্বর্ণ আসিয়া হাজির।

'একটু কীর্ত্তন গাইবে? একটুখানি?'

উত্তেজনা সে যেন চাপিয়া রাখিতে পারিতেছে না, চোখে-মুখে ফুটিয়া বাহির হইতেছে। যশোদা যে ঘরের অন্যদিকে চৌকীতে বসিয়া জামা সেলাই করিতেছিল, তার চোখে পড়িয়াছে কি না সন্দেহ। একটা ঘরে ঢুকিয়া সেই ঘরেই যশোদার মত একটি মানুষকে চোখে না পড়ার মত অবস্থা, আবেগ একটু বেশীরকম উথলাইয়া না উঠিলে হওয়া সম্ভব নয়।

নন্দ মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বলিল, 'এমনি তো হয় না, মানে, আয়োজন চাই কিনা অনেক, আর অনেকক্ষণ ধরে না গাইলে—'

এ বাড়ীতে সুবর্ণের আসাটাই খাপছাড়া ব্যাপার তাও এমন অসময়ে। কাল নন্দর কীর্ত্তন শুনিয়া তার কি রকম লাগিয়াছিল নন্দকে জানাইবার জন্য সে ছটফট করিতেছিল, সবুর সয়নাই, নতুবা জানাইবার সুযোগের অভাব তার হইত না, নন্দই হয়তো আজ কালের মধ্যে তাদের বাড়ী যাইত।—'কীর্ত্তন যে এমন হয়, আমি সত্যি জানতাম না, কাল শুন্‌তে শুন্‌তে আমার যে কি রকম হচ্ছিল—'

যশোদা মনে মনে বলে, 'রকম ন্যাখো ছুঁড়ির, ও রকম তো তোর সব সময়েই হচ্ছে।'

মুখে অবশ্য ভদ্রতা করিতে হয়, এ ধরণের ভাবোচ্ছ্বাসের জন্য গালে চড় কসাইয়া দিবার নিয়ম নাই। বড় জোর গম্ভীর মুখে, কড়া সুরে এদিকে আসিয়া বসিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করা চলে যে, ব্যাপারখানা কি। কিন্তু তাতে কি এসব মেয়ের মাথা ঠাণ্ডা হয়?

'তুমি শুনেছ যশোদাদিদি? কাল শুনেছ কীর্ত্তন? ও, হ্যাঁ, তুমি তো কাল গিয়েছিলে নেমন্তন্ন খেতে। কীর্ত্তন শুনে কাল বাড়ী ফিরে বৌদি কাঁদছিল। ঘরে নয়, সবাই ঘুমোবার পর সিঁড়িতে বসে। আমি জিজ্ঞেস করতে বল্‌লে, কীর্ত্তন শুনে এমন মন কেমন করছে ছোট্‌ ঠাকুরঝি!—বৌদি আমায় ছোট্‌ ঠাকুরঝি বলে।'

'সবাই ঘুমোবার পর তুমি বুঝি জেগে ছিলে?'

'হ্যাঁ, কিছুতেই ঘুম আসছিল না কাল।'

'চান করনি আজ?'

'না, গায়ে জল লাগলেই এমন ছ্যাক্ ছ্যাক্ করে উঠছিল যশোদাদিদি। ঐ যা, আসল কথাই ভুলে গেছি। বৌদি তোমায় একবার যেতে বলেছে বড্ড দরকার।'

'চলো তবে, এখুনি শুনে আসি দরকারটা কি।'

ছেলেমানুষ, রাত্রে ভাল করিয়া ঘুমায় নাই, জ্বরও বোধহয় আসিয়াছে, চোখ দেখিলে মনে হয়, কোন পাগলা-গারদ হইতে যেন পালাইয়া আসিয়াছে।

তাড়াতাড়ি সেলাই রাখিয়া যশোদা উঠিয়া পড়ে, বাড়ী নিয়া গিয়া সর্ব্বাগ্রে নিজের হাতে লেবু দিয়া বড় এক গ্লাস সরবৎ বানাইয়া মেয়েটাকে খাওয়াইবে, তারপর অন্য কথা।

কিন্তু সুবর্ণ নড়িতে চায় না।—'তুমি যাও না যশোদাদিদি, আমি যাচ্ছি একটু পরে।'

'না, আমার সঙ্গে এসো। এখানে কি করবে তুমি?'

'একটু কীর্ত্তন শুনব।' নন্দর দিকে চাহিয়া মিনতি করিয়া বলে, 'জোরে না গাও, গুন্ গুন্ করে একটু গাও না? সেই যেখানটা গাইতে গাইতে কাল তুমি কাঁদছিলে, সেখানটা।'

যশোদা আর কথা না বলিয়া সোজাসুজি সুবর্ণের ডান হাতের কব্জি চাপিয়া ধরিয়া তাকে একরকম গায়ের জোরে টানিয়াই সঙ্গে নিয়া ঘরের বাহির হইয়া যায়। আর ভদ্রতা করা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। কে বলিতে পারে কখন মেয়েটা মেঝেতে চিৎ হইয়া হাত-পা ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে মুখে ফেনা তুলিতে আরম্ভ করিয়া দিবে? কেবল লেবুর সরবৎ নয়, যাওয়ার সময় দু'পয়সার বরফও কিনিয়া লইয়া যাইতে হইবে কিষেণের দোকান হইতে। সুবর্ণের মাথাটাও ধোয়াইয়া দিবে বাড়ী গিয়াই।

'হাত ছাড় যশোদাদি উঃ রে বাবারে, হাতটা ভেঙ্গে ফেলবে নাকি তুমি আমার?'

বাড়ীর বাহির হইয়া যশোদা হাত ছাড়িয়া দিল। চোখ মুছিতে মুছিতে সুবর্ণ তার সঙ্গে চলিল আর বিড়বিড় করিয়া কি যে বলিতে লাগিল অস্ফুটস্বরে সে-ই জানে।

'কেঁদো না সুবর্ণ। রাস্তায় যদি কাঁদো ঠাস করে গালে চড় বসিয়ে দেব বলে রাখছি।'

শুনিয়া সুবর্ণের কান্না ও বিড়বিড়ানি দুই-ই হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল। বরফ কেনার সময় ক্ষীণকণ্ঠে সে একবার জিজ্ঞাসা করিল বটে, 'বরফ কিনছ কেন যশোদাদিদি?'—যশোদা জবাবও দিল না।

জ্যোতির্ম্ময়ের বাড়ী গিয়া গলা নরম করিয়া যশোদা বলিল, 'তোমার যে অসুখ হয়েছে বোন, জ্বর হয়েছে। মাথাটা ধুয়ে দিই এসো, তারপর তুমি

শুয়ে পড়গে যাও। বরফ দিয়ে আমি সুন্দর সরবৎ বানিয়ে দিচ্ছি, খেলেই তোমার জ্বর কমে যাবে।'

মিষ্টি কথা শোনামাত্র সুবর্ণ ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, 'আমার অসুখ হয়েছে আর তুমি আমায় এমন করে মারলে যশোদাদিদি !.... ...'

সুবর্ণের ব্যবস্থা করিয়া জ্যোতির্ম্ময়ের ঘরে বসিয়া ভদ্রলোকের বিজ্ঞাপন দেওয়া খাপছাড়া দরদের কথা যশোদার মনে হইতে থাকে। বেশ সাজান ঘরখানা, আসবাবপত্র একটু বেশীরকম ঠাসা। একঘরে খাট, ড্রেসিং টেবিল, লেখাপড়ার জন্য মাঝারি আকারের একটি টেবিল ও চেয়ার, ট্রাঙ্ক, সুটকেশ, অর্গ্যান, আলনা ইত্যাদি অনেকগুলি জিনিস ভর্ত্তি করায় নড়াচড়ার স্থানাভাব ঘটিয়াছে। অধিকাংশ আসবাবই জ্যোতির্ম্ময় ভালবাসিয়া কিনিয়া দিয়াছে, অর্গ্যানটি তো মাত্র ক'মাস আগে কেনা।

'ভাল কি গাইতে জানি? তবু কিনে দিলেন।'—অপরাজিতা সলজ্জ আনন্দে যশোদাকে জানায়। সুবর্ণকে কিনিয়া দেওয়ার বদলে স্ত্রীর নামে সঙ্গীত-যন্ত্রটি কেনায় বাড়ীতে যে কথা হইয়াছিল, যশোদার কানে তাহা আগেই পৌঁছিয়াছে। জ্যোতির্ম্ময়কে যশোদা মোটামুটি চেনে, তাই এমন সহজ সাংসারিক চালে তার ভুল হওয়ায় সে আশ্চর্য্য হয় নাই। দুদিন পরে যে বোনের বিবাহ হইয়া শ্বশুরবাড়ী চলিয়া যাইবে, তার নাম করিয়া ওটা কিনিলেই কোন গোল হইত না! কিন্তু সেটা জ্যোতির্ম্ময়ের খেয়াল হয় নাই। বিবাহের সময় যৌতুক হিসাবে অর্গ্যানটি দিতে হইতে পারে, এ আশঙ্কা অবশ্য একটু ছিল। কিন্তু সেও তো জ্যোতির্ম্ময়েরই হাত। যার নামেই কেনা হোক মেয়ে আসিলে এই অর্গ্যান বাজাইয়া সুবর্ণকে গান একটু শুনাইতেই হইবে অর্গ্যানটি কার সম্পত্তি, বরপক্ষ তখন সে প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করিবে, তখন বলিলেই হইবে এটি জ্যোতির্ম্ময়ের স্ত্রীর জিনিস। তাছাড়া, বরপক্ষ যদি অর্গ্যান একটা দাবী করে, নাছোড়বান্দা হইয়া দাবী করে, স্ত্রীর নামে কেনা হইয়াছে বলিয়াই এটি দান না করিয়া জ্যোতির্ম্ময় কি পারিবে? আরেকটু সস্তা দামের অন্য একটা অবশ্য—

ভদ্রলোকের অন্দরমহলে আসিলেই যশোদার চুল ধরে আর এই ধরণের চিন্তা মনে গিজ গিজ করিতে থাকে, তবে অপরাজিতা আজ যে সব বলিতেছিল কানে যাওয়ার পর সে পূর্ণমাত্রায় সচেতন হইয়া উঠিল।

'ওমা, এসব কি কথা বলছ বৌ ?'

বলিবার যে খুব বেশী প্রয়োজন ছিল অপরাজিতার তা নয়, তার চেহারা দেখিয়া, মুখচোখ দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায় ভিতরে কিছু গোলমাল হইয়াছে। কিন্তু অবস্থাটা যে এমন শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেও কি তা অনুমান করিতে পারিয়াছিল ?

ভয়ে অপরাজিতার মুখ ছাইবর্ণ হইয়া গেল। 'খুব খারাপ নাকি দিদি ?'

যশোদা তাড়াতাড়ি অভয় দিয়া বলিল 'খারাপের তো কিছুই ছিল না বৌ, শরীরটা এমনি খুব দুর্ব্বল করে ফেলেছে কিনা, তাই যা একটু ভয়। ওনাকে বলনি ?'

'কখন বলি ?'

তাওতো বটে, উপহারে আসবাবে যে ঘর ভরিয়া দেয়, প্রত্যেক রাত্রি যার পাশে শুইয়া কাটে, এতবড় বিপদের কথাটা তাকে বলিবার তোমার সুযোগ কোথায়! প্রথমটা যশোদার বড় রাগ হয়, মনে হয়, এমন ন্যাকামি করা যাদের স্বভাব চুলোয় যাক তারা, কাজ নাই তাদের কথায় থাকিয়া। কিন্তু অপরাজিতার শীর্ণ বিবর্ণ মুখে ভাসা ভাসা ভয়ার্ত্ত চোখের চাউনি দেখিয়া মনটা আবার গলিয়া যায়।

'তা বললে তো চলবে না বোন। ওনাকে বলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে তো ?'

অনেক বুঝাইয়া, অনেক পরামর্শ ও উপদেশ দিয়া যশোদা বাড়ী ফিরিয়াছে। ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছে যে, বেশী বয়সে বিয়ে করা বৌকে কি লোকে এতই বেশী ভালবাসে? এমনভাবে সীমা ছাড়াইয়া যায় সেই ভালবাসা যে, বুকের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া তিল তিল করিয়া মরিতে থাকিলেও খেয়াল পর্য্যন্ত হয় না খাপছাড়া কিছু ঘটিতেছে? সুশ্রী ও কচি মুখখানা আর সুগঠিত ও কোমল দেহখানা দেখিয়া বৌটার জন্য যদি দরদ জাগিয়া থাকে জ্যোতির্ম্ময়ের বুকে, সে দরদ কেন তাকে এখন বলিয়া দেয় না যে, সে শ্রীও নাই, সে লাবণ্যও আর নাই? বৌটাও বা এমন হাবা কেন, স্বামীকে অসুখের কথা বলিতে লজ্জা পায়? ভদ্র স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসার খেলা এইরকম ভদ্রতা বজায় রাখিয়া চলে নাকি? ভাগ্যে সংসারে সকলে ভদ্র নয়!

হাসপাতাল হইতে ধনঞ্জয় ফিরিয়া আসিয়াছে।

ডান পা'টি হাঁটুর নীচ হইতে বাদ গিয়াছে। এখনও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, তবে ঘা শুকাইয়া আসিয়াছে। আরও কিছুদিন পরে কাঠের পা লাগান চলিবে।

'কি পাপে আমার এমন দশা হল যশোদা ?'

পাপ ? পাপের কথা না ভাবাই ভাল। সবই ভগবানের ইচ্ছা। ভগবান যা করেন মানুষের বুঝিবার উপায় আছে কি কেন করেন ? সহ্য করা ছাড়া মানুষের আর উপায় নাই।

'প্রাণে যে বেঁচে গিয়েছ—'

'এর চেয়ে মরাই ভাল ছিল।'

ধনঞ্জয় মরে নাই, আধমরা হইয়া গিয়াছে। এ শরীরে আগে জোয়ার ভাঁটা টের পাওয়া যাইত না, এখন যেন ভাঁটার সময় কালীঘাটের কাছে আদি গঙ্গার যে অবস্থা যশোদা অনেকবার দেখিয়া আসিয়াছে, সেই রকম হইয়া গিয়াছে ধনঞ্জয়ের চেহারা।

'দেশে খবর দেবে না ?'

ধনঞ্জয় ভাবে, অকর্ম্মণ্য হইয়া সে আসিয়া ঘাড়ে চাপিয়াছে, যশোদা তাই তাড়াতাড়ি দেশে খবর দিয়া তাকে তাড়ানো ব্যবস্থা করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। মুখ বাঁকাইয়া সে বলে, 'তাড়াবার জন্য তর সইছে না চাঁদের মা ? ধন্য তোমরা সহরে মানুষ ! তুমি বললে সুধীরের সঙ্গে রেলের ইয়ার্ডে কাজ শেখো গে যাও, তোমার জন্য আমার এই সব্বোনাশ হল, আর তুমিই আমাকে—'

ধনঞ্জয়ের চোখে জল আসিয়া পড়ে। এত বড় অপবাদের জবাবে যশোদা শান্তভাবে শুধু জানায় যে তাড়ানো দূরে থাক, ধনঞ্জয় এখন যাইতে চাহিলে যশোদা তাকে যাইতে দিবে না কি ? ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক এইখানেই এখন ধনঞ্জয়কে থাকিতে হইবে কিছুকাল, পায়ের ঘা শুকাইয়া যতদিন কাঠের পায়ের ব্যবস্থা না হয়। তারপর সে যদি দেশে যাইতে চায় দেশে চলিয়া যাইবে। আর যদি এখানে কোন কাজকর্ম্ম করিতে চায়, তাও হয় তো যশোদা ঠিক করিয়া দিতে পারিবে।

'কাজ ? আর কি আমি কাজ করতে পারব যশোদা ?'

'কেন পারবে না ? কাঠের পা নিয়ে লোকে রোজগার করে খাচ্ছে না ? দেশে খবর দেবার কথা বল্‌ছিলাম, কাউকে যদি তুমি দেখতে চাও ?'

কে আর আছে দেশে ধনঞ্জয়ের, কাকেই বা সে দেখিতে চাহিবে। এখন আর খবর দিয়া কাজ নাই, ভাল হইয়া রোজগারপাতি করার মত সুদিন যদি কখনও ধনঞ্জয়ের আসে—

'আমার দেনাটাও তখন আস্তে আস্তে শোধ করে দিতে পারবে।'

যশোদার আর সব ভাল, মিষ্টি করিয়া কথা বলিতেও সে জানে, কেবল মাঝে মাঝে এই রকম এক একটা কথা বলিয়া এমন সে প্রাণে আঘাত দেয় মানুষের ! এমন প্রাণে আঘাত পাইলেও যশোদার আশ্রয়ে যশোদার অন্নে প্রাণধারণ করিয়া থাকিতে থাকিতে কয়েকদিন পরে যশোদার এই কথা মনে করিয়াই লজ্জাটা যে তার কম হইবে, প্রাণে একটু স্বস্তি বোধ করিবে, এসব অবশ্য ধনঞ্জয়ের খেয়াল হয় না। সামান্য একটু সাময়িক মনঃকষ্ট দিয়া অনেক দিনের অনেক বেশী মনঃকষ্ট নিবারণের এসব উপায়ের সঙ্গে তার পরিচয় নাই—ক'জন মানুষেরই বা থাকে !

সুধীর প্রথমটা ধনঞ্জয়ের কাছে ভেড়ে নাই। ধনঞ্জয় হাসপাতাল হইতে বাড়ীতে আসিয়াছে, দু'তিন দিন এটা যেন তার অজানাই রহিয়া গেল। তারপর একদিন সকাল বেলা কাজে যাওয়ার আগে মুখে অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য আনিয়া আস্তে আস্তে সে ধনঞ্জয়ের ঘরে গেল।

'কেমন আছ ধনা'দা ? খাও, বিড়ি খাও একটা।'

ধনঞ্জয় বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছিল। সুধীরের দেওয়া বিড়িটা ধরাইয়া সে বলিল, 'বোসো দিকি ভাই এখেনে, তোমাকে একটা কথা সুধোই পষ্ট করে। যা হবার তাতো হ'ল, সব আমার অদেষ্টের দোষ, গোলমাল টোলমাল আমি আর করব না, মা কালীর দিব্যি। গাড়ীটা কে ঠেলে দিয়েছিল বল দিকিন ?'

শুনিতে শুনিতে সুধীরের মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল, বুকের মধ্যে টিপ টিপ করিতেছিল।—'কে ঠেলে দেবে, কেউ ঠেলে দেয়নি।—বড়বাবু নিজে এসে সবাইকে জিজ্ঞেস করে রিপোর্ট দিলে—'

'সে তো জানি, তুমি নিজে দ্যাখো নি কিছু ?'

সুধীর রাগিয়া বলিল, 'কি বললে? আমি দেখেছি? দেখেও চুপ মেরে আছি? আমি মিথ্যুক? বড়বাবু নিজে এসে—'

হয় তো একটা কলহ বাধিয়া যাইত দু'জনের মধ্যে যশোদা আসিয়া পড়ায় সেটা আর ঘটিতে পারিল না।

যশোদা রাগ করিয়া সুধীরকে বলিল, 'কাজে যাও তো তুমি। কেমন ধারা মানুষ তুমি, রোগা মানুষটার সঙ্গে ঝগড়া করছ? যাও, এখুনি চলে যাও, একটি কথা নয় আর।'

ধনঞ্জয়ের সঙ্গে সুধীরের কলহ হইয়া গেলেও বোধ হয় এর চেয়ে ভাল ছিল। সোজাসুজি কলহবিবাদের ঝাঁঝ কতক্ষণ মানুষের মনে থাকে? যশোদা আসিয়া এমন করিয়া বলায় সুধীরের মনে যে জালা ধরিয়া গেল তার ঝাঁঝ সহজে মিটিবার নয়। তার জন্য দরদ ছিল যশোদার মনে, ধনঞ্জয় আসিয়া সে দরদ গাফ করিয়াছিল। এখনও, ধনঞ্জয়ের ঠ্যাং কাটা যাওয়ার পরেও, এই ধনঞ্জয়কেই যশোদা দরদ করিবে? সে তুচ্ছ হইয়া থাকিবে?

কেন এমন হইল? কেন যশোদা তাকে আর পছন্দ করে না?

যশোদা ধনঞ্জয়ের সেবা করে, তাকে বাটিভরা দুধ খাওয়ায়, না বলিতে দরকার মত তাকে বিড়ি পর্য্যন্ত কিনিয়া দেয়। অসুখে বিসুখে আরও দু' একজনকে এ বাড়ীতে সুধীর শয্যাগত হইয়া থাকিতে দেখিয়াছে, সে নিজেও একবার অসুখে ভুগিয়াছিল, তখন যশোদা যেমন সেবা করিয়াছিল ধনঞ্জয়ের সেবা করার সঙ্গে তার আকাশ পাতাল তফাৎ। অবশ্য সমস্ত কাজ যেন যশোদার কাছে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে, অন্য সকলের সুবিধা অসুবিধার জন্য তার যেন আগের মত ভাবনা নাই, ধনঞ্জয়ের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করাটাই যেন তার এখন একমাত্র কর্তব্য, সব সময় সে যেন কেবল ধনঞ্জয়ের কথাই ভাবে, ধনঞ্জয়ের ডাক শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া থাকে। অন্ততঃ দেখিয়া শুনিয়া সুধীরের তাই মনে হয়। দেখাশোনাটা সারাদিন চলে না, সুধীরকে কাজে যাইতে হয়। কিন্তু কল্পনা তো আছে সুধীরের, কাজে যাওয়ার আগে আর কাজে যাওয়ার পরে সে যতটুকু দেখে আর শোনে, ওয়াগনে মাল বোঝাই দিতে দিতে তারই ভিত্তিতে সে অহর্নিশি যশোদার আত্মবিস্মৃত সেবাযত্নের এমন কল্পনা গড়িয়া তোলে যে সত্য সত্যই সেই অনুপাতে ধনঞ্জয়ের সেবা করিয়া থাকিলে দু'চার দিনের

মধ্যে যশোদাও শয্যা গ্রহণ করিত আর তার নিজেরই দরকার হইত সেবার। এই সব দুর্ভাবনায় অন্যমনস্ক হইয়া রাজেনের গালাগালিতে সুধীরের প্রাণান্ত হয়। সুদীর্ঘ সরীসৃপের মত লম্বা মালগাড়ীর একপ্রান্তে ইঞ্জিন আসিয়া ঠেকিলে ওয়াগনের সঙ্গে ওয়াগনের ধাক্কায় যে শব্দ ওঠে তাতে সে চমকাইয়া ওঠে। না, এর চেয়ে তার একটা পা কাটা গেলে যেন ভাল ছিল! অথবা পা কাটার বদলে ধনঞ্জয় যদি একেবারে মরিয়া যাইত। ধনঞ্জয় অবশ্য এখনও মরিতে পারে,—কিন্তু লোকটার মরা-বাঁচার ভার কি ভগবান সুধীরের হাতে ছাড়িয়া দিবেন একদিন এক মুহূর্তের জন্য, সেদিন তাকে আলগা ওয়াগনটার পাশে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া হঠাৎ সুধীরের মাথায় ওয়াগনটা ঠেলিয়া দিবার বুদ্ধি যেমন যোগাইয়া দিয়াছিলেন?

এই চিন্তাটা মাথায় আসিলে সুধীরের মুখের ভাব এমন হয় যে বকিতে গিয়া রাজেন পর্য্যন্ত তাকে কিছু বলিতে সাহস পায় না কথাগুলি গিলিয়া ফেলে।

বাড়ী ছাড়িয়া কাজে আসিতে সুধীরের ভাল লাগে না, নানা ছুতায় সে বাড়ীতে বসিয়া থাকিবার চেষ্টা করে। কাজে যাইবে না কেন, কি হইয়াছে সুধীরের? অসুখ হইয়াছে,—পেট ব্যথা করিতেছে। বেশ, তবে আর এবেলা সুধীরেব কিছু খাইয়া কাজ নাই।

'তোমার ব্যাপারখানা কিছু ধরতে পারছি না সুধীর। কাজে নাকি ফাঁকি দিচ্ছ আর মেজাজ দেখাচ্ছ, রাজেন বললে। এ তো ভাল কথা নয়? এ কাজটা যদি যায় তোমার, আর কাজ আমি জুটিয়ে দিতে পারব না বলে রাখছি।'

'না দিলে কাজ জুটিয়ে, কাজ করব না।'

খাইয়া দাইয়া দেরী করিয়া সুধীর সেদিন কাজে গেল বটে, মাঝরাত্রে ফিরিয়া আসিল মাতাল হইয়া। আসিয়া এমন মাতলামিই সে আরম্ভ করিয়া দিল, শুধু মদ খাইয়া মাতাল হইয়া যেটা কোন মানুষের পক্ষেই করা সম্ভব নয়। কুড়ি বাইশজন কুলীমজুরকে বাড়ীতে রাখিয়াও যশোদা তার বাড়ীকে এতদিন ঠিক বস্তির পর্য্যায়ে নামিতে দেয় নাই, সুধীর একাই সেই কাজটা করিয়া দিল।

সকলে ভাবিয়াছিল পরদিন যশোদা বোধ হয় তাকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিবে। কিন্তু যশোদা কিছুই বলিল না। বলার খুব বেশী সুযোগও সে পাইল না, কারণ পরদিন কারও কাছে কিছু না বলিয়া সুধীর উধাও হইয়া গেল। ফিরিয়া আসিল তিন দিন পরে।

তখনও যশোদা তাকে কিছুই বলিল না।

কদিন বাহিরে ঘুরিয়া আসিয়া সুধীরের বোধ হয় হাওয়া পরিবর্ত্তনের কাজ হইয়াছিল, সেই সঙ্গে মতেরও বোধ হয় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। চোরের মত পলাইয়া গিয়াছিল যশোদার ভয়ে, ফিরিয়া আসিল যেন লাটসাহেব হইয়া। ভয় নাই, অনুতাপ নাই, মুখ ভার করিয়া থাকা নাই, এ জগতে কাউকে সে গ্রাহ্যও করে না। কৈফিয়ৎ হিসাবে নয়, নেহাৎ যেন দয়া করিয়াই যশোদাকে হঠাৎ উধাও হওয়ার কারণটা জানাইয়া দিল।

'মনটা ভাল ছিল না চাঁদের মা, তাই একবার একটু ঘুরে এলাম।'

যশোদা বলিল 'বেশ করেছ। রাজেনকে বলে দিয়েছি, এবার কিছু বলবে না, আর কিন্তু এরকম পাগলামী কোরো না কখনো।'

'তোমার জন্যেই তো। তুমি আমার সঙ্গে ওরকম কর কেন?'

যশোদা কথা বলে না। সুধীরের সম্বন্ধে কি করা দরকার এখনও সে ঠিক করিয়া উঠিতে পারে নাই।

সুধীর বলিতে থাকে, 'জানো চাঁদের মা, সেই যে সেদিন তুমি মুখে বললে আমি ভাত পাব না, কিন্তু পাছে ভাতটি না খেয়ে যাই তাই জন্যে নিজে তাড়াতাড়ি বাড়ী ছেড়ে চলে গেলে, সেদিন টের পেয়েছি সংসারে টাকা বল, রূপ-যৌবন বল, দরদ ছাড়া সুখ নেই মানুষের।'

যশোদা রীতিমত বিব্রত হইয়া বলে, 'অ! সেদিন টের পেয়েছ।'

আবেগের মাথায় সুধীর বলিয়া বসে, 'তুমি বললে তোমার জন্যে আমি প্রাণ দিতে পারি চাঁদের মা।'

'প্রাণ তোমাকে দিতে হবে না, নদের চাঁদের বৌটা জ্বরে ভুগছে, ওকে একটু ওষুদ এনে দাও দিকি?'

খানিক পরে খবর আনিতে গিয়া যশোদা দেখিল ঔষধ আনা হইয়াছে কিন্তু খাওয়ানো হয় নাই। বিছানায় চাঁপার মা কোঁকাইতেছে, ঘরের কোণে চাঁপা আর

সুধীর মসগুল হইয়া আলাপ করিতেছে।

চাঁপা বলিল, 'ওষুধটা কবার খাওয়ার বুঝে নিচ্ছিলাম দিদি।'

'ওষুদটা খাইয়ে গল্প কর চাঁপা।' বলিয়া যশোদা চলিয়া আসিল।

তারপর হইতে সুধীরকে চাঁপার যেন সর্ব্বদাই দরকার হইতে লাগিল। দু'বেলা ডাকিয়া পাঠায়, নিজে আসিয়া সুধীরের সঙ্গে গুজ্ গাজ্ ফিস্ফাস্ করে, কি যেন একটা ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিয়াছে দু'জনে। ও-বাড়ীতে গেলেই যশোদা দু'জনকে একসঙ্গে দেখিতে পায়। দু'একবার কালোকেও তাদের সঙ্গে দেখা গেল, তিনজনে হাসিগল্প করিতেছে। কথা বেশী বলিতেছে সুধীর,হাসি চাঁপাই হাসিতেছে বেশী, কালো হাঁ করিয়া শুনিতেছে। যশোদা ওদের এড়াইয়া চলিতে লাগিল, চাঁপা যদি জগৎকে ছাড়িয়া সুধীরের দিকে ঝুঁকিয়া থাকে, যশোদার কিছু বলিবার নাই। নিজের ভালমন্দ চাঁপা ভাল করিয়াই বোঝে। চাঁপার জন্য সুধীরের দরদ জাগিয়া তার জন্য দরদটা যদি একটু কমে তাহা হইলেই যশোদা এখন বাঁচে।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, যশোদাকে উপেক্ষা করার লক্ষণ সুধীরের দেখা গেল না। কয়েকদিনের মধ্যে চাঁপার সম্বন্ধে তার একান্ত উদাসীনতা দেখা গেল, চাঁপা ডাকিলে সব সময় সে যাইতে চায় না। কেবল চাঁপা যখন কালোকে পাঠাইয়া, তাকে বিশেষ দরকারে ডাকিয়া পাঠায়, তখন কালোর সঙ্গে সে মুখ গম্ভীর করিয়া শুনিয়া আসিতে যায় দরকারটা কি এবং গিয়াই ফিরিয়া আসে অল্পক্ষণের মধ্যে। ধীরে ধীরে আবার যেন তার আগেকার অস্থিরতা ফিরিয়া আসিতে লাগিল। ধনঞ্জয় আর যশোদাকে একসঙ্গে দেখিলেই কোথা হইতে সে আসিয়া উপস্থিত হয়, কিছুতেই আর নড়িতে চায় না। যশোদাকে একা পাইলেই কাছে বসিয়া আবোল-তাবোল গল্প জুড়িয়া দেয়, ধনঞ্জয়ের যত পারে নিন্দা করে, তার জানা একটি স্ত্রীলোকের উপর ধনঞ্জয়ের কি গভীর অনুরাগ ছিল সেই গল্প ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া এমন করিয়া বলে যে কথাটা সত্য না মিথ্যা জিজ্ঞাসা করারও প্রয়োজন হয় না।

তারপর একদিন সুধীর বলে কি, 'একটা কথা বলি শোন চাঁদের মা। শুনে রাগ কোরো না কিন্তু। আমার কোন কু-মতলব নেই আগেই বলে রাখছি তোমাকে।'

'তুমি মস্ত সাধুপুরুষ। শুনি কথাটা।'

আর তো সুধীর থাকিতে পারে না যশোদাকে ছাড়া, সে যে পাগল হইয়া গেল যশোদার জন্য তা কি যশোদা দেখিতে পায় না? এমনভাবে আর কতদিন চলিবে? তারচেয়ে এখানকার বাড়ী-ঘর বিক্রয় করিয়া যশোদা চলুক না তার সঙ্গে দূরদেশে, যেখানে তারা দু'জনে ঘর বাঁধিয়া পরম সুখে থাকিতে পারিবে? —'তুমি ভাবছ আমার চেয়ে বয়েসে তোমার দু'এক বছর বেশী, চেহারাটা তোমার জবরদস্ত, তোমার জন্য আমার মন কাঁদতে পারে না, বাড়ী বিক্রির টাকার 'পরে আমার লোভ? আগেই তো বলেছি তোমাকে, আমার কোন কু-মতলব নেই। বেশ বাড়ীঘর থাক তোমার, এমনিই চল তুমি আমার সঙ্গে, আমিই রোজগার করে তোমায় খাওয়াব।'

কথাটার আকস্মিকতায় যশোদা খানিকক্ষণ হতভম্ব হইয়া থাকে, তারপর বলে, 'বটে? ফাজলামির আর পাত্তর পেলে না তুমি, তাম্‌সা জুড়েছ আমার সঙ্গে? আস্পর্দ্ধা তো কম নয় তোমার!'

সুধীর ব্যগ্রকণ্ঠে বলে, 'তাম্‌সা নয় চাঁদের মা, সত্যি তাম্‌সা নয়। মতিদা বলছিল, কেউ কোনদিন তোমায় দরদ দেখায়নি বলে মনটা তোমার বিগড়ে গেছে, কেউ দরদ করলেই ভাব তাম্‌সা জুড়েছে। কি করলে তোমার বিশ্বেস হবে বলো, আমি তাই করব। তুমি জান না যশোদা'—

'জানতে চাই না আমি। যাও তুমি, বেরোও আমার বাড়ী থেকে—এক্ষুনি বেরোও, ফের যদি আমার সামনে পড়, কিলিয়ে তোমায় নিকেশ করব।'

কেবল এই কথা কয়েকটি নয়, আরও অনেক কিছু যশোদা অবশ্য তাকে বলিল, যেরকম জোরালো ঝাঁঝালো, অকথ্য কথার ফোঁড়ন না থাকিলে সুধীরের মত মানুষের পক্ষে বোঝাই কঠিন হয় যে তাকে সত্য সত্যই তিরস্কার করা হইতেছে।

তখন দুপুর বেলা। সুধীর সেদিন কাজে যায় নাই। ফতুয়াটা গায়ে দিয়া সুধীর বাহির হইয়া গেল আর সারাটা দিন রাগে যশোদা গরগর করিল। রেল ইয়ার্ডের একটা কুলী, সে কাজটা জুটাইয়া দিয়াছে বলিয়া দু'বেলা দু'টি অন্ন জুটিতেছে, সে কিনা তাকে এমন-ভাবে অপমান করিতে সাহস পায়! এই কি লাভ হইয়াছে তার কুলীমজুরকে আপন করিতে গিয়া? রাগের প্রথম অবস্থাটা

কাটিয়া যাইবার পর বড় দুঃখ হয় যশোদার, একবার চোখে জলও আসিয়া পড়ে। সুধীর কুলীমজুর বলিয়াই যশোদার এতখানি অপমান বোধ বা রাগ বা দুঃখ নয়, সুধীরের প্রেমনিবেদনের ভঙ্গীটাই তাকে বড় যন্ত্রণা দিতেছিল। দু'জনে মিলিয়া তারা পালাইয়া যাইবে এ যেন সুধীর প্রার্থনা করে নাই, যশোদাই অনেক দিন হইতে তার পায়ে ধরিয়া সাধিতেছিল, এতদিনে ভাবিয়া চিন্তিয়া সুধীর রাজী হইয়া গিয়াছে। সুধীরের মনের ভাব টের পাইতে যশোদার বাকী ছিল না, কদিন হইতে এই সমস্যাটাই সে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করিতেছিল, ভাবিতেছিল কি উপায়ে তার এই পাগলামী ঘুচান যায়। একদিন পোষা কুকুরের মত পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া সে তার ভালবাসার কথাটা বলিয়া ফেলিতে পারে, এ ভয়ও যশোদার ছিল। কিন্তু এমনভাবে সোজাসুজি এমন একটা প্রস্তাব তার কাছে করিবার সাহস যে সুধীরের পক্ষে হওয়া সম্ভব, যশোদা তা কল্পনাও করে নাই ?

রাত্রে রান্নার শেষে যশোদা দেখিতে পাইল, সুধীর চোরের মত পা টিপিয়া টিপিয়া বাড়ী ঢুকিতেছে। ক্ষমা-টমা সে চাহিবে না, যশোদা তা জানে। ওসব কায়দাদুরস্ত চালচলন এখনও এদের আয়ত্ত হয় নাই। একটু পরে সুধীর আবার চুপি চুপি বাহির হইয়া গেল। দোকানে খাবার কিনিয়া খাইতে গেল বোধ হয়। মাথার মধ্যে কেমন গোলমাল হইয়া যাইতেছিল, পরিষ্কার করিয়া ব্যাপারটা যশোদা বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারিতেছিল না। এসব মানুষকে বিচার করা বড় কঠিন। এদের মত একাধারে এমন বোকা-হাবা পাকা, বজ্জাত, ঝানু শিশু, কোমল, কঠোর, সাহসী, ভীরু, ভাল আর মন্দ জীব আর হয় না। সুধীরের আসল উদ্দেশ্যটা ধরিতে না পারিয়াই যশোদা বড় অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। সুধীর কি সত্যই বিশ্বাস করিয়াছিল। যশোদা তার সঙ্গে পালাইয়া যাইতে রাজী হইবে? এরকম একটা বিশ্বাস তার মনে জন্মিল কিসে? যশোদা ধমক দিলে যার মুখ শুকাইয়া যায়, যশোদার স্নেহ মমতার জন্য তার ব্যাকুলতা জন্মিতে পারে, যশোদার সঙ্গে পীরিত করার সখ হওয়াও তার পক্ষে সম্ভব, কিন্তু এমন একটা ধারণা তার মনে আসে কি করিয়া যে যশোদা তাকে প্রশ্রয় দিবে?

কখন আবার সুধীর আসিয়া ঢুকিয়াছিল যশোদা দেখিতে পায় নাই, পরদিন

সকালে ঘরের বাহিরে আসিয়া কলতলায় যশোদাকে দেখিয়াই চোরের মত সুধীর আস্তে আস্তে পলাইয়া যায়। দোষ করিয়া গুরুজনের কাছে ছোট ছেলে যেমন করে। দেখিয়া কে বলিবে এই সেই গোঁয়ার গোবিন্দ সুধীর, মতির হইয়া যে মিলে মারামারি করিয়াছিল, যশোদাকে কাল যে ডাক দিয়া বলিয়াছিল, চলগো যশোদা, আমরা হাত ধরাধরি করে পীরিত করতে যাই!

সারাদিন সুধীরের পাত্তা মিলিল না, সারাদিন যশোদা তারই কথা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। এক রাত্রেই যশোদার মন শান্ত হইয়া গিয়াছে, নিজের ভাবপ্রবণতার মেঘ কাটিয়া যাওয়ায় আর সুধীরের মত গৃহ-সুখে বঞ্চিত অশিক্ষিত বর্ব্বর দুর্ভাগ্যগুলির জন্য তার স্বাভাবিক মমতা ফিরিয়া আসায়, এবার ধীরে ধীরে সে সুধীরের পাগলামীর মানে বুঝিতে পারে। কবে যেন সুধীর প্রথম টের পাইয়াছিল, সংসারে টাকা বল, রূপ যৌবন বল, দরদ ছাড়া সুখ নাই? যশোদা যেদিন তাকে ভাত খাওয়ার সুযোগ দিতে ছল করিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং দরদের দাম কষিতে তাকে শিখাইয়াছে যশোদাই। আর মতি যেন কি বলিয়াছে সুধীরকে? পুরুষের ভালবাসা না পাওয়ায় মনটা বিগড়াইয়া গিয়াছে যশোদার! যশোদার কাছে দরদ চিনিয়া রূপলাবণ্যের অভাবে পুরুষের ভালবাসা না পাইয়া যশোদা মনে মনে কাঁদিতেছে জানিয়া, সুধীরের পক্ষে একথা মনে করা আশ্চর্য কি যে তার মত যোয়ান বয়সী মানুষের ভালবাসা পাইয়া যশোদা একেবারে কৃতার্থ হইয়া যাইবে।

স্বস্তি বোধ করে যশোদা, মুখে একটু হাসিও তার দেখা দেয়। আহা, সুধীর তবে সত্যই দরদ দেখাইতেছিল! হাতীর মত যে যশোদাকে কেউ চায় না, তাকে সঙ্গে করিয়া পালাইতে চাহিয়া সেই একটা মস্ত ত্যাগ স্বীকার করিতেছিল। তার আসল লোভ যে শ্রীমতী যশোদার উপর, সেই রোজগার করিয়া যশোদাকে খাওয়াইবে, এই কথাটায় যশোদার বিশ্বাস জন্মানোর জন্য তাই অমন ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল সুধীর।

রাত্রে রান্না করিতে করিতে যশোদা ভাবে, না, তার কুলীমজুরেরাই ভাল। এদের যদি আপন না করিবে, আপন হইবে কারা? সত্যপ্রিয়ের মত যারা বড়লোক, অথবা জ্যোতির্ম্ময়ের মত যারা ভদ্রলোক? বড়লোক, ভদ্রলোক আর ছোটলোক, বিগড়াইয়া অবশ্য গিয়াছে সকলেই, তবু অভাবে যারা বিগড়াইয়া গিয়াছে তারা

এখনও মানুষ আছে খানিক খানিক। আর এ অবস্থায় জীবন কাটাইয়া খানিক খানিক মানুষ থাকাও কি সহজ গৌরবের কথা! সুধীরের মত একজন করিয়া প্রত্যেক দিন তার সঙ্গে বেয়াদবি করুক, তবুও যশোদা চিরকাল এদেরই ভালবাসিবে।

সারাটা দিন বাহিরে কাটাইয়া রাত্রি প্রায় দশটার সময় সুধীর চুপি চুপি নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিয়াছিল। যশোদা হাঁকিয়া বলিল, 'ও মতি, সুধীরকে ডাকো, ভাত খেয়ে যাক।'

সুধীরকে রান্না ঘরে খাইতে বসাইয়া যশোদা বলিল 'এবারটি ধরলাম না তোমার কথা, আর কিন্তু ওসব বোলো না আমায় কোনদিন।'

সুধীর মুখ নীচু করিয়া খাইতে থাকে, যশোদা পিঁড়িটা আরেকটু সরাইয়া আনিয়া মুখোমুখি বসিয়া বলে, 'কাজে যাও নি আজ?'

'না।'

'কাল থেকে যেও।'

রান্নাঘরটি যশোদার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কেবল তিনটি উনানের ধোঁয়ায় দেয়াল কালিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। ধোঁয়ার সঙ্গে লড়াই করিয়া যশোদা পারে না। দোষটা অবশ্য আসলে ধোঁয়ার নয়, মানুষের পেটের। দু'বেলা ভাত সিদ্ধ করিতে না হইলে তিনটি উনানে দু'বেলা আঁচ দেওয়ারও দরকার হইত না, দেয়ালে এত কালিও জমিত না।

'ঘর-সংসার করার সাধ হয়ে থাকলে বিয়ে-থা করে একটা? বলতো আমিই না হয় বিয়েটা দিয়ে দিই তোমার একটা মেয়ে ঠিক করে?'

সুধীর মাথা নাড়িয়া চুপচাপ খাইয়া যায়।

যশোদা বলে, 'বেশ তো সাধ না হয়ে থাকে আমার কথা রাখবার জন্যেই বিয়ে কর। তুমি তো বলছিলে আমার জন্য প্রাণ দিতে রাজী আছ। প্রাণ দেওয়ার চেয়ে বিয়ে করাটা কি কঠিন নাকি?'

সুধীর চুপচাপ খাইয়া যায়।

'চাঁপাকে যদি তোমার পছন্দ হয়—'

সুধীর মাথা নাড়ে। যশোদা বলে 'অ! আমি ভাবলাম কি, হয়তো বা চাঁপাকে পছন্দ হয়েছে তোমার।'

এবার সুধীর মুখ তুলিয়া বলিল, 'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা কেন দিচ্ছ চাঁদের মা?'

সেদিন এই পর্য্যন্ত। দিন তিনেক চুপচাপ থাকিয়া যশোদা আবার অন্যভাবে কথাটা পাড়িল। 'চাঁপা বড় কষ্টে দিন কাটাচ্ছে, এমন মায়া হয় মেয়েটাকে দেখলে! তুমি যদি বিয়ে করো ওকে, বড্ড খুসী হব আমি।'

'চাঁপাকে? চাঁপার কি মায়ামমতা কিছু আছে চাঁদের মা? ওর চেয়ে কালো ঢের ভালো।'

তারপর যশোদা ঘটকালি করিয়া কালোর সঙ্গে সুধীরের বিবাহ ঠিক করিয়া ফেলিল। বলিল, 'খরচার টাকাটা কিন্তু ফেরৎ দিতে হবে বাবু। দু'টাকা চার টাকা করে দিয়ো, কিন্তু যদ্দিনে হোক শোধ করে দিতেই হবে। তুমি আমার এমন কিছু সাতপুরুষের কুটুম নও যে, তোমার ঘর-সংসার পাততে গিয়ে আমি ফতুর হব।'

একদিনে দু'টি বিবাহ হইয়া গেল, সুধীরের সঙ্গে কালোর আর জগতের সঙ্গে চাঁপার। ক'দিন পরে সত্যপ্রিয়ের ছোটমেয়ের বিবাহ, এখন হইতে গেটে শানাই বাজিতে আরম্ভ করিয়াছে। যশোদার বাড়ীতে দু'টি বিবাহে শানাই বাজিল শুধু এক সন্ধ্যা, উৎসব হইল একটু অভদ্র রকমের, তবে এমন জমজমাট উৎসব হইল বলিবার নয়। রাত বারটার পর মতির তো জ্ঞানই রহিল না। যশোদাকে একাধারে কন্যাকর্ত্তা ও বরকর্ত্তার নারীসংস্করণ হইয়া সমস্ত দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে হইল বটে, আমোদ-আহ্লাদ সেও করিল না কম। সকলের সঙ্গে এক হইয়া সে মিশিয়া গেল। নেশাটা জমিয়া আসিলে মতি একবার তার গলাটা জড়াইয়া ধরিয়াছিল, হাত ছাড়াইয়া যশোদাকে তাড়াতাড়ি অন্যদিকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া সবাই ভাবিয়াছিল, সে বুঝি রাগ করিয়াছে। ওমা, খানিক পরে এক বাটি দুধ আর একটি চামচ আনিয়া সকলের সামনে জোর করিয়া মতিকে শিশুর মত কোলে শোয়াইয়া যশোদা তাকে তিন চামচ দুধ খাওয়াইয়া ছাড়িল।

পাঁচ

যশোদা বড় ব্যস্ত, একেবারে সময় পায় না। দুটি বিবাহের হাঙ্গামা চুকিতে না চুকিতে সত্যপ্রিয় মিলে জোরালো ধর্ম্মঘটের আয়োজন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বদা যশোদার কাছে লোকজন আসে যায়, তার সঙ্গে পরামর্শ করে, শ্রমিকদলের সভায় গিয়া তাকে বক্তৃতা করিতে বলে। যশোদার পরামর্শের ধরণটা একটু বিচিত্র। খুঁটিয়া খুঁটিয়া সে কেবল প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া যায় অথবা যারা পরামর্শ করিতে আসে তাদের কথা কাটাকাটি মন দিয়া শোনে। তারপর একেবারে মত প্রকাশ করে : এখন করলেও চলে অবিশ্যি, কিন্তু কিছুকাল পরে করলেই ভাল হত।

বক্তৃতা করা সম্বন্ধে হাত জোড় করিয়া বলে, 'ওটি মাপ করতে হবে। আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, অত ভণিতে করে সাজিয়ে গুছিয়ে বলা আমার কম্মো নয়। দু'দশজনে এলে, কথাবার্ত্তা কইলাম, সে আলাদা। ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়, বক্তিমে করব কি গো!'

অপরাজিতার সম্বন্ধে জ্যোতির্ম্ময়কে সতর্ক করিয়া দিবে ভাবিয়াছিল, নানা হাঙ্গামায় যাওয়া হয় নাই। মাঝখানে অপরাজিতা আর একদিন তাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল, সেদিন তার অবস্থা দেখিয়া সত্য সত্যই যশোদার বড় ভাবনা হইয়াছে। একদিন যশোদা জ্যোতির্ম্ময়ের সঙ্গে দেখা করতে গেল।

বড় ব্যস্ত জ্যোতির্ম্ময়। সত্যপ্রিয়ের কন্যার বিবাহ উপলক্ষে প্রীতিউপহারের পদ্য লিখিতেছে। একটি দু'টি নয়, অনেকগুলি। মা-বাবা, মাসী-পিসী, খুড়া-জেঠা, দাদা-দিদি, বৌদিদি, ভগ্নীপতি ইত্যাদি নানা সম্পর্কের উপযোগী আশীর্ব্বাদে গুরুগম্ভীর অথবা হাসিতামাসায় হাল্কা পদ্য লিখিতে হইবে। প্রত্যেক পদ্যের শেষে ভগবানের কাছে প্রার্থনা থাকিবে যে, নবদম্পতি যেন সুখী হয়। একটু ক্লিষ্ট দেখাইতেছে জ্যোতির্ম্ময়কে, অসুখী মনে হইতেছে। প্রীতি-উপহারের পদ্য লিখিবার পরিশ্রমে নয়, সেই নেকলেসটার জন্য। নেকলেসটা যেন পাইয়া বসিয়াছে জ্যোতির্ম্ময়কে, ক্রমাগত পীড়ন করিতেছে। ভাবিয়া সে কিছু ঠিক করিতে পারে না। সত্যপ্রিয় তাকে এমনভাবে ঠকাইবে কেন? এমন কোন কথা ছিল না যে, কর্ম্মচারীর বৌকে তার হাজার টাকা দামের গহনা দিতেই হইবে, না দিলে লোকে নিন্দা করিবে, তাই বাধ্য হইয়া কোনরকমে সেদিন মানরক্ষা করিতে হইয়াছে।

সত্যপ্রিয় অবশ্য বলিয়া দেয় নাই যে, হাজার টাকা দামের নেকলেস দেওয়া হইল, কিন্তু সেদিন নেকলেসটির ঝলমলে রূপ দেখিয়া সেই ধারণাই তো সকলের মনে জাগিয়াছিল। লোকের মনে একরকম মিথ্যা ধারণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যই যদি সত্যপ্রিয়ের না থাকিবে, এমন জিনিষ সে কেন দিবে প্রথম কয়েকদিন যা চোখে ধাঁধাঁ লাগাইয়া দেয়, তারপর কয়েক মাসের মধ্যে চাকচিক্য হারাইয়া এমন সস্তা দেখাইতে থাকে? সত্যপ্রিয় ভাল একখানা কাপড় দিতে পারিত, ছোটখাট সোণার কিছু দিতে পারিত, কিছু না দিয়াও পারিত। একেবারে কিছু না দিলে জ্যোতির্ম্ময় একটু ক্ষুণ্ণ হইত সত্য, কিন্তু সে ক্ষোভ এমন উগ্র হইত না, এমন স্থায়ীও হইত না।

সত্যপ্রিয়ের দোষক্ষালনের জন্য কতভাবেই যে ব্যাপারটা জ্যোতির্ম্ময় বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। ভাবিয়াছে, হয়তো সত্যপ্রিয় জানিত না, নিজে তো দোকানে গিয়া সে জিনিষটি কেনে নাই। এত সব খুঁটিনাটি বিষয়ে নজর দিবার তার সময় কোথায়? একেবারে অপরাজিতার হাতে দিবার সময় এক মিনিটের জন্য ছাড়া হয়তো জিনিষটা সত্যপ্রিয় ধরেও নাই, চোখেও দেখে নাই। যে জিনিষটা কিনিয়া আনিয়াছে, শেষ মুহূর্ত্তে যে সত্যপ্রিয়ের হাতে জিনিষটা তুলিয়া দিয়াছে, সেই হয়তো ঠকাইয়াছে সত্যপ্রিয়কে। নির্ভয়েই ঠকাইয়াছে, কারণ দু'দিন পরে ফাঁকি ধরা পড়িলেও কেউ তো আর সত্যপ্রিয়কে জিজ্ঞাসা করিতে যাইবে না, আপনি আমার বৌকে কত দামের উপহার দিয়েছিলেন?

প্রীতিউপহারের পদ্য লিখিতে বসিয়া এইসব কথাই জ্যোতির্ম্ময় ভাবিতেছিল, যশোদাকে দেখিয়া খুশী হইয়া বলিল, 'এসো চাঁদের মা। সব সময় এসো না কেন বল তো?'

'সব সময় আসব কেন?'

'তা ঠিক। সত্যি বলছি চাঁদের মা, তোমার সঙ্গে কথা বলতে এমন ভাল লাগে, এমন সহজভাবে তুমি কথা বলতে পার। কোন বিষয়ে তোমার ন্যাকামি নেই। মানুষের মন রেখে কথা বলতে বলতে প্রাণ বেরিয়ে গেল চাঁদের মা।'

'না বলিলেই পারেন?'

সেটা যে সম্ভব নয়, যশোদাও খানিক খানিক বোঝে। অন্যভাবে কথা বলিতে জানিলে তো বলিবে, মানুষের মন রাখিয়া কথা না বলিলে বোবা হইয়া থাকিতে হয়।

অপরাজিতার কথাটা যশোদা প্রথমে জ্যোতির্ম্ময়ের মন রাখিয়া মোলায়েম করিয়াই বলিবার চেষ্টা করে। কিন্তু জ্যোতির্ম্ময় যেন শুনিয়াও শোনে না, কথাটার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে মনে হয় না। তখন যশোদা ভদ্রতা ভুলিয়া যায়, এমন সব কথাই শোনায় যে মনে মনে জ্যোতির্ম্ময় রাগিয়া যায়, ভাবে যে কড়া সুরে বলিয়া দিবে কিনা, তার স্ত্রীর ভাবনা যশোদাকে ভাবিতে হইবে না কিন্তু ভদ্রলোক বলিয়া কিছুই সে বলিতে পারে না, চুপচাপ শুনিয়া যায়, মাঝে মাঝে ভয়, বিস্ময় ও দুর্ভাবনা জানাইতে বরং এই ধরণের মন্তব্যই করে: 'সত্যি বলছ? এসব তো জানতাম না আমি! ইস্, বড় অন্যায় হয়ে গিয়েছে তো!'

'বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিন না?'

'বাপের বাড়ী? তাই তো, বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিলেই তো হয়! কথাটা তো একেবারেই খেয়াল হয়নি আমার!' বলিতে বলিতে জ্যোতির্ম্ময় অন্যমনস্ক হইয়া যাওয়ার উপক্রম করে, অন্যমনস্ক হইয়া যাওয়ার উপক্রম করিতে করিতে বলে, 'তাই দেব। চক্কোত্তি মশায়ের মেয়ের বিয়ে চুকে গেলেই পাঠিয়ে দেব।'

যশোদা উঠিয়া আসিবে, হঠাৎ জ্যোতির্ম্ময় জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা চাঁদের মা, তোমাকেই একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। চক্কোত্তি মশায়কে তো তুমি চেনো, তোমার কি মনে হয় সামান্য কটা টাকার জন্য উনি ছোটলোকোমি করতে পারেন?'

যশোদা সঙ্গে সঙ্গে বলিল, 'তা পারেন।'

'পারেন?'—জ্যোতির্ম্ময় যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল।

সত্যপ্রিয়ের মেয়ের বিবাহের তিনদিন আগে সত্যপ্রিয় মিলে ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইয়া গেল। কেবল ধর্ম্মঘট নয়, একটু মারামারিও হইয়া গেল। এবারও মারামারির সূত্রপাত হইল মতির জন্য। বড় রহস্যময় মারামারি। পরদিন ধর্ম্মঘট হইবে, কাজ করিতে হইবে না ভাবিয়া আগের দিন রাত্রে মতি মিলের প্রায় এক মাইল দূরে তার একটি চেনা স্ত্রীলোকের ঘরে নিশ্চিন্ত মনে মদ খাইতে গিয়াছিল। একাই গিয়াছিল, কালোকে বিবাহ করিবার পর সুধীর আর মতির সঙ্গে হল্লা করিতে বাহির হয় না। কার যেন একটু রাগ ছিল মতির উপরে,

এতদিন গোঁয়ার সুধীরটা সঙ্গে থাকায় মতিকে কিছু বলিতে পারে নাই, সেদিন রাত্রে একা পাইয়া মারিয়া সে মতিকে একেবারে জখম করিয়া দিল। পরদিন সত্যপ্রিয় মিলে গুজব রটিয়া গেল যে, মতি খুন হইয়াছে। মিলের সামনে কয়েকশ' শ্রমিক জমায়েৎ হইয়াছিল। শ'তিনেক শ্রমিক ধর্ম্মঘটে যোগ দেয় নাই, মিলের গেট বন্ধ করিয়া কাশীবাবু তাদের দিয়া কিছু কিছু কাজ চালাইবার চেষ্টা করিতেছিল। ভিতরের মজুরদের অন্য পথে বাহির হইবার চমৎকার ব্যবস্থা কাশীবাবু করিয়াছিল, কিন্তু তারা দল বাঁধিয়া সদরের গেট দিয়াই বাহির হইয়া আসিল ; কতলোকে কতরকম উস্কানিই যে দিতেছিল !

বাহিরের দলের একজন হাঁকিয়া বলিল, 'তোরা মতিকে মারলি কেন রে ?' বলিয়াই সে যে ভিড়ের মধ্যে কোথায় মিশিয়া গেল !

ভিতরের দলের একজন হাঁকিয়া বলিল, 'তোরাও ওমনিভাবে মরবি !' বলিয়া সেও যে ভিড়ের মধ্যে কোথায় মিশিয়া গেল !

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল মারামারি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে এবং পুলিশ আথালি-পিথালি সকলকে পিটাইতেছে। কয়েকজন জখম হইয়া হাসপাতালে গেল, কয়েকজন গ্রেপ্তার হইয়া হাজতে গেল, মিল অঞ্চল প্রায় জনশূন্য হইয়া পড়িল।

সেইদিন সন্ধ্যার সময় যশোদা যখন হাসপাতালে কয়েকজন আহত শ্রমিকের কাতরানি শুনিতেছে, সত্যপ্রিয় মিলের মজুরদের মধ্যে খবর রটিয়া গেল যে ধর্ম্মঘট উস্কানর জন্য যশোদার উপর এমন অকথ্য অত্যাচার করা হইয়াছে যে তাকে হাসপাতালে যাইতে হইয়াছে। মতি খুন হয় নাই এ খবরটাও পাওয়া গেল।

পরদিন একজন মজুরও সত্যপ্রিয় মিলে কাজ করিতে গেল না। মতির মত যশোদার সম্পর্কে গুজবটাও যে সত্য নয় এটা অবশ্য ক্রমে ক্রমে সকলেই জানিতে পারিল, কিন্তু তখন আর সেজন্য কিছু আসিয়া যায় না, কাল মারামারিটা হইয়া যাওয়ার যাওয়ার ফলে সত্যপ্রিয় মিলের মজুরদের মধ্যে মনের মিল হইয়া গিয়াছে।

মারামারির ফলে মনের মিল ? মজুরদের মধ্যে ওরকম হয়, ওরা ছোটলোক কিনা। দু'একজন লোক দলের মধ্যে চিড় খাওয়াইয়া দেয়, একজনের মনে

হয়ত একটু অভিমান আছে, ধর্ম্মঘটের দাবী উঠাইতে তার পরামর্শটা গ্রাহ্য করা হয় নাই। সে কয়েকজনকে শুনাইয়া বলিল, 'কর্ম্মো নেই ধর্ম্মো ঘটে।' কয়েকজনের মনে হইল, তাই তো বটে, কি দরকার হাঙ্গামায়? কয়েকজনের মনে হইল, একজন যেন বড় বেশী উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে ধর্ম্মঘটের জন্য, ওর মতলবটা কি? হিংসা, ভয়, সন্দেহ, দুর্ব্বলতা, অবিশ্বাস, ভুল ধারণা আর আত্মমর্য্যাদার অভাব তো চিরদিন পুরামাত্রাতেই আছে, তার উপরে একটু কু-পরামর্শ জুটিলে আর দেখিতে হয় না। যে ধর্ম্মঘট করে না সে ভাবে, যারা ধর্ম্মঘট করিয়াছে তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি? একটু হাতাহাতি মারা-মারি করিতে পাইলে এই চরম প্রশ্নের মীমাংসাটা তাদের হইয়া যায়, হঠাৎ যেন তাদের তুচ্ছ জীবনে এ ব্যাপারটার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারে। কু-পরামর্শদাতারা সময় মত সাবধান না হইলে এইজন্য মারামারির পর মজুরদের মনের মিল হইয়া যায়।

মারামারিতে সুধীর একটু জখম হইয়াছিল। পরদিন সকালে ঘর হইতে তাকে পুলিশে ধরিয়া লইয়া গেল। জগৎকেও তারা খুঁজিতেছিল, কিন্তু তাকে পাওয়া গেল না।

চাঁপা নির্ব্বিকার চিত্তে বলিল, 'আমি কি জানি তার খবর? রাতে ঘরে ছিল না।'

যশোদা রান্না করিতেছে, ঝড়ের মত কালো ছুটিয়া আসিয়া হাউমাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, 'ওদিদি, পুলিশে ধরে নিল যে?'

যশোদা বলিল, 'নিক্ না। যোয়ান মদ্দ মানুষটাকে পুলিশ কি গিলে খাবে? হাঙ্গামা মিটলেই ছেড়ে দেবে দু'দিন পরে।'

কালো তা বুঝিতে চায় না, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া থর থর করিয়া কাঁপে আর ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদে। মেয়ে মানুষ সমস্ত গণ্ডগোলের গোড়া, এই মতবাদ খাড়া করিয়া যশোদা যে এ বাড়ীতে স্ত্রীলোক থাকিতে দেয় না, এ বাড়ীতে ঢুকিয়া কালো যেন যশোদার সেই মতবাদটাই প্রমাণ করিয়া দিতে থাকে। যশোদা শেষে রাগ করিয়া বলিল, 'কেবল কি পীরিত করতে জেনেছিস, বাছা সংসারে? একটু এদিক ওদিক হলে যদি চোখে আঁধার দেখবি, পীরিতের মানুষটাকে আঁচলে বেঁধে রাখিস্ না কেন?'

এই বলিয়া রাগে আগুন হইয়া যশোদা হন্ হন্ করিয়া হাজির হইল একেবারে গলির মোড়ে, যেখানে কাশীবাবু একটু আড়ালে গা ঢাকা দিয়াছিল।

'সুধীরকে ধরানো হচ্ছে কি জন্যে? ওরা মারামারি করেছে নিজেদের মধ্যে, আপনার তাতে কি? এমনিতে পুলিশ তো মেরে লোপাট করে দিলে, আপনি আবার বেছে বেছে এক একজনার পিছনে লাগছেন কেন?'

সঙ্গে পুলিশ ছিল, কাশীবাবু নির্ভয়ে একগাল হাসিয়া বলিল, 'সুধীর তোমার পীরিতের লোক নাকি যশোদা? তাতো জানতাম না! জড়িয়ে ধরার সময় বেড় পায়?'

'বটে রে মুখপোড়া, রসিকতা হচ্ছে?'—হাত ধরিয়া হ্যাঁচকা টানে কাশীবাবুকে কাছে টানিয়া আনিয়া ঘাড় ধরিয়া মাথাটা নীচু করিয়া যশোদা ভদ্রলোকের মুখখানা জোরে জোরে রাস্তায় ঘষিয়া দিল। কাশীবাবু যখন সোজা হইয়া দাঁড়াইল, মুখের অর্দ্ধেক চামড়া তার উঠিয়া গিয়াছে, দরদর করিয়া রক্ত চোঁয়াইয়া পড়িতেছে।

সুতরাং সুধীরের সঙ্গে যশোদাও হাজতে গেল। ঘণ্টা তিনেক পরে সত্যপ্রিয় স্বয়ং তাকে ছাড়াইয়া লইয়া আসিল। যশোদার সামনেই মুখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা কাশীবাবুর কাছে হাত জোড় করিয়া বলিল, 'আপনাকে মিনতি করছি কাশীবাবু, আমায় না জানিয়ে দয়া করে কিছু আপনি করতে যাবেন না। দু'দিন একটু ব্যস্ত আছি, দাঙ্গা বাধিয়ে, পুলিশ ডেকে এক কাণ্ড করে আপনি বসে আছেন। আমার মিলের লোককে পুলিশে ধরে নিয়ে গেল, আপনি ভাবছেন এতে আমার সম্মান খুব বাড়ল? কে ডাকতে বলেছিল আপনাকে পুলিশ? আমার দেশের মানুষ ওরা, দু'টি অন্নের জন্য খাটতে এসেছে, খিটিমিটি বাধে নিজেদের মধ্যে তা মিটিয়ে নেব, ওদের না পোষায় ওরা কাজ করবে না, আমার না পোষায় আমি কারখানা তুলে দেব—পুলিশ ডাকব কোন লজ্জায়?'

যশোদা অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। কাশীবাবুর রাস্তায় ঘষা মুখটা বোধ হয় বড় জ্বালা করিতেছিল, মাথার ঠিক ছিল না, সত্যপ্রিয়ের তীব্র অনুযোগে থতমত খাইয়া সে বলিয়া বসিল, 'আজ্ঞে আপনি নিজেই তো—'

সত্যপ্রিয় গর্জ্জন করিয়া উঠিল, 'যান, যান, বাড়ী যান আপনি। আপনার মত অপদার্থ লোক রেখেই আমার সর্ব্বনাশ হবে একদিন।'

কাশীবাবু বিছানায় শুইয়া স্ত্রীর সেবা গ্রহণের জন্য বাড়ী গেল। সত্যপ্রিয় বলিল,

'যশোদা, তিন মাস আমি মিলের কোন ব্যবস্থা বদলাতেও পারব না, নতুন ব্যবস্থা চালাতেও পারব না। আমি যদি বলি তিন মাস পরে আমি নিজে খোঁজ খবর নিয়ে ওদের সমস্ত নালিশ আর দাবীর ব্যবস্থা করব, হাঙ্গামাটা তুমি মিটিয়ে দিতে পারবে?'

যশোদা ভাবিয়া বলিল, 'আপনি যদি বলেন—'

'আমি বলছি।'

যশোদা চেষ্টা করিয়া দেখিতে রাজী হইয়া চলিয়া আসিল বটে, মনটা তার খুঁত খুঁত করিতে লাগিল। এই সময় ধর্ম্মঘট চালাইয়া যা কিছু আদায় করিতে পারা যায়, আদায় করিয়া লইলেই ভাল হইত। এসব মতলববাজ লোককে বিশ্বাস আছে? তিন মাসে কত কি করিয়া বসিবে ঠিক আছে কিছু! কিন্তু টাকা সম্বন্ধে যত মতলববাজ লোকই হোক,—ব্যবসাদার মানুষেরা ওরকম একটু হয়,—দেশ সম্বন্ধে একটু মমতা বোধ হয় আছে সত্যপ্রিয়ের। পুলিশ সম্বন্ধে যে কথাগুলি সত্যপ্রিয় বলিল, তার মধ্যে একটু আন্তরিকতা আছে বলিয়া মনে হইল না?

বাড়ী ফিরিয়া কালোর খোঁজ করিতে গিয়া যশোদা দেখিল, না খাইয়া ঘরে কপাট দিয়া সে পড়িয়া আছে। যশোদা ডাকিতে সে দরজা খুলিয়া দিল। ঘরের মধ্যে আলো একটু কম, আলো কম বলিয়াই বোধ হয় কি যে একটা আশ্চর্য্য কমনীয় রূপ চোখে পড়িল কালোর দুঃখক্লিষ্ট মুখে! ন্যাকামি দেখিয়া রাগ করার বদলে যশোদা যেন একটু আশ্চর্য্যই হইয়া গেল—সময় সময় এমন দেখায় কেন মানুষের মুখ? মুখখানা কচি বলিয়া? না সত্যই ভিতরের কিছু মুখে ফুটিয়া বাহির হইতেছে? এরকম আকুল হওয়ার মধ্যে সুখ আছে নাকি কিছু, একটা বিশেষ ধরণের আনন্দ, যশোদা যার স্বাদ জানে না?

যশোদার দেহে সুধীরের বাহুর বেড় না পাওয়ার রসিকতাটা যশোদা ভুলিয়াও ভুলিতে পারিতেছিল না, প্রেমিকের বাহু বন্ধনের জন্য যশোদার কিছুমাত্র মাথা ব্যথা নাই, তবু ঘুরিয়া ফিরিয়া মনে হইতেছিল, কথাটা তো মিথ্যা নয় কাশীবাবুর, দেহটা তার একটু বড় সড় বৈ কি। যেমন ধর এই কালো, এই ছিপছিপে পাতলা মেয়েটাকে সুধীর যেমনভাবে বুকে তুলিয়া লইতে পারে—ঠিক তেমনিভাবে যশোদাকেও বুকে তুলিয়া লইতে একজন বোধ হয় পারে,—ধনঞ্জয়। কাশীবাবুকে ডাকিয়া আনিয়া ধনঞ্জয়ের চেহারাটি একবার দেখাইয়া দিবে নাকি, একবার বলিয়া দিবে নাকি যে,

আপনার মত বামনাবতার সবাই নয়। মশায়, হাঁ দেখুন চেয়ে? হাতে হাতে অবশ্য প্রমাণ করিয়া দেওয়া চলিবে না যে যশোদাকে বেড় দিবার পক্ষে ধনঞ্জয়ের বাহু দুটি যথেষ্টই লম্বা—

কিন্তু ধনঞ্জয়ের পা কাটা গিয়াছে। আর কি এখন মানুষকে ডাকিয়া গর্ব্বের সঙ্গে তাকে দেখানো চলে?

অপরাধটা যেন কালোর এমনিভাবে হঠাৎ বেচারা কালোর উপরে রাগ করিয়া সে বলিল, 'না খেয়ে পড়ে আছিস যে ছুঁড়ি? একটা দিনের জন্য তোকে ছেড়ে যেতে পাবে না সে মানুষটা?'

কালো সাগ্রহে বলিল, 'একটা দিন দিদি? কাল আসবে?'

'আজকেই হয়ত আসবে। যা, নেয়ে খাবি যা।'

সত্যপ্রিয়ের বাগানবাড়ীতে সত্যপ্রিয়ের একটি মেয়ের বিবাহ, কিন্তু মনে হয় সমস্ত সহরতলীতে যেন রাশি রাশি মেয়ের বিবাহ হইতেছে। যশোদার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। সত্যপ্রিয়ের মোটরে আসিয়া যশোদার গলির সামনে মোটর দাঁড় করাইয়া জ্যোতির্ম্ময় আর অনাথ দু'জনে তাকে নিমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছিল।

গাড়ী নিয়া নিমন্ত্রণ করিতে যাওয়ার কথায় জ্যোতির্ম্ময় বলিয়াছিল, 'আজ্ঞে, গাড়ীর দরকার নেই, বাড়ী ফেরার পথে আমি বলে যাব।' শুনিয়া হঠাৎ এমন একটা অদ্ভুত রকমের উদাস ভাব সত্যপ্রিয়ের মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল বলিবার নয়। জ্যোতির্ম্ময় তাড়াতাড়ি ত্রুটি সংশোধন করিয়া বলিয়াছিল, 'আজ্ঞে, গাড়ী নিয়েই যাই তবে, তাড়াতাড়ি হবে।'

সত্যপ্রিয় বলিয়াছিল, 'না না, তাড়াহুড়ো করবেন না। বাড়ীতে ঢুকেই বললেন, তোমার নেমন্তন্ন, আর বলেই চলে এলেন, এতে অপমান করা হয় মানুষের। বসে কিছুক্ষণ আলাপ পরিচয় করে বিশেষভাবে অনুরোধ করে আসবেন, বিয়েতে যেন আসে।'

বিবাহের দিন সন্ধ্যার সময় সত্যপ্রিয়ের গাড়ীতেই জ্যোতির্ম্ময় বাড়ীর সকলকে এবং যশোদা ও নন্দকে বিবাহ-বাড়ীতে নিয়া গেল। ধর্ম্মঘট মিটাইয়া দিয়া যশোদা যেন সত্যপ্রিয়কে কিনিয়া ফেলিয়াছে, কিভাবে তাকে সম্মান দেখাইবে সত্যপ্রিয় ভাবিয়া পাইতেছে না।

যশোদা কিন্তু সংশয়ভরে নন্দকে বলিয়াছে, 'উঁহু, কি যেন মতলব আছে লোকটার। নইলে এমন বাড়াবাড়ি করত না।'

নিমন্ত্রণে যাওয়ার কথায় অপরাজিতা এবারও বলিয়াছিল, 'আমি যাব?' তারপর রওনা হওয়ার সময়ও সে আপত্তি করিয়াছে, বলিয়াছে, 'দ্যাখো, শরীরটা বড় খারাপ লাগছে, ভিড়ের মধ্যে নাইবা গেলাম আমি?'

'একবারটি চলো লক্ষ্মী। গিয়ে না হয় একপাশে চুপটি করে বসে থেকো।'

সকলকে অন্দরের মুখে ছাড়িয়া দিয়া জ্যোতির্ম্ময় এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়ায়। বাড়ীর সামনে প্রকাণ্ড হোগলার মণ্ডপ তোলা হইয়াছে, থামগুলি রঙীন কাগজ আর দেবদারু পাতায় ঢাকা, বাহিরের গাছগুলিকে লাল নীল আলোয় সাজান হইয়াছে। অনেকগুলি জোরালো আলোয় চারিদিক ঝলমল করিতেছে। পান সিগারেট আর সরবৎ বিতরণ করা হইতেছে হরদম, মাঝে মাঝে গোলাপজলের পিচকারিও মারা হইতেছে। চারিদিকে লোক গিজ গিজ করিতেছে, নানা অবস্থার নানা বয়সের লোক,—বাঙ্গালীই বেশী, অ-বাঙ্গালীও আছে। সকলেই বেশভূষা করিয়াছে প্রাণপণে, কিন্তু গরীবদের দেখিলেই চেনা যায়। কেবল পোষাক ভেদ করা দারিদ্র্য নয়, অনভ্যস্ত উৎসবের আবেষ্টনীতে সকলের দৈনন্দিন অভ্যস্ত জীবনের পরিচয় বিচিত্র ইঙ্গিতে প্রকাশ হইয়া যাইতেছে। সঙ্কোচ, ভয়, দীনতা, দুঃখ, রোগ, শোক, বিষণ্ণতা। তার নিজের? চার পাঁচজন চেনা মানুষ জিজ্ঞাসা করিয়াছে, মুখ তার শুকনো কেন, তার কি অসুখ করিয়াছে? এতো বড় ভয়ানক কথা যে, একটা নেকলেশ তাকে এমন অবস্থায় আনিয়া দিতে পারে যে, তাকে দেখিলে লোকের মনে হয় সে অসুস্থ!

ক্রমাগত গাড়ী আসিয়া নিমন্ত্রিতদের নামাইয়া দিয়া যাইতেছিল। জমিদার, ব্যাঙ্কার, ব্যবসায়ী, উকিল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার। তিনজন মারোয়াড়ী ব্যবসায়ীর পরে দু'জন মন্ত্রীর আবির্ভাব ঘটিল,—একজন অন্য প্রদেশের। তারপর কয়েকজন বোম্বাইওয়ালা, পাঞ্জাবী ও য়ুরোপীয় ব্যবসায়ীর পিছনে আসিল দু'জন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী। দু'জনেই ইংরেজ। বোধ হয় এদের অভ্যর্থনা করার জন্যই একজন বাঙ্গালী উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী এতক্ষণ সত্যপ্রিয়ের কাছে দাঁড়াইয়া মোটা একটা সিগার টানিতেছিল। এদের একজনের সঙ্গে জ্যোতির্ম্ময় চাকরীর প্রথম দিকে একবার দেখা করিতে গিয়াছিল। নিজে যায় নাই, সত্যপ্রিয় সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিল। একটু চা পান আর ঘন্টাখানেক নানা বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল। ঠিক যে

আলোচনা হইয়াছিল তা নয়, নানা বিষয়ে জ্যোতির্ম্ময়ের মতামত জানিবার জন্য যেন কতকটা জেরাই করা হইয়াছিল জ্যোতির্ম্ময়কে, তবে সে কাজটা ভদ্রলোক করিয়াছিল বড়ই অমায়িকভাবে। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় আগাগোড়া সত্যপ্রিয় বিশেষ কথা শুনিয়াছিল—যেটা সত্যপ্রিয়ের একেবারেই প্রকৃতিবিরুদ্ধ। যাই হোক, কোন বিষয়ে নিজের কোন মতামত জ্যোতির্ম্ময়ের ছিল কিনা সন্দেহ, ততদিনে সত্যপ্রিয়ের মতামতগুলিও সে মোটামুটি আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিল, সুতরাং সত্যপ্রিয়ের সামনে বসিয়া ভারতবর্ষের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিতে তার বিশেষ অসুবিধা হয় নাই। সত্যপ্রিয়ও মোটামুটি খুসী হইয়াছিল, কেবল ফিরিবার সময় দু'একটি বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিল, 'আমার কথাগুলি এখনো সম্পূর্ণ বুঝে উঠতে পারেন নি। যাই হোক, আপনার নিষ্ঠা আছে, ধীরে ধীরে বুঝবেন। আমার কত বছরের চিন্তা ফল, ওকি আর দু'চারদিনে বোঝা যায়।'

তারপর জ্যোতির্ম্ময় আর ইংরেজ ভদ্রলোকটির সংস্পর্শে আসে নাই। কিন্তু সত্যপ্রিয়ের যত লেখা ও বক্তৃতা ছাপা হয়, সত্যপ্রিয় নিজে যে সেগুলিতে নানা রকম মন্তব্য যোগ করিয়া এর কাছে পাঠাইয়া দেয়, কিছুদিন পরে জ্যোতির্ম্ময় তা জানিতে পারিয়াছে।

সেই সঙ্গে একটা বিষয়ে জ্যোতির্ম্ময়ের একটা অস্পষ্ট ধারণাও জন্মিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের বড় বড় কণ্ট্রাক্ট বাগানোর ব্যাপারে সত্যপ্রিয় যে অসাধারণ ও প্রায় অবিশ্বাস্য কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, অনেকের কাছেই তা দুর্ব্বোধ্য রহস্যে ঢাকা। কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ের মনে হয়, এই ইংরেজ ভদ্রলোকটির অনুগ্রহেই বোধ হয় সত্যপ্রিয়ের এই বিশেষ সৌভাগ্য।

স্পষ্ট ধারণা করিবার উপায় নাই। সত্যপ্রিয়কে ব্যক্তিগতভাবে এতখানি অনুগ্রহ করিবার মত উচ্চপদে তো ভদ্রলোক প্রতিষ্ঠিত নয়। ব্যক্তিগত অনুগ্রহের ব্যাপারও এটা নয়। জোর গলায় যে ঘোষণা করিতেছে যে, আমি দেশকে ভালবাসি, ভারতবর্ষের সকল সমস্যার সমাধান আমি আবিষ্কার করিয়াছি, দেশের অপরিণামদর্শী অন্ধ নেতাদের প্রদর্শিত ভ্রান্ত পথ ত্যাগ করিয়া আমার প্রদর্শিত পথে চলিলে তেত্রিশ বৎসরে ভারত স্বাধীন হইবে, ভারতের ঘরে ঘরে সুখও শান্তি বিরাজ করিবে—মাঝে মাঝে সে ইংরেজ-বিদ্বেষ আর সোজাসুজি গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে

বিরোধ ত্যাগ করিতে বলে বলিয়াই কি তাকে প্রশ্রয় দেওয়ার মত উদারতা গবর্ণমেণ্টের হয়?

অথবা হয়?

কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারে না জ্যোতির্ম্ময়। মনে হয়, কোথায় যেন একটা ধাঁধাঁ আছে। দেশপূজ্য নেতা, স্বদেশী প্রতিষ্ঠান, স্বাধীনতার আন্দোলন সমস্ত কিছুরই বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্যপ্রিয় যেমন করে, গবর্ণমেণ্টের নিন্দাও তো করে? অবশ্য স্বাধীনতার মন্ত্র প্রচারকদের সমালোচনার সময় ভাষাটা যেমন তীব্র হয়, এদের প্ররোচনায় দেশের যে সর্ব্বনাশ হইতেছে তার বর্ণনা যেমন রোমাঞ্চকর হয়, গবর্ণমেণ্টের নিন্দাটা তেমন জমে না। শিক্ষার অব্যবস্থা, নদী নালার সংস্কারের অভাব, পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রচারে সহায়তা, ভ্রান্তিপূর্ণ অর্থ-নৈতিক নীতি অনুসরণ, এই ধরণের কয়েকটি বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের ভুল দেখাইয়া সসম্ভ্রমে গবর্ণমেণ্টকে সতর্ক করিয়া দিয়াই সত্যপ্রিয় ক্ষান্ত হয়। তবু, এসব তো বিরুদ্ধ সমালোচনা? সত্যপ্রিয় যে সত্য সত্যই দেশকে ভালবাসে, যত খাপছাড়া বা উদ্ভট সে ভালবাসা হোক, তার লেখা ও বক্তৃতায় তার যথেষ্ট পরিচয় থাকে।

দেশের দুরবস্থার যে বর্ণনা লেখায় ও বক্তৃতায় সত্যপ্রিয় দেয়, দেশকে ভাল না বাসিলে কেউ তা পারে? নেতারা যা চায় সত্যপ্রিয়ও তাই চায়,—কেবল তার উপায়টা একটু পৃথক, একটু অভিনব। কদিন আগেও সত্যপ্রিয়ের একটি পুস্তক জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ করিয়াছে, তাতে সত্যপ্রিয় স্পষ্টই বলিয়াছে, সর্ব্বাগ্রে ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতা চাই, প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য প্রত্যেক ভারতবাসীর চেষ্টা করা কর্ত্তব্য:—বলিয়া প্রকৃত স্বাধীনতা কাকে বলে ধর্ম্ম ও শাস্ত্রগ্রন্থের সাহায্যে সেটা ব্যাখ্যা করিয়াছে। সংস্কৃত শ্লোকগুলি সম্ভবতঃ কেষ্টবাবুই সংগ্রহ করিয়া দিয়াছে। তা হোক, সেটা বড় কথা নয়, সংস্কৃত শ্লোকের অপার সমুদ্রে ভাড়াটে ডুবুরী নামাইয়া রত্ন উদ্ধার করিলে দোষ হয় না, সেগুলি কাজে লাগাইতে পারাই আসল কথা। ব্যাখ্যার পর সত্যপ্রিয় নির্দ্দেশ করিয়াছে, প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবার উপায়। এই উপায় নির্দ্দেশ করাই প্রবন্ধটির প্রধান উদ্দেশ্য, প্রবন্ধটির নামই ছিল, 'তেত্রিশ বৎসরে ভারতের স্বাধীনতা লাভের উপায়।' ধর্ম্ম যখন লোপ পায়, সমাজ ব্যবস্থা বিকৃত হয়, দেশবাসীর দারিদ্র্য, অন্নাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, অকালমৃত্যু, বীভৎস রূপ ধারণ করে, দেশহিতৈষীর তখন সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য কি? এ সমস্তের মূল কারণ অনুসন্ধান।

কারণ না জানিলে প্রতীকার হইবে কিরূপে? শাস্ত্রগ্রন্থ, ধর্ম্মগ্রন্থ, দেশ-বিদেশের হাজার বৎসরের ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া সত্যপ্রিয় দেখাইয়াছে, একটিমাত্র কারণে দেশের সর্ব্বাঙ্গীন দুরবস্থা ঘটে—রাজশক্তির সহিত উদ্দেশ্যহীন বিরোধ। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের পরিচালনায় ঈশ্বর কয়েকটি মূলনীতি স্থির করিয়া দিয়াছেন, কেবল সূর্য্যের সহিত পৃথিবীর সম্পর্ক বিচার করিয়াই সে নীতির মর্ম্ম উপলব্ধি করা সম্ভব, ঐ সকল মূলনীতির একটি হইল—রাজশক্তির সহিত অকারণ কলহ করিলে দেশবাসীর ধর্ম্ম, সমাজ, সুখ-সম্পদ, স্বাস্থ্যশান্তি নষ্ট হইবেই হইবে, কিছুই তাহা ঠেকাইতে পারিবে না। এই নিয়মের দ্বারাই বিশ্বনিয়ন্তা শক্তির সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। এইখানে সত্যপ্রিয় শক্তি সম্বন্ধে বিজ্ঞানের মতবাদ ও ভারতীয় ঋষিগণের মতবাদ আলোচনা করিয়া বিজ্ঞানের মতবাদের ভ্রান্তি প্রমাণ করিয়াছে, যদিও সত্যকথা বলিতে কি, আলোচনাটা জ্যোতির্ম্ময় একবিন্দুও বুঝিতে পারে নাই। ভারতবর্ষের যে অধঃপতন হইয়াছে, ভারতবাসীর যে শোচনীয় দুরবস্থা দেখা দিয়াছে এবং দিন দিন অধঃপতন ও দুরবস্থা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ ভারতবাসীর রাজশক্তির সহিত বিবাদ। কিন্তু তাই যদি হয়, ভারতবর্ষ কি তবে স্বাধীনতা পাইবে না? স্বাধীনতা পাইতে গেলেই তো রাজশক্তির সহিত ভারতবাসীর বিবাদ বাধিবে—কারণ রাজশক্তি বৈদিশিক? না, তা নয়। সত্যপ্রিয় স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছে, স্বাধীনতা ভারতবাসী অনায়াসে পাইতে পারে, তেত্রিশ বৎসরে পাইতে পারে, যদি ঠিক পথ অনুসরণ করা হয়।

শতাব্দীর পর শতাব্দী রাজশক্তির সহিত ভারতে বিরোধ চলিয়া আসিতেছে, কখনও একরূপে কখনও অন্যরূপে, কখনও প্রবলভাবে, কখনও ক্ষীণভাবে—ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দেয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ভারতের অধঃপতন ঘটিতে ঘটিতে ভারত বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সুতরাং মূর্খেরও এখন বোঝা উচিত যে ভারতবাসীর সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য রাজশক্তির সহিত সর্ব্বপ্রকার বিরোধ পরিত্যাগ করা। কার্য্যে, চিন্তায় ও বাক্যে এমন কিছুই প্রশ্রয় পাইবে না যাহা রাজশক্তির পছন্দসই নহে। এমন কি, কেহ যদি ভ্রান্তিবশতঃ রাজশক্তির বিরোধিতা করিয়া দেশের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হয়, রাজশক্তি তাকে উপেক্ষা করিলেও দেশবাসীর নিজেদেরই কর্ত্তব্য হইবে তাকে সংযত করা। একদিনে ইহা হইবে না সত্যপ্রিয় তাহা জানে, সত্যপ্রিয়ের পন্থা অনুসরণ করিলে ইহাতে বিশ বৎসর সময় লাগিবে।

যে মুহূর্তে ভারতবাসী রাজশক্তির সহিত বিরোধ পরিত্যাগের চেষ্টা আরম্ভ করিবে, সেই মুহূর্ত্ত হইতে ধর্ম্ম ও সমাজের অধোগতি রদ হইয়া দেশবাসীর অন্নকষ্ট, সুখ-শান্তির অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব এ সমস্তের প্রতিকারও আরম্ভ হইবে—বিশ বৎসর পরে দেখা যাইবে, একমাত্র পরাধীনতা ছাড়া ভারতবর্ষের কোন অভাব নাই। ভারতীয় ধর্ম্ম, ভারতীয় সমাজ-বিধান চরম উন্নতি লাভ করায় তখন রাজশক্তিরও পরিবর্ত্তন ঘটিতে আরম্ভ করিবে, কারণ, প্রকৃতির নিয়মে ধর্ম্ম ও সমাজ বিধানের অনুরূপ রাজশক্তিই দেশে প্রচলিত থাকিতে পারে; এইখানে ঋষিগণের বাক্য হইতে সত্যপ্রিয় দেখাইয়াছে, একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন আধারহীন শক্তি হয় না, আধার পরিবর্ত্তিত হইলেই শক্তির বাহ্যিক রূপান্তর ঘটিবে, অবশ্য মূল শক্তি চিরদিনই অবিনাশী ও অপরিবর্ত্তনীয়, ইত্যাদি। তের বৎসর ভারতবাসী যদি ধর্ম্ম আর সমাজ বিধানের উৎকর্ষ বজায় রাখিতে পারে ভারতের বৈদেশিক রাজশক্তি ভারতীয় রাজশক্তিতে পরিণত হইবে। সুতরাং তেত্রিশ বৎসরে ভারতবর্ষ কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়, সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতা লাভ করিবে। নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। ইংরেজ-বিদ্বেষ প্রচার করিয়া, স্বাধীনতার আন্দোলন তুলিয়া নেতৃবর্গ দেশের ধ্বংসের পথটাই পরিষ্কার করিয়া দিতেছে—স্বাধীনতাকে হাজার বৎসর ভবিষ্যতে ঠেলিয়া দিতেছে।

সত্য কথা বলিতে গেলে, সত্যপ্রিয়ের প্রবন্ধটি জ্যোতির্ম্ময়ের কাছে কতকটা প্রলাপের মত মনে হইয়াছে, তবু কি যেন আছে প্রবন্ধটিতে যা মনের নীতিধর্ম্মগত অন্ধ বিশ্বাসে জন্ম-মৃত্যু-সীমাহীনতা নক্ষত্রলোক-আশ্রয়ী দুর্ব্বোধ্য ও রহস্যময় অনুভূতির জগতে, কেমন যেন একটা অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করে। আশার কথা বলা হইয়াছে, তবু অকারণ হতাশায় মন ভরিয়া যায়, কার্য্যের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে তবু মনে হয় হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকাই ভাল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার কথা বলিতে বসিয়া প্রাচীন ভারতের স্বর্গের সঙ্গে বর্ত্তমান ভারতের নরকের তুলনা করিয়া, ধর্ম্ম আর ঈশ্বর আর দর্শনের কথা বলিয়া, সত্যপ্রিয় যেন একেবারে মনের ভিত্তি ধরিয়া নাড়া দেয়,—আসল বক্তব্য সত্যপ্রিয় কি যুক্তি দিয়া প্রমাণ করিয়াছে সে বিষয়ে মাথা না ঘামাইয়াই তার কথা মানিয়া লইতে ইচ্ছা হয়। মাঝে মাঝে, বহির্জগতের চিন্তাধারার সঙ্গে হঠাৎ যখন জ্যোতির্ম্ময়ের কোন কারণে একটু সংস্পর্শ ঘটিয়া যায়, তখন দু'একবার তার মনে হইয়াছে, সত্যপ্রিয়ের বলিবার যেন কিছুই

নাই, সে শুধু ধর্ম্ম, ঈশ্বর, শাস্ত্র, দেশ ও সমাজের দোহাই দিয়া দেশবাসীকে স্বাধীনতার প্রচলিত আন্দোলন বন্ধ করিতে বলিতেছে। এই একটি কথাই বলিবার আছে সত্যপ্রিয়ের এবং এই একটি কথাই সে ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া পুনরাবৃত্তি করিয়া চলিয়াছে।

এদিক ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে জ্যোতির্ম্ময় বিবাহের আসরের কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল। একজন বড়বাজারের বড় ব্যবসায়ী সামনে পড়িল। ভুঁড়ি নাই, বাঙ্গলা বলিতে পারে। সত্যপ্রিয়ের সঙ্গে অনেকদিনের ঘনিষ্ঠতা, কারণ, সত্যপ্রিয় তিনবার তিনটি মুখের গ্রাসে লাখ তিনেক টাকা কাড়িয়া লইয়াছে।

'জোতীরমোয়বাবু যে! কেমোন আছেন! ভালত!'—একদৃষ্টে খানিক তফাতে সত্যপ্রিয়ের দিকে চাহিয়া থাকে। সাদা ও কালো রাজকর্ম্মচারী ক'জনকে সত্যপ্রিয় বিবাহের আসর দেখাইতেছিল এবং সম্ভবতঃ হিন্দু বিবাহ পদ্ধতির অবনতি ও তাহার কুফল ব্যাখ্যা করিতেছিল।—'দেখিয়েছেন জোতীরমোয়বাবু! মেয়ের সাদি দিতে দিতে কেমোন নিজের কাম বাগিয়ে নিয়েতেছেন। কি চীজ আছেন আপনার সত্যবাবু! কি বলিয়েতেছেন জনিসন সায়েবকে জানেন? হামি জানি! বলিয়েতেছেন—সায়েব, ইয়ংম্যান স্বদেশী করবে আর তোমরা তাদের জেলে ভেজবে, তোমরা তাদের জেলে ভেজবে আর ইয়ংম্যান স্বদেশী করবে,—হামারা বাত শুনিয়ে, জেলে কখুনো দিও না, একঠো নরম-গরম মেয়ের সাথে জবরদস্ত্ সাদি দিয়ে দাও, স্বদেশী না করে ইয়ংম্যান তখন সে তিশ রূপেয়ার কেরাণী বনে যাবে।'

জ্যোতির্ম্ময় হাসিয়া বলিল, 'তাই নাকি! সত্যপ্রিয়বাবু ও কথা বলছেন আপনি কি করে জানলেন মোহনলালজী?'

'হামি না জানিয়েলে কে জানবে? হামি আর উনি দু'জনতো টেণ্ডার দিয়েলাম—সায়েব হামাকে পুছলো, মোহনলালজী, দেশকো যত আদমি ইংরেজ রাজকো ভাগাতে চায় তাদের কি করা যায় বলুন তো? হামি বললাম, জেলমে পুরে দিন। বাস্, হামি আর টেণ্ডার না পেলাম।'

জ্যোতির্ম্ময় সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, 'ওঁকে জিজ্ঞাসা করায় উনি কি বললেন?'

'হামারা সামনে কি পুছিয়েছে? ওই অনুমান করে লিন্ না! আপনি সত্যবাবুকে না জানেন? সত্যবাবুর জবান না শুনেন?—হাসিয়ে হাসিয়ে উনি কোতোবার বলিয়েছেন, সাধুকে দারু পিলাবে তো মন্দিরমে ঘটা করে পূজা দিয়ে চরণামৃত

বোলকে পিলায়ে দেও। দশ রোজ পিলায়ে দিলে সাধু মাতাল হয়ে যাবে, চোরকে সাধু বানাবে তো আসলি সাধু বনে' থাকলে চুরির কতো সুবিস্তা সমঝিয়ে দিয়ে দশ রোজ ধরে সাধু বানাও—চোর আর চুরি না করবে। সত্যবাবু সায়েবকো এসা কুছু বলিয়ে থাকবেন।'

হয়তো তাই হইবে। যে সামান্য একটা নেকলেশের ব্যাপারে ছ্যাচরামি না করিয়া পারে না—

তারপর এক সময় কোন রকমে লুচি পোলাও কিছু পেটে পুরিয়া মণ্ডপের থামে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া জ্যোতির্ম্ময় নানা রঙের শাড়ী-পরা একদল ছোট ছোট চঞ্চল মেয়ের মহোল্লাসে প্রীতি-উপহারের সংগৃহীত কাগজ ভাগাভাগি করা দেখিতেছে, সত্যপ্রিয়ের বড় ছেলে মহীতোষ আসিয়া তাকে ডাকিয়া লইয়া গেল।

'কি হয়েছে মহী ?'

'বৌদি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।'

অপরাজিতা ? অপরাজিতার আবার কি অসুখ হইল ? অন্দরে মেয়েদের ভিড়, একটা ঘরে বাসর বসিয়াছে, বারান্দা ও দু'তিনটি ঘরে খাওয়া চলিতেছে, শাড়ীর বর্ণ-বৈচিত্র্যে চোখ ঝলসিয়া যায়। কিছু না জানিয়াও জ্যোতির্ম্ময় বুঝিতে পারিল এদের একজনও অপরাজিতা নয়। বাড়ীর প্রায় পিছনে কোণের দিকের ছোট একটি ঘরের সামনে স্বয়ং সত্যপ্রিয় দাঁড়াইয়া ছিল। আর একটু তফাতে তিন চারজন মেয়ের কাছে দাঁড়াইয়া সুবর্ণ নিঃশব্দে কাঁদিতেছিল। জ্যোতির্ম্ময়কে দেখিবামাত্র এতক্ষণের চাপা রাগ ও বিরক্তির বশে সত্যপ্রিয় বলিয়া ফেলিল, 'আপনার মাথায় গোবর ভরা জ্যোতির্ম্ময়বাবু! বৌমাকে এ অবস্থায় কি বলে নিয়ে এলেন ?'

মাথায় যে জ্যোতির্ম্ময়ের সত্যসত্যই গোবর ভরা তার প্রায় আরও একটা প্রমাণ দিয়া সে বলিল, 'আপনি যে আনতে বললেন ?'

সত্যপ্রিয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জ্যোতির্ম্ময়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, কিছু বলিল না। মহীতোষকে একখানা গাড়ী একেবারে বাড়ীর পিছনে আনিয়া লাগাইতে বলিয়া দিল। গাড়ী যেন বড় হয়, একজনকে যেন শোয়ান চলে গাড়ীতে।

মহীতোষ বলিল, 'অ্যাম্বুল্যান্সের জন্য ফোন করে দিলে হয় না ?'

সত্যপ্রিয় যেন শুনিতে পাইল না এমনিভাবে সরিয়া গিয়া বারান্দায় রেলিঙে

ঝুঁকিয়া একটু চাহিয়া রহিল, তারপর ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াই রাগ করিয়া বলিল, 'দাঁড়িয়ে রইলি যে মহী?'

'এই যে, যাই।'—চোখের পলকে মহীতোষ অদৃশ্য হইয়া গেল।

জ্যোতির্ম্ময় সুবর্ণের কাছে সরিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হয়েছে রে সুবর্ণ?'

সুবর্ণ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'বৌদি হঠাৎ মূর্চ্ছো গিয়ে গোঙাতে লাগল, আর—'

এবার সত্যপ্রিয় ডাকিয়া বলিল, 'ভয় পাবেন না জ্যোতির্ম্ময়বাবু। দু'জন ডাক্তার পরীক্ষা করছেন, দেখি তাঁরা কি বলেন। যশোদাও ভেতরে আছে।'

মিনিট পনের পরে দরজা খুলিয়া ডাক্তার দু'জন বাহির হইয়া আসিল, যশোদাও সঙ্গে আসিল। দু'জন ডাক্তারকে জ্যোতির্ম্ময় চেনে, দু'জনেই নাম করা চিকিৎসক, একজন সহরের, একজন সহরতলীর। এমন কত ডাক্তার আজ সত্যপ্রিয়ের কন্যার বিবাহে নিমন্ত্রণ রাখিতে আসিয়াছে।

ডাক্তার দু'জন মুখ খুলিবার আগেই সত্যপ্রিয় বলিল, 'একটু সুস্থ হয়েছেন তো এখন? যাক্ বাঁচা গেল। বিয়েবাড়ীতে একটা বিপদ-আপদ ঘটলে বাড়ীর কর্ত্তার বুকের মধ্যে কেমন করে, আপনারা কি বুঝ্‌বেন! সামান্য একটু কিছু ঘটল তো সব কাজ পণ্ড হতে বসল। যাই হোক্ ভগবানের দয়ায় সুস্থ যখন হয়েছেন, গাড়ী করে এবার ওঁকে বাড়ী পাঠিয়ে দি, কি বলেন? বাড়ী কাছেই, পাঁচ মিনিটের পথ। ইনি মেয়েটির স্বামী।'

ডাক্তার দু'জনের মধ্যে যার বয়স কম সে একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। জ্যোতির্ম্ময়ের দিকে এক নজর চাহিয়া সে হঠাৎ বলিল, 'আমি বলছিলাম কি—'

পরম ধৈর্য্যের ভঙ্গিতে তার মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া শান্তকণ্ঠে বলিল, 'বলুন? বলুন আপনি কি বলছেন?'

ডাক্তার ঢোঁক গিলিয়া বলিল, 'বাড়ী কাছে হলে আর ভাল একখানা গাড়ী পেলে নেওয়া চলে বৈকি।'

সত্যপ্রিয় বলিল, 'তা ছাড়া আপনি যখন সঙ্গে যাচ্ছেন, তখন আর ভয়ের কি থাকতে পারে?'

সুতরাং আর কারও কিছু বলিবার রহিল না, কেবল যশোদা একবার বলিল, 'আজ রাতে ঠাইনাড়া করা কি ভাল হবে ডাক্তারবাবু?'

ডাক্তার কি জবাব দিল ভালমত বোঝা গেল না। সিঁড়ি দিয়া নামাইয়া গাড়ী পর্য্যন্ত নেওয়ার জন্য ষ্ট্রেচারের মত একটা কিছুর ব্যবস্থার কথা ডাক্তার উল্লেখ করিলে যশোদা বলিল, 'থাক্, থাক্, এঁদের আর কষ্ট দিয়ে কাজ নেই। আমিই নিয়ে যাচ্ছি ওকে কোলে করে, তাতে ঝাঁকুনিও কম লাগবে।'

শিশুর মত অপরাজিতার শরীরটা দু'হাতে অবলীলাক্রমে বুকের কাছে তুলিয়া নিয়া যশোদা নীচে নামিয়া গেল। তাকে বুকে ধরিয়া রাখিয়াই নিজে সে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। ডাক্তার ভিতরে আসিল, জ্যোতির্ম্ময় আর সুবর্ণ সামনে বসিল।

যশোদা ডাক্তারকে বলিল, 'এইভাবেই রাখলাম, আবার নামাতে হবে তো। বারবার তোলা-নামার চেয়ে একভাবে থাকাই ভাল। কি বলেন ?'

ডাক্তার সংক্ষেপে বলিল, 'হ্যাঁ।'

দক্ষিণের গেট দিয়া গাড়ী রাস্তায় পড়িতেই যশোদা কারও সঙ্গে পরামর্শও করিল না, কারও অনুমতি চাহিল না, চালককে সোজা হাসপাতালে যাইতে হুকুম দিয়া দিল। জ্যোতির্ম্ময় চমকাইয়া উঠিল, সুবর্ণ অস্ফুট একটা শব্দ করিয়া আবার কাঁদিয়া ফেলিল, ডাক্তার চুপ করিয়া রহিল।

যশোদার গা বোধ হয় বড় বেশীরকম জ্বালা করিতেছিল, ডাক্তারের লজ্জিত নীরবতাও তাকে থামাইয়া রাখিতে পারিল না, একটু পরে আবার বলিল, 'হাসপাতালে না গিয়ে কি করি বলুন ? আপনাদের মত ডাক্তারের ভরসায় বাড়ী নিয়ে যেতে সাহস হল না।'

ডাক্তার এবারও কিছু বলিল না।

এমার্জ্জেন্সী ওয়ার্ডের একটা ঘরে অপরাজিতার মরণ রদ করিবার চেষ্টা চলিতে থাকে, বাহিরে একটা কাঠের বেঞ্চে বসিয়া থাকে জ্যোতির্ম্ময়, যশোদা আর সুবর্ণ। প্রিয়জনকে হাসপাতালে দিবার একটা অযৌক্তিক অসুবিধা আছে, নিজেদের কিছুই করিবার ক্ষমতা নাই, জানা থাকিলেও নিজেদের কিছু করা হইল না ভাবিয়া বড় কষ্ট হয়। একজন মরিতেছে আর এমন নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকা! এ যেন এক ধরণের অপরাধ।

রাত তিনটার সময় ডাক্তার জানাইল, এখন তারা নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী যাইতে পারে। না, ঠিক নিশ্চিন্ত মনে নয়, আর ভয় নাই এমন কথা ডাক্তার

বলিতে পারে না, তবে এখনকার মত বিপদটা কাটিয়া গিয়াছে। অপরাজিতা যদি নেহাৎ মরেই তবে তার মরিতে অন্ততঃ দু'একটা দিন সময় লাগিবে। এমন রূঢ়ভাবে যে ডাক্তার খবরটা জানাইল তা নয়, তার কথার মোটামুটি অর্থ-টা এই।

যশোদার সঙ্গে সুবর্ণকে বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া জ্যোতির্ম্ময় একাই হাসপাতালে বসিয়া রহিল। অপরাজিতাকে সে কি খুব ভালবাসে? অপরাজিতা মরিয়া গেলে খুব কষ্ট হইবে তার? উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া আর রাত্রি জাগরণের অবসাদের জন্য বোধ হয় মনটা ভোঁতা হইয়া গিয়াছে, ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

হাসপাতাল হইতে সে যখন বাহির হইল, রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। রাস্তার আলো নেভে নাই, কিন্তু চারিদিকে দিনের আলোর আবির্ভাবের আবছা সঙ্কেত টের পাওয়া যায়। ট্রাম ও বাস চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু জ্যোতির্ম্ময় হাঁটিতে আরম্ভ করিল। সমস্ত রাত জাগিয়া থাকার পর সহর ও সহরতলীর জাগরণ আরম্ভ হইবার সময়টা এই পথ দিয়া হাঁটিতে ভাল লাগিতেছিল। কয়েক ঘন্টা পরে মানুষ ও গাড়ী-ঘোড়ার কি ভিড়টাই এই পথে আরম্ভ হইবে। সহরতলী হইতে সহরের দিকেই মানুষ চলিতে আরম্ভ করিবে বেশী, বিকালের দিকে যেন স্রোতটা ফিরিয়া আসিবে সহর হইতে সহরতলীর দিকে।

পথটা এলোমেলোভাবে বহুদূর বিস্তৃত সারি-সারি রেললাইন ডিঙ্গাইয়া গিয়াছে। ব্রিজের উপর রেলিঙে ভর দিয়া জ্যোতির্ম্ময় একটু দাঁড়াইল। ওয়াগন বাছাই করিবার জন্য ইস্পাতের রেখার দুর্বোধ্য আর জটিল রেখাচিত্র দিয়াই সহর ও সহরতলীকে যেন ভাগ করা হইয়াছে। উঁচু থামের উপর হইতে এদিকে ওদিকে জোরালো আলো ফেলিয়া কোন কোন লাইনের কিছু কিছু অংশ আলোকিত করা হইয়াছে, বাকীটা আবছা আলো-অন্ধকারে ঢাকা। ব্রিজের দু'পাশে বহুদূর পর্য্যন্ত অসংখ্য ওয়াগন বিশৃঙ্খলভাবে দাঁড়াইয়া আছে। কয়েকটা ওয়াগন ইঞ্জিনের ঠেলা খাইয়া আপনা-আপনি একদিকে আগাইয়া চলিয়াছে, লিভার ঠেলিয়া ঠেলিয়া সেগুলিকে সরাইয়া দেওয়া হইতেছে এক লাইন হইতে আরেক লাইনে। দু'দিকে কাছে ও দূরে থামের মাথায় বসানো সিগন্যালের অনেকগুলি লাল-নীল আলো, মানুষের হাতের সঞ্চরণশীল আলোর নড়িয়া নড়িয়া দূরের মানুষকে দুর্বোধ্য ইঙ্গিত

করা, কতবার জ্যোতির্ম্ময় এই ব্রিজের উপর দিয়া দিনে ও রাত্রে যাতায়াত করিয়াছে, কিন্তু কোনদিন খেয়ালও করে নাই ব্রিজের দু'পাশে নগরের এমন একটা রূপ বিছান রহিয়াছে। অপরাজিতাকে সে যে বিবাহ করিয়াছে, এত কাল এক বিছানায় রাত কাটাইয়াছে, অপরাজিতার মধ্যে নিজের এক প্রতিনিধিকে আনিয়া দিয়াছে, তাও কি এতকাল সে খেয়াল করিয়াছিল ?

অপরাজিতা যদি মরিয়া যায় !

কি হইবে অপরাজিতা মরিয়া গেলে ? ব্রিজের দু'দিকে রেললাইনগুলি এমনিভাবেই পাতা থাকিবে, ইঞ্জিনের হুস্ হুস্ আর ওয়াগনে ওয়াগনে ঠোকাঠুকির এমনি শব্দ উঠিবে, থামের মাথার জোরালো আলো, সিগন্যালের লাল-নীল আলো, লণ্ঠন নাড়িয়া মানুষের সঙ্কেত কিছুই বদলাইবে না।

বাড়ী ফেরার পথে যশোদার সঙ্গে দেখা করিয়া গেল। যশোদা উনানে আঁচ দিয়াছে, আঁচ প্রায় ধরিয়া আসিল।

'কাল চাকরীতে রিজাইন দেব চাঁদের মা।'

'বেশ তো, রিজাইন দেওয়া তো পালাবে না ? বাড়ী গিয়ে শুয়ে পড়বেন যান।'

অপরাজিতা বাঁচিবে না আশঙ্কা করিয়াই সত্যপ্রিয় একটু ব্যস্ত হইয়া তাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছিল। কেবল অমঙ্গলের ভয় নয়, তার চেয়ে বেশী ভয় ছিল গোলমালের। এত টাকা খরচ করিয়া মেয়ের বিবাহের আয়োজন করিয়াছে, তার মধ্যে এমন একটা উৎপাত কি মানুষের ভাল লাগে ? সে রাত্রে অপরাজিতার প্রাণটা বাহির হইবে না জানা থাকিলে হয়ত তাকে সরাইয়া দিবার জন্য অতটা ব্যস্ত হইয়া পড়িত না।

পরদিন বেলা প্রায় এগারটার সময় নিজেই জ্যোতির্ম্ময়ের বাড়ী খবর জানিতে আসিল। এ বড় সহজ সম্মান ও দরদের পরিচয় নয়। জ্যোতির্ম্ময়ের বৈঠকখানায় অল্প দামী কাঠের চেয়ারে বসিবার আগে প্রথম কথা বলিল এই : 'ইস, আপনার চোখ-মুখ যে বসে গেছে জ্যোতির্ম্ময়বাবু।'

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, 'আজ্ঞে না, ও কিছু নয়।'

অপরাজিতার খবর ? তার অবস্থা বিশেষ ভাল নয়, শেষ পর্য্যন্ত কি হইবে বলা যায় না, সে হাসপাতালেই আছে এবং সম্ভবতঃ কিছুদিন থাকিতে হইবে।

'আপনি কিছুদিন ছুটি নিন্ জ্যোতির্ম্ময়বাবু।'

ছুটি সম্পর্কে জ্যোতির্ম্ময়ের বিশেষ আগ্রহ দেখা গেল না। এসব বিষয়ে সত্যপ্রিয়ের ব্যবস্থা বড় জটিল। ছুটি চাহিলেই দেয়, সময় সময় দরকার মনে করিলে, যেমন আজ জ্যোতির্ম্ময়ের বেলা মনে করিয়াছে, না চাহিলেও নিজে হইতে যাচিয়া ছুটি দিতে চায়। কিন্তু ছুটি যে নেয় শেষ পর্য্যন্ত তার হয় বিপদ। কাজ আর কাজের দায়িত্ব সত্যপ্রিয় ভাগ করিয়া দিয়াছে, যার যা করার কথা তাকে তা করিতেই হইবে, কাজ না করার পক্ষে কোন যুক্তি নাই, কোন কৈফিয়ৎ নাই। সে নিজে হইতে ছুটি নিতে বলিয়াছিল, ছুটিতে থাকার সময় মানুষ কাজ করিতে পারে না, এ যুক্তিটা খুব জোরালো সন্দেহ নাই, কিন্তু জোরালো যুক্তিটা শুনাইবার সুযোগ তো সত্যপ্রিয় কোনমতেই সৃষ্টি করিবে না! কাজ কেন হয় নাই সে কৈফিয়ৎ আজ পর্য্যন্ত সত্যপ্রিয় কারও কাজে স্পষ্ট ভাষায় দাবী করিয়াছে কি না সন্দেহ, কিন্তু রাগ যে সে করিয়াছে, এ ভাবে যে চলিবে না, কাজের ক্ষতির সঙ্গে যে চাকরীর ক্ষতির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক, এই সব কি কৌশলে যেন বরাবর ভাষার চেয়েও স্পষ্ট করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিয়া আসিয়াছে!

জ্যোতির্ম্ময় তাই আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, 'আজ্ঞে, আপনার নতুন প্রোগ্রামটা চালু করা হচ্ছে, এ সময়—'

সত্যপ্রিয় আবেগভরা কণ্ঠে বলিল, 'না, না, ওসব প্রোগ্রাম-ট্রোগ্রামের কথা নিয়ে আপনি আর এখন মাথা ঘামাবেন না জ্যোতির্ম্ময়বাবু।'

এ সব কথার অর্থও জ্যোতির্ম্ময় জানে। সত্যপ্রিয় সকলকেই এমনিভাবে দরদ জানায়, সকলের প্রতিই এমনি উদারতার পরিচয় দেয়। কিন্তু সত্য সত্যই যদি কোন মূর্খ এই দরদ আর উদারতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া বসে, দু'দিন পরে সে আর কোনদিকে কূল দেখিতে পায় না। এ বিষয়ে সত্যপ্রিয়ের একটা থিয়োরী আছে। কর্ম্মচারীদের সে এই সব কথা বলে, বন্ধু ও আত্মীয় হিসাবে, কর্ম্মচারী ও উপরওয়ালার সম্পর্কটা তো তাতে বাতিল হইয়া যায় না, মাসান্তে কর্ম্মচারী মাহিনা তো গ্রহণ করে, সুতরাং কাজ সম্পর্কে আত্মীয় বন্ধু হিসাবে সে যা বলে, কাজ সম্পর্কে সে কথাগুলি প্রয়োগ করা কি কর্ম্মচারীদের উচিত? তার মত অবস্থার আর একজন মানুষও কি আছে সামান্য মাহিনার কর্ম্মচারীর সঙ্গে যে এমন সহজভাবে মেলামেশা করে, বিপদে-আপদে সহানুভূতি জানায়, পরামর্শ দেয়? এই মেলামেশার

অনুগ্রহটুকু বাড়তি পাওনা মনে করিয়া তাদের কৃতার্থ থাকা উচিত। প্রথম প্রথম যারা বোকামি করিয়া এই সহজ কথাটা বুঝিতে পারে না, তাদের সে ক্ষমাও করে, ভবিষ্যতে সাবধান হইবার সুযোগও দেয়। কিন্তু যে পুরা টাকা মাহিনা দেয় সে প্রতিদানে পুরা কাজ চাহিবে, দরদ আর ভালবাসা দেখানোর জন্য মাহিনা দিয়া মানুষ লোক রাখে না,—এই সরল সত্যটা যার মাথায় কোন রকমেই ঢোকান যায় না, অগত্যাই সত্যপ্রিয় তাকে বিরাট ব্রহ্মাণ্ডে চরিয়া খাইবার জন্য মুক্তি দেয়।

অবশ্য, এই রকম দরদ ও সহানুভূতির সঙ্গে ব্যবহার করে বলিয়াই সকলে হাসি মুখে দশ ঘণ্টার যায়গায় পনের ঘণ্টা কাজ করে, তিনজনের কাজ একজনে করে। কিন্তু সত্যপ্রিয় তো করিতে বলে নাই ? যার যতক্ষণ ইচ্ছা কাজ করুক না, সত্যপ্রিয়ের কি আসিয়া যায়, তার কাজ হইলেই হইল।

জ্যোতির্ময় তাই আবার আমৃতা আমৃতা করিয়া বলিল, 'আজ্ঞে, ছুটির দরকার হলেই আপনাকে বলব। এখন তো হাসপাতালেই রইল, দু'বেলা গিয়ে শুধু দেখে আসা।'

'শ'খানেক টাকা বরঞ্চ আপনি রাখুন, চিকিৎসার জন্য যদি দরকার হয় ?'

এ আরেক বিপদ। যার যা প্রাপ্য তার বেশী একটি পয়সা কোনদিন কেউ সত্যপ্রিয়ের কাছে পায় নাই, কোনদিন পাইবেও না। সে যে দান করে হিসাব করিলে দেখা যায়, দানের রীতি, নীতি, প্রথা, নিয়ম, সামাজিক ও অন্যবিধ বাধ্য-বাধকতা প্রভৃতি হিসাবে সেটাও গ্রহীতার প্রাপ্য ছাড়া আর কিছুই নয়। কর্ম্মচারীদের হাতে টাকা গুঁজিয়া জোর করিয়া সাহায্য করিতেও দু'একবার সত্যপ্রিয়কে দেখা গিয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রে টাকা সত্যপ্রিয়ের ফিরিয়া আসে, কোথাও আসে কাজে, কোথাও আসে বাধ্যবাধকতার প্রয়োজনীয় সম্পর্কটা বজায় থাকাতে, কোথাও আসে প্রতিহিংসায়।

সত্যপ্রিয় চলিয়া গেলে জ্যোতির্ম্ময় স্নান করিতে গেল। খাইয়া আপিস যাইবে। যাওয়ার পথে হাসপাতালে খবর নিয়া যাইবে।

সুবর্ণ বলিল, 'আজকেও আপিস যাবে দাদা ?'

'একবার না গেলে চলবে কেন ? সকাল সকাল ফিরে আসব।'

'কি দরকার ? রাত্রিটাও আপিসে থেকো,—সুবর্ণের মুখ বিবর্ণ, চোখ ফুলিয়া

গিয়াছে। বলিতে বলিতে আবেগে বিবর্ণ মুখে রক্তের সঞ্চার হয়, মাথা ঝাঁকি দিয়া সে আবার বলে, 'বৌদি যেন মরে—মরে, মরে, মরে। ম'রে যেন তোমার হাত থেকে রেহাই পায়।'

সুধীরা চীৎকার করিয়া বলে, 'সুবর্ণ!'

আর জ্যোতির্ম্ময় করে কি, ঠাস্ করিয়া এক চড় বসাইয়া দেয় বিবাহযোগ্যা বোনের গালে, গায়ে যত জোর আছে, তত জোরের সঙ্গে। পাঁচটি আঙুল নয়, সুবর্ণের টুকটুকে গালে তিনটি আঙুলের ছাপ সঙ্গে সঙ্গে এমন স্পষ্টভাবে ফুটিয়া ওঠে যে, ভয় হয় কোনদিন বুঝি এ দাগ আর মুছিয়া যাইবে না।

আপিস যাওয়ার সময় জ্যোতির্ম্ময় একটু ঘুরিয়া যায়, যশোদার বাড়ীর গলিটার সামনে দিয়া যাইতে আজ কেমন সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল।

দুপুরবেলা সুবর্ণ সুধীরাকে বলিল, 'আর তো এ বাড়ীতে আমার থাকা হয় না দিদি।'

সুধীরা বলিল, 'চুপ কর। বকিসনে মেলা।'

সুবর্ণ তখন গেল যশোদার কাছে।

'আর তো আমার ও বাড়ীতে থাকা হয় না যশোদাদিদি।'

গালের দাগ দেখিয়া যশোদার বড় মায়া হইয়াছিল, কথা শুনিয়া মনটা বিগড়াইয়া গেল। 'মারবে না? সারারাত জেগে ভয়ে ভাবনায় পাগল হয়ে আছে মানুষটা, তাকে তুমি অমন করে বলতে গেলে কেন?'

কোথাও কি সহানুভূতি নাই? এমন কি কেউ নাই জগতে যে, যুক্তি-তর্ক বিচার-বিবেচনা বাদ দিয়া কোন্ অবস্থায় কে তাকে কি জন্য মারিয়াছে, সে কথা ভুলিয়া গিয়া, শুধু গালে চড় খাইয়া গালটা তার ফুলিয়া গিয়াছে বলিয়া ব্যাকুল হয়? জগতে দরদী নাই ভাবিয়া সুবর্ণের যখন কান্না আসিতেছে, দেখা হইল নন্দর সঙ্গে। সুবর্ণের গাল দেখিয়া নন্দ যে ঠিক ব্যাকুল হইল, তা বলা যায় না, বোধ হয় বিস্ময়েই অভিভূত হইয়া গেল। সুবর্ণের কাছে তাই যথেষ্ট। নন্দকেই তো সে খুঁজিতেছিল। আর কে আছে তার নন্দ ছাড়া?

'এসো তো আমার সঙ্গে।'

এখানে এই সরু গলির মধ্যে দাঁড়াইয়া কি কথা বলা যায়, যে নোংরা চারিদিক, যে দুর্গন্ধ চারিদিকে, দু'জন মানুষ পাশাপাশি চলিতে গেলে হয় গায়ে গায়ে ধাক্কা লাগে,

নয় দু'পাশের দেয়ালে গা ঠেকিয়া যায়। তা'ছাড়া যশোদার ভয় আছে, দেখিলেই দু'জনকে সে তফাৎ করিয়া দিবে। বেণী দুলাইয়া সুবর্ণ হন্ হন্ করিয়া চলিতে থাকে, পায়ের স্যাণ্ডেলে শব্দ হয় চট্ চট্। পাড়ার রাস্তায় এমনভাবে সুবর্ণের সঙ্গে চলিতে গিয়া নন্দর মুহূর্তে মুহূর্তে রোমাঞ্চ হয় আর মুহূর্তে মুহূর্তে হাত-পা যেন আড়ষ্ট হইয়া আসে। চেনা পথের দু'পাশে চেনা ঘরবাড়ী দোকানপাট সব যেন হাজার হাজার চেনা মানুষে ভরিয়া গিয়াছে, সকলে চাহিয়া দেখিতেছে সুবর্ণের চলন আর নন্দের অনুসরণ।

'একটু আস্তে হাঁট না?'

সুবর্ণ থমকিয়া দাঁড়ায়। ঠিক তিনু, বিশু আর বেন্দার কামারশালার সামনে। লোহার পাত গরম হইতেছে, তিনু প্রাণপণে হাপরের দড়ি টানিতেছে, বিশু হাতুড়ি উদ্যত করিয়া আছে, বেন্দা লোহার পাতটি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আগুনে গুঁজিয়া গুঁজিয়া ধরিতেছে। সেইখানে দাঁড়াইয়া সুবর্ণ জিজ্ঞাসা করে, নন্দ কি তবে সুবর্ণের সঙ্গে যাইতে চায় না? তবে না হয় থাক্ নন্দ, সুবর্ণ একাই যাইবে! যেদিকে দু'চোখ যায় চলিয়া যাইবে! নন্দ ভাবিয়াছিল, সুবর্ণ বুঝি ব্যাকুল হইয়া হাসপাতালে ছুটিয়া যাইতেছে তার বৌদিকে দেখিবার জন্য; কিন্তু হাসপাতালের পথ তো যেদিকে দু'চোখ যায় চলিয়া যাওয়ার পথ নয়। সুবর্ণের মুখে কড়া রোদ পড়িয়াছে, অভিমানের গাঢ় ছায়া স্পষ্ট করিয়া নন্দকে দেখানোর জন্যই সুবর্ণ যেন মুখ করিয়া দাঁড়াইয়াছে সূর্য্যের দিকে। রাধার অভিমানের জ্বালায় নন্দ নিজে কত জ্বলিয়াছে, তবু সুবর্ণের অভিমান সে চিনিতে পারে না। এতক্ষণ পরে হঠাৎ ব্যাকুল হইয়া সে বলে, 'তোমার অসুখ করেছে, সুবর্ণ?'

চেনা মানুষের কথা আর তো নন্দর মনে থাকে না, সেইখান হইতে গলা ফাটাইয়া অনেক দূরের একটা রিক্সাকে ডাকিয়া আনে। রিক্সায় উঠিয়া বসিয়াই সুবর্ণ অবশ্য নন্দর গায়ে গা এলাইয়া মূর্চ্ছা যায়। কিন্তু নন্দ রিক্সাওয়ালাকে বাড়ীর দিকে ফিরিয়া যাইতে বলা মাত্র সচেতন হইয়া বলে, 'না না, বাড়ী নয়, ট্রাম রাস্তার দিকে যেতে বলো।'

বাড়ী আর সুবর্ণ ফিরিবে না। নন্দ যদি ফিরিতে চায়, ফিরিয়া যাক। আর যদি সুবর্ণের সঙ্গে যায় নন্দ, অনেক দূরের কোন এক আজানা সহরে চলিয়া যায় সুবর্ণের সঙ্গে, আর নদীর ধারে ছোট একটি ঘর ভাড়া করিয়া দু'জনে বাস করে, আর নন্দ যদি সারাদিন কীর্ত্তন করে, আর নন্দর কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে সুবর্ণ যদি

রাঁধাবাড়া ঘরকন্নার কাজ করে—

নন্দর পকেটে আনা পাঁচেক পয়সা ছিল, তবে সুবর্ণের হাতে ছিল সোনার চুড়ি, কানে সোনার দুল। সহরের দিকে না গিয়া সহরকে পিছনে ফেলিয়া সহরতলী ডিঙ্গাইয়া নিরুদ্দেশ যাত্রা করিলে কি ঘটিত বলা কঠিন। এ দিকের সহরতলী হইতে সহরে যাওয়ার পথে যদি হাসপাতালটা না পড়িত এবং হাসপাতালে যদি অপরাজিতা না থাকিত, আর অপরাজিতার কাছে একবার শেষ বিদায় নেওয়ার সাধটা যদি সুবর্ণের না জাগিত, তাহা হইলেও কি ঘটিত বলা কঠিন। হয়ত কয়েকদিন পরে দু'জনে ফিরিয়া আসিত, হয়ত তাদের ফিরাইয়া আনা হইত এবং বিশ্রী একটা হাঙ্গামা আরম্ভ হইয়া যাইত। কিন্তু অপরাজিতার খবর লইতে গিয়া জানা গেল, ঘণ্টাখানেক আগে সেও নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়াছে, ফিরিয়া সে আর আসিবে না, ফিরাইয়া তাকে আনা যাইবে না। কেবল শরীরটাকে চিতায় তুলিয়া পুড়াইবার হাঙ্গামাটুকু করিতে হইবে।

সুতরাং নন্দ ও সুবর্ণের নিরুদ্দেশ যাত্রা আপনা হইতে বাতিল হইয়া গেল। জ্যোতির্ম্ময় আপিস যায় নাই, আপিস যাওয়ার পথে খবর নেওয়ার জন্য হাসপাতালে ঢুকিয়া হাসপাতালেই আটক হইয়া গিয়াছে। হাসপাতালের নূতন ও পুরাতন দালানের মাঝখানে চারিদিকে চওড়া কাঁকর বিছানো পথের জন্য প্রায় সবুজ দ্বীপের মত দেখিতে ছোট একটু গোলাকার ঘাসে ঢাকা জমি আছে। সবুজ রঙকরা গোটা তিনেক লোহার বেঞ্চিও সেখানে পাতা আছে, রোগীর খবর যারা জানিতে আসে, ইচ্ছা করিলে দরকার মত ওখানে ফাঁকায় বসিয়া বেশী বেশী বাতাস টানিয়া বুকের ধড়ফড়ানি শান্ত করিতে পারে। এখন রোদের বড় তেজ, জ্যোতির্ম্ময় একাই একটা বেঞ্চে চুপচাপ বসিয়াছিল। গায়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সুবর্ণ তাকে জড়াইয়া ধরিল। সুবর্ণ মরিতে বলিয়াছিল বলিয়াই কি অপরাজিতা মরিয়া গিয়াছে?

জ্যোতির্ম্ময় ধীরে ধীরে তাকে ছাড়াইয়া পাশে বসাইয়া দেয়। বলে, 'এ রকম করে না, ছিঃ! উতলা হতে নেই, মরতে বললে কি মানুষ মরে রে পাগলী? আর তুই তো শুধু মুখে বলেছিলি মনে মনে তো চাইছিলি তোর বৌদি বাঁচুক। কত মা পর্য্যন্ত কতবার রাগ করে ছেলেমেয়েকে মরতে বলে, মরতে বললেই যদি কেউ মরত—'

মনে হয়, জ্যোতির্ম্ময় যেন বক্তৃতা আরম্ভ করিয়াছে। হঠাৎ থামিয়া গিয়া

অনুতপ্তকণ্ঠে সে বলিল, 'ইস্, গালটা যে তোর ফুলে গিয়েছে সুবর্ণ! খুব লেগেছিল না? সেই শাড়ীটা তোকে কিনে দেব সুবর্ণ।'

কয়েকদিন আগে স্কুলে যাওয়ার জন্য নতুন ফ্যাশানের একটা শাড়ী চাহিয়া সুবর্ণ জ্যোতির্ম্ময়ের ধমক খাইয়াছিল, এদিকে খরচ চলে না, নিত্য নূতন ফ্যাশানের শাড়ী! সেদিন সুবর্ণ ভাবিয়াছিল যে, হুঁ, বৌদিকে তো খুব কিনে দিতে পার, আমায় দেবার বেলাই তোমার খরচ চলে না। গালে চড় মারার ক্ষতিপূরণস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময় সেই শাড়ীখানা কিনিয়া দিবে শুনিয়া হঠাৎ তার মনে পড়িয়া গেল, অপরাজিতার রাশি রাশি শাড়ী সমস্তই এবার সে পাইবে। মনে পড়ায় সুবর্ণ ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। অপরাজিতার শোকে নন্দর কাঁদিবার কথা নয়, মুখখানা ম্লান ও গম্ভীর করিয়া রাখিলেই যথেষ্ট হইত, সুবর্ণকে আকুল হইয়া কাঁদিতে দেখিয়া সেও চোখ মুছিতে লাগিল।

তখন দেখা গেল, জ্যোতির্ম্ময়ের চোখ দিয়াও জল পড়িতেছে। কান্না বোধ হয় ছোঁয়াচে।

ছয়

পাড়ায় চার-পাঁচটি নূতন বাড়ী তৈরী হইতেছে। সহরতলীর পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে কয়েক বছর আগে, দিন দিন পরিবর্ত্তন যেন দ্রুততর হইয়া উঠিতেছে। সহরের লোক সহর ছাড়িয়া সহরতলীতে বাস করিতে আসিতেছে। একি একটা নূতন ফ্যাশন? ভবানীপুর কালিঘাটের মত যেখানে ধনঞ্জয়ের মতে এককালে দিন-দুপুরে শিয়াল ডাকিত, এই সহরতলীকেও সহর ক্রমে ক্রমে গ্রাস করিয়া ফেলিবে? দশ-বার বছর আগে এ অঞ্চল কি ছিল, এখন কি দাঁড়াইয়াছে, ভাবিলেও যশোদা অবাক হইয়া যায়। কাছাকাছি যে প্রকাণ্ড একটা সহর আছে, তখন তাই-বা কে ভাবিতে পারিত? ছড়ানো বাড়ী-ঘর, মেটে পথ, ডোবা-পুকুর, বাঁশ-ঝাড় এসব কিছুরই অভাব তখন ছিল না। সত্যপ্রিয়ের বাগানবাড়ীটা ছিল প্রায় জঙ্গল, বাগানবাড়ীর দক্ষিণদিকে কয়েক ঘর গরীব মুসলমানের একটি বস্তি ছিল

বছর তিনেক আগে তারা যে কোথায় উঠিয়া চলিয়া গিয়াছে, আর জানা যায় না। বোধ হয়, সহরতলীর উত্তর দিকে যে নূতন মুসলমান পল্লীটি গড়িয়া উঠিয়াছে, সেইখানে গিয়া বসবাস আরম্ভ করিয়াছে। এ পাড়ায় আগেকার সেই ভাঙ্গা ঘরের বাসিন্দা শ্রমিক শ্রেণীর গরীব মুসলমানদের বদলে এলোমেলো ভাবে কয়েকটি পাকা বাড়ীতে কয়েক ঘর ভদ্র মুসলমান পরিবার আসিয়াছে, এরা সকলেই চাকুরীজীবী। পরিষ্কার বেশভূষা করিয়া পরিশ্রমের অভাবে বেঢপ শরীর লইয়া নটা-দশটার সময় প্রত্যেক দিন এদের ট্রামের উদ্দেশ্যে ব্যস্ত হইয়া ছুটিতে দেখিলে সেই অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর মুসলমান পরিবার কয়েকটির জন্য যশোদার কষ্ট হয়।

তবে সহরতলীর ধীরে ধীরে সহরে পরিণত হওয়ার বিরুদ্ধে যশোদার কোন নালিশ নাই,—যদি তার মনের মত সহরে পরিণত হয়। এ বিষয়ে বড় আশ্চর্য্য ও নিখুঁত কল্পনা আছে যশোদার, তার এই পাড়াকে কেন্দ্র করিয়া এই সহরতলীকে সে বড় সহরটির সঙ্গে সংলগ্ন একটি সুবিন্যস্ত, পরিচ্ছন্ন, সুশ্রী নগররূপে কল্পনা করিতে পারে। সে নগরে পল্লীর সবুজ রূপের বাহুল্য নাই, নগরবাসীর জীবন পল্লীবাসীর জীবনের মত সহজ-সরলও নয়। পল্লীর সঙ্গে যশোদার যথেষ্ট পরিচয় আছে, কিন্তু পল্লীর রূপ তার চোখে পড়ে না, ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গল, পচা জলের ডোবা-পুকুর, নোংরা পথঘাট, জীর্ণ ঘরবাড়ী ক্ষেত-খামারের মন-ভুলানো, চোখ-জুড়ানো শ্রী তার মানস-নয়নে পর্য্যন্ত অতি বিশ্রী ঠেকে এবং ঘষা পড়ার অভাবে পল্লীবাসীর বুদ্ধিটা একটু ভোঁতা বলিয়াই সহরবাসীর চেয়ে তাদের সরলতা কেন বেশী হইবে যশোদা বুঝতে পারে না, সঙ্কীর্ণ জগতে একঘেয়ে অনাড়ম্বর জীবন যাপন করে বলিয়া জীবনটাই বা তাদের সহরবাসীর চেয়ে সহজ হইবে কেন তাও যশোদা বুঝিতে পারে না,—পল্লীবাসীরাও তো কম গরীব নয়? যশোদার কল্পনার নগর তাই সহর-রূপী গ্রাম নয়, সহরই বটে। নগরের পথে ট্রাম চলে, পথের দু'পাশে পাঁচ সাততলা বাড়ী থাকে, দোকান থাকে, সিনেমা থাকে, পার্ক থাকে, গলি থাকে, হাজার হাজার মানুষ থাকে, অনেক কিছুই থাকে সহরের। কেবল সেই সঙ্গে সঙ্গে থাকে সামঞ্জস্য, বড় বাড়ীর আড়ালে ছোট বাড়ীর কাঁপর লাগে না, গলি ঘুঁজির গোলক ধাঁধা থাকে না, নাকেও লাগে, গায়েও ল্যাপটাইয়া যায় এমন ভাপসা দুর্গন্ধ কোন গলিতে কোন বাড়ীতে পাওয়া যায় না, আর—

আর, সত্যপ্রিয় অবশ্য মোটরে চড়িয়াই বেড়ায় যশোদার নগরে, কিন্তু

যশোদা যে কুলীমজুরদের সঙ্গে ঘর করে, তারা পেট ভরিয়া খাইতে পায়, পরিষ্কার জামা-কাপড় পরিতে পায়, দরকার মত স্ত্রী পায়, জীবনটা উপভোগ করার মত অবসর পায়,—আর? আর কি পায়? পেট ভরিয়া খাইতে পায়, পরিষ্কার জামাকাপড় পরিতে পায়, দরকার মত স্ত্রী পায়, জীবনটা উপভোগ করার মত অবসর পায়,—আর? মনে মনেও তার আদরের হতভাগাগুলোকে পাওয়াইয়া দেওয়ার ব্যাপারে যশোদা তেমন পটু নয়! কত কিছু কাম্য আছে মানুষের, কত কিছু পাইতে পারে মানুষ, কত কিছু পাইয়াছে মানুষ, কিন্তু এদের দেওয়ার সময় যশোদা যেন সে সমস্তের হদিস পায় না, এদের যেন ধন-মান স্বাস্থ্য সুখ তেজ শক্তি জ্ঞান বুদ্ধি রূপ যশ এ সমস্তের সত্যই দাবী থাকিতে নাই। কিন্তু এদের পেটের জ্বালা, রোগ শোক দুঃখ গ্লানি অভাব অভিযোগ মনোবিকার এ সমস্ত ম্যাজিকের মত দূর করিয়া দিবার ক্ষমতা যশোদার কল্পনার আশ্চর্য্য রকম আছে। এদের দুর্দ্দশা দেখিতে দেখিতে কল্পনা-বোধ হয় তার হইয়া গিয়াছে ভোঁতা, তাই অসম্ভব স্বপ্ন দেখিতে পারে না, ভিখারীকে রাজা হওয়ার আশীর্ব্বাদ করিতে যে কেউ তাকে বারণ করে নাই এটা ভুলিয়া গিয়া শুধু বলিতে পারে, আহা, খোঁড়া পা নিয়ে তুমি এত কষ্ট পাচ্ছ, তোমার কষ্ট কমুক, তোমার দুঃখ দূর হোক।

খোঁড়া ধনঞ্জয়ের কাঠের পা আসিয়াছে। পাড়ায় চাঁদা তুলিয়া আর নিজে কয়েকটা টাকা দিয়া যশোদাই তাকে কৃত্রিম পা'টি কিনিয়া দিয়াছে। যশোদার শত্রু আর ছেলেবেলার সখী কুমুদিনী চার আনা চাঁদা দিয়া বলিয়াছে, 'আর কেন ভাই, এবার মায়া কাটিয়ে বিদেয় দে। লোকে যে নিন্দে করছে ভাই?'

'কেন নিন্দে করছে? কিসের নিন্দে?'

'কচি খুকিটি কিনা, বোঝ না কেন নিন্দে করছে, কিসের নিন্দে!'

যশোদার ন্যাকামিতে ক্ষুব্ধ হইয়া মুখ নাড়া দিলেও কুমুদিনী বুঝাইয়া বলে। বলে যে, মানুষটা যতদিন দু'পায়ে খাড়া ছিল, চেহারা যেমন হোক দশজনের একজন হইয়া বাড়ীতে বাস করিত, লোকে হাসিতামাসা করিলেও তেমন কিছু বলিত না—হয়তো ভাবিতও না। কিন্তু এখন পা কাটা যাওয়ার পরেও যশোদা যদি তাকে ঘরে রাখিয়া পোষে, সকলকে অবহেলা করিয়া কেবল তাকে নিয়াই দিনরাত মাতিয়া থাকে, কাঠের পা কিনিয়া দিবার জন্য সকলের কাছে চাঁদা

পর্য্যন্ত আদায় করিতে সুরু করে—

যশোদা ফোঁস করিয়া ওঠে, 'কেন, সেবারে গগ্‌নার পা কাটা গেলে ঘরে রেখে পুষিনি তাকে ? কাঠের পা কিনে দিইনি চাঁদা তুলে ?'

কুমুদিনী বিজ্ঞের মত বলে, 'সে হল আলাদা কথা। তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আবার বলে, 'যাকগে ভাই যা খুসী করগে ভাই তুই, কলঙ্কে আর ডর কি তোর, বোঝার ওপর শাকের আঁটি বৈ ত নয়। ছেলেবেলা সই পাতিয়েছি, তাইতে বলা, নয় তো আমার কি এলো গেলো।'

সামনাসামনি এমনভাবে কথা কুমুদিনী সচরাচর বলে না। চার আনা চাঁদা দিতে হওয়ায় গায়ে এত জ্বালা ধরিয়াছে না কি তার ? কে জানে, হয় তো ধনঞ্জয় আর তাকে নিয়া সত্য সত্যই খুব একচোট আলোচনা, গবেষণা আর নিন্দা চলিতেছে।

তারপর যশোদার কানে আসে, এ কাজে সুধীরের উৎসাহই নাকি সকলের চেয়ে বেশী, সত্য মিথ্যা কত কথাই যে সে রটাইয়া বেড়াইতেছে! এখনও সুধীরের ক্ষোভ থাকিবার কোন কারণ যশোদা ভাবিয়া পায় না। কালোকে নিয়া সে বরং এমন মসগুল হইয়া পড়িয়াছে যে দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, অন্নের জন্য যশোদার হাত হইতে রেহাই পাওয়ার জন্য অদৃষ্টকে তার ধন্যবাদ দেওয়াই বেশী স্বাভাবিক। সুধীরের যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে,—গ্রীষ্মের তৃষ্ণাতুর পশুর একেবারে শ্রাবণের ধারা-জলে লুটোপুটি করার মত,—দেখিলে হাসিও পায় করুণাও হয়। ছায়ার মত যে যশোদার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে যশোদার চলাফেরা লক্ষ্য করিত, মুখ দেখিলে মনে হইত এই বুঝি সর্ব্বনাশ ঘটিল, বহুদিনের উপবাসী বাঘের মত এই বুঝি সে ঝাঁপাইয়া পড়ে হুঙ্কার দিয়া যশোদার ঘাড়ে—সেই সুধীর এখন যশোদার ধারে কাছে ভিড়িতে চায় না, কেবলি এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করে, সামনে পড়িতে এদিক ওদিক তাকায় আর কখনো কখনো বোকার মত একটু হাসে আরও বেশী বোকার মত জিজ্ঞাসা করে, কি খবর চাঁদের মা ? চালচলন বদলাইয়া গিয়াছে সুধীরের, মেজাজ নরম হইয়াছে, শুকনো বাকলের মত রুক্ষ কঠিন মুখের চামড়ার ভিতর হইতে একটা কোমল আস্তরণের হদিসও যেন পাওয়া যাইতেছে না ? একটি কালো সোণার কাঠির ছোঁয়াচে মানুষটার মধ্যে যেন পলকে পলকে পরিবর্ত্তনের

ভেল্‌কি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

'নিন্দে করে নাকি বেড়াচ্ছে তুমি আমার?'

সুধীর জবাব দিবার আগেই কালো তাড়াতাড়ি বলে, 'না দিদি না, মিথ্যে লাগিয়েছে তোমার কাছে মানুষে।'

যশোদা চোখ পাকাইয়া বলে, 'তুই চুপ কর ছুঁড়ি, তোকে বলিনি আমি। কেঁউ কেঁউ করতিস দু'দিন আগে কুকুর বাচ্চার মত, বড় মুখ ফুটেছে, না?'

সুধীর ক্ষুব্ধ হইয়া বলে, 'গাল দিও না চাঁদের মা।'

কতবার কত কারণে রাগ করিয়াছে যশোদা, এমন কালো মেঘের ছায়া কে কবে তার মুখে ঘনাইয়া আসিতে দেখিয়াছে?—'গাল দেব না?—গাল দিতে বারণ কর্‌লে? কথা কইলে যদি না সয়, যাও না চলে এখান থেকে? কে মাথার দিব্যি দিয়েছে থাকতে? পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে দিয়ে গট্‌ গট্‌ করে বেরিয়ে যাও দু'জনে।'

বলিয়া যশোদা নিজেই গট্‌ গট্‌ করিয়া বাহির হইয়া যায়, পরক্ষণে ফিরিয়া আসিয়া অপেক্ষাকৃত শান্ত কণ্ঠে বলে, 'আজ পর্য্যন্ত একটি পয়সা দিলে না, এম্‌নি করে তো দেনা শোধ হবে না সুধীর। আজকে ভাড়া চুকিয়ে দিও, ওমাসের আর পাঁচটি টাকা দিও দেনার জন্যে। আচ্ছা, পাঁচটা না পার, তিনটে টাকাই দিও।'

তারপর যশোদার রাগটা কমিবার সময় দিয়া রাত্রে কালোকে সুধীর তার কাছে কাঁদাকাটা করিতে পাঠাইয়া দেয়। সুধীর নয়, অনেকেই তার নিন্দা করিতেছে এ খবরটা আবিষ্কার করিয়া যশোদার রাগটা কমিয়া আসায় কালোকে সে বলিয়া দেয় যে, আচ্ছা যা, মাইনে পেলে দিতে বলিস।

এতদিন ধনঞ্জয়কে যশোদা ঘরে ভাত দিয়া আসিয়াছে, আজ বাহিরে আসিয়া সকলের সঙ্গে বসিয়া খাইবার ডাক পড়িল।

'উঠতে পারি না যে চাঁদের মা?'

'খুব পারবে। চেষ্টাই করে ছাখো পার কিনা।'

'বড় লাগে চাঁদের মা।'

'পেরথম পেরথম লাগবে না? তাই বলে শুয়ে বসে দিন কাটালে চলবে নাকি, অভ্যাস করতে হবে না চলা ফেরার?'

'উঠলে যে মাথা ঘোরায় চাঁদের মা ?'

'পেরথম পেরথম মাথা একটু ঘোরায়।'

আজ যশোদার প্রথম খেয়াল হয় ধনঞ্জয় সত্য সত্যই বড় বেশী আহ্লাদে হইয়া পড়িয়াছে, আদুরে ছেলের মত তার ঘেনঘেনানির অন্ত নাই। নিজের দুরদৃষ্টের কথা ছাড়া মুখে তার কথা শোনা যায় না, পা কাটা যাওয়ায় যন্ত্রণায় সে যত না কাতরাইয়াছিল এখন পায়ের ঘা শুকাইয়া আসিবার পর নিজের পোড়া কপালের নিন্দা করিয়া সে যেন তার চেয়ে বেশী কাতরায়। তার কথা বলার ভঙ্গিতে যেন ভিক্ষুকের সকরুণ আবেদন-নিবেদনের ধ্বনি শোনা যায়। এত যে আরামে যশোদা তাকে রাখিয়াছে, এত সেবা যত্ন করিতেছে প্রাণপাত করিয়া, কাছে বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার একঘেয়ে নালিশ শুনিয়াছে আর আশা ও ভরসার কথা শুনাইয়াছে, কিছুতেই ধনঞ্জয়ের তৃপ্তি হয় নাই, সহানুভূতির উগ্র পিপাসা কমে নাই। নিজের দুঃখের কথা বলিতে বলিতে সে অহোরাত্রি কাঁদিতে চায়, সেই সঙ্গে কাঁদাইতে চায় পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে। যশোদার কাছে তার যে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত এ কথাটিও সে যেন ধীরে ধীরে ভুলিয়া গিয়াছে, যশোদার কাছে এ সব যেন তার পাওনা ছিল। পা কটিয়া পঙ্গু হওয়ার জন্য তার এই দাবী জন্মিয়াছে।

ধনঞ্জয় মুখ ভার করিয়া পায়ে কাঠের পা'টি আঁটিতে যায়, যশোদা বলে, 'শুয়ে থেকে থেকে মাথাও কি খারাপ হয়ে গেছে তোমার ? এখান থেকে ওখানে গিয়ে খেতে বসবে, ওটা আঁটছ যে ?'

ধনঞ্জয় কাঁদ কাঁদ হইয়া বলে, 'আর পারি না চাঁদের মা, সত্যি বলছি আর পারি না আমি। আমি কেন মরলাম না চাঁদের মা ?'

'হয়েছে, এসো এবার।'—নির্ব্বিকারভাবে এই কথা বলিয়া যশোদা আরো বেশী নির্ব্বিকারভাবে চলিয়া যায়। আর প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না মানুষটাকে, এবার হইতে একটু শক্ত হইতে হইবে।

পরদিন সকালে কাশীবাবু আসিয়া হাজির।—'কেমন আজ চাঁদের মা ?'

রাস্তায় ঘষিয়া মুখের যেখানে যেখানে চামড়া তুলিয়া দিয়াছিল যশোদা, সেই যায়গাগুলি এখনও সাদাটে হইয়া আছে। মুখখানা কিন্তু হাসি হাসি।

পরমাত্মীয় যেন দেখা করিতে আসিয়াছে।

'বসুন। আপনি ভাল তো?'

অনেকক্ষণ বসিয়া কাশীবাবু আজে বাজে গল্প করে, শ্রমিকদের কথা বলে, মিল পরিচালনার কথা বলে,—সব অর্থহীন ভাসা ভাসা কথা। এ বাড়ীর বাসিন্দা তারই মিলের শ্রমিকেরা যশোদার বাড়ীতে রোয়াকে বসিয়া যশোদার সঙ্গে তাদের ম্যানেজারবাবুকে আলাপ করিতে দেখিয়া একটু অবাক হইয়া যায়,—ভাবে যে, এতদিনে বুঝি সত্য সত্যই তাদের দাবীগুলি সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা হইবে, কাশীবাবু ওই বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্যই আসিয়াছে। কাশীবাবু কিন্তু সে আলোচনার ধার দিয়াও যায় না, যশোদা নিজে কথাটা তুলিলে আশ্বাস দিয়া শুধু বলে যে, সত্যপ্রিয় নিজে খোঁজ খবর নিতেছেন, প্রায়ই মিলে আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া যান যথাসময়ে তিনিই সব ব্যবস্থা করিবেন।

ভাসা ভাসাভাবে একটা খবর যশোদার কানে আসিয়াছিল, সত্যপ্রিয় নাকি গবর্ণমেন্টের বড় একটা কণ্ট্রাক্ট পাইয়াছে অথবা শীঘ্রই পাইবে, মিল বড় করা হইবে, উৎপাদন দু'গুণ তিনগুণ বাড়াইয়া ফেলা হইবে। জিজ্ঞাসা করিতে কাশীবাবু একটু থতমত খাইয়া গেল।—'কই না, আমি তো কিছু জানি না? কত গুজব বাজারে রটে।'

একেবারে বিদায় নেওয়ার খানিকটা আগে যশোদার বাড়ীতে আসিবার আসল কারণটি কাশীবাবু ব্যক্ত করে। সত্যপ্রিয় তাকে পাঠাইয়া দিয়াছে—অনুতপ্ত ও লজ্জিত সত্যপ্রিয়। সত্যপ্রিয় মিলে একটি চাকরী খালি আছে, ভাল চাকরী, ষাট টাকা বেতন। নন্দকে এই চাকরীতে ভর্ত্তি করিয়া নেওয়ার জন্য কাশীবাবুর উপর হুকুম আসিয়াছে।

—'কি চোখেই যে চক্কোত্তিমশাই তোমায় দেখেছেন চাঁদের মা। কপাল তোমার ভালো।'

যশোদা উদাসভাবে বলিল, 'কি জানি কপাল ভাল কি মন্দ!'

সত্যপ্রিয়ের এ উদারতায় যশোদা একটুও মুগ্ধ হইয়া যায় না। মনটা বরং তার খারাপ হইয়াই যায়। ধীরে সুস্থে নন্দকে আগের চাকরীটির মত সাধারণ একটি চাকরী দিলে কোন কথা ছিল না, পঁচিশ টাকার বদলে না হয় বেতনটা এবার ত্রিশ টাকাই হইত। কিন্তু অনুগ্রহের এ-রকম বাড়াবাড়ী একটিমাত্র অর্থ

হয়—শ্রমিকদের দাবী মেটানো সম্বন্ধে সত্যপ্রিয় যে কথা দিয়াছিল, সেটা পালন করিবার ইচ্ছা তার নাই। তাই ভাইকে মোটা মাহিনার চাকরী দিয়া যশোদাকে সে বাঁধিয়া রাখিতে চায়। শ্রমিকদের সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি পালনের সময় পার হইয়া গেলেও যশোদা যাতে গোলমাল না করিয়া চুপ করিয়া থাকে। যশোদার কথায় শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট বন্ধ করিয়াছিল, যশোদা চুপ করিয়া থাকিলে তারাও চুপ করিয়া থাকিবে।

এখন সমস্যা হইল, নন্দকে সে চাকরী করিতে যাইতে দিবে কি না। দু'তিন মাসের বেশী চাকরী নন্দর থাকিবে না, ধর্ম্মঘটের উপক্রম হইলেই আবার তার চাকরীটি খসিয়া যাইবে এবং নন্দর চাকরীর খাতিরে ধর্ম্মঘট যশোদা বন্ধ রাখিবে না, স্থগিতও করিবে না, সত্যপ্রিয় যদি কথা না রাখে এবার ধর্ম্মঘট ঘটাইয়া যশোদা এস্‌পার ওস্‌পার একটা কিছু করিয়া তবে ক্ষান্ত হইবে। কিন্তু সত্য সত্যই কি সত্যপ্রিয় মতলব আঁটিয়াছে যশোদাকে হাত করিয়া শ্রমিকদের একেবারে ফাঁকি দিবে? নন্দকে চাকরী করিতে না পাঠাইয়া সত্যপ্রিয়কে চটাইয়া দেওয়া কি সঙ্গত হইবে?

রাত্রে নন্দকে সে জিজ্ঞাসা করে, 'চাকরী করবি নন্দ? নাই বা করলি!'

নন্দ জোর দিয়া বলে, 'না, চাকরী করব। চাকরী ছাড়া আমার চলবে না।'

'কেন চলবে না? দু'তিন মাস পরে আবার তো খেদিয়ে দেবে তোকে—কি এমন রাজা হবি তুই দু'তিন মাস চাকরী করে!'

নন্দ আবার জোর দিয়া বলে, 'খেদিয়ে দেবে কেন? এবার আর খেদিয়ে দেবে না।'

শুনিয়া সন্দিগ্ধভাবে যশোদা জিজ্ঞাসা করে, 'কি করে জানলি তুই?'

'চক্কোত্তিমশাই নিজে বলেছে।'

শুনিয়া আরও বেশী সন্দিগ্ধ হইয়া যশোদা জিজ্ঞাসা করে, 'তুই বুঝি চাকরীর জন্যে চক্কোত্তিমশায়ের কাছে গেছিলি নন্দ?'

নন্দ সাড়া দেয় না। রাগে দুঃখে অভিমানে যশোদাও অনেকক্ষণ গুম্ খাইয়া থাকে। অন্ধকার ঘরের দুই প্রান্তের দু'টি চৌকীতে ভাই-বোনের অস্বাভাবিক নীরবতা অন্ধকারকে যেন কুৎসিৎ করিয়া দেয়, সরু গলিটার মধ্যেই কেবল যে ভাপ্‌সা গন্ধ চিরস্থায়ী হইয়া আছে, ঘরের মধ্যেও হঠাৎ যেন সেই

গন্ধের হদিস্ মেলে—অন্ততঃ তাই মনে হয় যশোদার।

'আমায় একবার বল্‌তেও পারলি না নন্দ? তুই কি কচি খোকা যে, তোকে আমি আটকে রাখতাম?'

'চাকরী ছাড়া আমার চলবে না দিদি।'

একটা রহস্যময় ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছে দু'জনের মধ্যে। যশোদা স্পষ্ট অনুভব করতে পারে, জিজ্ঞাসা করিয়া কিছু জানা যাইবে না, এতকাল পরে নন্দর জীবনে এমন একটা গোপন কিছুর আমদানী হইয়াছে নন্দর যা নিজস্ব ব্যক্তিগত সম্পদ, দিদিকে সে ভাগ দিতে পারিবে না। তাকে ডিঙাইয়া সত্যপ্রিয়ের কাছে চাকরী ভিক্ষা করিতে যাওয়া শুধু চাকরীর লোভে নয়—এতক্ষণে নন্দ তাহা হইলে কাঁদ কাঁদ হইয়া কথা বলিত, এমন তেজের সঙ্গে ঘোষণা করিতে পারিত না যে চাকরী ছাড়া তার চলিবে না, তাই সে চাকরী সংগ্রহ করিয়াছে, যশোদাকে জিজ্ঞাসা করাও দরকার মনে করে নাই।

তবু যশোদা জেরা করে। তবু সে জানিতে চায়, চাকরীর এত দরকার তার কেন হইল। নন্দ যে কৈফিয়ৎ দেয় তাতে যশোদা একেবারে স্তম্ভিত হইয়া যায়। তার ভাই নন্দ, তার নিজের হাতে মানুষ করা রুগ্ন আর ভাবপ্রবণ অপদার্থ নন্দ, সে কিনা আজ তাকে শোনায় যে, বসিয়া বসিয়া দিন কাটাইলে তো চলিবে না, জীবনে একটু উন্নতির চেষ্টা তো করিতে হইবে তাকে? বুড়া মানুষের মত এইসব কথা বলিয়া আসল কথাটা গোপন করিয়া রাখে তার কছে!

বিষাদের স্বাদ যশোদা প্রায় জানেই না, বিষাদ যদি কখনও ঘনাইয়া আসে তার বাহন হয় চাঁদের জন্য শোক। তাও খুব বেশী প্রশ্রয় পায় না যশোদার কাছে, পুত্রশোকে কাতর হওয়ার অবসরই বা তার কই? আজ চাঁদের কথা মনেও পড়ে না, তবু গাঢ় বিষাদে তার যেন ঝিম ধরিয়া যায়, ঘুমের বদলে দু'চোখ ভরিয়া আসে, চোখের পাতা খানিকক্ষণ খুলিয়া রাখা, আর খানিকক্ষণ বন্ধ করার উত্তেজিত অবসাদ। আর হ্যাঁ, আজ নিজেকে তার অসহায় মনে হয়, মনে হয় জীবনটা তার ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে,—এত কাল কেন বাঁচিয়াছিল যশোদা, ভবিষ্যতে কেন বাঁচিবে?

সকালে নিজেকে একটু অসুস্থ মনে হয়। তবে রাত্রির অনুভূতিগুলি রাত্রেই

বিদায় হইয়া গিয়াছে। বিষাদও নাই, নিজেকে অসহায় মনে করাও নাই, জীবনের ব্যর্থতা বা সার্থকতা নিয়া মাথা ঘামানোও নাই। নন্দকে চাকরী দেওয়ার ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝিয়া আসিবার জন্য সোজাসুজি সে গিয়া সত্যপ্রিয়র সঙ্গে দেখা করে।

সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করে, 'ষাট টাকা মাইনের চাকরী করবার যুগ্যি ছেলে তো আমার ভাই নই চক্কোত্তিমশায়, ওকে যে নিচ্ছেন, ও কি পারবে ?'

সত্যপ্রিয় মৃদু হাসিয়া বলে, 'তুমি একেবারে চম্‌কে গেছ দেখছি। ভাবছ, কি জানি কি মতলব আছে লোকটার, যেচে এমন একটা চাকরী দেয় কেন ভাইকে। ভাবছ তো ? মতলব একটা আছে বৈকি। মিলে নন্দর চাকরী নামমাত্র, আসলে ও চাকরী করবে আমার। বড় সুন্দর কীর্ত্তন করে তোমার ভাই, সেদিন শুনে সবাই প্রশংসা করেছে। মাঝে মাঝে আমার এখানে কীর্ত্তন করবে, এইজন্য ওকে চাকরী দিয়েছি। নিজের পকেট থেকে মাইনে গুণতে হত, তার বদলে মিল থেকে যাতে মাইনেটা পায় আর আমারও কীর্ত্তন শোনা হয়, সেই রকম একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছি।'

যশোদা আশ্চর্য্য হইয়া বলে, 'কিন্তু মিলও তো আপনার ?'

সত্যপ্রিয় তেমনিভাবে মৃদু মৃদু হাসে, 'মিল আমার বটে, কিন্তু মিলের টাকা আলাদা, আমার টাকা আলাদা! কপালের কথা বলো কেন, এতগুলি ব্যবসা আমার, কোন একটা ব্যবসা থেকে পাঁচটি টাকা নিজের জন্য চাইতে পারি না।'—যশোদার মুখ দেখিয়া আবার বলে, 'ওসব বড় গোলমেলে ব্যাপার বাছা, ওসব তুমি বুঝবে না। কোন ব্যবসার শেয়ার-হোল্ডার আছে, কোন ব্যবসার স্লিপিং পার্টনার আছে, কোন ব্যবসার আমি শুধু ম্যানেজিং এজেন্ট —তাছাড়া, আসল ব্যাপারটি কি জান, লাভ হলে লাভটি নেব, লোকসান হলে আমার গায়ে লাগবে না, এই হল ব্যবসার মূল কথা। কত প্যাঁচ কষতে হয়, কত নিয়ম করতে হয় তার ঠিকানা আছে! নিজে নিয়ম করে নিজে তো ভাঙতে পারি না ? আমিই সব, আমারি সব—তবু, আমি কেউ নই, আমার কিছুই নয়। বছর বছর ব্যাঙ্কের টাকা যে আমার কি করে হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে, নিজেই ভাল বুঝতে পারি না। এইখানে বোসো তুমি, একটা কাগজে সই করে দিচ্ছি, এক ঘণ্টার মধ্যে লাখ টাকা এসে হাজির হবে তোমার সামনে।'······

বলিতে বলিতে সত্যপ্রিয় রীতিমত উৎসাহিত হইয়া ওঠে, বোঝা যায় টাকার কথা বলিতে তার মজা লাগিতেছে। জীবনে একটি কাজ সে করিয়াছে জীবন দিয়া, এও একটা সাধনা বৈকি। কিন্তু এ সাধনার ফাঁকি যশোদা জানে, একটা সীমায় ঠেকিবার পর এ সাধনা একঘেয়ে হইয়া যায়, সেইখানে সাধনার সমাপ্তি, তারপর কেবল জের টানিয়া চলা। সত্যপ্রিয় এখন তাই করিতেছে। ব্যাঙ্কে টাকা জমানো আর খোলামকুচি জমানর মধ্যে আর বিশেষ কোন পার্থক্য এখন নাই। যত বড় পেটুক হোক, কত আর খাইতে পারে মানুষ ?—এই-ভাবে কথাটা যশোদা বিচার করে। বড়লোকের দান সম্বন্ধেও তার তাই বিশেষ শ্রদ্ধা নাই। কোটিপতিরা লাখ টাকার হাসপাতাল স্থাপন না করিলেই বরং সে একটু আশ্চর্য্য হয়, যেমন আশ্চর্য্য হয় ময়রার দোকানের পেটুক মালিক যদি অমাবস্যার নিশিপালন না করে।

যশোদাকে অভিভূত হইতে না দেখিয়া সত্যপ্রিয় একটু ক্ষুণ্ণ হয়। নন্দকে চাকরী দিবার কারণটা জানিয়া যশোদা অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী ফিরিয়া যায়।

পরদিন কাশীবাবু আবার আসে, আবার বসিয়া বসিয়া গল্প করে, যাওয়ার সময় নন্দকে একেবারে সঙ্গে নিয়া যায়। এবার নন্দ একেবারে চাকরীর দলিল নিয়া বাড়ী ফেরে, একমাসের নোটিশ না দিয়া কার ক্ষমতা আছে নন্দকে এবার বরখাস্ত করে ? করিলে, একটি মাসের বেতন মাগ্‌না দিতে হইবে, চালাকি নয় নন্দর সঙ্গে !

'কি করতে হবে তোকে ?'

কিছু না দিদি, কাশীবাবুর ঘরে একটা চেয়ারে বসে থাকব আর কাশীবাবু যা বলবেন করব। আজকে শুধু সঙ্গে করে মিলটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিলেন। কাল থেকে কাজ আরম্ভ।'

পরদিন নন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, সারাদিনে সে ঘন্টাখানেক খাতা লিখিয়াছে, দু'বার কাশীবাবুর হুকুমে মিলটা ঘুরিয়া আসিয়াছে, আর একবার গিয়া একটি লোককে কাশীবাবুর কাছে ডাকিয়া আনিয়াছে। বাপ-মা তুলিয়া গালাগালি দিয়া কাশীবাবু লোকটিকে দিয়াছে তাড়াইয়া।

যশোদা বলিল, 'এ আবার কেমন ধারা চাকরী রে বাবা !'

রাত্রে বিতাড়িত লোকটি যশোদার সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। তার নাম ভুবন, ধর্ম্মঘটে সে একজন পাণ্ডা ছিল। আসিয়াই সে বলিল, 'বেশ দিদি, বেশ! ভাইকে দিয়ে শেষকালে আমারি ঘাড় ভাঙলে?'

'কি বলছ তুমি ভুবন?'

'যেন জান না কিছু, ন্যাকা ঠাকরুণ! আমিও এর শোধ তুলব, সর্ব্বনাশ যদি না করি তোমার আমি—' গট গট করিয়া ভুবন চলিয়া গেল। যশোদা ভাল করিয়া কিছুই বুঝিতে পারিল না। ভাবিল, নন্দকে দিয়া কাশীবাবু ডাকাইয়া আনায় বলিয়া সে বুঝি রাগ করিয়াছে। ব্যাপারটা কিন্তু তার মনের মধ্যে খচ খচ করিতে লাগিল। নন্দকে দিয়া কাশীবাবু ডাকাইয়া আনে কেন ভুবনকে? ভুবনকে ডাকিবার লোকের কি তার অভাব ঘটিয়াছিল?

এদিকে সত্যপ্রিয় মিলে চাকরী যাওয়ার যেন মরসুম পড়িয়া গেল। একদিন যায়, দু'দিন যায় নন্দ আসিয়া খবর দেয়, সেদিনও সে ভুবনের মত একজনকে ডাকিয়া আনিয়াছিল, কাশীবাবু গালাগালি দিয়া তাকে ছাড়াইয়া দিয়াছেন।

'ব্যাপার কি মতি?'

মতি ভয়ে ভয়ে বলে, 'তাতো জানি না চাঁদের মা।'

সুধীরকে জিজ্ঞাসা করিতে সেও গম্ভীর মুখে বলিল, 'জানি না।'

যশোদা বলিল, 'তোমাদের কি হয়েছে বলত? আমাকে যেন সবাই কেমন এড়িয়ে এড়িয়ে চলছ ক'দিন থেকে?'

'তোমার এখন কর্ত্তাবাবু, কাশীবাবু, এনাদের সঙ্গে ভাব, আমরা কি তোমার সঙ্গে মিশতে সাহস পাই!'

যশোদা লম্বা করিয়া টানিয়া বলিল, 'ব—টে! বড় যে লম্বা-চওড়া কথা শিখেছ দেখছি!'

সুধীর রাগিয়া বলিল, 'যাও যাও, কি আর ক্ষেতি করবে তুমি, না হয় কাজ থেকে তাড়াবে। গতর থাকলে ঢের কাজ পাব।'

'কাজ থেকে তাড়াব মানে?'

মানে সুধীর বলিল না, গুম হইয়া বসিয়া রহিল। কালোর মুখখানাও অন্ধকার, একদিন যে কালো সুধীরকে তাড়াতাড়ি হাজত হইতে ফিরাইয়া আনার জন্য যশোদার বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়াছিল। একরকম যশোদাই তো সুধীরকে

সত্যসত্যই শেষ পর্য্যন্ত হাজত হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছিল।

যার চেষ্টায় এখনও হাজতে পচার বদলে পরদিনই সুধীর আসিয়া কালোর মুখে হাসি ফুটাইয়াছিল, আজ তার দিকে কেমন ভাবে চাহিয়া আছে হ্যাংলা মেয়েটা, যেন যশোদার মত শত্রু তার আর নাই। আপশোষ করিয়া কি হইবে, মেয়েমানুষ এমনি অকৃতজ্ঞই বটে।

কিন্তু কেবল কালো তো নয়? জগৎ আর মতিরই বা কি হইল?

দু'দিন পরে কাজ গেল জগতের, তার পরদিন মতির।

পায়ে পায়ে কাছে আসিয়া কালো বলিল, 'কাজ থেকে শেষ পর্য্যন্ত তাড়ালে দিদি? ধন্যি তুমি।'

'কি বলছিস তোরা কালো? ডাক তো জগতকে আর সুধীরকে।' কিন্তু তারা কেউ আসিল না।

পরদিন মতি বলিল, 'তুমিই কাজ খসালে, এবার থেকে তুমিই তবে খেতে দিও চাঁদের মা!'

যশোদা বলিল, 'এসো তো মতি আমার সঙ্গে।'

মতিকে সঙ্গে করিয়া সে গেল জগতের ঘরে। জগৎ রাগিয়া আগুন হইয়া আছে। কেবল রাগ নয়, কি অবজ্ঞা সেই সঙ্গে—কথাই বলিবে না যশোদার সঙ্গে! অনেক বলিয়া অনেক বুঝাইয়া ব্যাপারটা যশোদা বুঝিতে পারিল। খুবই সহজ একটা চাল দিয়া যশোদাকে সত্যপ্রিয় কুপোকাৎ করিয়াছে। প্রথমে রটিয়াছে এই যে যশোদা ভিড়িয়াছে উপরওয়ালাদের সঙ্গে, যশোদা বিশ্বাসঘাতিনী। প্রমাণ? আগে একবার ধর্ম্মঘট থামাইয়াছিল কে সকলের ক্ষতি করিয়া? গতবার ধর্ম্মঘট থামাইয়াছে কে সকলের ক্ষতি করিয়া? সত্যপ্রিয়র সঙ্গে, কাশীবাবুর সঙ্গে এত অন্তরঙ্গতা কিসের যশোদার, দু'বেলা সত্যপ্রিয়র মোটর চাপিয়া কেন সে সত্যপ্রিয়র বাড়ী নিমন্ত্রণ রাখিতে যায়? নন্দর মত একটা ছোঁড়া যে মিলে অমন চাকরী পাইল, এটা কিসের পুরস্কার? এক একটা ছুতা দিয়া একে একে ধর্ম্মঘটের সাত আটজন পাণ্ডাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইল এটা কার পরামর্শ?

'আমার পরামর্শ নাকি জগৎ, এঁ্যা? আমি পরামর্শ দিয়েছি তোমাদের তাড়াবার?'

'কাশীবাবু নিজে বলেছেন।'

শুনিয়া খানিকক্ষণ যশোদা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর বলিল, 'পেটে পেটে এই মতলব ছিল ব্যাটার, তাই তিন মাস ধর্ম্মঘট বন্ধ রাখতে বলেছিল! সবাইকে ডাক দিকি একবার জগৎ, পিলেটা চমকে দিই হাড়-হাবাতে সত্যপ্রিয় আর কাশীবাবুর।'

কিন্তু কেউ আসিল না। আর কে বিশ্বাস করিবে যশোদাকে? কিন্তু লাভ হইয়াছে যশোদাকে বিশ্বাস করিয়া? বরং লোকসান হইয়াছে পুরামাত্রায়। যশোদা যদি খারাপ মানুষ নাও হয়, ধরা যাক তার কোনই দোষ নাই, কি দরকার তাকে টানাটানি করিয়া? সাবধান থাকাই ভাল। শ্রমিক প্রতিষ্ঠান দু'টি হইতেও যশোদা সম্পর্কে সাবধান থাকিবার জন্য সকলকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যশোদা কে যে তার কথায় সকলে ধর্ম্মঘট করিবে আর ধর্ম্মঘট থামাইবে?

যশোদা নন্দকে বলিল, 'কাল থেকে কাজে যাস্ না নন্দ।'

শুনিয়া নন্দ মুষড়িয়া গেল। বড় আরামের চাকরী, ইতিমধ্যে সে পনের টাকা আগাম মাহিনা চাহিবামাত্র পাইয়া গিয়াছে!

দিশেহারা নন্দ পরামর্শ করিতে গেল সুবর্ণের সঙ্গে। সুবর্ণ আঁতকাইয়া উঠিয়া বলিল, 'না না, কখ্খনো চাকরী ছেড়ো না তুমি। আমাদের কি উপায় হবে?'

চাকরী না ছাড়িলেও যে তাদের কি উপায় হওয়া সম্ভব নন্দ ভাবিয়া পায় না। তবে সুবর্ণই একদিন এক মিনিটের নোটিশে তাকে বগলদাবা করিয়াও উধাও হইয়া যাইতে চাহিয়াছিল, সুবর্ণই আজ মত বদলাইয়া তাড়াতাড়ি জীবনে তার উন্নতি করাইয়া প্রচলিত প্রথায় তাকে বরণ করিতে চায়, সুতরাং নন্দর কিছু বলিবার থাকিলেও বলিবার উপায় নাই। বলিতে ইচ্ছাও হয় না। অন্য কথা অবশ্য বলিতে ইচ্ছা হয় অনেক, আসরে শত শত মানুষের মধ্যে একা নন্দ একাকিনী সুবর্ণকে যে সব কথা হাসিয়া কাঁদিয়া বলে তার চেয়েও মৌলিক, তার চেয়েও রোমাঞ্চকর রাশি রাশি কথা। মনে হয়, সুবর্ণেরও যেন ওই রকম অনেক কিছু বক্তব্য আছে। তাই, নন্দও একরকম কিছুই বলে না, সুবর্ণও বলে না—জীবনমরণের সমস্যা নিয়া পরামর্শটা পর্য্যন্ত তাদের এমন সংক্ষিপ্ত

হয় বলিবার নয়। শুনিলে অন্য লোকের মনে হওয়া আশ্চর্য্য নয় যে, কিশোর-কিশোরীর মাসিকপত্রে যে সব ধাঁধা থাকে দু'জনে বুঝি তারই উত্তর বাহির করিতেছে, একজন আরেক জনকে শুনাইতেছে এক একটি সঙ্কেত সূত্র।

সুবর্ণ হয়তো বলে, একশো যদি হ'ত—

নন্দ সায় দেয়। আচমকা তিনটি মোটে শব্দ সুবর্ণ উচ্চারণ করিয়াছে, কিন্তু দু'জনের কাছেই তার অর্থ পরিষ্কার। নন্দর যদি একশ' টাকা বেতন হইত আর নন্দ যদি জ্যোতির্ম্ময়ের মত একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া বাস করিত আর মেলামেশা করিত ভদ্রলোকের সঙ্গে অর্থাৎ সোজা কথায় নন্দ যদি জ্যোতির্ম্ময়ের স্তরে ঠেলিয়া তুলিতে পারিত নিজেকে, তবে আর তাদের কোন ভাবনা ছিল না।

একটুক্ষণ চোখে চোখে চাহিয়া থাকিয়া সুবর্ণ হয়তো আবার বলে, দাদার চাকরী গেলেও—

এবার নন্দও সায় দেয়। জ্যোতির্ম্ময়ের যদি চাকরী যায় এবং আর সে চাকরী না পায় এবং ভয়ানক গরীব হইয়া যশোদার বাড়ীর মতই একটা বাড়ীতে কায়-ক্লেশে দিন কাটাইতে বাধ্য হয় অর্থাৎ সোজা কথায়, জ্যোতির্ম্ময় যদি নন্দর স্তরে নামিয়া আসে, তাহা হইলেও তাদের কোন ভাবনা ছিল না।

আবার একটু চোখে চোখে চাহিয়া সুবর্ণ হয়তো আবার আরও নীচু গলায় ফিস্ ফিস্ করিয়া বলে, বৌদির কথা তুলে খুব খোঁচাচ্ছি, কিন্তু—

অপরাজিতার কথা তুলিয়া সুবর্ণ জ্যোতির্ম্ময়কে খুব খোঁচাইতেছে, সে যাতে চাকরী ছাড়িয়া দিয়া গরীব হইয়া যায়। কিন্তু অপরাজিতার স্মৃতির অস্ত্রেও সুবর্ণ তার মর্ম্মভেদ করিতে পারিতেছে না, সমস্ত খোঁচানো ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে।

দু'জনে প্রায় একসঙ্গে নিশ্বাস ফেলে। নিশ্বাস ফেলিয়া নন্দ হয়তো বলে, যদি না হয়?

সুবর্ণ হয়তো জবাব দেয়, তাহ'লে তাই করব।

অর্থাৎ কিছুতেই যদি কিছু না হয়, তাহা হইলে অগত্যাই দু'জনে তারা হাত ধরাধরি করিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া যাইবে। এমনিভাবে কথার অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ আর মুখের ভাব আর দৃষ্টি বিনিময় দিয়া অনায়াসে তারা পরস্পরের মনের কথা বুঝিতে পারে কি সৃষ্টিছাড়া মনের মিলটাই যে তাদের হইয়াছে!

এই রকম আদান-প্রদানের নামই বোধ ভালবাসার ভাষা, কে বলিবে!

যশোদার বারণ না মানিয়া নন্দ চাকরী করিতে যায় আর যশোদা সকলকে জিজ্ঞাসা করে, 'নন্দকে যদি আমি খেদিয়ে দিই, তবে তো তোমরা আমায় বিশ্বাস করবে?'

কিন্তু বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন এখন তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে, যশোদাকে তারা এড়াইয়া চলিতে চায়, যশোদার সঙ্গে মাখামাখি করিয়া বিপন্ন হইবে কে? বলাই নামে একজন শ্রমিক যেদিন বরখাস্ত হইয়াছিল, তার পরদিন সকালে উঠিয়াই ছেঁড়া কাপড়-জামা সতরঞ্চি, কম্বল গুটাইয়া বিদায় হইয়া গেল যশোদার বাড়ী হইতে, শোনা গেল তাকে আবার কাজে নেওয়া হইয়াছে। তারপর সাতদিনের মধ্যে যশোদার বাড়ী খালি হইয়া গেল। যশোদার পাওনা গণ্ডা মিটাইয়া দিয়াই গেল সকলে, কাশীবাবু সকলকে দরকার মত আগাম টাকা দিয়াছে। যশোদাকে টাকা না দিয়া যাইতে পারিলে অবশ্য সকলে তাহাই করিত, কিন্তু যশোদাকে ফাঁকি দেওয়া বড় কঠিন।

প্রথমে যশোদা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কি করছ তোমরা বুঝতে পারছ? সাধ করে ফাঁদে পা দিচ্ছ? যদ্দিন না মিলের দেনা শোধ হবে টুঁ শব্দটি করতে পারবে না তোমরা। যা বলবে যা করবে মুখটি বুজে মেনে নিতে হবে তোমাদের— বুঝতে পারছ?

বুঝিতে পারিতেছে সকলেই, কিন্তু উপায় কি?

কেবল সত্যপ্রিয় মিলের নয়, অন্য মিলের যারা যশোদার বাড়ীতে ছিল তারাও পলাইয়া গেল। উপর হইতে তাদের উপরেও চাপ পড়িয়াছে। এ বাড়ীতে রহিল কেবল মতি আর ধনঞ্জয়, ও বাড়ীতে সুধীর আর নদেরচাঁদ। সুধীরকেও চলিয়া যাওয়ার জন্য কালো ক্রমাগত খোঁচাইতেছিল, কিন্তু সে কাজ করে রেলের ইয়ার্ডে, যশোদার দেনা শোধ করিয়া যশোদাকে ত্যাগ করার জন্য কে তাকে আগাম টাকা দিবে? নদেরচাঁদের কাজ ছিল না, মিলে কাজ পাওয়ার সম্ভাবনাও তার নাই।

তিনটি উনানে যশোদার আঁচ পড়ে না। একটি উনান ধরানোর সময় তার মনে হয়, এতবড় উনান ধরাইয়া কি হইবে, মিছামিছি কয়লার অপচয়। ছোট একটি উনান তৈয়ারী করিতে হইবে। অন্য সময় প্রয়োজন হওয়া মাত্র ছোট উনান যশোদার

প্রস্তুত হইয়া যাইত, এ রকম সামান্য কাজ ফেলিয়া রাখা যশোদার স্বভাব নয়, কিন্তু এবার ছোট উনানটি যশোদার মনের মধ্যেই জ্বলিতে থাকিল। রান্নাঘরে বড় বড় উনান তিনটির কাছে কাদামাটি দিয়া গড়িয়া তুলিবার শক্তি বা উৎসাহ যেন তার নাই।

(প্রথম পর্ব্ব সমাপ্ত)

সহবতলী

(দ্বিতীয় পর্ব্ব)

এক

সহরতলীর রূপান্তর গ্রহণের প্রক্রিয়া দিন-দিন দ্রুততর হইয়া উঠে।

অদ্ভুত ব্যাপার কিছু নয়, তবু আশ্চর্য্য মনে হয়। মাটির বাসন যেন দেখিতে দেখিতে কৃত্রিম ধাতুতে দাঁড়াইয়া যাইতেছে আর চাকচিক্য বাড়িতেছে প্রতিদিন। কত এব্ড়ো-খেব্ড়ো রাস্তা নূতন পিচের আবরণে গা ঢাকিয়া ঝক্-ঝক্ করিতেছে, কত আঁকা বাঁকা সরু গলি চওড়া আর সিধা হইয়া যাইতেছে, কত অনামী পথের গায়ে আঁটা হইয়া যাইতেছে জম্‌কালো নাম।

চারিদিকে বাড়ী উঠিতেছে অসংখ্য। ফাঁকে ফাঁকে ছড়ানো সেকেলে ধরণের সাদাসিদে একতলা দোতলা অনেক বাড়ী অদৃশ্য হইয়া সেখানে দেখা দিতেছে আধুনিক ফ্যাসানের বাড়ী—শুধু গঠনের মধ্যেই কত কায়দা। এ অঞ্চলে ছোট বড় সব বাড়ীরই প্রায় আকার ছিল চারকোণা বাক্সের মত, এখন বাড়ীগুলি হইয়াছে ইঁট-কাঠ-চূণ-সুরকি-সিমেণ্ট-লোহার জ্যামিতি। অস্বাভাবিক রূপলাবণ্যের অপ্রত্যাশিত আঘাতে বাড়ীগুলি যেন দৃষ্টিকে পীড়া দেয়। শিল্পী ভাস্কর কি মিস্ত্রীর কাজ আরম্ভ করিয়াছে, তাই তাল সামলানো যাইতেছে না?

দোকানপাটের সংখ্যাও হু-হু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে, পুরানো দোকানের চেহারাও বদলাইয়া যাইতেছে। ছোট ছোট কত পুরানো দোকান যে উঠিয়া গেল!—ছোট অপরিচ্ছন্ন ঘরে এলোমেলোভাবে জিনিষ সাজাইয়া এতদিন যাদের কাছে মাল বিক্রী করা চলিত তাদের অনেকেই তো নাই, নূতন যারা আসিয়াছে তারা ছবির মত সাজানো দোকান চায়।

বড় রাস্তায় রাস্তার আলোর সংখ্যা আরো জোর বাড়িয়াছে বটে কিন্তু এখন দু'দিকের দোকানের আলোতেই রাস্তাটি এমন ঝলমল করে যে, রাস্তার আলো রাত বারোটা পর্য্যন্ত নিভাইয়া রাখিলেও চলে।

বাজারের সংস্কার হইয়াছে। এলোমেলোভাবে যেখানে সেখানে কেউ আর মাছ তরকারী বেচিতে বসে না, সন্ধ্যার পর বাজারের অর্দ্ধেকটা এখন আর

আবছা অন্ধকারে ঢাকিয়া যায় না। দু'বেলা ধোয়া-মোছার ব্যবস্থা করিয়াও অবশ্য বাজারের নোংরামি আর দুর্গন্ধ এখনও দূর করা যায় নাই, কোনদিন যাইবেও না, তবু কুলীর দেহ ভদ্রলোকের দেহে পরিণত হওয়ার মত, বাজারে পরিবর্ত্তন যে হইয়াছে, তাতে সন্দেহ নাই।

দলে দলে যেসব নর-নারী আসিয়া এ অঞ্চলের নূতন ধরণের বাড়ীগুলিতে নীড় বাঁধিতেছে, সহরতলী পরিবর্ত্তিত আবেষ্টনীর সঙ্গে তাদের চাল-চলন বেশভূষা বেশ খাপ খায়। অনেকে বাস করিতে আসিয়াছে নিজের বাড়ীতে, অনেকে আসিয়াছে ভাড়াটে হইয়া। জমির দাম এত বাড়িয়া গিয়াছে যে বড়লোক ছাড়া বাড়ী করিয়া এ-অঞ্চলে বাস করা আর সম্ভব নয়। প্রথমদিকে যারা জমি কিনিয়া বাড়ী করিয়াছিল। অথবা তৈরী বাড়ী কিনিয়াছিল, তারা প্রায় অধিকাংশই না-বড়লোক ধরণের ধনী, বাড়ী করিতেই হয়ত অনেকের জীবনের সঞ্চয় ফুরাইয়া গিয়াছে। তবু এরাই প্রথমে এই সহরতলীকে ফ্যাশনেব্‌ল সহরে রূপ দিয়াছে, এ অঞ্চলে বাস করার মর্য্যাদা ও সুবিধা বাড়াইয়াছে, আকর্ষণ সৃষ্টি করিয়াছে। তারপর আসিয়াছে বড় বড় চাকুরে, ব্যবসায়ী, জমিদার—দশগুণ কম দামে পাঁচ কাঠা জমি কিনিতে একদিন যাকে চোখে অন্ধকার দেখিতে হইয়াছিল তার ছোট বাড়ীখানার পাশে উঠিয়াছে বাগান-ঘেরা প্রাসাদ।

অনেক বস্তির চিহ্নও লোপ পাইয়াছে, কেবল সেগুলি বড় রাস্তার অনেক তফাতে ভদ্র পাড়ার পিছনে পড়িয়াছে সেগুলি টিঁকিয়া আছে,—কোনটা সম্পূর্ণ, কোনটা আংশিক। যশোদার বাড়ীর তিনদিকে নতুন বাড়ী উঠিয়াছে, কেবল কুমুদিনীর বাড়ী যেদিকে সেদিকটা আগে যেমন ছিল তেমনি আছে। রূপান্তরের ঢেউ যশোদার দুটি মুখোমুখি বাড়ী পর্য্যন্ত আসিয়া ঠেকিয়া গিয়াছে।

যশোদা বাড়ী দু'টি বিক্রী করিলে সঙ্গে সঙ্গে এদিকের আট দশখানা বাড়ী পরিবর্ত্তনের স্রোতে ভাসিয়া যাইত। বিক্রী করিবার জন্য এসব বাড়ী আর ফাঁকা জমির মালিকেরা সকলেই উৎসুক হইয়া আছে, এ অঞ্চলে জমির দাম যে এত চড়িতে পারে পাঁচ সাত বছর আগে কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই। সব বেচিয়া দিয়া সহরে আরও তফাতে সস্তায় জমি কিনিয়া আবার তারা বাড়ী-ঘর তৈরী করিয়া নিবে, একটা মোটা টাকা হাতে থাকিয়া যাইবে।

এখন তাদের ভয় শুধু এই, হঠাৎ জমির দাম না কমিয়া যায়।

কিন্তু যশোদার জন্য কেউ তারা বাড়ী বিক্রী করিতে পারিতেছে না। যে কোম্পানী সমস্ত পাড়াটা চড়া দামে কিনিতে চায়, মাঝখানে যশোদার বাড়ী দু'টি বাদ পড়িলে তারা বেশী দাম দিবে না। সকলেই যদি বেচিতে রাজী হয়, এক কাঠা জমিও বাদ না পড়ে, তবেই যশোদার বাড়ীর এপাশের জমির দরটা তাদেরও দেওয়া চলিতে পারে—নয়তো অত দামে ছাড়া-ছাড়া জমি কিনিয়া কোম্পানীর কি লাভ হইবে ?

এইসব বাড়ীর মালিকেরা একত্র হইয়া অনেক পরামর্শ করিয়াছে, যশোদাকে বুঝাইয়াছে, অনুরোধ করিয়াছে, ভয়ও দেখাইয়াছে। কুমুদিনী যে তাকে কত খোঁচাইয়াছে বলিবার নয়। কুমুদিনীর বাড়ীটি ছোট, কিন্তু যায়গা অনেক। বাড়ীর পিছনে তার একটি ছোট-খাট বাগান আছে, পেয়ারা, লেবু, ডালিম গাছে বাগানটি ঠাসা। অনেকগুলি টাকা হাতে পাওয়ার সখটা কুমুদিনীর চিরদিনই বড় প্রবল। টাকা হাতে পাওয়ার সখটা অবশ্য কারও কম থাকে না, কিন্তু একসঙ্গে মোটা টাকা পাওয়ার জন্য কুমুদিনীর মনটাই বোধ হয় সকলের চেয়ে বেশী ছটফট করিতেছে।

তারপর মনের অশান্তি আর সকলের পীড়াপীড়িতে অস্থির হইয়া উঠিয়া বাড়ী বেচিতে যশোদা যদি বা রাজী হইয়াছিল, শেষমুহূর্ত্তে হঠাৎ আবার তার মন বদলাইয়া গেল।

সামান্য একটা উপলক্ষ্যে।

বাড়ী বেচিতে রাজী হওয়া মাত্র যশোদা বলিল, 'তবে আর এবাড়ীতে আমি একটা দিনও থাকবো না। আমি চললাম।'

কুমুদিনী, রাজেন আর ধনঞ্জয় তিনজনেই ব্যাকুল হইয়া বলিল, 'চললে ? কোথায় চললে তুমি বলা নেই কওয়া নেই ?'

যশোদা হাসিল। যশোদার সেই শান্ত কৌতুকভরা হাসি দেখিয়া সকলে স্বস্তি বোধ করিল। না, রাগে দুঃখে বিরক্তিতে মাথা যশোদার বিগড়াইয়া যায় নাই।

—'দু'দিন একটু ঘুরে আসবো।'

রাজেন বলিল, 'কোথায় যাবে ?'

যশোদা বলিল, 'চুলোয়। কুঁড়ে পাও, গোয়াল পাও একটা ঠিক করে রেখো দিকি আমার জন্যে—পশু´ এসেই জিনিষপত্তর নিয়ে উঠে যাব।'

কুমুদিনী মুখ অন্ধকার করিয়া বলিল, 'হুঁ, জিনিষপত্তর! জিনিষপত্তর বেঁধেছেঁদে রাখতে হবে তো আমাকে ?'

'তোকে তো বলিনি সই!'

কারও কাছে মনের কথা ফাঁস না করিয়া যশোদা বাড়ী ছাড়িয়া সহরের এক সস্তা হোটেলে গিয়া উঠিল। কিছুদিন হইতে যশোদা ভাবিতেছিল, রীতিমত একটা হোটেল খুলিয়া নিজের চারিদিকে আবার কতকগুলি মানুষ জড়ো করিয়া অনাত্মীয় মানুষের সুখ দুঃখের সঙ্গে নিজেকে জড়াইয়া দিয়া দিন কাটাইবে। কিন্তু দু'টি দিন সেই আদর্শ ও পবিত্র হোটেলে কাটাইয়াই সে বুঝিতে পারিল, এই সব কলমপেষা কুলীরা কারো সঙ্গে সুখ দুঃখের উপভোগ ভাগাভাগি করে না, যেটুকু করে সেটুকু শুধু মৌখিক ভদ্র আলাপে চল্‌তি শব্দের আদান প্রদান। সহানুভূতি কাকে বলে কেউ জানে না, চায় না এবং পায়ও না।

ক্ষুণ্ণ-মনে যশোদা তাই ফিরিয়া আসিল। আসিয়া দেখিল, কুমুদিনী সত্যই তার সমস্ত জিনিষপত্র বাঁধিয়া ছাঁদিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। সহরের অন্য-প্রান্তে একটি বাড়ীও রাজেন ঠিক করিয়াছে, সকলে মিলিয়া এখন সেখানে গিয়া উঠিবে তারপর যা ব্যবস্থা হয় করা হইবে। যশোদা চলিয়া যাইবে আর তারা এখানে পড়িয়া থাকিবে, কুমুদিনীর তা সহ্য করা অসম্ভব। শক্র যদি চোখের আড়ালেই চলিয়া গেল, দিন তার কাটিবে কি করিয়া?

যশোদা রাজেনকে বলিল, 'তোমাদের যাবার তাড়াতাড়ি কিসের ?'

রাজেনের হইয়া কুমুদিনী জবাব দিল, 'তোমারি বা তাড়াতাড়িটা কি শুনি?'

যশোদা মুখ ভার করিয়া বলিল, 'আমার কথা আলাদা। একা মানুষ আমি, দু'দিন আগে যাই পরে যাই, কারো কিছু এসে যাবে না! তোমরা কেন মিছিমিছি দু'চার মাস আগে থেকে ঘর ছাড়া হবে ?'

কুমুদিনী মুচকিয়া একটু হাসিল।—'আমরাও তো একা মানুষ চাঁদের মা নাই? —দু'টি একা মানুষ।'

রাজেন ও কুমুদিনী চলিয়া গেলে বাড়ী ছাড়িয়া যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হইয়া

যশোদা বাড়ীর উনুনগুলি ভাঙ্গিয়া দিতে গেল।

যশোদার লাথিতে তার রান্নাঘরের প্রকাণ্ড উনুন তিনটি ভাঙ্গিয়া গেল। বাড়ী ছাড়িয়া যাওয়ার সময় নাকি উনুন ভাঙ্গিয়া দিয়া যাইতে হয়।

মেয়েলি শাস্ত্রের এসব বিধান যশোদা যে বিশেষ মানিয়া চলে তা নয়, তা ছাড়া লাথি দিয়া উনুন ভাঙ্গিতে হইবে এমন কোন নির্দ্দেশও এ শাস্ত্রে নাই। তবে, মন ভাঙ্গিয়া গেলে মানুষের পক্ষে উনুন ভাঙ্গিবার জন্য এরকম খাপছাড়া উপায় অবলম্বন করা আশ্চর্য্য নয়।

উনুন ভাঙ্গিল, একটি পা-ও জখম হইল যশোদার। লোহার একটা শিক ডান পায়ের পাতায় এফোঁড়-ওফোঁড় বিঁধিয়া গেল। মন-ভাঙ্গা আবেগে লাথিগুলি যশোদা একটু জোরে জোরেই মারিয়াছিল।

মেঝেতে বসিয়া নিজেই সে টান দিয়া শিক খুলিয়া ফেলিল। তখন আরম্ভ হইল রক্তপাত। কত রক্তই যে ছিল যশোদার প্রকাণ্ড শরীরটাতে, দেখিতে দেখিতে রক্তে মেঝে ভাসিয়া গেল।

বগল-লাঠিতে ভর দিয়া এক পায়ে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ধনঞ্জয় যশোদার কীর্ত্তি দেখিতেছিল, তার দিকে চাহিয়া যশোদা বলিল, 'দেখলে ?'

রক্ত দেখিয়া ধনঞ্জয় প্রথমটা থতমত খাইয়া যায়।

পা কাটা যাওয়ার পর কিছুদিন সে সামান্য কারণে উত্তেজিত হইয়া উঠিত, রাগারাগি চেঁচামেচি করিয়া বাড়ী সরগরম করিয়া তুলিত, কত যে ছেলেমানুষী আর পাগলামী তার আসিয়াছিল হিসাব হয় না। তারপর ধীরে ধীরে সে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। সব সময়েই প্রায় বিষণ্ণ ও অন্যমনস্ক হইয়া থাকে, অথচ কোন বিষয়ে সে গভীরভাবে চিন্তা করিতেছে তাও মনে হয় না। ডাকিলে চমকাইয়া ওঠে না, ডাক সম্বন্ধে ধীরে ধীরে সচেতন হইয়া ওঠে, সাড়া দিতে একটু সময় লাগে। মস্তিষ্কের ক্রিয়া যেন আজকাল তার একটু শ্লথ গতিতে সম্পন্ন হয়। কেমন একটু বোকা হাবার মত হইয়া পড়িয়াছে মানুষটা।

যশোদার পা জখম হইয়া দরদর করিয়া রক্ত পড়িতেছে এটা খেয়াল করিয়া উঠিতে তার সময় লাগে, কিন্তু তারপর চোখের পলকে ঝিমানো মানুষটা যেন সজীব হইয়া উঠে অতিমাত্রায়। বগলের লাঠি ফেলিয়া দিয়া ন্যাংচাইতে ন্যাংচাইতে কাছে আগাইয়া যায়, গায়ের নূতন আলোয়ানটি দিয়া রক্ত মুছিতে মুছিতে

ব্যাকুলভাবে বলে, 'ডাক্তার ডেকে আনি ?'

আলোয়ানটি কাড়িয়া নিয়া যশোদা বলে, 'ডাক্তার না হাতি ডাকবে। জল আনো এক ঘটি আর খানিকটা ন্যাকড়া।'

ধনঞ্জয় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়ে, একপায়ে দুয়ারের কাছে গিয়া বগললাঠি তুলিয়া নিতে গিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া যাওয়ার উপক্রম করে। যশোদা ডাকিয়া বলে, 'হুটোপুটি ক'রো না বাবু, ধীরে সুস্থে আনো।'

'রক্ত পড়ছে যে গো!'

'কই রক্ত পড়ছে? টিপে ধরে' আছি দেখছো না ?'

ধনঞ্জয় জল আর ন্যাকড়া আনিতে যায়, পায়ের পাতার ফুটা টিপিয়া ধরিয়া রাখিয়া যশোদা চাহিয়া থাকে উনানের ভগ্নস্তূপের দিকে। একদিন দু'বেলা এই উনুনে বিশ পঁচিশ জনের রান্না করিত যশোদা, কুলী মজুরের মোটা ভাত, যশোদা যাদের আপন করিতে গিয়াছিল। আজ তারা সকলেই তাকে ত্যাগ করিয়াছে, বাড়ীতে তার মানুষ নাই। পরের বাড়ীর একটা মেয়েকে চুরি করিয়া ভাইটা পর্য্যন্ত তার কোথায় উধাও হইয়া গিয়াছে।

এদিকে ধনঞ্জয় চেঁচামেচি আরম্ভ করে, 'ও চাঁদের মা, ন্যাকড়া যে পাচ্ছি না?'

'ছোট টিনের তোরঙ্গে ছেঁড়া কাপড় আছে একটা, সেইটে নিয়ে এসো।'

নির্দ্দেশ দিয়া যশোদা চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। টিনের তোরঙ্গটি যে চাবি বন্ধ আছে, ধনঞ্জয় খুলিতে পারিবে না, একথা তার মনে আছে। তবু সে আর সাড়াশব্দ দেয় না, পায়ের ক্ষত হইতে আঙ্গুলের ছিপি খুলিয়া রক্তপাতের পথটাও মুক্ত করিয়া দেয়। এ একটা সাময়িক মানসিক বিলাস ভাঙ্গা মনের। নিজেকে আঘাত করিতেও সময় বিশেষে মানুষের বড় ভাল লাগে, নিজের লাল রক্তের অপচয়ও ভাল লাগে।

কয়েকবার ডাকাডাকি করিয়া ধনঞ্জয়ও চুপ করিয়া যায়, খানিক পরে জলের ঘটি আর ছেঁড়া কাপড় হাতে করিয়া আসিয়া যশোদার কাণ্ড দেখিয়া আবার ব্যাকুল হইয়া পড়ে।

'টিপে ধর, টিপে ধর, শীগ্‌গির টিপে ধর।'

যশোদা করুণভাবে একটু হাসিয়া বলে, 'কি করে' খুললে বাস্‌কো ?'

'টেনে খুলেছি।'

'তার মানে বাস্‌কোর তালাটি ভেঙেছো আমার। ধন্য তুমি।'

পায়ে একটা লোহার শিক বিঁধিয়া যাওয়া বাধা হিসাবে গণ্য করিবার মত গুরুতর ব্যাপার কিছু নয়। বাড়ী ছাড়িয়া যাওয়ার আর সব ব্যবস্থাই যখন হইয়া গিয়াছে, বাড়ীটা বিক্রয় করিতে পর্য্যন্ত বাকী আছে, কেবল হাতে টাকাটা পাইয়া দলিল রেজেষ্ট্রী করা, ভারি ভারি জিনিষপত্র প্রায় সমস্তই পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে সহরের অপর প্রান্তের আরেক সহরতলীর ভাড়াটে বাড়ীতে, রওনা হওয়ার আয়োজন, শুধু বাকী আছে; গাড়ী ডাকিয়া বাকী জিনিষপত্র নিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসার, তখন পায়ে শিক বেঁধাকে উপলক্ষ করিয়া হঠাৎ বাঁকিয়া বসার কোন অর্থ হয় না। যে সব কারণে যশোদা এ বাড়ী ছাড়িয়া এদিকের সহরতলী ছাড়িয়া জন্মের মত চলিয়া যাইতেছিল, পা একটু জখম হওয়ায় তার একটিও বাতিল হইয়া যায় নাই। তবু শেষ মুহূর্ত্তে যশোদা ওই ছুতায় যাওয়াটাই বাতিল করিয়া দিল।

ধনঞ্জয় বলিল, 'এ পা নিয়ে যেতে তোমার কষ্ট হবে চাঁদের মা!'

যশোদা চুপ করিয়া রহিল। তার এই গাম্ভীর্য্য ধনঞ্জয়ের কাছে চিরদিন বড় অস্বস্তিকর। একটু ভয়ে ভয়ে সে বলিল, 'খুব ব্যথা করছে তো?'

যশোদা ফোঁস করিয়া উঠিল, 'কিসের ব্যথা? আমার আবার ব্যথা-বেদনা কিসের শুনি?'

ধনঞ্জয় আরও দমিয়া গেল।—'পায়ের কথা বলছি গো। তোমার ওই পায়ের কথা যাতে শিক বিঁধেছে। কম লেগেছে তোমার পায়ে!'

'না লাগেনি, একটুও লাগেনি। আমার আবার লাগালাগি কি? মুখপোড়া ভগবান আমায় লোহা দিয়ে গড়েছে জান না?'

ধনঞ্জয় বলিল, 'গাড়ী ডাকি তবে?'

যশোদা বলিল, 'থাক।'

'আজ যাবে না?'

'না।'

ধনঞ্জয় খুসী হইয়া বলিল, 'আমিও তো তাই বলছি। তাড়াহুড়োর কি আছে? পায়ের ব্যাথাটা কমুক, দু'দিন পরে গেলেও চলবে।'

বলিতে বলিতে ধনঞ্জয়ের মুখে ম্যাজিকের মেঘের মত বিষাদের ছায়া

ঘনাইয়া আসিল।—'তোমার পা দু'দিন পরে সেরে যাবে, আমার পা কিন্তু কোনদিন ঠিক হবে না চাঁদের মা।'

অনেকদিন যশোদা ধনঞ্জয়ের মুখে তার কাটা পায়ের জন্য নালিশ শোনে নাই, বিষাদের ছাপটা যদিও চোখে পড়িয়াছে সব সময়েই। হাঁটুর নীচেই ডান পা'টি ধনঞ্জয়ের শেষ হইয়া গিয়াছে, ঘা শুকাইয়া খানিকটা মসৃণ হইয়াছে, বাকীটা হইয়া আছে এবড়ো-খেবড়ো। দেখিলে যশোদার এখনো বেদনা আর বিতৃষ্ণা মেশানো একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়, কতকটা প্রিয়জনের মৃতদেহ দেখিয়া বিব্রত হওয়ার মত।

'আমারও ডান পা'টা জখম হয়েছে, দেখেছ ?'

এতক্ষণ খেয়াল হয় নাই, এবার খেয়াল করিয়া এই অত্যাশ্চর্য্য যোগা-যোগে ধনঞ্জয়ের বিস্ময়ের সীমা থাকে না।

'হয়তো আমার পা'টাও তোমার মত কেটে বাদ দিতে হবে।'

'না না, তা কি হয়, কি যে বল তুমি চাঁদের মা!'

'হতে পারে তো? পা'টা যদি পেকে ফুলে ওঠে, তারপর পচে গলে যায়, তারপর ডাক্তার করাত দিয়ে কেটে তোমার পায়ের মত করে' দেয় বেশ হয় তা হ'লে, না?'

কথা শুনিলে আর কথা বলিবার ভঙ্গি দেখিলে মনে হয় যশোদার মনে বুঝি ঘোরতর বিকার আসিয়াছে। পায়ের পাতায় তার যেভাবে আঘাত লাগিয়াছে তাতে পা'টি পাকিয়া ফুলিয়া উঠিতে অবশ্য পারে এবং শেষ পর্য্যন্ত কাটিয়া পায়ের খানিকটা বাদ দেওয়ার প্রয়োজন হওয়াও আশ্চর্য্য নয়, সামান্য আঁচড় লাগিয়াও সময় সময় ওরকম হয়। কিন্তু সেটা যে বেশ হয়, ধনঞ্জয়ের সঙ্গে তারও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের একটা সামঞ্জস্য ঘটিবে শুধু এই জন্যই, এরকম ছেলেমানুষী কথা যশোদার মুখে মানায় না। কথাটা সে বলে রীতিমত আবেগের সঙ্গে, যেটা তার পক্ষে আরও বেশী অস্বাভাবিক, সেইজন্য মনে হয় সে যেন তামাসা করিতেছে।

ধনঞ্জয় খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকে।

'আমার সঙ্গে তামাসা করছ চাঁদের মা?'

শুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে শান্ত ও গম্ভীর হইয়া যশোদা বলে, 'না, তামাসা

করিনি। মনটা ভাল নেই কিনা, তাই কি বলতে কি বলেছি। বাড়ী-ভরা লোক ছিল আমার, তুমি ছাড়া আজ কেউ নেই, কি অদেষ্ট বলত আমার ?

চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়ে যশোদার, আর বিহ্বলের মত তাই দেখিতে থাকে ধনঞ্জয়। যশোদার মুখ সে গম্ভীর হইতে দেখিয়াছে, সহানুভূতিতে কোমল হইতেও দেখিয়াছে, কিন্তু সে মুখে বিষণ্ণতা কি কোনদিন নজরে পড়িয়াছিল তার ? যশোদা যে কাঁদিতে পারে, আর দশজন সাধারণ স্ত্রীলোকের মত দুঃখে জল আসিতে পারে তারও চোখে, কেবল ধনঞ্জয় নয়, যশোদাকে যারা চেনে তাদের প্রায় সকলের পক্ষেই এটা কল্পনা করাও কঠিন ছিল।

শূন্য বাড়ীতে শূন্য ঘরে খালি তক্তপোষের দুই প্রান্তে দু'জনে বসিয়া ছিল। তক্তপোষের বিছানাপত্র গুটাইয়া বাঁধিয়া ফেলা হইয়াছে। ঘরের জিনিষ-পত্র যশোদা পা জখম হওয়ার আগেই রোয়াকে টানিয়া নিয়া গিয়াছে। ধনঞ্জয় সরিয়া সরিয়া যশোদার গা ঘেঁষিয়া আসিয়া বসিল, কোঁচার খুঁট দিয়া যশোদার চোখ মুছাইয়া দিল। যশোদার চোখ দিয়া জল পড়া যেমন আশ্চর্য্য ব্যাপার, ধনঞ্জয়ের কাণ্ডটা তার চেয়ে কম নয়। অন্য সময় এত সাহস ধনঞ্জয়ের হইত না।

মানুষটাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দেওয়ার বদলে যশোদা তার হাত নামাইয়া ধরিয়া রাখিল, বলিল, 'হয়েছে। কচি খুকি না কি আমি, আদর করে' কান্না থামাচ্ছ ?'

ধনঞ্জয়ের জন্যই এবার যশোদার মন আরও খারাপ হইয়া যায়। বড় আত্মগ্লানি সে বোধ করে। নিজের উপর রাগ ধরিয়া যায়। ধনঞ্জয় ছেলে-মানুষ—বয়সে না হোক মনের দিক দিয়া সত্যই বড় ছেলেমানুষ। অতি তুচ্ছ একটু সাধারণ অন্তরঙ্গতাই যে মানুষটাকে খুসীতে গদগদ করিয়া দেয়, হাতে খেলনা পাওয়া শিশুর মত, অনেক বার সে তার প্রমাণ পাইয়াছে। কতবার সে ভাবিয়া রাখিয়াছে, লোকটার সঙ্গে কথায় ব্যবহারে একটু দূরত্ব বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে। কোনমতেই তো কথাটা সে মনে রাখিতে পারে না! সকলে তাকে ত্যাগ করিয়াছে শুধু ধনঞ্জয় ত্যাগ করে নাই, এই ভাবটাই শুধু মনে থাকিয়া যায়। তাকে ত্যাগ করার কারণ যে ধনঞ্জয়ের নাই, উপায়ও নাই, এটা যেন খেয়ালও থাকে না।

বেলা অনেক হইয়াছে, কিন্তু এখনো যশোদার উঠানে ভাল করিয়া রোদ আসে নাই। পূবে একটি নূতন তিনতলা বাড়ী উঠিয়াছে, যশোদার বাড়ীটি পড়িয়া গিয়াছে আড়ালে। নূতন রাস্তাটির সোহাগে চারিদিকের বাড়ী যেন মাথা তুলিতেছে বর্ষাকালের আগাছার মত। কতটুকু সময়ের মধ্যেই প্রকাণ্ড এক একটা বাড়ী যে সম্পূর্ণ হইতেছে! কোন কাজেই মানুষের যেন আজকাল আর সময় লাগে না—সহরের মানুষের। নূতন যুগের নূতন মন্ত্রে ম্যাজিকের মত কাজ হইয়া যায়।

ঘরের মধ্যে যশোদার শীত করিতেছিল আর তাকে পীড়ন করিতেছিল ঘরের রিক্ত নগ্নতা। মেঝেতে ছড়ানো পড়িয়া আছে জঞ্জাল, একটুকরা ছেঁড়া কাগজ যশোদা ঘরে জমিতে দিত না, যা কিছু অকেজো, যা কিছু পরিত্যজ্য সব যশোদা চিরদিন নির্ব্বিকার চিত্তে ফেলিয়া দিয়াছে,—যদি কাজে লাগে ভাবিয়া ঘরের জঞ্জাল সঞ্চয় করার মত ভীরু সে কোনদিন ছিল না। তবু, দুঃসাহসীর মনের গোপন ভীরুতার মত এত জঞ্জাল যে ঘরের মধ্যে কোথায় লুকাইয়া ছিল!

শূন্য দেয়ালে শুধু নানা রকম দাগ আর একটি পুরানো বাংলা দেয়াল-পঞ্জী,—জীবনবীমা কোম্পানীর বিজ্ঞাপন। দেয়াল-পঞ্জীর ছবিটিতে একজোড়া নারী ও পুরুষ ও তাদের গণ্ডাখানেক ছেলেমেয়ের দেহে স্বাস্থ্য আর মুখে আনন্দের হাসি যেন ধরিতেছে না। প্রথমে ছবিটা দেখিলেই যশোদার রাগ হইত, মনে হইত রেষারেষি করিয়া বিজ্ঞাপন দিয়া দিয়াই মানুষ আজকাল মিথ্যাকে ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া তুলিতেছে, সর্ব্বত্র ছড়াইয়া দিতেছে।

অনেক বিষয়ের মত এবিষয়েও যশোদার একটি নিজস্ব মতামত আছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা আর বিশ্লেষণ অবশ্য যশোদার মতামতের পিছনে নাই, পাণ্ডিত্যের ফেনা সঞ্চয় করিবার সুযোগও তার ঘটে নাই, মুখে ফেনা তুলিয়া জাবরও সে কাটে না, কাজে লাগায় শুধু নিজের উপলব্ধি ও সাধারণ বুদ্ধিকে। প্রচারের আশ্রয়ে মিথ্যা যে পুষ্ট হয় একথা বুঝিতে যশোদার গভীরভাবে ভাবিবার দরকার হয় নাই। তারপর ধীরে ধীরে চোখে সহিয়া আসিলে ছবিটির বিজ্ঞাপনের ছাপ যশোদার কাছে মুছিয়া গিয়াছে, জীবনবীমা কোম্পানীর দেয়াল-পঞ্জীর ছবি তার কাছে হইয়া দাঁড়াইয়াছে অজানা শিল্পীর আঁকা একটি অবাস্তব মধুর

কল্পনা।

'আগে ঘরদোর ভালো করে, সাফ করিয়ে তারপর জিনিষপত্র ঘরে ঢোকাব, কেমন ?'

ধনঞ্জয় সায় দিয়া বলিল, 'সেই ভাল। কাকে দিয়ে সাফ করাবে, তুমি তো পারবে না ?'

'কেন পারব না ? কি হয়েছে আমার ?'

'না না, তুমি আজ আর উঠো না চাঁদের মা। বিছানাটা এনে পেতে দি', শুয়ে থাকো।'

শুইয়া থাকার প্রস্তাবে যশোদা উঠিয়া দাঁড়াইল একপায়ে ভর দিয়া। একটু হাসিয়া বলিল, 'এখানে শীত করছে, রোদে বসি গে' চল বাইরে।'

উঠানের একপাশে একটু রোদ আসিয়াছিল, সেইখানে একটা ভাঙা তক্তায় বসিয়াই যশোদা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা, নন্দের তো জেল হবে ?'

এতবড় গুরুতর বিষয়ে মত জিজ্ঞাসা করায় খুসী হইয়া ধনঞ্জয় বলিল, 'মেয়েটির বাড়ীর লোক যদি গোলমাল করে—'

দিন চারেক আগে সুবর্ণ আর নন্দ উধাও হইয়া গিয়াছে, সুবর্ণের বাড়ীর লোকেরা কি করিয়াছে যশোদা কিছুই জানে না। জ্যোতির্ম্ময় একবার আসিয়া জিজ্ঞাসাও করে নাই, তার বোনটিকে সঙ্গে করিয়া যশোদার ভাই কোথায় গিয়াছে, এ খবরটা কি সে রাখে ? হয়তো জ্যোতির্ম্ময় পুলিশে খবর দিয়াছে, হয়তো চারিদিকে খোঁজ করাইতেছে, দু'জনের সন্ধান পাইলেই নন্দকে জেলে পাঠাইয়া ছাড়িবে। সুবর্ণের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিবে সেই জানে। হয়তো দূরে কোন আত্মীয়ের কাছে পাঠাইয়া দিবে, হয়তো কোন বোর্ডিং-এ রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইবে, হয়তো মেয়ের এই কীর্ত্তিকথা গোপন করিয়া চুপি চুপি কারও সঙ্গে বিবাহ দিবে—তারপর যা হবার হোক।

এসব কথাই যশোদা আজ ক'দিন ধরিয়া ভাবিতেছে। নিজেকে যে অনেকবার বলিয়াছে যে, নন্দ জেলে যাক, চুলোয় যাক, যমালয়ে যাক তার কিছু আসিয়া যায় না। ও নচ্ছারটার সঙ্গে আর তার কোন সম্পর্কই নাই। তবু মাঝে মাঝে যশোদার মনে প্রশ্ন জাগিয়াছে, একা নন্দই কি দোষী ? এই কেলেঙ্কারির জন্য সুবর্ণের কি কোন দোষ নাই ? সুবর্ণ ছেলেমানুষ কিন্তু অমন ভাবপ্রবণ,

ফাজিল আর পাকা মেয়েকে ভুলাইয়া চুপ করিয়া পালানোর সাহস কি নন্দের হওয়া সম্ভব? কাঁচপোকার আর্সোলাকে টানিয়া নিয়া যাওয়ার মত সুবর্ণই নন্দকে টানিয়া নিয়া গিয়াছে, দোষটা চাপিয়ে একা নন্দের ঘাড়ে।

ফিরিয়া আসিলে দু'জনের বিবাহ দিয়া দেওয়া যায় না? জ্যোতির্ময়ের কাছে গিয়া কথাটা আগে হইতে আলোচনা করিয়া আসিলে হয়তো সে ভাবিয়া চিন্তিয়া রাজী হইয়া যাইতেও পারে। এ বিবাহ অবশ্য সুখের হইবে না, কিন্তু এই কুৎসিত ব্যাপারের জের টানিয়া চলার চেয়ে সে সুখের অভাবও অনেক ভাল।

'কিন্তু বিয়ে কি হবে?'

ধনঞ্জয় চমকাইয়া উঠিল।—'বিয়ে? কার বিয়ে?'

ধনঞ্জয়ের সেই চমক দেখিয়া, চমকের মানে বুঝিয়া, যশোদার মনের মেঘ ফাঁক হইয়া কোথা হইতে যেন খানিকটা সোনালী রোদ আসিয়া পড়িল।

ধনঞ্জয়ের হাঁটুতে টোকা দিয়া একটু হাসিয়া সে বলিল, 'কেন, তোমার বিয়ে? আমার সঙ্গে?'

এবেলা যশোদা আর রান্নার ব্যবস্থা করিল না। একটু খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে গিয়া দু'জন লোক ডাকিয়া আনিয়া, নিজেও কোমরে আঁচল জড়াইয়া ঘর-দুয়ার ধোয়ামোছা আরম্ভ করিয়া দিল। বেলা তিনটার সময় দইচিঁড়ার ফলারে পেট ভরাইয়া মাটি ছানিয়া রান্নাঘরে তৈরী করিতে বসিল ছোটখাট একটি উনুন।

সব কাজে সাহায্য করিতে গিয়া ধনঞ্জয় সারাদিন আজ যশোদার বকুনি শুনিয়াছে, উনুন তৈরী করিতে দেখিয়া সে অবাক লইয়া বলিল, 'দু'চার দিনের জন্য আবার উনুন পাতছ কেন?'

ইঁটের উপর আড়াআড়িভাবে শিক বসাইতে বসাইতে যশোদা বলিল 'দু'চার দিন কে বললে? থাকতে হ'লে রেঁধেবেড়ে খেতে হবে তো? না, ফলার করবো রোজ?'

'ক'দিন থাকবে?'

'চিরদিন।'

'এখান থেকে যাবে না?'

'কেন যাব?'

'বাড়ী বেচবে না?'

'কেন বেচব ?'

'ওবাড়ীতে যে মালপত্র গেছে ?'

'আনিয়ে নেব। ওবেলা কেদারকে বললেই হবে। তিনটে গরুর গাড়ীতে মাল গেছে, একেবারে একটা লরীতে মাল ফেরৎ আসবে।'

ধনঞ্জয় ব্যাপারটা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। যশোদার খেয়ালের আদি-অন্ত পাওয়া ভার। বাড়ী ছাড়িয়া যাওয়া হইবে না শুনিয়া মুখখানা তার বিমর্ষ হইয়া যায়। নন্দ চলিয়া যাওয়ার পর এ বাড়ীতে কেবল সে আর যশোদা ক'দিন বাস করিতেছে। প্রথম রাত্রে নন্দ ফিরিবে কি ফিরিবে না একথা কারও জানা ছিল না, কোন কারণে ফিরিতে তার দেরী হইতেছে ভাবিয়া যে যার ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল, নিশ্চিন্ত মনে প্রতিদিনের মত ঘুমও আসিয়াছিল দু'জনের। পরদিন যশোদার সই আর শত্রু কুমুদিনী আসিয়া বলিয়াছিল, 'আমি থাকব ভাই তোর কাছে রাত্রে ?'

যশোদার বাড়ী হয় নাই। ধনঞ্জয়ের সঙ্গে একা একবাড়ীতে রাত কাটানোর ভয়াবহ পরিণামের কথা বারবার মনে পড়াইয়া দিয়া কুমুদিনী যশোদাকে কাবু করিতে চাহিয়াছিল, যশোদা হাসিমুখে বলিয়াছিল, 'আমার সুনাম দুর্নামে কার কি আসবে যাবে বল্, কে আছে আমার ? দুর্নাম হতে বাকীই বা কি আছে বল্ ? আমার ভাই মন্দ, আমিই বা মন্দ নই কিসে ?'

শেষ পর্য্যন্ত রাগ করিয়া গালাগালি আর অভিশাপ দিতে দিতে কুমুদিনী চলিয়া গিয়াছিল।

অনেক ভাবিয়া উদ্‌ভ্রান্তের মত কল্পনারাজ্যে অনেকক্ষণ বিচরণ করিয়া সেদিন সন্ধ্যার পর ধনঞ্জয় ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'আমি তোমার ঘরে শোব যশোদা ? তোমার হয় তো ভয় করবে ?'

'ভয় করবে ?'—যশোদা অবাক হইয়া গিয়াছিল, 'আমায় ভয় করবে একা এক ঘরে শুতে! গোটা বাড়ীটাতেই আমি যে আজ একা থাকবো গো ?'

ধনঞ্জয় আর কথা বলিতে পারে নাই। যশোদাকে বুঝা যায় না, যশোদার খেয়ালের অন্ত পাওয়া যায় না।

যশোদা আবার বলিয়াছিল, 'তুমি শোবে সই-এর বাড়ীতে, পূবের ঘরে।'

এই বাড়ীতে যশোদার সঙ্গে রাত্রি যাপনের মধ্যে ধনঞ্জয় হয়তো অনেক

কিছু রোমাঞ্চকর সম্ভাবনা আবিষ্কার করিতেছিল, কুমুদিনীর বাড়ীতে তাকে রাত্রে থাকিতে হইবে শুনিয়া সে মুষড়াইয়া গেল।

সন্ধ্যার পর রাজেন আসিল। লরীতে চাপাইয়া রাতারাতি মালপত্র ফিরাইয়া আনিবার অনুরোধে সে একটু হাসিল।

'রাত্তিরে হাঙ্গামা করবার দরকার কি চাঁদের-মা? আমি গিয়ে রাত্তিরটা থাকছি সেখানে, ভোর ভোর মালপত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ব?'

'কেন, সেখানে রাত কাটাবার তোমার দরকার? হরনাম সিংকে বলোগে' আমার নাম করে' গাড়ী আর লোকজন নিয়ে গিয়ে সেই সব ব্যবস্থা করে' দেবে, তুমি শুধু সঙ্গে থাকবে। সকালে ওর গাড়ী পাওয়া যাবে না।'

'কি বকশিস্ দেবে আমাকে?'

'রাত্তিরে আমায় পাহারা দিও।'

রাজেন হাসিমুখে চলিয়া গেল। চিরদিন হাসিমুখেই রাজেন তার কাজ করিয়া দেয়,—কুমুদিনীকে ফাঁকি দিয়া। যশোদার সঙ্গে রাজেন বেশী মেলামেশা করিবে কুমুদিনী এটা পছন্দ করে না, দু'জনকে কথা বলিতে দেখিলে সে রাগিয়া আগুন হইয়া যায়, দু'তিন দিনের জন্য যশোদাকে একেবারে ত্যাগ করে। তারপর নিজেই আবার ভাব করিতে আসে। তীক্ষ্ণ কথা আদান-প্রদানের ভাব। দিনান্তে একবার যশোদার কাছে না আসিলে আর খানিকক্ষণ ঝগড়া করিয়া না গেলে কুমুদিনীর ভাল লাগে না, সারারাত মেজাজ তার এমন গরম হইয়া থাকে যে রাজেনের দুর্ভোগের সীমা থাকে না।

রাজেন বাহির হইয়া যাওয়া মাত্র ধনঞ্জয় ফোঁস করিয়া উঠিল, 'ওকে থাকৃতে বললে যে তোমার কাছে?'

লণ্ঠনের আলোয় ধনঞ্জয়ের মুখ দেখিয়া যশোদা রাগ করার বদলে শান্তভাবেই বলিল, 'মাথা খারাপ না কি তোমার? তামাসা বোঝ না?'

ধনঞ্জয় অবুঝ শিশুর মত আব্দার করিয়া বলিল, 'ওরকম তামাসা আর কোরোনা, বুঝলে? বড় খারাপ লাগে শুনলে।'

যশোদা কথা বলিল না। ধনঞ্জয়ের কথা শুনিয়া তারও খারাপ লাগিতেছিল।

দুই

যশোদা বাড়ী বেচিবে না শুনিয়া সবচেয়ে বেশী গোলমাল করিল কুমুদিনী।

একা একা বাড়ীতে থাকার জন্য বটে, বাড়ী বিক্রী করিতে অস্বীকার করার জন্যও বটে। প্রথম কারণটা নিয়া সকালবেলা ঘণ্টা দুই ঝগড়া করিয়া ফুঁসিতে ফুঁসিতে বেচারী সবে বাড়ী গিয়া রান্না চাপাইয়াছে, অন্য ব্যাপারটা কানে আসিল। হাঁড়ি নামাইয়া আবার সে ছুটিয়া গেল যশোদার কাছে।

'এটা কি শুন্‌ছি চাঁদের-মা সই? বাড়ী নাকি তুই বেচবি না?'

যশোদা উনানে হাঁড়ি চাপাইতেছিল, সংক্ষেপে জানাইল, 'উঁ হুঁ।'

'কেন শুনি? তোর একার জন্য সবাই মরব আমরা? আমরা তোর কি করেছি, নিজের ক্ষতি ক'রেও আমাদের সব্বোনাশ করবি? তুই কি পাগল নাকি চাঁদের-মা সই, মাথা কি তোর খারাপ?'

'মাথা নয়। কপাল খারাপ।'

আরও চটিয়া কত কথাই যে কুমুদিনী বলিয়া যায়। যশোদা বেশীর ভাগ সময় চুপচাপ শুনিয়া যায়, মাঝে মাঝে দু'একটা মন্তব্য করে। এইমাত্র ঝাড়া দু'ঘণ্টা ঝগড়া করিয়া গিয়া কুমুদিনী বোধ হয় একটু শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, প্রথমদিকে কথাগুলি তার তেমন ঝাঁঝালো হয় না। তারপর ক্রমে ক্রমে মেজাজ চড়িতে থাকায় সে যশোদার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করিতে আরম্ভ করে। মনে হয়, এতকাল শুধু যশোদার দোষের অফুরন্ত তালিকা মুখস্থ করিয়া সে দিন কাটাইয়াছে, যশোদার মত খারাপ মেয়েমানুষ যে জগতে আর দু'টি নাই এ কথাটা প্রমাণ না করিয়া সে ছাড়িবে না।

শেষে যশোদা বলে, 'এদিকে তুই তো আলাপ করছিস আমার সঙ্গে, আরেকজন যে না খেয়ে কাজে গেল?'

'যাক্। আরেকজনের জন্য তোর অত দরদ কেন শুনি?'

'পীরিতের মানুষটার জন্য দরদ হবে না?'

কুমুদিনী মুখ বাঁকাইয়া বলে, 'তা তামাসা আর করছো কেন? পীরিত যে তোমাদের ঢের দিন থেকে চলছে, তা কি আর জানিনে আমি।

যশোদা হাসিয়া বলে, 'কত গণ্ডা লোকের সঙ্গে যে তুই আমার পীরিত

ঘটিয়ে দিলি ভাই! কিন্তু আমার এমনি পোড়াকপাল—'

কুমুদিনী ফোঁস করিয়া একটা অতি কুৎসিত মন্তব্য করিয়া নিজেই একটু থতমত খাইয়া যায়—কথাটা তার নিজের কানেই বীভৎস শোনায়। এতক্ষণ চটে নাই কিন্তু এবার যশোদা চটিয়া উঠিবে ভাবিয়া কুমুদিনীর একটু ভয়ও বুঝি হয়। চিরদিন সে যশোদাকে ভয় করিয়া আসিয়াছে। রাগ না করিয়া যতক্ষণ যশোদা আমল দেয় ততক্ষণই সে ঝগড়া করে, যশোদা রাগ করিলেই তার কান্না সুরু হইয়া যায়। তাড়াতাড়ি সামলাইয়া নিয়া নরম গলায় সে অন্য কথা জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা, কেন বাড়ী বেচবি না বলতে তো দোষ নেই ভাই চাঁদের-মা সই?'

কুমুদিনীর অকথ্য মন্তব্যে যশোদা রাগ করিয়াছে কিনা বোঝা যায় না, কেবল মুখখানা তার একটু গম্ভীর দেখায়। একটু ভাবিয়া সে বলে, 'না, বল্‌তে আর দোষ কি? সত্যপ্রিয় কিনে নিচ্ছে তো ঘর-বাড়ী—ওকে আমি বেচব না, লাখ টাকা দিলেও নয়।'

'সত্যপ্রিয়বাবু তো কিনছে না? একটা কোম্পানী থেকে কিনছে।'

'ওটা সত্যপ্রিয়ের কোম্পানী। লোকটা আমার ঘর ভেঙ্গেছে, আমার বদনাম রটিয়েছে, ওকে আমি বাড়ী-ঘর বেচব? সবাই কত ভালবাসত আমায়, এখন একজন আসে দেখিস্ আমার কাছে? কত করেছি ওদের জন্যে আমি, আজ ওরা আমায় বল্‌ছে সত্যপ্রিয়ের লোক, সত্যপ্রিয়ের টাকা খেয়ে ওদের বন্ধু সেজে ওদের সর্ব্বনাশ করেছি?

এভাবে কোন বিষয়ে নালিশ করা, অভিমানে এভাবে বিচলিত হওয়া যশোদার স্বভাব নয়। বন্ধুরূপী শত্রু বলিয়া কুলি-মজুরেরা ত্যাগ করিয়াছে বলিয়া মনটা কি যশোদার এত নরম হইয়া গিয়াছে?

কুমুদিনী একটু ভাবিয়া বলে, 'তা এক দিক দিয়ে তো ভালই হয়েছে ভাই চাঁদের-মা সই? কতকগুলো কুলি-মজুরদের পাল্লায় পড়ে যন্ত্রণা পাচ্ছিলে, বেঁচে গেছ। এখন অন্য ভাড়াটে রাখো বাড়ীতে,—না না, ভাড়াটে রাখবে কি ক'রে, বাড়ী তো তুমি বেচে দিচ্ছ।' বলিয়া কুমুদিনী একগাল হাসিল।

কিন্তু যশোদার জীবন সে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। যখন তখন যশোদার কাছে ছুটিয়া আসে, মত বদ্‌লানোর জন্য ঝগড়া করে, অভিশাপ দেয় আর

মিনতি করে, মাঝে মাঝে ধনঞ্জয়কে পর্য্যন্ত মধ্যস্থ মানে।

ধনঞ্জয় দ্বিধাভরে বলে, 'আমি তো বল্‌ছি প্রথম থেকে কিন্তু—'

যশোদা বলে, 'কি মুস্কিল, তোমরা বেচ না তোমাদের ঘর-বাড়ী।' 'আমার সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক কি? আমায় নিয়ে টানাটানি করছ কেন?'

যশোদার বাড়ী বেচার সঙ্গে তাদের স্বার্থের সম্পর্ক কোথায়, কেবল কুমুদিনী নয় পাড়ার সকলেই অনেকবার কথাটা তাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু যশোদা স্বীকার করে না। সে বলে, সব সত্যপ্রিয়ের চাল। সকলে চুপ করিয়া বসিয়া থাক, অন্য ক্রেতা আসুক, যশোদার বাড়ীশুদ্ধ কিনিতে পাইলে যে দর সত্যপ্রিয় দিবে বলিয়াছে তার চেয়ে বেশী দর দিয়া তখন কিনিয়া নিবে, যার খুসী বেচিবে যার খুসী বেচিবে না, সত্যপ্রিয় কথাটি বলিবে না।

'জমির দর চড়ছে দেখছ না দিন দিন? বেচিবার জন্য ব্যস্ত হচ্ছ কেন?'

রাজেনও যশোদার কথায় সায় দেয়—চিরদিন দিয়া আসিতেছে। তবে কুমুদিনীকে জানাইয়া নয়। কুমুদিনীর কাছে সে যশোদার কথার জোরালো প্রতিবাদই করে।

তারপর একদিন দেখা যায়, যশোদার কথাই ঠিক। পেন্‌সনভোগী এক ভদ্রলোক রাজেনের বাড়ীর পাশে উমেশ তরফদারের বাড়ীটা এবং ওই ভদ্রলোকেরই এক বন্ধু কানাই নন্দীর এগার কাঠা ফাঁকা জমিটুকু কিনিতে রাজী হইয়া গেল—যশোদা বাড়ী বেচিলে সত্যপ্রিয়ের কোম্পানী যে দর দিবে বলিয়াছিল সেই দরে। কিন্তু পেন্সনভোগী ভদ্রলোক ও তার বন্ধুর আর এখানে বাড়ী বা জমি কেনা হইল না। কোম্পানীর লোক আসিয়া সকলকে জানাইয়া দিল, যশোদা যে শত্রুতা করিয়া নিজের বাড়ীটা আটকাইয়া রাখিতেছে এটা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। একজনের সয়তানিতে সকলে মারা পড়িবে কোম্পানী তা সহ্য করিবে না। যে বেচিতে চায় তার বাড়ী আর জমিই কোম্পানী কিনিয়া নিবে। যে বেচিবে না তার সঙ্গে বুঝাপড়া হইবে পরে।

শুনিয়া যশোদা বলিল, 'বুঝাপড়া? আবার কি বুঝাপড়া করবে ওরা? বুঝাপড়ার দেখছি শেষ নাই ওদের!'

বিনাসর্ত্তে সকলের বাড়ী ও জমি সত্যপ্রিয়ই কিনিয়া নিল। বেচিল না কেবল কুমুদিনী।

এতকাল কয়েক হাজার কাঁচা টাকা হাতে পাওয়ার স্বপ্ন দেখিয়া, যশোদার সঙ্গে প্রতিদিন ঝগড়া করিয়া, শেষ মুহূর্ত্তে সে বাঁকিয়া বসিল। কৈফয়ৎ দিল এই : 'আরও দাম চড়ুক, তখন বেচব।'

তারপর কয়েকদিন কুমুদিনী আর যশোদার কাছে আসে না। রাজেনের কাছে খবর পাইয়া যশোদা নিজেই তাকে দেখিতে গেল। কুমুদিনীর সাত বছরের ছেলেটাকে এক হাতে ধরিয়া কাঁধে তুলিয়া বলিল, 'কি হ'ল ভাই কুমুদিনী সই, বাড়ী যে বেচলে না ?'

'তুই যে বেচলি না ? দাম চড়লে তুই যখন বেচবি, আমিও তখন বেচব।'

'তবে আর তুই বেচেছিস্।'

অনেকদিন পরে আজ যশোদার বড় আমোদ ও আনন্দ বোধ হয়। মানুষকে মানুষ ভালবাসে বৈকি। সকলে না হোক, নাটকীয় ভালবাসা না হোক, দু'চারজন সত্যই ভালবাসে। কুমুদিনীর অন্তহীন কটু কথায় তার যে একটু রাগ হয় না, কুমুদিনীকে সে ভালবাসে বলিয়াই তো ? তাকে ফেলিয়া একা একা কুমুদিনী যে বাড়ী-ঘর বেচিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে পারে না, কুমুদিনী তাকে ভালবাসে বলিয়াই তো ?

তার বেশী আর কি চাই মানুষের ?

কুমুদিনীর ঘরভরা ছেলেমেয়েদের কলরব শুনিতে শুনিতে যশোদার বিরাট দেহটি অবসন্ন হইয়া আসে। কারণটা বুঝিতে না পারিয়া সে একটু আশ্চর্য্য হইয়া যায়। সে তো জানে না মনের মধ্যে গভীর অশান্তির গুরুভার বহিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ মুক্তি পাইলে শুধু মন নয় শরীরটাও মানুষের আশ্চর্য্যরকম হাল্কা মনে হয়, শান্তি যেন আসে ঘুমের ছদ্মবেশে। ঘুমের মতই হয়তো অস্থায়ী, তবু এখন যশোদার মনে যে শান্তি আসিয়াছে তার তুলনা হয় না।

ইংরাজী নববর্ষ সুরু হয় শীতকালে। রাজেন পরামর্শ দিল, ইংরাজী নববর্ষের প্রথম দিন আবার হোটেল খুলিলে কেমন হয় ? কারখানার কুলি-মজুরদের জন্য না হোক, কারখানার বাইরে যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে তাদের জন্য ? যশোদারও তো জীবিকা অর্জ্জন করিতে

হইবে! বিশেষতঃ ধনঞ্জয়ের মত বিরাটকায় একটি পোষ্য যখন তার জুটিয়াছে।

যশোদা বলিল, 'কিছুদিন যাক।'

রাজেনও সায় দিয়া বলিল, 'আচ্ছা যাক কিছুদিন।'

দিন যায়। নন্দ ও সুবর্ণের কোন খবর আসে না। কোথায় কি ভাবে ওরা দিন কাটাইতেছে কে জানে! দিন ওদের চলিতেছেই বা কি করিয়া? নন্দ কি রোজগারের কোন উপায় করিতে পারিয়াছে? সুবর্ণের গায়ের গয়না একটি একটি করিয়া স্যাকরার দোকানে যাইতেছে হয় তো! নন্দর মত ছেলে, দু'দিন আগেও দিদি মুখে তুলিয়া না দিলে যে প্রায় খাইতে জানিত না, একটা মেয়েকে চুরি করিয়া পালাইবার এতকাল সে যে কেমন করিয়া ব্যাপারটার জের টানিয়া চলিতেছে, ভাবিলেও যশোদা অবাক হইয়া যায়।

মাঝে মাঝে নন্দর কীর্ত্তন শুনিবার জন্য যশোদার জোরালো ইচ্ছা জাগে। কীর্ত্তন করিলেই নন্দর শরীর খারাপ হয় বলিয়া নন্দর কীর্ত্তন করা যশোদা আগে পছন্দ করিত না, যদিও কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে সকলের মত অনির্ব্বচনীয় ভাবাবেগে সেও চিরদিন এক দুর্ব্বোধ্য ব্যাকুলতা অনুভব করিয়াছে। এখন মাঝে মাঝে তার মনে হয়, নন্দ থাকিলে নিজেই নন্দকে গাহিতে বলিয়া একদিন সে ভাল করিয়া তার কীর্ত্তন শুনিত।

জ্যোতির্ম্ময়ের সঙ্গে রাস্তায় একদিন যশোদার দেখা হইয়া গেল। একটি নূতন শ্রমিক-সমিতি সভায় যোগ দেওয়ার জন্য যশোদাকে একরকম জোর করিয়া ধরিয়া নিয়া যাওয়া হইয়াছিল. যাওয়ার ইচ্ছা তার একেবারেই ছিল না। আবার শ্রমিকদের ব্যাপারে মাথা ঘামাইতে যাইবে, তার কি লজ্জা নাই? পীড়াপীড়িতে শেষ পর্য্যন্ত তাকে যাইতে হইয়াছিল। সভায় গিয়াই সে টের পাইয়াছিল, তার অনুমানই ঠিক। সমিতিটি খাঁটি শ্রমিক-সমিতি নয়, একজন ভদ্রলোক নিজের স্বার্থের জন্য সমিতি গড়িবার চেষ্টা করিতেছেন।

সভা শেষ হওয়ার আগেই যশোদা চলিয়া আসিয়াছিল—বাঁচিয়া থাকিতেই যারা মরিয়া আছে তাদের ভাল করার নামে ব্যক্তিগত স্বার্থ-সাধনের এসব চেষ্টা সে সহ্য করিতে পারে না।

ফিরিবার সময় তার বাড়ীর গলি আর বড় রাস্তার মোড়ের কাছে প্রকাণ্ড তিনতলা নতুন বাড়ীটার সামনে দু'জনে মুখোমুখি হইয়া গেল। বড় বাড়ীটার

নীচের একটা অংশ চায়ের দোকান, জ্যোতির্ম্ময় বোধহয় চা খাইয়া ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। এত কাছে বাড়ী জ্যোতির্ম্ময়ের, দোকানে তার চা খাওয়ার কি প্রয়োজন হইয়াছে কে জানে! বাড়ীতে কি জ্যোতির্ম্ময়ের যাইতে ইচ্ছা হয় না, যে বাড়ীতে একদিন তার একটা বৌ আর একটা বোন ছিল, যে বৌটা মরিয়াছে হাসপাতালে আর যে বোনটাকে চুরি করিয়াছে যশোদার ভাই?

কিছুদিন একটানা কঠিন অসুখে ভুগিলে যেমন হয় সে রকম নয়, জ্যোতির্ম্ময় বড় রোগা হইয়া গিয়াছে। যশোদার সঙ্গে কথা না বলিয়াই সে চলিয়া যাইতেছিল, কি ভাবিয়া দাঁড়াইল।

'কোন খবর পাওনি, না?'

যশোদা মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না।'

জ্যোতির্ম্ময় আনমনে কি যেন ভাবিল। পথে মানুষ ও গাড়ী-ঘোড়ার সংখ্যা এত বেশী বাড়িয়া গিয়াছে, পথের দু'দিকের চেহারা এত বেশী বদলাইয়া গিয়াছে যে যশোদার মনে হয়, এ বুঝি তার বাড়ীর কাছের সেই পথটি নয়, দূরে অন্য কোথাও আসিয়াছে।

'খবর একটা পাওয়া যাবে চাঁদের-মা, কি বল?'

'তা পাওয়া যাবে বৈকি। আজ হোক কাল হোক, নিজেরাই একটা খবর ওরা পাঠাবে।'

'তোমায় যদি আগে জানায়, আমাকে জানাবে তো সঙ্গে সঙ্গে? আমায় খবর দিতে হয়তো ওদের ভয় হবে।'

'আপনাকে জানাবো বৈকি। কিন্তু ওদের সম্বন্ধে আপনি কি করবেন।'

প্রশ্ন শুনিয়াই জ্যোতির্ম্ময় অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল, 'সে সব পরে বিবেচনা করা যাবে চাঁদের-মা। নিজের বোনকে তো আর ফাঁসি দেব না আমি?'

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া অন্যমনে সে কি যেন ভাবিল। তারপর হঠাৎ বলিল, 'একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি চাঁদের-মা। নন্দ কোথাও বেড়াতে-টেড়াতে গেছে, এই কথা বলছো তো সবাইকে?'

যশোদা বলিল, 'হ্যাঁ, ওই ধরণের কথাই বলেছি। পাটনায় একটা চাকরী পেয়েছে। জ্ঞান হবার পর এই বোধহয় প্রথম মিছে কথা বললাম জ্যোতিবাবু।'

জ্যোতির্ম্ময় খানিকক্ষণ যেন অবাক হইয়াই যশোদার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর কথা বলিল বড় খাপছাড়া।

'বাহাদুরী কোরো না বেশী।'

গট্‌গট্‌ করিয়া সে চলিয়া গেল বাড়ীর উল্টা দিকে। গলিতে ঢুকিবার আগে মুখ ফিরাইয়া যশোদা দেখিতে পাইল, আবার সে ফিরিয়া আসিতেছে। আরও কিছু তার বলিবার আছে ভাবিয়া যশোদা একটু দাঁড়াইল, কিন্তু জ্যোতির্ম্ময় তার দিকে চাহিয়াও দেখিল না, সোজা আগাইয়া চলিয়া গেল।

এক মুহূর্ত্ত যশোদা অভিভূত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কি হইয়াছে জ্যোতির্ম্ময়ের? সে কি পাগল হইয়া যাইতেছে? জ্যোতির্ম্ময়ের মন যে কত দুর্ব্বল যশোদার অজানা ছিল না। তাই তার চেহারা দেখিয়া আর কথাবার্ত্তা চালচলনে মানসিক বিকারের স্পষ্ট লক্ষণ দেখিয়া যশোদা ভয় পাইয়া গেল।

অনেকদিন পরে সত্যপ্রিয়কেও আজ যশোদা দেখিতে পাইল। জ্যোতির্ম্ময় চলিয়া যাওয়ার একটু পরেই।

প্রথমে চোখে পড়িল সত্যপ্রিয়ের গাড়ী, পথের ধারে দাঁড়াইয়া আছে। অনেকটা আগাইয়া গিয়া দেখা গেল সত্যপ্রিয়কে। দু'জন সাহেবী পোষাক পরা লোকের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে সে গাড়ীর দিকে ফিরিয়া যাইতেছিল। খুব সম্ভব নূতন কেনা জমি ও বাড়ীগুলি দেখিতে এ পাড়ায় আসিয়াছে।

পথের দুই প্রান্ত ধরিয়া দুইজন চলিতেছিল, যশোদা কল্পনাও করে নাই সত্যপ্রিয় তার সঙ্গে কথা বলিবে। পরস্পরকে অতিক্রম করিয়া যাওয়ার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে সত্যপ্রিয় বলিল, 'কেমন আছ চাঁদের-মা?'

কাছে গেল না, শুধু দাঁড়াইল। যশোদাও পথের অপর প্রান্তে দাঁড়াইয়া পড়িল। শান্ত কণ্ঠে বলিল, 'ভাল আছি। আপনি ভাল তো?'

সত্যপ্রিয়র সঙ্গের লোক দু'জন বিস্মিত চোখে চাহিয়া আছে। একজন সাইকেল আরোহী ঘন্টা বাজাইয়া চলিয়া গেল। পথের মাঝে এ ভাবে পীড়ন করা কেন? এত করিয়াও কি সত্যপ্রিয়ের সাধ মেটে নাই?

'চলে যাচ্ছে একরকম।'

সত্যপ্রিয় চলিতে আরম্ভ করিল। যশোদা একমুহূর্ত্ত নড়িতে পারিল না। তার চোখে হঠাৎ জল আসিয়া পড়ায় পথটা একটু ঝাপ্সা হইয়া গিয়াছিল।

তিন

বাড়ী ঢুকিয়া যশোদা দেখিতে পাইল, নন্দ আর সুবর্ণের বয়সী দু'টি ছেলেমেয়ে ভিতরের বারান্দায় জলচৌকিতে বসিয়া আছে। অল্প দূরে দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া বিড়ি টানিতেছে ধনঞ্জয়।

যশোদাকে দেখিয়া তিনজনেই চঞ্চল হইয়া উঠিল।

ধনঞ্জয় তাড়াতাড়ি বলিল, 'এত শীগ্‌গির যে ফিরে এলে চাঁদের-মা?'

প্রশ্নের জবাব না দিয়া যশোদা পাল্টা প্রশ্ন করিল, 'এরা কে?'

'ওরা ঘর ভাড়া নিতে এসেছে। আমি বললাম এখানে ঘর ভাড়া মিলবে না—'

ছেলেটি বলিল, 'রাজেনদা' আমাদের বসতে বলে' গেছে। কাছেই বাড়ী না রাজেনদা'র?'

যশোদা বলিল, 'হ্যাঁ, কাছেই বাড়ী।'

'রাজেনদা' বাড়ী থেকে একটু ঘুরে আসতে গেছে। আমরা থাকলে যদি আপনার অসুবিধে হয়—?'

পরিষ্কার ধবধবে জামা-কাপড় পরনে, সমস্তই সাদাসিদে সাধারণ, তবু দু'জনের পরিচ্ছদেই যেন মার্জ্জিত রুচি আর সহজ ও স্বাভাবিক পরিচ্ছন্নতার ছাপ আঁকা রহিয়াছে। ছেলেটির বয়স তেইশ চব্বিশের বেশী হইবে না, মুখখানা মেয়েদের মত কোমল। মেয়েটির বয়স বোধ হয় ষোল বছর, এলোখোঁপায় আটকানো আঁচলটি খসিয়া পড়ি' পড়ি' করিয়াও পড়িতেছে না, সীঁথিতে সূক্ষ্ম সিঁদুরের রেখা। মুখখানা সুশ্রী, বুদ্ধিতে উজ্জ্বল চপল দু'টি চোখ।

এতক্ষণ সে অবাক হইয়া যশোদর বিরাট দেহটি দেখিতেছিল,—জীবনে বোধ হয় সে এতবড় লম্বা-চওড়া মেয়েমানুষ দেখে নাই। এবার ছেলেটির দিকে চাহিয়া অকারণেই ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, 'তুমি থামো। আমি বুঝিয়ে বলছি।'

তারপর সোজাসুজি যশোদার মুখের দিকে চাহিয়া মেয়েটি বলিল, 'আমরা খারাপ লোক নই, আমাদের বিয়ে হয়েচে।'—

যশোদা বলিল, 'বিয়ে না হলে বুঝি লোক খারাপ হয়?'

মেয়েটি আবার ফিক্ করিয়া হাসিল, 'না, তা বলিনি। আপনি যদি কিছু

সন্দেহ করেন, যদি ভাবেন আমরা পালিয়ে এসেছি বাড়ী থেকে, তাই জন্যে আগে থেকে বলে' রাখলাম। আমরা দুজনেই ছেলেমানুষ তো? আমরা এমনি ভাবে এসে ঘরভাড়া নিতে চাইলে আপনার কেন, সব্বারি মনে হতে পারে, ভেতরে কোন গোলমাল আছে নিশ্চয়। আপনিই বলুন, মনে হতে পারে না? গোলমাল অবিশ্যি আছে, তবে ও-ধরণের গোলমাল নয়। আমায় চুরি করার জন্যে ওঁর হাতে একদিন হাতকড়া পড়বে আর আপনাকে নিয়ে পুলিশ টানাটানি করবে, সে ভয় করবেন না। গোলমালটা কি হয়েছে বলছি শুনুন। হয়েছে কি জানেন—'

মুখে যেন খই ফুটিতে থাকে মেয়েটির। যশোদা অবাক হইয়া শুনিয়া যায়। এতটুকু মেয়ে, বিবাহ নাকি হইয়াছে মোটে মাস ছয়েক আগে, কিন্তু কথায় একেবারে পাকা গিন্নি। কি তার মুখের ভঙ্গি, কি ভনিতা, কি ফোড়ন আর ব্যাখ্যা! শুনিতে শুনিতে যশোদার মনে হয়, কার যেন অনুকরণ করিতেছে মেয়েটি, হাত নাড়া, ঠোঁট নাড়া, চোখের পলক ফেলা, রাগ দুঃখ ক্ষোভ বিস্ময় কৌতুক ফুটাইয়া তোলা আর মিলাইয়া দেওয়া, সব যেন তার নকল, কথাগুলি সমস্তই শোনা-কথার পুনরাবৃত্তি। কে জানে মা না মাসী না পিসী কে নিজেকে এমনভাবে উজাড় করিয়া মেয়েটির মধ্যে ঢালিয়া দিয়াছে!

গোলমালটা অসাধারণ কিছু নয়, মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারে সর্ব্বদাই ঘটিতেছে। দাদার পছন্দ-করা একটি মেয়েকে বাতিল করিয়া অপছন্দ-করা এই মেয়েটিকে বিবাহ করায়, বিবাহে নগদ টাকা নিতে রাজি না হওয়ায় এবং সম্প্রতি একটা কারখানায় পঁচিশ টাকায় প্রায় কুলি-মজুরের একটা কাজ নেওয়ায়, দাদা ভয়ানক চটিয়া গিয়াছে। দাদার স্ত্রীর মতে, মায়ের পেটের ভাই তো দূরের কথা শত্রুও মানুষের সঙ্গে এমন শত্রুতা করে না।—

'আসলে, আমার জা-ই যত নষ্টের গোড়া। ক'দিন যা দেখেছি তাতেই বুঝেছি ভাসুর আমার লোক ভাল। আমায় দেখে ভাসুরের পছন্দ হয়েছিল, এক বন্ধুর কাছে বলেছিলেন উনি শুনেছেন, কিন্তু আমার জায়ের রংটা আমার চেয়ে একটু কম ফর্সা কিনা, আর দেখতেও আমার মত সুন্দর নয় কিনা— তা, তার এখন বয়েস হয়েছে, ছেলে-মেয়ে হয়েছে তিনটি, প্রথম বয়েসে যেমন ছিল এখনও কি তেমনি চেহারা থাকে, রূপ-যৌবন মানুষের দু'দিনে উবে যায়

—আমায় দেখেই তাই অপছন্দ হয়ে গেল। তারপর যে মেয়েটিকে নিজে দেখে পছন্দ করল—ওগো, বলনা সে দেখতে কেমন ছিল? হাসছ যে? আমার খুব অহঙ্কার হয়েছে ভাবছ বুঝি? না বাপু, আমি ওসব অহঙ্কার বুঝি না, ন্যাকানিপনার ধার ধারি না। সত্যি কথা বলব তাতে দোষ কি, তা সে নিজের সম্বন্ধেই হোক আর যার সম্বন্ধেই হোক? আমি তো আর বলিনি, আমি আকাশের পরীর মত সুন্দরী! মোটামুটি দেখতে সুন্দর আমি, এই পর্য্যন্ত, বাস্! আমার মত সুন্দর মেয়ে গণ্ডা-গণ্ডা গড়াচ্ছে পথে-ঘাটে। তুমিই তো বলেছিলে, সে মেয়েটা দেখতে কালো আর চোখ একটু ট্যারা, বলনি? যাক্ গে, যা বলছিলাম, বলি। কি কথায় কি কথা এসে পড়ল। দেখুন তো দিদি, এমনি করে' পেছনে লাগলে কেউ কথা কইতে পারে? কি যেন বলছিলাম—হ্যাঁ, সেই হ'ল আমার জায়ের রাগ। এমন ব্যবহার সুরু করলে আমাদের সঙ্গে কি বলব। নগদ টাকা সম্বন্ধে বলতে লাগল, উনি যে নগদ নেন্‌নি সে কি আর অম্‌নি অম্‌নি—নগদ নিলে টাকাটা আমার ভাসুরের হাতে পড়ত, এ বেশ বৌ এর গায়ে গয়না হ'ল। আমার পিসী,—পিসীই আমায় মানুষ করেছে, বড্ড ভালবাসে আমায়—পিসী নিজে থেকে আটশো টাকার গয়না বেশী দিয়ে দিল। গয়না যা দেবার কথা ছিল তাতো দিলই, তার উপরে আরও সাড়ে আটশো টাকার গয়না, নগদ টাকার বদ্‌লিতে। ভাসুর তিনশো টাকা মাইনে পান, ওক'টা টাকা নগদ পেলেই বা তিনি এমন কি বড়লোক হ'য়ে যেতেন, তিন মাসের মাইনেও নয়! কিন্তু জা' আমার ওই কথা বলে বলে ভাসুরের মন ভাঙাতে লাগল। তারপর ও যেই চাকরীটা নিল,—না নিয়েই বা কি করবে বলুন, ভাল একটা চাকরীও জুটিয়ে দেবে না, এদিকে ঘরে বসে' থাকার জন্যও খোঁচাবে! ভাসুর নয়, আমার জা'। হাত খরচের দু'চারটে পয়সা তো মানুষের লাগে? দাদার কাছে চাইলে তিনি বলবেন, আহা বৌদির কাছ থেকে নে না গিয়ে। বৌদির কাছে চাইলে এমন করে' মুখ বাঁকাবে—! একবার দু'বার চেয়ে শেষে ও আর চাইত না। আমি একটা গয়না দিলাম বেচতে, তাও বেচবে না। এদিকে নস্যি কেনার একটা পয়সা নেই! তখন এই চাকরীটা নিয়ে নিল। কিন্তু আমার জায়ের সে কি রাগ! বলে কি, লোকের কাছে দাদার মাথা হেঁট করাবার জন্যে ইচ্ছে করে' এই

চাকরী নিয়েছে। নইলে এতগুলো পাশ ক'রে কেউ কুলি-মজুরের কাজ নেয়? খেটে খেলে লোকের কাছে মাথা হেঁট হবার কি আছে বলুন তো দিদি? রাত্তিরে আমার জা' কি সব পরামর্শ দিল কে জানে, সকালে আমার ভাসুর ওকে বললেন, কি, হয় এ-কাজ ছেড়ে দাও, নয় আমার বাড়ী থেকে বেরোও। ফিক্ করিয়া সে আবার হাসিল, 'না, ঠিক ওমনিভাবে বলেন নি, তবে, মোট কথাটা দাঁড়াল ওই। আমরাও তাই চলে এলাম।'

ছেলেটির নাম অজিত, মেয়েটির নাম সুব্রতা।

'তোমার ডাক নাম কি বোন? সুব্রতা বলে' ডাকতে পারব না।'

'আমার ডাক নাম নেই।'—সুব্রতা হাসে।

অজিত বলে, 'ওর ডাক নাম হ'ল গিয়ে—'

সুব্রতা চোখ পাকাইয়া বলে, 'ত্মাখো, ভাল হবে না কিন্তু!'

অজিত হাসিমুখেই চুপ করিয়া থাকে। তখন সুব্রতা বলে, 'আচ্ছা, বলো। কি আর হবে, আজ হোক কাল হোক জানতে তো পাবেন-ই!'

এই সামান্য হাসি-তামাসার ব্যাপারেও মনে হয়, অজিত যেন বৌ-এর বড় বাধ্য। সুব্রতার কৃত্রিম চোখ-পাকানো রাগকে পর্য্যন্ত সে সম্মান করিয়া চলে। প্রথমটা যশোদার একটু কেমন কেমন লাগিয়াছিল, তারপর দু'একটা দিন যাইতে না যাইতে সে টের পাইয়াছে, এটা দু'জনের একটা ভালোবাসার খেলা মাত্র। দু'জনে বড় মজা পায় এ খেলায়। এই বয়সের দু'টি ছেলেমেয়ের মধ্যে, মিলন যাদের হইয়াছে মোটে ছ'মাস আগে, এমন একটা আশ্চর্য্য মিল আছে মনের যে যেটুকু যশোদা বুঝিতে পারে তাতেই সে অবাক হইয়া যায়। সুব্রতা যদি আব্দার ধরে, আমায় আকাশের চাঁদ পেড়ে দাও,—আদর দিলেই বৌরা সময় অসময়ে যে আব্দার ধরিয়া স্বামীদের মেজাজ বিগড়াইয়া দেয়,—অজিত সঙ্গে সঙ্গে বলে, দিচ্ছি পেড়ে। সুব্রতা জানে অজিত বুঝিবে এটা তার আব্দার, সুব্রতার এই জানা অজিত জানে, অজিতের এই জানাও সুব্রতা জানে, আবার সুব্রতার—দু'জনের জানাজানির এই প্রক্রিয়া যশোদার মনে হয় অন্তহীন আর রহস্যময়, তবু যেন দু'জনের মধ্যেই এর সর্ব্বাঙ্গীণ পূর্ণতা ঘটিয়াছে,

সহজ ও শান্ত আনন্দের গভীর অনুভূতিতে।

একেই কি বলে ভালবাসা? মনের মিল?

যশোদা ভাবে।

হিংসার মত কি যেন একটা মৃদু প্রতিক্রিয়া জাগে যশোদার মনে, ক্ষীণ একটা অস্বস্তিবোধের পীড়ন চলিতে থাকে।

সুব্রতা তার ঘর সাজায়, সকালে আর সন্ধ্যায় অজিত তাকে সাহায্য করে। তিন টাকা ভাড়ায় যশোদা বড় ঘরখানাই তাদের দিয়াছে; একটি তোরঙ্গ আর দুটি স্যুট্‌কেশে ঘরটা যেন খালিখালি দেখায়। সুব্রতা দেয়ালে টাঙায় ছবি আর ফটো, জানালায় দেয় পর্দ্দা, অজিতকে দিয়া আল্‌না আনায় আর বেশী-বেশী জামা-কাপড় অকারণে বাহির করিয়া সাজাইয়া রাখে, যশোদার দেওয়া চৌকির পায়া চারটিতে রঙীন কাপড়ের ঢাকনি দেয়, টুকিটাকি আরো কত কি যে সে করে। আর সেই সঙ্গে করে অজিতের সঙ্গে নানা বিষয়ে পরামর্শ—যশোদার সামনেই। মাঝে মাঝে যশোদারও মতামত জিজ্ঞাসা করে। মাস নয়, বছর নয়, সমস্ত ভবিষ্যতকে সে যেন এই একটি ঘরে আটক করিয়াছে। এই ঘরেই তার যেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। কোথায় টেবিল পাতিবে, কোন্‌দিকে আলমারি রাখিবে, ক'খানা আর কি ধরণের চেয়ার কিনিবে, এসব কল্পনার আর শেষ থাকে না। যে রেটে সে কল্পনায় আসবাব কিনিতে থাকে, তাতে এক বছর পরে এ-ঘরে তিল ধারণের স্থান থাকিবে কি করিয়া যশোদা ভাবিয়া পায় না।

কয়েকদিন রাঁধিয়া খাওয়ায় যশোদাই। তারপর একদিন দুপুরে সুব্রতা বলে, 'আমি কোথায় রাঁধব দিদি?'

'আমার রান্না রুচছে না?'

'ওমা, সে কি কথা! সত্য বলছি দিদি, এমন রান্না জীবনে খাইনি কখনো। আজ যে কুমড়োর ছক্কা খাওয়ালে, ঠিক অমৃতের মত লাগলো। কুমড়োর ছক্কার যে আবার এমন স্বাদ হয়, স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। তবে কি জান দিদি, আমরা হলাম ভাড়াটে, চিরকাল তো আর তোমার ঘাড়ে খাওয়া উচিত হবে না।'

'আমার ঘাড়ে খাবে কেন বোন? তোমরা খরচা দিও, রান্না এক যাগাতেই

হবে। চারটি তো প্রাণী আমরা বাড়ীতে, দু'যায়গায় রেঁধে কোন লাভ আছে? মিছেমিছি বেশী খরচ।'

শুনিয়া সুব্রতা খুসী হইয়া তৎক্ষণাৎ এ প্রস্তাবে রাজী হইয়া যায়। যশোদার প্রশংসা করিয়া বলে যে, বাস্তবিক, বয়স না হইলে কি এসব কথা মানুষের মাথায় আসে! কিন্তু একটা বিষয় আপত্তি করে সুব্রতা, সকাল সন্ধ্যায় চা-জলখাবার সম্বন্ধে।

'চা'টা কিন্তু আমি করব দিদি।'

'নিজের হাতে করে' খাওয়াতে চাও, না?' বলিয়া যশোদা হাসে।

সুব্রতার সঙ্গে এমনিভাবে আলাপ করে যশোদা, কখনও মা মাসীর মত, কখনও সমবয়সী সখির মত। কিছুক্ষণ আলাপ করিবার পরেই সব গোলমাল হইয়া যায়, সুব্রতার কথা শুনিতে শুনিতে সমবয়সী বন্ধু মনে হয় তাকে, আর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলে খেয়াল হয় যে সে ষোলবছরের একটা কচি মেয়ে মাত্র, যে বয়সের মেয়ে যশোদারও থাকিতে পারিত।

এরা যে তার ভাড়াটে একথা যশোদার মনেই থাকিতে চায় না। দু'জনকে তার মনে হয় অতিথি, তার বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়াছে; এদের খাওয়া-দাওয়ার ভাল ব্যবস্থা করা আর সুখ-সুবিধার দিকে নজর রাখার দায়িত্ব যেন তার।

পরদিন সকালে উনুনে আঁচ দিয়া যশোদা সুব্রতাকে ডাকিতে যায়। এ সময় রোজ সুব্রতা রান্নাঘরে উপস্থিত থাকে, আজ তাকে না দেখিয়া যশোদা একটু আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল।

ঘরে গিয়া যশোদা ছাখে কি, অজিত ছোট টুলটিতে মুখ ভার করিয়া বসিয়া আছে, চৌকিতে সতরঞ্চির উপর উপুড় হইয়া গুটানো তোষকে মুখ গুঁজিয়া সুব্রতা কাঁদিতেছে।

'কি হ'ল সকাল বেলা তোমাদের?'

যশোদার সাড়া পাইয়াই সুব্রতা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসে। জলভরা চোখ, ভিজা গাল আর ফুলানো ঠোঁটে কি ছেলেমানুষ আর সুন্দরই তাকে দেখায়! মনে হয় গিন্নিপনার অভ্যাসটাও যেন তার এখনকার মত ঘুচিয়া গিয়াছে। শিশুর মত যশোদার কাছে সে নালিশ জানায়।

'চায়ের জিনিষপত্র কিনবার পয়সা পর্য্যন্ত নেই দিদি। বললাম, এমনি

মোটা-মোটা চুড়ি ছ'গাছা করে' কেউ একহাতে পরে না, দু'গাছা চুড়ি বেচে দিয়ে এস। তা, কিছুতেই বেচবে না। কি হয় বাড়্তি চুড়ি বেচলে ?'

'চায়ের জিনিষপত্র কেনার জন্য বৌ-এর গয়না বেচবে !'—অজিত বলে।

'কেন, বৌ কি পর ?'—সুব্রতা বলে।

কঠিন সমস্যা সন্দেহ নাই। বৌ-এর গয়না বেচার সমস্যা যশোদার আগের ভাড়াটেদের মধ্যেও অনেকবার দেখা দিয়াছে, কিন্তু সমস্যাটা তখন দাঁড়াইত ঠিক উল্টা। গয়না বেচিতে স্বামীরাই ছিল উৎসুক, বৌয়েরা ছিল বিরোধী। কলহও ছিল তাদের ভিন্ন ধরণের, কথা কাটাকাটি ছিল যেন গালাগালি আর অভিশাপ, মারামারি ভূমিকার মত। দু'একটি স্বামী যে বৌকে চড়-চাপড়টা বসাইয়া দিত না, তাও নয়। অতীতে স্বামী-স্ত্রীর যত কলহে সে মধ্যস্থতা করিয়াছে তার সঙ্গে এই নব দম্পতীর কলহের পার্থক্যটা এত বেশী স্পষ্ট হইয়া যশোদার কাছে ধরা পড়ে যে, এদের মিল ঘটানোর লাগসই উপায় সে ভাবিয়া পায় না। মিলনের চেয়ে মধুর যে বিরোধ, তার কি প্রতিবিধান আছে ?

একরকম জোর করিয়া রান্নাঘরে ধরিয়া নিয়া গিয়া দু'জনকে সে চা আর হালুয়া খাওয়ায়। মন কাঁদিতে থাকে নন্দ আর সুবর্ণের জন্য। হয়তো এমনিভাবে কোথায় কার বাড়ীতে একটি ঘর ভাড়া নিয়া তারা আছে, পয়সার টানাটানির জন্যই হয়তো তাদের প্রথম ঝগড়া বাধিয়াছে এমনিভাবে। প্রথম বয়সের উত্তেজনায় দুঃখকে বরণ করায় সুখ দু'দিনে ঘুচিয়া গিয়া দুর্দ্দশার দুজনের সীমা থাকিবে না, এই কথাই সর্ব্বদা সে ভাবে, কিন্তু আসলে হয়তো এদের মতই দুর্লভ আনন্দে দিনগুলি তাদেরও ভরিয়া আছে! ভাবিতে গিয়া সংশয় জাগে যশোদার। সুবর্ণ তো সুব্রতার মত নয়। সুব্রতার গিন্নিপণা আছে পাকামি নাই, লজ্জাহীনতা আছে বেহায়াপনা নাই, বুদ্ধি আছে কুটিলতা নাই, চপল হাসি মন ভুলানোর অস্ত্র নয় সুব্রতার। সুব্রতার মত সুবর্ণ কি কাউকে আপন করিতে পারে, সুব্রতার মত মনের মিল কি সুবর্ণের সঙ্গেও কারো হয় ?

অজিতের চা খাওয়া দেখিতে দেখিতে যশোদার মনে হয়, কে জানে নন্দও তো অজিতের মত নয়। এদের দু'জনের মত নয় বলিয়াই হয়তো ওদের মধ্যে এদের মত মিল হইয়াছে।

যশোদার গম্ভীর মুখ দেখিয়া অজিত আর সুব্রতা ভাবে, তাদের চুড়ি বিক্রীর কথাটাই সে ভাবিতেছে। দু'জনেই যশোদার দিকে তাকায় আর চোখ নামাইয়া নেয়, তারপর প্রায় একসঙ্গেই পরস্পরের দিকে মুখ ফিরানোর ফলে যেই চোখোচোখি হয়, দু'জনের মুখেই মৃদু হাসি ফুটিয়া ওঠে। যশোদার প্রকাণ্ড শরীরটা আজও তাদের চোখে অভ্যস্ত হইয়া যায় নাই, এখনো বিস্ময় আর কৌতুক জাগে।

হাসি দেখিয়া যশোদা বলে, 'বড় ছেলেমানুষ তোমরা।'

দু'জনে ভাবে, এ বুঝি যশোদার শরীর দেখিয়া হাসার জন্য তিরস্কার। লজ্জায় অজিতের চোখ মিট্‌মিট্ করে, সুব্রতার গাল দু'টী লাল হইয়া যায়।

যশোদা বলে, 'দুটো চুড়ি বেচবে কি বেচবে না, তাই নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি, কাঁদাকাটা কেন? তেমন দরকার হ'লে গয়না বেচতে কোন দোষ নেই—বেচাই বরং উচিত। মেয়েমানুষের গয়না তো শুধু সখের সামগ্রী নয়, বিপদে আপদে কাজে লাগবে বলেই গয়না গড়ানো, ও হ'ল একধরণের সঞ্চয়। তাই বলে' যখন-তখন সামান্য কারণে বেচতে নেই। চায়ের জিনিষপত্র কেনার জন্যে কি আর গয়না বেচা চলে? তবে মনে কর সুবুর—'সুব্রতার একটা অসুখ বিসুখ হওয়ার কথাটা যশোদার জিভের ডগায় আসিয়া পড়িয়াছিল, সামলাইয়া নিয়া সে বলে, 'ছেলেপিলে হবে বলে' টাকার দরকার, তখন তো আর বৌ-এর গয়না বেচব না বললে চলবে না। আমার কাছে ধার নাও ক'টা টাকা, পরে শোধ করে' দিও।'

সুব্রতার মুখের লালিমা, আরও বেশী গাঢ় হইয়া আসিয়াছিল, সে চুপ করিয়া থাকে।

অজিত বলে, 'টাকা ধার করতে কেমন যেন লাগে।'

যশোদা সুব্রতার মুখখানা দেখিতে দেখিতে বলে, 'সে তো ভালই। তবে দিদি বলে' যখন ডাকো আমায়, নিশ্চয় শোধ করে' দেবে জানো মনে মনে, তখন ক'টা দিনের জন্য আমার কাছে নিতে দোষ নেই।'

অজিত কাজে চলিয়া যায়। সুব্রতা রান্নাঘরে আসিয়া যশোদাকে টুকিটাকি কাজে সাহায্য করিবার সুযোগ খোঁজে আর বার বার কি যেন একটা কথা বলিতে গিয়া চুপ করিয়া যায়। রান্না প্রায় সবই হইয়া গিয়াছে। সকাল

সকাল রান্না শেষ করা যশোদার চিরদিনের অভ্যাস, ভাড়াটেরা তার ন'টার মধ্যে খাইয়া কাজে বাহির হইয়া যাইত। মাঝখানে বাড়ীতে যখন কেউ ছিল না, শুধু সে আর ধনঞ্জয়, তখন রান্না শেষ হইত। অনেক বেলায় অজিত আসিবার পর আবার যশোদা ন'টার মধ্যে সকালের রান্না শেষ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভাল যে যশোদার বিশেষ লাগে তা নয়। মস্ত উনুনে কত লোকের রান্না সে একদিন রাঁধিত, বাড়ীতে দু'বেলা যেন চলিত নিমন্ত্রণের হাঙ্গামা, এখন শুধু সিদ্ধ করা চারজনের ভাত।

'জানো দিদি—'

কিন্তু যশোদাকে কথাটা সুব্রতার আর বলা হয় না। রাজেন আসিয়া বসিতে সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যায়। রাজেনের কাছে হঠাৎ তার এত লজ্জার কারণটা কেউ বুঝিতে পারে না।

'ভাড়াটেরা কেমন চাঁদের-মা ?'

'মন্দ কি !'

'আরেক জোড়া ভাড়াটে আছে, আনব ?'

যশোদা হাসিয়া বলে, 'কেন এক জোড়ায় কলঙ্ক ঠেকানো যাবে না ?'

রাজেনও হাসিয়া বলে, 'তা কেন, রোজগারের ব্যবস্থাও তো করতে হবে ?'

'এদের মত ভদ্রলোক ভাড়াটে আনবে তো ?'

প্রশ্ন শুনিয়া রাজেন উৎকণ্ঠিত ব্যগ্রতার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে, 'কেন, এদের কি তোমার পছন্দ হচ্ছে না চাঁদের-মা ? না তিনটাকা ভাড়ায় একখানা ঘর দিতে হয়েছে বলে' ভাবছ ? আমি কি সে সব না ভেবেই তোমায় ভাড়াটে এনে দিয়েছি ! ক'টা মাস অপেক্ষা কর, অজিতের মাইনে ডবল হয়ে যাবে, —তখন—'

যশোদা মাথা নাড়িয়া বলে, 'সেজন্য নয়। ভাবছি, শেষকালে কি ভদ্রলোক ভাড়াটেই শুধু রাখতে হবে আমায় যারা দু'চোখে কোনদিন দেখতে পারেনি ?'

'আমি কিন্তু মানুষ চাঁদের-মা।'

'মানুষ না ঘোড়া তুমি তা জানিনে, তবে ভদ্রলোক তুমি নও।'

'বি-এ ফেল করেছি, সাতষট্টি টাকায় চাকরী করা, বিয়ে করা, বৌ নিয়ে ঘর সংসার করছি—আমি যদি ভদ্রলোক নই, কে তবে ভদ্রলোক শুনি ?

সত্যপ্রিয় ?'

'ও আবার একটা লোক নাকি যে ভদ্র হবে? ও হল মানুষের রূপ ধরা দৈত্য—কিংবা দানোয় পাওয়া মানুষ। চাদ্দিকে হু হু করে বাড়ী তুলে গণ্ডা-গণ্ডা ভদ্রলোক এসে বাসা বাঁধছে, ভদ্রলোক কাকে বলে জানো না? চাষা মজুরকে যারা ঘেন্না করে, বড়লোকের পা চাটে, ন্যাকা ন্যাকা কথা কয়, আধপেটা খেয়ে দামী দামী জামা কাপড় পরে, আরাম চেয়ে চেয়ে ব্যারামে ভোগে, খালি নিজের সুখ খোঁজে, মান অপমান বোধটা থাকে টনটনে কিন্তু যত বড় অপমান হোক দিব্যি সয়ে যায়, কিছু না জেনে সবজান্তা হয়,—আর বলব ?'

রাজেন মাথা নাড়িয়া বলিল, 'বলতে চাও বল, তবে আর শুনবার দরকার নেই। তোমার যখন ঝোঁক চাপে চাঁদের-মা—'

'মুখে খৈ ফুটতে থাকে, না ?'

'ভদ্রলোকের ওপর তোমার এত রাগ কেন যশোদা ?'

'ভদ্রলোকেরা কি মানুষ ?'

আরেক জোড়া ভাড়াটে আনিবার অনুমতি যশোদা দেয়। এক জোড়া যখন আসিয়াছে, আরও আসুক। মনটা কিন্তু খুঁতখুঁত করিতে থাকে যশোদার। মনে হয়, চলিতে চলিতে সামনে একটা বাধা পাইয়াছে বলিয়া নিজের মনের দুর্ব্বলতার জন্য সে যেন বিপথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। দুপুরবেলা কুমুদিনী আসিয়া বেড়াইয়া গেল, সুব্রতার সঙ্গে ভাবও করিয়া গেল। ইতিমধ্যে যতবার সে আসিয়াছে, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া যশোদার সঙ্গে কয়েক মিনিট কথা বলিয়াই চলিয়া গিয়াছে, বসিতে বলিলেও বসে নাই। আজ প্রায় সমস্ত দুপুর এ বাড়ীতে কাটাইয়া গেল।

সুব্রতার কি হইয়াছে কে জানে, সমস্ত দুপুর কুমুদিনী যে এত কথা বলিল তার সঙ্গে, কথায় বা ভাব-ভঙ্গিতে তার এতটুকু গিন্নিপনা দেখা গেল না। কেমন যেন অন্যমনস্ক মনে হইতে লাগিল তাকে।

কুমুদিনী চলিয়া যাওয়ার পর আবার সে উস্‌খুস করিতে থাকে, সকালে রান্নাঘরে যেমন করিয়াছিল।

বলে, 'জানো দিদি, সেই যে বলেছিলে না—?'

যশোদা বলে, 'কি বলেছিলাম ?'

'সেই যে, যে জন্য গয়না বেচা চলে ?'

কিছুক্ষণ যশোদা বুঝিতেই পারে না, অবাক হইয়া সুব্রতার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। তারপর খেয়াল হয়।

'ওমা, সত্যি ?' বলিয়া সুব্রতাকে সে বুকে টানিয়া নেয়।

কি হয় তখন যশোদার, প্রথম সন্তান সম্ভাবনায় উদ্‌ভ্রান্ত পরের একটা মেয়েকে সজোরে বুকে চাপিয়া ধরিয়া ? তীব্র বেদনার সম্ভাবনায় বিরাট দেহের প্রত্যেকটি অণু ভয়ার্ত্ত ঔৎসুক্যে সজাগ হয়ে ওঠে, চাঁদকে প্রসব করার সময় যেমন হইয়াছিল। আলিঙ্গনের চাপে দম আটকাইয়া সুব্রতার প্রাণ বাহির হইয়া যাওয়ার উপক্রম হয়। জোর তো সোজা নয় যশোদার দু'টি বাহুতে। সুব্রতার অস্ফুট আর্ত্তনাদে সচেতন হইয়া সে তাকে ছাড়িয়া দেয়। ধপ্ করিয়া মেঝেতে বসিয়া জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে নিতে ক্ষীণস্বরে সুব্রতা বলে, 'আরেকটু হলেই শেষ করে দিয়েছিলে দিদি।'

রাত্রে ধনঞ্জয়কে খাইতে দিয়া সামনে বসিয়া থাকিতে থাকিতে যশোদার মনে হয়, আরেকজন মানুষকে খবরটা শুনাইতে না পারিলে বুকটা তার ফাটিয়া যাইবে।

'জানো, সুবুর ছেলেপিলে হবে।'

বাড়ীতে ভাড়াটে আসিবার পর ধনঞ্জয় কেমন মুষড়াইয়া গিয়াছে। ক'দিন চুপচাপ শুধু সকলকে দেখিয়া গিয়াছে, মুখে তার একটি কথা শোনা যায় নাই। যশোদার মুখে সুব্রতার সন্তান-সম্ভাবনার খবরটা শুনিয়া এবিষয়ে সে কিছুই বলে না, অভিমানী বালকের মত নিজের নালিশটা জানাইয়া বসে।

'রাজেনকে তুমি অত খাতির কর কেন চাঁদের-মা ?'

সুব্রতার নূতন খাপছাড়া অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা দেখিয়া যশোদা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কোথায় সে ছিল, কতদূর বিভিন্ন আবেষ্টনীর মধ্যে, হঠাৎ আসিয়া পড়িয়াছে কোথায়। কিন্তু ছোটবড় সব বিষয়ে অনেক ভুল করিলেও এবং নানারকম মুস্কিলে পড়িলেও কখনো তাকে কাবু হইতে দেখা গেল না। নিজেই ভুল সংশোধন করিতে লাগিল, মুস্কিলের আসান করিতে লাগিল। চায়ের সেট আর ওই ধরণের কয়েকটি অভাব মিটানোর জন্য সুব্রতার চুড়ি বিক্রী করার সমস্যা যশোদা সমাধান করিয়া

দিয়াছিল। তবে সেটা সাময়িকভাবে কোনরকমে কাজ চালানো গোছের সমাধান। সে সমাধান গ্রহণ করার বদলে সুব্রতা নিজের সমস্যার আরও স্থায়ী ও ব্যাপক মীমাংসা করিয়া ফেলিল। যশোদার কাছে টাকা ধার করার বদলে দামী চায়ের সেট কেনার মত প্রয়োজনগুলিকেই বাতিল করিয়া দিল!

হাসিমুখে বলিল, 'প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারিনি দিদি কদ্দুর হিসেব করে চলতে হবে আমাকে।'

একটি এলুমিনামের কেটলী আর সস্তা কয়েকটি কাপডিস্ মাত্র কেনা হইল। আসবাব কিনিয়া ঘর বোঝাই করা তো বন্ধ হইয়া গেলই, যশোদাকে একদিন সুব্রতা জিজ্ঞাসাও করিল, বাড়তি কয়েকটা আসবাব বিক্রী করিয়া ফেলা যায় না?

খরচপত্রও সে হঠাৎ কমাইয়া ফেলিল। যুদ্ধের সম্ভাবনা টের পাওয়া মাত্র বুদ্ধি থাকিলে একটা দেশ যেমন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়, অদূর ভবিষ্যতে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই বাধিবে জানিয়া সুব্রতাও যেন তেমনিভাবে নিজেকে প্রস্তুত করিতেছে।

সুব্রতার মধ্যে ন্যাকামি নাই। তরুণ মনের স্বাভাবিক ভাবপ্রবণতা তার মধ্যে যথেষ্টই আছে কিন্তু দামও সে করিতে জানে। বাঁকা আলোয় চকচকে কাঁচকে হীরার মত খাতির করার খেলায় হয়তো সে আনন্দ পায় এবং সে কাঁচের বিনিময়ে কিছু সোনাদানাও অনায়াসে দিয়া বসে কিন্তু হীরার বদলে কাঁচ পাইয়াছে বলিয়া কখনো আপশোষ করে না। কারণ, কাঁচ সে কাঁচ তা সে জানে, আসলে সে দাম দেয় শুধু আনন্দটুকুর।

যশোদা এ'টা আশা করে নাই। সুব্রতাকে ভাল লাগিলেও এবং একটু স্নেহ জাগিলেও প্রথমটা তাকে যশোদার মনে হইয়াছিল, তুবড়ির মত উচ্ছ্বাস-ভরা অকালে পাকা ফাজিল মেয়ে। তারপর ক্রমে ক্রমে যশোদা বুঝিতে পারিয়াছে, কথা বলা ছাড়া আর কোন বিষয়ে সে তুবড়ি-ধর্ম্মী নয়। ঠেকিয়া শেখা অভিজ্ঞতার পরিমাণটা তার অস্বাভাবিক রকমের বেশী নয়, কেবল দেখিয়া-শেখা অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের স্বভাবসিদ্ধ পটুতার জন্য জ্ঞানের ভাণ্ডারটা বেশীরকম ভরিয়া ওঠায় তাকে একটু পাকা মনে হয়, আসলে মেয়েটা কাঁচাই আছে। মনকে সঙ্কীর্ণ করার অপরাধে নিজেকে অপরাধী করে নাই বলিয়া সাহস ও সরলতা তার একটু বেশী, তাই তাকে মনে হয় ফাজিল।

রাজেনকে যশোদা বলে, 'না, এরা ঠিক ভদ্রলোক নয়।'

'দেখলে তো? এমন ভাড়াটে এনে দিয়েছি, দু'দিনে পছন্দ হয়ে গেল। কি তোমার ভাল লাগে না লাগে, সব জানা আছে চাঁদের-মা!'

যশোদা হাসিয়া বলে, 'মনের মানুষ তুমি, তুমি জানবে না তো কে জানবে?'

কাছে বসিয়া কুমুদিনী মুখ বাঁকায়। ধনঞ্জয় অসহায় দৃষ্টিতে যশোদার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে।

সুব্রতার সুঠাম দেহ আর সুন্দর মুখখানা দেখিয়া একটা কথা যশোদার বার বার মনে পড়িয়া যায়। বাড়ীর লোকের পছন্দ করা কুরূপা মেয়েটির বদলে তাকে বিবাহ করিয়া অজিত যে গোলমাল সৃষ্টি করিয়াছে যশোদাকে প্রথম দিন তাই ব্যাখ্যা করিয়া শোনানোর সময় অজিতকে হাসিতে দেখিয়া সুব্রতা সবিনয়ে ঘোষণা করিয়াছিল, সে সুন্দরী বটে কিন্তু তার মত গণ্ডা-গণ্ডা সুন্দরী মেয়ে রাস্তাঘাটে গড়াগড়ি যাইতেছে। সুব্রতার কথা আর ভঙ্গিকে তখন যশোদার মনে হইয়াছিল, একেলে মেয়ের পাকামির প্যাঁচ, ঘষামাজা ন্যাকামি। তারপর যশোদা জানিতে পারিয়াছে মেয়েদের পক্ষে এ বিশ্বাস পোষণ যতই বিস্ময়কর হোক, কথাটায় সুব্রতা সত্য-সত্যই বিশ্বাস করে। তার মত রূপবতী মেয়ের পক্ষে নিজের রূপ সম্বন্ধে এমন একটা ধারণা আন্তরিকতার সহিত পোষণ করা যে সম্ভব, এ অভিজ্ঞতা যশোদার ছিল না। রাম-লক্ষ্মণের মন ভুলানোর প্রতিযোগিতায় সীতা-উর্মিলার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে এ বিশ্বাস যে সূর্পণখার ছিল, সে তো সে স্ত্রীজাতীয়া জীব বলিয়াই!

স্নেহ করার সঙ্গে সুব্রতাকে যশোদা তাই একটু শ্রদ্ধাও করিতে শিখিয়াছে।

চার

সুব্রতার চরিত্রের আরেকটা দিকও ক্রমে ক্রমে যশোদার কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিল। মেয়েটা খুব মিশুক।

যশোদা আর কুমুদিনীর সঙ্গে ভাব জমিয়াছিল একদিনে, পাড়ার কয়েকটি বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গেও সে ভাব জমাইয়া ফেলিল কয়েকদিনের মধ্যে।

প্রথমে পরিচয় করিতে গেল সব চেয়ে কাছের বাড়ীর এবং সম্ভবতঃ ছোটখাট একটা পরিধির মধ্যে সবচেয়ে গরীব ও অতি-ভদ্র পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে। পরিবারটি অমূল্য নামে একজন বছর পঞ্চাশেক বয়সের রোগজীর্ণ কেরাণী ভদ্রলোকের। যশোদার সঙ্গে এবাড়ীর মেয়েদের ঘনিষ্ঠতা না থাকিলেও পরিচয় আছে অনেকদিনের। পরদিনই ওবাড়ীর সাত হইতে চল্লিশ পর্য্যন্ত বিভিন্ন বয়সের আটজন মেয়ে যশোদার বাড়ী বেড়াইতে আসিল। সাত বছর বয়সের মেয়েটির রঙীন কাপড় পরার ভঙ্গি দেখিয়া মনে হইল, যৌবনে পা দিয়া তাড়াতাড়ি দলের তিনটি তরুণী মেয়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে যেন তার তর সহিতেছে না।

অনেকদিন আগে অমূল্যর বাড়ীর মেয়েরা দু'একবার যশোদার বাড়ী বেড়াইতে আসিয়াছিল। যশোদা তখনও কুলি-মজুরদের বাড়ীতে ভাড়াটে রাখিতে আরম্ভ করে নাই। তারপর নানা আপদে বিপদে মাঝে মাঝে যশোদাকে তারা ডাকিয়াছে বটে, কিন্তু যশোদার বাড়ীতে কখনো আসে নাই। আজও তারা যশোদার কাছে আসে নাই, আসিয়াছে সুব্রতার নতুন সংসার দেখিতে।

অমূল্যর স্ত্রী আশাপূর্ণা পান চিবাইতে চিবাইতে বলিল, 'আমরা এলাম। কই, তোমার নতুন ভাড়াটে চাঁদের-মা ?'

যশোদা বলিল, 'আমার নতুন ভাড়াটেকে খুঁজছ পাঁচুর মা ? এসো, বসবে এসো।'

আশাপূর্ণার পান চিবান বন্ধ হইয়া গেল। এতকাল কুলি-মজুরের সঙ্গে কারবার করিয়া প্রায় তাদের মত বনিয়া গিয়া এখনো তাকে সমানের মত সম্বোধন করার মত ভদ্রতা যশোদার কাছে, সে তা কল্পনাও করে নাই।

কয়েক মাসের মধ্যে দেখা গেল যশোদার বাড়ীতে দুপুরবেলা রীতিমত মেয়েদের বৈঠক বসিতে আরম্ভ করিয়াছে। দু'একটি মেয়ে নয়, উকিল, ডাক্তার, মাষ্টার, প্রফেসর, কেরাণী, জীবনবীমার এজেন্ট প্রভৃতি অনেক রকম ভদ্রলোকের বাড়ীর অনেক মেয়ে। সকলের বাড়ী যে খুব কাছে তাও নয়। বড় রাস্তার ধারের কয়েকটি বাড়ীতে পর্য্যন্ত সুব্রতা তার পরিচয়ের অভিযান আগাইয়া নিয়া গিয়াছে।

হাসি-গল্প গান-বাজনায় যশোদার বাড়ী দুপুরবেলা মুখরিত হইয়া ওঠে।

সুব্রতা মোটামুটি গান জানে, একটি হারমোনিয়াম আর একটি সেতার তার সঙ্গেই আসিয়াছিল। তারপর কয়েক জোড়া তাস আসিয়াছে, নগেন ডাক্তারের বাড়ীর ক্যারাম বোর্ডটি আসিয়াছে। একটি করিয়া মুখ আর পরচর্চ্চার মাল-মসলা তো সকলে সঙ্গে করিয়াই আনে।

একটা আড্ডা পাইয়া সকলেই খুসী। সুব্রতা যেন মেয়েদের একটা ছোট-খাট ক্লাব সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছে। কাজটা পাড়ার যে কোন বাড়ীর যে কোন মেয়ে ইচ্ছা করলেই করিতে পারিত কিন্তু এতদিন কারও খেয়ালও হয় নাই যে মাঝে মাঝে এ-বাড়ী ও-বাড়ী করার বদলে এক জায়গায় সকলে এক সঙ্গে মিলিয়া পাড়াবেড়ানোর সাধ মিটাইবার এরকম একটা সহজ উপায় আছে। অবশ্য নিজের বাড়ীতে রোজ এতগুলি মেয়েমানুষের সমাগম সকলের পছন্দ হইত না। তবে একত্র হইতে চাহিলে কি আর স্থানের অভাব হয়!

প্রথম প্রথম কেউ আসিয়াছিল নিছক ভদ্রতার খাতিরে, কেউ মনের খেয়ালে, কেউ কৌতূহলের বশে। আসিবার আগে কেউ ভাবেও নাই যে, তাদের জন্য তাদের নিয়াই সুব্রতা যশোদার বাড়ীতে এমন একটি আকর্ষণ সৃষ্টি করিতেছে।

অল্পদিনে সুব্রতার নামহীন, উদ্দেশ্যহীন, কমিটি প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারীহীন মহিলা সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিল। যশোদা রাগ করিবে কি খুসী হইবে বুঝিয়া উঠিবার সময়ও পাইল না। ব্যাপারটা ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবার আগে নিজেই সে সঙ্ঘে যোগ দিয়া বসিল। নানাবয়সী মেয়েদের মধ্যে প্রয়োজনীয় শ্রেণী বিভাগের জন্য সুব্রতাকে যে কৌশল অবলম্বন করিতে হইল, এটা হইল তার ফল।

'গরু আর বাছুর একসঙ্গে বসলে কি জমে দিদি?'

'না দিদি, জমে না।'

'কাল ত'াহলে আমি বিনু, উমি, সাবু এদের আমার ঘরে ডেকে নিয়ে যাব, তুমি বড়দের নিয়ে বসবার ঘরটাতে থাকবে, কেমন?'

সুব্রতা ভাড়া নিয়াছে একটি ঘর, কিন্তু মেয়েদের বসানোর জন্য আরেকটি ঘরকে বসিবার ঘরে পরিণত করিতে তার বাধে নাই। যশোদাকে জিজ্ঞাসা করাও দরকার মনে করে নাই।

তারপর যশোদা বয়স্কাদের আসরে ভিড়িয়া গিয়াছে। কেউ মোটা, কেউ রোগা, কেউ দু'য়ের মাঝামাঝি, কিন্তু সকলেই শিথিল। কেউ এখনো সচেতন গর্ব্বের সঙ্গেই ফর্সা চামড়ার স্তিমিত রূপের ঝাঁঝ বিকীর্ণ করিতেছে, রূপের অভাবে আসিয়া-যাওয়ায় বয়সটা পার হইয়া কেউ স্বস্তি বোধ করিতেছে। কারও গায়ে গয়না বেশী, কারও গায়ে কম গয়নার ফ্যাসন গয়নার চেয়ে স্পষ্ট। কারও মুখে পান, কারও মুখে ভাঙ্গা-বাঁকা দাঁতগুলি রোজ সকালে কয়লার গুঁড়ার ঘষামাজা পায় বলিয়া বেশ সাদা।

কয়েকটি মুখ যশোদার অপরিচিত। চারিদিকে অনেক নতুন বাড়ী উঠিয়াছে, অনেক নতুন লোক সহরতলীতে বাস করিতে আসিয়াছে। সুব্রতা হয়তো এতদূর হইতে দু'একজনকে টানিয়া আনিয়াছে, সহরতলীর পুরানো বাসিন্দা হইলেও যার মুখ চেনার সুযোগ যশোদার ঘটে নাই। চেনা হোক, অচেনা হোক, যশোদা এদের চেনে। এরা সকলেই মধ্যবিত্ত ভদ্র পরিবারের গিন্নি। কপালে থাকিলে যশোদা নিজেই হয়তো এতদিনে এদের মত একজন গিন্নি হইয়া দাঁড়াইত।

কিন্তু কোথায় যশোদার চাঁদ? আত্মীয়-স্বজনভরা সংসার? সংসার না থাকিলে কি গিন্নি হওয়া চলে! মজুরদের নিয়া সে সংসার গড়িয়া গিন্নী হইয়া বসিয়াছিল, সত্যপ্রিয় সে সংসারও তার ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।

যশোদার দুঃখ কষ্ট অভাব অভিযোগ রাগ দ্বেষ হিংসা গ্লানি সব কিছুর উপর চিরদিন স্থায়ী একটা প্রলেপ থাকিত—মজা লাগার। জিভের ঘায়ে মধুমাখা মলমের প্রলেপের মত। সেই প্রলেপের অভাবে যশোদার মনের সবগুলি আঘাতের ক্ষত আজকাল কটকট করে।

যশোদার কিছুই করিবার নাই।

সর্ব্বদা পরের বিপদ ঘাড়ে করা, পরের সমস্যার মীমাংসা করা, বাঁচিয়া থাকার মর্ম্মান্তিক প্রচেষ্টায় আহত অনেকগুলি অশিক্ষিত ও অমার্জ্জিত বয়স্ক শিশুর সেবায় মসগুল থাকা, সব ঘুচিয়া গিয়াছে। রাজেন তাই তাকে শ্রমিক নেতার কাজে টানিয়া নিয়া গিয়াছে, বাড়ীতে ভাড়াটে আনিয়া দিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। যা নিয়া যশোদা ছেলের শোক ভুলিয়াছিল,

আত্মীয় পরিজনের অভাব ভুলিয়াছিল, নিজেকে বিকাশ করার সুযোগ পাইয়াছিল, এসব কৃত্রিম খেলনায় কি সে অভাব মেটে ?

অপরের দেখাইয়া দেওয়া আদর্শের দিকে অপরের সৃষ্টি কর্ম্মের নালায় জীবনস্রোতকে বহাইয়া দিবার সাধ যশোদার কোনদিন ছিল না। ওসব তার ধাতে সহ্য হয় না। সে যেমন আর তার যা আছে তেমনি থাকিয়া আর সেই সব নিয়া অনেকগুলি পছন্দসই পরের জীবনের ঘনিষ্ঠ আবেষ্টনীর মধ্যে সে নিজের নিয়মে বাঁচিতে চায়।

ভদ্রলোক নামে যে একশ্রেণীর মানুষ আছে তাদের পুত্রকন্যা প্রসব করিয়া আর সংসার চালাইয়া মাঝ বয়সেই যেসব গিন্নিদের দেহ, মন, মুখ, এমন কি শাড়ীর আঁচল আর ব্লাউজ সেমিজ পর্য্যন্ত শিথিল হইয়া গিয়াছে, তাদের সঙ্গে কয়েকটা দুপুর আড্ডা দিয়া যশোদার হাঁপ ধরিয়া যাওয়া উচিত ছিল। তার বদলে হঠাৎ সে যেন আহত মনের ক্ষতে মিষ্টি মলমের মৃদু একটা স্বাদ অনুভব করিতে লাগিল।

তার বাড়ীতে আসিয়া তার ঘরে বসিয়া একেবারে তার চোখের সামনে পাড়ার এতগুলি স্ত্রীলোক নিজেদের শ্যাওলা ধরা জীবন মেলিয়া ধরে আর উপেক্ষা, অবহেলা বা বিতৃষ্ণার বদলে যশোদার মনে জাগে মমতা। অজানা কিছু নয়, নতুন কিছু নয়। যশোদা এদের জানে, এদের জীবন যাত্রার পরিচয়ও রাখে। এদের দূরেও সে রাখিত সেই জন্যই। তবে দূরে রাখিয়া মোটামুটি ধারণা পোষণ করা এক কথা। একঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘনিষ্ঠভাবে বসিয়া অসংখ্য খুঁটিনাটি বিকৃতি আর ব্যর্থতা আবিষ্কার করিয়া মমতা বোধ করার সঙ্গে তার অনেক পার্থক্য।

কেবল অসুখের সময় গিয়া সেবা করিয়া, বিপদের সময় গিয়া সাহস দিয়া আর আর উৎসবের সময় গিয়া খাটিয়া আসিয়া যশোদা যেন ভুলিয়াই গিয়াছিল যে এরাও মানুষ।

চাঁদ মরিয়া যাওয়ার পর সে যেমন ডাকছাড়িয়া কাঁদিয়াছিল, নগেন ডাক্তারের ফর্সা মোটা বৌ অতসী ছেলের শোকে তেমনিভাবে কাঁদিয়াছে।

অতসীর এখনো তিনটি ছেলে আর দু'টি মেয়ে আছে। বড় ছেলে রমেন ডাক্তারি পড়ে। বড় ম্লান মুখখানা ছেলেটার, বড় বিষণ্ণ স্তিমিত দৃষ্টি।

দেখিলেই যশোদার মনটা কেমন করিয়া ওঠে। ক'দিন আগে দুপুরবেলা কি দরকারে সে মাকে ডাকিতে আসিয়াছিল, তখন তার চোখে যশোদা যেন দেখিতে পাইয়াছিল, একটা চাপা-পড়া লাজুক ভাবপ্রবণ ক্ষুধা।

'বলগে যা, আসছি' বলিয়া ছেলেকে বিদায় দিয়া হাতের তাস নামাইয়া সকলের দিকে চাহিয়া অতসী তৃপ্তির হাসি হাসিয়াছিল,—সগর্ব্বে।—'আর বছর ডাক্তারি পাশ করবে। এক বাড়ীতে দুজন ডাক্তার হবে, রুগীকে আর ফিরতে হবে না—একজন বাড়ী না থাক আরেকজন তো থাকবে, কি বলেন? পাশ করেই অবিশ্যি ওনার মত চার টাকা ফি করলে চলবে না, প্রথম দু'চার বছর দু'টাকা করে, তারপর পশার বাড়লে চার টাকা। উনি হয়তো তদ্দিনে আট টাকা ফি করে ফেলবেন, এখন থেকেই বলছেন, চার টাকায় আর পোষায় না—'

নন্দর কাছে রমেন কীর্ত্তন শিখিতে আসিত। তখনও তাকে দেখিয়া যশোদার মনে হইত, ডাক্তারি বিদ্যার চাপে ছেলেটা যেন দিন দিন কুঁকড়াইয়া যাইতেছে। দেহতত্ত্ব জিজ্ঞাসু বৈষ্ণবের ছাঁচে ঢালিয়া মানুষ করিয়া ছেলেকে মড়া কাটিতে পাঠানোর জন্য অতসীর গর্ব্ব দেখিয়া একটা দুর্ব্বোধ্য বন্ধনের অনুভূতিতে যশোদাকে ব্যাকুলভাবে একবার জোরে শ্বাস টানিতে হইয়াছিল।

সন্ধ্যার পর যশোদার মনে হইয়াছিল, কেবল রমেন তো নয়। সুন্দরী বড় মেয়েটাকে আই. সি. এস. বরের উপযোগী লেখাপড়া চালচলন শিখাইয়া তার চেয়ে অশিক্ষিত মাঝ বয়সী গেঁয়ো রাজার রাণী করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

কেবল অতসীও তো নয়। একে একে অন্য গিন্নিদের ছেলেমেয়ের কথাও যশোদার মনে পড়িয়াছিল। মনে হইয়াছিল, যেন এক ধরণের জীবন যাপনের জন্য সকলেই যেন অন্য ধরণের জীবন যাপনের উপযোগী করিয়া ছেলেমেয়ে-গুলিকে মানুষ করে।

যশোদা বড়ই মমতা বোধ করিয়াছিল। এদিক দিয়া কুলি-মজুরেরাও ভাল। আধমরা পশুর মত জীবন হোক, ছেলেমেয়েগুলি তাদের আধমরা পশুর মত জীবন যাপনের জন্যই জন্ম হইতে তৈরী হয়।

সুকুমার উকিলের স্ত্রী বনলতাও ফর্সা এবং মোটা। সর্ব্বদা পান খায়। সুযোগ পাওয়া মাত্র রোয়াকে দাঁড়াইয়া মুখভরা পান চিবাইতে চিবাইতে চুপি চুপি সে যশোদাকে বলে, 'চার টাকা না চারশো টাকা! যা মুখে আসে বললেই

হল। পশার তো ভারি, সারাদিন হাঁ করে বসে থাকে রুগীর জন্য, একটা টাকা দিলেই ছুটে আসবে। চারটাকা কোথায় আদায় করে জানো চাঁদের-মা? অন্য ডাক্তার ডাকবার সময় নেই, এদিকে রুগীর যায় যায় অবস্থা, তখন। আবার বলে আট টাকা করবে! এমন হাসি পায় মাগীর কথা শুনলে।'

হাসিবার জন্যই বোধ হয় যশোদার ঝকঝকে উঠানের একটা কোণ পিক ফেলিয়া ভাসাইয়া দেয়। তিন চার দিন আগে অতসী তার ডাক্তার স্বামীর ফির সম্পর্কে কথা বলিয়াছিল, যশোদার কাছে সে কথার ফাঁকি ধরাইয়া দেওয়ার জন্য আজ পর্য্যন্ত বনলতা সযত্নে কথাগুলি মনের মধ্যে পুষিয়া রাখিয়াছে। এমনি চুপি চুপি আরও কত জনকে বলিয়াছে কে জানে, হয়তো আরও সপ্তাহখানেক ধরিয়া বলিয়াই চলিবে।

যেখানে সেখানে পানের পিক ফেলার স্বভাবের জন্য একটা কড়া কথা বলিতে গিয়া যশোদা চুপ করিয়া গেল। হঠাৎ তার মনে হইয়াছে, বনলতার মাথাটা যেন একটু খারাপ। বাড়ীতে যারা আসিতেছে তাদের সকলের মানসিক অবস্থাই কমবেশী অস্বাভাবিক, কিন্তু বনলতার মন যেন স্বাভাবিকতার স্তর পার হইয়া একটু বেশী রকম আগাইয়া গিয়াছে।

অতসীর সঙ্গে বনলতার খুব ভাব, তাস খেলার লড়াই-এ প্রায় রোজই তারা দু'জনে মিলিয়া একটি পক্ষ গঠন করে। বনলতা কথা বলে না অনুরূপার সঙ্গে। অনুরূপা প্রফেসর সুনীল সেনের স্ত্রী। মানুষটা একটু হাবাগোবা ধরণের, বড়ই নিরীহ। যে যা বলে তাই সে মানিয়া নেয়, কারও সঙ্গে ঝগড়া করে না। এরকম গোবেচারা মানুষের সঙ্গে বনলতার কথা বন্ধ করার কারণটা যশোদা কোন মতেই ভাবিয়া পায় না।

এরকম খাপছাড়া যুক্তিহীন ব্যাপার যশোদাকে পীড়া দেয়। কতকটা নিজের বিরক্তি দূর করিবার উদ্দেশ্যেই সে ভাবে, কারণ যাই থাক, দু'জনের মধ্যে ভাব করাইয়া দিলে দোষ কি?

জিজ্ঞাসা করিতে বনলতা বলে, 'কথা বলব না কেন, বলি তো?'

যশোদা বুঝিতে পারে অনুরূপার সঙ্গে সে যে কথা বলে না তাও বনলতা স্বীকার করবে না, কথাও বলিবে না। এ চাল যশোদা জানে, তাই বনলতার সঙ্গে সময় নষ্ট না করিয়া সে ধীরে ধীরে অনুরূপার পাশে গিয়া বসে, বনলতা

পিক ফেলিতে উঠিয়া গেলে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করে, 'সেন গিন্নির সঙ্গে বুঝি আপনার বনে না?'

অনুরূপা অপরাধীর মত ভয়ে ভয়ে বলে, 'বনবে না কেন, তবে কি জানেন—'

সুব্রতার ঘরে তখন মধুর কণ্ঠে গান আরম্ভ হইয়াছে। অনুরূপার মেয়ে অলকা চমৎকার গান গায়। বড় রাস্তার কাছাকাছি সামনে ছোট বাগানওয়ালা দোতলা বাড়ীটিতে তারা উঠিয়া আসিয়াছে বছরখানেক আগে এবং আসিয়াই অলকা পাড়ার গায়িকাদের খ্যাতি ম্লান করিয়া দিয়াছে।

'আপনার মেয়ে বড় সুন্দর গান গায়' অনুরূপাকে এই কথা বলিবার জন্য যশোদা মুখ খুলিয়াছে, পিক ফেলিয়া আসিয়া পানের পিকের মতই মুখ লাল করিয়া বনলতা উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে বলে, 'ওই রে, ছুঁড়ি আবার গান ধরেছে! শুনছেন? ফের প্যানপ্যানানি সুরু করেছে।'

অবিনাশ চাটুয্যের বৌ প্রভা মিনতি করিয়া বলে, 'আহা, একটু শুনতে দিন না?'

বনলতা যেন ক্ষেপিয়া যায়।—'কি শুনবে ভাই? ওকি গান নাকি? মিন মিন করে কাঁদলেই যদি গান হ'ত—'

ইনস্যুরেন্স এজেন্ট জগদীশের দ্বিতীয়পক্ষের বৌ অমলা হঠাৎ বলিয়া বসে, 'খুকুর চেয়ে তো ভাল গায়।'

বনলতা ধপাস করিয়া বসিয়া পড়ে।—'খুকুর চেয়ে ভাল গায়? এত বড় বড় ওস্তাদ রেখে খুকুকে গান শেখালাম, খুকুর চেয়ে ভাল গায়?'

বনলতা হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করে। কাঁদিতে কাঁদিতে মেঝেতে শুইয়া পড়িয়া গড়াগড়ি দেয়।

অতসী তীব্র ভৎর্সনার সুরে অমলাকে বলে, 'ওর পেছনে লাগবার কি দরকার ছিল আপনার?'

এই সব গোলমালের মধ্যে ওঘরে গান বন্ধ হইয়া যায় এবং যশোদা এক গেলাস জল আনিয়া বনলতার তালুতে একটু একটু করিয়া থাপড়াইতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে বনলতা শান্ত হইয়া উঠিয়া বসে।

যশোদা জানে এ শুধু ঈর্ষা আর অহঙ্কারের ব্যাপার নয়, নিজের মেয়ের চেয়ে অন্য একজনের মেয়ে ভাল গান গায় বলিয়া সুস্থ মানুষ এরকম করে

না। ভিতরে বিকার আছে আর সেই বিকার এই রকম খাপছাড়া উপলক্ষ্য অবলম্বন করিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

এ ধরণের বিকার শুধু এদের মধ্যেই দেখা যায়, কুলি-মজুরদের বৌ-রা এ হিষ্টিরিয়ার ধার ধারে না। অভাবের চাপে আর ঝাঁঝাঁলো নিষ্ঠুর বাস্তবতার তাপে তারা শুকাইয়া যায়, এদের মত পচিতে সুরু করে না।

যশোদার চিন্তিতভাবকে সুব্রতার মনে হয় গাম্ভীর্য্য। সন্ধ্যার পর মন খারাপ করিয়া সে জিজ্ঞাসা করে, 'কি ভাবছ দিদি?'

যশোদা প্রথমে বলে, 'ভাবছি? কই, কিছুই তো ভাবছি না ভাই?' তারপর বলে, 'ও, হ্যাঁ, একটা কথা ভাবছি। মেয়েদের গান শেখাবার ইস্কুলের মত করলে হয় না একটা? ঘরোয়া ইস্কুলের মত, মাইনে টাইনের দরকার নেই, দুপুরবেলা পাড়ার মেয়েরা এসে গান শিখে যাবে। যন্ত্রপাতি কিনবার যদি দরকার হয় তখন বরং সকলের কাছ থেকে চাঁদার মত কিছু কিছু নিলেই হবে। কি বল?'

প্রস্তাবটি শুনিয়াই সুব্রতা খুসী হইয়া ওঠে, 'নিশ্চয়, ঠিক্। আমিও ভাবছিলাম ওই রকম কিছু করতে হবে। বসে বসে শুধু গল্প করলে চলবে কেন?'

'তুমি, অলকা আর খুকু গান শেখাবে।'

'অলকা আর খুকু?' সুব্রতার মুখে দুর্ভাবনা ঘনাইয়া আসে, 'তবেই তো মুস্কিল!'

যশোদা হাসিয়া বলে, 'সে আমি ঠিক করে দেব।'

প্রথমে যশোদা গেল প্রফেসর সুনীল সেনের বাড়ী। অনুরূপা তার সব কথাতেই সায় দিয়া গেল, সব প্রস্তাবেই রাজী হইয়া গেল। কেবল অলকা একটু মুখ ভার করিয়া বলিল, 'খুকু আর আমি? ও মেয়েটা বড় হিংসুটে।'

কিন্তু যশোদার কাছে এতটুকু মেয়ে কেন মুখ ভার করিয়া থাকিতে পারিবে, বিশেষতঃ নিজের তাগিদে একটা করার ভার গ্রহণ করিয়া হঠাৎ যখন যশোদার শরীর মন হাল্কা মনে হইতে আরম্ভ করিয়াছে? অলকাকে জয় করিতে তার কয়েক মিনিট সময় মোটে লাগে। খুকু তো ঠিক হিংসুটে নয়, বোকা।

তাছাড়া, অলকার গান শুনিয়া গান জানা কোন্ মেয়ের না হিংসা হয় ?

'খুকুকে না ডাকলেও তো চলবে না দিদি! সারেগামা শেখানো, গলা সাধানো, সোজা গান শেখানো এসব তো একজনের করা চাই ? এমন গান করো তুমি, তোমায় কি এসবের জন্য বলতে পারি ? তোমার সময়ই বা কই ? মাঝে মাঝে তুমি গিয়ে দু'একখানা ভাল গান শেখাবে, বাস—!'

তেল মাখাইতেও যশোদা কম পটু নয়, গর্ব্বে আর আনন্দে অলকার মুখখানা তেল মাখানো মুখের মতই চকচক করিতে থাকে।

তখন যশোদা যায় বনলতার বাড়ী, মা ও মেয়েকে বুঝাইয়া বলে,— 'আসলে খুকুই আমাদের গান শেখাবে, সব ভার থাকবে খুকুর ওপরে। অলকা মাঝে মাঝে আসে তো আসবে, দু'একখানা গান শিখিয়ে যাবে। মিহি গলা থাকলেই তো গান শেখানো যায় না, গান শেখাতে হলে সুর তাল শেখাতে হয়, নয় দিদি ?'

খুকু গদগদ ভাবে বলে, 'আরও কত কি আছে—গান শেখা কি সহজ!'

একটি হারমোনিয়ম, একটি এস্রাজ আর পাঁচ ছ'টি ছাত্রী নিয়া যশোদার ঘরোয়া সঙ্গীত বিদ্যালয় আরম্ভ হয়। সকলের যে খুব বেশী উৎসাহ জাগিয়াছে তা নয়, সকলে ভাবিতেছে, যশোদার মতলবটা কি ? কিন্তু যশোদা জানে বিনা পয়সায় মেয়েদের গান শেখানোর সুযোগ কেউ ছাড়িবে না, মেয়েদের গান বাজনার চর্চ্চা যারা পছন্দ করে না তারাও নয়। দু'চার দিনের মধ্যে ছোট বড় মেয়ের ভিড়ে তার ঘর ভরিয়া উঠিবে। এই তো সবে সুরু।

সকলেই আজ এক ঘরে। অন্য সকলে এলোমেলো ভাবে যে যেখানে পারে বসিয়াছে, একটি আস্ত পাটি কেবল ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে গানের শিক্ষয়িত্রী আর ছাত্রীদের। হারমোনিয়মের একদিকে বসিয়াছে ছাত্রীরা, অন্যদিকে পরস্পরের যতটা পারে তফাতে সরিয়া বসিয়াছে অলকা আর খুকু। কিন্তু এত কাছে বসিয়া, একই কাজ করিতে বসিয়া, পরামর্শ না করিয়া চুপ চাপ শুধু বসিয়া থাকিলে চলিবে কেন ? বিশেষতঃ সকলে যখন কি ভাবে গান শেখানো আরম্ভ হয় দেখিবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে। তারা যে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে না, তাদের মায়েরাও বলে না, এটা তাই তখনকার মত তাদের ভুলিয়া যাইতে হয়।

প্রথমে অলকা বলে, 'কি শেখানো যায়? গান?'

তখন খুকু বলে, 'গলা কি করে সাধতে হয় শেখালে হতনা?'

অলকা বলে, 'গলা তো সাধবেই, একটা সোজাসুজি গান দিয়ে আরম্ভ করলে বোধ হয় ভাল হয়।'

খুকু বলে, 'একেবারে গান দিয়ে আরম্ভ করলে—'

পরামর্শের সুবিধার জন্য নিজেদের অজ্ঞাতসারেই তারা পরস্পরের একটু কাছে সরিয়া আসে।

ছয় সাতটি নানা পর্দ্দায় গলার বেমিল, বেসুরো, হঠাৎ-জাগা হঠাৎ-থামা আওয়াজে ঘরটা গম্‌গম্‌ করিতে থাকিলে যশোদা বনলতা আর অনুরূপার মুখের দিকে তাকায়। এই দু'টি জননীর মধ্যে ভাব জমানোর যে তুচ্ছ খেয়াল হইতে এই সুরচর্চ্চার উৎপত্তি হইয়াছে, যশোদা তা ভোলে নাই। সুরচর্চ্চা অবশ্য যশোদা আর থামিতে দিবে না, আরও ব্যাপক ও শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে চর্চ্চা করাইবে, কিন্তু ওদের দু'জনের ভাব হওয়াটা তো দরকার?

হঠাৎ যশোদা উঠিয়া যায়, ঘরের এক প্রান্ত হইতে হাত ধরিয়া অনুরূপাকে অন্যপ্রান্তে বনলতার কাছে টানিয়া আনে, বনলতার পাশে তাকে বসাইয়া দু'জনের হাতে হাত মিলাইয়া দিয়া আবেগ কম্পিত গলায় বলে, 'আপনাদের দু'টি মেয়েই রত্ন। ওদের জন্যই আমার সাধ মিটল। ওরা যদি আমার মেয়ে হত!'

বনলতা প্রায় কাঁদিয়া ফেলে।—'কত ওস্তাদ রেখে কত চেষ্টায় মেয়েকে আমি গান শিখিয়েছি!'

অনুরূপা বলে, 'আপনার মেয়ে সত্যি শেখার মত করেই শিখেছে।'

বনলতা কাঁদিয়া ফেলে।—'ওর গলাটা যদি তোমার মেয়ের মত মিষ্টি হ'ত ভাই!'

তিন মাসের মধ্যে পথের ওদিকে এবাড়ীর মুখোমুখি যশোদার অন্য বাড়ীতে একটি রীতিমত সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া গেল। বাড়ীর সামনে ছোট একটি কাঠের ফলকে নামটা লিখিয়া টাঙ্গাইয়া দেওয়াও হইল। বাড়ীটি যশোদা কোনদিন আর ভাড়া দিবে না ঠিক করিয়াছিল। তবে ভাড়া দেওয়া আর কাজে লাগানোর মধ্যে তফাৎ আছে।

বনলতা একদিন চুপি চুপি যশোদাকে বলে, ‘স্কুল তো দিব্যি চলছে চাঁদের-মা। খুকু তো প্রাণ দিয়ে খাটছে তোমার স্কুলের জন্য, এবার ওর জন্য কিছু ব্যবস্থা করে দাও?’ বনলতা পান চিবাইতে চিবাইতে হাসে, ‘মাইনের কথা বলছি না, অত খাটছে মেয়েটা, হাত খরচ বাবদ কিছু’—তারপর হঠাৎ হাসি বন্ধ করিয়া গম্ভীর হইয়া বলে, ‘ওস্তাদ রেখে গান শেখাতে জলের মত টাকা ঢেলেছি কিনা, তাই বলছি।’

তবু যশোদা ভুল করে না যে বনলতার মাথা আসলে সকলের চেয়ে বেশী খারাপ নয়।

পাঁচ

ছেলে বা জামাই কেউ সত্যপ্রিয়ের মনের মত নয়। আত্মীয়-পরিজন কেউ যে তার মনের মত তাও অবশ্য নয়, তবু সেটা কোনরকমে সহ্য হইয়া যায়। বড় ছেলে আর বড় মেয়ের জামাই যে তার অপদার্থ এই আপশোষ মাঝে-মাঝে মানুষটাকে একেবারে কাবু করিয়া ফেলে। সকলকে বড় বড় উপদেশ দেয়, মানুষের শিক্ষা-দীক্ষার মারাত্মক ত্রুটি আবিষ্কার করিয়া সকলকে জানাইয়া দেয়, মানুষকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিবার সহজ সরল পথ কি তাই নিয়া গবেষণা করে, আর তার ছেলে আর জামাই এমন! না জানি লোকে কি ভাবে? না জানি তার সব অকাট্য যুক্তিগুলিকে সকলে তার ছেলে আর জামাইয়ের কথা ভাবিয়া অনায়াসে কাটিয়া টুকরা-টুকরা করিয়া দেয় কিনা?

মেয়েটি সত্যপ্রিয়ের খুব সুশ্রী নয়, কিন্তু অনেক খুঁজিয়া অনেক টাকা খরচ করিয়া জামাই আনা হইয়াছে রূপবান। কি রঙ্ জামাইয়ের! যেন সোনার ওজনে সোনার পুতুলই সত্যপ্রিয় কিনিয়া আনিয়াছে মেয়ের জন্য।

একজন আত্মীয়, যে কখনো সত্যপ্রিয়ের কাছে টাকা প্রত্যাশা করে না, সত্যপ্রিয় যাচিয়া দিতে গেলেও বোধ হয় যে বিশেষ দরকারের সময়ও তার টাকা নিবে না,

সম্বন্ধ ঠিক করার সময় সে একবার বলিয়াছিল, 'আরেকটু চলনসই পাত্র আনলে হ'ত না ?'

সত্যপ্রিয় মুখ ভার করিয়া বলিয়াছিল, 'কেন ?'

'কি জান, তোমার মেয়েকে যদি ছেলেটির পছন্দ না হয় ? নিজের চেহারার জন্যেই এ সমস্ত ছেলের মাথা গরম হয়ে থাকে, টাকার লোভে যদি বা বিয়ে করে, খুব সুন্দরী মেয়ে না পেলে নিজের সঙ্গে মানায়নি ভেবে মনটা হয়তো খুঁত খুঁত করবে।'

'সবাই কি তোমার মত ভাবপ্রবণ ভাই !'

'তা মানুষ একটু ভাবপ্রবণ বৈকি। টাকা দিয়ে গরীবের ছেলে কিনছ, ছেলে তোমাদের সকলের অনুগত হয়ে থাকবে বটে, কিন্তু তাতে কি ছেলে আর মেয়ের মনের মিল হবে ? আর মনের মিল যদি না হ'ল—'

কিন্তু সত্যপ্রিয় বুঝিতে পারে নাই। সে যাকে কিনিয়া আনিতেছে, বাড়ীতে রাখিতেছে, জীবিকার উপায় করিয়া দিতেছে, তার মেয়ের মনে কষ্ট দেওয়ার মত স্পর্দ্ধা কখনও তার হইতে পারে ! বিবাহের এক বছরের মধ্যে মেয়ের মুখের হাসি নিভিয়া যাইতে দেখিয়া সে তাই অবাক হইয়া গিয়াছিল। তারপর তার চোখের সামনে চিরস্থায়ী বিষাদ মেয়ের মুখকে আশ্রয় করিয়াছে, কেমন যেন উদাস উদাস চাহনি হইয়াছে মেয়ের।

অথচ যামিনীর স্বভাব খুব নম্র, তার মত শান্তশিষ্ট নিরীহ গোবেচারী জামাই পাওয়াই কঠিন। সত্যপ্রিয়ের সঙ্গে কখনো মুখ তুলিয়া কথা বলে না। বাড়ীর কারো সঙ্গে কখনো তর্ক করে না। বৌ-এর সঙ্গে একটা দিনের জন্যও কোনদিন সে কলহ করিয়াছে বলিয়া কেউ শোনে নাই। চরিত্রও তার খারাপ নয়, হঠাৎ বড় লোকের জামাই হইয়া হাতে অনেক টাকা পাইয়াও বাহিরে স্ফূর্তি করার দিকে তার একটুকু টান দেখা যায় না।

তবে ? যোগমায়া মাঝে মাঝে লুকাইয়া লুকাইয়া কাঁদে কেন ?

নিরুপায় আপশোষে সত্যপ্রিয়ের হাত-পা কামড়াইতে ইচ্ছা করে। কিছুই করিবার নাই, কিছুই বলিবার নাই। যামিনী যদি মেয়েকে তার মারিত, মদ খাইয়া মাতলামি করিত, কিংবা অন্য কোন স্পষ্ট অপরাধে মেয়ের চোখের জল আনিত, সে তাকে উপদেশ দিতে পারিত, শাসন করিতে পারিত, চাপ দিয়া সিধা করিয়া দিতে পারিত। কিন্তু এখানে যে কোন প্যাঁচ পর্য্যন্ত

খাটানোর উপায় নাই। যামিনীর হাতখরচের টাকাটা কোন ছুতায় বন্ধ করিয়া দিলে কি কিছু লাভ হইবে? মেয়ের মনে বরং তাতে কষ্ট হইবে আরও বেশী।

তা ছাড়া সমস্যা তো ওরকম নয়। যে উদ্ধত নয় তাকে নরম করা চলিবে কেমন করিয়া?

একদিন যামিনীর একটু জ্বর হইয়াছে, সামান্য সর্দ্দিজ্বর, ব্যস্ত হওয়ার কিছুই ছিল না। কিন্তু সত্যপ্রিয় যেন ব্যাকুল হইয়া পড়িল। ব্যাকুল হওয়াটাই সত্যপ্রিয়ের পক্ষে খাপছাড়া ব্যাপার, এমন সামান্য ব্যাপারে তাকে ব্যাকুল হইতে দেখিয়া যামিনীও ভয় পাইয়া গেল যে, অসুখটা বুঝি তার ভয়ানক কিছুই হইয়াছে।

নিজে মোটরে করিয়া সত্যপ্রিয় যামিনীকে ডাক্তারের কাছে নিয়া গেল।

ফোনটা তুলিয়া নিয়া একটা করিয়া হুকুম দিলে যার বাড়ীতে ডাক্তারের ভিড় জমিয়া যাওয়ার কথা, জামাইকে দেখানোর জন্য সে নিজে ডাক্তারের বাড়ী যাইবে, এ ব্যাপারটা সকলের বড়ই অসাধারণ মনে হইল। ভাবিয়া-চিন্তিয়া সকলে ঠিক করিল, হয়তো যামিনীর এমন কোন অসুখ হইয়াছে যা পরীক্ষা করিতে বিশেষ কোন যন্ত্রপাতি লাগে, যে-সব যন্ত্রপাতি নিয়া ডাক্তারের বাড়ীতে আসিবার উপায় নাই। কিন্তু সত্যপ্রিয় নিজে গেল কেন? যদি বা গেল, কাউকে সঙ্গে নিল না কেন? এভাবে সে তো কখনো কোথাও যায় না!

ডাক্তারের বাড়ী দেখিয়া যামিনী অবাক। মারাত্মক রোগ হইয়াছে তার, মস্ত এক ডাক্তারের বাড়ীতে তাকে নিয়া যাওয়া হইতেছে, এই ভাবনায় মুখখানা যামিনীর সর্দ্দিজ্বরের টস্‌টসে ভাবের মধ্যেও শুকনো দেখাইতেছিল। কিন্তু বড় ডাক্তার কি গলির মধ্যে এমন একটা ছোট রঙ্-চটা বাড়ীতে থাকে, এমন চেহারা হয় তার বসিবার ঘরের? পুরানো একটা ওষুধের আলমারি, কয়েকখানা কাঠের চেয়ার আর একটা ময়লা কাপড়-ঢাকা কাঠের টেবিল, তাতে পাঁচ ছ'খানা ডাক্তারি বই। ঘরের মাঝখানে সবুজ রঙ-করা চটের পার্টিসন দেওয়া, তার ওপাশে বোধ হয় রোগীকে পরীক্ষা করা হয়।

ডাক্তার সম্ভবতঃ প্রতীক্ষা করিতেছিল, সত্যপ্রিয়কে দেখিয়া খুব বেশী বিস্মিত হইল না। কেবল মহাসমারোহে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, 'আসুন, আসুন, বসুন!'

একজন মাত্র রোগী বসিয়াছিল, পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়সের একটি যুবক। চেহারাটি শীর্ণকায়, চোখের নীচে কালিপড়া, মুখখানা তেলতেলা। তাকে

তাড়াতাড়ি বিদায় করার জন্য ডাক্তার বলিল, 'আচ্ছা, আপনি দিন সাতেক পরে আবার আসবেন। যা-যা বললাম করবেন আর ওষুধ দু'টো নিয়ম মতো খাবেন।'

'রাত্রে ঘুম হবে তো ডাক্তারবাবু?'

যুবকটির গলা খুব মোটা আর কর্কশ কিন্তু কি যে গভীর হতাশা তার প্রশ্ন আর প্রশ্নের ভঙ্গিতে! রাত্রির ঘুমের কথা ভাবিয়া, এখন, এই সকাল বেলাই, সে যেন আতঙ্কে আধমরা হইয়া গিয়াছে।

ডাক্তার বলিল, 'হবে। শোবার আগে যে ওষুধটা দিয়েছি, ওটাতেই ঘুম হবে। ঘুম যদি না হয় কাল সকালে একবার আসবেন।'

সত্যপ্রিয় বলিল, 'তোমার রাত্রে ঘুম হয় না?'

অপরিচিত মানুষের অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে ছেলেটি এমন করিয়া চম্‌কাইয়া উঠিল যেন স্নায়ুর কেন্দ্রে ঘা লাগিয়াছে, চোখের পলকে মুখখানা তার ফ্যাকাসে হইয়া গেল। সত্যপ্রিয়ের মুখের দিকে একনজর তাকাইয়াই চোখ নীচু করিয়া বলিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

সত্যপ্রিয় প্রচণ্ড একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'ছেলেবেলা থেকে ব্রহ্মচর্য্যের অভাব ঘটলে তো এরকম হবেই। কত ছেলে যে এমনি করে' আত্মহত্যা করছে! তাদেরি বা দোষ কি, সব শিক্ষার দোষ। মা বাপ যদি না খেয়াল রাখে, তারা ছেলেমানুষ, তাদের কি জ্ঞান বুদ্ধি আছে যে ভবিষ্যৎ ভেবে নিজেদের সাম্‌লে চলবে! কি বলেন ডাক্তার বাবু?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, তা বৈকি।'

ছেলেটি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'আচ্ছা, আজ আসি ডাক্তারবাবু।' বুঝা গেল, পালানোর জন্য সে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

সত্যপ্রিয় বলিল, 'বোসো একটু, তোমার ঘুমের জন্য একটা কথা বলে' দিই। ওষুধের চেয়ে এতে তোমার বেশী কাজ হবে। শোয়ার আগে এক কাজ করবে, মেঝেতে জোড়াসন হয়ে মেরুদণ্ড সিধা করে' বসবে। এইখানে তোমার নাভিপদ্ম আছে জানো বোধ হয়? এখানে বাঁ হাত দিয়ে এই ভাবে আস্তে স্পর্শ করে' থাকবে—আঙুলগুলি যেন সোজা থাকে আর পরস্পরের সঙ্গে লেগে থাকে, বুঝলে? ডান হাতটি এই ভাবে মাথার তালুতে রাখবে।

তারপর চোখ বন্ধ করে' ভাববে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে যত জীবিত প্রাণী আছে সব ধীরে-ধীরে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘরের দরজা বন্ধ করে' নিও, কেউ যেন ঘরে না আসে। আর—'

ছেলেটি কাতরভাবে বলিল, 'আজ্ঞে, আমার ঘরে আমার চারটি ভাই-বোন শোয়, আমার বাপ-মাও ওঘরে থাকেন। ঘরে সব সময় লোক থাকে।'

'অন্য ঘরে শোয়ার ব্যবস্থা করে' নিও।'

'আরেকটা ঘরে দাদা-বৌদি শোয়। আর ঘর নেই আমাদের।'

ছেলেটি আর দাঁড়াইল না, একরকম পলাইয়া গেল। এই অবহেলাতেই সত্যপ্রিয় জ্বালা বোধ করে সব চেয়ে বেশী। কেউ শুনিতে চায় না, তার এত দামী দামী কথাগুলি সাধ করিয়া কেউ ধৈর্য্য ধরিয়া শুনিতে চায় না। না শুনিয়া যাদের উপায় নাই শুধু তারা শোনে, অন্য সকলে পালানোর জন্য ছটফট করে। এত হাল্কা মানুষের মন? ডাক্তারের দিকে তাকাইয়া সত্যপ্রিয় বলিল, 'এই সব অপদার্থ ছেলের জন্যই দেশটা রসাতলে গেল।'

ডাক্তার সায় দিয়া বলিল, 'নিশ্চয়। ওদের কথা আর বলবেন না।'

তারপর পরীক্ষা হইল যামিনীর। তাকে সঙ্গে করিয়া চটের পার্টিসনের ওপাশে গিয়া মিনিট পনেরো পরে আবার ডাক্তার ফিরিয়া আসিল। যামিনীর সুন্দর মুখখানা তখন টুকটুকে লাল হইয়া গিয়াছে। এদিকে আসিয়া সে ঘাড় নীচু করিয়া সত্যপ্রিয়ের পিছনে দাঁড়াইয়া রহিল।

সত্যপ্রিয় বলিল, 'তুমি গাড়ীতে বোসো গিয়ে যামিনী। আমি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলে' আসছি।'

যামিনীকে পরীক্ষা করিল অজানা অচেনা গরীব এক ডাক্তার কিন্তু চিকিৎসা আরম্ভ করিল সত্যপ্রিয়ের পরিচিত মস্ত নাম-করা কবিরাজ। যামিনীর জন্য নানা অনুপানের সঙ্গে পাথরের খলে কবিরাজী বড়ি পেষণ করা হইতে লাগিল, অনেকরকম সুপাচ্য ও পুষ্টিকর পথ্যের ব্যবস্থা হইল।

ওষুধ ও পথ্যের ব্যবস্থা সত্যপ্রিয় সমস্তই মানিয়া নিল, কিন্তু একটা বিষয়ে কবিরাজের সঙ্গে তার মতের মিল হইল না। চিকিৎসার সময়টা যোগমায়াকে আত্মীয়ের কাছে পাঠাইয়া দেওয়ার প্রস্তাবে কবিরাজ ঘাড় নাড়িল।

'ভালর চেয়ে তাতে মন্দই বেশী হবে মনে হয়।'

কিন্তু চিকিৎসকেরও সব কথা স্বীকার করা সত্যপ্রিয়ের পক্ষে অসম্ভব, এ-যুগের চিকিৎসকেরা কি জানে? জানিলেও সত্যপ্রিয়ের চেয়ে তো বেশী জানে না!

'ব্রহ্মচর্য্য পালন না করলে শুধু ওষুধ আর পথ্যে কি ফল হবে কব্‌রেজ মশায়?'

কবিরাজ মৃদু হাসিয়া বলিল, 'স্বামী-স্ত্রীকে গায়ের জোরে তফাৎ করলেই কি ব্রহ্মচর্য পালনের ব্যবস্থা হয়ে যায়? ওদের দেখা-সাক্ষাৎ হ'তে না দিলে ফলটা খারাপ হবে।'

ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া কবিরাজ একটু ভাবিল, তারপর বলিল, 'তা ছাড়া, আমার মনে হয় সবটাই আপনার অনুমান, আপনার জামায়ের কোন চিকিৎসার দরকার ছিল না। শ্রীমানের স্বাস্থ্য তো এমন-কিছু খারাপ নয়। ওর মানসিক স্বাস্থ্যই বরং একটু খারাপ যাচ্ছে।'

'তা বলতে কি বুঝাচ্ছেন?'

'বুঝাচ্ছি যে শ্রীমানের মনটা একটু বিকারগ্রস্থ, কোন আঘাতটাঘাত পেয়েছে মনে কিংবা অনেকদিন থেকে কোন দুঃখকষ্ট সহ্য করে' আসছে। ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা না করে' খুব হৈ-চৈ ফূর্ত্তি করে' দিন কাটাবার ব্যবস্থা করলেই বোধ হয় ভাল হ'ত।'

'হৈ-চৈ ফূর্ত্তিটা কি রকম?'

'এই মনের আনন্দে থাকা আর কি। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে হাসিতামাসা করা, খেলা-ধূলা ভাল লাগলে তাই করা, দেশটেশ বেড়ানো, ভাল লাগলে শিকার-টিকারে যাওয়া—কি জানেন, সবাইকার তো এক জিনিষ পছন্দ নয়, যার যেদিকে মন যায়। একেবারে মদটদ খেয়ে গোল্লায় যাবার ব্যাপার যদি না হয়, বেশী বাঁধাবাঁধির চেয়ে অল্পবিস্তর অসংযমও ভাল। শ্রীমান বড় বেশী ভয়ে-ভাবনায় দিন কাটায়—'

'কিসের ভয় ভাবনা?'

সত্যপ্রিয়ের মুখ দেখিয়া কবিরাজ কথার মোড় ঘুরাইয়া নিল। যে চিকিৎসা চায় উপদেশ চায় না, তাকে যাচিয়া উপদেশ দিয়া লাভ কি!

কবিরাজের সঙ্গে আলোচনার কয়েকদিন পরেই সত্যপ্রিয় মেয়েকে দেশে

পাঠানোর আয়োজন করে। দেশের বাড়ীতে আত্মীয়স্বজন আছে। সত্যপ্রিয়ের এক পিসতুতো বোন স্বামীপুত্র নিয়া অনেকদিন হইতে এখানে আছে, হঠাৎ তার দেশে গিয়া বাস করার সখ চাপিল। সত্যপ্রিয়ের ঈঙ্গিতে অনেকের মনে অনেকরকম সখই জাগিয়া থাকে। ঠিক হয়, যোগমায়াও এদের সঙ্গে যাইবে।

প্রথমে যোগমায়া কথাটা হাসিয়াই উড়াইয়া দেয়, তারপর যখন বুঝিতে পারে তাকে দেশে পাঠানোর ইচ্ছাটা সত্যপ্রিয়ের, তখন সে মুখ ভার করিয়া বলে, 'না বাবা, আমি এখন কোথাও যাব না'

সত্যপ্রিয় বলে, 'ক'দিন বেড়িয়ে আয়। বিয়ের পর দেশের সবাই তোকে দেখতে চাচ্ছে।'

শুনিয়া যোগমায়া আর আপত্তি করে না। মেয়ে-জামাইকে দেশের আত্মীয়-স্বজনকে দেখাইবার ইচ্ছা যদি সত্যপ্রিয়ের হইয়া থাকে, সে তো ভাল কথা। স্বামীর সঙ্গে সর্ব্বত্র যাইতেই সে রাজী আছে।

'দুশো টাকা দেবে বাবা আমায় ?'

'বিয়ের পর তুই যে হরদম টাকা নিচ্ছিস্।—কি করবি টাকা দিয়ে ?'

'নতুন রকম একটা গয়না কিনব। আজকেই দাও বাবা—আজকেই কিনব।'

বিবাহের পর বাপের ভয়টা যেন যোগমায়ার একটু কমিয়াছে—সব মেয়েরই কমে। বিবাহের পর খুব কড়া মেজাজের বাপও মেয়ের সঙ্গে একটু খুসী মেজাজেই মেলামেশা করে, মেয়েকে কিছু স্বাধীনতা দেয়। বাপ ও মেয়ের মধ্যে অতিরিক্ত একটা সম্পর্ক যেন কোথা হইতে কি ভাবে গড়িয়া উঠে।

কিন্তু যোগমায়া যখন টের পায় তাকে একাই যাইতে হইবে, যামিনী সঙ্গে যাইবে না, তখন সে হঠাৎ বাঁকিয়া বসে। না, তার যাইতে ইচ্ছা করিতেছে না, সে যাইবে না। শরীরটা ভাল নয় তার। কি হইয়াছে ? এই গা ম্যাজ-ম্যাজ করিতেছে, মাথা ঘুরিতেছে, আরও অনেক কিছু হইয়াছে।

সন্তানের এ রকম মুখোমুখি অবাধ্যতার অভিজ্ঞতা সত্যপ্রিয়ের জীবনে এই প্রথম। প্রথমটা সে কেমন থতমত খাইয়া যায়। তারপর ক্রোধে পৃথিবী অন্ধকার দেখিতে থাকে।

পিসতুতো বোন বলে, 'কি করব দাদা, যাব। মায়া তো কিছুতে যেতে রাজি নয়। যামিনীর এমন অসুখের সময় ওকে ফেলে কোথাও যেতে চায় না।'

'তোমাদের সকলের মাথায় গোবর ভরা।'

নিজের দোষটা বুঝিতে না পারিলেও পিসতুতো বোন মন্তব্যটায় সায় দিয়া চুপ করিয়া থাকে।

দিন তিনেক পরে সত্যপ্রিয় জামাইকে তার ঘরে ডাকিয়া আনিয়া বলে, 'যামিনী।'

যামিনী বলে, 'আজ্ঞে ?'

'তোমার ভালর জন্যেই বলা।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'জীবনে উন্নতি করতে হ'লে অভিজ্ঞতা চাই।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আমাদের দিল্লী ব্রাঞ্চের সাব-ম্যানেজার ক'মাসের ছুটি নিয়েছে। তার জায়গায় তুমি গিয়ে কাজ করে' আসতে পারবে না ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, পারব বৈকি।'

ক্রুদ্ধ আহত মনে যামিনীর বিনয়ে একটু শান্তি বোধ হয়। নিজের মেয়ের চেয়ে পরের ছেলেই ভাল। শ্বেত পাথরের মেঝেতেই দু'জনে বসিয়াছিল, যামিনী ঘাড় নীচু করিয়া উসখুস্ করিতে থাকে। কি যেন বলিতে চায় কিন্তু বলিতে পারে না।

'কবে যেতে হবে ?'

'কালকেই রওনা হয়ে যাও। নিয়মিত ওষুধপত্র খেয়ো। কব্রেজ মশায়কে বলে' দেব, ডাকে ওষুধ পাঠিয়ে দেবেন। আর সকাল-সন্ধ্যায় একটু যে যোগাভ্যাস শিখিয়ে দিয়েছি—'

'আমার কিছু টাকার দরকার ছিল।'

সত্যপ্রিয় হঠাৎ চুপ করিয়া যায়। কতগুলি বিষয়ে বুদ্ধিটা খুবই ধারালো, হঠাৎ তার মনে হয় জামায়ের সম্বন্ধে একটা নূতন তথ্য যেন আবিষ্কার করিয়া বসিয়াছে।

'কত টাকা ?'

'পাঁচশো।'

খুব লজ্জার সঙ্গে ভয়ে-ভয়েই যামিনী টাকার আবেদন জানাইয়াছে, তবু

সত্যপ্রিয়ের মনে হয় মাঝে মাঝে দু'একজন তাকে ফাঁদে ফেলিয়া যেভাবে টাকা আদায় করিবার চেষ্টা করে, যামিনীর টাকার দাবীটা যেন কতকটা সেই ধরণের। আপিসে নামমাত্র কাজের জন্য হাতখরচ বাবদ যামিনীকে মাসে দু'শ টাকা দেওয়া হয়। খরচ তার কি যে দুশো টাকাতেও কুলায় না? গম্ভীর হইয়া সত্যপ্রিয় একটু ভাবে, তারপর চেক বই বাহির করিয়া পাঁচশো টাকার একটা চেক লিখিয়া দেয়।

সারাটা দিন তার কেবলি মনে হইতে থাকে, চঞ্চলভাবে ছুটাছুটি করিতে করিতে হঠাৎ যেন দেয়ালে মাথা ঠুকিয়া সে শান্ত হইয়া গিয়াছে। একটা অদ্ভুত স্তব্ধতাভরা শান্তির শান্তভাব।

যামিনী দিল্লী রওনা হইয়া যায় আর অতদূরে অসুস্থ স্বামীকে কাজ করিতে পাঠানোর জন্য বাপের ওপর রাগ করিয়া যোগমায়া বাড়ীর সকলের সঙ্গে কথা বন্ধ করিয়া দেয়। শুনিয়া সত্যপ্রিয় নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবে, সকলে কি অকৃতজ্ঞ! যার ভালর জন্য যা করি তাতেই তার রাগ হয়।

মাস দুই পরে পিসতুতো বোন একদিন সত্যপ্রিয়কে একটা খবর দেয়। শুনিয়া প্রথমটা সত্যপ্রিয় কথাটা বিশ্বাস করিতেই চায় না।

'কা'র ছেলে হবে?'

'মায়ার। এই চার মাস।'

সংবাদটা এমন খাপছাড়া মনে হয় যে সত্যপ্রিয় তবু বোকার মত আবার জিজ্ঞাসা করে, 'ভুল হয়নি তো তোমাদের?'

দিল্লীর সাব-ম্যানেজার তিন মাসের ছুটি নিয়াছিল। যামিনী তিনমাস কাজ করিবার জন্য সেখানে গিয়াছে। দু'চারদিনের মধ্যেই তাকে সেখানে স্থায়ী করার নির্দ্দেশপত্র পাঠানোর কথাটা সত্যপ্রিয় ভাবিতেছিল। এবার একেবারে চুপ করিয়া যায়। সহজে সত্যপ্রিয় লজ্জা পায় না, হঠাৎ যেন মেয়ের কাছে মুখ দেখাইতে তার লজ্জা করিতে থাকে। কেবল মেয়ের কাছে নয়, আরো অনেকের কাছে। জানিয়া বুঝিয়া ইচ্ছা করিয়া সত্যপ্রিয় অনেক ব্যাপারে বাহাদুরী করিয়াছে, এমন অনেক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছে যেদিকে তার তাকানোই উচিত ছিল না, কিন্তু কারো কাছে কোনদিন এতটুকু সঙ্কোচ বোধ করে নাই। মনে মনে বরং নিজের সর্ব্বব্যাপী প্রভুত্বে গর্ব্বই অনুভব করিয়াছে। কিন্তু মেয়ে আর জামাইয়ের জীবনকে

নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিয়া এত বড় একটা ভুল করার জন্য সঙ্কোচ বোধ না করার ক্ষমতা সেও নিজের মধ্যে খুঁজিয়া পায় না।

ছি, কি কদর্য্য ভুল!

মাসখানেক পরে যামিনী ফিরিয়া আসিল। শোনা গেল, যোগমায়ার মুখে নাকি হাসি ফুটিয়াছে।

দিন পনের পরে একদিন সকালে যামিনী মুখ কাঁচুমাচু করিয়া সত্যপ্রিয়ের কাছে শ'তিনেক টাকা চাহিল। তার বিশেষ দরকার।

সত্যপ্রিয় বলিল, 'সেদিন তোমায় পাঁচশো টাকা দিয়েছি যামিনী।'

সন্ধ্যার পর যোগমায়া আসিয়া আব্দার করিয়া বলিল, 'আমায় তিনশো টাকা দেবে বাবা?'

সত্যপ্রিয় বলিল, 'সেদিন তোকে দুশো টাকা দিয়েছি মায়া।'

পরদিন শোনা গেল, যোগমায়ার মুখ নাকি কালো হইয়া গিয়াছে। চোখ দেখিয়া বুঝা গেল, রাত্রে খুব কাঁদিয়াছে। ঘুম ভাঙার পর হইতে যামিনীর আপিস যাওয়া পর্য্যন্ত একবার ধারে-কাছেও ঘেঁষিল না দেখিয়া বুঝা গেল' দু'জনে ঝগড়া হইয়াছে।

সন্ধ্যার পর মেয়েকে ডাকিয়া সত্যপ্রিয় তিনশো টাকার একখানা চেক তার হাতে দিল। যোগমায়া নীরবে চেক হাতে করিয়া চলিয়া গেল।

আপিসে সেদিন একজন লোক সত্যপ্রিয়ের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল। মহীতোষ তার কাছে সাড়ে তিন হাজার টাকা ধার নিয়াছিল, যতদিন পারে অপেক্ষা করিয়া একেবারে শেষদিন লোকটি অগত্যা সত্যপ্রিয়ের কাছে আসিয়াছে।

'কোটিপতি মানুষ আপনি, আপনার ছেলের নামে এ ক'টা টাকার জন্য নালিশ করব? আমি কি পাগল? আমি জানি আপনার কাছে এসে দাঁড়ালেই টাকা পাওয়া যাবে। দু'মাস ছ'মাস অপেক্ষা করব তাতে আর কথা কি? তবে কি জানেন, হঠাৎ বড় দরকার পড়ে গেল টাকাটার—আজকের মধ্যে না পেলে নয়।'

পরদিন কোর্টে নালিশ রুজু না করিলে দেনাটা তামাদি হইয়া যাইবে।

সত্যপ্রিয় নীরবে একটা চেক লিখিয়া দিয়াছিল।

অন্ধকার ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া সত্যপ্রিয় ভাবিতে থাকে। দর্শন, বিজ্ঞান,

রাজনীতির সমস্যার কথা নয়। অন্য কথা।

বুদ্ধিটা সত্যপ্রিয়ের সত্যই তীক্ষ্ণ। কিন্তু কতকগুলি ব্যাপারে মানুষের তীক্ষ্ণবুদ্ধি বুঝিবার কাজেই শুধু লাগে, মানুষ বুঝিতে চায় না। সত্যপ্রিয় জানে, একই মানুষের মধ্যে এরকম সমাবেশ ঘটে না, তবু সে আশা করে গরীব মা-বাপকে পাঠানোর জন্য জামাই তার যদিও বা যোগমায়াকে কষ্ট দিয়া তার কাছে টাকা আদায় করার উপায়টা অবলম্বন করিয়াছে, মানুষটা সে আসলে ভাল, মনটা তার নিশ্চয় নরম, টাকার ব্যবস্থার জন্য ছাড়া অন্য কোন কারণেই তার মেয়েকে হয় তো সে কষ্ট দেয় না। যামিনী যে বাপকে পাঠানোর জন্য টাকা আদায় করে সম্প্রতি এটা সত্যপ্রিয় টের পাইয়াছে।

টাকা আদায় করিবার উপায় থাকিলে, তা সে স্ত্রীর উপর চাপ দিয়াই হোক আর যে ভাবেই হোক, টাকা আদায় করাকে সত্যপ্রিয় বিশেষ সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার বলিয়া মনে করে না, খুব বেশী অন্যায় বলিয়াও গণ্য করে না। যত মানুষকে সে চেনে তারা সকলেই টাকা টাকা করিয়া পাগল। তাই নিয়ম সংসারে। কেবল নিজের মেয়ে জামায়ের ব্যাপার বলিয়াই তার একটু খারাপ লাগিতেছে।

নরনারী সম্পর্কে যে মনের মিল বলিয়া একটা খুব বড় রকমের ব্যাপার আছে, সোজাসুজি অবিচার অত্যাচার না করিয়া, এমন কি রীতিমত ভাল ব্যবহার করিয়াও যে একজন আরেকজনকে অবহেলা করিতে পারে, মিষ্টি ভদ্রতার সম্পর্ক আর স্নেহ মমতার সম্পর্কের মধ্যে যে তফাৎ অনেক, সত্যপ্রিয় তা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছে। পুরুষমানুষ যদি অকারণে মেয়েমানুষকে মারধোর গালাগালি না করে, তবে আর মেয়েমানুষের সুখের জন্য কি দরকার হইতে পারে সে বুঝিতে পারে না।

কিন্তু যোগমায়ার অসুখী মন আজকাল নানা দিক দিয়া নানাভাবে আসিয়া তাকে ক্রমাগত আঘাত করে। সাধারণ অবস্থায় হয়তো সে খেয়ালও করিত না, কিন্তু এদিকে এখন তার মন গিয়াছে। দেশের স্বাধীনতা চাহিলে যে স্বাধীনতা পাওয়া যায় না বরং না চাইলেই নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাওয়া যায় এই সমস্যার মত, কন্যার বিবাহিত জীবনটাও তার কাছে এখন একটা সমস্যা দাঁড়াইয়া গিয়াছে। মেয়ে যে অসুখী হইয়াছে এর চেয়ে তার যেন বেশী

যন্ত্রণা বোধ হয় এই ভাবিয়া যে সে মেয়েকে সুখী করিবার জন্য নিজে সে পাত্র ঠিক করিয়া মেয়ের বিবাহ দিয়াছে, অথচ মেয়ে সুখী হয় নাই।

ব্যবসার একটি সমস্যার মত ব্যাপারটাকে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করিতে করিতে কয়েক দিনের মধ্যেই খুব ভাল একটি সমাধান আবিষ্কার করিয়া ফেলে। ব্যাপারটা তো মূলতঃ এই। মেয়েকে সুখী করার ভার সে জামাই-এর উপর ছাড়িয়া দিয়াছে এবং সেজন্য খরচ করিয়াছে অনেক টাকা। তার মেয়েকে সুখী করার দায়িত্বটা জামাই-এর। জামাই যদি কাজটা না পারিয়া থাকে, তাকে বুঝাইয়া দেওয়া দরকার দায়িত্বটা সে পালন করিতে পারে নাই। সেই সঙ্গে এটাও বুঝাইয়া দেওয়া দরকার, দায়িত্বটা ভালভাবে পালন না করিলে তার নিজের অবস্থাটাও সুবিধা দাঁড়াইবে না। অনেক কর্ম্মচারী আর এজেন্টের ভোঁতা মাথায় এই জ্ঞানটুকু ঢুকাইয়া দিয়া অনেক দায়িত্বপূর্ণ কঠিন কাজ সে করাইয়া নিয়াছে।

এই সহজ কথাটা এতদিন কেন মনে হয় নাই ভাবিয়া সত্যপ্রিয় একটু আশ্চর্য্য হইয়া যায়। একদিন যামিনীকে ডাকিয়া বলে, 'বাবা, তোমার মনের অবস্থাটা বড় খারাপ দেখছি। তোমার মুখ দেখে যোগমায়ার মুখখানাও সব সময় শুকিয়ে থাকে। তা তুমি এক কাজ কর, ক'দিন বাপমা'র কাছে থেকে এসো গে। আজকেই চলে' যাও, এইবেলা, এইমাত্র—জিনিষপত্র থাক্।'

যামিনী আমৃতা আমৃতা করিয়া বলিবার চেষ্টা করে, 'আজ্ঞে, আমার মনের অবস্থা—'

'পথের খরচ বাবদ এই চারটাকা দিলাম—গাড়ীভাড়া তিনটাকা চোদ্দ পয়সা, নয়? মন সুস্থ না করে, মানে, মনের অবস্থা না বদ্‌লে এসো না।'

এক ঘন্টার মধ্যে জামাই বিদায় হইয়া গেল।

জামাইকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে ভাবিতে গেলে সকলের মাথা ঘুরিয়া যায়। তাও কি সম্ভব? কিছুই বুঝিতে না পারিয়া সকলে ভাবে, ভিতরে কিছু আছে। কোন কাজে যামিনীকে পাঠানো হইয়াছে, কোন উদ্দেশ্যে। সত্যপ্রিয়ের অদ্ভুত কাজ আর উদ্দেশ্যের তো অন্ত নাই।

কিন্তু কাজটা কি? কি উদ্দেশ্য সত্যপ্রিয়ের?

রওনা হওয়ার সময় সত্যপ্রিয় যামিনীকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে, 'তোমায়

কেন পাঠিয়ে দিচ্ছি বুঝতে পেরেছ তো বাবাজি ?'

'আজ্ঞে না, ঠিকমত—'

এত করিয়াও যদি না বুঝানো গিয়া থাকে তবে আর এ অপদার্থের কাছে কি আশা করা যায় ! সত্যপ্রিয় বড়ই ক্ষুণ্ণ হয় !

'বুঝতে পারলে লিখে জানিও। আমি সঙ্গে-সঙ্গে সব ব্যবস্থা করব ফিরে আসার।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, জানাব বৈকি, নিশ্চয়।'

যামিনী চলিয়া গেলে সত্যপ্রিয় ভাবে, মাসে মাসে এতগুলি টাকা হাতে পাইয়া আর এমন আরাম ও উৎসবের মধ্যে দিন কাটাইয়া গিয়া টাকা আর আরামের অভাবটাও যদি সেখানে তাকে আসল ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিতে না পারে, তবে আর কিছু না বুঝাইলেও চলিবে।

তবু, কয়েকদিন পরেই যে যামিনীর কাছে একখানা পত্র পাঠাইয়া দেয়। জামায়ের কাছে এরকম কবিত্বপূর্ণ পত্র লেখা সত্যপ্রিয়ের মত মানুষের পক্ষে শুধু নয়, অনেকের পক্ষেই উদ্ভট আর খাপছাড়া। সত্যপ্রিয়ের পত্রের মর্ম্ম এই যে, বিবাহের পর হইতে মেয়ের মুখ তার বিষণ্ণ, যাই হোক, এবার যামিনী ফিরিয়া আসিবার পর বোধ হয় তার মুখে হাসি ফুটিবে : অন্ততঃ যামিনী যে হাসি ফুটাইবে তাতে সন্দেহ নাই।

ছয়

যশোদা ভাবিয়াছিল, শ্রমিকদের সঙ্গে তার সম্পর্ক বুঝি চিরকালের জন্যই চুকিয়া গিয়াছে। বহুদিন নিজের বাড়ী দু'টিতে অনেকগুলি ওই শ্রেণীর নরনারীকে আশ্রয় দিয়া, দু'বেলা কুড়ি-বাইশ জনের জন্য ভাত রান্না করিয়া, এখানে-ওখানে দু'চারজনের কাজ জুটাইয়া দিয়া, বিপদে আপদে পরামর্শ দিয়া আর সাহায্য করিয়া তার মনে একটা ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল, ঠিক ওভাবে ছাড়া এসব মানুষের সঙ্গে আর কোনরকম সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতে পারে না।

সম্পর্কটা গড়িয়া উঠিয়াছিল আপনা হইতে, স্বাভাবিক ভাবে। প্রথমে ওদের কেবল ভাড়াটে হিসাবে যশোদা বাড়ীতে থাকিতে দিয়াছিল মাত্র, ওদের সুখ-দুঃখ ভালমন্দের ভাবনাটাও যে তাকে একদিন ভাবিতে হইবে সে তখন এ কথাটা কল্পনাও করিতে পারে নাই। চোখের সামনে এই শ্রেণীর জীবগুলির কয়েকজন প্রতিনিধির জীবন-যাপনের প্রক্রিয়া দেখিতে দেখিতে যশোদা টের পাইয়াছিল, এরা সব বয়স্ক শিশুমাত্র, অভাবে আর চাপে খানিকটা বিগড়াইয়া গিয়াছে। একটু একটু করিয়া তখন মায়া জাগিয়াছিল যশোদার মধ্যে। একটু একটু করিয়া তারপর সে জড়াইয়া গিয়াছিল ওদের জীবনের সঙ্গে। চাঁদের জন্য সব সময় যশোদার মনটা তখন হু-হু করিত, এতগুলি বয়স্ক শিশুকে পাইয়া শোকটা তার কমিয়া গিয়াছিল।

কিন্তু ওরা তাকে ত্যাগ করিয়াছে। সত্যপ্রিয়ের কারসাজিতে আর তাকে ওরা বিশ্বাস করে না। তাকে শত্রু জানিয়া, তার সংস্পর্শে আসিলে বিপদ ঘটিবে জানিয়া, সকলে তফাতে সরিয়া গিয়াছে। ওদের ভালবাসিবার ভাণ করিয়া সে উপরওয়ালাদের স্বার্থসাধনের সাহায্য করে, ওদের ন্যায্য দাবী ত্যাগ করায়, ধর্ম্মঘট ভাঙিয়া দেয়, কাজ হইতে তাড়ায়। এতকাল পরে যশোদার সম্বন্ধে ওদের এই ধারণা জন্মিয়াছে!

অর্থহীন অভিমানকে প্রশ্রয় দেওয়ার মানুষ যশোদা নয়, কোন ব্যাপারকে ব্যক্তিগত কল্পনার বাষ্পে সে ফাঁপাইয়া তোলে না। বাঁচিয়া থাকাটাই যাদের পক্ষে একটা বীভৎস সংগ্রাম, অত কৃতজ্ঞতার ধার ধারিলে কি তাদের চলে? কৃতজ্ঞতাও ওদের যথেষ্টই আছে। কাজ না থাকার সময় দুদিন যাকে যশোদা খাইতে দিয়াছে, কাজ পাওয়ার পরেও যশোদার একটি ধমকে সে যে কাঁদ-কাঁদ হইয়া যাইত, বসিয়া বসিয়া যশোদা দু'দণ্ড সুখদুঃখের গল্প করিলে সকলে যে কৃতার্থ বোধ করিত, এ কি কৃতজ্ঞতা নয়? কিন্তু যখন জানা গেল যশোদা তলে তলে তাদের ক্ষতিই করে, যশোদার বাড়ীতে থাকিলে কাজ থাকে না, শ্রমিক সমিতি হইতেও যখন উপদেশ দেওয়া হইতে লাগিল যশোদাকে বর্জ্জন করিবার, ওদের তখন আর কি করিবার ছিল?

এসব কথা যশোদা ভাবিয়াছে। কিন্তু মন তার অবুঝ হইয়া পড়িয়াছে, কিছুই আর মানিতে চায় না সুবর্ণকে নিয়া উধাও হইয়া গিয়া নন্দ তাকে আরও বেশী কাবু করিয়া দিয়াছে। নিজেকে যশোদার কেমন অপরাধী মনে হয়। মনে আর

জোর পায় না। যুক্তিতর্ক দিয়া মনকে বুঝাইয়া মনের জোর তো আর বাড়ানো যায় না।

তাই, কেবল শ্রমিকরা যে তাকে ত্যাগ করিয়াছে তা নয়, সেও একরকম ওদের ত্যাগ করিয়াছে। সত্যপ্রিয়, মিলের কেউ না আসুক, অন্য মিলের অনেকে মাঝে মাঝে যশোদার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে, কেউ আসিয়াছে বিপদে পড়িয়া, কেউ আসিয়াছে কাজের সন্ধানে, কেউ আসিয়াছে নিছক দু'দণ্ড যশোদার সঙ্গে বসিয়া গল্প করিবার জন্য। সকলে যে তাকে ত্যাগ করে নাই তার এতবড় একটা প্রমাণও যশোদাকে কিন্তু খুসী করিতে পারে নাই।

সোজাসুজি কড়া সুরে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, 'কি চাই ?'

কি চাই অর্দ্ধেকটা শুনিতে না শুনিতে বলিয়াছে, 'আমি পারব না। আমার কাছে এসেছ কেন ?'

মনটা যশোদার সত্যিই একটু বিগড়াইয়া গিয়াছে।

তবু মনের কোণে হয়তো যশোদার ক্ষীণ একটু আশা বা ইচ্ছা ছিল, একদিন আবার বাড়ীতে তার কুলি-মজুরেরা বাসা বাঁধিবে, আবার সে দু'বেলা ওদের ভাত রাঁধিয়া খাওয়াইবে। কিন্তু রাজেনের প্ররোচনায় বাড়ীতে ভদ্র ভাড়াটেদের আনিবার পর সে-আশাও যশোদার ঘুচিয়া গিয়াছে। তাছাড়া, যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তার বাড়ীর চারিদিকের সহরতলীতে, তাতে কুলি-মজুরদের এখানে আর বাস করাও বোধ হয় সম্ভব নয়। চারিদিকের সহরে ভদ্র আবহাওয়ার চাপে বেচারাদের দম আটকাইয়া আসিবে, এক মুহূর্ত্তের স্বস্তি থাকিবে না।

কিন্তু আবার অন্য দিক দিয়া কুলি-মজুরদের সঙ্গে যশোদার যোগাযোগ টিকিয়া গেল।

একদিন রাজেন মাঝবয়সী এক ভদ্রলোককে আনিয়া হাজির, যশোদার সঙ্গে আলাপ করিবে। কেন আলাপ করিবে, মানুষটার নাম কি, কি করে, কিছুই রাজেন প্রথমে বলিল না। লোকটিও ঘণ্টাখানেক এ-বিষয়ে সে-বিষয়ে এলোমেলো আলোচনা করিয়া উঠিয়া গেল। আলাপ করিতে যে আসিয়াছে সে শুধু আলাপ করুক, যশোদার তাতে কোন আপত্তি নাই, কিন্তু এ কোন্ দেশী আলাপ ? একেবারে যেন অনেকদিনের পরিচয় ছিল, খানিকক্ষণ বসিয়া বাজে গল্পে আনন্দ করিয়া চলিয়া গেল। লোকটি বসিয়া থাকিতে থাকিতেই যশোদা

কয়েকবার রাজেনের মুখের দিকে চাহিয়াছিল, কিন্তু লোকটি বিদায় হওয়ার আগে তার কাছে একটি কথাও শুনা গেল না।

'আসছি' বলিয়া লোকটির সঙ্গে উঠিয়া গিয়া রাজেন ফিরিয়া আসিল।

'কেমন লাগল লোকটিকে চাঁদের-মা ?'

'তা যেমনি লাগুক, আগে বলত শুনি মানুষটা কে ?'

'খুব নাম-করা লোক গো—বিধুবাবু।'

বিধুবাবুর নাম যশোদাও শুনিয়াছে, শ্রমিক নেতা হিসাবে লোকটি সত্যই এতখানি বিখ্যাত যে এভাবে বাড়ী আসিয়া যশোদার সঙ্গে আলাপ করিয়া যাওয়া সত্যই বিস্ময়ের ব্যাপার !

'বিধুবাবু ! বিধুবাবু আমার সঙ্গে আলাপ করতে এলেন কেন ?'

রাজেনের চেয়ে সে-কথা বিধুবাবুই যশোদাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিল, দিন তিনেক পরে। আবার তেমনিভাবে অসময়ে আসিয়া আলগোছে একটি মোড়াতে বসিয়া বলিল, 'তাহ'লে পশু'র সভাতে যাচ্ছ তো দিদি ?'

আগের দিন বিধুবাবু তাকে 'তুমি'ও বলে নাই, দিদিও বলে নাই। যশোদা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, 'কিসের সভা ?'

বিধুবাবু আরও বেশী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, 'কেন রাজেন বলেনি ?'

'কই, না ?'

সঙ্গে সঙ্গে বিধুবাবুর হাসির শব্দে যশোদার বাড়ী সরগরম হইয়া উঠিল।—'তা রাজেন ওই রকম মানুষই বটে ! আমি কে তাতো বলেছে, না তাও বলে নি ?'

'প্রথমে বলে নি, আপনি যাওয়ার পর বলেছে।'

যশোদারও হাসি আসিতেছিল। প্রথমদিন বিধুবাবুর তবে ধারণা ছিল যশোদা তার নাম-ধাম আর দেখা করিতে আসার উদ্দেশ্য সমস্তই জানে, তাই পরিচয়ও দেয় নাই, কাজের কথাও বলে নাই। লোকটিকে যশোদার ভাল লাগিতে থাকে। এরকম লোকই ভাল, যারা অকারণে প্রথম পরিচয়ের দিন অনাবশ্যক ব্যগ্রতার সঙ্গে বড়-বড় কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া আরও বড় প্রয়োজন যে চেনা হওয়া, তাতে বাধা সৃষ্টি করিয়া বসে না।

দু'দিন পরে শ্রমিকদের একটি সভা হইবে, সাধারণ সভা। প্রথমে কর্ম্মীদের সভা, তারপর শ্রমিকদের। বিধুবাবু যশোদাকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিয়া যাইতে চায়,

ব্যাপারটা একটু দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া আসিবে। তারপর যশোদার ইচ্ছা হয়, সমিতির মধ্যে ভিড়িয়া গিয়া একটু কাজ করিতে চায় সে তো আনন্দের কথা। আর ভিড়িতে যদি না চায় নাই ভিড়িবে। একবার গিয়া দেখিয়া আসিতে দোষ নাই।

'সমিতি-টমিতির সঙ্গে কি আমার বন্‌বে বিধুবাবু? সমিতির লোকেরা আমার ওপর চটে' আছে, কত কথাই রটিয়েছে আমার নামে।'

'ওসব লোকেশবাবুর কাজ দিদি। লোকেশবাবুর একটু বাড়াবাড়ি আছে কিনা সব বিষয়ে, সমিতির মেম্বার না হয়ে কেউ শ্রমিকদের ভাল করবে তা পর্য্যন্ত সহ্য হয় না। আগের কথা ভুলে যাও দিদি, তোমাকে আমাদের চাই।'

অনেকগুলি প্রশ্ন করিয়া অনেকক্ষণ ভাবিয়া যশোদা সভায় যাইতে রাজি হইয়া গেল।

বিদায় নেওয়ার আগে যশোদা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, 'আমার কথা শুনলেন কার কাছে? রাজেন বলেছে বুঝি?'

বিধুবাবু বলিল, 'সত্যপ্রিয় মিলের কাণ্ডটার সময় আমি ছিলাম পশ্চিমে। এসে অনেক রকম কথা শুনলাম। তোমার কথা তো আগে থেকে সব জানতাম দিদি, তাই শুনে মনে হ'ল, এ তো বড় খাপছাড়া ব্যাপার হচ্ছে। তারপর রাজেন একদিন আমায় বললে বসে' বসে' মরচে ধরায় বড নাকি কষ্ট পাচ্ছ। আমারও একটু দরকার ছিল, তাই তাড়াতাড়ি ছুটে এলাম। সত্যপ্রিয় মিল বড় করেছে জানো?'

'শুনেছি।'

বিধুবাবু খানিকক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যশোদার মুখের ভাব দেখিতে থাকে। বড় ধারালো দৃষ্টি বিধুবাবুর, দেখিলেই বুঝা যায় মানুষটা সে ভয়ানক নিষ্ঠুর। তবে এটুকু যশোদা আগেই বুঝিয়াছিল, অন্যকে কষ্ট দিয়া আনন্দ পাওয়ার নিষ্ঠুরতা এটা নয়, এ নিষ্ঠুরতা জ্ঞান আর অভিজ্ঞতার, প্রতিক্রিয়া যে প্রতিক্রিয়ায় মনের কোমলতা আর ভাবপ্রবণতা গোড়া শুদ্ধ উপ্‌ড়াইয়া যায়। সাধারণ আলাপেই এটা বেশ বোধগম্য হয়। তাছাড়া, যে ভাবে বিধুবাবু হাসে তার মধ্যেও তার মনের এ পরিণতির প্রমাণ স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। এ রকম হাসির সঙ্গে যশোদার পরিচয় আছে, তার পরিচিত আরেক জন লোক এভাবে হাসিত। সমস্ত ব্যাপারে

যারা কৌতুক বোধ করে, মর্ম্মান্তিক বেদনায় কাঁদিবার সময়ও একজনকে খাপছাড়া মুখের ভঙ্গি করিতে দেখিয়া যাদের হাসি পায়, কেবল তারাই এ রকম হাসি হাসিতে পারে।

এরকম লোককে কিন্তু এক বিষয়ে নিশ্চিন্ত মনে বিশ্বাস করা যায়। এদের আর যাই থাক, কিছুমাত্র স্বার্থপরতা থাকে না। পরের জন্য বেশী মন না কাঁদুক, নিজের ভাবনাটা এরা একেবারেই ভাবে না।

সেদিন খাওয়ার সময় সুব্রতা বলিল, 'আমরাও আজ এক জাগায় যাচ্ছি দিদি।'

অজিত তাকে আজ সিনেমায় নিয়া যাইবে। খবরটা দেওয়ার সময় সুব্রতা মুচকি মুচকি হাসে। যশোদাও হাসে।

'আমায় নিয়ে যাবে না?'

'তুমি না কোথায় যাচ্ছ আজকে?'

'ও, তাই আজ তোমরা সিনেমায় যাচ্ছ, আমায় ফাঁকি দেবার সুযোগ পেয়ে!'

বলিয়া প্রচণ্ড শব্দে যশোদা হাসিতে থাকে। এই সামান্য পরিহাসে এত জোরে হাসিবার কি ছিল সেই জানে, হাসিটা বিধুবাবুর মত হইতেছে খেয়াল করিয়া হঠাৎ সে থামিয়া যায়।

তারপর সুব্রতা যে খবরটা দেয় সেটা একটু মারাত্মক। একজনের গাড়ীতে তারা সিনেমায় যাইবে, এদিকেই কোথায় সত্যপ্রিয় বলিয়া একজন মস্ত বড়োলোক থাকে, তার ছেলের গাড়ীতে। কবে যেন অজিত তার সঙ্গে কোন্ স্কুলে পড়িয়াছিল, হঠাৎ ক'দিন আগে দেখা হইয়া গিয়াছে। তারপর তাদের পরামর্শ হইয়াছে পরস্পরের বৌকে নিয়া আজ তারা একসঙ্গে সিনেমায় যাইবে, আলাপ পরিচয়ও হইবে, একটু আনন্দও করা হইবে।

পাকা গিন্নীর মত মুখ করিয়া সুব্রতা বলিতে থাকে, 'আমার কি আর সিনেমা-টিনেমায় যাওয়ার সখ আছে দিদি? কি করব, বন্ধু বড় ধরেছে। ও কি বলছিল জানো দিদি? বন্ধুর বাপ নাকি বৌকে নিয়ে ছেলের কোথাও যাওয়া দু'চোখে দেখতে পারে না, ভীষণ চটে যায়। সেকেলে ভূত আর কি। বাপ নাকি কোথায় গিয়েছে ক'দিনের জন্য, ছেলেও বৌকে নিয়ে খুব বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে।'

মহীতোষকে যশোদা জানে, ছেলেটারবুদ্ধি একটু কাঁচা। সকলে তাকে

সেকেলে, গেঁয়ো আর অসভ্য মনে করে ভাবিয়া বড়ই মনের কষ্টে সে দিন কাটায়। বাহিরের লোকের সঙ্গে কথায় ব্যবহারে সে বিনয়ের অবতার, যশোদার সঙ্গে পর্য্যন্ত এমন মুখ কাঁচুমাচু করিয়া কথা বলে যে দেখিলে হাসিও পায়, মমতাও হয়। রাতে ঘুমের মধ্যেও হয়তো বাপের ভয়ে মহীতোষ চমকিয়া জাগিয়া ওঠে, কিন্তু বাড়ীতে যারা আশ্রিত ও আশ্রিতা, আফিসে ও কারখানায় যারা জীবিকার প্রত্যাশী তাদের সঙ্গে তার ব্যবহার বড় খারাপ। কথায় কথায় কারণে অকারণে রাগিয়া যায়, গালাগালি দেয়, অপমান করে। অজিতের সঙ্গে মহীতোষের বন্ধুত্ব না হয় আছে, কিন্তু মহীতোষ কি জানে না বন্ধু তার যশোদর বাড়ীতে থাকে? যশোদার বাড়ীর ভাড়াটের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার সাহস সে পাইল কোথায়?

শ্রমিক সমিতির সভায় গিয়া যশোদা যে বিশেষ খুসী হইল তা বলা যায় না, তবে তেমন খারাপও তার লাগিল না। পরিচালক সমিতির সভায় বড় বেশী তর্ক চলে, নিজের নিজের মতামতটা জাহির করিবার জন্য অনেকে বড় ব্যস্ত। বড় বড় কথাও অনেক বলা হয়, একেবারে নাটকীয় ভঙ্গীতে, অবরুদ্ধ একটা উত্তেজনা যেন বক্তার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। তবে সকলে এরকম নয়, শান্ত ও সংযত মানুষও কয়েকজন আছে, ভাবিয়া চিন্তিয়া হিসাব করিয়াই যারা কথা বলে। কিন্তু এদেরও আসল বক্তব্যটা যশোদা আগাগোড়া ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। খানিকক্ষণ হয়তো কথাগুলি জলের মত পরিষ্কার বুঝা যাইতে লাগিল তারপর হঠাৎ কখন কি ভাবে যে সমস্ত বিষয়টা জটিল আর দুর্ব্বোধ্য হইয়া গেল কিছুই যশোদার মাথায় ঢুকিল না। তবে সেজন্য এদের সে দোষ দিল না, অপরাধটা ধরিয়া নিল নিজের বুদ্ধির।

এরা সমস্ত জগতের শ্রমিকদের অবস্থা জানে, শ্রমিক সমস্যা এরা বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশ্লেষণ করিয়াছে, এদের সমস্ত তর্কবিতর্ক পরিষ্কার বুঝিবার মত জ্ঞান সে কোথায় পাইবে? তার মত ঠেকনো দিয়া দশবিশজন শ্রমিককে কোন রকমে খাড়া রাখিবার ব্রত এদের নয়, ধনিক-তন্ত্রের চোরাবালির গ্রাস হইতে সমস্ত শ্রমিককে বাঁচাইয়া শক্ত মাটিতে তাদের দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করা এদের কাজ।

সে কাজের বিরাটত্ব কল্পনা করিয়া যশোদার মাথা ঘুরিয়া যায়। কুলি-মজুরের সঙ্গে সে মিশিয়াছিল, তাঁদের কয়েকজনকে ভাল বাসিয়াছিল, একটা

শ্রেণী হিসাবে তাদের কথা কখনো ভাবিয়া ছাখে নাই। আজ সকলের আলোচনা হইতে শ্রমিক সমস্যার স্বরূপ তার কাছে যতটুকু প্রকট হইয়া উঠিল তাতেই সে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

শ্রমিকসভার বক্তৃতাগুলি যশোদার ভাল লাগিল না। প্রত্যেকটি বক্তা প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসই শুধু বিতরণ করিয়া গেল, কোন বিষয়েই একটু ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা কারো দেখা গেল না। বক্তৃতাগুলি জোরালো হইল সন্দেহ নাই, শ্রমিকদের উপর যথেষ্ট প্রভাবও দেখা গেল বক্তৃতায়, কিন্তু এরকম প্রভাব কি স্থায়ী হয়? কাজে লাগে?

হয়তো লাগে। যা ওদের করা উচিত সেটা কেন করা উচিত বুঝাইয়া দেওয়ার বদলে এমনি বক্তৃতার সাহায্যে করাইয়া নেওয়াই হয়তো সহজ ও সম্ভব?

এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে রাত প্রায় ন'টার সময় বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া যশোদার চোখে পড়িল, তাদের গলির মোড়ে দাঁড়াইয়া আছে সত্যপ্রিয়ের প্রকাণ্ড বাড়ী। ভিতরে একা বসিয়া আছে একটি অল্পবয়সী বৌ। পাশ কাটাইয়া যশোদা গলির মধ্যে ঢুকিতে যাইতেছিল, বৌটি ক্ষীণস্বরে ডাকিয়া বলিল, 'চাঁদের মা, ও চাঁদের মা, শুনুন।'

বৌটি কে এবং এখানে গাড়ীর মধ্যে একা কেন বসিয়া আছে যশোদা আগেই অনুমান করিয়াছিল। কাছে আসিতে মহীতোষের বৌ বলিল, 'ওঁকে একটু শীগ্‌গির পাঠিয়ে দেবেন চাঁদের-মা?'

'তা দিচ্ছি, কিন্তু তোমায় একা বসিয়ে রেখে কি বলে' নেমে গেলে বাছা?'

'কথা কইতে কইতে এগিয়ে গেছেন।'

বাড়ীর দরজার সামনে দাঁড়াইয়া মহীতোষ, অজিত আর সুব্রতার মধ্যে তখনো কথা চলিতেছিল। অজিত বা সুব্রতা যে মহীতোষকে আটকাইয়া রাখে নাই, মহীতোষ দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছে বলিয়াই দু'জনে তারা ভিতরে যাইতে পারিতেছে না বুঝিতে যশোদার দেরী হইল না। ছেলেমানুষ তিনজনেই এবং মহীতোষের বুদ্ধিটা সত্যই একটু কাঁচা। সুব্রতাই বা কি, এদিকে তো মুখে তার কথা ছোটে তুবড়ীর মত, ভদ্রতা বজায় রাখিয়াই একটু ইঙ্গিতেও কি সে মহীতোষের মনে পড়াইয়া দিতে পারিল না, গলির মোড়ে বৌটাকে সে একা ফেলিয়া আসিয়াছে?

যশোদাকে দেখিয়া মহীতোষ বলিল, 'কেমন আছেন চাঁদের-মা? আজ এঁদের নিয়ে—'

'একা বসে' থাকতে বৌমার ভয় করছে।'

'আঁ? ও, হ্যাঁ, যাই।'

বাড়ীর ভিতরে ঢুকিয়া যে যার ঘরে কাপড় ছাড়িতে গেল। ধনঞ্জয় যশোদার বিছানা দখল করিয়া শুইয়া আছে।

'তুমি এখানে যে?'

ধনঞ্জয় জবাব দিল না।

'ভাত খেয়েছ?'

'খেয়েছি।'

সারাদিন রাগে গজ গজ করিতে করিতে কুমুদিনী আজ এখানে আসিয়া রাঁধিয়া দিয়া গিয়াছে। কথা ছিল, কুমুদিনীর ননদ আসিয়া রাঁধিয়া দিবে, কিন্তু শত্রুর বাড়ীতে নিজে রাঁধিয়া দিতে না আসিলে কুমুদিনীর বোধ হয় তৃপ্তি হয় না।

বাহিরে গিয়া কাপড় ছাড়িয়া যশোদা তিনজনের ভাত বাড়িল, তারপর ধনঞ্জয়কে ডাকিয়া বলিল, 'এখানে এসো না, আমাদের খাওয়া দেখবে আর গল্প শুনবে কোথায় গিছলাম?'

ধনঞ্জয় সাড়া দিল না বটে কিন্তু খানিকক্ষণ পরে মুখ অন্ধকার করিয়া উঠিয়া আসিল। সকলে তখন খাইতে বসিয়াছে। কাঠের পা ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে সে বাড়ীর বাহিরে চলিয়া গেল। সুব্রতা বলিল, 'ওঁর ঠক্ ঠক্ করে' হাঁটা দেখলে এমন লাগে আমার! কি হ'ল দিদি তোমার ওখানে?'

'কি আর হবে, কুলি-মজুরের মিটিং হ'ল। তোমরা কেমন বায়স্কোপ দেখলে বল।'

বায়স্কোপের চেয়ে মহীতোষ আর তার বৌ-এর সঙ্গে পরিচয়ের কাহিনী বলিতে আর দু'জনের সমালোচনা করিতে সুব্রতার বেশী আগ্রহ দেখা গেল, ওদের কথাতেই খাওয়া শেষ হইয়া গেল। একবার মুখ খুলিলে সুব্রতা আর থামিতে পারে না। আঁচাইয়া উঠিয়া ছবির গল্প আরম্ভ করিয়া বলিল, 'দেখবে

দিদি বইটা ? নাম-টাম আছে, অনেকের ছবিও আছে।'

বাংলা চলচ্চিত্র। সুব্রতার কথা শুনিতে শুনিতে যশোদা ছাপানো প্রোগ্রামটির পাতা উল্টাইতেছিল। এক পাতায় দু'জন অভিনেতা অভিনেত্রীর ছবি দেখিয়া তার চোখের পলক বন্ধ হইয়া গেল।

নন্দ আর সুবর্ণ সিনেমায় অভিনয় করিতেছে ?

সুব্রতা বলিল, 'কি হ'ল দিদি ? কার ফটো দেখেছ ?—ওঃ, ওই ছেলেটার ! এমন সুন্দর গান করলে দিদি ছেলেটা কি বলব তোমায় !'

সাত

যামিনী ফিরিয়া আসিল এবং পরাধীনতায় অভ্যস্ত মানুষও যেমন বড়রকম একটা ঘা খাওয়ার সময় কিছুক্ষণের জন্য গা' নাড়া দিয়া উঠিয়া স্বাধীনতার আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দেয়, চার টাকা পথ খরচ দিয়া তাড়াইয়া দেওয়ার জন্য সেইরকম একটা গোলমাল বাধাইয়া দিল।

আমাদের স্বাধীন কর বলাটাই এ ধরণের আন্দোলনের প্রচলিত প্রথা। যামিনীও রাগ করিয়া সত্যপ্রিয়ের কাছে দাবী করিয়া বসিল, সত্যপ্রিয় তার ভিন্ন থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিক।

'ভিন্ন থাকবে ? মেসে ?'

'আজ্ঞে না। অন্য একটা বাড়ী নিয়ে—'

সত্যপ্রিয় সমস্তই বুঝিতে পারিতেছিল তবু জামাইয়ের ছেলেমানুষী রাগ কমানোর জন্য মৃদু একটু হাসিয়া পরিহাসের সুরে বলিল, 'আমার তো আর বাড়ী নেই বাবা, এই একটা ছাড়া ?'

'ছোটোখাটো একটা বাড়ী ভাড়া নেওয়ার কথা বলছিলাম।'

এবার একটু গম্ভীর হইয়া সত্যপ্রিয় বলিল, 'বেশ তো, সেজন্য ব্যস্ত হবার কি আছে ! কিছুদিন যাক না !'

যামিনী একগুঁয়ের মত বলিল, 'আজ্ঞে না, দু'চার দিনের মধ্যে একটা বাড়ী ঠিক

করে চলে যাব ভাবছিলাম।'

সত্যপ্রিয় এবার রীতিমত গম্ভীর হইয়া গেল।

'দু'চার দিনের মধ্যে চলে যাবে ভাবছিলে ? তা বেশ। একটা বাড়ী দেখে নাও, কলকাতায় বাড়ীর অভাব নেই। কিন্তু, একা একজনের জন্য একটা বাড়ী না নিয়ে মেসে হোটেলে থাকলেই সুবিধে হ'ত না ?'

তখন যামিনী স্পষ্ট করিয়াই জানাইয়া দিল যে একা বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকিবার কথা সে ভাবিতেছে না, সকলকে সঙ্গে নিয়া যাওয়াই তার ইচ্ছা।

সত্যপ্রিয় বলিল, 'আমাকে তার ব্যবস্থা করে দিতে হবে, এই কথা বলছ তো ? মাসে মাসে বাড়ী ভাড়াটাও দিতে হবে নিশ্চয় ?'

'আমার মাইনেটা কিছু বাড়িয়ে দিলে—'

'কিসের মাইনে ? একজনকে বসিয়ে বসিয়ে মাসে দু'শো টাকা হাত খরচা দিলে কি আপিস চলে বাপু ? কাজকর্ম্ম শিখলে হয়তো একদিন মাইনে হবে তোমার, এখন আমার পকেট থেকে যে হাত খরচার টাকাটা দিচ্ছি, সেটা আর বাড়াতে পারব না। কমিয়ে দিতে হবে কিনা কে জানে,—বড় টাকার টানাটানি চলছে আমার।'

খুব সকালে যামিনী আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, ঝগড়ার পর না খাইয়াই আবার বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেল। বিকালে অজিতের সঙ্গে সে গেল যশোদার বাড়ী।

সত্যপ্রিয় চার টাকা পথ খরচ দিয়া জামাইকে দেশে পাঠাইয়া দিয়াছে যশোদা এ খবরটা জানিত। অজিত খবর দিয়াছিল। অজিত মহীতোষের বন্ধু, বুদ্ধিটাও মহীতোষের তেমন ধারাল নয় যে ঘরের কোন কোন খবর যে বন্ধুর কাছেও চাপিয়া যাওয়া উচিত এটুকু তার খেয়াল থাকিবে। সত্যপ্রিয়ের মনের কোন কথা কেউ কোনদিন ঘুণাক্ষরে টের পায় না, মহীতোষের মনের কথাগুলি বাতাসে উড়িয়া বেড়ায়।

যামিনীকে দেখিয়া যশোদা একটু অবাক হইয়া যায়, তারপর তার প্রস্তাব শুনিয়া যশোদার একেবারে চমক লাগে।

'আমার এখানে থাকবেন মানে কি গো জামাইবাবু ?'

অজিত বুদ্ধিমানের মতো একটু তফাতে সরিয়া গিয়াছিল। যামিনী গম্ভীরভাবে

বলিল 'শ্বশুরের অন্ন আর কতকাল ধ্বংস করব চাঁদের-মা? তাই ভাবছি, অজিতবাবুর মতো আপনার এখানে ঘর ভাড়া করে থাকব।'

'একা?'

'উঁহুঁ, সবাইকে নিয়ে থাকব—অজিতবাবুর মতো।'

যশোদা হাসিয়া ফেলিল। সত্যপ্রিয়ের মেয়েকে নিয়া যামিনীর তার বাড়ীতে ঘরভাড়া করিয়া থাকিবে। এমন ছেলেমানুষী কথা যশোদা জীবনে কখনো শোনে নাই।

'ঝগড়া হয়েছে বুঝি শ্বশুরের সঙ্গে?'

'ঠিক ঝগড়া নয়, ওখানে আর বাস করা যায় না। কি কুক্ষণেই যে বড়লোকের মেয়ে বিয়ে করেছিলাম চাঁদের-মা!'

প্রথমটা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেও শেষ পর্য্যন্ত যশোদা ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝিতে পারে। একটু সহানুভূতি পাইয়াই যামিনীর মুখ খুলিয়া যায়, ফেণাইয়া ফাঁপাইয়া বাড়াইয়া কমাইয়া অবিরাম সে বড়লোকের, বিশেষ করিয়া সত্যপ্রিয়ের মেয়েকে বিবাহ করার ট্র্যাজেডি বর্ণনা করিয়া যায়, দুর্ভাগ্যের ইতিহাস যেন তার শেষ হইবে না।

ব্যাপারটা বুঝিতে যশোদার বিশেষ কষ্ট হয় না, সত্যপ্রিয়কে সে তো চেনেই, যামিনীর মত ছেলেরাও তার অজানা নয়! অন্য কারও ঘরজামাই হইলে যামিনীকে সে আমল দিত কিনা সন্দেহ, সস্ত্রীক যামিনীকে বাড়ীতে থাকিতে দিলে যে হাঙ্গামা আরম্ভ হইবে সেটা সে বেশ অনুমান করিতে পারে। তাছাড়া, বেশীদিন বড়লোক শ্বশুরকে অবহেলা করিয়া শ্বশুরবাড়ীর আরাম ছাড়িয়া এখানে বাস করিয়া থাকিবার মানুষও যামিনী নয়, তার বড়লোক শ্বশুরের কন্যাটিও নয়। সত্যপ্রিয়ের কাছ হইতে একবার ডাক আসিলেই দু'জনে ফিরিয়া যাইবে। সত্যপ্রিয়কে একটু নরম করার জন্য এ বিদ্রোহ।

তবু দু'দিনের জন্যও সত্যপ্রিয়কে একটু বিপাকে ফেলা চলিবে শুধু এই জন্যই যশোদা যামিনীর প্রস্তাবে রাজি হইয়া গেল।

প্রতিহিংসা?

তাছাড়া আর কি বলা চলে! মুখোমুখি দু'টি বাড়ীতে পঁচিশ ত্রিশটি মানুষ নিয়া যশোদার ছিল গুছানো সুখের সংসার, সত্যপ্রিয় সে সংসার ভাঙ্গিয়া

দিয়াছে। সত্যপ্রিয়কে জ্বালাতন করার সুযোগ কি সহজে ছাড়া যায়!

ক্ষতি করার জন্য মানুষকে কষ্ট দিয়া সুখ পাওয়া স্বভাব যশোদার নয়, সত্যপ্রিয়কে আঘাত দেওয়ার জন্য ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন উপায় আবিষ্কার করার কথাটা তার মনেও আসে নাই। যামিনী বাড়ী বহিয়া আসিয়া প্রতিশোধের এরকম একটা সুযোগ হাতে তুলিয়া না দিলে যশোদা কোনদিন কিছু করিত না। তাছাড়া, মেয়ে-জামাইকে এভাবে বাড়ীতে রাখিলে সত্যপ্রিয়ের ধনসম্পদ নষ্ট হইবে না, হাত-পাও ভাঙ্গিবে না। হয়তো শুধু সহ্য করিতে হইবে নিছক একটু মানসিক অশান্তি। যশোদার অশান্তির তুলনায় সেটা কিছুই নয়।

'উনি কি মেয়েকে ছেড়ে দেবেন আপনার সঙ্গে?'

'উনি ছেড়ে না দিন, ওঁর মেয়ে আসবে।'

'মেয়েকে চুরি করবেন!' বলিয়া যশোদা হাসে।

যশোদা তামাসা করুক, যামিনীর সমস্যা কিন্তু দাঁড়াইয়াছিল তাই, সত্যপ্রিয়ের মেয়েকে চুরি করিবে, অথবা সকলের সামনে বুক ফুলাইয়া তার হাত ধরিয়া সত্যপ্রিয়ের বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া আসিবে? সত্যপ্রিয়কে আগে হইতে জানাইয়া তার মেয়েকে নিয়া বাড়ী ছাড়া সহজ ব্যাপার নয়, যদিও সে যামিনীর আইন আর শাস্ত্রসম্মত স্ত্রী।

যোগমায়ার সঙ্গে সে দেখা করে দুপুরে, সত্যপ্রিয় যখন বাড়ী থাকে না। পর পর তিনটি দুপুর পরামর্শের পর যোগমায়া মন স্থির করিতে পারে। গরীবের মতো কিন্তু স্বাধীনভাবে থাকিবার অর্থ যোগমায়ার জানা নাই, সেটা তার কাছে একটা কাল্পনিক উত্তেজনাময় নতুনত্ব মাত্র, যশোদার বাড়ীতে থাকিবার কথায় সে খুঁতখুঁত করিতে থাকে। কলিকাতায় এত বাড়ী থাকিতে যশোদার বাড়ীতে কেন? তাছাড়া বাপের বাড়ীর এত কাছে যশোদার বাড়ীতে থাকাটাকি উচিত হইবে, না, ভাল দেখাইবে? নাটক ছাড়া মানায় না এমন অনেক বড় বড় আবোল-তাবোল কথা বকিয়া যশোদার বাড়ীতে বাস করিতে যোগমায়াকে যামিনী যদি বা রাজি করাইতে পারে, চুপি চুপি বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে যোগমায়া কিছুতেই রাজি হয় না।

'কেন, আমি কি পাপ করছি? স্বামীর সঙ্গে স্বামীর ঘর করতে যাব, তা লুকিয়ে চুরিয়ে যাব কেন?'

যোগমায়া এখনো স্বামীর ঘর করিতে যায় নাই, সে অভিজ্ঞতাও তার নাই। সে শুধু শুনিয়াছে, স্বামীর ঘর করিতে যাওয়াটা মেয়েদের মহা গৌরব ও সৌভাগ্যের কথা।

'বাবা যেতে দেবেন না।'

'খুব দেবেন।'

আসল কথা, যোগমায়ারও সখ চাপিয়াছিল, একটু বেড়াইয়া আসিবে, জীবনে একটু নতুনত্ব আনিবে। রাজপ্রাসাদের মত এতবড় বাগান-ঘেরা বাড়ী ঘরভরা গাদা গাদা আপনজন আর আত্মীয়স্বজন, এত সব দামী আসবাব আর দাসদাসী, নানা উপলক্ষে প্রায়ই লোকজনকে খাওয়ানোর হৈ চৈ, কর্ত্তার মেয়ে বলিয়া সকলের উপর এতখানি কর্ত্তৃত্ব, তবু যেন যোগমায়ার সব একঘেয়ে লাগে।

বিবাহের অনেক আগে হইতেই একঘেয়ে লাগে, বাড়ীর বাহিরে খেলা করিতে যাওয়া সত্যপ্রিয় যখন রদ করিয়া দিয়াছিল। বিবাহ হইলে ভাল লাগিবে ভাবিয়াছিল, যামিনীর সঙ্গে রাত কাটাইতে ভাল লাগেও বটে, কিন্তু তাতে কি মানুষের মন ওঠে, বাস্তবতার সঙ্গে সংশ্রব-বিহীন অল্পবয়সী একটি মেয়ের মন ?

যোগমায়ার রাগও হইয়াছিল। যামিনীকে দেশে পাঠানোর জন্য নয়, চার টাকা পথ-খরচ দিয়া যামিনীকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে এই গুজবটা রটিয়াছে বলিয়া। তার স্বামীর সঙ্গে এমন ব্যবহার করে তার বাবা, সকলের কাছে তার স্বামীকে এমনভাবে অপমান করে! স্বামীর সঙ্গে ভাঙা ঘরে সে উপবাস করিবে (কিছুদিন করিবে, সত্যপ্রিয় ব্যস্ত হইয়া ফিরাইয়া আনিতে গেলেই ফিরিয়া আসিবে) তবু আর সে এমন বাপের বাড়ীতে থাকিবে না।

সুতরাং সত্যপ্রিয়ের বাড়ীতে একদিন সত্যই হৈ চৈ পড়িয়া গেল।

মেয়েদের মধ্যে ফিস্‌ফাস্ গুজগাজের শেষ রহিল না। সকলেই বুঝিতে পারিল যে যামিনী রাগ করিয়া যোগমায়াকে নিয়া যাইতেছে, তবু যোগমায়া বাড়ীর যেখানে যায় সেখানেই যেন তাকে ঘিরিয়া জিজ্ঞাসু মেয়েদের সভা বসিতে লাগিল। কেবল সত্যপ্রিয়ের অনুমতি চাহিতে যাওয়ার সময় কেউ তার সঙ্গে গেল না।

যামিনী দুপুরবেলা তার অনুপস্থিতির সময় আসা-যাওয়া করিতেছে শুনিয়া সত্যপ্রিয় মনে মনে একটু হাসিয়াছিল। আর দু'একদিনের মধ্যেই যামিনী আসিয়া

পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিবে। আসল ব্যাপারটা তার কানে গিয়াছিল সকালে যোগমায়া অনুমতি চাহিতে যাওয়ার আগের দিন সন্ধ্যায়। তারপর সত্যপ্রিয় মনে মনে আর হাসে নাই বটে, মেজাজটাও গরম করে নাই।

খবরটা দিতে আসিয়াছিল তার ভগ্নীপতি, খবর দিয়া আফশোষের শব্দ করিয়া বলিয়াছিল, 'আচ্ছা বিপদ হ'ল তো!'

সত্যপ্রিয় আশ্চর্য্য হওয়ার ভাণ করিয়া বলিয়াছিল, 'কিসের বিপদ?'

তার সঙ্গে লড়াই করিবে তার টাকা দিয়া কেনা জামাই? সত্যপ্রিয়ও লড়াই করিতে জানে।

দুরু দুরু বুকে ঘরে গিয়া যোগমায়া ত্থাখে, সত্যপ্রিয় মেঝেতে যোগাসনে বসিয়া সামনে খবরের কাগজ বিছাইয়া ঝুঁকিয়া কাগজ পড়িতেছে।

কি ভাবে কথাটা বলা যায়? কি ভাবে বাপকে জানানো যায়, আমি তোমার বাড়ী ছাড়িয়া চলিলাম? মাথা ঘুরিয়া, গা কাঁপিয়া যোগমায়া অস্থির হইয়া পড়ে, কি ভাবে যে শেষ পর্য্যন্ত কথাটা বলিয়া বসে নিজেই ঠিকমত বুঝিতে পারে না।

সত্যপ্রিয় আগেই মুখ তুলিয়াছিল, সহজভাবে বলে, 'যামিনী নিয়ে যাবে? আচ্ছা। কবে যাবি?'

যোগমায়া বলে, 'আজ।'

সত্যপ্রিয় বলে, 'বেশ।'

যোগমায়ার পৃথিবী অন্ধকার হইয়া যায়। শুধু আশা নয়, যোগমায়ার বিশ্বাস ছিল সত্যপ্রিয় কখনো তাকে পাঠাইতে রাজি হইবে না, রাগ করিবে, বকুনি দিবে, তাকে বুঝাইবে—আর সে তখন কাঁদিয়া কাটিয়া অনর্থ করিবে, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিবে যে, তোমার জন্যেই তো সব গোলমাল, তুমি কেন ওকে অপমান করিলে! তার বদলে, একি! এক কথায় তাকে যাওয়ার অনুমতি দিয়া দিল? এখন তো আর না গিয়ে উপায় থাকবে না।

সত্যপ্রিয় খবরের কাগজ পড়িতে মন দেয়।

কাঁদিতে কাঁদিতে যোগমায়া বলে, 'আমি কিন্তু আর ফিরে আসব না বাবা, আমায় আর আসতে দেবে না।'

সত্যপ্রিয় অন্যমনে বলে, 'বেশ তো!'

যামিনী আসিলে খবরটা দিয়া যোগমায়া চোখ বড় বড় করিয়া প্রশ্ন করে, 'কি

উপায় হবে এখন ?'

এত সহজে অনুমতি পাইয়া যামিনীরও ভাল লাগিতেছিল না, তবু সে জোর করিয়া বলে, 'ভালই তো হ'ল।'

'ছাই হ'ল! তোমার মাথা হ'ল!'

যোগমায়া কাঁদিতে থাকে, কাঁদিতে কাঁদিতে মাথা নাড়িয়া বলে, 'আমি যাব না।'

রাগ করিয়া যামিনীর সঙ্গে ক'দিনের জন্য চলিয়া যাওয়ার কল্পনায় যোগমায়া যত মজা আবিষ্কার করিয়াছিল তার একটাও এখন আর সে খুঁজিয়া পায় না। যা ছিল ছেলেমানুষী তাই এখন ভয়ানক বিপদ দাঁড়াইয়া গিয়াছে!

'যাবে না মানে ?'

'না না, যাব না। কোথায় যাব আমি বাবাকে ছেড়ে ?'

যামিনী আহত হইয়া বলিল, 'বেশ। যাওয়া ঠিক করে এখন উল্টো গাইছ।'

'তুমিই তো কুপরামর্শ দিয়ে মাথা ঘুলিয়ে দিলে আমার ?'

যামিনীর সঙ্গে যোগমায়ার ঝগড়া হইয়া যায়।

বাপকে গিয়ে যোগমায়া বলে, 'না বাবা, আমি যাব না। তোমাদের মনে কষ্ট দিয়ে—'

সত্যপ্রিয় বলে, 'আমাদের আবার কষ্ট কিসের!'

যোগমায়া থমকিয়া যায়। সামলাইয়া উঠিয়া আবার বলে, 'আমি জানি তোমার ইচ্ছে নেই বাবা, তোমার মনে ব্যথা দিয়ে—'

নিজে না গলিলে এজগতে কারও ক্ষমতা নেই সত্যপ্রিয়কে গলায়। তেমনি স্নেহহীন কণ্ঠে নির্ব্বিকার ভাবে সে বলে, 'আমার মনে ব্যথা দিবি কেন ?'

বাপের ব্যবহারে মর্ম্মাহত যোগমায়ার দারুণ অভিমানে আবার মনে হয়, যামিনীর সঙ্গে যাওয়াই ভাল, সত্যপ্রিয় যতদিন নিজে না আনিতে যায় ততদিন না আসাই ভাল।

তবু, কোনরকমে চোখ কান বুজিয়া সে বলে, 'তুমি যদি ওকে একটু মিষ্টি করে বুঝিয়ে বল বাবা—'

সত্যপ্রিয় বলে, 'তোরা দু'জনেই বড় বেশী বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছিস্, মাথায় চড়ে' গেছিস্ দু'জনে।'

অগত্যা যামিনীর সঙ্গে যোগমায়া যশোদার বাড়ীতে গিয়া উঠিল। রওনা

হওয়ার সময় সত্যপ্রিয় বাড়ীতেই ছিল। যোগমায়া ইচ্ছা করিয়াই দেরী করিয়া করিয়া সত্যপ্রিয় বাড়ী ফিরিবার পর রওনা হইয়াছে। যাওয়ার সময় সত্যপ্রিয় যদি নরম হয়? মেয়েকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া মন কেমন করিয়া উঠিলে সে যদি একটু নত হইয়া যামিনীকে মিষ্টি কথায় বুঝাইয়া শান্ত করিয়া যাওয়ার ব্যবস্থা বাতিল করিয়া দেয়?

আগে পরে দু'জনে সত্যপ্রিয়কে প্রণাম করিল। সত্যপ্রিয় যামিনীকে বলিল, 'সাবধানে থেকো' আর যোগমায়াকে বলিল, সাবধানে থাকিস্।'

কয়েক মিনিট পরেই যশোদার বাড়ী। যশোদা হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিল, সুব্রতা হাত ধরিয়া যোগমায়াকে ভিতরে নিয়া গেল, পাড়ার যেসব মেয়েরা যশোদার বাড়ীতে সত্যপ্রিয়ের মেয়ের পদার্পণ দেখিবার জন্য ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল তারা হাঁ করিয়া চাহিয়া রইল।

যশোদাকে যোগমায়া চেনে, তার বাড়ীটি কোনদিন ছাখে নাই। ভিতরে ঢুকিয়া সেও যেদিকে চোখ পড়িতে লাগিল সেইদিকেই হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিতে লাগিল। ঘর দেখিয়া সে যেন মরিয়া গেল। কি সর্ব্বনাশ, এই ঘরে তাকে থাকিতে হইবে নাকি? খাটপালঙ্ক, আলমারী, ড্রেসিংটেব্‌ল এ-সব না থাক, কিন্তু একি দেয়াল, একি মেঝে, একি দরজা জানালা! কতটুকু ঘর!

সুব্রতা আনন্দে ডগমগ হইয়া বলিল, 'যাক্, এ্যদ্দিনে একজন মনের মত সঙ্গী জুটল। তোমার ভাইয়ের কাছে তোমার কথা এত শুনেছি ভাই!'

'তুমি আমার ভাইকে চেনো?'

'চিনি না? কবে থেকে চিনি।'

'কি করে চিনলে?'

প্রশ্ন শুনিয়া মনের মত সঙ্গী সত্যই জুটিয়াছে কিনা সে বিষয়ে বড়ই সন্দেহ জাগায় সুব্রতা একটু দমিয়া গেল।

'ওঁর সঙ্গে পরিচয় আছে। তোমার দাদা ওঁর বন্ধু।

'তাই নাকি? তাতো জানতাম না।'

যশোদা যোগমায়াকে দেখিয়াই দমিয়া গিয়াছিল। পাড়ার মেয়েদের আস্তে আস্তে বিদায় করিয়া সে যামিনীকে নিয়া পড়িল।

'আপনার কেমন ধারা বিবেচনা জামাইবাবু?'

'কেন চাঁদের-মা ?'

'দু'দিন বাদে ওর ছেলেপিলে হবে, ওকে নিয়ে এসময় টানা-হ্যাঁচড়া হাঙ্গামা আরম্ভ করেছেন ? প্রথমবার লোকে কত সাবধানে রাখে, মন ভাল রাখার জন্য বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেয়, আর আপনি এমন একটা বিচ্ছিরি কাণ্ড বাধিয়ে বসলেন। বয়স তো কম হয় নি আপনার ?'

যামিনী আমৃতা আমৃতা করিয়া বলিল, 'এখনো দেরী আছে।'

যশোদা ফোঁস করিয়া উঠিল, 'ছাই আছে। ও দু'চার মাস সময় কোন্ দিক দিয়ে কেটে যাবে টেরও পাবেন না। দেরী থাকলেই বা কি, এ সময় কেউ এমনি হাঙ্গামা করে ?'

যশোদার বড় অনুতাপ হয়। সত্যপ্রিয়কে খোঁচা দেওয়ার সুযোগ পাইয়া খুসী হওয়ার সময় তার মেয়ের কথাটা মনে রাখা উচিত ছিল। সে অবশ্য জানিত না যোগমায়ার এরকম অবস্থা, তবু এতটুকু একটা মেয়ের মনে এই ধরণের হাঙ্গামার ব্যাপার কি রকম আঘাত দিতে পারে সেটা অনুমান করা তো তার পক্ষে কঠিন ছিল না। মানুষকে হিংসা করিলে এমনি হয়, এক-জনকে হিংসা করিতে গিয়া মনেও থাকে না আরও অনেকে তার ফলভোগ করিবে।

কি আর করা যায়, যোগমায়ার মনটা একটু ভাল করার জন্য যশোদা চেষ্টা আরম্ভ করে। গল্প জুড়িয়া দেয়, হাসি-তামাসা করে, গম্ভীরমুখে বলে, 'দু'দিনের জন্য বেড়াতে তো এলে দিদি, দু'দিন বাদে বাপ যখন গাড়ী পাঠিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, ঘর যে তখন আমার খালি হয়ে যাবে বাছা ?'

'বাবা আর আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবে না যশোদাদিদি।' যোগমায়া কাতর-ভাবে বলে।

যশোদা হাসিয়া বলে, 'থামো বাছা তুমি। বাপ কখনো মেয়েকে ত্যাগ করতে পারে ?'

'আমার বাবার ভীষণ রাগ, তুমি জানো না। চলে আসতে যখন দিয়েছে, কখ্‌খনো আর ফিরে যেতে দেবে না।'

'দেবে—আমি বলছি দেবে। বাপ-মার রাগ ক'দিন টেঁকে ? দু'দিন বাদে রাগ জল হয়ে গেলে যখন মন কেমন করতে আরম্ভ করবে, নিজে এসে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে তোমাদের।'

কুমুদিনী প্রথম হইতে একপাশে মুখ বুজিয়া বসিয়াছিল, এবার সে সংক্ষেপে জিজ্ঞাসা করে, 'রাগারাগি করে এসেছে বুঝি ?'

যশোদা বলে, 'কিসের রাগারাগি ? সংসারে অমন কথা কাটাকাটি হয় ।'

যামিনী ও সত্যপ্রিয়ের কলহের ব্যাপারটাই যশোদা একেবারে তুচ্ছ করিয়া উড়াইয়া দিতে চায়। যামিনী শ্বশুরের সঙ্গে আর সত্যপ্রিয় জামাইয়ের সঙ্গে যেন একটু ছেলেখেলা করিতেছে, যশোদার ভাবটা এই রকম। যোগমায়াকে সাহস দেওয়ার জন্য এটা শুধু যশোদার ছলনা নয়। সত্যপ্রিয়কে সে জানে। পুতুল কথা না শুনিলে ছোটছেলে যেমন তার অত সাধের পুতুলটি ঠুকিয়া ঠুকিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলে, সত্যপ্রিয়ও তেমনি তার অবাধ্য প্রিয়জনকে পিষিয়া ফেলিতে পারে অনায়াসেই। তবু যশোদা বিশ্বাস করিতে পারে না সত্যপ্রিয় মেয়েকে ফিরাইয়া নেওয়ার ব্যবস্থা না করিয়া বেশীদিন চুপ করিয়া থাকিবে।

যোগমায়া যশোদার সঙ্গে যেন একেবারে আঁটিয়া যায়। অনেক দিন আগে, যশোদার বাড়ীতে যখন শুধু কুলি-মজুরের অস্তানা ছিল, আর সত্যপ্রিয় হঠাৎ যশোদাকে খাতির করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, একদিন সত্যপ্রিয়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়া বেয়াদবী করার জন্য যশোদা যোগমায়াকে আচ্ছা করিয়া শাসন করিয়া দিয়াছিল। সাপের মতো ফোঁস ফোঁস করিয়াছিল সেদিন যোগমায়া। আজ যখন রাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসে বিদ্যুতের আলো জ্বলে না, ঘরের দেয়াল সরিয়া সরিয়া আসিয়া চাপ দিতে থাকে, দম আটকাইয়া আসে, ভবিষ্যৎ অন্ধকার মনে হয়, যোগমায়া যশোদার কাছে সরিয়া সরিয়া আসে, পিছু পিছু ঘুরিয়া বেড়ায়।

'ঘরটা গুছিয়ে নাও ?' যশোদা বলে।

'আমার কি হবে যশোদাদিদি !' যোগমায়া বলে।

ধনঞ্জয় ঘরে আর রোয়াকে বসিয়া বসিয়া সব দেখিতেছিল, এক ফাঁকে চুপিচুপি যশোদাকে জিজ্ঞাসা করে, 'ওরা এখানে থাকবে নাকি চাঁদের-মা ?'

যশোদা বলে, 'না।'

পরদিন খুব ভোরে উঠিয়া যশোদা উনান ধরাইতেছে, যামিনী উঠিয়া আসিল মুখখানা শুকাইয়া গিয়াছে, চোখ ঘুমে ঢুলুঢুলু।

'ঘুমোচ্ছে ?'

'হ্যাঁ। এই তো ঘুমোলো চারটের সময়।'

যশোদা তা জানিত।

'খুব কেঁদেছে, না ?'

'শুধু কান্না ! কি বিপদেই যে পড়লাম চাঁদের-মা।'

যশোদা তাও জানিত। একটা আফ্‌শোষের শব্দ করিল।

যামিনী মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বলিল, 'একটা বড় দেখে বাড়ী ঠিক করে' উঠে যাব চাঁদের-মা ?'

যামিনীর কাছে শ'খানেক টাকা আছে, যোগমায়ার কাছেও আছে সাতাত্তর টাকা। যোগমায়ার গায়ে আর বাক্সে গয়না আছে অনেক। কিন্তু যশোদা সংক্ষেপে বলিল, 'বড় বাড়ী দিয়ে কি হবে ? ক'টা দিন যাক।'

যশোদা ভাবিয়াছিল, দু'একদিনের মধ্যেই সত্যপ্রিয়ের কোন আত্মীয় মধ্যস্থ হইয়া আসিবে। কিন্তু চার পাঁচদিন কাটিয়া যায় কারও পাত্তা মেলে না। সত্যপ্রিয় যেন সত্যই মেয়ে-জামাইকে ত্যাগ করিয়াছে। যোগমায়ার অবস্থা দিন দিন কাহিল হইতে থাকে, যশোদা না থাকিলে ইতিমধ্যেই হয়তো তার নার্ভস্ ব্রেকডাউন ঘটিয়া যাইত। যশোদা তাকে আদর করে, ধমক দেয়, নানা ভাবে বুঝাইয়া শান্ত করিয়া রাখে। কিন্তু মনের যার জোর নাই একেবারে, কতটুকু মনের জোর তার মধ্যে সংক্রামিত করা যায় ? ধার-করা মনের জোর কতক্ষণ কাজে লাগে মানুষের ?

যশোদা যখন বলে, 'এরকম যদি করবে, এলে কেন ?'

যোগমায়া বলে, 'আমি আসিনি, আমায় জোর করে এনেছে।'

যামিনী যখন বলে, 'এমন জানলে তোমায় আমি আনতাম না।'

যোগমায়া বলে, 'আমাকে মেরে ফেলে বাবাকে কষ্ট দেবে বলে তুমি আমায় জোর করে এনেছ।'

'চলো তবে তোমায় রেখে আসি ?'

'বাবা না ডাকলে কি করে যাব ?'

শুধু এই একটি বিষয়ে সত্যপ্রিয়ের মেয়ের মতই তার তেজ দেখা যায়। অথবা সত্যপ্রিয়ের মেয়ে বলিয়াই হয়তো সে হিসাব করে যে না ডাকিতে ফিরিয়া গেলে ভবিষ্যতে প্রায় চলিয়া যাওয়ার ভয় দেখানোর সুবিধা থাকিবে না।

সাতদিনের দিন সকালে মহীতোষ আসিল। অজিত আর সুব্রতার সঙ্গে মহীতোষ মাঝে মাঝে আড্ডা দেয়, তবে সেটা তার নিজের গাড়ীতে অথবা মাঠে ঘাটে হোটেল সিনেমায়, যশোদার বাড়ীর মধ্যে নয়। এবার কোথা হইতে পায়ে হাঁটিয়া আসিয়া ভিতরে ঢুকিয়া সে একটা পিঁড়ি দখল করিয়া বসিল।

যোগমায়া তো আনন্দে প্রায় পাগল হওয়ার উপক্রম।—'দাদা! দাদা এসেছো! তুমি কোত্থেকে এলে দাদা? বাবা পাঠিয়েছে?'

মহীতোষ নিষ্ঠুরের মত নির্ব্বিকার হাসি হাসিয়া বলিল, 'বাবা পাঠাবেন বৈকি! কাউকে আসতেই বাবা আরও বারণ করে' দিয়েছেন, বাবা পাঠাবেন!'

যোগমায়া দমিয়া গেল।—'বারণ করে' দিয়েছেন!'

'করবেন না? যা কীর্ত্তিটাই তোমরা করলে!'

যশোদা মৃদু প্রতিবাদের সুরে বলিল, 'আহা, কেন মিছে ঘাব্‌ড়ে দিচ্ছেন ওদের? রাগ করবেন সে তো জানা কথা—ও রাগ কি টেঁকে? সব ঠিক হয়ে যাবে।'

মহীতোষ সায় দিয়া বলিল, 'তা যাবে—তা যাবে। নিশ্চয় যাবে। তবে কিনা—তা ঠিক, সব ঠিক হয়ে যাবে বৈকি।'

'অন্য সবাই বলে না আমার কথা?'

'বলে বৈকি।'

'কি বলে বলো না দাদা?'

'নিন্দে করে, আবার কি বলবে।'

শুনিয়া যোগমায়া স্তব্ধ হইয়া যায়। নিন্দা করিবে বৈকি, স্পর্দ্ধা কি কম সকলের! করুক, যত পারে নিন্দা করুক। ফিরিয়া গিয়া নিন্দা করার মজাটা সকলকে সে যদি টের না পাওয়াইয়া দেয়—

যোগমায়ার মন যতই খারাপ থাক আর বাড়ীঘরের অবস্থার জন্য যতই লম্বা করিয়া কান্না আসুক, এটা তো ধরিতে গেলে একরকম তার নিজের বাড়ী, এখানকার কুঁড়ে ঘরেও তারই তো সংসার। মহীতোষকে যে কি দিয়া অভ্যর্থনা আর আদর-যত্ন করিবে সে ভাবিয়া পায় না। শেষে, একরাশ বাজারের খাবার আনাইয়া তাকে খাইতে দেয় আর খুঁটিয়া খুঁটিয়া বাড়ীর সব খবর জিজ্ঞাসা করে। ক'দিন আর সে বাড়ী ছাড়িয়াছে, ক'দিনের মধ্যেই কতগুলি বছর যেন কাবার হইয়া গিয়াছে। জবাব দিতে দিতে মহীতোষ বিব্রত আর বিরক্ত হইয়া বলে, 'সবাই

ভাল আছে, সব ঠিক আছে। যেমন ছিল তেমনি সব আছে। কেন ভাবছিস ?'

যেমন ছিল সব তেমনি আছে ? সে চলিয়া আসিয়াছে বলিয়া এতটুকু পরিবর্ত্তন হয় নাই ? একটু কাঁদাকাটাও করে নাই কেউ ? যোগমায়া দুঃখে অভিমানে ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া কাঁদিতে থাকে।

আরও বেশী বিব্রত হইয়া কয়েক মিনিট বসিয়াই মহীতোষ উঠিয়া পড়ে।

যোগমায়া কান্না থামাইয়া আবদার জানায়: 'রোজ একবার করে এসো কিন্তু দাদা।'

'আসব।'

'আর শোন বাবা যদি জিজ্ঞেস করে আমার কথা—'

'বাবা কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। আমি এসেছিলাম জানতে পেরে আমায় না খেয়ে ফেলে।'

মেয়ের খোঁজখবর নিতে সকলকে বারণ করিয়াছে ? মেয়ে-জামাইকে ঘরে ফিরানোর চেষ্টাটা সত্যপ্রিয়ের দিক হইতে আরম্ভ হইবে এটা বোধ হয় তবে আর আশা করা যায় না। আশা কেন যশোদা করিয়াছিল, যশোদা নিজেই জানে না। মেয়ে-জামাই অন্য কোথাও গেলে হয়তো সত্যপ্রিয় কিছু করিত, তারা যশোদার বাড়ীতে আসিয়া উঠিয়াছে বলিয়াই বোধ হয় সে গুম্ খাইয়া গিয়াছে। এবং হয়তো গুম্ খাইয়াই থাকিবে। অথবা হয়তো এমন কিছু করিবে যাতে মেয়ে-জামাই তার যশোদার বাড়ী ছাড়িয়া তার পায়ের উপর গিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িবে আর যশোদার হইবে সর্ব্বনাশ। কি ভাবে সত্যপ্রিয়ের পক্ষে এটা করা সম্ভব যশোদা ভাবিয়া না পাক, সত্যপ্রিয়ের মগজে ওরকম অনেক মতলব ঠাসা থাকে, সাধারণ মানুষের কাছে যা দুর্ব্বোধ্য কল্পনাতীত।

কিন্তু আগে মেয়ে-জামাই-এর একটা ব্যবস্থা না করিয়া সে কি যশোদার কিছু করিবে ? কে জানে, হয়তো যার উপর রাগ হইয়াছে তাকে পিষিয়া মারার জন্য মেয়ে-জামাই-এর ভাল-মন্দের কথাটাও সে ভাবিবে না। মেয়ে-জামাইকেই হয়তো যশোদাকে জব্দ করার কাজে ব্যবহার করিবে। ওদের উপরেও তো সে কম রাগে নাই!

যশোদার মনটা খারাপ হইয়া থাকে। আবার সত্যপ্রিয়ের সঙ্গে লড়াই আরম্ভ হইয়া গেল ? একটা তুচ্ছ বাজে উপলক্ষে ? আদর্শবাদের ব্যাপারটা

যশোদা একেবারেই বোঝে না, তবু তার সহজবুদ্ধিতেই সে বুঝিতে পারে, এবারকার লড়াইটা একেবারে অর্থহীন, জগতে কারও এতে কোন উপকার হইবে না।

যোগমায়ার মনটা খারাপ হইয়া গেল বীভৎস রকমের। তার রকমসকম দেখিয়া যশোদাও ভড়কাইয়া গেল। কোন বিষয়ে ভড়কাইয়া যাওয়া যশোদার বড় অপছন্দ। বিরক্ত হইয়া যোগমায়াকে একেবারে সে আচ্ছা করিয়া ধমকাইয়া দিল, তারপর অনেক আদর করিল, তারপর নিজের বিষাদের স্বপ্ন ঝাড়িয়া ফেলার মত মাথা ঝাঁকি দিয়া বলিল, 'কি মন খারাপ করে আছি আমরা সবাই মিছিমিছি! বাড়ীতে যেন মড়া জমেছে ক'গণ্ডা। এসো তো বাছা সবাই মিলে একটু ফুর্তি করি আজ। কি করা যায় বল তো?'

সুব্রতাই ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, 'সিনেমায় যাবে দিদি সবাই মিলে?'

সিনেমা-থিয়েটার যাওয়া ছাড়া ফুর্তি করার আর কোন উপায়ের কথা সুব্রতার জানা আছে কিনা সন্দেহ।

যশোদা না ভাবিয়াই বলিল, 'তাই চল।'

সহরতলীতে থাকিয়াও কতকাল যশোদা সিনেমায় যায় নাই তার নিজেরও মনে নাই। নন্দ আর সুবর্ণকে পর্দ্দায় দেখিতে যাওয়ার ইচ্ছাটা আজকাল জোরালো হইয়া উঠিয়াছিল, যাই-যাই করিয়াও এতদিন যাওয়া হয় নাই। ভাবপ্রবণ ব্যাকুলতাকে যশোদা বড় ভয় করে। নন্দকে পর্দ্দায় নড়িয়া চড়িয়া কথা বলিতে দেখিলে আর তার গান শুনিলে হয়তো সে ব্যাকুল হইয়া পড়িবে। এই আশঙ্কাটা যশোদাকে আটকাইয়া দিয়াছিল। সাধ করিয়া ওরকম ব্যাকুল হইয়া লাভ কি—ও তো মদ খাইয়া মাতাল হওয়ার সামিল!

আজ সে সুব্রতাকে বলিল, 'সেই ছবিটা দেখতে যাব—সেই যে সেদিন দেখে এসে আমায় বল্লে, একটা ছেলে চমৎকার গান গায়?'

সুব্রতা বলিল, 'সেটা তো আমি দেখেছি। একটা নতুন ছবি হচ্ছে, খুব ভাল বই, সেটা দেখবে চল।'

যশোদা বলিল, 'না, ওই ছবিটা দেখব। এক ছবি দু'বার দেখলে তুমি মরবে না। ইচ্ছে না হয়, যেও না।'

আট

সকলে সিনেমায় গেল দল বাঁধিয়া। যশোদার বাড়ীতে যারা বাস করিতেছিল। তারা তো গেলই, বাহির হতে আসিয়া যোগ দিল কুমুদিনী আর কেদার।

যোগমায়া শেষ মুহূর্তে হঠাৎ বাঁকিয়া বসিয়াছিল।

সকলে তখন সাজগোজ করিয়াছে, কেদার আর কুমুদিনীও আসিয়া হাজির হইয়াছে। যশোদার সিনেমায় যাওয়ার উপযুক্ত বেশভূষা করা নিয়া একটু হাঙ্গামা বাধিয়াছিল—সেরকম কাপড় কই, ব্লাউজ কই? সুব্রতা যাচিয়া যশোদাকে কাপড় আর ব্লাউজ ধার দিতে গিয়াছিল, বলিয়াছিল, 'আমার এই কাপড়টা পরো না দিদি, আর এই ব্লাউজটা।'

অনেক দিনের পুরোনো তোরঙ্গ ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে যশোদা বলিয়াছিল, 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? তোমার জামা আমার হাতে ঢুকবে কিনা সন্দেহ, গায়ে দেব!'

'আচ্ছা, কাপড়টা পরো তাহ'লে।'

'না দিদি, আমার যা আছে তাই ভাল।'

সুব্রতার মুখখানা ম্লান হইয়া গিয়াছিল।

'জানো দিদি, তোমার এই স্বভাবের জন্য তোমায় কেউ দেখতে পারে না।'

চওড়া পাড় পরিষ্কার একখানা সাদা শাড়ী পরিয়া যশোদা নিজেই একটু হাসিয়াছিল।—'রঙিন কাপড় পরার বয়েস কি আর আছে বোন? তোমার এমনি সাদাসিদে কাপড় থাকলে পরতাম। তোমার ঐ কাপড় পরে বৌ সাজি, আর আমায় দেখে সং ভেবে সবাই হাসুক, অত বোকা তোমার দিদিকে পাওনি।'

'রঙীন কাপড় পরলে লোকে হাসবে, এত বুড়ী তুমি হওনি দিদি। তোমার বয়েসে সবাই সাজগোজ করে।'

জামাকাপড়ের এই আলোচনায় বোধ হয় যোগমায়ার খেয়াল হইয়াছিল, একে একে সে চাহিয়া দেখিয়াছিল সকলের দিকে। তারপর চাহিয়াছিল নিজের জমকাল শাড়ীখানার দিকে। এদের সঙ্গে সে সিনেমা দেখিতে যাইবে, এদের সঙ্গিনী হিসাবে? কি ভাবিবে লোকে? চেনা লোকে যদি তাকে এদের সঙ্গে দেখতে পায়? এ পাড়াটা পার হইয়া যাওয়ার সময় তো অনেক

চেনা লোকের চোখে পড়িয়া যাইবে, সত্যপ্রিয় চক্রবর্ত্তীর মেয়ে সে, কে না তাকে চেনে এপাড়ায় ?

তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়া যোগমায়া কাপড় ছাড়িয়া ফেলিতে আরম্ভ করিল। একটু পরে রওনা হওয়ার সময়েও তাকে ঘরের বাহির হইতে না দেখিয়া সুব্রতা ডাকিতে গেল।

যোগমায়া বলিল, 'আমি যাব না, যেতে ইচ্ছে করছে না আমার।'

'কেন ? হঠাৎ তোমার কি হল, যাবার জন্য তৈরী হয়ে ?'

'বললাম তো ইচ্ছে করছে না।'

সুব্রতা মুখ ভার করিয়া ফিরিয়া আসিয়া খবর দিল, 'ও যাবে না দিদি। কাপড়চোপড় ছেড়ে বসে' আছে।'

তখন ব্যাপার বুঝিতে গেল যশোদা।

মুখ ভার করিয়া যোগমায়া চৌকিতে বসিয়া আছে, বিনা দোষে কে যেন তাকে তিরস্কার করিয়াছে অনেক।

'কি হ'ল হঠাৎ যাবেনা কেন ?'

'ভাল লাগছে না যশোদা দিদি !'

যশোদা একটু হাসিল, বলিল, 'সেজেগুজে রওনা হওয়ার সময় হঠাৎ এরকম ভাল না লাগা তো ভাল কথা নয়। চলো, লোকে কিছু ভাববে না। যদি ভাবে তো ভাববে যে, আমরা তোমার চাকর-দাসী—তুমি কোথাকার রাজরাণীটাণী হবে, পাঁচ-সাতজন চাকর-দাসী নিয়ে বায়োস্কোপ দেখতে এসেছো।'

যোগমায়া চোখও তোলে নাই, আর কথাও বলে নাই।

যশোদা গম্ভীর হইয়া বলিয়াছিল, 'তার চেয়ে এক কাজ কর না ? সাদা-সিদে একখানা কাপড় প'রে চলো, এ কাপড়টা তোলা থাক। আমাদের সঙ্গে একেবারে মিশে যাবে—মনের খুঁতখুঁতানিটা যদি চাপতে পার কোনরকমে, 'কি ফুর্ত্তিটা হবে বলতো ?'

পাশে বসিয়া যোগমায়াকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল, 'নতুন কিছু একটা করেই ত্থাখোনা আমার কথায়—খেলা মনে করে করে ত্থাখো একবার ? সখ করে

সাদাসিদে একখানা শাড়ী পরিয়াই শেষে যোগমায়া দলে ভিড়িয়াছিল।

সকলেই হাসিখুসী, অল্পবিস্তর উত্তেজিত—উত্তেজনা ছাড়া তো আনন্দ হয় না। কেবল যোগমায়ার উত্তেজনার মধ্যে আনন্দ নাই, যশোদার হুকুমে সে সকলের সঙ্গে আসিয়াছে কিন্তু মন কেন খুসী হওয়ার হুকুম মানিবে ?

টিকিট আগেই করা ছিল, সকলে ভিতরে গিয়া বসিল। আরম্ভ হইতে তখনও আধঘণ্টার উপরে দেরী। তবে তাতে কিছু আসে যায় না। অজিত আর যামিনী নিয়মিত সিনেমা ত্মাখে, তারা ছাড়া, এ আধঘণ্টা সকলের কাছেই উপভোগ্য, যে আনন্দ টিকিটের দামে কেনা হইয়াছে তার ফাউ। একেবারে অপরিচিত না হোক এই আলো-ঝলমল গুঞ্জনধ্বনি-মুখরিত ঘনীভূত আধুনিকতার জগতে সময় কাটানোর অভ্যাস যশোদার নাই। সকলের আগে যশোদার মনে হয় চারিদিকের দেয়াল আর ছাদগুলি যেন শিশুকে ভুলানোর জন্যে মুখে রঙ-মাখা সুন্দরী মেয়ের মত অসহ্য কৌতুকের উদ্ভট মুখভঙ্গি করিয়া আছে। ঘরের দেওয়ালে, আনাচে-কানাচে সর্ব্বত্র হাস্যকর অনিয়ম। কোণগুলি কোণ নয়, রেখাগুলি সাপের মত আঁকা বাঁকা, এখানে ওখানে দু'চার হাত সমতল স্থান যদি বা থাকিয়া গিয়াছে রঙের কায়দায় সেখানটাও দেখাইতেছে উঁচুনীচু। কেমন পছন্দ মানুষের কে জানে, এমন খাপছাড়া ভঙ্গিতে ঘর তৈরী করে আর ঘর সাজানোর মধ্যে এমন কুৎসিৎ অসামঞ্জস্য সৃষ্টি করে !

হল ইতিমধ্যেই প্রায় ভরিয়া গিয়াছিল, এখনও ক্রমাগত লোক ঢুকিতেছে—ছোট বড় গৃহস্থ পরিবার, স্কুল কলেজের যুবক, মাঝবয়সী ও বৃদ্ধ। মধ্যবিত্ত পরিবারের সংখ্যাই বেশী, রঙীন শাড়ী আর গয়নায় সাজানো পুতুলের মত বৌ আর তার স্বামী, কোন কোন স্বামীর কোলে একটি শিশু, আবার অনেক দলে অল্পবয়সী মেয়ে বৌ-এর সঙ্গে বাড়ীর বয়স্কা গৃহিণীও আছে, সাজগোজটা তার একেবারে তুচ্ছ নয়।

যশোদার মনে হয়, এরা সকলেই যেন তার চেনা মানুষ—ঠিক সামনের সিটের গল্প-বিভোর প্রেমিক-প্রেমিকা দু'টিকে যেমন চেনে, খানিক তফাতে পাশাপাশি প্রায় তিন গণ্ডা সিট দখল করিয়া যে পরিবারটি বসিয়াছে তাদেরও তেমনি চেনে। সবাই যেন তার প্রতিবেশী, পাশের বাড়ীর লোক।

কুমুদিনী বলিল, 'ভিড় হয়েছে তো খুব।'

সুব্রতা সগর্ব্বে বলিল, 'বলিনি ভাল ছবি? কতদিন হল চলছে, এখনো ভিড় হয়।'

যোগমায়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সে শুধু চারিদিকে চাহিতেছিল আর কেউ তার দিকে ঈর্ষার দৃষ্টিতে চাহিয়া নাই বলিয়া জ্বালা বোধ করিতেছিল। জমকালো শাড়ী গয়নার অভাবে তার মনে হইতেছিল ভিড়ের মধ্যে সে যেন একটু উলঙ্গ হইয়া বসিয়া আছে। কি ভাগ্যে চেনা কারও সঙ্গে দেখা হইয়া যায় নাই!'

যশোদাও চুপ করিয়াছিল। ছবি আরম্ভ হওয়ার আগে হইতেই সে প্রতীক্ষা করিয়া আছে, কখন নন্দ পর্দ্দায় আসিবে!

'কত দেরী ছবি সুরু হতে?'

'এইবার সুরু হবে।'

যশোদার আগ্রহে সুব্রতা মনে মনে একটু হাসিল। যারা কখনো সিনেমায় আসে না, তারা এই রকম অধীর হইয়া পড়ে।

তারপর ঘর অন্ধকার করিয়া ছবি আরম্ভ হইল। যশোদা অন্ধকারে নিশ্চিন্তমনে ব্যাকুল আগ্রহের সঙ্গে প্রতিমুহূর্ত্তে পর্দ্দায় নন্দের আবির্ভাবের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু কোথায় নন্দ? এলোমেলো কতকগুলি নরনারী পর্দ্দায় নড়াচড়া করিয়া আবোল-তাবোল কি সব বলে গেল, তারপর আবার আলো জ্বলিয়া উঠিল। সুব্রতা কি ভুল করিয়াছে?

যশোদা সুব্রতাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কই সেই ছেলেটা তো গান করল না?'

সুব্রতা সবজান্তার মত বলিল, 'বই তো এখনো আরম্ভ হয়নি। বেশী বড় বই হ'লে হাফ-টাইমের আগে দেয়। ছোট বই হ'লে শীগ্‌গির হাফ-টাইম দিয়ে, পরে দেয়। কমিকটা সুন্দর হয়েছে, না?'

যোগমায়া সব-ভুলিয়া-যাওয়া উজ্জ্বল হাসির সঙ্গে বলিল, 'সত্যি। কি জব্দই হ'ল ছেলেটা মেয়েটার কাছে! বিয়ে করে তবে রেহাই।'

কুমুদিনী বলিল, 'জব্দ হল কিনা কে জানে!'

যোগমায়ার হাসি আরও উছলিয়া উঠিল: 'সত্যি! ঠিক্! বিয়ে করতেই তো চাইছিল।'

কমিক? বিয়ের কমিক? যশোদা রাগ করিয়া সোজা হইয়া বসে। এমন কেন হইয়াছে আজকাল, চোখের সামনে যা ঘটে তাও চোখে পড়ে না? মনে কষ্ট পাওয়ার কারণ ঘটিয়াছে, মনে কষ্ট হোক, তাতে যশোদার আপত্তি নাই। হাল-ভাঙ্গা নৌকার মত দিশেহারা হইলে চলিবে কেন?

আসল ছবি আরম্ভ হওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই নন্দের আবির্ভাব ঘটিল। নন্দই বটে, কিন্তু যেন কোন্ দেশী নন্দ, একেবারে চেনাই যায় না। সায়েব বাড়ীর একটা ঘরে বাঙ্গালী বাড়ীর একটা মেয়ে অর্গান বাজাইয়া গান গাহিতেছিল, এমন সময় আসিল সাহেবী পোষাক পরা নন্দ। গান শেষ হওয়া পর্য্যন্ত মেয়েটি টেরও পাইল না কেউ ঘরে আসিয়াছে, তারপর চমকমারা, লজ্জাভরা আনন্দময় বিস্ময়ের সঙ্গে তাড়াতাড়ি অর্গান ছাড়িয়া উঠিয়া আসিল। তারপর অনেকক্ষণ একটি অতি বুদ্ধিমতী মেয়ে আর অতি বুদ্ধিমান ছেলের কথা কাটাকাটি, হাসি তামাসা অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি চলিতে লাগিল। প্রথমেই নন্দ একটা গান শোনানোর অনুরোধ জানাইয়াছিল এবং মেয়েটি বলিয়াছিল নন্দর মত গায়কের সামনে সে কিছুতেই গান করিবে না ; ধেৎ, তাই কি সে পারে, তার লজ্জা করে না বুঝি ? মনে হইতে লাগিল, এ তর্কের জের যেন তাদের মিটিবে না। কথায় কথায় অন্য কথা আরম্ভ করিয়া নিজেদের সম্বন্ধে কত কথাই যে তারা দর্শকদের জানাইয়া দিতে লাগিল, মাঝে মাঝে কত বাড়ীর লোক আর বাহিরের কত বন্ধু ও বান্ধবী বাজে ছুতায় আসিয়া দর্শকদের কাছে কৌশলে নিজেদের পরিচয় জানাইয়া চলিয়া গেল, তার পরে ও দু'জনের মধ্যে কে আগে গান করিবে এ সমস্যা ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

'কেন শুনতে চাইছ গান ?'

'তোমার গান বলে।'

'তার মানে আমি গাইতে পারি না। আমার গান বলে কোনরকমে শুনবে।'

'তোমার চেয়ে গান দামী, গানের চেয়ে তুমি দামী। গানে গানে সুরের মূর্ছনায় তুমি যখন জগৎ ভরে দাও, আমি নিজেকে ভুলে যাই।'

'আমিও। তুমি আগে গাও।'

'না, তুমি আগে।'

কি মানে দু'জনের এই কথা কথাকাটির ? যশোদা ভাবিয়া পায় না। সে তো জানে না দু'জনের গান সম্বন্ধে দর্শকের কৌতূহল বাড়ানোর এটা কৌশল।

তখন নন্দ বলিল, 'দু'জনে মিলে সেই গানটা গাই এসো।'

অর্গানের ধারে-কাছেও কেউ গেল না, নেপথ্যে কোথায় যেন গান আরম্ভ হওয়ার আগেই বাজনা বাজিয়া উঠিল—বাঁশী, বেহালা, হারমোনিয়াম, তবলা

ইত্যাদির ঐক্যতান।

পালা করিয়া দু'জনে গান গায়, কাছাকাছি আসিয়া পরস্পরকে ধরাধরি করে, চোখে চোখে চাহিয়া থাকে, হঠাৎ পাক দিয়া তফাতে সরিয়া যায়। সকলে মুগ্ধ হইয়া ছাখে আর শোনে।

যশোদা যাত্রায় এরকম ডুয়েট্ গান অনেক শুনিয়াছে, তবে এতটা খাপছাড়া আর মার্জ্জিত নয়। যাত্রার ডুয়েট্ গান যেন কাহিনী, আবেষ্টনী আর অভিনয়ের সঙ্গে বেশ মানায়।

তবে এখানে নন্দ আছে।

পর্দ্দার কাহিনী আগাইয়া চলে, কোন্ দেশের মানুষের কোন্‌দেশী কাহিনী বুঝিয়া উঠিতে গিয়া যশোদার ধাঁধাঁ লাগিয়া যায়। যে ঘটনা ঘটা উচিত সে ঘটনা ঘটে না, যার যে কথা বলা উচিত সে সে-কথা বলে না, অথচ মাঝে মাঝে ঘরোয়া ঘটনা উঁকি দিয়া যায়, ঘরোয়া কথা কানে আসে।

আগাগোড়া সবটা রূপকথা হইলে বোধ হয় যশোদা এতটা বিব্রত হইয়া পড়িত না। রূপকথাতেও আগাগোড়া একটা সামঞ্জস্য থাকে। যশোদা যখন ভাবে, এইবার নন্দ রাগ করিবে, নন্দ তখন হাল্কা হাসি হাসে, নন্দর হাসি দেখিবার আগ্রহে যশোদা যখন সামনে একটু ঝুঁকিয়া পড়ে, নন্দ তখন রাগে আগুন হইয়া ওঠে।

যশোদার নিজেরই তখন রাগ হয়।

তারপর দেখা দেয় সুবর্ণ। সুবর্ণ একটি অপ্রধান পার্টে নামিয়াছে, অল্পবয়সী বৌ-এর পার্টে। এই পার্টটিই বোধ হয় সে ভাল অভিনয় করিতে শিখিয়াছে।

যশোদাকে সহজে চমক দেওয়া যায় না, সে ধীরে ধীরে নাড়া খায়। সুবর্ণের উপর যশোদা বিশেষ খুসী ছিল না, ছবি শেষ হওয়ার আগেই মেয়েটার জন্য তার যেন বেশ মায়া জন্মিয়া যায়। মনের তলে একটা আশা যশোদার ছিল বৈকি যে একদিন নন্দ আর সুবর্ণ ফিরিয়া আসিবে, দু'জনকে সে ক্ষমা করিবে আর ভাই ও ভাই-এর বৌকে নিয়ে সংসার করিয়া চলিবে সুখে। এখন মনে হইতে থাকে, নন্দ যেন তার সে আশা চিরদিনের জন্য নষ্ট করিয়া দিয়াছে, তার ঘরের বৌকে করিয়া দিয়াছে সিনেমার অভিনেত্রী। জীবনে আর কোনদিন সে তার বাড়ীতে বৌ সাজিয়া থাকিতে আসিবে না।

যশোদা নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবে, আমার মত ভাগ্যবতী সংসারে কেউ নেই। আমি যা ধরতে যাই তাই ফসকে যায়। যে সুখ আমার জোটা উচিত ছিল, তা জোটে না। মরণও হচ্ছে না সেই জন্য ?

বাড়ী ফিরিবার পথে সুব্রতা জিজ্ঞাসা করে, 'কেমন দেখলে দিদি ?'

যশোদা সংক্ষেপে বলে, 'বেশ।'

রাজেন গম্ভীর চিন্তিত মুখে মাঝে মাঝে যশোদার মুখের দিকে তাকায়, কিন্তু কিছু বলে না। মন্তব্য করে কুমুদিনী।

বলে, 'ছেলেটা ঠিক আমাদের নন্দর মত নয় ? গলার আওয়াজটা পর্য্যন্ত একরকম। প্রথমটা আমি তো—'

কেদার বলে, 'আহা, চুপ কর না ?'

খুমুদিনী ফোঁস করিয়া ওঠে, 'কেন, চুপ করব কেন ?'

যশোদা ধীরে ধীরে বলে, 'নন্দর মত নয়, ওই আমাদের নন্দ।'

'ওমা সে কি কথা গো ?'

প্রথমে খানিকক্ষণ কুমুদিনী পলক না ফেলিয়া চাহিয়া থাকে, তারপর যেন প্রকাণ্ড একটা সমস্যা সমাধান করিয়া ফেলিয়াছে এইরকমভাবে বারকয়েক মাথা নাড়িয়া বলে, 'হুঁ, তাই তো বলি, জনে জনে কি এমন মিল থাকে! কেমনধারা সাজ পোষাক করেছে তাই, নইলে কি আর চিনতে একদণ্ড দেরী হ'ত। নন্দ বায়স্কোপ করছে!'

যোগমায়া ধীরে ধীরে বলে, 'আমি দেখেই চিনেছিলাম।'

এ সব আলোচনা যশোদার সহ্য হয় না। সে বিরক্ত হইয়া বলে, 'চেনা মানুষকে চিনবে, তাতে আশ্চর্য্যের কি আছে ? কি যেন আরম্ভ করে দিয়েছ তোমরা।'

মনে মনে যশোদা ভাবে, নন্দকে চিনিতে পারিল, সুবর্ণকে কেউ চিনিতে পারিল না কেন ?'

সমস্ত পথ গম্ভীর হইয়া কি যেন ভাবে কুমুদিনী, বাড়ী ফিরিয়া যশোদাকে একান্তে টানিয়া নিয়া বলে, 'বলি চাঁদের-মা, একটি বৌ দেখলাম জ্যোতির্ম্ময়বাবুর বোনের মত, সে বুঝি—'

'সে সুবর্ণ।'

'মাগো! এসব কি!—'

কুমুদিনীর মুখ দেখিয়া মনে হয় সে বুঝি শুধু আশ্চর্য্য হয় নাই, ভয়ও পাইয়াছে।

পরদিন সকালে রাজেনকে ডাকিয়া যশোদা বলিল, 'একটা কাজ করে দেবে?'

এরকম ভূমিকা করা যশোদার স্বভাব নয়। রাজেন একটু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

'কি কাজ?'

'নন্দর ঠিকানাটা জেনে আসবে?'

'নন্দর ঠিকানা জেনে করবে কি চাঁদের-মা?'

যশোদা হাসিল।—'বেশ মানুষ বটে তুমি, বেশ কথা সুধোচ্ছো।'

রাজেন ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, 'মানে, কি জান চাঁদের-মা, আসবার হ'লে নন্দ নিজেই আসত আগে। বায়স্কোপে পার্ট করলে নাকি ঢের পয়সা পাওয়া যায় শুনেছি, ওর তো পয়সার অভাব নেই—'

'পয়সার কথা নয়, নিজে থেকে ফিরে আসতে হয়তো সাহস পাচ্ছে না।'

তখন নন্দর ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া আনিবার কথা দিয়া রাজেন চলিয়া গেল, যশোদা গেল সত্যপ্রিয়ের বাড়ী।

হঠাৎ তার মনে হইয়াছে, অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে ঝোঁকের মাথায় বাড়ী ছাড়িয়া গেলে যে অনেক সময় সাধ থাকিলেও ফিরিয়া আসিতে ভরসা পায় না, একথাটা সত্যপ্রিয়কে বুঝাইয়া বলা দরকার।

যামিনী স্বাধীনভাবে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াক, বৌকে নিয়া নিজের ভিন্ন সংসার পাতুক, যশোদার তাতে কোন আপত্তি ছিল না। মানুষের মধ্যে এরকম তেজই সে পছন্দ করে। কেবল যোগমায়ার সন্তান-সম্ভাবনার জন্য এসময়টা তাকে নিয়া এরকম টানা-হ্যাঁচড়া করা সঙ্গত নয় বলিয়া প্রথমটা সে অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। এতকাল যে অনায়াসে শ্বশুরের অন্ন ধ্বংস করিয়াছে আর কয়েকটা মাস সে ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিল না? বীরত্ব বা মনুষ্যত্ব তো পাগলামী নয়। বেহিসাবী তেজ দেখানো গোয়ার্ত্তুমির সামিল।

প্রথমে যামিনী বুক ফুলাইয়া বলিত, কুঁড়ে ঘরে না খাইয়া দিন কাটাইবে তবু আর জীবনে কখনও শ্বশুরের অন্ন ধ্বংস করিতে যাইবে না। কিন্তু এখন মুখেও আর

সে ওসব কথা বলে না। কিছুদিন পরে সে হঠাৎ একদিন যাচিয়া গিয়া সত্যপ্রিয়ের পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া পড়িবে, তাকে কোনমতেই আটকানো যাইবে না। নিজের পায়ে ভর দিয়া কুঁড়ে ঘরে স্বাধীন জীবন যাপন করিবার মানুষ সে নয়—একটু নরম হইয়া থাকিলেই সত্যপ্রিয়ের রাজপ্রাসাদে আরামে জীবন কাটানোর সুযোগটা অন্তত যতদিন সামনে উপস্থিত আছে। যোগমায়ারও এ জীবন সহ্য হইতেছে না। এরকম অবস্থায় ওদের এখানে রাখিয়া কষ্ট দিয়া লাভ কি? ফিরিয়া যদি যাইতে হয়, ক'মাস পরে যাওয়ার চেয়ে, যোগমায়ার দিক হইতে ধরিলে, এখন যাওয়াই ভাল।

তাছাড়া আর একটা কথাও যশোদার মনে হইতে থাকে—ওদের দু'জনকে বাড়ীতে রাখিয়া সত্যপ্রিয়কে খোঁচা দেওয়া যাইবে ভাবিয়া নিজের খুসী হওয়ার কথা। প্রতিহিংসার জন্য ওদের কেন সে কষ্ট দিবে? এই অন্যায় কল্পনা মনে আসিয়াছিল বলিয়া এখন তাহার মনে হয়, ওদের ফিরিয়া যাওয়ার উপায়টা তারই করিয়া দেওয়া উচিত।

সত্যপ্রিয় কাগজ পড়িতেছিল, মুখ তুলিয়া একটু বিস্ময়ের সঙ্গেই বলিল, 'এসো চাঁদের-মা।'

খানিক তফাতে মেঝেতে ঝাঁকিয়া বসিয়া যশোদা নির্ব্বিকার ভাবে বিনা ভূমিকায় বলিল, 'মেয়েকে এবার ফিরিয়ে আনুন?'

'মেয়েকে ফিরিয়ে আনব? আমি?'

'তাতে দোষ কি বলুন? বাপ তো আপনি? বড় কাঁদাকাটা করছে খুকী। এ সময়টা খুকীর পক্ষে—ছেলেমেয়ে হবে ওর জানেন না বোধ হয়?'

'জানি।'

শুনিয়া যশোদা একটু চুপ করিয়া রহিল।

'জেনেও ওদের যেতে দিলেন?'

'আমি যেতে বলিনি। ওরা নিজেরাই গেছে।'

'আটকানো উচিত ছিল আপনার।'

'কি করে আটকাতাম? পায়ে ধরে?'

যশোদা তাড়াতাড়ি বলিল, 'ছি, ওকথা বলতে নেই। অকল্যাণ হয়। যা হবার হয়ে গেছে, এবার ওদের ক্ষমা করুন। ছেলেমানুষ তো, ওরা কি বোঝে? ফিরে

আসবার জন্য মেয়েজামাই আপনার পাগল হয়ে আছে, কেবল না ডাকলে ভরসা পাচ্ছে না আসতে। আপনি যদি ডেকে পাঠান—'

সত্যপ্রিয় তার পরিচিত মৃদু হাসির সঙ্গে বলিল, 'ডেকে পাঠালেই তো ওরা মাথায় চড়ে বসবে, চাঁদের-মা।'

যশোদা অবাক হওয়ার ভাণ করিয়া বলিল, 'মাথায় চড়ে বসবে? আপনার? আপনার সামনে মুখ তুলে কথা কইবার সাহস ওদের আছে কিনা সন্দেহ, মাথায় চড়বে! তাছাড়া, বেয়াদবি যদি একটু করেই, মেয়ে-জামাইকে সিধে রাখতে পারবেন না?'

সত্যপ্রিয় ভাবপ্রবণতার চিহ্নও দেখাইল না, শান্তভাবে বলিল, 'ওরা নিজে থেকেই আসবে।'

যশোদাও তা জানিত, কিছুক্ষণ সে আর বলিবার কিছু খুঁজিয়া পাইল না। সত্যপ্রিয়ের নির্ব্বিকার ভাব যশোদাকে সত্যসত্যই দমাইয়া দিয়াছিল। সত্যপ্রিয়ের সঙ্গে কথা বলার এই একটা মস্ত অসুবিধা, এত সহজে সে মানুষের মধ্যে নিজের প্রয়োজনীয় অনুভূতি জাগাইয়া তুলিতে পারে, উত্তেজনা, ভয়, আনন্দ, উৎসাহ, হতাশা এসব যেন নিজের ইচ্ছামত পরের মধ্যে সংক্রামিত করিবার ক্ষমতা তার আছে। সত্যপ্রিয়ের উদাসীনতা দেখিয়া মনে হয়, মেয়ে-জামাই-এর কথাটা আলোচনা করাও সে প্রয়োজন মনে করে না। অতি সাধারণ একটা ব্যাপার, সংসারে এমন অনেক হয়, আপনা হইতেই সব ঠিক হইয়া যাইবে। এজন্য মাথা-ঘামানোর কিছু নাই। যশোদারও মনে হইতে থাকে, ব্যাপারটা সে যত গুরুতর মনে করিয়াছে, হয়তো তেমন কিছুই নয়। এবিষয়ে আর কিছু না বলাই উচিত। তবে কোন কাজ আরম্ভ করিয়া মাঝখানে হাল ছাড়িয়া দেওয়া যশোদারও স্বভাব নয়।

'তা হয়তো আসবে, কিন্তু তার তো দেরী আছে। খুকীর মুখ চেয়ে একটু তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে আনাই ভাল। আপনার ছেলেকে যদি পাঠিয়ে দেন—'

সত্যপ্রিয় মাথা নাড়িয়া বলিল, 'আমি কাউকে পাঠাতে পারব না।'

কথাটা সে এমন স্পষ্টভাবেই বলিল, যে মাথা নাড়িবার কোন প্রয়োজনই ছিল না। যশোদা হাঁটু গুটাইয়া মেঝেতে ডান হাতের তালু পাতিয়া একটু কাত হইয়া মেঝেতে মেয়েদের বসিবার চিরন্তন ভঙ্গিতে বসিয়াছিল। উঠিয়া দাঁড়ানোর ভূমিকা হিসাবে সে এবার সোজা হইয়া বসিল। আর তার কিছুই বলিবার নাই।

সত্যপ্রিয় হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, 'ওরা বুঝি তোমায় পাঠিয়েছে ?'

যশোদা বলিল, 'না।'

সত্যপ্রিয় এতক্ষণ অন্যদিকে চাহিয়াছিল, কথা বলিবার সময় সে কদাচিৎ শ্রোতার মুখের দিকে তাকায়। এবার যশোদার চোখে চোখ মিলাইয়া সে খানিকক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল, তারপর মৃদুস্বরে বলিল, 'অন্য কেউ একথা বললে বিশ্বাস করতাম না চাঁদের-মা। তবে তোমার কথা আলাদা। তুমি কখনো মিথ্যা বল না।'

সত্যপ্রিয়ের দৃষ্টি দেখিয়া যশোদা এক মুহূর্তের জন্য শিহরিয়া উঠিয়াছিল। যশোদার স্নায়ুগুলি এরকম শিহরণের উপযোগী করিয়া তৈরী হয় নাই; রাতদুপুরে হঠাৎ বাড়ীর অন্ধকারে একটা ভূত দেখিলেও সে ভাল করিয়া চমকাইয়া ওঠে কিনা সন্দেহ। কিন্তু সত্যপ্রিয়ের দৃষ্টিতে যে-ভাষা তার স্পষ্ট চোখে পড়িয়াছে ভূত দেখার চেয়ে তা চমকপ্রদ। ধনঞ্জয়ের চোখে একদিন যশোদা এ ভাষা দেখিয়াছিল, তবে সত্যপ্রিয়ের চোখের এমন বিশ্বগ্রাসী মারাত্মক ক্ষুধার সঙ্গে ধনঞ্জয়ের সেই মৃদু কামনার অভিব্যক্তির তুলনাই হয় না। হঠাৎ যশোদার একটা অদ্ভুত ধরণের লজ্জা বোধ হয়, অনেকদিন সেরকম লজ্জার সঙ্গে তার পরিচয় ঘুচিয়া গিয়াছিল।

চোখের অস্বাভাবিক দীপ্তি নিভাইয়া সত্যপ্রিয় বলিল, 'তবু, মেয়ে-জামাইকে ফিরিয়ে আনবার জন্য আমি কিছু করতে পারব না চাঁদের-মা। তুমি নিজে যখন এসেছ, আমার মেয়ের ভালর জন্য এসেছ, তোমার জন্য আমি এইটুকু করতে পারি—ওদের ক্ষমা করলাম। তুমি গিয়ে ওদের বলতে পার, ওরা যদি ফিরে আসে আমি ওদের কিছু বলব না।'

বাড়ী ফিরিয়া যশোদা নিজের বিস্ময়ে নিজেই হতবাক্ হইয়া থাকে। তার জীবনে কখনও এমন সমস্যা উদয় হয় নাই। যা সে দেখিয়া আসিয়াছে সত্যপ্রিয়ের চোখে, তাই কি ঠিক? অন্য আর কি হইতে পারে? যেভাবে সত্যপ্রিয় তাকে দু'চোখ দিয়া গ্রাস করিতে চাহিয়াছিল তার তো অন্য কোন ব্যাখ্যা সম্ভব নয়? কিন্তু সত্যপ্রিয়ের পক্ষে কি ওটা সম্ভব? বিশেষতঃ তাকে দেখিয়া? তার মত বিরাটকায়া মাঝবয়সী রমণীকে সামনে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সত্যপ্রিয়ের মত

প্রৌঢ় মানুষের মধ্যে জোয়ারের আকস্মিক বন্যার মত প্রচণ্ড কামনার উদ্রেক হইতে পারে, এ তো বিশ্বাস করার মত কথা নয়।

চোখ বুজিয়া বাস্তবকে এড়ানোর ছেলেমানুষী যশোদার নাই। সে জানে, সত্যপ্রিয়ের মত সবল সুস্থ সংযমী মানুষ প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছিয়াছে বলিয়াই নিভিয়া যায় না। আকস্মিক এবং হয়তো ক্ষণিক উচ্ছ্বাসের অসংযমকে একেবারে বর্জ্জন করা মানুষের পক্ষে কঠিন। রামায়ণ মহাভারতে যশোদা মুনিঋষিরও অনেক অসংযমের কাহিনী পড়িয়াছে। কিন্তু সে সব হঠাৎ-জাগা ভালবাসা জাগাইত অনন্যসাধারণ রূপবতী যুবতী মেয়েরা। যশোদাকে দেখিলে রাস্তার গুণ্ডাও যে ভড়কাইয়া যায়!

সত্যপ্রিয়কে যশোদা ভাল করিয়াই চেনে, এক এক সময় ব্যাপারটা তার বড়ই কৌতুকজনক মনে হয়, আবার পরক্ষণে সে বুঝিতে পারে এর মধ্যে কৌতুকের কিছু নাই, বিষয়টা অতীব গুরুতর! সত্যপ্রিয় যা কিছু চায়, প্রচণ্ড আবেগের সঙ্গেই চায়। প্রত্যেকটি কামনার এরকম অস্বাভাবিক প্রচণ্ডতাই সত্যপ্রিয়কে এরকম হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর করিয়াছে। বিরক্তি বোধ করিলে ভূমিকম্পের জন্য সত্যপ্রিয় পৃথিবীকে পদাঘাত করিয়া ছাড়ে। পায়ে একটা কাঁটা ফুটিলে হয়তো জগতের সমস্ত কাঁটা নষ্ট করিয়া ফেলা সম্ভব কিনা এই কল্পনাকেও সে প্রশ্রয় দেয়। কিন্তু সে ভাববিলাসী নয়, বাস্তবকে সে এড়াইয়া চলে না,—তার মত হিসাবী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ফন্দিবাজ, সংযমী আর স্বার্থপর মানুষ যশোদা খুব কমই দেখিয়াছে। মানুষকে পায়ের নীচে চাপিয়া রাখার কামনা সম্বন্ধে হয়তো সে অসংযত, নিজের মতামত প্রচার করার স্বপ্ন দেখিবার বেলা হয়তো সে অবাস্তব, অসম্ভব কল্পনার ক্রীতদাস,—কিন্তু তাও যেন ইচ্ছাকৃত দুর্ব্বলতা, জানিয়া বুজিয়া নিজেকে একটু খেয়াল খেলার সুযোগ দেওয়া।

অথবা মোটের উপর মানুষটা আসলে পাগল?

এই সব চিন্তায় কয়েকটা দিন কাটিয়া গেল। তারপর একদিন সকালে পিয়ন আসিয়া একখানা খাম দিয়া গেল যশোদার নামে। খামের মধ্যে কারও ব্যক্তিগত চিঠি ছিল না, ছিল একটি নোটিশ। সহরতলীর উন্নতির জন্য যশোদার বাড়ীর উপর দিয়া নূতন রাস্তা যাইবে, যশোদার বাড়ী আর আলগা জমি উপযুক্ত মূল্যে কিনিয়া নেওয়া হইবে। বাড়ী বিক্রয় করার বিরুদ্ধে আর নির্দ্ধারিত মূল্যের বিরুদ্ধে

যশোদার যদি কিছু বলিবার থাকে, নির্দ্দিষ্ট একটি দিনের মধ্যে যশোদা যেন তার লিখিত আবেদন দাখিল করে।

ইংরাজীতে লেখা নোটিশ, যামিনী তাকে সমস্তটা পড়িয়া শুনাইয়া মানে বুঝাইয়া দিল। অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া যশোদা বলিল, 'বাড়ী বেচতে হবে?'

যামিনী বলিল, 'তা ছাড়া আর উপায় কি! আপত্তির কথাটা বাজে, ওরা আপত্তি কানে তোলে না।'

'আমি বেচতে না চাইলেও বেচতে হবে?'

'তাই তো আইন—রাস্তার জন্য কিনা! তবে ওরা দাম ভাল দেয়—এখানকার বাড়ী বেচে অন্য জায়গায় বাড়ী করবেন।'

যশোদা বিশ্বাস করিল না। নোটিশ-হাতে পাড়ার রমেশ উকিলের বাড়ী গিয়া হাজির হইল। ফিরিয়া আসিয়া ভাখে, রাজেন বসিয়া আছে।

'কি ব্যাপার চাঁদের-মা?'

'আবার পাততাড়ি গুটোতে হবে।'

আগে আর কখনো যশোদা পাততাড়ি গুটায় নাই, কেবল গুটানোর উপক্রম করিয়াছিল। কিন্তু কথা শুনিয়া মনে হয়, পাততাড়ি গুটাইয়া গুটাইয়াই যেন তার জীবন কাটিয়াছে।

রাজেন হাত বাড়াইয়া বলিল, 'দেখি, প'ড়ে দেখি একবারটি কি লিখেছে।'

'এর মধ্যে খবর পেয়েছ?' বলিয়া যশোদা নোটিশটি তার হাতে দিল। গম্ভীরভাবে নোটিশ পড়িয়া নিরুপায় আপশোষের সঙ্গে প্রচণ্ড একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'হুঁঃ! ওই হনুমানটার কাজ আর কি!'

যশোদারও কথাটা মনে হইয়াছিল, বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় নাই। সহর আর সহরতলীর উন্নতির জন্য যারা মাথা ঘামায়, তাদের সঙ্গে সত্যপ্রিয়ের সম্পর্কই বা কোথায়? তাছাড়া, ক'দিন আগে সত্যপ্রিয়ের চোখে যে দৃষ্টি দেখিয়াছিল, তাও যশোদা ভুলিতে পারিতেছিল না।

রাজেন আবার বলিল, 'মেয়ে-জামাইকে ঘরে ঠাঁই দিয়েছ কিনা, তার শোধ তুলল।'

সকলেই আসিয়া হাজির হইয়াছিল। যোগমায়া হঠাৎ ক্ষেপিয়া গেল, 'আমাদের

কথা বলছ তুমি! বাবার কথা বলছ! আমার বাবাকে তুমি হনুমান বললে?'

রাজেন বলিল, 'শুধু হনুমান? তোমার বাবা—'

যশোদা বলিল, 'আহা, থামো না বাবু, তোমারও কি মাথা খারাপ হল?'

এখানে আর বেশী সহানুভূতির সম্ভাবনা নাই দেখিয়া যোগমায়া কাঁদিবার জন্য ঘরে চলিয়া গেল।

যশোদা বলিল, 'কিন্তু চকোত্তি মশায়ের সঙ্গে এদের সম্পর্ক কি?'

রাজেন বলিল, 'সম্পর্ক আর কি, ও-ব্যাটার কোম্পানী থেকে এপাড়ার সব ঘর-বাড়ী জমিজমা কিনে নিয়েছে তো, তুমি আর আমি শুধু বেচিনি। তারপর বলে দিয়েছে, এখান দিয়ে রাস্তা গেলে সুবিধা হবে।'

'তুমি আর আমি যদি বলি এখান দিয়ে রাস্তা যেতে দেবো না? একটু তফাৎ দিয়ে—?'

রাজেন মাথা নাড়িল, 'আমরা দু'জন বললে কি হবে, সবাই বললে তবু ভরসা ছিল। তা সবাই তো আগেই ঘরবাড়ী বেচে বসে আছে। তাছাড়া ওই হনুমানটার কথা ফেলে আমাদের কথা কে শুনবে বলো? আমরা হলাম গরীব মানুষ।'

যোগমায়ার মনে কষ্ট হইবে বলিয়া সত্যপ্রিয়ের ক্ষমা করার প্রতিজ্ঞার কথাটা যশোদা তাদের শোনায় নাই। আপনা হইতে এরা যদি ফিরিয়া যায়, আর গিয়া দ্যাখে যে, সত্যপ্রিয় একটুও রাগ করে নাই, দু'জনেই খুব খুসী হইবে। ভাবিয়াছিল, নিজেই বুঝাইয়া দু'জনকে পাঠাইয়া দিবে।

রাজেন কাজে চলিয়া গেলে যশোদা যামিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আমি তো চললাম, আপনারা এবার কি করবেন?'

যামিনী ইতিমধ্যে একবার ঘরে গিয়া বাপের অপমানে অপমানিতা যোগমায়ার সঙ্গে ঘন্টাখানেক কাটাইয়া আসিয়াছে। সে বলিল, 'তাই ভাবছি।'

'ফিরেই যান না?'

'তাই যাই, কি বলেন?'

'সেই ভাল। আমার মনে হয়, চকোত্তি মশায় রাগ করেন নি, আপনারা ফিরে গেলে খুব খুসী হবেন।'

যামিনী আমতা আমতা করিয়া বলিল, 'ফিরেই যদি যেতে হয়, দেরী করা বোধ

হয় উচিত হবে না। যেতে হলে আজকেই চ'লে যাই। আপনি কি বলেন ?'

'তাই যান।'

অজিতের দিকে চাহিয়া যশোদা হাসিয়া বলিল, 'তোমরা কি করবে ভাই ?'

অজিত বলিল, 'এই তো সবে নোটিশ এলো, এখনও ঢের দেরী। বাড়ী বেচে সব ঠিকঠাক করে উঠে যেতে বছরখানেক তো অন্ততঃ লাগবেই—ইচ্ছে করলে বেশী লাগাতে পারেন। আমরা কি করব, ভেবেচিন্তে ঠিক করলেই হবে।'

যশোদা হাসি বন্ধ করিয়া বলিল, 'দেরী নেই ভাই, দু'চার দিনের মধ্যে আমি উঠে যাব, যত শীগ্‌গির পারি। এখানে আর মন টিকছে না। দু'দিন বাদে উঠে যেতেই হবে ভাবব আর দিন গুণে দিন কাটাব—বাপ্‌রে, আমার দম আটকে আসবে।'

'আমরা তবে অন্য কোথাও ঠিক করে—'

সুব্রতার কথার উৎস অনেকক্ষণ বন্ধ হইয়াছিল, চোখ দু'টি একটু যেন ছলছল করিতেছিল। অজিতের কথা শেষ হওয়ার আগেই সে বলিয়া উঠিল, 'অন্য কোথাও না ছাই, আমরাও দিদির সঙ্গে যাব। তোমায় আর ছাড়ছি না দিদি, মরে গেলেও না—যেখানেই যাও তুমি আমি তোমার সঙ্গে যাবই যাব। হুঁ, বলে এতকাল পরে সত্যিকারের একটা দিদি পেলাম, দিদি যাবে এক যাগায়, আমরা যাব আর এক যাগায়! কি যে বল তুমি!'

অজিত তাড়াতাড়ি বলিল, 'আমি এমনি বলছিলাম।'

সুব্রতার গালটা একটু টিপিয়া দিয়া যশোদা রান্নাঘরে চলিয়া গেল। ছোট ছোট দু'টি উনুনে রান্না হইতেছে, একটি তোলা উনুন। আগে একবার যখন যশোদার ভরাট বাড়ী খালি হইয়া গিয়াছিল, চলিয়া যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া বড় বড় উনুনগুলি সে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। এই উনুনগুলিও আবার ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে।

কোথায় যাইবে ? কোথাও বাড়ী কিনিয়া উঠিয়া যাইবে, না নন্দের বাড়ীতে গিয়া উঠিবে ? রাজেন নন্দের ঠিকানা আনিয়াছে, নন্দ নাকি এখন বড়লোক, তার বসিবার ঘরে গদি-আঁটা চেয়ার। সেখানে কি থাকিতে পারিবে যশোদা ? কিন্তু যেখানেই যাক, উনুনগুলি আবার তাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে।

সমাপ্ত

প্রতিবিম্ব

বেশী না হোক, বাপ প্রতি মাসে পেন্‌সন পান। বাড়ি-ঘর আছে, জমি-জমা থেকেও বছরে শ' দুই টাকা আয় হয়। দাদা বৌকে নিয়ে সাত বছর দেশ ছাড়া, দু'তিনখানা পত্রাঘাত করলে সেও কিছু টাকা পাঠায়। মণিঅর্ডারের কুপনে বাপের স্নেহ-দুর্বলতাকে আক্রমণ করে মন্তব্য থাকে: তারক কি করছে? ছাব্বিশ সাতাশ বছরের যোয়ান মদ্দ ছেলে কেন বাড়ি বসে অন্ন ধ্বংস করবে? স্নেহান্ধ বাপ মা'র দোষেই বাঙ্গালী ছেলে এভাবে নষ্ট হয়। নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে শেখে না।

আরও অনেক আদর্শ বুলি।

বৌদি অনেক বুঝিয়ে অনেক উপদেশ দিয়ে দেবরকে চিঠি লেখেন। একি ঘেন্নার কথা যে বাবা চিরদিন এক ছেলের কাছেই হাত পাতবেন? তারকের দাদা হলে লজ্জায় কবে গলায় দড়ি দিতেন। চিরকাল একা তাদের সাহায্য করবার মত অবস্থাও তার দাদার নয়। সবাই মাইনেটার দিকেই তাকায়, বিদেশে কত যে খরচ সে কথা কেউ ভাবে কি? লেখাপড়া শিখেছে, মানুষ হয়েছে, এবার তারক কিছু করুক!

আরও অনেক ন্যায্য কথা।

শেষের দিকে বিশেষ বুদ্ধি খাটিয়ে বৌদি টুকটুকে একটি বৌয়ের কথাটাও উল্লেখ করেন। কবে চাকরী হবে, কবে বৌ আসবে ভেবে সেই আটশো ন'শো মাইল দূরে বৌদির না কি ছটফটানির সীমা নেই।

বড় ছেলের গঞ্জনায় হঠাৎ চারদিকের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠে বাপের মেজাজ যায় খিঁচড়ে। বাপ ছেলেতে বেধে যায় কলহ। প্রথম দিকে কলহটা করেন বাপ একাই। খুব এক চোট গালাগালি দিয়ে ছেলেকে দূর হয়ে যেতে বলেন বাড়ি থেকে। কিন্তু যতই অনুপযুক্ত হোক, ছাব্বিশ বছরের শক্ত সমর্থ যুবক তো ছেলেটা, একটা অনির্দিষ্ট আশঙ্কায় বাপকে থেমে গিয়ে সুর পাল্টাতে হয়।

'জবাব দিস্ না যে কথার?'

'কোন কথার? শুধু তো গালাগালি দিলে এতক্ষণ। ঠাণ্ডা হয়ে কথা বলো, জবাব দিচ্ছি।'

'চাকরী-বাকরী করবি নে তুই?'

'পেলেই করব। চাকরী কই? দাদাকে লেখো না চাকরী করে দিতে?'

কিছুক্ষণের জন্য বাপকে একটু অসহায়, উপহাস্য মনে হয়। দাদাকে চাকরীর জন্য লেখা হয়েছিল কয়েকবার। কিন্তু অতদূর থেকে বাঙলা দেশে ভাই-এর চাকরী সে করে দেবে কি করে? দাদা যে দেশে থাকে সে দেশেই একটা কিছু জুটিয়ে দেবার জন্য পত্র লেখায় দাদা জবাব দিয়েছিল, বিদেশে সামান্য চাকরীতে তারকের নিজের খরচই চলবে না। বাবা তো জানেন না বিদেশে কি খরচ, বাড়িতে টাকা পাঠাতে কেন তার এত অসুবিধা হয়। যাই হোক, সে চেষ্টা করবে, যথাসাধ্য চেষ্টাই করবে, যদি কিছু জুটে যায়। তবে কি না বিদেশে এসব ছেলের চাকরী হওয়া বড় কঠিন।

দাদার চেষ্টায় এ পর্যন্ত কোন ফল হয় নি। স্পষ্টই বোঝা যায় অপদার্থ ভাইকে কাছে টানতে সে ইচ্ছুক নয়। বিদেশে বাড়ি ঘর, বিদেশে সব, দেশে ফিরলেও দেশের বাড়িতে বাস করতে যাবে না, কাজ কি ভায়ের সাথে জড়াজড়ি মাথামাথি করে।

তারক মাঝে মাঝে দাদাকে উপদেশ দিয়ে পত্র লেখে যে বাপের সঙ্গে ছলনা করা কি তার দাদার মত সহানুভব ব্যক্তির উচিত, বাপের কাছে ভাণ করা? সোজাসুজি লিখে দিলেই হয় তারকের জন্য কিছু সে করতে পারবে না! কারণ, চাকরী করে না দিতে পারুক, তারক যে বার বার ব্যবসা করার জন্য হাজার খানেক টাকা চাইছে, সেটা তো দিতে পারে দাদা, হাজারের কাছাকাছি যার মাইনে!

দাদা জবাব দেয় না।

বাপ তাই হঠাৎ পক্ষ পরিবর্তন করে বলেন, 'দাদা! দাদা! দাদার ভরসাতেই থাকো তুমি। বাপ ভায়ের জন্য কত দরদ সে বৌ-পাগলা হারামজাদার! যার দাদা নেই সে বুঝি আর চাকরী করে না? তোর দাদাকে কে চাকরী দিয়েছিল? নিজের চেষ্টায় জুটিয়ে নিতে পার না নিজের চাকরী?'

'দরখাস্ত তো করছি গাদা গাদা। জবাব পর্যন্ত দেয় না।'

সে কথা মিথ্যে নয়। খবরের কাগজ ঘেঁটে ঘেঁটে বাবা নিজেই ছেলের জন্য

বহু সম্ভাব্য চাকরী এ পর্যন্ত আবিষ্কার করেছেন এবং ছেলেকে দিয়ে দরখাস্তও পাঠিয়েছেন। কিন্তু এমনি বিস্ময়কর মন্দ কপাল তারকের যে আজ পর্যন্ত একটা জবাবও আসে নি সে সব দরখাস্তের। ছেলের বেকার অবস্থার জন্য তাই বাপের একটা গোপন সহানুভূতি বরাবর ছিল। চাকরী-দাতারা সবাই এমন বিরূপ হলে ও বেচারার কিইবা করবার আছে!

'কি সব দলেটলে মিশিস্, সেজন্য নয় তো?'

'তোমার যেমন কথা। কোন দলে আমার নাম আছে না কি?'

দরখাস্ত সম্পর্কিত আসল ব্যাপারটা সম্প্রতি জানা গেছে। দরখাস্ত তারক একখানাও পাঠায় নি। পাঠাবার খরচটা লাগিয়েছে হাত খরচে। মহকুমা সহরের গাঁ-ঘেসা গ্রাম,—পোস্টাপিস শহরে। পোস্টাপিসে কিছু রেজেস্ট্রী করলেই রসিদ পত্র পাওয়া যায়, দরখাস্তের পৌঁছা সংবাদ আনাবার ব্যবস্থাও করা যায়। কিন্তু সকালে সহরে গিয়ে অধিকাংশ দিন চিঠিপত্র তারক নিজেই নিয়ে আসে। দুপুরে যদি সে ঘুমোয়, ঘুমোয় বৈঠকখানায়। পিয়ন ডাক দিয়ে যায় তারই কাছে।

হয়তো বাপ কোনদিন প্রশ্ন করেছেন, 'দরখাস্তটা পৌঁছল কি না—'

'হ্যাঁ, পৌঁচেছে। কাল এ্যাকনলেজমেণ্ট এসেছে।'

বাপ তাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন। ঘুরে ফিরে আড্ডা দিয়ে কর্মহীন জীবনযাপন করুক, ছেলে তার কোনদিন মিথ্যা বলে নি, প্রবঞ্চনা করে নি। সেই ছেলের এতদূর অধঃপতন হয়েছে কে ভাবতে পারত।

অদৃষ্টের বিরুদ্ধে নালিশের বোঝা হাল্কা করতে করতে বাপ কাঁদতে লাগলেন। কিছু না জেনে ও না বুঝে মাও তাতে যোগ দিলেন। গাঢ় চটচটে স্নেহের কবল থেকে মুক্তি পেতে তারক সবে মুখ তুলবার চেষ্টা করছে। কিন্তু অনিশ্চিত আদর্শের টানে বাইরে একটা এলোমেলো দিশেহারা জীবন গড়ে তুলবার চেষ্টা আর কতগুলি বই পড়া বিদ্যা দিয়ে বাঙ্গালী বাপ মা'র একেবারে বুকের তল থেকে উৎসারিত এই সর্বনেশে লাভা-প্রবাহ ঠেকিয়ে রাখবার ক্ষমতা তারকের জন্মে নি। সেও তাই অনিচ্ছায় কাঁদ কাঁদ হয়ে গেল।

'তোমায় ঠকাই নি বাবা। শোন বাবা শোন, জোচ্চুরি করার এ্যাতটুকু ইচ্ছে আমার ছিল না। আরে, কথাটা শোনই না আমার আগে!'

তারকের ব্যাকুলতা দেখে বাপ-মা চুপ করে গেলেন। তারক মন খুলে সব

কথা তাদের বুঝিয়ে বলল।

বাপের মনে কষ্ট না দিয়ে নিজের ইচ্ছা বজায় রাখার জন্য সে এই প্রবঞ্চনাটুকু করেছে। আর কি উপায় ছিল তার বলুক তার বাপ-মা? দরখাস্ত একটা লেগে গেলে তার যে সর্ব্বনাশ হয়ে যেত। এদিকে দরখাস্ত পাঠাতে না চাইলে বাড়িতে অশান্তির সীমা থাকত না, রাত্রে ঘুম না হওয়ায় বাপের তার শরীর খারাপ হয়ে যেত, তাই না তাকে এ কাজ করতে হয়েছে! বাপ মা'র মুখ চেয়ে যা সে করেছে তারই জন্য তার গঞ্জনা!

সাত দিন বাপ ছেলের সঙ্গে কথা কইলেন না, ছেলেও সকাল থেকে রাত দশটা এগারটা পর্যন্ত বাইরে বাইরে কাটাতে লাগল। দুটো রাত বাড়িই ফিরল না। মা কেঁদে ককিয়ে অস্থির হলেন। একটা দোষ করে ফেলেছে বলে অত বড় ছেলের সঙ্গে এমন ব্যবহার করা! ছেলে যদি তার মনের ঘেন্নায় বনবাসী হয়?

সাত দিন পরে তারক যখন দুপুরে ভাত খেতে বাড়ি ফিরেছে, বাপ প্রায় ক্ষমার্থীর মত কাতরভাবে ছেলেকে বললেন, 'আমায় ঠকালে কেন? চাকরী করবে না বললেই পারতে!'

ছেলে দাওয়ায় বসে গায়ে তেল মাখতে মাখতে জবাব দিল, 'হুঁ।'

ছেলে গায়ে তেল ঘষে আর বাপ মা'র মুগ্ধ সম্মোহিত দৃষ্টির সামনে ছেলের বুকে পিঠে কাঁধে ও বাহুতে পেশীগুলি নড়ে চড়ে। দু'জনের মনে হয়, তারাই যেন ছেলের কাছে কত অপরাধে অপরাধী!

স্নেহের উচ্ছ্বাসে ধরা গলায় মা বললেন, 'আমাকেই নয় চুপি চুপি বলতিস্?'

ছেলে উদাসভাবে বলল, 'অনেকবার বলেছি। তোমরা শুনবে না তো কি করব আমি? দরখাস্ত না পাঠালে বাবা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে প্রাণ বার করে ছাড়বে, রাত্রে ঘুমোবে না, শরীর খারাপ করতে থাকবে। আমি কি করব না ঠকিয়ে?'

'চাকরী তুই করবি না?'

'না।'

'এমনি করে ভেসে ভেসে বেড়াবি? বিয়ে করবি না, সংসার করবি না, বাইরে বাইরে দিন কাটাবি?' বাপ বললেন।

'আমি তা বলেছি?'

'তবে চাকরী করবি না কেন?'

তারক জবাব দিল না।

মা মরিয়া হয়ে বললেন, 'চাকরী না করিস, বিয়ে কর। একটা বৌ এনে দে আমায়। পুরুষ মানুষ, দিন তোর একরকম কেটে যাবে, বৌ নিয়ে ঘর করার সাধটা আমার মেটা বাবা! আরেকজন তো বিয়ে করে বছর না কাটতে বৌ নিয়ে চলে গেল কোন্ মুল্লুকে। পোড়া অদেষ্টে ছেলের বৌ নিয়ে ঘর করা কি আমার নেই রে তারু!' মা ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

তারক ভেবে চিন্তে বলল, 'আচ্ছা সে হবে'খন। যাক না দু'দিন।' বাপ-মা'র যেন চমক ভাঙল। ছেলের তবে বিয়ে করবার মন হয়েছে। তাই এমন নোঙরহীন নৌকার মত সে ভেসে বেড়ায়, উদাসীন হয়ে থাকে! চাকরী বাকরী কোন কিছু করার দিকে তাই তার মন নেই! বড় ছেলের ওপর দু'জনের রাগের অন্ত থাকে না। তারই পরামর্শে ভুলে তারকের তারা এতদিন বিয়ে দেন নি, তারক কবে নিজে উপার্জন করবে তারই অপেক্ষায় দিন কাটিয়েছেন। উপার্জনক্ষম না হলে ছেলের বিয়ে দেওয়া তার মতে উচিৎ নয়! বড়ছেলের মুণ্ডু উচিত নয়! সংসারে যেন সবাই উপার্জনক্ষম হয়ে বিয়ে করছে। বিয়ের পর সংসারে যেন কেউ উপার্জন করে না!

বিয়ের পরেই বরং উপার্জনে মন বসে ছেলেদের।

বাপ মেয়ে খুঁজতে থাকেন, ছেলে রামবাবুর বাড়ির আসরে পৃথিবীর সমস্যা নিয়ে তর্ক করে, চায়ের দোকানে আড্ডা দেয় বন্ধুদের সংগে, এ গ্রামে ও গ্রামে মিটিং করে বেড়ায়।

রামবাবু বলেন, 'এবার রিলিফ ওয়ার্কে বেশী জোর দিতে হবে। তুমি একটু লাগো তারক।'

তারক বলে, 'কি লাভ হবে?'

'যে ক'জনকে বাঁচানো যায়। তাছাড়া, এ অবস্থায় রিলিফ ওয়ার্ক না করলে লোকেই বা বলবে কি?'

'আমি ওতে নেই। ভাল করে দুর্ভিক্ষ হোক। লোক মরুক।'

রামবাবু সন্দিগ্ধভাবে বলেন, 'তুমি যা ভাবছ তা কি হবে?'

তারক আশ্চর্য হয়ে বলে, হবে না? আপন জন মরছে, নিজে মরতে বসেছে, মানুষ মরিয়া হবে না! কি যে বলেন!'

রামবাবু তবু সন্দিগ্ধভাবে মাথা নাড়েন, 'তা বোধ হয় হবে না তারক!'

'দেখাই যাক না, হয় কি না হয়।'

'যদি হয়ও, রিলিফ চালাতে দোষ কি? রিলিফ দিয়ে কতটুকু ঠেকানো যাবে!'

'আমি ওতে নেই।'

সুন্দর স্বাধীন জীবন। অলস, মন্থর, সরস। কোথাও নিয়ম নেই, বাধ্য-বাধকতা নেই, রাজকতা নেই। আর বেশী রোজগার দিয়ে তার কি হবে? নেহাৎ দরকার হয়, সদরে চায়ের দোকান দিয়ে বসবে একটা। দেশের অবস্থা খারাপ ছিল, বেশী খারাপ হয়েছে। সেটা অস্বীকার করবার উপায় নেই। সবাই যেন কেমন নিঝুম হয়ে গেছে, বিবর্ণ হয়ে গেছে সকলের মুখ। নন্দীদের মা সেদিন গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে। পয়সা দিয়ে লোকে ভাতের ফ্যান কিনছে—ফ্যান যারা চিরদিন নর্দমায় ফেলে দিত তাদের রোজগার হচ্ছে, দু'চার পয়সা। গাছের পাতা খেয়ে অনেকে বাঁচবার চেষ্টা করছে। অনেকে আবার ও চেষ্টাটা করছে না খেয়েই। এসব গুরুতর কথা বৈকি, ভয়ঙ্কর কথা। তারক এসব কথা ভাবে। সবাই যা ভাবছে, সবাই যে বিষয়ে আলোচনা করছে—সেও সে কথা যতদূর সম্ভব ভাবে। দুরবস্থার ছাড়া ছাড়া চরম উদাহরণগুলি তাকে পীড়িত করে। বিধু খুড়োর বাড়িতে হঠাৎ ঢুকে পড়ে সেদিন সে কি অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল! খুড়োর অত বড় সোমত্ত মেয়েটা ছেঁড়া গামছায় গা ঢেকে পাটপাতা বাছছিল, লাফিয়ে উঠে ঘরে ঢুকতে গিয়ে গামছাটি তার থেকে গিয়েছিল বাইরেই। ভাবলেও তারকের হাসি পায়। না, দুঃখ হয়। বুকের মধ্যে টনটন করে। দেশের তরুণী যুবতী মেয়েগুলির পর্যন্ত এ-দশা হয়েছে? ঘরের দেয়ালে টাঙ্গানো ইস্তাহারের ভাষায় তার মন বলে ওঠে, যে দুঃশাসন আজ ঘরে ঘরে দ্রোপদীর—····

এসব ভাবনার মধ্যে বৌ-এর ভাবনাটা বার বার আসা-যাওয়া করছে আজকাল। বৈচিত্র্য বিশেষ কিছু না থাক, একটি লতাবৎ কোমলাঙ্গী সুন্দরী মেয়েকে সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্তে পাবার কল্পনা বেশ রঙীন হয়ে উঠছে। মাঝে মাঝে সে একেবারে মসগুল হয়ে যায়।

বেশী দিন কল্পনার খেলা নিয়ে থাকবার সুযোগ কিন্তু তারকের ভাগ্যে জুটল না। চৈত্র শেষ হয়ে বৈশাখ সুরু হতেই একদিন তার বিয়ে হয়ে গেল। সদরের একজন মোক্তারের মেয়ে। বেশ দেখতে। সবই যেন বেশ বৌটির। চলাফেরা ওঠা বসা বেশ, লজ্জা বেশ, আত্মসমর্পণ বেশ, ঠোঁট বেশ, ফিস ফিস কথা বেশ।

কিন্তু হায়রে তারকের ভাগ্য, পাঁচ মাসের মধ্যে এমন বেশ বৌটি কি না তাকে জিজ্ঞেস করে বসল, 'তুমি চাকরী কর না কেন ?'

তারক আহত হল। রাগ করে বলল, 'আমার খুসী।'

বলার সময় গলায় জড়ানো বৌয়ের লতাবৎ হাতটি খুলে সে বোধ হয় ছুঁড়ে দিয়েছিল। এ অবস্থায় সব বৌ কাঁদে, বিনিয়ে বিনিয়ে মিনিয়ে মিনিয়ে কাঁদে। যে কান্না কোন নতুন স্বামীর সয় না। অনেক সাধ্যসাধনায় কান্না থামিয়ে তারক বৌকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করল, কেন সে চাকরী করবে না। বৌ চুপ করে শুনে গেল। তাকে বড় বেশী চুপচাপ মনে হওয়ায় সন্দেহের বশে অধ্যাপনা বন্ধ করে পরীক্ষা করে তারক দেখতে পেল, বৌ তার ঘুমিয়ে পড়েছে।

চাকরীর কথা বৌয়ের মুখে আর শোনা গেল না। মাসখানেক পরে বৌকে নিয়ে তারক গেল শ্বশুরবাড়ি। সারাটা দিন জামাই আদর ভোগ করার পর সে যখন জীবনের তুচ্ছতম ক্ষুদ্রতম সমস্যাটি পর্যন্ত ভুলে গেছে, তখন শ্বশুরমশায় তাকে ডেকে পাঠালেন বৈঠকখানায়। ঘরে পুরানো লণ্ঠনের আলো, কাঠের তাকে আর দরজা খোলা কাঠের আলমারিতে আদালতী নথিপত্রের পুরানো ধূলিমলিন স্তূপ। একেবারে চাষা মক্কেলদের বসবার জন্য লম্বা বেঞ্চি আছে; একটু ভদ্র চাষীদের জন্য আছে মানুষের ঘষায় ঘষায় পালিশ করা চাটাই বিছানো নীচু তক্তপোষ। শ্বশুর মশায় টেবিল নিয়ে চেয়ারে বসেন। অতিরিক্ত একটা চেয়ার ও একটা টুল আছে। সমস্ত আসবাবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি অত্যন্ত মোটা। সময়ের পোকা ভেতর থেকে জীর্ণ করে না ফেললে শত বছরেও ভাঙবে না!

মদন মোক্তার খানিকক্ষণ সম্পূর্ণ অন্য কথার ভূমিকা করে বললেন, 'চাকরী করে দেব কথা দিয়ে মেয়ে দিয়েছিলাম বাবা, ক'মাস ধরে সেই চেষ্টাই করছি। যুদ্ধের চাকরী ছাড়া তো চাকরীই নেই আজকাল। রায় সাহেব মজুমদার মশায় একটু খাতির করেন আমায়, তিনি একটা চাকরীর ভরসা দিয়েছেন। যুদ্ধের চাকরী— তবে যুদ্ধে টুদ্ধে যেতে হবে না। আপিসের কাজ, মাঝে মাঝে এদিক ওদিক একটু ঘুরে আসা, আর কিছু নয়!'

সব ঠিক হয়ে আছে। দরখাস্ত পর্যন্ত তারককে পাঠাতে হবে না। রায় সাহেবের একখানা চিঠি নিয়ে কলকাতায় গিয়ে বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করলেই চাকরী হয়ে যাবে। বড় সাহেব বাঙ্গালী, অত্যন্ত ভালমানুষ। হাসিমুখে হয়তো দু'চারটে

সহজ সাধারণ কথা জিজ্ঞাসা করবেন, দু'চার মিনিট আলাপ করবেন, তারপর চাকরীটা দিয়ে দেবেন। কোন ভয় নেই তারকের, ইন্টারভিয়ুতে আটকাবে না। চাকরীটা তার একরকম হয়ে গেছে ধরে নেওয়া যায় এখন থেকে।

'কিন্তু—'

'কিন্তু কি বাবা?' শ্বশুরমশায় সস্নেহে জিজ্ঞেস করলেন।

'না। কিছু না।'

আরও বেশী রাত্রে বৌ বলল,—'চাকরীর দরখাস্ত পাঠানো নিয়ে কি কাণ্ড করেছিলে আমি সব জানি। ছি ছি! এবার যদি কোন গোলমাল কর, আমি কিন্তু বিষ খেয়ে মরে যাব বলে রাখছি। মানুষের কাছে মুখ দেখাতে পারি না আমি।'

তারক গম্ভীর বিষণ্ণভাবে বলল, 'না, চাকরী এবার করতেই হবে। কোন দিকে ফাঁক দেখছি না।'

তারপর বৌ অবশ্য অন্য সুরে আরও অনেক কথা বলল। তারক চাকরী করলে দশের কাছে তার বৌয়ের কত গৌরব বাড়বে, ভবিষ্যতের জন্য কত নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে, নিজেদের সংসার পাতা যাবে, তারককে সে প্রাণভরে কত ভালবাসতে পারবে, এই সব কথা।

তারক চুপ করে শুনে গেল।

কোনদিকে ফাঁক নেই। চাকরী এবার তাকে করতেই হবে। বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা না করলে সে খবর রায় সাহেবের মারফৎ শ্বশুর মশায়ের কাছে পৌঁছে যাবে। এদিকে বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করলেই চাকরীর জোয়ালে তাকে জুড়ে দেওয়া হবে, মুক্তি সে পাবে না। একবার চাকরী ধরলে ছাড়াও যাবে না সে চাকরী। বৌ অতিষ্ঠ করে তুলবে জীবন।

বৌ! একটা মেয়ে। তার জন্য চাকরী!

গাঁয়ের আর গাঁ-ঘেঁষা মহকুমা শহরের সহস্র শিকড় তার ছিঁড়ে যাবে, বন্ধু থাকবে না, অবসর থাকবে না, অনুগত ছেলেদের সেনাপতি হয়ে শোভাযাত্রা,

মিটিং, পূজা-পার্বণের উৎসব করা যাবে না, রামবাবুর পার্টিতে যোগ দিয়ে চাষী মজুরদের জাগিয়ে তুলবার কল্পনা কোনদিন কার্যে পরিণত হবে না। রামবাবুর অনেক কাজ সে করে দিয়েছে। রামবাবুর অনুরোধে সেবার সে ঘুরে ঘুরে অনেক চেষ্টায় সাতশো চাষীকে সদরে এনে হাজির করেছিল। সেই থেকে রামবাবু তাকে রীতিমত শ্রদ্ধা করেন। দলে যোগ দিলে ভাল ট্রেনিং দিয়ে তাকে কলকাতা পাঠাবার কথা রামবাবু কতবার বলেছেন। সে না কি পারবে,—অনেক কিছু করতে পারবে। ক্রমে ক্রমে তাকে দায়িত্ব দেওয়া হবে বেশী বেশী, ক্রমে ক্রমে সে উঠবে উঁচুতে, একদিন দেখা যাবে পার্টির সে একজন বড় নেতা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আজ কাল করে পার্টিতে আর নাম লেখানো হয় নি। ট্রেনিং, ডিসিপ্লিন, দায়িত্ব, এই সব কথাগুলি সম্বন্ধে তারকের একটা স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা আছে, ভয় আছে। রামবাবুর সঙ্গে ট্রেইন্‌ড ডিসিপ্লিন্‌ড দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন সহকারী হিসেবে দু'তিন সপ্তাহ সে কাজও করেছে, জলে ভেজা, কাদা ভাঙ্গা, নোংরা পার্টিতে ইঁট মাথায় দিয়ে শোয়া, এসব কষ্টকে সে কষ্ট বলেই গণ্য করে নি। বন্ধু, তাস, রেস্টুরেন্ট, সিনেমার অভাব অনুভব করার সময়ও পায় নি। কিন্তু এখানে কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না, কিছু করা বা না করা ছিল তার ইচ্ছাধীন। একবার দলে ঢুকে পড়লে যদি একই সময়ে তার নিজের সিনেমা যাওয়ার ইচ্ছার সঙ্গে দলের কোন নির্দেশের সংঘর্ষ বাধে?

সমস্ত পথ তারকের নির্যাতিত মন এবারকার মত রেহাই পাবার উপায় খুঁজে আকুলি বিকুলি করে। বৌ সারা মন জুড়ে থাকলেও সে স্পষ্ট অনুভব করে, সমাজ সংসার মিছে নয়, শুধু সংসারটাই মিছে।

ষ্টেশনে একটি বিশ-বাইশ বছরের ছেলে তারককে সাদর অভ্যর্থনা জানাল। সে রামবাবুর পার্টির লোক। রামবাবু আগেই চিঠি লিখে দিয়েছিলেন। ছেলেটির নাম শৈলেশ। আকারে সে খুব ছোট, তবে খারাপ দেখায় না। বালকের মত সর্বাঙ্গের হ্রস্বতায় সুন্দর সামঞ্জস্য আছে। মস্ত একজোড়া চশমা তার মুখে সর্ব-

বিদ্যাবিশারদের ছাপ ফেলেছে। তাতেও সামঞ্জস্য নষ্ট হয় নি।

'রামলালবাবু এমন বর্ণনা দিয়েছেন আপনার যে দেখেই চিনতে পেরেছি। আসুন আমার সঙ্গে। বিছানা এনে ভালই করেছেন।'

'ভাবছিলাম একটা মেসে গিয়ে—'

শৈলেশ বিস্মিত হয়ে বলল, 'কমরেড চক্রবর্তী যে লিখলেন, আপনি আমাদের সঙ্গে ক'দিন থাকবেন? যাকগে, নেয়ে খেয়ে বিশ্রাম করবেন চলুন তো, তারপর মেসের কথা ভাবা যাবে।'

শৈলেশ হাসল, 'আমাদের ওটাও একরকম মেস—একটু খাপছাড়া মেস।'

গলির মধ্যে দোতলা একটি পুরানো বাড়ি, নিজের তলাটা একটু স্যাঁতসেঁতে। দোতলার সিঁড়িটা কাঠের এবং ধাপগুলি অপ্রশস্ত। বিশেষ কায়দায় পা ফেলে ওঠানামা করতে হয় এবং কায়দাটি আয়ত্ত করতে রীতিমত কিছুদিনের অভ্যাস দরকার। ছোট বড় ঘর আছে সাতখানা। এই বাড়িতে কোনদিন পনের কোনদিন পঁচিশজন মেয়ে পুরুষ বাস করে। সংখ্যার বাড়তি কমতিটা হয় বেশীর ভাগ পুরুষদের। সকালে দুপুরে সন্ধ্যায় মেয়েরা অনেকে আসে যায়, কিন্তু তারা সকলে ঠিক এখানে বাস করে না। আধ ঘণ্টা বাড়ির যেখানে খুসী বসে চুপচাপ চারিদিকে লক্ষ্য করলে আপনা থেকে মনে হয় কয়েকটি বাঙ্গালী পরিবার যেন এ বাড়িতে ভেঙ্গেছে এবং মোটা রকম বাইরের উপাদান সংগ্রহ করে একটি সার্বজনীন পরিবার সৃষ্টি হয়েছে। বাড়ির চার জোড়া স্বামী-স্ত্রীকে আবিষ্কার করতে তারকের বেলা দুপুর হয়ে গেল। অনাবশ্যক পরিচয় কেউ করিয়ে দেয় না, আবার অকারণে কেউ আলাপ-পরিচয় করে এমনভাবে যেন জের টানা হচ্ছে বহু পুরানো বন্ধুত্বের, নাম-ধামটা জানাই শুধু বাকী ছিল।

এক ঘরে জন পাঁচেক যুবক তর্ক করছিল, এক কোণে শাড়ীর পাড়ের ঢাকনি দেওয়া বাক্সের ওপর বই রেখে পড়া করছিল তরুণী একটি বৌ। ঘরের মাঝখানে সতরঞ্চিতে তারককে বসতে দেওয়া হয়েছিল। মুখ হাত ধুয়ে যেই সে আবার সেখানে বসেছে, পাঠরতা বৌটি উঠে গিয়ে তাকে এক কাপ চা আর দু'খানা আটার রুটি এনে দিল। তারপর দিল নিজের পরিচয়। 'আমি পুষ্প সোম। কমরেড নিশীথ সোমের স্ত্রী, ওই উঁনি।'

নিশীথ এক গাল হেসে তারকের মনোহরণ করে বলল, 'দাঁড়ান মশায় একটু,

কথাটা শেষ করে নি। তারপর ভাল করে আপনার সঙ্গে পরিচয় করছি।'

কি কথা শেষ করতে চায় ওরা! চায়ে ভিজিয়ে রুটি চিবোতে চিবোতে তারক গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকে। মনটা তার এলিয়ে যায়। আলোচনার কোন ধারাই সে ধরতে পারে না। নাম শোনে সে শোনা লেখকের, পড়া বই-এর, জানা বাদ ও পন্থার, অথচ প্রত্যেকের কথা তার দুর্বোধ্য মনে হয়। শিশুশিক্ষা প্রথম ভাগ নিয়ে পাঁচজনে যেন মুখে মুখে ডক্টরেটের থিসিস তৈরী করছে।

শৈলেশ তাকে পৌঁছে দিয়েই কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ ফিরে এসে বলল, 'চুপ করে বসে আছেন যে? ঘরে ঘরে যান, আলাপ করুন সকলের সাথে? চুপটি করে বসে থাকলে কেউ আপনার দিকে তাকিয়েও দেখবে না।'

তারক সেটা ক্রমে টের পাচ্ছিল। কেউ আসছে কেউ যাচ্ছে, কেউ খানিক বসে জামা খুলে গায়ে তেল মাখছে। পাশের ঘরের একটা পাটিতে শুয়ে দু'জন এত বেলায় ঘুমিয়ে আছে, হলুদ-পেশার রঙ লাগানো হাতে একটি মহিলা ঘরে ঢুকে ট্রাঙ্ক খুলছেন নিঃশব্দে—চাবির গোছার একটি চাবি ঝিনিক্ করে শব্দ করতে পারছে না।

শৈলেশ আবার বলল, 'ফাঁকা ভদ্রতা করবার পাট আমাদের নেই। সময় কোথা? এমন ব্যস্ত সবাই!'

ব্যস্ততার লক্ষণগুলি একটু বেখাপ্পা মনে হওয়ায় তারকের মনে উল্টো ক্ষোভ জেগেছিল। ঘুমন্ত আর আড্ডারতদের দেখিয়ে সে একটা মন্তব্য করল। শৈলেশ অনায়াসে রাগ করতে পারত। রাগ না করে সে শুধু বলল, 'ওরা দু'রাত জেগে ভোর চারটেয় ঘুমিয়েছে। আর ওরা আড্ডা দিচ্ছে না, কনফারেন্সের ব্যবস্থা করছে। সতেরই কনফারেন্স হবে।'

কনফারেন্স সম্বন্ধে আলোচনা না কি এই? প্যাণ্ডেল, চেয়ার, সতরঞ্চি, সভাপতি, রিসেপসন কমিটি—এসব কথার উল্লেখও নেই কারো মুখে, ডেলিগেটদের থাকা ও খাওয়ার কথা নিয়ে তুমুল তর্ক নেই, এর মধ্যে কনফারেন্স-প্রসঙ্গ আছে কোথায়? তারক শুনেত পায় নিশীথ বলছে, 'তোমরা খালি চাষী চাষী করছ, দেখতে পাচ্ছ না চাষীদের টানা কত শক্ত? ফ্যুডেল সীস্টমের শেষ গাধাবোট পর্যন্ত কি ওদের তোমরা বলতে পার? দু'চার বংশ ওরা এমনিভাবেই কাটাবে। মজুরদের ডাকলেই আসে। ওরা সোজাসুজি ক্যাপিটালিস্ট সীস্টমের চাপে এসে

পড়ে। ছ'মাস আগে যে চাষী ছিল হাজার বোঝালেও সে কিছু বুঝত না, ছ'মাস ফ্যাক্টরীতে কাজ করে তার বোধশক্তি জন্মে। জিন্দাবাদ বলতে শেখে। বড়লোকের টাকা আগে ইণ্ডাস্ট্রীতে না লাগালে—'

দীঘল নাক উঁচ কপালে করুণা বলে, 'তা'তে ক্যাপিটালিস্ট প্রশ্রয় পাবে।'

নিশীথ বলে, 'পাবে। মজুরও বাড়বে। সীস্টেমটাকে গড়ে উঠতে না দিলে কি ভাঙবার জন্য তুমি বিপ্লব আনবে, লড়বে কার সঙ্গে? শিশুর সঙ্গে যুদ্ধ চলে না। কলকারখানায় যে টাকা খাটে সেটা অন্ততঃ ক্যাপিটালিস্টের পকেটে থাকে না, বৃটিশ ফরেন এক্সচেঞ্জের ইণ্ডিয়ান ডেবিট ক্রেডিট নামে উল্টো গতি পায় না। কলকারখানায় টাকা খাটুক, ক্যাপিটালিস্ট বাড়ুক। লক্ষ লক্ষ বাড়তি বেকার-চাষী মজুর হোক, তখন কিছু করা যাবে। কোন দেশে কোন কালে ক্যাপিটালিস্টের পকেটের টাকা কেউ বাগাতে পারে নি, কারণ ও টাকাটা তখন আর টাকাই থাকে না।'

কোটপ্যান্ট পরা সীতানাথ পা ছড়িয়ে দু'হাতে ভর দিয়ে বসেছিল,—'তুমি সব সময় 'কোন কালে কোন দেশের কথা বল।' অথচ তোমার হিস্টরিক্যাল সীমেট্রির বোধ নেই, ইণ্টারন্যাশনাল ব্যাকগ্রাউণ্ড তোমার কাছে ঝাপসা হয়ে আছে, তুমি শুধু ইণ্ডিয়াকে দেখতে পাও। তুমি ভুলে যাও যে সোস্যাল সায়েন্সের নিয়মগুলি দেশ কাল নিরপেক্ষ।'

নিশীথ মৃদু হেসে বলল, 'তুমিও ভুলে যাও সোস্যাল সায়েন্সের শৈশবও এখনো উৎরোয় নি। তোমাদের কি হয়েছে জানো, সোভিয়েট নেতাদের দৃষ্টি দিয়ে দেশকে দেখছ। রাগ করো না, একটা উপমা দিচ্ছি। ইংরেজীপনা একদিন যেমন আমাদের মধ্যে মত্ততা এনেছিল, তোমাদেরও তেমনি রুশপনার মত্ততা এসেছে। এখনো স্বদেশীপনার রূপ দিতে পার নি, জাতি না হয়েই আন্তর্জাতিকতার মন্ত্র জপছ। মস্কো থেকে ইংলণ্ড হয়ে ভারত হয়ে একটা তার মস্কোতে পৌঁচেছে—এই হল তোমাদের আন্তর্জাতিকতার রূপ। ভারতে শুধু তারটা আছে—আস্ত তার, এখানে ওখানে কেটে একটা টেলিফোন বসাতে পার নি। মস্কো-ইংলণ্ড আন্তর্জাকতার তারটা ভারতে শুধু হাওয়ায় কেঁপে একটু গুঞ্জন করেছে, তাতেই তোমরা খুসী! তা, সে তারটাও কট করে কেটে দিয়েছে সেদিন।'

তারক বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাতে শৈলেশ তাকে আলোচনার গোড়ার কথাটা বুঝিয়ে

দিল। কংগ্রেসের নীতি সম্বন্ধে পার্টির মনোভাব কনফারেন্সে স্থির করা হবে। এরা প্রস্তাব তৈরী করতে বসেছেন। কনফারেন্সের ব্যবস্থা? সে সব ঠিক করাই আছে। খুব কম রেটে একটি হল ভাড়া পাওয়া যায়, সেখানে কনফারেন্স বসে। কনফারেন্স এক রকম লেগেই আছে, স্থায়ী ব্যবস্থা ছাড়া কি চলে?

কনফারেন্স এক রকম লেগেই আছে! এমন হাস্যকর শোনায় কথাটা তারকের কাছে। সপ্তাহে সপ্তাহে দুর্গা পূজার সংবাদ যেন শৈলেশ তাকে দিয়েছে।

তারপর এক সময় পুষ্প তার বেণীকে খোঁপায় পরিণত ক'রে বই খাতা নিয়ে কলেজে যায়, নিশীথ করুণা সীতানাথেরা আরও বেলায় কথা কইতে কইতেই তাকে একটা সম্ভাষণ পর্যন্ত না জানিয়ে কোথায় ডুব মারে, একা সে বসে থাকে নির্জন ঘরে। মনে মনে কুপিত হয়ে ভাবে, ভাত খেতেও কি তাকে কেউ ডাকবে না? কোথায় কার কাছে ভাত পাওয়া যাবে আবিষ্কার করে তাকে আবেদন জানাতে হবে না কি? নাঃ, উদ্ভট খাপছাড়া মানুষ এরা, এরা সবাই এক একটা কুষ্মাণ্ড। কিছু হবে না এদের দ্বারা। ফাঁকা বিনয় আর বাড়াবাড়ি ভদ্রতা বাদ দিতে গিয়ে এরা মানুষের সঙ্গে ফাঁক সৃষ্টি করছে। নইলে তাকে এমন অবহেলা করে! রামবাবু হয়তো লিখেও দিয়েছেন, সে খুব কাজের লোক, তাকে পার্টিতে ঢোকাতে পারলে অনেক লাভ হবে পার্টির। অথচ তার সম্বন্ধে কারও এতটুকু মাথা ব্যথা নেই!

দোতলার রেলিঙে আর উঠানের তারে কত ধুতি আর শাড়ী ঝুলছে, কে জানে তার কথা ভুলে খেয়ে দেয়ে সকলে বিশ্রাম করছে কি না!

দরজার বাইরে যেতেই ওপর থেকে ফড় ফড় করে একটি কালো পেড়ে কাচা শাড়ী নেমে এসে তার মাথায় ঠেকল। মুখ তুলে তাকাতেই মনোজিনী বলল, 'আসছি।'

নিচে এসে বলল, 'খাবেন আসুন। খিদেয় পেট জ্বলছে নিশ্চয়ই? আমারও জ্বলছে। একটা একস্ট্রা ক্লাস ঘাড়ে চাপিয়ে দিল তাই দেরী হয়ে গেল ফিরতে।'

এখানে এসে একবার শুধু মনোজিনীকে তারক দেখেছিল, কলতলায় কয়েকটা সার্টে সাবান দিচ্ছে। দেখে তার মনে হয়েছিল মানুষের চেহারায় এত বেশী বিষাদের সমাবেশ সে জীবনে কখনো দেখে নি। অজানা কারো চেহারায় দূরে থাক, অতি চেনা কোন হতভাগীর চেহারাতেও নয়, যার জন্য সহানুভূতিতে চোখ

পর্যন্ত তার সজল হয়েছে। তখন পরিচয় হয় নি, শৈলেশ শুধু পরিচয় দিয়েছিল।

এবার নিচে নেমে এসে তারকের সঙ্গে ভাত খেতে বসে মনোজিনী নিজেই তার বিস্তারিত পরিচয় দিল। মনোজিনীর স্বামী বনবিহারী ছিল এক কলেজের লেকচারার, মাস ছয়েক হ'ল জেলে আছে। তার বছরখানেক আগে তাদের বিয়ে হয়েছিল এবং এই বাড়িতে দু'জনে সংসার পেতেছিল—অর্থাৎ বাস করছিল। বনবিহারী জেলে যাবার পর বাড়ি ছেড়ে যেতে মনোজিনীর মন চায় নি, বাপ মা ভাই বোন সেধে সেধে ফিরে গেছে। শেষে পার্টির কয়েকজন মিলে বাড়িটা ভাড়া নিয়েছে এবং একসঙ্গে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

'কিন্তু তাই বলে যেন মনে করবেন না দিনরাত আমি ককিয়ে কাঁদছি ভেতরে ভেতরে। আমার চেহারাটাই ওম্‌নি, দেখলেই মনে হয় একটা অদ্ভুত মনোকষ্টে আছি। এ অবস্থায় যতখানি দুঃখ হওয়া উচিত তার বেশী সত্যি কিছু হয় নি।'

সামনা-সামনি পিঁড়িতে বসে দু'জন একসঙ্গে খাওয়া সুরু করেছিল। তারকের থালাটা আগে সাফ হয়ে যাওয়ায় মনোজিনী ভাত গিলে হাসল।—'ইস্‌। আপনি মফস্বল থেকে আসছেন, এমন যোয়ান চেহারা আপনার, আমার একবার খেয়ালও হয় নি চাল বেশি নিতে হবে। আপনার জন্য মাছ আনা হ'ল বিশেষ করে, খেলেন আধপেটা। কি আর করবেন, ওবেলা পেট ভরে খাবেন।'

'আপনারা মাছ খান না?'

'খাই। পয়সা বাড়লেই খাই। জানেন তো আমাদের অবস্থা, কেউ চাকরী করে, কেউ শুধু আমাদের কাজ করে, চাকরীর জন্যে তাদের স্পেয়ার করা চলে না। সবাই তো খাবে?'

তারক জোর দিয়ে বলল, 'খাবে বৈকি। না খেলে কি চলে?'

মনোজিনী স্বাভাবিক বিষাদে হাসল, 'চলে না? বহু বহু লোকের না খেয়ে চলছে। একেবারে ফুটপাত থেকে নরক পর্যন্ত। তবে আমরা ডাল ভাতটা কিছু পরিমাণে খাই। তাই কয়েকজনকে চাকরী করতে দেওয়া হয়। যেমন ধরুন আপনি, কায়দা-কানুন ভাল করে শিখতে আপনার দু'চার বছর লাগবে। এই দু'চার বছর আপনি চাকরী করলে পার্টির লাভ বই ক্ষতি নেই।'

এরাও তাকে চাকরী করাতে চায়! এরা ধরে নিয়েছে সে দলের লোক, চাকরীও করবে, ট্রেনিংও পাবে, পার্টির জন্য সব স্বার্থ ত্যাগ করবে। কে জানে কি চিঠি লিখেছিলেন রামবাবু এদের?

এই যে তারকের একবার মনে হল এরা তাকে বাঁধতে চায়, মন থেকে কথাটা সে আর দূর করতে পারল না। এরা কষ্ট করে থাকে, টাকার অভাবে প্রতিদিন মাছ পর্যন্ত খেতে পায় না, এটা ত্যাগ বলে জেনেও তারকের শ্রদ্ধা জাগে না। তার মনে হয়, এ নিছক দারিদ্র্য, যার কবল থেকে মুক্তি পাবার ক্ষমতা এদের নেই। এরা যে সে মুক্তি চায় না, বেঁচে থাকার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকে যতদূর সম্ভব বর্জন করে এরা কাজ করতে চায়, তাও তারক জানে। তার চাকরীর টাকাটা এদের ভোগে লাগবে যতটুকু তার চেয়ে বেশী লাগবে পার্টির কাজে। তবু তারকের মনে হয়, আরেকটা সত্য আছে। এরা চায় না সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে বোধ হয় এও সত্য যে চাইলেও এদের বেশী টাকা পাবার ক্ষমতা নেই। এদের এই ইচ্ছাকৃত দারিদ্র্যকে কোনদিন এরা ইচ্ছাকৃত স্বচ্ছলতায় পরিণত করতে পারবে না, পার্টির জন্যও যথেষ্ট টাকা সংগ্রহের শক্তি এদের নেই।

গোটা পাঁচেক আত্মীয়বন্ধুর বাড়ি দেখা-শোনার কর্তব্য পালন করার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে দ্বিতীয় বাড়িতেই সে প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিল। এটি তার চিরপরিচিত খাঁটি স্নেহার্ত নীড়, সমস্ত বাড়িটা যেন স্নেহের অশেষ বর্ষণে সেঁতসেঁতে হয়ে গেছে। ছোট বড় সকলের জীবন শ্যাওলার মত ভেলভেট কোমল। সকাল থেকে আটকানো নিশ্বাস যেন এখানে এসে পড়ল তারকের, তেলমাখানো চাবি দিয়ে একবেলার মরচে ধরা তার মনের ক'টা বিশেষ তালা এরা খুলে দিল। কথা কইতে কইতে জুড়িয়ে জুড়িয়ে এমন হল তারকের যে কথা কইতে গিয়ে ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে আসতে লাগল।

'বাছারে! ঘুমোস নি বুঝি গাড়িতে?'

সঙ্গে সঙ্গে বিছানা পাতা হল, ঘর নির্জন হল, দুয়ার ভেজানো রইল। এটা স্বাভাবিক। আপন কারো সর্দিজ্বরে এবাড়িতে শঙ্কার আবির্ভাব পথের পথিক টের পায়, ঘুম-উপোসী তারকের জন্য এটুকু হবে না?

আদুরে ছেলে তারকের একগুয়েমি বড় হয়ে খানিকটা রামবাবু, খানিকটা বইপত্র আর খানিকটা তার মানসিক সজাগত্বের মারফতে পাওয়া গভীর মর্মভেদী অনুভূতির আশ্রয়ে সংযত হয়ে থাকত। মাঝখানে একবার ছেদ পড়ে আবার এই চেনা জগতটার ছোঁয়াচ লেগে পরিণত হয়ে গেল মননশীল গুণ্ডামিতে। শুয়ে শুয়ে সে ভাবতে লাগল বাংলার পাকা দালানগুলি ভেঙ্গে পরিবারগুলি যদি ছত্রভঙ্গ হয়ে যেত! যদি মায়ের বুকের মাংসল চাপে একেবারে নিরামিষাশী না হয়ে উঠত বাঙ্গালী ছেলেগুলি ছাগলছানার মত! শুকনো কাপড়ের মত মনুষ্যত্ব ছেড়ে রেখে যদি না ব্যাং হয়ে ঝাঁপ দিত নির্জলা মধুর কূপে! এত যদি সস্তা না হ'ত নীহারিকার দেশে যাওয়ার ভাড়া আর সহজ, স্বাস্থ্যকর, অমৃতময় একটি ঘন্টাকে বহু ঘন্টা করার জন্য গভীর দুখে দুখী হয়ে মুখোমুখী চেয়ে থাকার মোদক।

দেহের শ্রান্তিতে নয়, ঘুমের জন্যও নয়, মগজের বিড়ম্বনায় তারক ঘুমের আগে ছেলেমানুষ হয়ে গিয়েছিল। আসন্ন সন্ধ্যা পূরবীব্যথা দিয়ে অনুভূতিকে একটু আচ্ছন্ন করার চেষ্টা করায় মনটা তারকের খিঁচড়ে গেল। অতি তুচ্ছ, অতি বাজে অনেক কথা, বলাবলি হবে, চা ও জলখাবার খাবে, এখানে থাকতে না পারার গুরুত্বপূর্ণ কারণ দেখাবে, তবে তার মুক্তি। তারকের ফাঁপর ফাঁপর ঠেকতে লাগল।

হঠাৎ সে তাই করল কি, একে ওকে ডাক দিতে দিতে লাফিয়ে উঠে জামা পরতে সুরু করে দিল, যারা এল তাদের সামনে দু'বার স্বগত উক্তিতে প্রকাশ করল যে তার সর্বনাশ হয়ে গেছে। উৎকণ্ঠায় উত্তেজিত ও কৌতূহলে আত্মহত আপনজনের প্রশ্নের জবাবে বলল যে চাকরীর জন্য বিকালে যার সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল, এখন কি আর দেখা হবে তার সঙ্গে!

'চল্লাম। আরেকদিন আসব'খন।'

একটি কথাও কেউ কইল না। মনে সকলের হায় হায় জেগেছে। কেমন ছেলে এ, কাণ্ডজ্ঞানহীন? ঘুমিয়ে একটা চাকরী হারালো! পথে নামবার আগে তারকের কানে বাজল ছোটদের কান্না কলরব, বড়দের নৈঃশব্দ।

শৈলেশ বলল যে এখনো সেই আলোচনা চলছে পার্টির আপিসে। তারক একবার যাবে কি? সেক্রেটারীর সঙ্গে একবার দেখা করা উচিত তারকের। মনোজিনী আর সীতানাথ যাচ্ছে, ওদের সঙ্গে সে যেতে পারে। আপিস বেশী

দূরে নয়। ফাইন্যাল ড্রাফ্ট্ ঠিক করে আজকে রাত্রেই ইস্তাহার ছাপতে যাবে।

'আপনি যাবেন না?' জিজ্ঞেস করল তারক।

'আমি একটু বালীগঞ্জের দিকে যাব।' শৈলেশ জবাব দিল।

সীতানাথের অসন্তোষ চাপা রইল না।—'উনি আজ আপিসে গিয়ে কি করবেন! তার চেয়ে তোমার সঙ্গেই ওকে নিয়ে যাও শৈলেশ।' মনোজিনী গামছায় মুখ মোছা সাঙ্গ করে বলল, 'ক্ষেপেছো না কি তুমি? শৈলেশ যাচ্ছে নিজের বিয়ের ঘটকালি করতে, শৈলেশের সঙ্গে উনি যাবেন মানে? না তারকবাবু, আপনি চলুন আমাদের সঙ্গে আপিসে।'

পথে নেমে তিনজনে হাঁটতে আরম্ভ করে। মনোজিনী দু'একটি কথা বলে তারক ও সীতানাথকে উদ্দেশ করে। তারক জবাব দেয়, সীতানাথ চুপ করে থাকে। অল্প দূর গিয়ে হঠাৎ সীতানাথ থমকে দাঁড়ায়, বলে যে আপনারা এগোন আমি আসছি এবং বলেই দীর্ঘ পদক্ষেপে পাশের পথের মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

দু'জনে খানিকক্ষণ নীরবে হেঁটে চলে। অথ আঁধার, আলো শুধু দোকানে। একটা বিড়ির দোকানের আলো আইনভাঙা দুঃসাহসিকতায় কয়েক মুহূর্তের জন্য মনোজিনীর মুখে পড়ায় তারকের মনে হয়, গামছা ঘষে সে যেন মুখের বৈধব্যকে আরও বেশী অনাবৃত করেছে।

'বড় মুস্কিলে পড়েছি ওকে নিয়ে। বড় জ্বালাতন করছে আমায়।'

'সে কি!' বলে হতভম্ব তারক খানিকক্ষণ কথা বলতে পারে না, তারপর মন্তব্য করে, 'আপনি প্রশ্রয় দেন কেন?'

'প্রশ্রয়?'

'অত গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কানে কানে কথা কইতে দিলে প্রশ্রয় দেওয়া হয়।'

'আপনি—আপনি—' কি একটা কড়া কথা বলতে গিয়ে মনোজিনী হেসে ফেলল। 'আপনার কথা জিজ্ঞেস করছিল। কি বলছিল শুনবেন?—এ মূর্তিমান মফস্বলটি কে। আপনার টেরি ওর পছন্দ হয় নি।'

'সেটা ওর সযত্নে এলোমেলো করা চুল দেখেই বোঝা যায়। কিন্তু ওকে তো মূর্তিমান শহর বলে তো মনে হল না! শহরে ছোকরা ফাজিল হয়, ন্যাকা হয় না।'

'ন্যাকা নয়, ছেলেমানুষ। ওর কথা বাদ দিন।'

মনোজিনীর কথার সুরে তারক হেসে ফেলল, 'তাই বলছিলাম, প্রশ্রয় দেন কেন।'

মনোজিনী বলল, 'ও! আপনি তাই ভাবছেন, আমার মনটা বিশ্লেষণ করে ফেলেছেন—আমার কোন খারাপ মতলব নেই, তবে ওকে নিয়ে খেলা করতে ভাল লাগছে, কেমন তো? আপনি মফস্বল থেকে আসছেন খেয়াল ছিল না।'

'গেঁয়োই বলুন না স্পষ্ট করে, মফস্বল কেন?'

মনোজিনী থমকে দাঁড়াল। ভয় দেখানোর ভঙ্গিতে তার বুকে তর্জনী ঠেকিয়ে প্রত্যেকটি শব্দে জোর দিয়ে মিষ্টি সুরে বলল, 'তারকবাবু, আপনাকে অবজ্ঞা করে ওকথা বলি নি। মফস্বলের লোককে আমরা অবজ্ঞা করি না। আমি বলতে চাইছিলাম, আপনি বাইরে থেকে আসছেন, আমাদের কতগুলি চালচলনের অভিজ্ঞতা আপনার নেই। সেটা আপনার দোষও নয়, লজ্জার কথাও নয়।'

দু'জনে আপিসের সামনে এসে পড়েছিল, বাইরে দাঁড়িয়ে এবিষয়ে আর তর্ক চলে না। সিঁড়ি ভেঙ্গে দোতলার সরু প্যাসেজে ক'বার পাক খেয়ে দু'জনে আপিসে পৌঁছল। মাঝারি সাইজের ঘর। একটি টেবিল, দুটি আলমারি, তিন জোড়া চেয়ার ও পাঁচটি বেঞ্চে ভরা। পোস্টার ও ইস্তাহারে আলমারি দু'টি ঠাসা, টেবিলে কাগজপত্র ছড়ানো, সাজানো আছে শুধু কয়েকটি বাঁধানো খাতা ও ফাইল। একটা স্কুলে অনেকটা এইরকম ক্লাশরুমে তারক দেড় বছর পড়েছিল। চেয়ারগুলি ছাড়া বেঞ্চে যারা বসেছে ঠিক তাদের মত পাঁচ ছ'টি বেঞ্চে তারা আট দশটি ছাত্র ভাগে ভাগে বেঞ্চির অনেকটা খালি রেখে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসত।

সেক্রেটারী কি বলতে দাঁড়িয়েছিলেন মনোজিনী বাধা দিয়ে বলল, 'এক মিনিট কমরেড। এর সঙ্গে সকলের পরিচয়টা করিয়ে দি। রামবাবু এঁকে পাঠিয়েছেন।'

সেক্রেটারী বললেন, 'আমার সঙ্গে আগে থেকেই পরিচয় আছে।'

তারক জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইল।

'চিনতে পারছ না?'

'আজ্ঞে না, সার।'

বলেই সে যেন 'সার শব্দটার ভেতর থেকে চেনার ইঙ্গিত পেতে লাগল। তারপর হঠাৎ মুখখানা তার হাসিতে ভরে গেল।

'এবার চিনেছি। আপনার কাছে একনমিকস্ পড়তাম। এখন কি করছেন

সার ?'

'বাড়িতে বসে নিজর কাছে একনমিকস্ পড়ছি।'

সেক্রেটারী হাসলেন, 'কিন্তু সার সার কোরো না তারক, লোকে হাসবে।'

চারিদিকে তাকিয়ে তারক অসন্তুষ্ট হল। কেউ হাসছে না, সকলের মুখ শুধু সস্মিত। সেটাও হাসির পর্যায়ে পড়ে,—বিশুদ্ধ সভ্য হাসি। তাকে কেউ অপমান করতে চায় না, ঠাট্টা করতে চায় না, বরং হাসি মুখে পিঠ চাপড়ে প্রশ্রয় দিয়ে আপন করতে চায়। গেঁয়ো ভাবছে না কি সকলে তাকে ? আনাড়ি ভাবছে এসব পার্টির ব্যাপারে ?

গম্ভীর মুখে ধীরে ধীরে তারক উঠে দাঁড়াল। কথাগুলিতে অনাবশ্যক জোর দিয়ে বলল, 'সার, আমার আপত্তি আছে সার। আপনাকে যদি সার না বলে কমরেড বলতে হয়, সার, আমি এখানে থাকতে চাই না সার।'

এ যেন একেবারে সন্ধি সম্পর্কে মিত্রপক্ষের ঘোষণা, হয় এস্পার নয় ওস্পার, মাঝামাঝি রফা নেই ! বিস্মিত দৃষ্টিতে সকলে এই উদ্ধত অমার্জিত অকুণ্ঠ গোয়ার্তুমির কমিক অভিনেতাকে দেখতে থাকে।

সেক্রেটারী গম্ভীর মুখে উদাসভাবে বলেন, 'তা তোমার যা ইচ্ছা তাই বোলো। এবার বসো তারক। দরকারী কাজটা সেরে নি।' কনফারেন্সের জন্য প্রস্তাবের খসড়াটি তিনি ধীরে ধীরে পাঠ করলেন। কেউ যে বিশেষ মন দিয়ে শুনল তা নয়, কারণ ওটা সকলের প্রায় মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। মহকুমা সহর-ঘেঁষা গাঁয়ে বাস করেও এলোমেলো ছাড়া ছাড়া ভাবে এই কথাগুলি তারকও প্রায় সমস্তটাই শুনেছিল। কংগ্রেসের নীতির সমালোচনা করে, কংগ্রেসের আগষ্ট প্রস্তাব প্রত্যাহার ও জেলের বাইরে এসে নতুন নীতি গ্রহণ করার দাবী জানিয়ে দেওয়াই প্রস্তাবের মূল কথা।

সকলেই প্রস্তাবটি গ্রহণ করল, নিশীথ পর্যন্ত। সে শুধু একবার জানিয়ে দিল যে প্রস্তাবটি সে সমর্থন করে না, তবে পার্টির খাতিরে গ্রহণ করল। এই নিয়ে একটু গোলমাল হল তারপর, সমর্থন না করেও প্রস্তাব গ্রহণ করার সঙ্গতি অসঙ্গতি নিয়ে। সিদ্ধান্ত যে কি হল শেষ পর্যন্ত কিছুই তারক বুঝতে পারল না। তারকের সমর্থন অসমর্থনের কোন প্রশ্নই ছিল না, সে শুধু দর্শক, তার কোন অধিকার নেই এ ব্যাপারে কথা বলার। কিন্তু রীতিনীতি জানতে বা মানতে তো তখন পর্যন্ত শেখেনি তারক, নির্বিবাদে সে তাই সোজা স্পষ্ট ভাষায় এক প্রশ্ন করে বসল, 'আপনারা কি

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা চালাবেন? কংগ্রেসকে গালাগালি দেবেন?'

সেক্রেটারী সংক্ষেপে জবাব দিলেন, 'না। গালাগালি দেওয়া আমাদের পেশা নয়।'

'রামবাবুও তাই বলেছিলেন আমাকে। আপনারা শুধু তাহলে একটা প্রস্তাব পাশ করাতে চান? এর পেছনে কাজের কোন প্ল্যান নেই?'

সেক্রেটারী পূর্বতন ছাত্রের জেরায় একটু বিরক্ত হলেন।

—'তুমি কিছু না জেনেই তর্ক করছ তারক। কাজ তো আমাদের চলছেই।'

'তবে একটা কনফারেন্স ডেকে এ প্রস্তাব পাশ করার দরকারটা কি ছিল বুঝতে পারছি না সার।'

এবার নিশীথ বলল, 'আপনার কথা খানিকটা ঠিক তারকবাবু। তবে এভাবে প্রসিড করা হয় মেথড রক্ষার জন্য। একটা পাবলিসিটি হয়, দশজন আমাদের পলিসি জানতে পারেন।'

মনোজিনী হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'থাক্, থাক্। ও সব পরে আপনাকে বুঝিয়ে দেব তারকবাবু।'

মনোজিনীর বিষাদ-করুণ মুখে সেই অপূর্ব হাসি দেখে তারক একবার ভাবল, থাক তবে। এদের খানিক সমারোহের সঙ্গে প্রস্তাব পাশ করানোর মতই কি আর লাভ হবে তার এই বাদ-প্রতিবাদে। কিন্তু তাকে চাকরী করতে হবে এই চিন্তার সঙ্গে এদের পার্টিতে যোগ দিতে হবে এ চিন্তাও তার মনে অবিরাম পাক খাচ্ছিল, অসংখ্য প্রশ্ন কিলবিল করছিল তার মনে। চুলকানির চেয়েও অবাধ্য হয়ে উঠেছিল প্রশ্নগুলি।

সে তাই মনোজিনীর জবাবে নিজেও একটু হাসি ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করে বলল, 'সোজা মোটা কথাটাই বুঝতে পারছি না, পরে আর কি বুঝিয়ে দেবেন! কাজ যেমন চলছে তেমনি চলবে, আপনারা যেমন আছেন তেমনি থাকবেন, মিছে-মিছি কনফারেন্স ডেকে পয়সা খরচ করা কেন? প্রস্তাবটিতে বলতে গেলে কিছুই নেই। আপনারা যে কংগ্রেসের নীতি সমর্থন করেন না, জেলের বাইরে থেকে আপনাদের কাজ করাটাই তার মস্ত প্রমাণ! পলিসি জোর গলায় ঘোষণা করলেই লোকে বুঝবে কংগ্রেসের পলিসি আপনারা মানছেন না। একটা উদ্দেশ্যহীন কনফারেন্স ডেকে লাভ কি?'

কে একজন বলল, 'সে আপনি বুঝবেন না।'

তারক আন্দাজে বক্তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'কেন বুঝব না? রামবাবু অকারণে কিছু করেন না। কেন করেন না সেটা বুঝি। আপনাদেরটা বুঝব না কেন? রামবাবু কখনো জেনে শুনে এমন কনফারেন্স ডাকেন নি, যা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হতে বাধ্য।'

মিলের রঙীন শাড়ী পরা একটি মোটা মেয়ে বলল, 'আপনি খোকার মত কথা বলছেন। রামবাবু কনফারেন্স ডাকবেন মানে? তাঁর কতটুকু এরিয়া। হেড-কোয়ার্টার্স থেকে কনফারেন্স ডাকা হয়।'

পুষ্প দাঁত দিয়ে নখ খুঁটছিল, গরম ঘরের ফোকর দিয়ে গলিয়ে একটু ঠাণ্ডা বাতাস ঢোকার মত ছেলেমানুষ পুষ্প হঠাৎ বলে বসল, 'প্রস্তাবের কথা বাদ দিন না তারকদা। কনফারেন্সে সকলে একত্র হবে তো, চাদ্দিকে যারা ছড়িয়ে রয়েছে? সেটা বুঝি কম হল!'

'তা বটে। সেটা ঠিক।' বলে শেষ পর্যন্ত পুষ্পর কাছে হার মেনে তারক বসল।

তারক একদিকে খুশি হয় এই ভেবে যে পার্টি কংগ্রেসকে গাল দেবে না। শৈশব থেকে সে অন্ধ প্রীতি দিয়ে এসেছে কংগ্রেসকে। নতুন চিন্তার প্রধান ধারা থেকে ঘটি ও কলসী ভরে অনেক নমুনা তার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে যুগ, ভাবতে শেখার লাঙল-চষা মন তা শুষে নিতে বিলম্ব করে নি। কিন্তু হায়রে মন না মতি মানুষের, গেঁয়ো সতীর মত ভেতরে কে গোঁ ধরে আছে ফসল ফলাবে সেই একজন,—অবশ্য ঘটি কলসীতে সেচে নয়, বাঁয়ের মেঘের ধারা বর্ষিয়ে।

তারক বুঝতে পারে না কংগ্রেসকে বাইরে আনতে এত ব্যস্ত কেন এরা, এত অধীর কেন? এরা কেন অবাস্তব অর্থহীন পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকবে বর্তমানে? আর তো কোন পথ নেই কংগ্রেসের। যে নামে হোক, যে ভাষায় হোক, যে পদ্ধতিতে হোক, এদের মূলনীতি গ্রহণ করতেই হবে কংগ্রেসকে, যে পথে চলতে এরা এত ব্যাকুল সেই পথেই হবে কংগ্রেসের গতি। তারকের কাছে এই সম্ভাবনা অপরিহার্য। ছোট ছোট পার্টির জন্ম, ভেদাভেদ, দলাদলি গালভরা নাম দিয়ে দল গঠন, এসব তারককে তার মহকুমা-ঘেঁষা গাঁয়ে এতটুকু বিচলিত করতে পারে নি। যুদ্ধোত্তর ভবিষ্যতে নতুন ভাববন্যার আবির্ভাবে এতই দৃঢ় তার

বিশ্বাস। বিরোধী যুক্তি, বিরোধী তর্ককে সে শুধু তার বিশ্বাস দিয়ে চিরকাল উড়িয়ে দিয়েছে।

রামবাবুকে সে বলে, 'দেশকে নিয়ে কংগ্রেস জেলে যায় নি!'

রামবাবু বলেন, 'দেশের মনকে ছেড়েও দিয়ে যায় নি।'

সে বলে, 'কিন্তু সংস্কার ছাড়া আর কিছু কি মনকে চলতে না দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারে? নতুন চিন্তাধারা কি ভাবে ছড়াচ্ছে দেখতে পান না? আমরা তাই করব, চলতি মনকে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যাব। আমাদের দেশপ্রেমে কংগ্রেসে দাঁড়িয়ে আছে, ওই দেশপ্রেম থেকে আমরা জনমত গজিয়ে রাখব, মাটিতে যেমন ঘাস গজায়! কংগ্রেস জনমত ছাড়া দাঁড়াবার ঠাঁই পাবে না।'

রামবাবু বলেন, 'বেশ বলেছ। গোটা কয়েক মিটিং-এ ঘণ্টাখানেক এভাবে বলতে পারলে নেতা হতে পারবে, একটা পার্টি গড়তে পারবে। আরে বাপু, দেশের মন যদি নতুন পথে এগিয়ে গেল কংগ্রেসের কাছি ছিঁড়ে কংগ্রেস এসে নাগাল ধরুক বা না ধরুক কি এসে যাবে তাতে? বাড়ি গিয়ে ভেবে দেখো, কংগ্রেসটা কি বস্তু, আর তোমার মন কি বস্তু। গোড়ার কথা না বুঝে চড়া বিদ্যে আয়ত্ত কর বলেই তো তোমাদের ধাঁধাঁ ঘোচে না।'

তখন তারকের মনে হয়, সত্যিই সে ধাঁধাঁর আবর্তে পাক খাচ্ছে। বিশ্বাসকে যতক্ষণ খাড়া করে তুলতে না পারে, ততক্ষণ হাঁসফাঁস করে তারকের মনটা। প্রোডাকসন, ডিস্ট্রিবিউসন, ক্যাপিটালিস্ট সীস্টেম, সোশ্যালিস্ট সীস্টেম ইত্যাদি সব জলের মত পরিষ্কার তার কাছে—অথচ দেশকে সামনে রেখে ভাবতে গেলে সব তথ্যবোধ তার গুলিয়ে যায়। বিদেশী বণিকের হাত থেকে রাষ্ট্রক্ষমতা স্বদেশী বণিকের করায়ত্ত হতে দিতে তারকের আপত্তি নেই, কিন্তু তাও সম্ভব হবে একমাত্র সোসালিস্ট রাষ্ট্র গঠনের আয়োজন থেকে উদ্ভূত বিপ্লবের মারফতে। সে স্বাধীনতার মূল্য তারকের কাছে খুব বেশী নয়। তবু সে স্বাধীনতাই ক্যাপিটালিস্ট বৃটেনকে দুর্বল করবে, ভারতে ক্যাপিটালিজমের ধ্বংস সহজ হবে এবং তারক বিশ্বাস করে ভারতকে সোজাসুজি সোশ্যালিস্ট রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টার চেয়ে এই পন্থায় সেটা অনেক সহজে এবং কম সময়ের মধ্যে হবে।

শুধু বিশ্বাস, আর কিছু নয়। বিশ্বাসের ভিত্তিটা শক্ত করবার জন্য যুক্তি, বিশ্লেষণ ও মনীষিদের সমর্থক উক্তি খুঁজে খুঁজে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখে নি বলে তারকের

মনে মাঝে মাঝে গভীর আপশোষ জাগে। কিন্তু মফঃস্বলের আলস্য বড় সাংঘাতিক জিনিস।

সবটুকু বিশ্বাস বজায় রেখেও খানিকটা টলমল মন নিয়ে তারক পার্টির বাসায় ফিরল। মনোজিনী সমস্ত পথ মন্তব্য করতে করতে এল : নাঃ, নেতা নেই আমাদের! একটা নেতা নেই! ইস্, ভাবতেও কষ্ট হয়, একটা ভাল নেতা নেই আমাদের, যে হাল ধরতে জানে!

কনফারেন্সের জন্য বাসায় লোক বেড়েছে, বাইরে থেকে কয়েকজন এসে এখানে উঠেছে। সকলের গল্পগুজব আলাপ-আলোচনার মধ্যে কিসের অভাব যেন পীড়ন করতে লাগল তারককে—সকলের আগ্রহ ও উৎসাহ তাকে সঞ্জীবিত করে তুললেও। কয়েকজনকে ছাড়া এদের চেনে তারক। ভেতরে বাইরে চেনে। এরা সৈনিক-বৃত্তি গ্রহণ করেছে, সামরিক জাতির মানুষের মত সহজ, স্বাভাবিক ভাবে। তফাৎ শুধু এই যে মরণকে এরা প্রাণ বিলিয়ে দেয় নি, জীবিতের জন্য দান করেছে জীবন।

খাওয়া শেষ করে সকলের শোয়ার ব্যবস্থা হতে অনেক রাত হয়ে গেল। তারকের বিছানা মনোজিনী বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে গেল।

'আমার খাটে আপনারা তিনজন বালিশ ছাড়া শুধু গদিতে শোবেন। আপনার এই ক্ষুদে তোষকটি পাবে দু'জন। সুজনীটা বড় আছে ওটা পেতে শোব আমরা—থ্রি লেডিজ্।'

সীতানাথ দেয়ালে ঠেস দিয়ে সিগারেট টানছিল, হঠাৎ উদ্ধত ভঙ্গিতে বলল, 'নাঃ আমি বাড়ি চললাম।'

মনোজিনী রাগ করে বলল, 'ট্রাম নেই, বাস নেই, কি করে যাবে? আগে গেলেই হত। কষ্ট করতে শেখো একটু।'

'কষ্ট আর কি!'

'তা মিথ্যে নয়। রীতিমত তোষক চাদরের বিছানা তোমাদের দিয়েছি, তিনটে মোটা মোটা বই পর্যন্ত পেয়েছ। আচ্ছা যাও, এই বালিশটাও তোমাকে দেয়া গেল।'

সীতানাথ বালিশটা নিয়ে দু'হাতে চেপে চেপে সেটাকে গোলাকার করবার চেষ্টা করে। তারক ভাবে, এটা একটা আস্ত বাঁদর। খাস জংলী বাঁদর।

'প্যান্ট পরে শোব না কি আমি?'

'আমি তার কি করব ?'

'তোমার একটা শাড়ী দাও।'

'আমার শাড়ী নেই। একটা ধুয়ে দিয়েছি, একটা পরে আছি। তোমার বৌদির মত আমার দশ গণ্ডা শাড়ী থাকে না।'

তারক ভদ্রতা করে বলতে গেল, 'আমার একখানা কাপড়—'

মনোজিনী বাধা দিয়ে বলল, 'না, আপনার ধুতিটুতি ও পাবে না। বাইরে থেকে এসেছেন, কত দরকার হবে আপনার।—ওই গামছাটা তুমি পরতে পার সীতু। মস্ত গামছা, লুঙ্গির মত পরতে পারবে, আর কিছু জুটবে না।'

পুষ্প এসেছিল। মুখ বাঁকিয়ে মাথা নেড়ে নেড়ে সে বলল, 'আপনি বড় জ্বালান সীতুদা। কোথায় কোন্ বালিগঞ্জীর প্রেমে পড়বেন, এসে জ্বালাবেন আমাদের। অত আদর দিতে পারব না আমরা, স্পষ্ট বলে দিচ্ছি।'

মনোজিনী বলল, 'চুপ কর পুষ্প। কত আদর তুই দিচ্ছিস একজনকে ছাড়া অন্যকে!'

পুষ্প প্রতিবাদ করল, দিচ্ছি না ? পরশু রাত এগারটা পর্যন্ত ঘুরিনি শৈলেশের সঙ্গে ? বুঝিয়ে বুঝিয়ে হয়রাণ হয়ে শেষে আসল কথা ফাঁস করতে হল,—বীথির প্যাঁচড়া হয়েছে তাই কাছে ঘেঁসতে দেয় না। আমি বলেছি শুনতে পেলে বীথি কেমন চটবে বলত ?'

পুষ্প চলে যাবার পর সীতানাথ হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'খাটে জায়গা নেই ?'

মনোজিনী খানিকক্ষণ চুপ করে রইল।

'খাটে শুতে চাও ? আচ্ছা সুশীলকে বলছি তোমার জায়গায় শুতে।' যাবার জন্য পা বাড়িয়ে মনোজিনীর বোধহয় মনে হল প্রশ্রয়ের দিকে পাল্লা ঝুঁকছে। সে তাই মুখ ফিরিয়ে বলে গেল, 'বালিশ পাবে না।'

সন্ধ্যা পর্যন্ত আত্মীয়ের বাড়ি ঘুমিয়েছে, তারকের চোখে অনেকক্ষণ আর ঘুম আসে না। জীবনে সে এমন নরম গদিতে শোয় নি, তিন চার পরত পুরু তুলোর তোষককেই সে এতক্ষণ গদি বলে জেনে এসেছে। এটা তুলোর নয় নিশ্চয়।

রিক্সার টুনটুন আওয়াজ তার কানে আসে। সারাদিন বাড়ির কথা, বৌয়ের কথা তার একবারও মনে পড়ে নি, এখন চিন্তার ফাঁকে ফাঁকে পুরানো স্মৃতির মত, প্রাচীন স্বপ্নের মত, ওসব চিন্তা মনে ভেসে আসে। যেদিন খুসী বিকেলে ট্রেনে উঠে সকালে ওদের কাছে সে যেন আর ফিরতে পারবে না, একদিনে বহু যুগের ব্যবধান রচিত হয়ে গেছে। অন্ধকার ঘুমন্ত বাড়িতে তারক ভিড়ের সান্নিধ্য অনুভব করে। তার মহকুমা সহরে হাঙ্গার মার্চ করে যারা এসেছিল চারদিকের গাঁ থেকে, যাদের উদরহীন কাকলি মুষ্টিতে ধরা যাবে মনে হয়েছিল, তাদের ভিড়। ওদের ভবিষ্যৎ এ বাড়ির ঘরে ঘরে গাদাগাদি করে ঘুমিয়ে আছে,—ব্যারাকের সৈন্যের মত। মেয়েরা পর্যন্ত বইতে এসেছে সেই ভবিষ্যতের ভার!

অনুভূতিময় শ্রান্ত জাগরণ সিগারেটের পিপাসা জাগায়। মাথার নীচে পুঁটলী করা জামার পকেট খুঁজতে গিয়ে তারক থমকে যায়। স্প্রিং-এর গদীতে এলোমেলো ঢেউ তুলে সীতানাথ উঠে যাচ্ছে।

খানিক পরেই মনোজিনীর চকিত কণ্ঠ কানে আসে।

'সীতু! কি করছ তুমি?'

'আমি তোমায় ভালবাসি মনু-বৌদি।'

একখানা কাপড় সংগ্রহ করে পুষ্পদের খানিক তফাতে ঠিক জানালার নিচে পেতে মনোজিনী শুয়েছিল। তার গরম-বোধটা একটু বেশী। ঘরের গাঢ় অন্ধকারে জানালা দিয়ে আকাশের অতি ক্ষীণ চাঁদ আর তারার আলো এসেছে। তারকের শরীরটা শক্ত হয়ে গেল। মন হয়ে গেল ভোঁতা। ওদের কি জানানো উচিত হবে সে জেগে আছে? চুপি চুপি সে কি বাইরে পালাতে পারবে ওদের টের পেতে না দিয়ে? কে জানে হয়তো খাট থেকে নামতে গেলেই পুষ্প বা তার পাশের কোন মেয়ের গা সে মাড়িয়ে দেবে! না, পালাবার পথ তার নেই। শব্দ করার ক্ষমতাও তার নেই। জেগে থেকে তাকে অভিনয় করতে হবে ঘুমন্তের! হায়, জেল-খাটা তারককে কে মুক্তি দেবে এই ভয়ঙ্কর বন্দী দশা থেকে!

তারপর তারক শুনতে পেল মনোজিনী বলছে, 'ঘুমন্ত মানুষকে জাগিয়ে বলতে এসেছো ভালবাসো? আচ্ছা বেশ, আমি শুনে রাখলাম। এবার শোবে যাও। কাল এবিষয়ে কথা কইব।'

'চুলোয় যাক কাল।'

'তা জানি। ঘুমের মধ্যে জড়িয়ে ধরেছ, ছাড়তে বলছি ছাড়ছ না, পৃথিবী এখন তোমার কাছে চুলোয় গেছে। কিন্তু আমি তো তোমায় ভালবাসি না সীতু, আমার নাড়ী এতটুকু চঞ্চল হয় নি। পরখ করে ছাখো। আমার বিশ্রী লাগছে, কষ্ট হচ্ছে। যাও, শোবে যাও।'

'কিন্তু—'

'কোন কিন্তু নেই। সত্যি বলছি তোমায়, তুমি যদি আমার মধ্যে এতটুকু—'

কথা সে শেষ করার স্থযোগ পেল না, তারক এসে বাধা দিল। বাধাও কি সহজ বাধা, ঘাড় ধরে সীতানাথকে টেনে তুলে প্রচণ্ড আক্রোশে সে বসিয়ে দিল কয়েকটা কিল চড় ঘুসি, তীব্র চাপা গলায় বলতে লাগল, 'পাজী! বদমাস! লক্ষীছাড়া!'

এ কোনো পুরোনো পীরিতির জের টানা নয়, এ শুধু বাঁদরটার বাঁদরামি টের পেয়ে মাথায় বীরত্বের আগুন জলে উঠেছিল তারকের। আটকানো নিশ্বাসটা তার পড়বার স্থযোগ পেয়েছিল।

সীতানাথের গলা ধরে সে ঝাঁকি মারছে, মনোজিনী ব্যাকুলভাবে দু'জনকে ঠেলে তফাৎ করবার চেষ্টা করে বলল, 'কে? কি করছেন আপনি?'

'আমি তারক। বাঁদরটাকে রাস্তায় ফেলে দিয়ে আসছি দাঁড়ান।'

'ছেড়ে দিন ওকে আপনি!'

মনোজিনীর কথার স্থরে থতমত খেয়ে তারক সীতানাথকে ছেড়ে দিল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল ঘর—নিঝুম, নিঃশব্দ। ঘরে যারা ঘুমোচ্ছিল তারা সবাই ঘুমিয়েই চলেছে, একজনও সাড়া দেয় না, শব্দ করে না। তারকের মনে হল সে যেন রূপ-কথার ঘুমন্ত পুরীর একটি ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে, যাদুমন্ত্রে ঘুম পাড়ানো হয়েছে সারি সারি নরনারীকে, কোন ঘটনা কোন হট্টগোলেই তাদের ঘুম ভাঙবে না।

'শোবে যাও সীতু। তারকবাবুকে বুঝিয়ে বলছি, উনি কিছু প্রকাশ করবেন না। ব্যাপারটা তুমি আমি আর তারকবাবুর মধ্যেই রইল। কেউ কিছু জানবে না।' বলে একটু থেমে যোগ দিল, 'কাল সারাদিন ঘুরতে হবে—একটু ঘুমিয়ে নাও।'

সীতানাথ নীরবে খাটে শুয়ে পড়ল।

'চলুন তারকবাবু, একটু ছাতে যাই।'

'কাল সকালেই বরং—'

'এখুনি চলুন। বাতাস পাবেন। সিগ্রেট নিয়ে চলুন।'

এতও জানে মনোজিনী! সে সিগ্রেট খাবে আর দু'দণ্ড তার সঙ্গে আলাপ করতে করতে মনোজিনী উপদেশ দেবে—এমন করে দেবে যে, সাংসারিক ব্যাপার নিয়ে স্ত্রী যেন স্বামীর সঙ্গে আলোচনা করছে—একপক্ষের আলোচনা। হুঁঃ, এ সব মেয়েমানুষকে চেনে তারক। এরা তার গাঁয়ের শশীদা'র মার মত। পায়েস খেতে ডেকে আদর করে বসিয়ে কথা পাড়বেন সোমত্ত মেয়ের বিয়ে-সমস্যার আর সেই আলোচনার জের টানতে টানতেই তারকের জ্ঞান জন্মিয়ে দেবেন যে বিয়ের যুগ্যি মেয়েটার সঙ্গে বেশী মেলামেশা যদি করে তারক, কলংক রটতে কতক্ষণ! পুরুষমানুষের সঙ্গে বেশী মেলামেশার ফলে মনোজিনীও শশীদা'র মা'র মত হয়ে গেছে এই বয়েসে।

কত বয়স হবে মনোজিনীর?

'আপনার বয়স কত?'

'আপনি আর আমি সমবয়সী বোধ হয়।'

তারক চুপ করে গেল। কিন্তু মনোজিনী ছাড়ল না।

'সীতু আমার চেয়ে তিন-চার বছরের ছোট হবে। বুঝলেন?'

অন্ধকার সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে তারক ভাবল, কি তাকে মনে করেছে মনোজিনী? গেঁয়ো? অমার্জিত অনভিজ্ঞ বুদ্ধিহীন অসভ্য? ভাবুক মনোজিনী! তাই তার গৌরব!

এ বাড়ির তেতলা ছাদটিও বাড়িওলার দখলে, নিজের দু'তলার পুরুষদের ছাদে ওঠা নিষেধ। মেয়েদের সম্বন্ধে বাড়িওলা উদারতা দেখিয়েছেন, মেয়েরা ছাতে উঠে হাওয়া খেতে পারে। ছাতে উঠে আল্‌সেয় ভর দিয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দু'জনে তারা নিচে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে। অদূরে ফুটপাতে লম্বা লাইন দিয়ে নারী-পুরুষ শুয়ে বসে ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে। এখানে লাইনের শেষটা রাস্তার আবছা আলোর চোখে পড়ে, আরেকটি মুখ খানিক দূর গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

মনোজিনী কথা কইতে তারক বুঝতে পারল সে ঠিক তার শশীদা'র মা'র মত নয়। ভনিতা ও ভূমিকার ধার মনোজিনী ধারে না।

'আপনার একটু বুদ্ধি হল না যে সতুকে আমিই সামলাতে পারতাম? সাহায্যের দরকার হলে আমিই চেঁচামেচি করে সকলকে জাগাতে পারতাম?'

'এ বিষয়ে আমার বুদ্ধিটা সত্যি ভোঁতা। আপনাকে সাহায্য করতে যাই নি, একটা বাঁদরকে শাস্তি দিতে গিয়েছিলাম।'

'কেন? কিল চড় ঘুষিতে বাঁদরামি ভুলিয়ে দিতে? এ-বাড়ির হাবুল ও-বাড়ির মীনুকে একা পেয়ে হাত ধরে টেনেছে, একি সেই সমস্যা? হাবুলকে আচ্ছা করে শাসন করে দিলে সে আর কোনদিন মীনুকে জ্বালাতন করবে না, সুতরাং মীমাংসা হয়ে গেল? ও বাঁদরটার কাছে আমরা অনেক আশা করছি, ওকে হারালে পার্টির ক্ষতি হবে। আপনি তো সর্ব্বনাশ করতে বসেছিলেন। যদি কারো ঘুম ভেঙ্গে যেত—'

'তা ভাঙ্গত না। বোমা পড়লেও ভাঙ্গত না।'

'আপনার বুদ্ধি আছে। কিন্তু তবু আপনি এমন অবোধ! কেউ জাগছে না, সীতুও যদি সেটা টের পেত আপনার মত? ও যদি জানত সবাই ওর কাণ্ড টের পেয়ে গেছে, ঘুমের মধ্যে আমাকে আক্রমণ করে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, এ খবর কাল মুখে মুখে ছড়িয়ে যাবে, ওর দফা শেষ হয়ে যেত একেবারে। হয় পার্টি ছেড়ে চলে যেত, নয় পার্টিতে থেকেও কোন কাজে লাগত না। অথচ কত তুচ্ছ একটা উপলক্ষ্য!'

'তুচ্ছ না কি?'

'তুচ্ছ বৈকি! পেটের ক্ষিদেয় কাতর হয়ে আমার কাছে খাবার চাইলে যত তুচ্ছ হত, প্রায় সেরকম তুচ্ছ। বয়সের ধর্ম বলে আমি ওর সাফাই গাইছি না, এখনো ওর মন ঠিক হয় নি, মেয়েদের সম্বন্ধে এখনও ওর রোমান্সের বিষ ঝরে যায় নি। মেয়েদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা এখনো ওর অভ্যস্ত হয় নি।'

তারক দ্বিধাভরে বলল, 'ও যে সমাজের ছেলে শুনলাম, মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ তো ওর কম হওয়ার কথা নয়।'

মনোজিনী বিদ্বেষহীন সুরে বলল, 'সে তো ড্রয়িং-রুমী রোমান্টিক মেলামেশা—মেয়েরা রহস্যের আড়াল ছেড়ে আসে না। হ্যাঁ, সেক্স্ নিয়ে পর্য্যন্ত অবাধে আলোচনা করে—তবে আলোচনাটা কোনদিন সেক্সের দণ্ড নিয়ে কাব্যমন্থন ছাড়া আর কিছু হয় না। আমাদের মেলামেশায় সব কৃত্রিম ব্যবধান ভেঙ্গে দেওয়া

হয়, কাজে-কর্মে চলাফেরায় সময়ে-অসময়ে সব অবস্থায় সব সময় সমানভাবে আমরা মেলামেশা করি। ঠিক এইজন্যই বাইরে আমাদের বদনাম রটে কিন্তু আসলে এইজন্যই সমাজের উঁচু থেকে নিচু পর্যন্ত সমস্ত স্তরের চেয়ে আমাদের মধ্যে বিকার কম, অসংযম কম। আজকের কাণ্ড দেখে কথাটা আপনার বিশ্বাস করা কঠিন হবে, কিন্তু সত্যি কথাই বলছি আপনাকে। ভাইবোনের মধ্যে যৌন আকর্ষণ হয় না কেন আপনি নিশ্চয় জানেন। আমাদের মধ্যেও অনেকটা তাই ঘটে। মেলামেশায় যদি আমাদের বিধিনিষেধ আইন-কানুন থাকত, তা'হলে মেয়েরা যেমন পুরুষরা তেমনি সর্বদা সচেতন হয়ে থাকত পরস্পরের সম্বন্ধে, সেই চেতনা থেকে মোহ জন্মাত, কামনা জাগত। কিন্তু সর্বদা খোঁচা দিয়ে যৌন চেতনাকে জাগিয়ে রাখার সব ব্যবস্থা আমরা বাতিল করে দিয়েছি। তাছাড়া, আমরা সর্বদা কাজে ব্যস্ত থাকি, মস্ত একটা উদ্দেশ্য আছে আমাদের, দু'দণ্ড বসে উচ্ছৃঙ্খল চিন্তাকে প্রশ্রয় দেবার অবসরও আমাদের জোটে না। ঘুম পাচ্ছে আপনার?'

'পাচ্ছে। কিন্তু আপনি বলুন।'

'আর কি বলব। বাইরে থেকে না জেনে না বুঝে আমাদের কুৎসা রটায় মানুষ, আপনিও হয়তো অনেক শুনেছেন। আপনাকে তাই একটু বুঝিয়ে দিতে হল। কে জানে হয়তো আপনার সঙ্গেই একদিন মফঃস্বলে গিয়ে আটকে যাব, এক ঘরে দু'জনের রাত কাটাতে হবে। তখন যেন সীতুর মত ছেলেমানুষী করবেন না।'

'সীতুর কি হবে? কতদিন ওকে সামলে সামলে চলবেন?'

'কত দিন আর, ওর মন দু'চার মাসে সাফ হয়ে যাবে। অন্য কোনদিকে ওর দুর্বলতা নেই, মেয়েদের সম্বন্ধে শুধু একটু রোমান্টিক। কাল পরশু আশা করে আসবে যে আমার মধ্যে খুব বড় রকম একটা প্রতিক্রিয়া হয়ে গেছে, হয় আমি ম্রিয়মান হয়ে পড়েছি আর না হয় রেগে রয়েছি। এসে যখন দেখবে যে আমি যেমন ছিলাম তেমনি আছি, ওর কাছে যা জীবনে একটা বিপ্লব ঘটার মত ব্যাপার, আমার কাছে তা সহজ স্বাভাবিক তুচ্ছ কিছুই না, বেচারা ভড়কে যাবে। তারপর ধীরে ধীরে আমার জন্য কামনা নিভে আসতে থাকবে—একদিন ভাবতেও পারবে না কেন আমার জন্য পাগল হয়েছিল। আমার কি দাম আছে বলুন ওর কাছে?

নিজের কল্পনা দিয়ে ও আমাকে মনের মত করে গড়েছে, ও যাদের চেনে তাদের মত না হয়ে আমি শুধু অন্যরকম বলে। সাধারণ খুঁটিনাটির মধ্যে ও আমার ভালবাসা খুঁজে পেয়েছে। অন্য কেউ চায় নি কিন্তু ও চেয়েছে বলে হয়তো এক কাপ চা বেশী দিয়েছি, বেশীক্ষণ আলাপ আলোচনা করেছি, কোথাও যেতে সঙ্গে নিয়েছি। আজ যেমন দেখলেন, খাটে শোবার আব্দার করল, খাটে শুতে দিলাম। এসব যে বাড়তি কিছু নয়, অন্য যে কেউ চাইলেই পেত, ওর মাথায় তা ঢোকে নি। ভেবেছে, আমার স্বামী বহুদিন জেলে, আমি ওকে ভালবাসতে সুরু করে দিয়েছি, এসব তারই লক্ষণ। আগাগোড়া ভুল করেছে জানলেই ওর তাসের প্রাসাদ ভেঙ্গে পড়বে। একটু আঘাত পাবে কিন্তু ভালই হবে তা'তে। আপনি তো রইলেন পার্টিতে, দু'বছর পরে ওকে চিনতেই পারবেন। আমাকেই ধমক দিয়ে হয়তো ও তখন বলবে, কমরেড। তুমি বড় ডিসিপ্লিন নষ্ট করছ!'

দু'জনেই টের পেল আর কিছু বলাবলির নেই। সিঁড়ির দিকে চলতে আরম্ভ করে তারক হঠাৎ থেমে গেল।

'একটা কথা জানা বাকী আছে। কাল যদি সীতু এসে বলে, আপনাকে না পেলে সে পার্টিতে থাকবে না, কি করবেন আপনি?'

মনোজিনী শ্রান্ত-কণ্ঠে জবাব দিল, 'ও তা বলবে না।'

'যদি বলে?'

'যদি আবার কি, যদি? বলছি ও কথা সীতু বলবে না, তবু যদি! থিয়োরি ঘেঁটে ঘেঁটে কি যে মন হয়েছে আপনাদের, যা অসম্ভব তাকেও একটা যদি দিয়ে সম্ভব করতে চান।'

মনোজিনীর রাগ দেখে তারকও চটে গেল।

'আরেকটা প্রশ্ন জেগেছিল, জিজ্ঞেস করতাম না। এখন জিজ্ঞেস করতে হচ্ছে। সীতু যা পায় নি আমি যদি এখন তা আদায় করে নি?'

'যদি আদায় করে নেন? যদি? নিন্। কোন আপত্তি নেই আমার। আপনাকে যেন বহুদিন ভালবেসে এসেছি এমনি ভাবে নিজেকে সঁপে দিচ্ছি, আপনি শুধু নিন আমাকে। আপনার যদির মাহাত্ম্য প্রমাণিত হয়ে যাক। আমারও জ্ঞান জন্মে যাক, সভ্যতা মিথ্যা, প্রগতি মিথ্যা, বাস্তব মিথ্যা, বিশ্বাস মিথ্যা।'

তারা ভরা আকাশের নিচে খোলা ছাতে দু'জনে মুখোমুখি উদ্ধত ভঙ্গিতে

দাঁড়িয়ে রইল যুগ ও জগতের দু'টি মহাসমস্তার রূপধরা জীবন্ত প্রতীকের মত।

তারক প্রথমে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল।—'আসুন, নিচে যাই।'

মনোজিনী বলল, 'দাঁড়ান, আমাকে ধরে নামবেন। আমার চেনা সিঁড়ি। ছাতের সিঁড়ি বলে ভাঙা-চোরা যেমন আছে তেমনি রেখে দিয়েছে বাড়িওলা, তিনবার বিয়ে করে একটা ছেলে হল না যে টাকাগুলো ভোগ করবে ব্যাটার। একবার কি হয়েছিল জানেন? এক গাঁ থেকে একা স্টেশনে যাচ্ছিলাম সন্ধ্যার পর। পথের দু'দিকে পাটক্ষেত। নির্জন, কিন্তু পথ হারাবার ভয় নেই। হঠাৎ যেন পাটক্ষেতের ভেতর থেকেই ছ'টা লোক কিলবিল করে বেরিয়ে এসে আমায় ঘিরে ধরল। কেউ জিজ্ঞেস করে, কে গো তুমি, কেউ জিজ্ঞেস করে বাড়ি কোথা, আর গা ঘেঁসে আসে। মুখ চাপা দেবার জন্য একজন গামছা ভাঁজ করছে, তাও দেখলাম। ওরা আপনাদের 'যদি', 'কিন্তু', 'হয়তো'র নাগাল পায় নি। নিজেকে তাই এই সব বলে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছি যে, যাকগে, মেয়েমানুষ হলেও তো একটার বেশী জীবন নেই—হঠাৎ শুনি একজন বলছে, ইনি যান তিনি মালুম হয়! আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, হ্যাঁ ভাই আমিই তোমাদের বক্তৃতা শুনিয়েছিলাম। পরক্ষণে দেখি, সবাই অদৃশ্য হয়েছে। একজনের গলা শুনলাম, ডর নাই, ডর নাই, যান। জানেন তারকবাবু, আমাদের সত্যি কোথাও ভয় ডর নেই।'

ঘরে আলো জ্বলছিল। সকলে জেগে উঠে সীতানাথকে ঘিরে বসে আছে। পুষ্প ন্যাকড়া ভিজিয়ে ভিজিয়ে সীতানাথের নাকে জল দিচ্ছে, নিচে মস্ত একটা গামলা ভরা টকটকে লাল জল। খাটের গদিতেও খানিকটা স্থান রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে।

তারক তাকিয়ে দেখল তার ডান হাতেও রক্তের দাগ লেগেছে, কব্জি পর্যন্ত।

পুষ্প বলল, 'মনোদি, দেখেছ কাণ্ড?'

মনোজিনী বলল, 'কি হয়েছে?'

'সীতুদার ডাক শুনে উঠে দেখি নাক দিয়ে গলগল করে রক্ত পড়ছে। কোথা গিয়েছিলে তোমরা?'

মনোজিনী বলল, 'মাঝে মাঝে ওর নাক দিয়ে রক্ত পড়ে। কিন্তু এত বেশী তো কোনদিন পড়ে নি। বন্ধ হয় নি এখন?'

'প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে।'

সীতানাথের ঠোঁটও কেটে ফুলে উঠেছে। তারক ভাবে, আপনা থেকে নাক দিয়ে রক্ত মানুষের পড়ে, গলগল করেও পড়ে। কিন্তু ঠোঁট কেটে ফুলে ওঠা চাপা পড়বে কিসে? সীতানাথ কি এতই হাবা যে এখনো সে টের পাচ্ছে না সকলে তার অপরাধ না-জানার অভিনয় করে চলেছে? তাই যদি হয় অমন হাবা ছেলেকে শুধরে বদলে নিয়ে লাভ কি হবে মনোজিনীই জানে।'

'আর জল দিতে হবে না।' মনোজিনী এগিয়ে গিয়ে সীতুকে ধরে আস্তে আস্তে শুইয়ে দিল।—'এবার জলপটি দিলেই হবে। পাখাটা আন্ তো পুষ্প।'

'পাখা? উনুন ধরাবার ভাঙ্গা পাখাটা ছাড়া—'

'একটা পাখাও নেই তোদের?'

গায়ের আঁচল খুলে নিয়ে ভাঁজ করে মনোজিনী সীতানাথকে বাতাস করতে লাগল, গায়ে তার রইল শুধু ব্লাউজ। সীতানাথ এতক্ষণ মনোজিনীর দিকেই তাকিয়ে ছিল, এবার সে চোখ বুজল।

তারক নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। নিচে চৌবাচ্চার জলে তার রক্তমাখা হাত ভাল করে ধুয়ে ফেলতে হবে।

হাবা? না, সীতানাথ রোমান্টিক। মধ্যরাত্রির এই নাটকটি তার ভাল লাগছে। অন্ধকারে মনোজিনীর কাছে উঠে যাবার সময় তার শুধু বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করছিল, হয়তো মুখ শুকিয়ে কানটাও ঝাঁ ঝাঁ করছিল একটু, তার সেই একাগ্র উত্তেজনা খণ্ড খণ্ড হয়ে লজ্জা ভয় ব্যথা ঔৎসুক্য ও আতঙ্ক, মার খেয়ে আদর পাওয়ার জয়গৌরব, দুর্বোধ্য আবেগ, একসঙ্গে হাসিকান্না পাওয়া, রূপকথার রাজ্যে যাওয়ার স্বপ্ন যেন মিটছে আর মনোজিনীর সঙ্গে একটা গোপন কাব্যিক সন্ধি হয়েছে এই বিশ্বাস তাকে উদভ্রান্ত, অভিভূত করে দিয়েছে। মনোজিনী পাশে বসে হাওয়া করছে, কোথাও দু'চার ইঞ্চি জায়গায় ছুঁয়ে আছে মনোজিনীর দেহ, তাতেই হয়তো রোমাঞ্চ হচ্ছে বার বার।

হাবা? রোমান্টিক হলেই হাবা হয়। জেনেও সকলের না জানার ভানে গা এলিয়ে ভেসে যেতে নইলে ওর মজা লাগে! সে হলে কি করত? কয়েক বছর পিছিয়ে ওই সীতানাথের বয়সের সে হলে? সহ্য করতে করতে মনোজিনীর গায়ের আঁচল খুলে হাওয়া দিতে আরম্ভ করার আগে পর্যন্ত দাঁতে দাঁত কামড়ে কোনরকমে হয়তো ভদ্রতা বজায় রাখত। তারপর চোখ বোজার বদলে ডান পাটি গুটিয়ে নিয়ে মনোজিনীর ব্লাউজ আঁটা স্তন দুটির মাঝখানে একটা—

কাণের ফুটো আঙুল দিয়ে বন্ধ চোখ বুজে তারক মাথাটি ভরা চৌবাচ্চার জলে ডুবিয়ে দিল। মাথা গরম হয়ে উঠেছে।

বেলা বারোটায় তারকের ইন্টারভিউ।

সকালে ঘুম ভেঙেই তার মনে হল, সুনিশ্চিত চাকরীর খবর শোনার পর থেকে তার মনে যে ভার চেপে ছিল, আজ তা বড় বেশী ভারি হয়ে উঠেছে। এত যে অফুরন্ত কাজ মানুষের জন্য পড়ে রয়েছে, হৃদয় মন শরীর দিয়ে স্বেচ্ছাধীন সুপ্রিয় কাজ, বিচিত্র ও অভিনব—চাকরী ছাড়া তার কি কিছুই করা ভাগ্যে নেই!

চায়ের কাপ নামিয়ে নিশীথ বলে, 'চোখে মুখে স্বপ্ন নেমেছে দেখছি মশাই।'

'স্বপ্ন? কাজের কথা ভাবছি।'

'কাজের কথা ভাবলে আপনার মুখ এমন স্বপ্ন-বিভোর দেখায়!'

'আমি তো জানতাম কোন কাজে একবিন্দু স্বপ্ন নেই।'

'আপনি তো সবজান্তা!'

নিশীথ বিস্মিত হয়ে তাকাল। আর কথা বলল না।

'কিছু মনে করবেন না, কমরেড।' তারক হঠাৎ বলল।

নিশীথ আবার বিস্মিত হয়ে তাকাল।

তারক ভাবল, বেশ। বেশ এরা চুপ করে থাকতে জানে!

বলল, 'স্বপ্ন বুঝি আপনার পছন্দ হয় না?'

'নাঃ। স্বপ্ন বড় কাজ নষ্ট করে। স্বপ্নের চেয়ে কাজ ঢের দামী।'

'মনের মত কাজ যদি হয়? সে কাজের স্বপ্ন নিয়ে দিনরাত মানুষ বিভোর হয়ে থাকতে পারে না? তারপর দেখুন, মনটা, কাজের মত তৈরী করে নিলেও কাজ মনের মত হতে পারে। কাজ হল জীবন, জীবনে স্বপ্ন থাকবে না, কি যে বলেন মশায় আপনারা! কেমন যেন বাড়াবাড়ির রকমের সিরিয়াস আপনারা।

খেয়ে আনন্দ হয় ডিসপেপসিয়ার রোগীর মত আপনারা তা ভাবতেই পারেন না।'

নিশীথ একটু বাঁকা হেসে বলল, 'ভাবতে পারে বৈকি। ফুটপাতে লোক না খেয়ে মরছে দেখতে দেখতে যখন সন্দেশ রসগোল্লা চপ কাটলেট খাই, আনন্দে রীতিমত রোমাঞ্চ হয়।'

তারক আহত হল, চটেও গেল।

'আমি তা বলি নি।'

নিশীথ উদাসভাবে বলল, 'বলেন নি ?'

'না, বলি নি। একশোবার বলি নি। এটাও আপনাদের একটা মস্ত দোষ, সব কথা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে নিজের সুবিধামত মানে করে নেবেন। গোড়া থেকে আপনি তাই করছেন। কাজ করার কথায় স্বপ্নের কথা বললাম, আপনি ধরে নিলেন আমি বিলাসের স্বপ্ন, আকাশ-কুসুমের স্বপ্নের কথা বলছি। আমি বললাম খাওয়ার আনন্দের কথা, আপনি মানে করলেন সন্দেশ রসগোল্লা চপ কাটলেট খাওয়ার আনন্দ।'

'ওঃ!' এবার নিশীথ অন্য এক ধরণে বিস্মিত হয়ে তাকাল।—'আমার ভুল হয়েছে তারকবাবু। আপনি যে স্বপ্নের ওই মানের কথা বলেছিলেন বুঝতে পারি নি। আমার কিন্তু দোষ নেই—স্বপ্ন মানে আমি স্বপ্নই বুঝি। আপনি যদি স্বপ্নের বদলে কল্পনা, উদ্দীপনা, ফুর্তি বা এরকম কোন শব্দ ব্যবহার করতেন—'

'ভুল হত।' তারক উঠে দাঁড়িয়ে ঘর ছেড়ে চলে যাবার আগে বলে গেল, 'স্বপ্নটা বঞ্চিতের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়।' চৌকাঠ পেরোবার সময় যোগ দিল, 'আপিমখোরেরও নয়।'

আজ সকালে আবার সকলে তাকে অবহেলা করেছে। নিশীথের কূট মন্তব্যে গোড়াতেই তার সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল, নইলে হয়তো খানিক গল্পগুজব করা যেত। অন্য একজনও যেচে তার সঙ্গে কথা কয় নি। দু'টি ছেলে এসে খবর দিয়ে গিয়েছিল, কনফারেন্সে 'ওরা' না কি গোলমাল করবে। 'ওরা' মানে যে পুলিশ নয় অন্য একটি দল, সেটা তারক নিজেই অনুমান করেছিল। দু'তিনজনকে জিজ্ঞেস করেও বিশদ বিবরণ জানতে পারে নি। প্রত্যেকে জবাব দিয়েছে, ও কিছু নয়। মনোজিনী পর্যন্ত জবাব দিয়েছে, পরে শুনবেন। মাঝখানে সেক্রেটারী কয়েক মিনিটের জন্য এসেছিলেন। তিনি বলে গেলেন যে, অন্ততঃ ত্রিশজনকে রেডি

থাকতে হবে, 'ওরা' গোলমাল সুরু করলেই ধরে ধরে বার করে দেওয়া হবে হল থেকে এবং কিছু মার দিতে হবে।

তারক যে মার দিতে পারে রাত্রেই সে তার যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছিল। অথচ মনোজিনীও তাকে একটা অনুরোধ জানাল না, সে যেন কনফারেন্সে উপস্থিত থাকে!

তাকে বাদ দিয়ে ওরা কনফারেন্স করবে না কি?

ন'টা বাজে। খানিকটা ডাঙ্গায় তোলা মাছের মতই যখন লাগছে এখানে, ফর্সা জামা-কাপড় পরে তারক বেরিয়ে পড়াই ভাল মনে করল। এবেলা আর এখানে ফিরবে না। কোন হোটেলে খেয়ে নিয়ে ইণ্টারভিউ দিতে যাবে। কিন্তু এখন, সকাল এই ন'টার সময়, কোথায় যাবে ভাবতে গিয়ে একটি অবশ্য-কর্তব্য কাজের কথা তারকের স্মরণে এল।

তারকের এক খুড়শ্বশুর থাকেন কলকাতায়, কালীঘাট অঞ্চলে। শ্বশুরমশায় তার এই ভায়ের বাড়িতেই তাকে উঠবার হুকুম দিয়েছিলেন। হুকুম না মানায় বিশেষ কিছু এসে যায় নি। এসে গেলেও তারক কেয়ার করে না, তবে বাড়ি গিয়ে একবার দেখা না করলে অন্যায় হবে। এখন গিয়ে চা জলখাবার খেয়ে ঘণ্টাখানেক থেকে এ হাঙ্গামাটা চুকিয়ে দেওয়া যায়। তারপর যা থাকে কপালে।

সীতানাথের সঙ্গে তারকের দেখা হয় নি। সে না কি এখনো ঘুমোচ্ছে। দিনের আলোয় ছেলেটাকে একবার দেখবার জন্য তারক একটু উৎসুক হয়েছিল। ঠিক ক্ষমা চাওয়া নয়, অন্যায় করলেও ক্ষমা চাওয়ার বালাই তারকের ধাতে সয় না, একান্তে ছেলেটার কাছে একটু দুঃখ প্রকাশ করবে। তাতে মুখে কিছু না বলে জানিয়েও দেওয়া হবে যে সে তার অপকর্মের বিচারক হতে চায় না, সমালোচক নয়।

ঘরে গিয়ে তারক দেখল, সীতানাথের ঘুম ভেঙ্গেছে, জামা পরছে। মনোজিনী ছাড়া ঘরে আর কেউ নেই। তারকের মনে হল, মনোজিনীই বোধ হয় তাকে ডেকে তুলে দিয়েছে, নইলে সে আরও কিছুক্ষণ ঘুমোত। সীতানাথের মুখ দেখে তারকের মায়া হল।

মনোজিনী বলছিল, 'মুখ-হাত ধুয়ে চা-খেয়ে বাড়ি চলে যাও। ওবেলা কনফারেন্সের হাঙ্গামা, মনে আছে তো?'

'বাড়ি নাই গেলাম?'

'না, বাড়ি যাও।'

তারক বলল, 'চলুন, একসঙ্গে বেরোই।'

'আপনি বেরোচ্ছেন ?' মনোজিনী শুধোল।

'আত্মীয়ের বাড়ি দেখা করতে যাব।'

'আপনার ইন্টারভিউ কখন ?'

'বারোটায় টাইম দিয়েছে।'

'তবে এখন নাইবা গেলেন ঘোরাঘুরি করতে ? ইন্টারভিউর জন্য তৈরী হয়ে নিন, সাড়ে দশটায় খেয়ে এগারটায় বেরিয়ে পড়বেন। একটু আগে খাওয়াই ভাল। কোথায় যাবেন, দেরী টেরী হয়ে যাবে—' তারকের মুখে প্রশ্রয়ী হাসির ব্যঞ্জনা দেখে মনোজিনী থেমে গিয়ে বিনা দ্বিধায় সোজাসুজি হেসে ফেলল, 'খুব উপদেশ দিচ্ছি।'

তারক লজ্জিত হয়ে বলল, 'ঠিক কথাই বলেছেন। তবে নামমাত্র ইন্টারভিউ, কম্পিটিশন নেই, আমিই একা। ফস্কাবার ভয় নেই।'

তারককে দেওয়া উপদেশ ফিরিয়ে নিয়ে মনোজিনী সীতানাথকে উপদেশ দিল, 'এঁর ওপর রাগ রেখো না সীতু। ইনি না জেনে না বুঝে ভুল করে ফেলেছিলেন।'

একবার জোরে নিশ্বাস টেনে একটুক্ষণ নিশ্বাসটা আটকে রেখে তারক হাত জোড় করল।—'আমি ক্ষমা চাইছি। গেঁয়ো মানুষের দোষ ক্ষমা করতেই হবে।'

সীতানাথ বিগলিত ও বিব্রত হয়ে কোনমতে বলল, 'না না না, ওতে কি হয়েছে, ও কথা বলবেন না, প্লিজ।'

তারক একাই বেরিয়ে পড়ল।

ট্রামে বাসে অসম্ভব ভিড়, মানুষ ঝুলতে ঝুলতে আপিস চলেছে। প্রথম শ্রেণীতে ভিড় বেশী। সেকেণ্ড ক্লাশের নোংরা মানুষের সান্নিধ্যে যারা একটু অস্বস্তি বোধ করে, তারাও অনেকে অগত্যা সেকেণ্ড ক্লাশে ভিড় জমিয়েছে। তারক পিছনের গাড়িতে উঠল এবং উঠেই টের পেল একটা গোল বেধেছে।

ছেঁড়া ময়লা খাকি সার্ট গায়ে পশ্চিমা এক মিস্ত্রী-শ্রেণীর লোকের গুঁতো খেয়ে

ধোপদুরস্ত সাহেবী বেশধারী এক আপিসগামী ভদ্রলোক রেগে টং হয়ে ধমক দিচ্ছেন। পশ্চিমা লোকটি একটু বিনয়ের সঙ্গেই তাকে বুঝাবার চেষ্টা করছে যে সে যখন ইচ্ছে করে গুঁতো দেয় নি, এরকম ভিড়ে যখন এ ধরণের অঘটন হরদম ঘটছে, তার কসুর কি। ভদ্রলোক সে কথা কানেও তুলছেন না, শুধু বলছেন, 'চোপ রও, পাজী উল্লুক, হঠ যাও।'

ভুল করে মারার জন্য একটি ছেলের কাছে সত্ত-সত্ত জোড় হাতে ক্ষমা চেয়ে আসায় ব্যাপারটা তারকের কাছে বড় হাস্যকর ঠেকল। উপস্থিত আট দশটি ভদ্রলোক কেউ মুখ ফুটে কেউবা শুধু মাথা হেলিয়ে হেলিয়ে আহত ভদ্রলোকটির পক্ষে সায় দিচ্ছে।

একজন অত্যন্ত দামি একটা মন্তব্য করলেন: 'গাড়িতে সবাই যাবে, একি গুণ্ডামির যায়গা।'

এদের সকলের ভাব দেখেই বোধ হয় পশ্চিমা লোকটির নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করবার রোখ বেড়ে যাচ্ছে।—'বাবুজি শুনিয়ে, বাত্‌তো শুনিয়ে—'

তারক ভাবে, ওর পক্ষ কেউ সমর্থন করে না কেন? ওর দলের লোকই তো বেশী গাড়িতে।

ভাবতে ভাবতে তারক দেখতে পায়, লোকটি হঠাৎ গুম খেয়ে পরক্ষণে আচমকা গাড়ি ছাড়ার ধাক্কায় ভদ্রলোকের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে কোনরকমে সামলে নিল। কিন্তু তার আগেই তার বগলের চটে জড়ানো লোহার যন্ত্রগুলিতে ভদ্রলোক ফের গুঁতো খেয়েছেন। ইংরাজী বাংলা মিশিয়ে কয়েকটা বদখৎ গাল দিয়ে ভদ্রলোক তার গালে একটা চড় বসিয়ে দিলেন। অন্য ভদ্রলোকেরা সমর্থনের কলরব করে উঠলেন। একজন বললেন, 'বেশ করেছেন।' আরেকজন বললেন, 'বেটা নেশা করেছে না কি?'

পশ্চিমা লোকটি রোগা, হয়তো বা রুগ্নও। বাঁ হাতে তারকের বাহুমূল আঁকড়ে ধরে সে নিজেকে হুমড়ি খাওয়া থেকে সামলে ছিল। এবার সেই হাতে ভদ্র-লোকের টাই আর সার্ট মুঠ করে ধরে বলল, 'কাহে মারা বাবুজী?'

ওপাশে একজন লুঙ্গিপরা লোক উঠে দাঁড়িয়ে গর্জে উঠল, 'কাহে মারা হায় উস্কো?'

অনেকগুলি অভদ্রলোকের কণ্ঠে কলরব উঠল প্রতিবাদের। দু'তিনজন ভিড়

ঠেলে এগিয়ে আসবার চেষ্টা করতে লাগল এদের কাছে। ভদ্রলোকেরা চুপ,—সবাই, একসঙ্গে! তাদের সেই আকস্মিক স্তব্ধতা ও নির্বিকার অন্যমনস্কতার গভীরতায় কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন দম আটকে এল তারকের। কেউ তারা কিছু জানে না, জানতে চায় না। ভদ্রলোককে ছোট লোকেরা গাল দিক, মারুক, গাড়ি থেকে টেনে ফেলে দিক, বড় জোর আড় চোখে তাকিয়ে দেখবার বেশী কেউ কিছু করবে না।—যতক্ষণ না গাড়ি থামে এবং পুলিশ আসে।

পশ্চিমা লোকটি গোড়ায় একা ছিল, কেউ তার পক্ষ নেয় নি। কিন্তু তাকে ত্যাগ করে নি কেউ, অসময়ে বর্জন করে নি। সবাই এখন একসঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ভদ্রলোককে একা করে দিয়েছে। এত যে সমর্থক ছিল তার খানিক আগে, হাঙ্গামার সম্ভাবনায় এক মুহূর্তে সকলে তাকে ত্যাগ করেছে, তাকে অস্বীকার করেছে। এ যে কি ভীষণ একাকীত্ব কল্পনা করতে গিয়ে তারকের বুক কেঁপে গেল!

খুড়শ্বশুরের বাড়ির সদর দরজাটা খোলাই ছিল। খুড়শ্বশুর চাকুরে ভদ্রলোক, বৈঠকখানা রাত্রে শোয়ার কাজে লাগে, সতরঞ্চি বিছানো তক্তপোষ আছে। ভদ্রলোক বলে তখনো নিজেকে তারকের কেমন পরিত্যক্ত একা আর অসহায় মনে হচ্ছিল, যার অনুভূতি বড়ই বিস্বাদ। ভিতরের দরজার কড়া নাড়তে গিয়ে সে থেমে গেল। অন্দরে, দরজার ওপাশের ঘরেই, স্ত্রীপুরুষের কলহ চলছে।

'জামাই! জামাই এসে আমায় উদ্ধার করবে। তবু যদি নিজের জামাই হত! নিজের জামাইকে একখানা কাপড় দিতে পারিনে—'

'নতুন জামাই যে গো! প্রথম আসবে।'

'তাই কি? কে ডেকেছে নতুন জামাইকে? মেয়ের বিয়েতে একশোটা টাকা দিয়ে সাহায্য করে না যে দাদা, তার জামাইকে জুতিয়ে তাড়াতে হয়।—কে?'

আপিসের বেশধারী প্রৌঢ় খুড়শ্বশুর বাইরে এলেন। তারক ভক্তিভরে তাকে প্রণাম করল।

শ্বশুর গদগদ হয়ে বললেন, 'তারক না কি? এসো বাবা, এসো। দু'দিন ধরে পথ চেয়ে আছি। তা, এত যে দেরী হল?'

'আজ্ঞে, চাকরীর চেষ্টায় ঘুরছি,—সময় পাই নি।'

'অন্য কোথাও উঠেছ না কি? এ তোমার ভারি অন্যায় বাবা, আমরা এখানে থাকতে—'

শাশুড়ী ঘরে আসায় তাকেও তারক ঢিপ করে একটা প্রণাম করল।

চাকরীর ইন্টারভিউর অজুহাতে এক ঘন্টা পরেই তারক ছুটি পেল। কিন্তু এই এক ঘন্টার জামাই-আদর ভোগ করেই তার মনে হল জগতে আর সব মিথ্যা। এ আদর ছাড়া আর কিছু সত্য নেই জগতে। এ বাড়ির বৈঠকখানায় দাঁড়িয়ে নিজের খুড়শ্বশুরের মুখে সে এইমাত্র নিশ্চয় শোনে নি যে দাদার জামাই বাড়িতে এলে তাকে জুতিয়ে তাড়াতে হয়, গোপালভাঁড় কিম্বা বটতলার কোন হাসিতামাসার বইয়ে এরকম একটা অভদ্র গল্প বোধ হয় সে কোনদিন পড়েছিল। জুতো মেরে যাকে তাড়িয়ে দিতে ইচ্ছা হয় তাকে কোন মানুষ এত সম্মান, এত প্রশ্রয়, এত আদর কখনো দিয়ে যেতে পারে এতক্ষণ ধরে? এক মুহূর্তের জন্যও তো তার মনে হল না কারো ব্যবহারে এতটুকু ছলনা আছে, অভিনয় আছে।

ট্রামের রাস্তায় পৌঁছে ফুটপাতে ছোট একটি ভিড় দেখে তারক উঁকি মারল। উঁচু রোয়াকে ঠেসান দিয়ে ফুটপাতে পা ছড়িয়ে বসে আছে একটি স্ত্রীলোক, মাথাটা বুকে নামিয়ে যেন ঘুমোচ্ছে। তার দুই উরুতে উপুড় হয়ে হাত পা মাথা সবগুলি প্রত্যঙ্গ এলিয়ে দিয়ে যেন ঘুমিয়ে আছে তিন চার বছরের একটা ছেলে। ছেলেটা একেবারে উলঙ্গ, বাঁকা মেরুদণ্ড আর পাঁজরের হাড়গুলির চেয়ে তার মাংসহীন পাছার শতকুঞ্চনে কুঞ্চিত চামড়াই যেন বরফ-শৈত্যের শিরশির শিরশির শিরশির শিরশির শিহরণ। স্ত্রীলোকটির সায়া সেমিজ নেই অথচ শাড়িখানা তার এক অত্যাশ্চর্য বিস্ময়। আগেকার দশ বারো টাকা দামের শাড়ি। এ সব শাড়ি তোরঙ্গে তোলা থাকে। তোরঙ্গ থাকে ঘরে। ঘর আর তোরঙ্গ যে আছে, শপথ করে বলা যায়। যেমন বলা যায় স্ত্রীলোকটির যৌবন আছে। আরও যৌবন ছিল, এখন খানিকটা আছে। তারকের মহকুমা-সহরঘেঁষা গাঁয়ে বিশ বছরের বকুল মরেছিল চার পাঁচ মাস ধরে, আজ একটু ভাত পরশু একটু ফ্যান আর গাছের পাতা জংলী লতা খেয়ে ধীরে ধীরে তিলে তিলে সে হয়ে গিয়েছিল চামড়াঢাকা কঙ্কাল, এ স্ত্রীলোকটি ক'দিন আগেও খেয়েছে, মোটামুটি খেয়েছে, তারপর হঠাৎ একদিন একেবারে পুরোপুরি না খাওয়া সুরু হওয়ায় যৌবন ফুরিয়ে

যাবার আগেই একটানা উপোসের ফলে এখানে মরে গেছে। ভাবেনি যে মরবে—রোয়াকে ঠেস দিয়ে ফুটপাতে পা ছড়িয়ে একটু বসে জিরিয়ে নিতে গিয়ে একেবারে মরে বসে থাকবে!

উপবাসী ঠিক এমনিভাবে মরে। ঝিম্ ধরা ভাব গাঢ় নিঝুম হয়ে আসে, হৃদস্পন্দন মৃদু থেকে মৃদুতর হয়ে থেমে যায়, পা ছড়ানো ঠেসান দেওয়া শরীরটা একটু নড়ে চড়ে পাশে ঢলে পর্যন্ত পড়ে যায় না।

খানিক তাকিয়ে থেকে তারক ভিড়ের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যায়, পাশে দাঁড়িয়ে যে লম্বা লোকটি মৃত্যু দেখছিল সেও খসে আসে তার সঙ্গে।

'দেখলেন মশায়? দেখলেন?'

তারক পাক দিয়ে তার সামনে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে কামড়ে দেবার ভঙ্গিতে গাল দেবার সুরে বলল, 'আমি অন্ধ না কি?'

ভদ্রলোক ভড়কে গেলেন। সবিনয়ে বললেন, 'আজ্ঞে না, তা বলি নি। বলছিলাম কি—'

'বলছিলেন যে আপনার সঙ্গে দুদণ্ড হাহুতাশ করি। আমার এতটুকু আপশোষ হয় নি।'

'তা হবে।'

তিনি সরে পড়লেন ও ফুটপাতে। তারকের চেয়ে রোদের ঝাঁঝ তার পছন্দ হল বেশী।

পাঁচতলা মস্ত বাড়ির একটা অংশে তারকের ভবিষ্যৎ আপিস। তারকের ধারণা ছিল একেবারে বাইরের ফুটপাত থেকেই চারিদিকে খাকির ছড়াছড়ি দেখতে পাবে। কিন্তু রাস্তায় একটা চলতি লরী বোঝাই বিদেশী খাকি দেখে আপিস-বাড়িটার গেট পার হয়ে ভেতর ঢুকবার পর শুধু দু'টি লোকের গায়ে সে খাকি দেখতে পেল, ধুতি-পরা একটি পিয়নের গায়ে খাকি কোট এবং আর একজনের গায়ে—সে পিয়ন কি আপিসের কেরানী বোঝা যায় না—একটি খাকিরঙা কাপড়ের সার্ট।

একটি ঘরে ছোট বড় টেবিলে জন পনের কাজ করছিল, কোণের দিকে একজনের দু'হাতের আঙুল টকাটক টিপে যাচ্ছিল টাইপরাইটারের চাবী। এদের মধ্যে একজনও বুড়ো নেই, মাঝ বয়সী পর্যন্ত নেই—সকলেই যুবক। এদিকে একুশ

বাইশ বছরের ছেলে আছে, ওদিকে ত্রিশ পেরিয়ে কেউ গেছে কি না সন্দেহ। ঘরে একপাশের দেয়াল ঘেঁষে, বাইরের প্যাসেজ এবং পাশের ঘরে রাশিকৃত চৌকো, চ্যাপ্টা লম্বা প্রভৃতি নানা আকারের নানা কাঠের প্যাকিং কেশ জমা করা—সেগুলি ভিজে থাকায় পচাইখানা শুঁড়িখানার মত একটা অঢেল গন্ধ ফুর ফুর করছে চারিদিকে। মহুয়া গাছের তলে ঝরা ফুলের কার্পেটে বসলেও এমনি গন্ধ পাওয়া যায়।

যুদ্ধের আপিস—আপিসী গন্ধ এখনো হয়তো সৃষ্টিই হয় নি। অপ্রত্যাশিত মিঠে কেঠো গন্ধে মনটা কেমন করতে লাগল তারকের।

এতক্ষণ পরে এই আপিসে বৌ তার কাছে এসেছে নিবিড়ভাবে! ছোট বড় সমবয়সী এতগুলি মানুষের আপিস করার আড়ালে যে বৌরা আছে, তাদের সঙ্গে তার বৌও তার নাগাল ধরেছে এইখানে। চেয়ারে চেয়ারে বসানো এতগুলি উদাহরণ তার সামনে, মনের কানে কানে বৌ যেন তার অবিরাম ফিস্ ফিস্ করে চলেছে, অনুসরণ করো! অনুসরণ করো! নইলে আমাকে নিয়ে দিনের খেলা রাতের খেলা খেলবে কি করে?

তাই মনে হয় তারকের। বাকী জীবন, আরও যতকাল সে বাঁচবে! কি অসীম সে সময়! একটা জীবনে এতকাল ধরে বৌকে পাওয়ার চেয়ে আর কি পাওয়া তার বড় হতে পারে। তার মনে সারি সারি আগামী রাত্রিগুলি কল্পনার সীমা পার হয়ে চলে যায়, প্রতিটি রাতের কক্ষে সে দেখতে পায় তার বৌকে, অভিন্না, অপরিবর্তনীয়া!—কেশ যার গন্ধ-মুখর, চোখের গভীরতা হৃদয়তক্, নিটোল সর্বাঙ্গে টনটনে টানধরা চামড়ার চাঁপা রঙা আবরণ।

অনুভূতি বন্যা ধরেছে, কল্পনা বাগ মানে না, কিন্তু সেই সঙ্গে মাথা নাড়ে তারক। কি সব যা-তা ভাবছে ভেবে ঠোঁটের কোণে কৌতুকের হাসিও ফোটে।

একটা পার্টিসনের ওপার থেকে নেয়াপাতি ভুঁড়ি-হবো-হবো বিনয় ও ভালমানুষীর জীবন্ত প্রতীকের মত এক ভদ্রলোকের আবির্ভাব ঘটল। হাতের ফাইলপত্র বুকের কাছে ধরে মেঝেতে আলগাভাবে চটি পিটিয়ে চলার ভঙ্গিটাই তার অসীম দরদের চলচ্ছবি।

এতক্ষণ অনেকে তারকের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়েছে, কিন্তু মুখ ফুটে কেউ কিছু শুধোয় নি। ইনি কোনমতেই আগন্তুকের জন্য কিছু করা সম্ভব কি না না জেনে

এগিয়ে যেতে পারলেন না।

'আপনি—?'

প্রশ্নটা তারক অবশ্য বুঝতে পারল। সহজেই বুঝা গেল ভদ্রলোক আপনি কে, কি চান, কাকে চান এসব স্পষ্ট প্রশ্নের অভদ্রতা সর্বদাই এড়িয়ে চলেন।

এই ভদ্রলোক তারককে আপিসের বড় সাহেবের কাছে নিয়ে গেলেন। ঘরখানা শ্রুতিবন্ধ্যা। মেঝেতে কার্পেট, দেয়ালে দেয়ালে রঙ। একপাশে কোণঘেঁষে মোটা কাঁচ বসানো টিপায়ের তিন দিকে নিচু বেতের সোফা—ভাল দামী জিনিস। এই আসবাবের সঙ্গে অনির্দিষ্ট দ্বন্দ্বে নিযুক্ত একটি বড় টেবিল চারকোণা ঘরের দেয়ালের সঙ্গে খানিক কোণাচে করে পাতা। শুধু এ ভাবে টেবিল পাতার কৌশলেই যেন ঘরে যায়গা বেড়ে গেছে অনেক। অঙ্ক জানা হিসেবী মানুষ ছাড়া সাধারণ বুদ্ধিতে এই সহজ ম্যাজিক কারো জানার কথা নয়। অঙ্ক জানা কোন একজন যে কি কাজ এখানে করেন তার অঙ্ক দিয়ে, কে জানে। বড় সরকারী অফিসারের টেবিলে যা কিছু থাকে সবই আছে, শাখা টেলিফোন থেকে মখমলের পিন কুশান, বাদ শুধু পড়েছে আপিসী রূঢ়তা। কারণ, কয়েকটি ফাইলের বুকে চেপে বসে আছে বার্ণার্ড শ'র পুরোনো ম্লান লাল কাপড়ে বাঁধাই মস্ত ভল্যুম, আর সাজানো গুছানোর সবগুলি আইন ভঙ্গ করে ফ্যানের বাতাস পাতা নাড়ছে দুটি বাংলা মাসিক। টেবিলের ওপাশে বসে আছেন বুশ সার্ট পরা অমুগ্র-স্মার্ট প্রিয়দর্শন যুবক, চেহারায় ঠিক বয়সের আন্দাজ মেলে না। দু'প্রান্তে ছোট দুটি খাদ চওড়া কপালকে একটু তুলে সামনে ধরেছে, মুখের দর্শনীয় অংশের চেয়ে কপালটি বেশী ফর্সা। কপাল মুখের ছাঁদকে নিয়ন্ত্রণ করছে এমন মুখ নজরে পড়ে খুব কম এবং প্রতিদিন দেখেও আত্মীয়বন্ধু ধরতে পারে না এ মুখের বৈশিষ্ট্য কি। এ পাশে একজন আগাগোড়া কোঁচকানো তসরের পাঞ্জাবী গায়ে লম্বা কালো শ্রীহীন ভদ্রলোক হাই পাওয়ার চশমার আড়ালে চোখ দুটি স্তিমিত—মুখভরা ছেলেমানুষী খুসী চাপার স্পষ্ট প্রচেষ্টা, এইমাত্র কে যেন প্রশংসা করেছে। তার পাশে বেমানান কলেজী স্যুট পরা বেঁটে কালো ভদ্রলোক, সোনার চশমা পরা মুখের গাম্ভীর্য, যা অগভীর কিন্তু অন্তহীন মনে হয়, হঠাৎ একটু লাগসই হাসিতে ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার সৃষ্টি হয়ে গেল।

এসব তারকের চোখে পড়েছিল পরে। ঘরে ঢুকে প্রথমেই তার দৃষ্টি আকর্ষণ

করেছিল সামনের দেয়ালে টাঙানো স্ট্যালিনের বড়ো বাঁধানো ফটো। যুদ্ধের বাজারে একক স্ট্যালিনের ফটো বড় অসম্পূর্ণ মনে হল তারকের। ধীরে ধীরে পাক দিয়ে সে চারিদিকের দেয়ালে চার্চিল-রুজভেল্ট চিয়াং-কাইশেকের ফটো তিনটিতে চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর চোখ পড়ল বড় সাহেবের দিকে।

নিখুঁত ভঙ্গিতে মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে একটু হেসে বড় সাহেব বললেন, 'দেখলেন? কেউ বাদ যান নি। বসুন।' কি যে ভড়কে গেল তারক সেই হাসি দেখে আর গল্পে' মানুষের সহজ ভঙ্গির কথা শুনে! চাকরী আর না হবার উপায় নেই। চাকরীটা ইনি তাকে দেবেন। দেড় হাজার না দু'হাজার টাকা মাইনে পেয়ে অমন করে যিনি একশো টাকার চাকরীর উমেদারের দিকে চাইতে, হাসতে ও কথা কইতে পারেন, তার কাছে তারকের নিস্তার নেই।

দু'মিনিট কথা কয়ে দুটো সহজ প্রশ্ন করে আজকেই হয়তো এই শক্তিমান পুরুষ তাকে লটকে দেবেন চাকরীতে!

তারকের মাথাটা বোঁ করে ঘুরে যায়। স্ট্যালিনের ফটো আর তার দৃষ্টির তেরচা সমান্তরালকে ছুঁই ছুঁই করে পাক খাচ্ছে ফ্যানের হাতলগুলি। চাকরী করবে, পার্টিতে থাকবে, বৌকে আনবে, আত্মীয়কে খুসী করবে, এ যে চারতলা জীবন হবে তার!—রাজা, গোলাম, বিবি এবং টেক্কার তাস দিয়ে গড়া জীবন!

বেমানান টাই ও স্যুট পরা সেই ভদ্রলোক স্পষ্টভাবে প্রত্যেক কথা উচ্চারণ করে করে বললেন, 'বসতে বলছেন আপনাকে। বসুন।' টেবিলের কোণের কাছে চেয়ার ছিল, তারক তা'তে কাত হয়ে হেলান দিয়ে বসল, ডান হাতটা তুলে দিল চেয়ারের পিছনে। চাকরীর জন্য ইন্টারভিউ দিতে এসে এমনভাবে কেউ যে বসতে পারে, আবার সেই সঙ্গে মুখ নিচু করে রেখে হাসতে পারে মৃদু মৃদু, এ অভিজ্ঞতা যুদ্ধের চারজন অনুধ্যায়কের ছিল না। সাহেবের মুখে মৃদু বিস্ময় ও আমোদের ভাব দেখা গেল। তার বেপরোয়া ভাব স্মার্টনেশের সামিল হয়ে তারই বিরুদ্ধে যাচ্ছে টের পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে হাত নামিয়ে তারক একটু জড়সড় হয়ে বসল। মুখের হাসিটা সে কিছুতেই বশ করতে পারছিল না। চাকরী করা না করার যুদ্ধে হার মেনে মেনে এতদূর এগিয়ে জবাই হবার ঠিক আগে কি সহজ উপায় সে খুঁজে পেয়েছে জয়ী হয়ে পিছিয়ে যাবার! ভাবতেও তার হাসি উপচে উঠছে। এরা সিরিয়াস, খুসী। একটি ছেলের বেকারত্ব ঘোচানো গেল ভেবে এদের

আনন্দ হয়েছে। হয়তো মৃদু সমবেদনার সঙ্গে একথাও কেউ ভাবছেন যে, হায়, যুদ্ধ ফুরিয়ে গেলেই বেচারার চাকরী শেষ হয়ে যাবে!

বেমানান-টাই কি একটা সন্দেহ করে এতক্ষণ পরে চিনিয়ে দিয়ে বললেন, 'ইনিই মিস্টার গাঙ্গুলী। এর কাছেই আপনার চাকরীর ইণ্টারভিউ।'

বক্তার সোনার চশমার দিকে চেয়ে বারকয়েক চোখ মিট মিট করে তারক বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ। মানে—নিশ্চয়ই।'

মিঃ গাঙ্গুলী বললেন, 'আপনার কোয়ালিফিকেশন সব লেখাই আছে—এ চাকরীর পক্ষে তাই যথেষ্ট। তবু একটা যখন আছে, দু'একটা প্রশ্ন করি। যুদ্ধের খবর পড়েন কাগজে?'

তারক কথা কইল না। মুখে একটা অদ্ভুত হাসি ফুটিয়ে টেবিলের কোণে দৃষ্টি বিঁধিয়ে রাখল।

বেমানান টাই সস্নেহে বললেন, 'বলুন—জবাব দিন।'

ভালমানুষীর প্রতীক ভদ্রলোকটির সিক্ত স্নায়ু আর সইতে পারছিল না, তিনি বলে উঠলেন, 'খবরের কাগজ পড়েন তো আপনি, সে কথাটা বলতে পারছেন না?'

তারকের এই অদ্ভুত বোবাত্বের চাপে ভদ্রলোকের চোখে যেন জল এসে পড়বে মনে হল।

মিঃ গাঙ্গুলী সস্মিত মুখে বললেন, 'আপনি বড় লাজুক। কাগজ পড়েন না?'

খানিক চিন্তা করে তারক বলল, 'মাঝে মাঝে পড়ি।'

ঘরের পরিস্থিতি যেন একটু নরম হল তার জবাব দেওয়ার সঙ্গে। মুখের সেই বোকাটে হাসি তার কখন মুছে গেছে তারক নিজেই টের পায় নি। এতক্ষণে সে উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছে কাজটা সে যত সহজ ভেবেছিল তত সহজ নয়। বোকা সাজবার আগে কি বোকার মতই সে বিশ্বাস করেছে সামান্য চেষ্টায় এ ক'জন সরকারী চাকুরীয়াকে ভুলিয়ে চাকরী সম্পর্কে নিজেকে বাতিল করিয়ে নিয়ে চলে যেতে পারবে! এরা যে মানুষ, এদের যে ব্যক্তিত্ব আছে, এদের সান্নিধ্যও যে কলের পুতুলের নয়, হৃদয় মনের সান্নিধ্য এতো সে খেয়ালও করে নি! মিঃ গাঙ্গুলীর হাসি ও কথা শুনে যখন তার ভয় হয়েছিল ইনি তাকে চাকরী না দিয়ে নিরস্ত হবেন না, তখন তো তার একথা ভাবা উচিত ছিল যে, কাছাকাছি বসে এর মানুষিক উপস্থিতিটা তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া চলবে না, মানুষটা শুধু গভর্ণমেন্ট সার্ভেন্ট

বলে। 'যুদ্ধের খবর কিছু জানেন ?'

মিঃ গাঙ্গুলীর প্রশ্নে সচেতন হয়ে তারক বিনা দ্বিধায় বলে ফেলল, 'জানি।'

'ইউরোপে কোথায় কোথায় যুদ্ধ হচ্ছে বলুন তো !'

তারক মুখ নিচু করে আগের মত অর্থহীন নির্বোধ হাসি ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করতে লাগল।

তখন এক অঘটন ঘটে গেল। লম্বা কালো হাই পাওয়ার চশমা এতক্ষণ টেবিলে কনুই রেখে বসেছিলেন, সিধা হয়ে হঠাৎ তিনি প্রশ্ন করে বসলেন, 'আপনি বিয়ে করেছেন ?'

তারকের মন ছিল মিঃ গাঙ্গুলীর কাছে বোকা বনবার চেষ্টায়, আচমকা খাপছাড়া প্রশ্নে এবারও সামলাতে না পেরে সোজাসুজি জবাব দিয়ে বসল, 'করেছি।'

হাই পাওয়ার চশমা যেন নিশ্চিন্ত হয়ে খাড়া মেরুদণ্ডকে একটু বাঁকতে দিলেন।

মিঃ গাঙ্গুলী হেসে বললেন, 'এটা আপনার কি রকম প্রশ্ন হল ব্যানার্জী ? বিয়ে না করলে কি ভদ্রলোক চাকরী খুঁজতে আসতেন ? কই, আপনি তো বললেন না যে, ইউরোপে কোথায় যুদ্ধ হচ্ছে ?'

জবাবের জন্য মিনিট খানেক সকলকে অপেক্ষা করিয়ে তারক বলল, 'রুশিয়ায়।'

মিঃ গাঙ্গুলী বললেন, 'বেশ বেশ। রুশিয়ার কোথায় যুদ্ধ হচ্ছে জানেন কি ? আচ্ছা যাক, আগে বলে নিন ইউরোপের আর কোথায় যুদ্ধ চলছে। আরেক জায়গায় যুদ্ধ নিয়ে খুব হৈচৈ হচ্ছে।'

তারকের ঘাড় নিচু করা নীরবতায় এতক্ষণে মিঃ গাঙ্গুলীর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, 'সিসিলি জানেন, সিসিলি ? জোর লড়াই হচ্ছে সেখানে।'

চার আর একে পাঁচজনের নীরবতায় কিছুক্ষণ ঘরের স্তব্ধতা থম্‌থম্‌ করতে থাকে। তারক লক্ষ্য করে মিঃ গাঙ্গুলী একটি হাত রেখেছেন বার্নার্ড শ'র পুরানো মলাটে, আরেকটি হাতের আঙ্গুল দিয়ে যেন আদর করছেন বাংলা মাসিকের একটি উল্টানো পাতাকে।

আপশোষের শব্দ করে শেষে তিনি বললেন, 'কি করি বলুন তো আপনারা, একে তো নেওয়া যায় না কোনমতে !' বলে হঠাৎ যেন মরিয়া হয়ে তিনি শেষ একটা প্রশ্ন করলেন তারককে, 'সিসিলি কোথায় জানেন ? দেখাতে পারবেন ওই ম্যাপে ?'

বেমানান নেকটাই বললেন, 'যান, দেখান গিয়ে।'

তারক উঠলো না। দেয়ালে টাঙানো পৃথিবীর মস্ত ম্যাপটার দিকে চেয়ে বসে রইল। মুখ তার প্যাঙাসে হয়ে গেছে। হতভাগ্য বেকুবের মতই দেখাচ্ছে এখন তাকে। বাপকে যে প্রয়োজনে সে প্রায় দু'বছর ঠকিয়েছিল, আজ সেই প্রয়োজনে এদের কাছে শুধু কিছুক্ষণের জন্য পাগলাটে বোকা সেজে থাকতে মনের মধ্যে বিদ্রোহের গর্জন উঠেছে। ভিতরের একটা অদ্ভুত যন্ত্রণা চেপে তারক মরিয়া হয়ে প্রাণপণ চেষ্টায় তার শেষ জবাব দিল, 'সিসিলি বর্মার কাছে।'

বাপ তার স্নেহান্ধ, দুর্বল মানুষ—তার ব্যক্তিত্ব নেই, প্রাণ নেই। তার ছেলে বলেই দরখাস্ত পাঠাবার ব্যাপার ধরা পড়লে কান্নার ছোঁয়াচে কান্না এসেছিল। কিন্তু কষ্ট কিছু হয় নি। এখানে বুদ্ধি ও শক্তির সম্পদ নিয়ে বসে আছে মানুষ, তার চিরকালের অবজ্ঞার বস্তু গভর্নমেন্ট সার্ভেন্ট—এদের কাছে বোকা সাজতে তার কষ্ট হচ্ছে।

জীবনে কত অভিজ্ঞতা তার দরকার!

অপরাহ্নে কনফারেন্স হল, দশ মিনিটের জন্য।

গোলমাল হবে কিন্তু ঠিক কোন্ দিক দিয়ে আক্রমণটা আসবে জানা না থাকায় এ পার্টির লোকেরা একটু নার্ভাস হয়ে ছিল। অপর পার্টি ভারি চালাক, ধূর্ত। শয়তানী বুদ্ধিতে আঁটা বড় কঠিন ওদের সঙ্গে। সেদিন ওপেন-এয়ার মিটিং-এ ওদের শিবরাম কিছু বলবার অনুমতি চাইল। না, এ পার্টির বিরুদ্ধে কিছু বলবে না, নিজেদের পার্টির প্রোপাগাণ্ডাও চালাবে না, শুধু স্টুডেন্টদের দু'চার কথা বলবে। সময়? ঘড়ি ধরে পাঁচ মিনিট। পাঁচ মিনিটের বেশী শিবরাম বলল না, বিশ্বাস-ভঙ্গ করেও কিছু বলল না। বলার শেষে তিনবার দর্শকদের শ্লোগান দিল। দিয়ে নিজে বসে পড়ল। পাঁচ ছ'শো লোক তার সঙ্গে তিনবার চেঁচিয়ে থেমে গেল। কিন্তু জন ত্রিশেক যুবক আর থামে না, তারা চেঁচিয়েই চলেছে! কোথা থেকে চোঙা হাতে একজন উঠে তাদের পরিচালনা করছে দেখা গেল। ক্রমে ক্রমে

উৎসাহ বাড়ল, ধেই ধেই নাচতে সুরু করে তারা তালে তালে বলতে লাগল, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ।

এবার ভাড়া করা হলে মিটিং, ঘরে বাইরে সতর্ক পাহারার ব্যবস্থা হয়েছে। যা দেখে মনটা আঁকুপাকু করছে তারকের। প্রতিপক্ষের কেউ এলেই ঠিক পুলিশের মত তাকে ঘিরে নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে বসানো হচ্ছে, যেখান থেকে সহজেই ঘাড় ধরে বার করে দেওয়া চলবে।

বলে দেওয়া হচ্ছে, 'গোলমাল চলবে না কিন্তু ভাই!'

'আরে ভাই, না। এমনি দেখতে এলাম। অন্ততঃ আমি চুপ করে থাকব কথা দিচ্ছি।'

দু'পক্ষের সকলেই প্রায় পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। তাছাড় কথা যখন দিয়েছে চুপ করে বসে থাকবে, কথার খেলাপ করবে না। সেটা নিয়ম নয়, কেউ কখনো করে না। কিন্তু সবাই চুপ করে বসে থাকার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে কেন? চাইলেও দিচ্ছে, না চাইলেও দিচ্ছে! বড় ধাঁধায় পড়ে গেছে এ পক্ষের চাঁইরা। চুপ করে বসেই যদি থাকে এবং কথা দেওয়ার পর তা ওরা থাকবে, গোলমাল সৃষ্টি করে কনফারেন্স ভাঙবে কি করে? অথচ আজ সকালেই সুনিশ্চিত, অবধারিত খবর পাওয়া গেছে—কনফারেন্স ভাঙবার চেষ্টা ওরা করবেই।

একবার সেক্রেটারীর নাগাল পেয়ে তারক জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের কনফারেন্সে ওদের তবে ঢুকতে দিচ্ছেন কেন?'

সেক্রেটারী বললেন, 'এটা ওপেন কনফারেন্স।'

'তবে এত কড়াকড়ি কেন?'

'তারকবাবু প্লিজ!'

তা সেক্রেটারীর দোষ নেই। তিনি সত্যই অতি ব্যস্ত।

কনফারেন্স সুরু হল। সেক্রেটারী রিপোর্ট পাঠ করবার আগেই জানিয়ে দিলেন যে, যারা ভুল পথের পথিক, পার্টি গড়ে যারা দেশের লোককে ভুল পথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে, যদিও সুবিধা করতে পারছে না তেমন, তাদের অনেকে উপস্থিত আছেন দেখে তিনি বড়ই বাধিত হয়েছেন। এই সভায় উপস্থিত থেকে যদি তাদের একজনও নিজের ভুল বুঝতে পারেন এবং ভুল সংশোধন করে—' ঠিক এই সময় উপর থেকে তোড়ে জল পড়তে আরম্ভ করায় কনফারেন্স ভেসে গেল।

হায়, কে জানত অতি তুচ্ছ তৃতীয় একটা নতুন পার্টি প্রতিপক্ষকে খাতির করে তাদের ক্ষতি করবে। ছোট এই পার্টিটিকে চিরদিন তারা পিঠ চাপড়ে এসেছে, ঝরণার মত বইয়ে এনে নিজেদের নদী-স্রোতে মিশিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। ওরাই যে শেষে ওপরের ব্যালকনী থেকে কনফারেন্সের ওপর আগুনে হোজের অস্ত্র হানবে কে তা কল্পনা করেছিল!

ভিজে চুপ্‌সে গিয়েও তারক তার আসনে অনড় অচল হয়ে বসে রইল। তার মনে হল, বাংলার জীবন যৌবন ধন মান কালস্রোতের বদলে শুধু জলস্রোতে ভেসে যাচ্ছে!

তারপর এক সময় সেক্রেটারীর সঙ্গে তার কিছুক্ষণ কথা হল। সে চাকরী পায় নি শুনে সেক্রেটারী দুঃখিত হলেন।

'তবে তো আরও মুস্কিল। আমি ভাবছিলাম, দু'এক মাস যে চাকরীর চেষ্টা করবেন সে সময়টা কোথায় কার কাছে আপনার থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়া যায়। একেবারে চাকরীই যদি না করেন—'

'তা হলে আমার ফিরে যাওয়াই ভাল।'

সেক্রেটারী মুখ তুলে একগাল হাসলেন। তারক তাকে এই প্রথমবার হাসতে দেখল।

'নিজের ব্যবস্থা করে পার্টির কাজ করতে পারেন।'

'চব্বিশ ঘণ্টা যদি পার্টির কাজ করি?'

'তার চেয়ে চব্বিশ ঘণ্টা নিজের কাজ করে অবসর সময়টা আমাদের দিলে বেশী উপকার হবে তারকবাবু।'

তারক স্থির দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল।

'এত টাকা কি হয় আপনাদের? আপনার নিজের পকেটে কত পার্সেণ্ট যায়?'

'আমার পকেট নেই তারকবাবু। আমি বিয়ে করি নি।'

সেক্রেটারী জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন।

'মেয়েদের পেছনে আরও বেশী খরচ হয়।'

'অদৃষ্টের কথা বলেন কেন। মেয়েরা ফিরেও তাকায় না। বড় সাধারণ লোক আমি। নিজেই তো দেখছেন।'

'আপনাদের তবে টাকা নেই?'

'না।'

'কেন? দরকার আছে, টাকা নেই কেন?'

'আপনিই বলুন না?'

তারক মৃদু হেসে বলল, 'আমি? আপনি বসে থাকবেন সেক্রেটারী হয়ে, আপনি করবেন নেতৃত্ব, আর প্রশ্নের জবাব দেব আমি?'

সেক্রেটারীও হাসলেন, 'তবে প্রশ্ন করেন কেন?'

'আপনি নেতা হবার উপযুক্ত নন।'

সেক্রেটারী এবার সোজা তারকের চোখের দিকে তাকালেন। নীরবে মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

'আপনি বুদ্ধিমান। ঠিক ধরেছেন। গুজব যা রটে সেসব দোষ আমার নেই, পার্টিকে বাঁচিয়ে রেখে বড় করার চেয়ে আমার জীবনে বড়ও আর কিছুই নেই। পার্টিকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষমতা আমার আছে কিন্তু এমন কোন পজিটিভ গুণ নেই যাতে নেতা হতে পারি। নেতার অভাবে আমরা মরছি তারকবাবু, শুধু একজন খাঁটি নেতার অভাবে।'

'গাঁয়ে বসেও মাঝে মাঝে আমার একথা মনে হয়েছে।'

'যে একটু ভাবতে জানে আজ একথা তার মনে হবেই। আমাদের দিশেহারা ভাবটা প্রকট না হয়ে পারে? লোকে আজ ভাবতে শিখেছে। তারা দেখছে আমাদের ধারও নেই, ভারও নেই। দা বা তরোয়ালের কোন নির্দিষ্ট আকারও নেই। কামার মিলছে না।'

মনোজিনীও এই কথাই বলল। কিন্তু সেক্রেটারীর মত হতাশভাবে নয়।

'এ অবস্থায় এরকম হওয়াটা কিন্তু খুব আশ্চর্য নয় তারকবাবু। উনি বড় বাড়াবাড়ি করেন, কিন্তু আমরা মোটেই দমে যাই নি। দেশের চিন্তাধারা বদলাচ্ছে। কোথায় কে আমাদের মুক্তির নতুন পথের কথা ভাবছে, ঝাঁকে ঝাঁকে জ্ঞান ও

অভিজ্ঞতা এসে তার বিশ্বাসকে দৃঢ় করছে, ক্রমে ক্রমে আমাদের নেতায় পরিণত হয়ে যাচ্ছে কে তা জানে? হয়তো আমাদের মধ্যেই একজন কাল বিনা দ্বিধায় আমাদের ভার নেবে। হয়তো দেখব একদিন আপনিই 'কমরেড' বলে হাঁক দিলে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত সাড়া দিচ্ছে: 'কমরেড, আমরা তোমায় বিশ্বাস করি।'

মনোজিনী হেসে ফেলল।—'বক্তৃতা দিয়ে ফেললাম? খালি বক্তৃতাই দিতে হয়—অভ্যাস জন্মে গেছে। দেশে ফিরছেন?'

'কাল যাব।'

'কাল! ক'টা দিন থেকে যান, হাল-চাল বুঝে যান চারিদিকের?'

তারক সিগারেটে সজোরে টান দিয়ে বলল, 'আবার আসব। মাঝে মাঝে আসতেই হবে। একটা বড় ভুল হয়ে গেছে, সংশোধন করে আসি।'

মনোজিনী মাখা আটার তালটিকে চটপট ছোট ছোট টুকরোয় ভাগ করছিল, সে কাজ বন্ধ করে প্রশ্ন করার বদলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

'দেশের পরিচিত চাষী-মজুরগুলোকে একবার চিনে আসতে হবে।'

মনোজিনী আশ্চর্য হয়ে গেল।—'সেকি? ওদের সঙ্গে তো আপনার বহুদিনের ঘনিষ্ঠ সংশ্রব? রামবাবু সেদিন এসে বলে গেলেন, একদিনে আপনি বিশটা গাঁয়ের লোককে জড়ো করতে পারেন, মজুররা আপনাকে খাতির করে?'

তারক একটু অপরাধীর মত বলল, 'তবু আমার কেমন ধাঁধাঁ লেগে গেছে। ওদের মনে করতে গিয়ে কেবল সোভিয়েট পোস্টার দেখছি!'

মুখ একটু হাঁ হয়ে গিয়ে মনোজিনীর দু'সারি চকচকে দাঁত খানিকক্ষণ দৃশ্যমান হয়ে রইল।

তারক নিজেই আবার বলল, 'এরকম হত না। আমি সত্যি ওদের ভাল করে জানি না। প্রতিদিন ওদের জীবনযাত্রা দেখেছি, এক সঙ্গে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ করেছি কিন্তু কোথায় যেন ফাঁক ছিল একটা। হয়তো আনমনা হয়ে থাকতাম, লক্ষ্য করতাম না। আমার নিজস্ব যেন একটা সমস্যা আছে, ওর এক একজন তার এক একটা টুকরো মাত্র, এই রকম ভাব ছিল মনের। আমার বাড়ির

কাছে জৈনুদ্দিনের ঘর, জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত বোধ হয় লাখখানেক কথা ওর সঙ্গে আদান-প্রদান হয়েছে, কিন্তু ভাবতে গিয়ে দেখছি লোকটা কি ভাবে, কেমন করে ভাবে, কিছুই জানি না। মানুষগুলোকে একটু চিনে আসি।'

মনোজিনী ডাকল, 'পুষ্প, রুটি ক'টা বানা দিকি ভাই! ভদ্রলোকের সঙ্গে দুটো কথা কই।'

তারক বলল, 'কথা আর কি বলবো! বলার মত কথা কি আর আছে বলুন? যা বললাম তাতে আপনার ভুল ধারণা জন্মে যেতে পারে, তাই আরেকটা কথা বলি। শুধু মানুষগুলোকে চিনতে যে কাল দেশে যাচ্ছি তা নয়, নতুন বৌটার জন্যেও যাচ্ছি।'

তারক কথাবার্তা সহজ করে আনতে চায় ভেবে মনোজিনী হেসে উঠে বলল, 'বলেন কি! ধৈর্য ধরছে না?' বলে তারকের মুখ দেখে অপ্রস্তুত হয়ে হাসি বন্ধ করল।

তারকের মুখেও অবশ্য মৃদু মৃদু হাসি ফুটেছিল, কিন্তু তাতে কৌতুক ছিল না এক ফোঁটা।

'কি জানেন, খিদেয় বৌটা খাঁ-খাঁ করছে।' তারক একটা সেঁকা রুটি টেনে নিয়ে খেতে আরম্ভ করল।

* * * * *

বাপ শুধোলেন, 'চাকরীটা হল না বাবা?'

তারক বললে, 'না বাবা, হল না। আমার হার্ট খারাপ।'

'হার্ট খারাপ! ডাক্তার না দেখিয়ে, চিকিৎসা না করে, তুই যে চলে এলি বড়?'

'ডাক্তার বললে খোলা আলো বাতাস আর পুষ্টিকর খাবার ছাড়া আমার আর কোন ওষুধপত্র দরকার নেই।'

রাত্রে রাতের কাপড় পরতে পরতে বৌ বলল, 'কাজ নেই বাবা চাকরী করে।'

বিছানায় বসে বলল, 'আচ্ছা, হার্ট ভাল হলে চাকরী করতে পারবে না?'

তারক বৌকে বুকে নিয়ে বলল, 'পারব বৈকি। হার্ট ভাল হলেই কাজ করতে পারব। হার্ট ভাল হোক, তৈরী হয়ে নিই, তারপর একচোট দেখিয়ে দেব কাজ কাকে বলে। তার আগে ঘর ছেড়ে নড়ছি না। জেলের মত ঘরে কয়েদী হয়ে থাকব, তুমি পুলিশের মত আমায় পাহারা দিও।'

সমাপ্ত

আঁবক

কেন লিখি

লেখা ছাড়া অন্য কোন উপায়েই যে-সব কথা জানানো যায় না সেই কথাগুলি জানাবার জন্যই আমি লিখি। অন্য লেখকেরা যাই বলুন, আমার এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই যে, তাঁরা কেন লেখেন সে-প্রশ্নের জবাবও এই।

চিন্তার আশ্রয় মানসিক অভিজ্ঞতা। ছেলেবেলা থেকেই আমার অভিজ্ঞতা অনেকের চেয়ে বেশি। প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণের কথাটা বাজে। আত্মজ্ঞানের অভাব আর রহস্যাবরণের লোভ ও নিরাপত্তার জন্য প্রতিভাবানেরা কথাটা মেনে নেন। মানসিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ইচ্ছা ও উৎসাহ অথবা নেশা এবং প্রক্রিয়াটির চাপ ও তীব্রতা সহ্য করবার শক্তি অনেকগুলি বিশ্লেষণযোগ্য বোধগম্য কারণে সৃষ্টি হয়, বাড়ে অথবা কমে। আড়াই বছর বয়স থেকে আমার দৃষ্টিভঙ্গির ইতিহাস আমি মোটামুটি জেনেছি।

লেখার ঝোঁকও অন্য দশটা ঝোঁকের মতোই। অঙ্ক শেখা, যন্ত্র বানানো, শেষ মানে খোঁজা, খেলতে শেখা, গান গাওয়া, টাকা করা ইত্যাদির দলেই লিখতে চাওয়া। লিখতে পারা ওই লিখতে চাওয়ার উগ্রতা আর লিখতে শেখার একাগ্রতার ওপর নির্ভর করে। বক্তব্যের সঞ্চয় থাকা যে দরকার সেটা অবশ্য বলাই বাহুল্য,—দাতব্য উপলব্ধির চাপ ছাড়া লিখতে চাওয়ার উগ্রতা কিসে আনবে!

জীবনকে আমি যে ভাবে ও যতভাবে উপলব্ধি করেছি অন্যকে তার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ভাগ দেওয়ার তাগিদে আমি লিখি। আমি যা জেনেছি এ জগতে কেউ তা জানে না (জল পড়ে পাতা নড়ে জানা নয়)। কিন্তু সকলের সঙ্গে আমার জানার এক শব্দার্থক ব্যাপক সমভিত্তি আছে। তাকে আশ্রয় করে আমার খানিকটা উপলব্ধি অন্যকে দান করি।

দান করি বলা ঠিক নয়—পাইয়ে দিই। তাকে উপলব্ধি করাই। আমার লেখাকে আশ্রয় করে সে কতকগুলি মানসিক অভিজ্ঞতা লাভ করে—আমি লিখে পাইয়ে না দিলে বেচারী যা কোনদিন পেতো না। কিন্তু এই কারণে লেখকের

অভিমান হওয়া আমার কাছে হাস্যকর ঠেকে। পাওয়ার জন্য অন্যে যত না ব্যাকুল, পাইয়ে দেওয়ার জন্য লেখকের ব্যাকুলতা তার চেয়ে অনেকগুণ বেশী। পাইয়ে দিতে পারলে পাঠকের চেয়ে লেখকের সার্থকতাই বেশি। লেখক নিছক কলম-পেষা মজুর। কলম-পেষা যদি তার কাজে না লাগে তবে রাস্তার ধারে বসে যে মজুর খোয়া ভাঙে তার চেয়েও জীবন তার ব্যর্থ, বেঁচে থাকা নিরর্থক।

কলম-পেষার পেশা বেছে নিয়ে প্রশংসায় আনন্দ পাই বলে দুঃখ নেই, এখনো মাঝে মাঝে অন্যমনস্কতার দুর্বল মুহূর্তে অহংকার বোধ করি বলে আপশোষ জাগে যে, খাঁটি লেখক কবে হবো!

প্রগতি সাহিত্য

১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে সংঘের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন হয়। দীর্ঘ চার বছর পরে বর্তমান চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। দুটি সম্মেলনের মধ্যে এই দীর্ঘ ব্যবধান ঘটার প্রধান কারণ আমাদের অর্থাৎ সংঘের পরিচালকদের দুর্বলতা। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পক্ষে এরূপ সম্মেলনের গুরুত্ব আমরা সঠিক অনুভব করতে পারিনি, এবং এই অক্ষমতা এসেছে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির আদর্শগত অনচ্ছতা থেকে। একথা অস্বীকার করা যায় না যে, বাস্তব অবস্থা সম্মেলন আহ্বান করার অতিশয় প্রতিকূল ছিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার প্রচণ্ড আঘাতে ও বঙ্গবিভাগের ফলে আমাদের সংগঠন একরকম ভেঙে যায়। শাখাগুলির সঙ্গে কেন্দ্রের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। বহু শাখার অস্তিত্ব লোপ পায়। কেন্দ্রের কার্যকলাপও বহুদিন বন্ধ রাখতে হয়। এ আঘাত সামলে উঠতে না উঠতে শুরু হয়ে যায় প্রতিক্রিয়ার হিংস্র আক্রমণ।

বাস্তব বাধা ও অসুবিধাগুলির গুরুত্ব কিছুমাত্র অস্বীকার না করেও বলা যায়, এই সব বাধা ও অসুবিধা অতিক্রম করে অনেক আগেই আন্দোলনের আয়োজন করা অসম্ভব ছিল না। দাঙ্গাহাঙ্গামার জন্য কেবল ১৯৪৬ সালে সম্মেলন সম্ভব ছিল না, পরের বছর সম্মেলন আহ্বান করা যেতো। প্রকৃতপক্ষে, ১৯৪৭ সালে সম্মেলন ডাকা সম্পর্কে আলোচনা ও প্রাথমিক পরিকল্পনা স্থির হয়—সংঘের সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রকাশিত বুলেটিনে বাংলা শাখার রিপোর্টে এই পরিকল্পনার উল্লেখ আছে। প্রতিক্রিয়ার সরকারী ও বেসরকারী আক্রমণও এতদিন সম্মেলন না ডাকার অনিবার্য কারণ হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। প্রতিক্রিয়ার বেসরকারী আর্তনাদ এখন তীক্ষ্ণতর, এবং সরকারী দমননীতি তীব্রতর হয়েছে এবং আমরা এই সম্মেলনের আয়োজনও করেছি।

সুতরাং সম্মেলন এই ১৯৪৯-এ পিছিয়ে আনার প্রধান দায়িত্ব সংঘের পরিচালকমণ্ডলীর। বলা বাহুল্য, যুগ্মসম্পাদক দু'জন এ বিষয় সকলের চেয়ে বেশি দায়ী।

আজ এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, আমাদের অন্যান্য ভুলভ্রান্তির

মতো এই নিষ্ক্রিয়তার মূল উৎস হচ্ছে, বর্তমান জগতের বাস্তব পরিস্থিতিতে প্রগতিশীল শিল্পী ও সাহিত্যিকদের ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের দ্বিধা-সংশয়হীন সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব। আদর্শগত দ্বিধাসংশয় দেশের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রগতিশীল শক্তির বিরাট অভ্যুত্থান সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে আমরা প্রগতির ক্রমবিকাশের পথে এগিয়ে এনেছি সত্য, কিন্তু এগিয়েছি আমরা দ্বিধাগ্রস্তভাবে, বাস্তবতার দ্রুত রূপান্তরের অনেকখানি পিছনে পিছনে। আদর্শ ও বাস্তবের সমন্বয় করতে, সত্যোপলব্ধির আলোতে আজকের দিনে প্রগতিশীল শিল্পী ও সাহিত্যিকদের লক্ষ্য কি, কর্তব্য কি, এ বিষয়ে দ্বিধাহীন, আপোষহীন শাণিত তীক্ষ্ণ আহ্বান, সংঘ দিতে পারেনি।

সংঘের গত কয়েক বছরের ইতিহাস সমগ্র দৃষ্টিতে বিচার করলে এই দুর্বলতার সুস্পষ্ট চেহারা এবং এই দুর্বলতা সত্ত্বেও, প্রগতিশীল চিন্তাধারা ও আন্দোলনের অভূতপূর্ব প্রসার আমাদের কাছে ধরা পড়ে।

যুদ্ধের সময় সংঘের ফ্যাসি-বিরোধী আন্দোলনের প্রসার লাভ ও শক্তিশালী বৃহৎ সংগঠন গড়ে ওঠা, বিস্ময়কর দ্রুততার সঙ্গে সংঘটিত হয়। এই সাফল্যের একটি বিশেষ তাৎপর্য আজ আমাদের লক্ষ্য করা প্রয়োজন। ১৯৪৪ সালের গোড়ার দিকে সংঘের কেন্দ্রীয় শাখার সভ্যসংখ্যা ছিল মাত্র ৭৫ জন—এক বছরের মধ্যে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৪২ জন; সংঘের শাখা ছিল মাত্র ২টি, বাংলার বিভিন্ন জেলায় সক্রিয় ১৪টি শাখা গড়ে ওঠে।

কেন্দ্র ও শাখাগুলির মোট সভ্যসংখ্যা হাজারের উপরে উঠে যায়। কলিকাতা ও মফঃস্বলে বহু সাংস্কৃতিক সভা, শিল্প-সাহিত্য ও সমাজ-জীবনের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা, পুস্তক প্রকাশ, লাইব্রেরী পরিচালনা প্রভৃতি নানা কাজের মধ্যে আন্দোলন অসাধারণ শক্তি সঞ্চয় করে।

কেবল বাংলায় নয়, সারা ভারতে ফ্যাসি-বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে সংঘের সর্বভারতীয় বিরাট সংগঠন গড়ে ওঠে।

এই অসাধারণ সাফল্যের কারণ খুঁজতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই, আদর্শ ও আন্দোলন সম্পর্কিত একটি সহজ সত্যই আরেকবার প্রমাণিত হয়েছিল এই সাফল্যের মধ্যে যে, আদর্শ ও সংগঠন পরস্পর নিরপেক্ষ নয়। আদর্শে খুঁত থাকবে, অথচ সংগঠন নিখুঁত হবে, বা সংগঠনে খুঁত রেখেও নিখুঁত আদর্শ সার্থক

হবে, এটা অসম্ভব। আদর্শ ও সংগঠন বা আন্দোলন পরস্পরের পরিপোষক ও পরিপূরক; অবিচ্ছিন্ন, অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। সমাজ-জীবন ও শিল্প-সাহিত্যের সম্পর্কে মার্ক্‌সিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি কি তখন আমাদের নিখুঁত ছিল? আজকের চেয়ে পরিষ্কার ধারণা ছিল শিল্পী ও সাহিত্যিকের সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে? তা নয়, দৃষ্টি তখন আমাদের অনেকখানি ঝাপ্‌সাই ছিল, আদর্শগত সমগ্রতার দিক থেকে।

কিন্তু তখনকার পরিস্থিতিতে, পৃথিবীব্যাপী সংকটের সীমাবদ্ধ বাস্তবতায় আমাদের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মূল আদর্শ ও লক্ষ্য ছিল নির্ভুল। সোভিয়েটের নেতৃত্বে ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে পৃথিবীব্যাপী সংগ্রাম চলার সময় প্রগতিবাদী শিল্পী ও সাহিত্যিকের একমাত্র কর্তব্য সুনির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল—তার সবটুকু সৃজনীশক্তি দ্বিধাহীন চিত্তে ফ্যাসিবাদের উচ্ছেদ সাধনে প্রয়োগ করা।

অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় ১৯৪৫ সালে তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনে, ফ্যাসি-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ নাম পরিবর্তন করে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ নাম রাখা হয়। পরিবর্তিত অবস্থায় আমাদের আদর্শগত সামগ্রিক ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন ক্রমে ক্রমে জরুরী হয়ে ওঠে। শিল্প ও সাহিত্যের ফর্ম কন্টেন্ট থেকে শুরু করে সামাজিক ভূমিকা পর্যন্ত নানা বিষয়ে, এত প্রশ্ন ও সংশয়ের সম্মুখীন আমাদের হতে হয় যে, মার্ক্‌সবাদের বিজ্ঞানসম্মত বিচারের ভিত্তিতে প্রগতি আন্দোলনের নির্ভুল ও সর্বাঙ্গীন আদর্শ স্থির করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়।

এই চেতনার তাগিদে, সংঘের বিভিন্ন সভার ও সাপ্তাহিক বুধবারের বৈঠকে এবং 'পরিচয়' ও অন্যান্য প্রগতিবাদী পত্রিকায়, বক্তৃতা, আলোচনা ও প্রবন্ধের মাধ্যমে সঠিক মার্ক্‌সবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। শিল্পী সাহিত্যিক ও সংঘের অন্যান্য সভ্যদের বড় একটি অংশের মধ্যে আদর্শের দিকটা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা গড়ে তোলার জন্য বিশেষ আগ্রহ এবং উৎসাহ দেখা যায়। দৃষ্টিভঙ্গির ক্রমবিকাশের সঙ্গে এই আগ্রহ ও উৎসাহ। অন্যদিকে, দৃষ্টিভঙ্গিকে সাফ করার এই আন্তরিক প্রচেষ্টার মধ্যে বুর্জোয়া মনোবৃত্তি সম্পন্ন সুবিধাবাদী কিছু কিছু শিল্পী সাহিত্যিকের মানসিক দৈন্য প্রকট হয়ে যায়। ক্রমে ক্রমে সংঘ থেকে সরে গিয়ে এঁরা প্রগতি-বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করেন।

শিল্প ও সাহিত্যের থিয়োরীর দিকটা সম্পর্কে আমাদের এই ঝোঁক, অপ্রয়োজনীয় বুদ্ধিবিলাস ছিল না, এদিকে আরও বেশি সক্রিয়তা ও উৎসাহেরই বরং প্রয়োজন

ছিল। আর্ট ও সমাজ সম্পর্কে সঠিক মার্ক্‌সবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার এই অভিযানের মধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এক নিষ্ঠুর সত্য—বিদেশী শাসক কত যত্ন আর অধ্যবসায়ের সঙ্গে তার পদানত দেশের মানুষগুলির চিন্তাজগতে, পুরনো মৃত যুগের কত বিভ্রান্তির জঞ্জালকে, কত অন্ধ সংস্কারকে জীইয়ে রাখে—স্বাধীন দেশে কালের গতির সঙ্গে আপনা থেকে যা ধুয়ে মুছে যায়।

আমাদের মানসজগতের ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণে সযত্নে রক্ষা করা বহু সংস্কার ও বিশ্বাসের মূলগুলি উপড়ে ফেলার জন্য, থিয়োরী নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার অফুরন্ত প্রয়োজন আছে। আমাদের ত্রুটি এদিকে ঘটেনি, আমাদের ভুল হয়েছে অন্যদিকে। দেশে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাস্তব অবস্থার দ্রুত রূপান্তর সম্পর্কে একেবারে উদাসীন না থাকলেও, এদিকে যতখানি মনোযোগ দেওয়া, এই বাস্তবতাকে যতখানি গুরুত্ব দেওয়া একান্তভাবে জরুরী ছিল, আমরা তা দিইনি। আমাদের গলদ থেকে গিয়েছিল—প্রতি পদক্ষেপে বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে না দিলে আদর্শগত বিভ্রান্তি বা মোহ থেকে যে মুক্ত থাকা যায় না—এই সহজ সত্যের উপলব্ধিতে।

শ্রেণীসংগ্রাম, শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী ভূমিকা এবং সোভিয়েটের নেতৃত্বে জগতে ধনতন্ত্রের অবসান ও নূতন সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা, এদেশে বুর্জোয়া শ্রেণীর, প্রগতিশীল ভূমিকা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার শিবিরে যোগদান—এই সব সত্যকে সচেতনভাবে গ্রহণ করেও, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই সব সত্যের বাস্তব অভিব্যক্তি যে এক হওয়া উচিত, সে বিষয়ে আমাদের বিভ্রান্তি থেকে গিয়েছিল। সমস্ত জগৎ দুটি বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও যে তার প্রতিফলন ঘটবে প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার একইরূপ আপোষহীন সংঘাতের মধ্যে, প্রগতিশীল চিন্তাধারাকে চেপে মারার বহুরূপী প্রত্যক্ষ ও প্রচ্ছন্ন অভিযান প্রবলতর হয়ে উঠতে থাকবে—এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ সচেতন হতে পারিনি।

আমরা তাই সাংস্কৃতিক আন্দোলনে পুরনো ধারার জের টেনে এসেছি। শ্রমিক ও বিপ্লবী জনসাধারণের নূতন সংস্কৃতি গড়ে তোলার কাজে এগোতে এগোতেও বজায় রাখতে চেয়েছি বুর্জোয়া জগতের সঙ্গে ভাবগত আত্মীয়তা। আমরা যে সচেতনভাবে, সক্রিয়ভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে একমাত্র শ্রমিকশ্রেণী ও বিপ্লবী জনসাধারণের পক্ষে, সোভিয়েটের পক্ষে,—দৃঢ় কণ্ঠে একথা ঘোষণা করতে আমরা

ইতস্তত করেছি।

সংঘ একদিকে যেমন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের মধ্যে বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা বজায় রেখে অগ্রসর হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি এই দ্বিধাগ্রস্ততার পরিচয়ও দিয়ে এসেছে।

দাঙ্গাহাঙ্গামা যখন প্রচণ্ডতম হয়ে দাঁড়ায়, তখন কিছুদিন ছাড়া সংঘ কোনদিনই নিষ্ক্রিয় থাকেনি। সংঘের সাধারণ নিয়মিত কাজের মধ্যে সোমেন চন্দ লাইব্রেরী ও পাঠাগার পরিচালনা, এবং বুধবারের বৈঠক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য বহু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের আহ্বানে, বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী বক্তা পাঠাবার ব্যবস্থাও সংঘ বরাবর করে এসেছে। দাঙ্গার সময়, সংঘের উদ্যোগে ও পরিচালনায় শিল্পী ও সাহিত্যিকদের বিরাট দাঙ্গা-বিরোধী অভিযান গঠন এবং শ্রমিকশ্রেণীর দাঙ্গা-বিরোধী চেতনাকে শিল্পে সাহিত্যে, চিত্র ও রচনার মধ্যে রূপায়ণ, এবং শিল্পী সাহিত্যিকদের ঐক্যবদ্ধ সভা ও শোভাযাত্রায় সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি দেওয়া, আমাদের সংঘের পক্ষেই সম্ভব ছিল। এই সময় (১৯৪৬) বঙ্গীয় সংস্কৃতি পরিষদ স্থাপনের প্রচেষ্টা করা হয়। অপর দিকে ১৯৪৭-এর পনেরোই আগস্ট ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে, সর্বদলীয় শিল্পী সাহিতিকদের সাংস্কৃতিক ঐক্যমূল্য দিতে বিরাট সভার অনুষ্ঠান করে, শ্রেণীস্বার্থে বিভক্ত জগতে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অবাস্তব ও অসম্ভব সর্বদলীয় ঐক্যের প্রতি মোহের পরিচয়ও সংঘ দিয়েছিল। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার দুটি বিরোধী ধারাও স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে থাকে, রাজনীতির ক্ষেত্রে তথাকথিত স্বাধীনতা পাওয়া সম্পর্কে শ্রমিক ও জনসাধারণের মোহভঙ্গের প্রতিক্রিয়া শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই দুটি ধারায় বিরোধীরূপ,—প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল রূপ—প্রকট হয়ে ওঠে। 'আর্ট ফর আর্ট্‌স সেক'-এর পন্থী শিল্পী ও সাহিত্যিকের নিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী কয়েকজন নামকরা ব্যক্তির সঙ্গে, সংঘের প্রগতিবাদী সভ্যদের মতের সংঘাত তীব্র হয়ে ওঠে। সংঘ দৃঢ়তার সঙ্গে এই ভ্রান্তমতের বিরোধিতা করে। প্রগতিবিরোধী এই সাহিত্যিকেরা সংঘ থেকে সরে গিয়ে সংঘকে তীব্রভাবে আক্রমণ করে নিন্দা ও মিথ্যাপ্রচারের অভিযান শুরু করেন।

প্রকৃতপক্ষে, প্রগতিবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির বিভিন্ন "সাংস্কৃতিক" পত্রিকা এবং প্রতিক্রিয়াশীল লেখকদের সংগঠন এই সময় আমাদের সংঘের বিরুদ্ধে তীব্র

আক্রমণ আরম্ভ করে।

আমাদের সংঘের বিরোধিতার উদ্দেশ্যে স্থাপিত 'কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ' সক্রিয় হতে চেষ্টা করে। কিন্তু মৃত সংস্কৃতির জের টেনে প্রগতিশীল নূতন ও জীবন্ত সংস্কৃতির বিরোধিতায় নামার অর্থই, ভাব ও প্রেরণার অসীম দৈন্য—এই দৈন্য নিয়ে কোন সংঘ প্রাণবান ও সক্রিয় হতে পারে না। 'কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ' তাই বারবার মাথা তুলতে চেয়ে ঝিমিয়ে গিয়েছে।

আমাদের সংঘ সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এই আক্রমণের প্রতিরোধ করেছে—'পরিচয়' এবং অন্যান্য প্রগতিবাদী পত্রিকায় সাহায্যে এবং সাংস্কৃতির অনুষ্ঠান প্রভৃতির আয়োজন করে। প্রগতিশীল মতবাদের প্রচারে 'পরিচয়'-এর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রগতি-বিরোধী ধারা প্রবল হবার পর 'পরিচয়'-এর সম্পাদকীয় নীতির যে পরিবর্তন করা হয়, এবং যে দৃঢ়তার সঙ্গে এ নীতি অনুসরণ করা হয় তা বিশেষ অভিনন্দনের যোগ্য।

বিরোধীপক্ষের প্রবল আক্রমণের বিরুদ্ধে আমাদের সংঘ প্রশংসনীয় দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছে, কিন্তু প্রতিরোধ গড়ে তুলবার সক্রিয় প্রচেষ্টা সম্পর্কে সংঘ সম্পূর্ণ সচেতন হতে পারেনি। বুর্জোয়া ভাবধারার মোহ সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে না পারায় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রগতির ধারা আজ কতদূর শক্তিশালী—সংঘের পুরোপুরি সে ধারণা জন্মায়নি, এবং এই শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ রূপ দেবার দায়িত্ব পালনে উদাসীনতা থেকে গিয়েছে। বর্তমান যুগে শ্রমিকশ্রেণী ও জনসাধারণের বিপ্লবী চেতনা যখন যতদূর অগ্রসর হয়, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রগতিশীল ধারার ততখানি শক্তিশালী হবার সম্ভাবনাও সেই সঙ্গে সৃষ্টি হয়ে যায়। বাংলার শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রেও নূতন সংস্কৃতির দুর্বার জোয়ার আনার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়ে আছে বহুমুখী বিক্ষিপ্ত প্রগতিশীল ধারাগুলির মধ্যে। আমরাই গাফিলতি করে এতদিন ধারাগুলিকে একত্র করে জোয়ার সৃষ্টি করতে পারিনি।

গত এক বৎসর প্রতিক্রিয়ার আক্রমণ, নিন্দা ও অপপ্রচারের স্তর অতিক্রম করে, প্রগতিশীল লেখক, শিল্পী, সাংস্কৃতিক কর্মী ও প্রতিষ্ঠানের উপর সরকারী নির্যাতনের স্তরে পৌঁচেছে। সংঘের বিশিষ্ট সভ্য শ্রীগোপাল হালদার, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায় আজ বহুদিন বিনা বিচারে আটক হয়ে আছেন। সংঘের কেন্দ্রীয় আপিসে একাধিকবার পুলিসের পদার্পণ ঘটেছে,

কয়েকটি শাখায় সার্চ করে উৎসাহী কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান গণনাট্য সংঘ এবং সোভিয়েট সুহৃদ সংঘও পুলিসের কৃপালাভ থেকে বঞ্চিত হয়নি।

এই আক্রমণের প্রতিরোধে সংঘের উদ্যোগে 'সংস্কৃতি স্বাধীনতা পরিষদ' স্থাপিত হয়। বুদ্ধিজীবীদের সামনে সংস্কৃতির এই নতুন সংকটের স্বরূপ তুলে ধরা ও জোরালো প্রতিবাদ সৃষ্টি করার কাজে 'সংস্কৃতি স্বাধীনতা পরিষদে'র ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

যুদ্ধাবসানের পর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অবস্থার দ্রুত রূপান্তর হয়েছে। আজ সোভিয়েটের বিরুদ্ধে আমেরিকার নেতৃত্বাধীনে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি সংঘবদ্ধ হয়ে নূতন বিশ্বযুদ্ধের প্রকাশ্য প্রচারের রূপ নিয়েছে। এই সোভিয়েট বিরোধিতা রাজনীতির ক্ষেত্র অতিক্রম করে সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও ফ্যাসিস্ট দমননীতিতে পরিণত হতে আরম্ভ করেছে। তাই, যেটুকু মোহ ও জড়তা অবশিষ্ট ছিল আজ তা ঝেড়ে ফেলবার জরুরী প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

সন্দেহ নেই আমরা তা পারবো। প্রগতির অভিযান সকল বাধা ঠেলে সরিয়ে এগিয়ে যাবে।

বাংলায় ভারতীয় প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের একটি হিন্দী ও একটি উর্দূ শাখা আছে। এই শাখা দুটির সঙ্গে এতদিন আমাদের প্রায় কোন যোগাযোগই ছিল না, অল্পদিন হয় এঁদের সঙ্গে আমাদের সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। তাই এই প্রতিষ্ঠান দুটির নাম উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হতে হচ্ছে।

বহু প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান, পত্রিকা ও ব্যক্তির কাছ থেকে প্রগতি লেখক ও শিল্পীসংঘ নানাভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করেছে। আমরা সহযাত্রী, আমাদের মধ্যে ঋণ স্বীকার ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ব্যবধানটুকুও আমরা রাখতে চাই না। [২২-৪-৪৯]

বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা

পৌষ, ১৩৫৩ সংখ্যা "পরিচয়ে" প্রকাশিত "বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্ম-সমালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধটি আমি সমগ্রভাবে প্রত্যাহার করছি। এদেশে শ্রেণী সংগ্রামের বর্তমান পর্যায় সম্পর্কে আমার পূর্ববর্তী প্রাপ্ত ধারণার ফলেই তার জন্ম।

এরূপ প্রত্যাহার ঘোষণার প্রয়োজন হবে ভাবিনি। আমার ধারণা ছিল নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে মূল বিষয়টি সমগ্রভাবে পুনর্বিবেচনাসাপেক্ষ এবং এ লেখাটিও বাতিল বলে বিবেচিত হবে। প্রশ্নটা সামগ্রিক বিচারের, সুতরাং গুরুতর ভুল সত্বেও কোন লেখায় কোন্ কোন্ সঠিক কথা বলা হয়েছে সেটা তুলে ধরবার চেষ্টা নিরর্থক এবং অনুচিত। সব কিছু বাতিল হোক বা না হোক, সব কিছুই নতুনভাবে বিচার করতে হবে। আনুষঙ্গিক বা আংশিক সত্য যদি বলা হয়ে থাকে, তার স্থান হবে ভুলভ্রান্তি সংশোধন করা ও নতুনভাবে বিচারের ভিত্তিতে লেখা প্রবন্ধে।

দেখা যাচ্ছে, অনেকের ধারণা এই যে, আমি এখনও উপরোক্ত প্রবন্ধের মতামত আঁকড়ে আছি। পুনর্বিবেচনার জন্য তাই এই প্রত্যাহার ঘোষণার প্রয়োজন হলো।

আমার এই প্রবন্ধটি সম্পর্কে ফাল্গুনের "পরিচয়ে" সিতাংশুবাবুর আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। লেখাটি মার্ক্সবাদের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা পদ্ধতিকে, বৈঠকী তার্কিকের যেন-তেন-প্রকারেণ বিপক্ষকে (?) ঘায়েল করার স্তরে নামিয়ে আনার একটি নিদর্শন বলে মনে হয়েছে। লেখাটি নিয়ে বিশদ আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই। আমি শুধু লেখাটির প্রথম প্যারাটির বিচার করবো, এবং ব্যক্তিগত আক্রমণাত্মক দু'একটি অপ্রাসঙ্গিক অভিযোগের জবাব দেবো। কোন লেখার প্রথম প্যারা থেকেই যদি প্রমাণ করা যায় যে, সমালোচক তাঁর আলোচ্য প্রবন্ধটি ভালো করে না পড়েই মার্ক্সবাদের উদ্ধৃতি-ভূষিত আলোচনাটি লিখে ফেলেছেন, তখন সমস্ত লেখাটি নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন থাকে কি ?

ঐতিহ্য সম্পর্কে আমার একটি মত ছিল, রবীন্দ্র গুপ্ত ঐতিহ্য বিচারের যে নতুন 'ভিত্তি' সরবরাহ করেন, আমি সেটা গ্রহণ করি। এই প্রসঙ্গে আমার আগের মতটা কি ছিল তার বিবরণ আমার প্রবন্ধে দাখিল করি। "আমার মতটা কি

ছিল এবং কিভাবে আমি রবীন্দ্র গুপ্তের মত গ্রহণ করেছি একটু বলা দরকার।”

[পরিচয়, পৌষ, পৃঃ ৩৬]

সিতাংশুবাবুকে পায় কে! নতুন মত গ্রহণের আগে আমার পুরনো মত কি ছিল তার বিবরণ থেকে উদ্ধৃতি তুলে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন, আমি কেমন নতুন একটা মত মেনে নিয়েও তার বিরোধী কথা লিখছি!

আরও আছে, প্রথম প্যারাতেই আছে। প্যারার শুরুতেই সিতাংশুবাবু লিখেছেন যে, আমি “প্রকাশ রায়ের বক্তব্য রবীন্দ্র গুপ্তের লেখা” পড়ার পর মেনে নিয়েছি। এটা আংশিক সত্য অবলম্বন করে একটা মিথ্যাকে দাঁড় করাবার চেষ্টা। আমার প্রবন্ধে কি কোনরূপ অস্পষ্টতা আছে যে, শুধু ঐতিহ্য সম্পর্কে প্রকাশ রায়ের মতটা রবীন্দ্র গুপ্তের মতের ভিত্তিতে মেনে নিয়েছিলাম? প্রবন্ধের গোড়াতেই নম্বর দিয়ে লিস্ট দাখিল করেছি, প্রকাশ রায়ের কোন্ কোন্ বক্তব্য সম্পর্কে আমার কি বক্তব্য ছিল—এবং নম্বর (২নং বক্তব্য) উল্লেখ করে স্পষ্টই বলেছি যে, রবীন্দ্র গুপ্তের লেখা পড়ে কেবল ঐতিহ্য সম্পর্কে আমার মত বদলেছি। প্রকাশ রায়ের লেখাকে রবীন্দ্র গুপ্ত মোটামুটিভাবে সমর্থন করেন—আমি তা করিনি। প্রকাশ রায়ের খণ্ডিত দৃষ্টি, বামপন্থী বিচ্যুতি না দেখা, যান্ত্রিকতা, প্রভৃতির যে সমালোচনা আমার প্রবন্ধে আছে, সেটা কি তার বক্তব্যকে মেনে নেওয়ার প্রমাণ?

সিতাংশুবাবু অভিযোগ করেছেন: “এই সম্পর্কে মানিকবাবু গত প্রগতি সাহিত্য-সম্মেলনের ইস্তাহার রচনা নিয়েও কতগুলি কথা বলেছেন, যেগুলি সেই সম্মেলনের ইস্তাহার পুনর্লিখন কমিটির সভ্য হিসাবে তাঁর বলা ঠিক হয়েছে কিনা তাঁকে ভেবে দেখতে বলি।”

(পরিচয়, ফাল্গুন, পৃঃ ৪৯)

অর্থাৎ সিতাংশুবাবু বলতে চান, কমিটির সভায় কিছু না বলে পরে আমার প্রবন্ধে ইস্তাহারটির নিন্দা করা ঠিক হয়নি। কমিটির সভ্য হিসাবে পুনর্লিখিত ইস্তাহার সম্পর্কে আমার দায়িত্ব ভুলে গিয়েছি। নিজেকে বাঁচিয়ে অন্যদের নিন্দা করা আমার অন্যায় হয়েছে।

এও আরেকটা প্রমাণ যে, সিতাংশুবাবু আমার প্রবন্ধটি ভালো করে না পড়েই সমালোচনা করেছেন। ইস্তাহারটি সম্পর্কে কাকে বা কাদের কটাক্ষ করা হয়েছে আমার প্রবন্ধে? কোথায় অস্বীকার করেছি আমার দায়িত্ব? ইস্তাহারটি মনের মতো না হলেও সেটি গ্রহণযোগ্য বলার জন্য, ভালো একটি ইস্তাহার লেখার

অক্ষমতার জন্য শুধু আমাকেই বরং আমি খোঁচা দিয়েছি। নিন্দা করেছি, "প্রগতি লেখক সংঘের সম্পাদক ও সম্মেলনের কার্যকরী সভাপতি"কে [পরিচয়, পৌষ, পৃঃ ৪৫]। ইস্তাহার পুনর্লিখন কমিটির সভার বিবরণ স্মরণ আছে, কিন্তু আমিই যে ছিলাম সংঘের সম্পাদক ও সম্মেলনের কার্যকরী সভাপতি, সেটা আজ স্মরণ করিয়ে দিতে হচ্ছে সিতাংশুবাবুকে।

ইস্তাহার পুনর্লিখন কমিটির উল্লেখ আমার প্রবন্ধে নেই। উল্লেখ করলে এ স্বীকৃতিও অবশ্যই থাকতো যে, আমিও ওই কমিটির সভ্য ছিলাম।

৫১ পৃষ্ঠায় [পরিচয়, ফাল্গুন সংখ্যা] সিতাংশুবাবু লিখেছেন: "মানিকবাবুকে আশ্বাস দিচ্ছি তাঁকে শ্রমিক হতে হবে না, কেননা শ্রমিক হলেই সাহিত্য লেখা যায় না।"

শ্রেণী-সম্পর্ক, শ্রেণী-বিচ্যুতি, শ্রেণী-সংগ্রামে অংশ গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে আমি যা বলিনি তাই আমার বক্তব্য বলে, এবং আমি যা বলেছি সেটা বিকৃত করে উপস্থিত করেছেন, তাই কি যথেষ্ট ছিল না? এ ব্যক্তিগত মিথ্যা আক্রমণ কেন? আমি শ্রমিক হতে অনিচ্ছুক, এ নির্লজ্জ ঘোষণা তো আমার লেখায় কোথাও নেই! আমার লেখায় বরং শ্রমিকশ্রেণীকেই ষোল আনা বিপ্লবী, সেরা মানুষ বলে অভিনন্দিত করা হয়েছে।

মার্ক্সবাদ লেনিনবাদ থেকে চয়ন করে নয়, সিতাংশুবাবু নিজে আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন! অথচ শ্রমিক শব্দের মানেই তিনি জানেন না। তাই তিনি নির্বিবাদে ঘোষণা করেছেন, জগতের শ্রমিকশ্রেণীর নেতা স্টালিনও শ্রমিক নন!

বুঝতে পারা যায় যান্ত্রিক অনমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি সিতাংশুবাবুকে কোন্ ধাঁধায় ফেলেছে: কারখানায় না খেটে কি করে শ্রমিক হওয়া যায়? শ্রমিক না হয়েও শ্রমিকশ্রেণীর নেতা হওয়া সম্ভব, যেমন স্টালিন, কিন্তু কারখানায় না খাটলে শ্রমিক হবে কোন্ যুক্তিতে?

সিতাংশুবাবু নিজেই এ সমস্যার মীমাংসা করতে পারেন। শ্রমিকশ্রেণীর বন্ধু আছেন, শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ, সংগ্রাম ও চেতনা ষোল আনা নিজের করে নিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর একজন হয়ে পড়ুন। দেখবেন, কারখানার মারফতে ছাড়া এভাবেও শ্রমিক হওয়া যায়—শ্রমিকশ্রেণীর একজন হওয়ার যুক্তিতে।

সাহিত্য সমালোচনা প্রসঙ্গ

সম্পাদক বার বার তাগাদা দিয়েছেন, আমি বার বার সময় চেয়ে নিয়েছি। কারণ, একজন সৎ ও চিন্তাশীল ব্যক্তির "অনাগতের প্রতীক্ষায়"-এর (নতুন সাহিত্য, চৈত্র ১৩৫৯) মতো প্রবন্ধকে হঠাৎ গ্রহণ বা বর্জন করার মতো বিস্তাবুদ্ধি আমার আছে কিনা জানা ছিল না।

"নতুন সাহিত্য" সম্পাদকের অনুরোধটাও মারাত্মক—তিনি সরাসরি আমাকে কথাশিল্পীর অবশ্য পালনীয় একটি মূলনীতি লঙ্ঘন করার আহ্বান জানিয়েছেন। অচ্যুতবাবুর সমালোচনামূলক প্রবন্ধটি সম্পর্কে কোন পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণার দাবি তিনি জানাননি—ঐ প্রবন্ধে আমার সাহিত্য সম্পর্কে যে সমালোচনা আছে শুধু সে বিষয়ে আমার মতামত চেয়েছেন। অচ্যুতবাবুর বক্তব্য আমি কি ভাবে নিয়েছি এটুকু বলাই যথেষ্ট।

বন্ধুবর গোপাল হালদার তাঁর জবাবের শুরুতেই এ প্রথা চালু করে সম্পাদকের বিপদে পড়া সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।

সম্পাদকের বিপদ! অভিমানে খোঁচা লাগায় লেখকরা চটে যাবেন, এটাই কি আসল কথা? নিজের সাহিত্যের শিল্পমূল্যের বিচারটা মনঃপূত না হলেই চটে যাবেন এরকম শিশুর মতো অভিমানী লেখককে শুধু ধমক দিয়ে চটানো কেন, মেরে ধরে কাঁদালেই বা কি আসে যায়? দুটো মিষ্টি কথার লজেন্স দিলেই তো আবার তার মুখে হাসি ফুটবে!

নিজের লেখার সমালোচনা নিয়ে বাদপ্রতিবাদে নামার প্রথা চালু করার বিপদ বরং লেখকদেরই, নীতিভঙ্গের বিপদ।

নিজের বই সম্পর্কে কোন সমালোচনার জবাবে লেখকের কিছু বলা সাংঘাতিক অনিয়ম।

নিন্দা বা প্রশংসা, অন্যায় আক্রমণ বা পিঠচাপড়ানো—এ সম্পর্কে তো বটেই, বই-এর কাহিনী, আঙ্গিক, শিল্পমূল্য ইত্যাদির বিচার-বিশ্লেষণ, সমালোচনা সঠিক বা বেঠিক হয়েছে সে বিষয়েও লেখক মুখ বুজে থাকতে বাধ্য। একটি গল্প বা উপন্যাস

লিখে বাজারে ছাড়ার পর কে কোথায় কেন কিভাবে কি বলছে না বলছে লেখক নীরবে শুনে যাবেন। নির্ভেজাল সদিচ্ছা ও সৎসাহস নিয়ে নিজে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে, সমালোচনার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণকে স্বীকৃতি দিয়ে বা প্রতিবাদ জানিয়ে লেখক কিছু বলতে গেলেই সেটা দাঁড়াবে লেখকের নিজের ব্যক্তিত্ব খাটিয়ে ও প্রচার চালিয়ে পাঠক ও সমালোচক মহল বইখানা কিভাবে নেবেন তাদের সেই স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা।

কিভাবে লিখবেন সে স্বাধীনতা লেখকের। সে লেখা বিচার করার স্বাধীনতা সকলের। এইজন্য অসৎ সমালোচকের উদ্দেশ্যমূলক সস্তা গালাগালিও লেখক নীরবে উপেক্ষা করবেন। অসৎ সমালোচককে শায়েস্তা করার দায় অবশ্য অন্যান্য সৎ সমালোচকের এবং সাহিত্য-রসিকের।

নিজের বই সম্পর্কে নীরব থাকার নীতি কিন্তু লেখকের সমালোচক হবার স্বাধীনতা হরণ করে না। সাধারণভাবে সাহিত্যের এবং অন্যের বই-এর সমালোচনা করার অধিকার তাঁর সকলের মতোই বজায় থাকে। নিজের বই সম্পর্কে সমালোচকের বিচার-বিশ্লেষণ এবং মতামত সম্পর্কে চুপ করে থাকা নিয়ম হলেও সমালোচকের স্থূল অবাস্তব ভুল বা বিকৃতিগুলি লেখক দেখিয়ে দিতে পারেন। বই-এ যা আছে সমালোচনায় তা বিকৃত করলে অথবা যা নেই তা টেনে আনলে লেখকের প্রতিবাদ জানানো দোষের নয়।

যেমন, 'ইতিকথার পরের কথা'র ' জমিদার-নন্দন" বিলাত ফেরত উচ্চশিক্ষিত নায়কের নামে অচ্যুতবাবু অপবাদ দিয়েছেন যে, "আজকে, একচেটিয়া পুঁজিবাদের যুগে" তার মাথায় "গ্রামাঞ্চলে শিল্পবিস্তার করে জনসাধারণের জীবন উন্নয়ন" করার "বালখিল্য" কল্পনা এসেছে—সে আদর্শ "প্রথম অসহযোগ আন্দোলনের পর স্বাভাবিক ছিল।"

এটা অচ্যুতবাবুর সম্পূর্ণ মনগড়া অপবাদ। বইটির কোথাও নেই যে, "জমিদার নন্দনটি"র মাথায় গ্রামাঞ্চলে শিল্পবিস্তারের কল্পনা গজিয়েছিল অথবা কাজে সে এরকম কোন চেষ্টা করেছিল।

ভালোভাবে দেখাতে পেরেছি কি পারিনি সে প্রশ্ন আমার বিচার্য নয়। কিন্তু আমার নায়কটির আসল সমস্যা কী—বইটিতে সে বিষয়ে যথেষ্ট বলা হয়েছে। নিজের 'উচ্চ শিক্ষা' নিয়ে কি করবে, উচ্চশিক্ষার মহান আদর্শের খাতিরে যৌবনের সেরা

বছরগুলি সাধনায় খরচ করে দেশবিদেশ থেকে সঞ্চয় করা বিজ্ঞানের জ্ঞান এদেশে কিভাবে কোন কাজে লাগালে কিছু পয়সাও আসবে, তার স্বপ্ন তার সাধনাও সফল হবে—এই নিয়ে আমার নায়কটি ফাঁপরে পড়েছে। শিক্ষাদীক্ষার সার্থক প্রয়োগের সুযোগ সুবিধার অভাবের চাপে একজন উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তির এদেশের বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে খানিকটা নতুনভাবে শিক্ষা প্রচেষ্টায় নামার অর্থ গ্রামাঞ্চলে শিল্প বিস্তারের প্রচেষ্টা হবে কেন? কলকাতা থেকে দূরে নিজের সুবিধাজনক স্থানে রেলস্টেশনের ধারে কারখানা খোলার জন্য কি অচ্যুতবাবু আমার নায়কের কাজের মনগড়া অর্থ করেছেন?

'জমিদার-নন্দন-'এ অচ্যুতবাবুর আপত্তির কারণটা বুঝলাম না। অন্য কোন ধনীর উচ্চ শিক্ষিত নন্দনকে নায়ক করলেও গুণের সার্থক প্রয়োগের সমস্যা থেকে যেত—কেবল কাহিনী, পরিবেশ ও চরিত্র হতো অন্যরকম।

অচ্যুতবাবুর সমালোচনামূলক প্রবন্ধটি সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা শুরু করার একটা কথা বলে নিই। অচ্যুতবাবুর বিচার-বিশ্লেষণের নীতি ও সাধারণ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে লিখলেও কেউ যেন এই সিদ্ধান্ত করে বসবেন না যে, আমি লেখাটির গুরুত্ব বা মূল্য সম্পর্কে সচেতন নই। লেখাটি প্রকাশ করে অচ্যুতবাবু আমাদের সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। লেখাটি পড়ে অচ্যুতবাবুর সততা ও মননশীলতা সম্পর্কে এতটুকু সন্দেহ থাকে না। এরূপ লেখা এবং লেখাটি নিয়ে আলোচনা আমাদের চিন্তার অনেক অপূর্ণতা ও অশুদ্ধতা দূর করতে সাহায্য করে।

প্রকৃতপক্ষে, বাংলা প্রগতি সাহিত্যের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমি যে আশাবাদী—এরূপ সমালোচনা যে প্রকাশিত হয় সেটা তার অন্যতম একটি কারণ।

সততা ও স্বচ্ছতা এই লেখাটির একটি প্রধান গুণ। বিচারবিবেচনা করে যা সত্য বলে জেনেছেন পরিপূর্ণ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে সহজভাবে তিনি আমাদের সামনে তা ধরে দিয়েছেন। এই গুণটাই অন্য হিসাবে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়—সমালোচনার ভুলত্রুটি দুর্বল অসরল সমালোচনার চেয়ে বেশি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। তাই বাধ্য হয়ে প্রতিবাদ জানাতে হচ্ছে যে, অনেক দামী কথা বলে থাকলেও বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের সম্পর্কে অচ্যুতবাবুর দৃষ্টিভঙ্গি বিভ্রান্তিকর। "অভিজ্ঞতার বাড়া শিক্ষা নেই" সত্য কথাই। কিন্তু পাঠক সমাজ নাড়া খাচ্ছে না, সাড়া দিচ্ছে না, গ্রহণ করছে না—এটাই কি বাংলার প্রগতিবাদী লেখকদের অভিজ্ঞতার শিক্ষা?

পাঠক পাঠিকা—অর্থাৎ দেশের লোকের উপেক্ষা বা খাতিরটাই সাহিত্যের সার্থকতার নিরিখ। বাংলার লেখকরা অভিজ্ঞতা থেকে এই শিক্ষা লাভ করেছেন? লোকের মুখ চেয়ে বাংলার লেখকেরা দিশেহারার মতো একবার "প্রচারধর্মী" এবং একবার "সূক্ষ্মভাবে আঙ্গিক-সর্বস্ব" হয়ে যাচ্ছেন!

অচ্যুতবাবুর এ সিদ্ধান্ত মানতে পারলে আমি নিজে অন্তত চিরদিনের জন্য লেখা বন্ধ করে সাহিত্যের ক্ষেত্র থেকে দূরে সরে গিয়ে বড়বাজারে মশলার দোকান নিতাম।

দেশের লোকের গ্রহণ বা বর্জনের প্রশ্নটা মোটেই তুচ্ছ নয়—লেখকের কাছে বরং সেটাই প্রধান কথা। দেশের জন্যই তো লেখক লেখেন। কিন্তু লেখক কি নিজের স্বার্থে লেখেন? দেশের লোকের আদর আর অনাদরের হিসাবটা কি লেখক কষবেন নিজের স্বার্থের মানদণ্ডে?

নিজের স্বার্থে পাঠকদের কাছে পাত্তা পাবার জন্য "প্রচারধর্মী" হয়ে সাহিত্যের আসরে নেমে সুবিধা হচ্ছে না দেখে "অভিজ্ঞতার শিক্ষা" স্বীকার করে পাঠকের মন যোগানোর জন্য ভোল পাল্টে লেখক "সূক্ষ্মভাবে আঙ্গিক-সর্বস্ব" হবেন?

অচ্যুতবাবু কী করে বাংলার লেখকদের এরকম ছোটলোক (খারাপ লোক অর্থে—গরীব চাষী মজুর অর্থে নয়) ভাবতে পারলেন কল্পনা করতেও আমার বিস্ময়ের সীমা থাকছে না।

লেখক কে? পিতার মতো যিনি দেশের মানুষকে সন্তানের মতো জীবনাদর্শ বুঝিয়ে শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করার ব্রত নিয়েছেন। পিতার মতো, গুরুর মতো জীবনের নিয়ম অনিয়ম বাঁচার নিয়ম অনিময় শেখান বলেই অল্পবয়সী লেখক-শিল্পীও জাতির কাছে পিতার মতো, গুরুর মতো সম্মান পান। দেশের মানুষের মন যোগাতে চেয়েছিল বলে কি আমাদের কিশোর কবি সুকান্তকে দেশের আবালবৃদ্ধবণিতা এত ভালোবাসে এত সম্মান করে? দেশের মানুষকে সন্তানের মতো দেখে কাব্যের মারফতে তাদের মানুষ করার ব্রত নিয়েছিল বলেই কিশোর কবিকে জাতি পিতার আসনে বসিয়েছে।

এটাই আসল কথা। দেশের লোকের সস্তা খাতিরকে লেখক-শিল্পী খাতির করেন না। দরকার হলে দেশের মানুষকে কান মলে শাসন করার অধিকার খাটাতে লেখক-শিল্পীর দ্বিধা বা ভয় হবার কথা নয়। তেতো ওষুধ খেতে পছন্দ করবে না বলে বাপ কি রুগ্ন শিশুকে ওষুধ খাওয়ানো থেকে বিরত থাকেন?

নানাভাবে মন ভুলিয়ে ধমক দিয়ে শাসন করে ওষুধ খাওয়ান।

কাজেই বাংলার লেখকদের "অভিজ্ঞতার শিক্ষা" "মনস্তত্ত্বগত" কারণে তাঁদের সৃষ্টিতে কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব ঘটা প্রভৃতি বিচার অচ্যুতবাবু যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে করেছেন তা সঠিক ধরে নিলে বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশান্বিত হবার বদলে চরম হতাশা জাগাই স্বাভাবিক।

অচ্যুতবাবুর আঙ্গিকের বিচারও ত্রুটিপূর্ণ।

'ইতিকথার পরের কথা'র চরিত্রগুলি 'আধা-নিউরোটিক কৃষক' আর 'পুরো নিউরোটিক জমিদার-নন্দন' হয়ে দাঁড়িয়েছে কিনা—লেখকের নীরব থাকার নীতি অনুসরণ করেই যে আমি এ বিষয়ে কিছু বলবো না তা নয়, বলবার ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু আঙ্গিক বিচারের যে নীতি অচ্যুতবাবু এখানে তুলে ধরেছেন আমি সেটা ভুল মনে করি।

অচ্যুতবাবু বলেছেন, "বৃহত্তর জীবন-সত্যকে রূপায়িত করতে হলে জীবনের খণ্ড খণ্ড অংশ একত্র করলেই চলবে না।·· ···খণ্ডগুলিকে সমন্বিত করে এমন একটা সামগ্রিক রূপ দিতে হবে যাতে এই সামগ্রিকতা যে কোন খণ্ড অংশকে অতিক্রম করে যাবে।"

তাঁর মতে, জীবনের খণ্ডিত অংশগুলি সমন্বিত করে তাতে এই সামগ্রিকতা না-দেওয়ার কৌশল কেবল সমাজের সংকীর্ণ ক্ষয়িষ্ণু একটা অংশের জীবন-সত্যকে (বাংলার মধ্যবিত্ত) রূপ দেওয়ার পক্ষে 'অদ্ভুত উপযোগী'। জীবনের খণ্ড খণ্ড অংশ একত্রিত করে এই সামগ্রিকতা এনে দেওয়া বা না দেওয়াটা কি ব্যাপার? আমি তো জানি জীবনের খণ্ড খণ্ড অংশ বাছাই করে শিল্পকলা খাটিয়ে সাজিয়ে গেঁথে দেওয়াই গল্প উপন্যাস লেখার আঙ্গিকের মোট কথা—তারপর আর কি করার থাকে লেখকের?

জীবনের খণ্ডিত অংশগুলি লেখকের বেছে নেবার কথা খেয়াল করেননি বলে অচ্যুতবাবু বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে গিয়েছেন। সমাজের খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন অংশের জীবন-সত্যই হোক, আর সমাজের বৃহত্তর জীবন-সত্যই হোক, সে সত্য কতটুকু রূপায়িত হবে তা নির্ভর করবে জীবনের খণ্ডগুলি বেছে নেওয়ার উপর। এই বেছে নেওয়ার কাজটা ঠিকমতো না হলে হাজার শিল্পকৌশল প্রয়োগ করেও লেখক সত্যকে রূপ দিতে পারবেন না।

জীবনের খণ্ডাংশগুলি স্বভাবতঃই বাছাই হবে লেখকের চেতনা ও অভিজ্ঞতা অর্থাৎ জীবন-দর্শন অনুসারে। জীবন-সত্যকে রূপায়িত করার জন্য তাই প্রধান কথা হলো লেখকের ওই জীবন-সত্যটা ধরতে পারা।

শুধু বুদ্ধি দিয়ে জানা নয় যে, সমাজজীবনে ভাঙনের সঙ্গে সঙ্গে পুনর্গঠনের কাজও চলছে—ভাঙাগড়ার প্রক্রিয়াটা কি ভাবে ঘঠছে কেন ঘঠছে নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে জানা, চেতনায় উপলব্ধি করা।

মহাত্মা গান্ধীকে তাঁর খণ্ডগুলির যোগফল হিসাবে দেখলে অবশ্যই তাঁকে নিউরোটিক মনে হবে, কিন্তু গান্ধীচরিত্র ঠিকমতো ফোটাতে গেলে বাছাই করে নিতে হবে তাঁরই বিশেষ কতগুলি খণ্ড। কোন খণ্ডগুলি বেছে গান্ধীচরিত্রকে কেমন রূপ দেবেন তা নির্ভর করবে কে কোন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গান্ধীজিকে দেখে কোন খণ্ডগুলি বাছাই করবেন। একজন মার্ক্সবাদী এবং একজন অন্ধ গান্ধী-ভক্তের খণ্ড বাছাই করা স্বভাবতঃই একরকম হবে না এবং দু'জনের আঁকা গান্ধীচরিত্রও একরকম হবে না।

প্রিয়-বিরহকাতুরা রমণীর চব্বিশ ঘণ্টার চিন্তার তালিকা পড়লে হাসি পাবে সত্যই। কিন্তু এই উদাহরণটি তুলে ধরার মধ্যেও জীবন সত্য রূপায়ণে আঙ্গিকের ভূমিকা সম্পর্কে অচ্যুতবাবুর বিভ্রান্তি ধরা পড়ে। বিরহকাতুরার চব্বিশ ঘণ্টার চিন্তার মধ্য থেকে বাছাই করা চিন্তা নিয়ে ওস্তাদ শিল্পী কেন অনবদ্য সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারবেন না, যা পড়লে হাসি পাওয়ার বদলে অভিভূত করে দেবে? বিরহকাতুরার মনে কি প্রিয়তম ও অন্যান্য মানুষের সঙ্গে বিচিত্র বাস্তব জীবন সংগ্রামের স্মৃতি এবং আরও অনেক বাস্তব চিন্তা রেখাপাত করে না? কেউ যদি বিরহকাতুরার কেবল ছাঁকা বিরহ-বেদনা ঘটিত চিন্তা বেছে নিয়ে ব্যথার কাব্য রচনা করেন সেটা তাঁর জীবন-দর্শনের বৈশিষ্ট্যের জন্যই করবেন।

বন্ধুবর গোপাল হালদারের সাহিত্য সম্পর্কে অচ্যুতবাবু বলেছেন: 'গোপাল-বাবুর আঙ্গিকে তাঁর বুদ্ধিজীবী সত্তার স্বাক্ষর রয়েছে।' তার ফলে তাঁর উপন্যাসে কি ঘটেছে তাও সুন্দরভাবে উপস্থিত করেছেন এবং গোপালবাবুর উপন্যাসের চরিত্রগুলি কেন মেটাফিসিক্যাল, কেন তারা বদলায় না, কেন "কাহিনীর পর কাহিনী যোগ হয়ে যায় কিন্তু তাতে জীবনের কোন অন্ধকার কোণে নতুন আলোকপাত ঘটে না"—এর কারণ অচ্যুতবাবু বলেছেন—এটাই তাঁর

"আঙ্গিকের বিশেষত্ব"।

অচ্যুতবাবু অত্যন্ত স্পষ্টভাবে অনুযোগও দিয়েছেন যে, গোপালবাবু তাঁর বই-এ একটিমাত্র কৃষক চরিত্রও আনতে সাহস পাননি।

অথচ অচ্যুতবাবুর কাছে এ সত্য স্পষ্ট নয় যে, বুদ্ধিজীবী সত্তার জন্যই গোপাল-বাবুকে জীবনের এমন অংশগুলি বেছে নিতে হয় যাতে তিনি তাঁর ডায়ালেকটিক চিন্তাধারাকে কাহিনীর পর কাহিনী সাজিয়ে প্রকাশ করতে পারেন।

আঙ্গিকের ভূমিকা সম্পর্কে বিভ্রান্তির জন্যই বর্তমান প্রগতি সাহিত্য সম্পর্কে অচ্যুতবাবু "আশান্বিত" হবার কারণে খুঁজে পাচ্ছেন না। প্রবন্ধের গোড়াতেই তিনি প্রগতিশীল শিল্পের স্থূল সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে সমাজ-জবনের বাস্তবতার উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সাহিত্যের বাস্তবতা বিচার করতে নেমে ওই বাস্তবতাকে পিছনে ঠেলে দিয়েছেন। সাহিত্যের বাস্তবতার বিচার অর্থাৎ সমাজ-জীবনের বাস্তবতায় যে জীবন-সত্য সাহিত্যে তা কিভাবে কতটুকু রূপায়িত হচ্ছে বা হচ্ছে না তার বিচার যে সর্বদা সমাজ-জীবনের বাস্তবতার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে করা দরকার এটা খেয়াল না রাখায় অচ্যুতবাবুর বিচার বিশ্লেষণ অবৈজ্ঞানিক হয়ে গিয়েছে।

এদিকে আবার সঠিক জীবন-দর্শনের গুরুত্ব সম্পর্কে অচ্যুতবাবু মোটেই অচেতন নন। বর্তমান বাংলা প্রগতি সাহিত্যের স্বরূপ এবং লেখকদের সমস্যা যেমন নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন তেমনি সুন্দর ও সঠিকভাবে এই সমস্যার সমাধানও বাৎলিয়েছেন: আরও বেশি করে জীবনকে জানা, আরও একান্তভাবে নিবিড়ভাবে জীবনের সান্নিধ্যে যাওয়া ও তার গতি-প্রকৃতির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উপলব্ধি করা। আঙ্গিকের জন্যও তিনি পূর্বসূরীদের সাহিত্য পড়তে বসে সঠিকভাবেই মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, সে আঙ্গিকে আজকের লেখকের কাজ হবে না।

অচ্যুতবাবু লিখেছেন, "আসল কথা হলো, প্রগতিশীল লেখকদের আজকে এমন একটা সমস্যার সামনে পড়তে হয়েছে যা কোন কালের কোন লেখকের উপলব্ধি করতে হয়নি। লেখকেরা চিরদিনই তথ্যের থেকে তত্ত্বের দিকে যান; আজকের লেখকদের পরিক্রমণের পথ হলো তত্ত্বের থেকে তথ্যের দিকে। ফলে তথ্যের মধ্যে তত্ত্বকে নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সীমায় আবিষ্কার করতে না পারার জন্যে লেখকেরা একবার স্থূলভাবে প্রচারধর্মী হয়ে পড়ছেন, আর একবার সূক্ষ্মভাবে আঙ্গিক-সর্বস্ব হয়ে পড়ছেন। এর একমাত্র সমাধান হলো আরও বেশী করে

জীবনকে জানা, আরও একান্তভাবে নিবিড়ভাবে জীবনের সান্নিধ্যে যাওয়া ও তার গতিপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উপলব্ধি করা। আঙ্গিকের জন্য পূর্বসূরীদের সাহিত্য পড়তে হবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে সে-আঙ্গিকে লেখকের কাজ হবে না। আর একটি কথা, শ্রমিক-কৃষকের জীবনের পটভূমিকা না হলে প্রগতিশীল সাহিত্য হয় না, এ ধারণা ভুল। জীবনের যে কোন একটি ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে রোগ এবং রোগারোগ্যের প্রচেষ্টা মিলিয়ে আধুনিক সমাজব্যবস্থার যে-সমস্যা তার প্রতিফলন আবিষ্কার করা যায়।"

এত অল্প কথায় অচ্যুতবাবু সমকালীন বাস্তবতার জন্য লেখকদের সমস্যা কি ও তার সমাধান কি তা ধরে দিয়ে এবং সমগ্র প্রবন্ধটির বিচার-বিশ্লেষণে দৃষ্টির গভীরতার পরিচয় দিয়েও আসল বিচারে কেন গোলমাল করে ফেললেন ভেবে প্রথমটা আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর আবিষ্কার করলাম যে, অনেক আনুষঙ্গিক সত্যকে সঠিকভাবে জেনেও সেইগুলিকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রয়োগ করতে না পারায় এই বিভ্রাট ঘটেছে।

তিনি বলছেন "আসল কথা হলো : প্রগতিশীল লেখকদের আজকে এমন একটা সমস্যার সামনে পড়তে হয়েছে যা কোন কালের কোন লেখককে উপলব্ধি করতে হয়নি।" কিন্তু আজকের লেখকদের সমস্যাটা বিশেষ কেন—আজকের বাস্তবতা বিশেষ বলেই তো? সেইজন্যই আজ লেখকের প্রয়োজন জীবনের ঐতিহাসিক গতি-প্রকৃতির মূল নিয়ম জানার সঙ্গে বাস্তব জীবনকে ঘনিষ্ঠভাবে জানা এবং তার গতি-প্রকৃতির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উপলব্ধি করা।

বেশ কথা। আজ বাংলার সমাজ-জীবনের ভাঙাগড়ার বাস্তবতা কি, বাঙালীর জীবন-সত্যটা কি? কি স্বরূপ জীবনের অন্তর্নিহিত গতি প্রকৃতির?

অচ্যুতবাবু সমাজ জীবনের বাস্তবতা মোটামুটি দেখিয়েছেন—বর্তমান সমাজ এমন একটা যুগ পরিবর্তনের আবর্তসংকুল সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে যে, তার আভ্যন্তরীণ শ্রেণীদ্বন্দ্ব একটা চরম রূপ নিয়ে উপস্থিত। শোষিতশ্রেণী সমূহ একটা শ্বাসরোধকারী সামাজিক অবস্থানের থেকে বেরিয়ে আসার জন্য প্রতিনিয়ত প্রকাশ্যে বা পরোক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বীশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত। আজকের এই সামাজিক সত্যটি জীবনের যে-কোন স্তরের যে-কোন মানুষের সত্তার গভীরে অনুপ্রবিষ্ট। এই অত্যন্ত সাদা-মাটা সত্যটিকে স্বীকৃতি দান বর্তমান প্রগতি সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ।

'শোষিতশ্রেণী সমূহের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সংগ্রামের গতি-প্রকৃতি কি তা উপলব্ধি করে প্রগতিশীল লেখকের পক্ষে জীবনের কোন্ খণ্ডিত অংশগুলি বেছে নেওয়া সম্ভব এবং কোন আঙ্গিকে কিভাবে তা কতখানি রূপায়িত করা সম্ভব নির্ভুলভাবে এটা বিচার না করে প্রগতি সাহিত্যের সামগ্রিক গতি-প্রকৃতি ও শিল্পমূল্য সঠিক নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

বাস্তবতাকে অতিক্রম করে মিথ্যা কল্পনার রাজ্যে চলে যাবার সুযোগ ভাববাদী লেখকের আছে, ভাববাদী আদর্শগত জীবন দর্শনকে রূপ দেবার জন্য তিনি যত খুশি কল্পনার রং চাপাতে পারেন। কিন্তু বস্তুবাদী প্রগতিশীল লেখক বাস্তবতাকে ছাড়িয়ে যেতে পারেন না। বস্তুবাদী লেখক অবশ্যই বাস্তবতার রিপোর্টার নন, তিনি শিল্পী—তিনিও কল্পনার রঙে-রসেই তাঁর কাহিনী রূপায়িত করবেন, কিন্তু মিথ্যার সঙ্গে তাঁর কল্পনার কারবার থাকবে না। এই জন্যই তাঁর বাস্তবজীবনের গতি-প্রকৃতি ভালো করে জানা দরকার—তাঁর কল্পনা যাতে বাস্তবতাকে অতিক্রম করে ফাকা আদর্শবাদিতার মিথ্যায় পরিণত না হয়, জীবন-বিরোধী হয়ে না ওঠে।

অচ্যুতবাবু কি জানেন বাংলা প্রগতি-সাহিত্য প্রচারধর্মী হয়েছিল জীবন-বিরোধী মিথ্যা আদর্শবাদিতা থেকে আত্মরক্ষার জন্য? এটা ত্রুটি, বাস্তবজীবনের গতি-প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের অভাবেরই সুস্পষ্ট নিদর্শন কিন্তু মিথ্যাকে তুলে ধরার চেয়ে সাহিত্যে প্রচারধর্মী হওয়া ঢের ভালো—সমাজ ও সাহিত্যের রূপান্তর গ্রহণের বিশেষ স্তরে প্রচারধর্মী হওয়াটাই তাই সাহিত্যের প্রগতি লক্ষণ এবং আশার কথা হয়ে দাঁড়ায়।

এই প্রচারধর্মিতা থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টা ও ব্যাকুলতা তা' সূক্ষ্ম আঙ্গিক—সর্বস্বতার রূপই নিক বা অন্য যে কোন রূপই নিক, সেটাও তখন হয় সাহিত্যে প্রগতি বজায় থাকার লক্ষণ এবং আশার কথা।

বাংলার সমাজ জীবনের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে, শ্রেণী সংগ্রাম ও শ্রেণী সম্পর্কের বর্তমান রূপ এবং ঐতিহাসিক গতি-প্রকৃতির বিচার বিশ্লেষণের পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যের বিচার-বিশ্লেষণ করলে অচ্যুতবাবু দেখতে পেতেন সমগ্র বাংলা সাহিত্যের মধ্যে প্রগতিসাহিত্যের বর্তমান রূপটাই অনিবার্য ছিল এবং এই প্রগতিসাহিত্য সম্পর্কে হতাশার কিছুমাত্র কারণ নেই। বাংলার প্রগতি সাহিত্যের মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে, পথটা দুর্গম ও এলোমেলো হলেও এ সাহিত্য

সামনের দিকেই এগিয়ে চলেছে।

আত্মসন্তুষ্টি মারাত্মক। হতাশ হবার কারণ না থাকলেও চোখ-বোজা আত্মসন্তুষ্টির বিপদ সম্পর্কে সচেতন করার দিক থেকে অচ্যুতবাবুর প্রবন্ধটি মূল্যবান। আমি তাঁকে অভিনন্দন জানাই।

আমিও সেই অনাগতের প্রতিক্ষায় আছি যিনি একদিন মহান সৃষ্টির মধ্যে বাংলা সাহিত্যের নবতম রূপ সার্থকভাবে রূপায়িত করতে পারবেন। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না সেই অনাগত আকাশ থেকে নেমে আসবেন, বাঙালীর জীবন ও সাহিত্যের বাস্তব যাত্রাপথেই তার আবির্ভাব ঘটবে।

উপন্যাসের ধারা

লিখতে শুরু করার আগে শুধু আশা নয়, দৃঢ় প্রতিজ্ঞাও ছিল যে, একদিন আমি লেখক হবো। তবু নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় সাগ্রহে ছাত্র হয়েছিলাম বিজ্ঞানের, অনার্স নিয়েছিলাম অঙ্কশাস্ত্রে। আজ চর্চা নেই সময় আর সুযোগের অভাবে ; কিন্তু বিজ্ঞানকে আজও সমানভাবেই ভালোবাসি।

লিখতে শুরু করেই আমার উপন্যাস লেখার দিকে ঝোঁক পড়লো। কয়েকটি গল্প লেখার পরেই গ্রাম্য এক ডাক্তারকে নিয়ে আরেকটি গল্প ফাঁদতে বসে কল্পনায় ভিড় করে এল 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র উপকরণ এবং কয়েকদিনে একটি গল্প লিখে ফেলার বদলে দীর্ঘদিন ধরে লিখলাম এই দীর্ঘ উপন্যাসটি—এ ব্যাপারের সঙ্গে সাধ করে বিজ্ঞানের ছাত্র হওয়ার সম্পর্ক অনেকদিন পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত থেকে যায়। মোটামুটি একটা ধারণা নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলাম যে, সাহিত্যিকেরও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা প্রয়োজন, বিশেষ করে বর্তমান যুগে, কারণ তাতে অধ্যাত্মবাদ ও ভাববাদের অনেক চোরা মোহের স্বরূপ চিনে সেগুলি কাটিয়ে ওঠা সহজ হয়।

পরে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতাকে ভালো করে তলিয়ে বুঝে 'কেন লিখি ?' তত্ত্বগত দিকটার সঙ্গে মিলিয়ে নেবার প্রয়োজন জরুরী হয়ে উঠলো সমাজ ও সাহিত্যের সম্পর্ক নিয়ে নানা এলোমেলো থিয়োরি ও তার ব্যাখ্যার আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে। তখন অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে একটা আশ্চর্য কথাও স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে, লিখতে আরম্ভ করার আগেও বলে দেওয়া সম্ভব ছিল—যদি কোনদিন আমি লিখি ঝোঁকটা আমার পড়বে উপন্যাস লেখার দিকে।

আমার বিজ্ঞান-প্রীতি, জাত বৈজ্ঞানিকের কেন-ধর্মী জীবন-জিজ্ঞাসা, ছাত্রবয়সেই লেখকের দায়িত্বকে অবিশ্বাস্য গুরুত্ব দিয়ে ছিনিমিনি লেখা থেকে বিরত থাকা প্রভৃতি কতগুলি লক্ষণে ছিল সুস্পষ্ট নির্দেশ যে, সাধ করলে কবি হয় তো আমি হতেও পারি ; কিন্তু ঔপন্যাসিক হওয়াটাই আমার পক্ষে হবে উচিত ও স্বাভাবিক !

কথাটা কী দাঁড় করাচ্ছি ? আনুষ্ঠানিকভাবে বিজ্ঞানের ছাত্র না হলে, কিঞ্চিৎ বিজ্ঞান চর্চা না করলে, উপন্যাস লেখা যায় না ? আজ পর্যন্ত যাঁরা উপন্যাস লিখেছেন তাঁরা সকলেই—?

যেহেতু বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও আমি দু'চারখানা উপন্যাস লিখেছি সেই হেতু ওটাই হবে উপন্যাস লেখার একটা সর্ত—যেটুকু বলেছি তার এরকম যান্ত্রিক ও হাস্যকর তাৎপর্য কারো কারো মনে আসা আশ্চর্য নয়। কথাটা এখানেই পরিষ্কার করা দরকার। সরাসরি বিজ্ঞানের কিছু শিক্ষা পাওয়া নয়, উপন্যাস লেখার জন্য দরকার খানিকটা বৈজ্ঞানিক বিচারবোধ। বিজ্ঞান-শাস্ত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে কিছুমাত্র পরিচয় না থাকলেও এ বিচারবোধ মানুষের আয়ত্ত হতে পারে। সমাজ ও জীবনে বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ প্রভাব ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। এই প্রভাবের জন্য সাধারণ অশিক্ষিত মানুষের চিন্তাজগতে, তার দৃষ্টিভঙ্গিতে বৈজ্ঞানিকের চিন্তাপদ্ধতির, বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গির ছাপ পড়েছে,—যত কম আর অস্পষ্টই সেটা হোক। বিজ্ঞানচর্চা না করেও এবং সম্পূর্ণরূপে নিজের অজ্ঞাতসারে হলেও, ঔপন্যাসিক খানিকটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করবেন তাতে বিস্ময়ের কিছুই নেই।

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিজ্ঞান-প্রভাবিত মন উপন্যাস লেখার জন্য অপরিহার্য-রূপে প্রয়োজন। পৃথিবীর যে কোন দেশের যে কোন যুগের যে কোন উপন্যাস ধরে বিশ্লেষণ করলে লেখকের এই বৈশিষ্ট্য, বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে এই বিশেষ ধরনের মানসিক সমতা খুঁজে পাওয়া যাবে।

সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্পর্কহীন নয়। সমাজের মাধ্যমে সে সম্পর্কের সূত্রগুলি পাওয়া যায়। সাহিত্যের তথাকথিত সবচেয়ে অবৈজ্ঞানিক অঙ্গ কবিতার গতি-প্রকৃতি বিজ্ঞানের সমকালীন বিকাশের সাথে কি ভাবে জড়িত তা খুঁজে বার করা কষ্টসাধ্য কাজ, কিন্তু উপন্যাসের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক অনেক বেশি স্পষ্ট ও ঘনিষ্ঠ। সাহিত্যের ক্ষেত্রে উপন্যাস হলো সভ্যতার অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ অবদান।

বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের একটা স্তর পর্যন্ত সাহিত্য ছিল, উপন্যাস ছিল না। বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি সমাজ জীবন ও মানুষের চেতনায় বিশেষ পরিবর্তন ঘটানোর ফলেই সাহিত্যে উপন্যাসের আঙ্গিক প্রয়োজনীয় এবং আদরণীয় হয়।

কাব্য ও নাটকের আঙ্গিকে ভাববাদ অবাধে আত্মপ্রকাশ করেছে। কার্য ও কারণকে রাখা গিয়েছে ভাববাদেরই স্তরে, মানে খোঁজা সম্ভব হয়েছে জীবন ও জগতের। অধ্যাত্মবাদকে টেনে আনা গিয়েছে যতখানি প্রয়োজন। কিন্তু বিজ্ঞান তো ছেড়ে কথা কয় না। বিজ্ঞানকে যে যুগে যাই ভেবে থাকুক মানুষ, বিজ্ঞানের

ভিত্তি চিরদিনই স্বীকৃত বা অস্বীকৃত বস্তুবাদ। যে বিশ্বাস নিয়েই বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও গবেষণা করে থাকুন, বস্তুজগতে মানবতার বাস্তব অগ্রগতিই চিরদিন তাঁর একমাত্র লক্ষ্য।

নিত্য নতুন আবিষ্কারে বিজ্ঞান বদলে দিয়ে চলে সমাজ ও জীবনকে, বদলে দিয়ে চলে মানুষের চেতনাকে। এই চেতনায় জাগে সাহিত্যের কাছে নতুন চাহিদা এবং এই চেতনা প্রতিফলিত হয় নতুন আঙ্গিকে উপন্যাস রচনায়।

গদ্য ভাষায় সাহিত্যে এল বাস্তব জীবনের পরিবেশ, চরিত্র ও ঘটনা; নতুন পদ্ধতিতে মানুষের জীবন বোধের আকাঙ্ক্ষা মেটাতে আরম্ভ করলো উপন্যাস।

বিজ্ঞানকে, মানুষের বস্তুবাদী চেতনার ক্রমবিকাশকে, একেবারে আর উপেক্ষা করতে না পেরে সাহিত্যকে নতুন একটি বিভাগ খুলতে হলো: অধ্যাত্মবাদের জের এবং ভাববাদ আত্মরক্ষার খাতিরে যুক্তিবাদের সাহায্যে বাস্তবতাকে কাজে লাগিয়ে শুরু করলো উপন্যাসের ধারা।

যুক্তিবাদ খাঁটি দর্শনে বিশেষ খাতির পায়নি—ইতিহাস দর্শনকে যে মূল ভাগে ভাগ করেছে (অধ্যাত্মবাদ, ভাববাদ ও বস্তুবাদ) তারই নানারকম আল্‌তো বাদ হিসাবে অনেক শাখাপ্রশাখা গজিয়েছে, যুক্তিবাদ তারই একটা।

যুক্তিবাদ কারণ দেখায় না, যুক্তি দেয়। 'এরকম হওয়া উচিত' এটাও যুক্তিবাদের যুক্তি।

দর্শন ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যুক্তিবাদের অবদান খুবই সামান্য, সাহিত্যে উপন্যাসের নব-বিধান যেন যুক্তিবাদেরই জয়গান—আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হয়। আসলে সেটা বস্তুবাদেরই অগ্রগতি। অধ্যাত্মবাদ, ভাববাদ এবং বস্তুবাদ কোনটাই সমসাময়িক সুবিধাবাদের নীতি মানেনি। মানবতার বিকাশের মূলনীতি ক্ষয়বৃদ্ধি এগোনো পিছানোর বাস্তব কার্যকরী নীতিকেই মেনে এসেছে।

বাদ নিয়ে বাদানুবাদের প্রবন্ধ লিখতে চাইনি। এটুকু ভূমিকা মাত্র। আমার অভিজ্ঞতায় এটুকু যাচাই হয়ে গিয়েছে গোড়াতেই। খুব সহজ করে বলতে গেলে বলা যায় যে, লেখক যে ভাব আর ভাবনাই সাজিয়ে দিন উপন্যাসে, ভিত্‌টা তাঁকে গাঁথতেই হবে খাঁটি বাস্তবতায়। যতই খাপছাড়া উদ্ভট হোক উপন্যাসেরই চরিত্র, মাটির পৃথিবীর মানুষ হয়ে তাকে খাপছাড়া উদ্ভট হতে হবে। যত অসম্ভব ঘটনাই ঘটুক উপন্যাসে, সম্ভাব্য ঘটনাকে আশ্রয় করেই তাকে কাল্পনিক অসম্ভবতার স্তরে

উঠতে হবে। উপন্যাসেও কাব্য সৃষ্টি করা যায়, কল্পনা পার হয়ে যেতে পারে বাস্তবতার সীমা, গড়ে উঠতে পারে এমন এক মানস জগৎ যার অস্তিত্ব লেখকের মন ছাড়া কোথাও নেই ; কিন্তু বাস্তব মানুষ বাস্তব জীবন বাস্তব পরিবেশ অবলম্বন করেই এসব ঘটাতে হবে।

কবি-বন্ধুর মনে কথা জাগতো, কথায় তিনি তা প্রকাশ করে দেখতেন। কবিতা লিখতেন কিম্বা লিখতেন ছোটগল্পরূপী গদ্য-কবিতা। আমার মনেও কথা জাগতো, কথা তুলে রাখতাম মনেরই তাকে। বাস্তবতার আশ্রয় ছাড়া আমার কথা দাঁড়াবে কিসে? আরও বয়স বাড়ুক, অভিজ্ঞতা হোক, বাস্তবতাকে আরও ভালো করে জেনে চিনে আমার কথার ভিত্ গাঁথতে শিখি, তারপর মনের কথাকে বাইরে আনবো। একদিন উপন্যাস লিখবো ভাবতাম কি? মোটেই না। সোজা-সুজি ভাবতাম যে, লিখতে শুরু করার আগে আমাকে আরও পাকতে হবে? উপন্যাস লিখতেই যে এই পাকামি দরকার হয় সেটা জেনেছি অনেক পরে।

প্রথম লিখলাম একটি গল্প—তাও লেখার খাতিরে নয়, কয়েকটি ছাত্রবন্ধুর সঙ্গে তর্কের ফলে সাধারণ একটা বাস্তব সত্যকে হাতে নাতে প্রমাণ করার জন্য। এ ঘটনার মধ্যেও প্রকাশ পেয়েছিল আমার ঔপন্যাসিকের ধাত,—সাধারণ যুক্তিবোধ, বাস্তব-বোধ। তর্কটা ছিল মাসিকের সম্পাদকমশাইদের অবিবেচনা, উদাসীনতা, পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি দোষ নিয়ে। সম্পাদকেরা কিরকম জীব কিছুই জানতাম না, কিন্তু ভালো একটা লেখা হাতে পেলেও শুধু লেখকের নাম নেই বলেই লেখাটা তাঁরা বাতিল করে দিয়ে থাকেন, এটা কোনমতেই মানতে পারিনি। কোন যুক্তিই খুঁজে পাইনি সম্পাদকদের এই অর্থহীন অদ্ভুত আচরণের। ভালো লেখার কদর নেই কদর আছে শুধু নাম-করা লেখকের এ তো স্রেফ পরস্পরবিরোধী কথা। যদি ধরা যায় যে, ভালো গল্প লেখা অতি সহজ, গাদাগাদা ভালো গল্প তৈরি হওয়ায় সম্পাদকের কাছে তার বিশেষ কোন চাহিদা নেই—তা হলে নাম-করা লেখকের নামেরও কোন মানেই থাকে না। এত সোজা কাজ করার জন্য নাম হয় কিসে?

ভালো লেখা অন্যান্য কারণে সম্পাদকীয় অবজ্ঞা লাভ করতে পারে, লেখক নতুন বলে কখনোই নয়। এই সত্যটা প্রমাণ করার জন্য নিজে একটি গল্প লিখেছিলাম।

সাহিত্যজগতের সঙ্গে কোনরকম যোগাযোগ না থাকলেও উপলব্ধি করেছিলাম যে, সাহিত্যের জগৎও মানুষেরই জগৎ, সংসারে সাধারণ নিয়মকানুন সাহিত্যের জগতে বিপরীত হয়ে যেতে পারে না। মোটামুটি ভালো এক গল্প লিখলে যে কোন সম্পাদক যে সেটা নিশ্চয় সাগ্রহে ছাপবেন এ বিষয়ে এমনই দৃঢ় ছিল আমার বিশ্বাস যে তখনকার সেরা তিনটি মাসিকের যে কোন একটিতে ছ'মাসের মধ্যে আমার গল্প বার করা নিয়ে বাজী রাখতে দ্বিধা জাগেনি। কবি মনের ঝোঁক নয়, ঔপন্যাসিকের প্রতীতি—যা আসে বাস্তব হিসাব নিকাশ থেকে।

গল্পটা লেখার মধ্যে ছিল এই বাস্তব বিচারবিবেচনা, কি হয় আর কি না হয় তার হিসাব। এর মধ্যেও সন্ধান পাওয়া যাবে যে, ভবিষ্যৎ ঔপন্যাসিক একদিকে কিরকম নির্বিকার নিরপেক্ষভাবে বাস্তবতার সমগ্রতাকে ধরবার চেষ্টা করেন, অন্যদিকে তারই মধ্যে বজায় রেখে চলেন আবেগ অনুভূতির সততা—মোহহীন মমতাহীন বিশ্লেষণে সত্যকে যাচাই করে নিয়ে তার মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করেন (যার যেমন বিশ্লেষণ ও যার যেমন প্রাণ!)। প্রথমে হিসাব করেছিলাম কি ধরনের গল্প লিখবো। সবদিক দিয়ে নতুন ধরনের নিশ্চয় নয়। একেবারে আনাড়ি, হঠাৎ একদিন কলম ধরে নতুন টেকনিকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নতুন বিষয়ের গল্প খাড়া করা সম্ভবও নয়, বেশি 'নতুনত্ব' সম্পাদকের পছন্দ নাও হতে পারে। ভেবে-চিন্তে স্থির করেছিলাম যে, রোমান্টিক গল্প লেখাই সবচেয়ে সহজ, এরকম গল্প জমে গেলে সম্পাদকেরও চট করে পছন্দ হয়ে যাবে।

আদর্শ অপার্থিব প্রেমের জমকালো গল্প ফাঁদতে হবে। কিন্তু সমস্তটাই আজগুবি কল্পনা হলে তো গল্প জমবে না, বাস্তবের ভিত্তিও থাকা চাই গল্পের। কি হবে এই ভিত্তি? কাহিনী যদি দাঁড় করাই প্রেমাত্মক অবাস্তব কল্পনার, গল্পের চরিত্র-গুলিকে করতে হবে বাস্তব রক্ত-মাংসের মানুষ।

অতিজানা অতিচেনা মানুষকে তাই করেছিলাম 'অতসী মামী'র নায়ক নায়িকা। সত্যই চমৎকার বাঁশি বাজাতেন চেনা মানুষটি, বেশি বাজালে মাঝে মাঝে সত্যই তাঁর গলা দিয়ে রক্ত পড়তো এবং সত্যই তিনি ছিলেন আত্মভোলা খেয়ালী প্রকৃতির মানুষ। ভদ্রলোকের বাঁশি বাজানো সত্যই অপছন্দ করতেন তাঁর স্ত্রী, মাঝে মাঝে কেঁদে কেটে অনর্থ করতেন।

শুধু এটুকু নয়। সত্যই দু'জনে তাঁরা একেবারে মশগুল ছিলেন পরস্পরকে

নিয়ে। এঁদের দেখেছিলাম খুবই অল্প বয়সে, সেই বয়সেও শুধু এঁদের কথা বলা, চোখে চোখে চাওয়া দেখে টের পেতাম অন্যান্য অনেক জোড়া চেনা স্বামী-স্ত্রীর চেয়ে এঁদের মধ্যে বাঁধনটা ঢের বেশি জোরালো, সাধারণ রোগে ভুগে ভদ্রলোক মারা গেলে কিছুকালের জন্য তাঁর স্ত্রী পাগল হয়ে গিয়েছিলেন।

অতসী মামী লিখবার সময় এঁদের দু'জনকে আগাগোড়া মানস চোখের সামনে রেখেছিলাম। শুধু তাই নয়। সোজাসুজি কাহিনীটা লিখে না গিয়ে নিজে আমি অল্পবয়সী একটি ছেলে হয়ে গল্পের মধ্যে ঢুকে তার মুখ দিয়ে গল্পটা বলেছিলাম।

আমার এই প্রথম গল্পের কাহিনী হাস্যকর রকমের রোমান্টিক কল্পনা। আজও যখন ট্রেন দুর্ঘটনার রাত্রে প্রতিবছর অতসী মামীর রেললাইনের ধারে নির্জন মাঠে একাকিনী সারা রাত মৃত প্রিয়ের সঙ্গ অনুভব করতে যাওয়ার কথা ভাবি, আমার নিজেরই হাসি পায়। এমনি ভাবতে গেলে হাসি পায়, কিন্তু আজও গল্পটি প্রথম থেকে পড়ে গেলে আর মনে মনেও হাসবার সাধ্য হয় না।

কারণ, কাহিনী রূপকথা হলেও নায়ক-নায়িকা জীবন্ত মানুষ, উদ্ভটভাবে হলেও কাহিনীতে প্রতিফলিত হয়েছে মাটির পৃথিবীর দুটি মানুষের বাস্তব প্রেম।

আমার এই আদি গল্পের মোট কথা আর সাহিত্যের আদিম উপন্যাসের মোট কথা একই—কল্পনার রূপায়নের জন্য বাস্তবকে আশ্রয় করা। উপন্যাসে বাস্তবের ক্ষেত্র হয় আরও ব্যাপক ও প্রসারিত—অনেক রকমের অনেক মানুষকে তাদের বাস্তব জীবন ও পরিবেশ সমেত টেনে এনে কাহিনী ফাঁদতে হয়। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই কবিতার চেয়ে উপন্যাসে ভাববাদী কল্পনার স্থান বস্তুবাদী কল্পনা অনেক সহজে ও দৃঢ়ভাবে দখল করছে।

সাহিত্যিক ও গুণ্ডামি

সাহিত্যিক শ্রীযুত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর কিছুদিন আগে হাওড়ায় যে বর্বরোচিত আক্রমণ করা হয়, তা এমন এক স্তরের গুণ্ডামির নিদর্শন যে, এই ঘটনা যে-কোন বাঙালীকে লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ করবে। নিজের মত ও বিশ্বাসের জন্যে কোন সাহিত্যিকের সরকারী কৃপাই লাভ হোক বা গুণ্ডার কৃপাই লাভ হোক, সমস্ত সাহিত্যিককে—তথা সমস্ত দেশবাসীকে—সে লাঞ্ছনা-অপমানের অংশীদার হতে হয়; কারণ, এই ধরণের বর্বরতা সাহিত্যিকের মৌলিক অধিকারে কুৎসিত হস্তক্ষেপ—যে অধিকার গ্রহণ বা বর্জন, সাহিত্যিকের একমাত্র বিচারক দেশবাসীই তাকে দান করেছে।

নতুন জীবন

'নতুন জীবন' যৌনতত্ত্ব ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত মাসিক পত্রিকা। অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, এত এত সাহিত্য পত্রিকা থাকতে যৌনতত্ত্ব ও স্বাস্থ্যবিষয়ক পত্রিকার প্রসঙ্গ কি জন্য ?

একটি কারণ এই যে, নতুন জীবনের পৃষ্ঠাগুলি প্রধানতঃ যা দিয়েই ভরা থাক, এটিও সাহিত্য পত্রিকাই। আমার বিবেচনায়, কেবল গল্প কবিতা উপন্যাস বোঝাই অনেক তথাকথিত সাহিত্য পত্রিকার চেয়ে উচ্চাঙ্গেরও বটে। গল্প উপন্যাসও নতুন জীবনে কিছু কিছু স্থান পেয়ে আসছে, যদিও সেগুলি একটু বিশেষ ধরনের, উদ্দেশ্যমূলক।

আর একটি কারণ, নতুন জীবনই একমাত্র পত্রিকা যা বাংলা ভাষায় এই ধরনের সাময়িকপত্রের অভাব মেটাবার আদর্শ সামনে রেখে সক্রিয় প্রচেষ্টা করে আসছে বলা যেতে পারে। যৌন ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্পর্কে প্রথম শ্রেণীর একটি জনপ্রিয় সাময়িক পত্রের অভাব নতুন জীবন মেটাতে পেরেছে বলতে পারি না, কিন্তু ভালো জিনিষ পরিবেশন করে সত্যসত্যই পাঠকের উপকার করার আন্তরিক প্রেরণা এই পর্যায়ের মাসিকগুলির মধ্যে নতুন জীবনেই খুঁজে পেয়েছি। অন্য যে পত্রিকা আমি দেখেছি তাতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির এবং যৌন ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয় জ্ঞান পরিবেশনের ভানটাই শুধু আছে—বিকারগ্রস্ত মানুষের মনে নিষিদ্ধ অশ্লীল বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া করার যে চুলকানি আছে সেটা উস্কে পত্রিকা চালনাই অনেকের আসল উদ্দেশ্য। এমন কি বিজ্ঞানপন্থী পত্রিকা বলে ঘোষিত হলেও যৌনব্যাধি ও স্বাস্থ্যহানির হাতুড়ে ওষুধ আর মাদুলি তাবিজের লোকঠকানো স্পষ্ট জুয়াচুরির বিজ্ঞাপনও এই সমস্ত পত্রিকায় অনায়াসে স্থান পায়।

এবিষয়ে নতুন জীবনের সম্পাদকের নিষ্ঠা প্রশংসনীয়। ফাঁকিবাজি বিজ্ঞাপন —পয়সা যাতে বেশি মেলে তাঁর কাগজে ছাপা হয় না। অতি সহজে আইন বাঁচিয়ে বিজ্ঞাপনের এই ঘৃণিত ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে নতুন জীবন জেহাদ ঘোষণা করেছে। সমস্যাটা সত্যই তুচ্ছ নয়। শুধু লক্ষ লক্ষ রুগ্ন হতাশ মানুষের জীবনটাই এই প্রবঞ্চকের দল ব্যর্থ করে দিচ্ছে না, সমাজের নৈতিক জীবনের ভিত্তিমূলেও

এরা আঘাত হানছে। এ দুর্ভাগা দেশের অন্য বড় বড় সমস্যাগুলির মতো এ সমস্যারও আসল মীমাংসা অবশ্য রাষ্ট্র ও সমাজের সেই পরম সংস্কারে। কিন্তু কাগজে কাগজে এদের বিরুদ্ধে লড়বার, মানুষকে এদের সম্বন্ধে সচেতন করে তুলবার চেষ্টার প্রয়োজনও কম নয়। কুৎসিত বিজ্ঞাপনের আলোচনাও কুৎসিত হবে—এই আশঙ্কাতেই কি বড় বড় পত্রিকায় অন্য সব বিষয়ে আলোচনা থাকলেও এবিষয়ে কথনো আলোচনা হয় না? অথবা অন্য কারণ আছে?

যৌন বিষয়ে কতগুলি প্রাথমিক জ্ঞানের অভাব মানুষের পক্ষে যেমন ক্ষতিকর, অজ্ঞ সংস্কারবদ্ধ ভাবপ্রবণ মানুষকে সেই যৌনজ্ঞান দেবার প্রক্রিয়া ভুল হলে তাও কম বিপজ্জনক হয় না। এ বিষয়ে সম্পাদক ও পরিচালকদের দায়িত্ব গুরুতর। অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী হবার সম্ভাবনাই থাকে বেশি এবং নতুন জীবনের মতো সাধারণের উপযোগী পত্রিকার পক্ষে পাঠক-পাঠিকাকে অল্পবিদ্যার বেশি কিছু দেওয়া চেষ্টা করেও সম্ভব নয়। তাই কঠোর নিষ্ঠা ও অখণ্ড সতর্কতার প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি যাতে লব্ধ জ্ঞানটুকু পাঠক-পাঠিকার সত্যই কাজে লাগে, তাদের বিভ্রান্ত না করে দেয়।

নতুন জীবনের অনেকগুলি লেখায় একটি মূলনীতি অনুসরণ করা হয়েছে বোঝা যায়, যা থেকে এই অপরিহার্য সতর্কতা সম্পর্কে সম্পাদককে সচেতন মনে হয়। লেখকদের দায়িত্বজ্ঞানেরও পরিচয় মেলে। আমাদেরই প্রাত্যহিক ব্যবহারিক জীবনে কার্যকরী জানবার কথায় আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখার প্রচেষ্টা লেখাগুলিতে করা হয়েছে। শিশুর যৌনবোধ নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্য স্পষ্টতঃ এই যে, শিশুর যৌনবোধের অস্তিত্ব ও স্বরূপকে ছেলেমেয়ে মানুষ করার জন্য বড়দের যতখানি মানা ও জানা দরকার ততখানিই মানিয়ে ও জানিয়ে দেওয়া। এ লেখায় অনায়াসে কটিলতা এসে সংশয় ও ভ্রান্তির সৃষ্টি করা চলতো। স্বাভাবিক যৌনশক্তি লাভের কয়েকটি সহজ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ উপায় শিরোনামা দেখে আতঙ্ক হয়েছিল। সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধটি পড়ে খুশ হলাম, লেখককে মনে মনে ধন্যবাদও জানালাম। এত সহজ ও স্পষ্টভাবে কাজের কথা লেখা কঠিন, বিষয়টি নিয়ে ফেনিল আলোচনার প্রলোভন সত্যই প্রবল।

সব লেখায় এ নীতি বজায় থাকেনি। সহজ জানবার কথার সঙ্গে মিশ্রণ ঘটেছে কঠিন তথ্যের। ফলে লেখাগুলি সামঞ্জস্য হারিয়েছে। কেবল সহজ

বোধ্য কথা নিয়েই আলোচনা থাকবে, উঁচুস্তরের জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা থাকবে না, তা বলছি না। কিন্তু একই লেখার খানিকটা সাধারণ পাঠকের বোধগম্য করতে চেয়ে বাকিটা দুর্বোধ্য রেখে পাঠকের মনে বিপর্যয় সৃষ্টি করা অসঙ্গত মনে হয়। কঠিন বিষয়ে লেখায় একটি নিয়ম অবশ্য পালনীয়: যে শ্রেণীর পাঠকের জন্য লেখা রচনাটি যেন সেই এক শ্রেণীর পাঠকেরই উপযোগী হয়। একটি লেখাকে অজ্ঞ ও জ্ঞানী সকলেরই পাঠযোগ্য করতে চাওয়ার মানে হয় না। একই বিষয়ে দুটি লেখা প্রকাশ করাও বরং তার চেয়ে শ্রেয়। তা যদি সম্ভব না হয়, লেখার আগা গোড়া অধিকাংশ পাঠকের জ্ঞান বুদ্ধির অভিজ্ঞতার পক্ষে গ্রহণযোগ্য করা না যায়, তবে প্রবন্ধটি মুষ্টিমেয় সেই ক'জনের জন্যই লেখা হোক—গ্রহণ করার ক্ষমতা যাদের আছে। সাময়িক পত্রে এরকম দু'একটি লেখা থাকা দোষের কিছু নয়। সাধারণ পাঠকের গ্রহণযোগ্য আরও রচনা তো আছে। দুটি একটি দুর্বোধ্য লেখা সাধারণ পাঠকের উপকার ছাড়া অপকার করে না। লেখাটি বুঝবার জন্য কারো কারো মনে ও-বিষয়ে পড়াশোনা করে নিজেকে তৈরি করে নেবার আকাঙ্ক্ষা জন্মে। কিন্তু কিছু বোঝা আর কিছু না-বোঝা তার পক্ষে প্রায়ই ক্ষতিকর। কিন্তু বোঝাটাই অর্থহীন। কোন জ্ঞাতব্য বিষয়েই খানিকটা টুকরা ভেঙে নিয়ে মানুষ আত্মসাৎ করতে পারে না। কিছু বোঝার মানে তার ভুল ধারণার সৃষ্টি হওয়া যে সে সব বুঝেছে। নিজের ধারণা ও কল্পনা দিয়ে সে তারপর সমগ্র ভ্রান্তি গড়ে তুলবে। 'সঙ্কর রক্ত কি সত্যই প্রতিভার সৃষ্টি করে?' লেখাটিতে সামঞ্জস্যের এই অভাব।

বরং 'সঙ্গীতে যৌনতা'র বিষয় বস্তু আরও বেশি সূক্ষ্ম ও গভীর হলেও লেখাটিতে অনেকটা সামঞ্জস্য আছে—যতখানি বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন পাঠককে সামনে ধরে লেখক লিখতে শুধু করেছেন শেষ পর্যন্ত মোটামুটি তাকেই সামনে খাড়া রেখেছেন। 'আধুনিক প্রেমের কবিতা'র সম্বন্ধে এ কথা বলতে পারলাম না। 'পুরুষ কি নারীতে তৃপ্ত?' প্রবন্ধটিতে বহু বিতর্কের উপাদান থাকলেও পাঠকের মনে নতুন ভ্রান্তি সৃষ্টির সহায়তা করে না।

নতুন জীবনের পথ নতুন। সাহিত্য ও সমাজপ্রীতির আদর্শ যত জোরালো হবে পথ ততই প্রশস্ত ও দীর্ঘ হবে।

ভারতের মর্মবাণী

ঐতিহাসিক ঘটনার ধারাবাহিক বাস্তবতাকে আশ্রয় করে ভারতের দেড়শ' দু'শ' বছরের জাতীয় জীবনের মর্মকথাকে মঞ্চের উপর নৃত্য-নাট্যের স্বল্প পরিসরের মধ্যে সার্থক রূপ দেওয়া কি সম্ভব? ভারতীয় গণ-নাট্যসঙ্ঘের কেন্দ্রীয়বাহিনীর অভিনীত 'ভারতের মর্মবাণী' প্রত্যক্ষ করবার আগে এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ ছিল। কারণ, নৃত্য-নাট্য সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে, ভাব ও কল্পনাই এর প্রাণ, ঘটনা তার প্রতীক মাত্র; ভাব ও কল্পনার রূপকধর্মী সাঙ্কেতিক ব্যঞ্জনার উপরেই নৃত্য-নাট্যের সার্থকতা নির্ভর করে। নৃত্য-নাট্যের সরলতা, স্পষ্টতা ও বলিষ্ঠতা আমাদের কাছে স্থুলতার সামিল। আমাদের ধারণা এই যে, নৃত্যগীত সমন্বিত প্রতীক-নাট্যে এই তিনটি গুণের সমাবেশ ঘটলে ভাবের গভীরতা ব্যাহত হয় এবং অবদানের সমগ্রতা রক্ষা করা যায় না। 'তাসের দেশ' ও সাধারণ 'রামলীলা, অভিনয়ের পার্থক্য মনে রাখলে এই সিদ্ধান্তে আসাই স্বাভাবিক। এ কথা খুবই সত্য যে, 'তাসের দেশ'-এর টেকনিক অবলম্বন করলে ঐতিহাসিক ঘটনাশ্রয়ী ধারাবাহিকতার কাঠামো বর্জন করতে হয়, সময়-নিরপেক্ষ সমগ্র ভাব-সংঘাতের চুম্বক ভিত্তি করে, তাকেই রূপ দেবার চেষ্টা করতে হয়। অপরপক্ষে, 'রামলীলা'র টেকনিক নিলে ঘটনা সাজিয়ে সাজিয়ে গড়ে তুলতে হয় বিস্তৃত কাহিনী, ঘটনার তাৎপর্য গেঁথে গেঁথে সম্পূর্ণতা দিতে হয় মূল ভাবধারাকে। এক্ষেত্রে ঘটনাই সর্বস্ব, কাজেই প্রত্যেকটি ঘটনাকে দিতে হয় কলাসম্মত গঠন ও রূপ। নৃত্য-নাট্য আবার বেশি দীর্ঘ হলে জমে না।

এদিক দিয়ে বিচার করলে তবেই ঠিকমতো উপলব্ধি করা যায়, 'ভারতের মর্মবাণী' নৃত্য-নাট্যটির পরিকল্পনা ও অভিনয় ভারতীয় গণ-নাট্যসঙ্ঘের কত বড় কৃতিত্বের পরিচয়। ইংরেজের এদেশে পদার্পণের সময় থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত ভারতের জাতীয় জীবনের ইতিহাসকে উচ্চাঙ্গের নৃত্য-নাট্যে রূপায়িত করবার একমাত্র যে টেকনিক, এঁরা সেটি খুঁজে বার করে কাজে লাগিয়েছেন; যার দ্বারা নৃত্য-নাট্যে, ঘটনার বাস্তব নির্দেশ ও ভাব-সংঘাতের রূপকধর্মী অভিব্যক্তির সমন্বয় ঘটানো সম্ভব হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোক-নৃত্য, পল্লীগীতি প্রভৃতির

সরলতা, স্পষ্টতা ও বলিষ্ঠতা এঁরা এদের নৃত্য-নাট্যে সঞ্চারিত করেছেন। সব রকম বাহুল্য, জটিলতা ও আড়ম্বর বর্জন করা হয়েছে। সুর ও ধ্বনি সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করা হয়েছে সাধারণ কয়েকটি যন্ত্র।

পল্লী-চারণের গাথা, লোক-নৃত্য ও লোক-সঙ্গীতের ছন্দ সুর এবং ধ্বনি, ভঙ্গি আলোকপাত ও অপূর্ব অভিনয়-নৈপুণ্যের সমন্বয়ে 'ভারতের মর্মবাণী' হয়েছে মর্মস্পর্শী। বুদ্ধিবিলাসী থেকে সাধারণ দর্শক, সকলের কাছেই এর আবেদন সমান বলিষ্ঠ। আত্মকলহের সুযোগে এদেশে ইংরাজের প্রতিষ্ঠালাভ, দারিদ্র্য, জমিদারের অত্যাচার, যন্ত্রযুগ, রেলপথ, কারখানা, বণিকের শোষণ, যুদ্ধ, নতুন দুর্দশা, জাতীয় নেতাদের কারাবাস, অনৈক্য, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, আমলাতন্ত্রের আশ্রয়পুষ্ট মজুতদার ও অতিলোভী ব্যবসায়ীর পেষণে নিষ্পিষ্ট জনগণ, সমস্তই নৃত্য-নাট্যটিতে রূপ পেয়েছে। কিন্তু এরই মধ্যে আরম্ভ ও শেষ নয়। তাহলে 'ভারতের মর্মবাণী' অসম্পূর্ণ থেকে যেত। গোড়ায় পল্লীচারণের গাথায় আছে ভারতের অতীত গৌরবের কাহিনী, সমাপ্তিতে জনগণের মুক্তিকামনা রূপ নিয়েছে জাগ্রত জনগণের সমবেত দাবীর কাছে দেশী ও বিদেশী অত্যাচারীর পরাজয়ে।

নৃত্য-নাট্যটির পূর্বে বাংলা, গান্ধার, অন্ধ্র, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশের নাচ ও গান পৃথকভাবে দেখানো হয়েছে ওঙ্কার আহ্বান, লম্বাদি নৃত্য, ধোবিনৃত্য, নবান্ন উৎসব, রামলীলা ইত্যাদিতে। এর দ্বারা লোক-নৃত্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচয়হীন দর্শকের মনও প্রস্তুত হতে পেরেছে। এটা খুব বড় কথা! লোক-কলার মারফতে নতুন চিন্তা ও বর্তমান যুগের সমস্যাগুলিকে সামনে ধরবার জন্যে লোক-কলার খাঁটি রূপের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, যাতে আমাদেরই অবহেলায় লুপ্তপ্রায় এই জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্পদের মূল্য সম্বন্ধে আমরা সচেতন হয়ে উঠতে পারি।

সংস্কৃতির কোন বিশিষ্ট রূপ ও ধারাকে সংস্কারের মতো রূপান্তরহীন করে রাখলে তার কোন ভবিষ্যৎ থাকে না, তার মৃত্যু অনিবার্য। লোক-কলাকে বাঁচাবার ও লোক-শিক্ষার বাহন হিসাবে তাকে কাজে লাগাবার উদ্দেশ্য তখনই সফল হতে পারে, যখন জনগণের জীবনের বর্তমান বাস্তবতার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করা যায়, তাদেরই জীবন্ত আনন্দ-বেদনা আশা-নিরাশা সঙ্কট ও সমস্যা রূপান্বিত হয়। গণ-নাট্যসঙ্ঘ এটা উপলব্ধি করেছেন। তাঁরা তাই

দেশের সামনে শুধু লোক-কলার কতকগুলি নমুনা ধরে দেশবাসীর কাছে আবেদন জানাননি—'জাতির এই সম্পদকে রক্ষা করা চাই।' জানালে সেটা অরণ্যে রোদন হতো মাত্র। নিজেরাই তাঁরা কাজটা আরম্ভ করেছেন—দেশের সামনে শুধু আদর্শটা নয়, উপায়টাও ধরে দিয়েছেন। সকলের মন তাই নাড়া খেয়েছে, সাড়া মিলেছে।

এই কার্যে ব্রতী তরুণ ও অ্যামেচার অভিনেতা ও অভিনেত্রী নিয়ে গড়া এই বাহিনীটির বয়স এক বছরও পূর্ণ হয়নি। এঁদের এই অপূর্ব অভিনয় নৈপুণ্য কোথা থেকে এল? কি এঁদের অভিনব সাফল্যের মর্মকথা? এর একটিমাত্র জবাব জানি—এঁরা শুধু শিল্প-প্রাণ নন, দেশপ্রাণও বটে। আর্টের জন্য আর্টের ধোঁয়ায় এঁদের চোখ কটকট করে না, শিল্পীর কর্তব্য সম্বন্ধে এঁদের দ্বিধাও নেই, দুর্বলতাও নেই। এই প্রসঙ্গে গণ-নাট্যসঙ্ঘের বাংলা শাখার এমনি অল্প-বয়সী অ্যামেচার অভিনেতা অভিনেত্রীদের প্রদর্শিত 'জবানবন্দী' ও 'নবান্ন'র কথা স্মরণীয়। এ দুটি নাটক নাট্য-জগতে কি চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে কারো তা অজানা নয়। 'নবান্ন' অভিনয়ের জন্য আজ চেষ্টা করেও স্টেজ ভাড়া পাওয়া যায় না। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের কর্তারা ভয় পেয়ে গিয়েছেন। অথচ এঁদের সঙ্গে প্রতি-যোগিতা করার কোন ইচ্ছাই গণ-নাট্যসঙ্ঘের নেই—এঁরা ব্যবসায়ী নন, লাভের টাকা শিল্পী বা পরিচালক কারো পকেটে যায় না। বাংলার দুর্ভিক্ষের জন্য বাংলা শাখা বোম্বাই ও পাঞ্জাবে সফর দিয়ে লক্ষাধিক টাকা সংগ্রহ করেছিল, 'নবান্ন' অভিনয়ের কয়েক হাজার টাকা বাংলায় মহামারীর চিকিৎসায় লেগেছে।

রঙ্গালয়ের পরিচালকদের তবু এত আতঙ্ক কেন? সোজাসুজি প্রতিযোগিতার ভয় এঁদের নেই—এঁদের ভয় দর্শক সাধারণের রুচির পরিবর্তনে। কিন্তু সস্তা নাটক ও সস্তা অভিনয় দিয়ে দর্শককে ভোলাতে বাঙলা রঙ্গমঞ্চের কর্তারাই বা চাইবেন কেন? আর, তাঁরা যদিই বা মুনাফার লোভে তা চান, রঙ্গমঞ্চের শিল্পীরা কেন তাতে সায় দেবেন? তাঁরা কি নূতনতর সৃষ্টিতে ও সৃষ্টির তাগিদে সাড়া দিতে পারবেন না—এতই কি জড়তাপ্রাপ্ত হয়েছেন?

এই আতঙ্ক ও প্রতিকূলতার প্রতিরোধের মধ্যেও গণ-নাট্যসঙ্ঘের আন্দোলনের ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেখতে পাই। দেশ এঁদের আন্দোলনকে সমর্থন ও গ্রহণ করেছে—সারা দেশে এঁদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে।

কথা-শিল্পী হিসাবে ভারতীয় গণ-নাট্যসঙ্ঘের কাছে একটি ব্যক্তিগত ঋণের কথা স্বীকার না করলে অন্যায় হবে। নতুন প্রেরণা ও উদ্দীপনা পাওয়ার ঋণ নয়,—ওটা শুধু আমাকেই নয়, সকলকেই ওঁরা পরিবেশন করেছেন, সেজন্য ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞতা জানাবার প্রয়োজন ছিল না। সাহিত্যিক হিসাবে আমার একটি ভীরুতা সম্বন্ধে এঁরা আমাকে সচেতন করেছেন। পাঠক সাধারণকে একটু বেশিরকম ভোঁতা ও একগুঁয়ে মনে করার প্রতিক্রিয়া, অনেক লেখকের রচনাতেই কতগুলি অনাবশ্যক সতর্কতা হয়ে দেখা দেয় নানা ভাবে, এবং সমস্ত রচনাটিকে প্রভাবান্বিত করে। লেখকের ভীরুতাই এজন্য দায়ী। সঙ্ঘের অভিনব প্রচেষ্টাকে সাধারণ দর্শক যে রকম উদারতার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন, তাতে আমি উপলব্ধি করেছি যে, আমরাই লেখক ও শিল্পীরাই, পাঠক ও দর্শক সাধারণের ঘাড়ে অযথা দোষ চাপাই, তাঁদের কতগুলি সঙ্কীর্ণতা ও বিরোধিতা স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিই। আসলে তাঁরা আমাদের সব রকম সুযোগ ও স্বাধীনতা দিতে সর্বদাই প্রস্তুত, আমরাই তাঁদের এই উদারতা স্বীকার করতে ভয় পাই। আমি বিশ্বাস করি, নিজের এই দুর্বলতা চেনার ফলে আমার লেখার উন্নতি হবে।

গল্প

প্রাগৈতিহাসিক

সমস্ত বর্ষাকালটা ভিখু ভয়ানক কষ্ট পাইয়াছে। আষাঢ় মাসের প্রথমে বসন্তপুরের বৈকুণ্ঠ সাহার গদীতে ডাকাতি করিতে গিয়া তাহাদের দলকে দল ধরা পড়িয়া যায়। এগার জনের মধ্যে কেবল ভিখুই কাঁধে একটা বর্শার খোঁচা খাইয়া পলাইতে পারিয়াছিল। রাতারাতি দশ মাইল দূরের মাথা-ভাঙা পুলটার নীচে পৌঁছিয়া অর্দ্ধেকটা শরীর কাদায় ডুবাইয়া শরবনের মধ্যে দিনের বেলাটা লুকাইয়া ছিল। রাত্রে আরও ন'ক্রোশ পথ হাঁটিয়া একেবারে পেহ্লাদ বাগ্দীর বাড়ী চিতনপুরে।

পেহ্লাদ তাহাকে আশ্রয় দেয় নাই।

কাঁধটা দেখাইয়া বলিয়াছিল, 'ঘাও খান সহজ লয় স্যাঙ্গাৎ। উটি পাকবো। গা ফুলবো। জানাজানি হইয়া গেলে আমি কনে' যামু? খুনটো যদি না করতিস্—'

'তরেই খুন করতে মন লইতেছে পেহ্লাদ।'

'এই জন্মে লা, স্যাঙ্গাৎ'। বন কাছেই ছিল, মাইল পাঁচেক উত্তরে। ভিখু অগত্যা বনেই আশ্রয় লইল। পেহ্লাদ নিজে বাঁশ কাটিয়া বনের একটা দুর্গম অংশে সিন্‌জুরি গাছের নিবিড় ঝোপের মধ্যে তাহাকে একটা মাচা বাঁধিয়া দিল। তালপাতা দিয়া একটা আচ্ছাদনও করিয়া দিল। বলিল, বাদলায় বাঘ টাঘ সব পাহাড়ের উপরে গেছেগা। সাপে যদি না কাটে ত আরাম কইরাই থাকবি ভিখু।'

'খামু কি?'

'চিড়া গুর দিলাম যে? দু'দিন বাদে বাদে ভাত লইয়া আসুম। রোজ আইলে মাইনষে সন্দ করব।'

কাঁধের ঘা'টা লতা পাতা দিয়া বাঁধিয়া আবার আসিবার আশ্বাস দিয়া

পেহ্লাদ চলিয়া গেল। রাত্রে ভিখুর জ্বর আসিল। পরদিন টের পাওয়া গেল পেহ্লাদের কথাই ঠিক, কাঁধের ঘা ভিখুর দুনাইয়া উঠিয়াছে। ডান হাতটি ফুলিয়া ঢোল হইয়া গিয়াছে এবং হাতটি তাহার নাড়িবার সামর্থ্য নাই।

বর্ষাকালে যে বনে বাঘ বাস করিতে চায় না এমনি অবস্থায় সেই বনে জলে ভিজিয়া মশা ও পোকার উৎপাত সহিয়া, দেহের কোন না কোন অংশ হইতে ঘণ্টায় একটি করিয়া জোঁক টানিয়া ছাড়াইয়া জ্বরে ও ঘায়ের ব্যথায় ধুঁকিতে ধুঁকিতে ভিখু দু'দিন দু'রাত্রি সঙ্কীর্ণ মাচাটুকুর উপর কাটাইয়া দিল। বৃষ্টির সময় ছাঁট লাগিয়া সে ভিজিয়া গেল, রোদের সময় ভাপসা গাঢ় গুমোটে সে হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া শ্বাস টানিল, পোকার অত্যাচারে দিবারাত্রি তাহার এক-মুহূর্তের স্বস্তি রহিল না। পেহ্লাদ কয়েকটা বিড়ি দিয়া গিয়াছিল সেগুলি ফুরাইয়া গিয়াছে। তিন চার দিনের মত চিড়া আছে বটে কিন্তু গুড় একটুও নাই। গুড় ফুরাইয়াছে, কিন্তু গুড়ের লোভে যে লাল পিঁপড়াগুলি ঝাঁক বাঁধিয়া আসিয়াছিল তাহারা এখনো মাচার উপরে ভিড় করিয়া আছে। ওদের হতাশার জ্বালা ভিখুই অবিরত ভোগ করিতেছে সর্ব্বাঙ্গে।

মনে মনে পেহ্লাদের মৃত্যু কামনা করিতে করিতে ভিখু তবু বাঁচিবার জন্য প্রাণপণে যুঝিতে লাগিল। যেদিন পেহ্লাদের আসিবার কথা সেদিন সকালে কলসীর জলটাও তাহার ফুরাইয়া গেল। বিকাল পর্য্যন্ত পেহ্লাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া তৃষ্ণার পীড়ন আর সহিতে না পারিয়া কলসীটা লইয়া সে যে কত কষ্টে খানিক দূরের নালা হইতে আধ কলসী জল ভরিয়া আনিয়া আবার মাচায় উঠিল তাহার বর্ণনা হয় না। অসহ্য ক্ষুধা পাইলে শুধু চিড়া চিবাইয়া সে পেট ভরাইল। একহাতে ক্রমাগত পোকা ও পিঁপড়াগুলি টিপিয়া মারিল। বিষাক্ত রস শুষিয়া লইবে বলিয়া জোঁক ধরিয়া নিজেই ঘায়ের চারি দিকে লাগাইয়া দিল। সবুজরঙের একটা সাপকে একবার মাথার কাছে সিন্‌জুরি গাছের পাতার ফাঁকে উঁকি দিতে দেখিয়া পুরা দু'ঘণ্টা লাঠি হাতে সেদিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল এবং তাহার পর দু'এক ঘণ্টা অন্তরই চারিদিকের ঝোপে ঝপাঝপ লাঠির বাড়ি দিয়া মুখে যথাসাধ্য শব্দ করিয়া সাপ তাড়াইতে লাগিল।

মরিবে না। সে কিছুতেই মরিবে না। বনের পশু যে অবস্থায় বাঁচে না সেই অবস্থায়, মানুষ সে, বাঁচিবেই।

পেহ্লাদ গ্রামান্তরে কুটুম বাড়ী গিয়াছিল। পরদিনও সে আসিল না। কুটুমবাড়ীর বিবাহোৎসবে তাড়ি টানিয়া বেহুঁস হইয়া পড়িয়া রহিল। বনের মধ্যে ভিখু কি ভাবে দিন রাত্রি কাটাইতেছে তিন দিনের মধ্যে সে কথা একবার তাহার মনেও পড়িল না।

ইতিমধ্যে ভিখুর ঘা পচিয়া উঠিয়া লালচে রস গড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। শরীরও তাহার অল্প অল্প ফুলিয়াছে। জ্বরটা একটু কমিয়াছে বটে কিন্তু সর্ব্বাঙ্গের অসহ্য বেদনা দম ছুটানো তাড়ির নেশার মতই ভিখুকে আচ্ছন্ন, অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। সে আর এখন ক্ষুধা তৃষ্ণা অনুভব করিতে পারে না। জোঁকেরা তাহার রক্ত শুষিয়া শুষিয়া কচি পটোলের মত ফুলিয়া উঠিয়া আপনা হইতেই নীচে খসিয়া পড়িয়া যায়, সে টেরও পায় না। পায়ের ধাক্কায় জলের কলসীটা এক সময় নীচে পড়িয়া ভাঙিয়া যায়, বৃষ্টির জলে ভিজিয়া পুঁটুলির মধ্যে চিড়াগুলি পচিতে আরম্ভ করে, রাত্রে তাহার ঘায়ের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া মাচার আশে পাশে শিয়াল ঘুরিয়া বেড়ায়।

কুটুম বাড়ী হইতে ফিরিয়া বিকালের দিকে ভিখুর খবর লইতে গিয়া ব্যাপার দেখিয়া পেহ্লাদ গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িল। ভিখুর জন্য এক বাটি ভাত ও কয়েকটা পুঁটি মাছ ভাজা আর একটু পুঁই চচ্চড়ি সে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ভিখুর কাছে বসিয়া থাকিয়া ও-গুলি সে নিজে খাইয়া ফেলিল। তারপর বাড়ী গিয়া বাঁশের একটা ছোট মই এবং তাহার বোনাই ভরতকে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিল।

মইএ শোয়াইয়া তাহারা দুজনে ভিখুকে বাড়ী লইয়া গেল। ঘরের মাচার উপরে খড় বিছাইয়া শয্যা রচনা করিয়া তাহাকে শোয়াইয়া রাখিল।

আর এমনি শক্ত প্রাণ ভিখুর যে শুধু এই আশ্রয়টুকু পাইয়াই বিনা চিকিৎসায় ও এক রকম বিনা যত্নেই একমাস মুমূর্ষু অবস্থায় কাটাইয়া সে ক্রমে ক্রমে নিশ্চিত মরণকে জয় করিয়া ফেলিল। কিন্তু ডান হাতটি তাহার আর ভাল হইল না। গাছের মরা ডালের মত শুকাইয়া গিয়া অবশ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল। প্রথমে অতি কষ্টে হাতটা সে একটু নাড়িতে পারিত কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে ক্ষমতাটুকুও তাহার নষ্ট হইয়া গেল।

কাঁধের ঘা শুকাইয়া আসিবার পর বাড়ীতে বাহিরের লোক কেহ উপস্থিত

না থাকিলে ভিখু তাহার একটি মাত্র হাতের সাহায্যে মধ্যে মধ্যে বাঁশের মই বাহিয়া নীচে নামিতে লাগিল এবং একদিন সন্ধ্যার সময় এক কাণ্ড করিয়া বসিল।

পেহ্লাদ সে সময় বাড়ী ছিল না, ভরতের সঙ্গে তাড়ি গিলিতে বাহির হইয়া গিয়াছিল। পেহ্লাদের বোন গিয়াছিল ঘাটে। পেহ্লাদের বৌ ছেলেকে ঘরে শোয়াইতে আসিয়া ভিখুর চাহনি দেখিয়া তাড়াতাড়ি পলাইয়া যাইতেছিল, ভিখু তাহার একটা হাত চাপিয়া ধরিল।

কিন্তু পেহ্লাদের বৌ বাগ্দীর মেয়ে। দুর্ব্বল শরীরে বাঁ হাতে তাহাকে আয়ত্ত করা সহজ নয়। এক ঝটকায় হাত ছাড়াইয়া সে গাল দিতে দিতে চলিয়া গেল। পেহ্লাদ বাড়ী ফিরিলে সব বলিয়া দিল।

তাড়ির নেশায় পেহ্লাদের মনে হইল, এমন নেমকহারাম মানুষটাকে একেবারে খুন করিয়া ফেলাই কর্ত্তব্য। হাতের মোটা বাঁশের লাঠিটা বৌ-এর পিঠে এক ঘা বসাইয়া দিয়া ভিখুর মাথা ফাটাইতে গিয়া নেশার মধ্যেও কিন্তু টের পাইতে তাহার বাকী রহিল না যে কাজটা যত বড় কর্ত্তব্যই হোক্, সম্ভব একেবারেই নয়। ভিখু তাহার ধারাল দা'টি বাঁ হাতে শক্ত করিয়া বাগাইয়া ধরিয়া আছে। সুতরাং খুনো খুনির পরিবর্ত্তে তাহাদের মধ্যে কিছু অশ্লীল কথার আদান প্রদান হইয়া গেল।

শেষে পেহ্লাদ বলিল, 'তোর লাইগ্যা আমার সাত টাকা খরচ গেছে, টাকাটা দে, দিয়া বাইর' আমার বাড়ীর থেইকা,—দূর হ'।'

ভিখু বলিল, 'আমার কোমরে একটা বাজু বাইন্ধা রাখছিলাম, তুই চুরি করছস। আগে আমার বাজু ফিরাইয়া দে, তবে যামু।'

'তোর বাজুর খপর জানে কেডা রে' ?'

'বাজু দে কইলাম পেহ্লাদ, ভাল চাসত! বাজু না দিলি সা' বাড়ীর মেজোকর্ত্তার মত গলাডা তোর একখান কোপেই দুই ফাঁক কইরা ফেলুম, এই তোরে আমি কইয়া রাখলাম। বাজু পালি' আমি অখনি যামু গিয়া।' কিন্তু বাজু ভিখু ফেরত পাইল না। তাহাদের বিবাদের মধ্যে ভরত আসিয়া পড়ায় দু'জনে মিলিয়া ভিখুকে তাহারা কায়দা করিয়া ফেলিল। পেহ্লাদের বাহুমূলে একটা কামড় বসাইয়া দেওয়া ছাড়া দুর্ব্বল ও পঙ্গু ভিখু আর বিশেষ কিছুই

করিয়া উঠিতে পারিল না। পেহ্লাদ ও তাহার বোনাই তাহাকে মারিতে মারিতে আধমারা করিয়া ফেলিয়া বাড়ীর বাহির করিয়া দিল। ভিখুর শুকাইয়া-আসা ঘা ফাটিয়া রক্ত পড়িতেছিল, হাত দিয়া রক্ত মুছিতে মুছিতে ধুঁকিতে ধুঁকিতে সে চলিয়া গেল। রাত্রির অন্ধকারে সে কোথায় গেল কেহই তাহা জানিতে পারিল না বটে, কিন্তু দুপুর রাতে পেহ্লাদের ঘর জ্বলিয়া উঠিয়া বাগ্দী পাড়ায় বিষম হৈ চৈ বাধাইয়া দিল।

পেহ্লাদ কপাল চাপড়াইয়া বলিতে লাগিল, 'হায় সর্ব্বনাশ, হায় সর্ব্বনাশ! ঘরকে আমার শনি আইছিলো গো, হায় সর্ব্বনাশ।'

কিন্তু পুলিশের টানাটানির ভয়ে মুখ ফুটিয়া বেচারী ভিখুর নামটা পর্য্যন্ত করিতে পারিল না।

সেই রাত্রি হইতে ভিখুর আদিম, অসভ্য জীবনের দ্বিতীয় পর্য্যায় আরম্ভ হইল। চিতলপুরের পাশে একটা নদী আছে। পেহ্লাদের ঘরে আগুন দিয়া আসিয়া একটা জেলে ডিঙ্গি চুরি করিয়া ভিখু নদীর স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল। লগি ঠেলিবার সামর্থ্য তাহারে ছিল না, একটা চ্যাপ্টা বাঁশকে হালের মত করিয়া ধরিয়া রাখিয়া সে সমস্ত রাত কোন রকমে নৌকার মুখ সিধা রাখিয়াছিল। সকাল হওয়ার আগে শুধু স্রোতের টানে সে বেশীদূর আগাইতে পারে নাই।

ভিখুর মনে আশঙ্কা ছিল ঘরে আগুন দেওয়ার শোধ লইতে পেহ্লাদ হয় ত তাহার নামটা প্রকাশ করিয়া দিবে, মনের জ্বালায় নিজের অসুবিধার কথাটা ভাবিবে না। পুলিশ বহুদিন যাবত তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে, বৈকুণ্ঠ সাহার বাড়ীতে খুনটা হওয়ার ফলে চেষ্টা তাহাদের বাড়িয়াছে বই কমে নাই। পেহ্লাদের কাছে খবর পাইলে পুলিশ আশে পাশে চারিদিকেই তাহার খোঁজ করিবে বিশ ত্রিশ মাইলের মধ্যে লোকালয়ে মুখ দেখানো তাহার পক্ষে বিপদের কথা। কিন্তু ভিখু তখন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। কাল বিকাল হইতে সে কিছু খায় নাই। দু'জন যোয়ান মানুষের হাতে বেদম মার খাইয়া এখনো দুর্ব্বল শরীরটা তাহার ব্যথায় আড়ষ্ট হইয়া আছে। ভোর ভোর মহকুমা সহরের ঘাটের সামনে পৌছিয়া সে ঘাটে নৌকা লাগাইল। নদীর জলে ডুবিয়া ডুবিয়া স্নান করিয়া গায়ের রক্তের চিহ্ন ধুইয়া ফেলিয়া সহরের ভিতরে

প্রবেশ করিল। ক্ষুধায় সে চোখে অন্ধকার দেখিতেছিল। একটি পয়সাও তাহার সঙ্গে নাই যে মুড়ি কিনিয়া খায়। বাজারের রাস্তায় প্রথম যে ভদ্রলোকটির সঙ্গে দেখা হইল তাহারই সামনে হাত পাতিয়া সে বলিল, 'দু'টো পয়সা দিবান কর্ত্তা ?'

তাহার মাথার জটবাঁধা চাপ চাপ রুক্ষ ধূসর চুল, কোমরে জড়ানো মাটির মত ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়া আর দড়ির মত শীর্ণ দোদুল্যমান হাতটি দেখিয়া ভদ্রলোকটির বুঝি দয়াই হইল। তিনি তাহাকে একটি পয়সা দান করিলেন।

ভিখু বলিল—'একটা দিলেন বাবু ? আর একটা দেন।'

ভদ্রলোক চটিয়া বলিলেন— 'একটা দিলাম, তাতে হল না,—ভাগ্ !'

এক মুহূর্ত্তের জন্য মনে হইল ভিখু বুঝি তাহাকে একটা বিশ্রী গালই দিয়া বসে। কিন্তু সে আত্মসম্বরণ করিল। গাল দেওয়ার বদলে আরক্ত চোখে তাহার দিকে একবার কটমট করিয়া তাকাইয়া সামনের মুড়ি মুড়কির দোকানে গিয়া পয়সাটা দিয়া মুড়ি কিনিয়া গোগ্রাসে গিলিতে আরম্ভ করিল।

সেই হইল তাহার ভিক্ষা করিবার হাতে খড়ি।

কয়েক দিনের ভিতরেই সে পৃথিবীর বহু পুরাতন ব্যবসাটির এই প্রকাশ্যতম বিভাগের আইন কানুন সব শিখিয়া ফেলিল। আবেদনের ভঙ্গি ও ভাষা তাহার জন্ম ভিখারীর মত আয়ত্ত হইয়া গেল। শরীর এখন আর সে একেবারেই সাফ করে না, মাথার চুল তাহার ক্রমেই জট বাঁধিয়া বাঁধিয়া দলা দলা হইয়া যায় এবং তাহাতে অনেকগুলি উকুন-পরিবার দিনের পর দিন বংশ বৃদ্ধি করিয়া চলে। ভিখু মাঝে মাঝে খ্যাপার মত দুই হাতে মাথা চুলকায় কিন্তু বাড়তি চুল কাটিয়া ফেলিতে সাহস পায় না। ভিক্ষা করিয়া সে একটি ছেঁড়া কোট পাইয়াছে, কাঁধের ক্ষতচিহ্নটা ঢাকিয়া রাখিবার জন্য দারুণ গুমোটের সময়েও কোটটা সে গায়ে চাপাইয়া রাখে। শুকনো হাতখানা তাহার ব্যবসার সব চেয়ে জোরালো বিজ্ঞাপন, এই অঙ্গটি ঢাকিয়া রাখিলে তাহার চলে না। কোটের ডানদিকের হাতটি সে তাই বগলের কাছ হইতে ছিঁড়িয়া বাদ দিয়াছে। একটি টিনের মগ ও একটা লাঠিও সে সংগ্রহ করিয়া লইয়াছে।

সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বাজারের কাছে রাস্তার ধারে একটা তেঁতুল গাছের নীচে বসিয়া সে ভিক্ষা করে। সকালে একপয়সার মুড়ি খাইয়া নেয়,

দুপুরে বাজারের খানিক তফাতে একটা পোড়ো বাগানের মধ্যে ঢুকিয়া বটগাছের নীচে ইঁটের উনুনে মেটে হাঁড়িতে ভাত রান্না করে, মাটির মালসায় কোনদিন রাঁধে ছোটমাছ কোনদিন তরকারী। পেট ভরিয়া খাইয়া বটগাছটাতেই হেলান দিয়া বসিয়া আরামে বিড়ি টানে। তারপর আবার তেঁতুল গাছটার নীচে গিয়া বসে।

সারাটা দিন শ্বাস টানা শ্বাস টানা কাতরানির সঙ্গে সে বলিয়া যায়ঃ 'হেই বাবা একটা পয়সা ঃ আমায় দিলে ভগবান দিবো ঃ হেই বাবা একটা পয়সা—'

অনেক প্রাচীন বুলির মত 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ' শ্লোকটা আসলে অসত্য। সারা দিনে ভিখুর সামনে দিয়া হাজার দেড় হাজার লোক যাতায়াত করে এবং গড়ে প্রতি পঞ্চাশ জনের মধ্যে একজন তাহাকে পয়সা অথবা আধলা দেয়। আধলার সংখ্যা বেশী হইলে সারাদিনে ভিখুর পাঁচ ছ' আনা রোজগার হয়, কিন্তু সাধারণতঃ তাহার উপার্জ্জন আট আনার কাছাকাছি থাকে। সপ্তাহে এখানে দু'দিন হাট বসে। হাটবারের উপার্জ্জন তাহার একটা পুরা টাকার নীচে নামে না।

এখন বর্ষাকাল অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। নদীর দু'তীর কাশে শাদা হইয়া উঠিয়াছে। নদীর কাছেই বিন্নুমাঝির বাড়ীর পাশের ভাঙা চালাটা ভিখু মাসিক আট আনায় ভাড়া করিয়াছে। রাত্রে সে ওইখানেই শুইয়া থাকে। ম্যালেরিয়ায় মৃত এক ব্যক্তির জীর্ণ কিন্তু পুরু একটি কাঁথা সে সংগ্রহ করিয়াছে, লোকের বাড়ীর খড়ের গাদা হইতে চুরি করিয়া আনা খড় বিছাইয়া তাহার উপর কাঁথাটি পাতিয়া সে আরাম করিয়া ঘুমায়। মাঝে মাঝে সহরের ভিতরে গৃহস্থবাড়ীতে ভিক্ষা করিতে গিয়া সে কয়েকখানা ছেঁড়া কাপড় পাইয়াছে। তাই পুঁটুলি করিয়া বালিসের মত ব্যবহার করে। রাত্রে সে নদীর জলো-বাতাসে শীত করিতে থাকিলে পুঁটুলি খুলিয়া একটি কাপড় গায়ে জড়াইয়া লয়।

সুখে থাকিয়া এবং পেট ভরিয়া খাইয়া কিছুদিনের মধ্যে ভিখুর দেহে পূর্ব্বের স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিল। তাহার ছাতি ফুলিয়া উঠিল, প্রত্যেকটি অঙ্গ সঞ্চালনে হাতের ও পিঠের মাংস-পেশী নাচিয়া উঠিতে লাগিল। অবরুদ্ধ শক্তির উত্তেজনায় ক্রমে ক্রমে তাহার মেজাজ উদ্ধত ও অসহিষ্ণু হইয়া পড়িল।

অভ্যস্ত বুলি আওড়াইয়া কাতরভাবেই সে এখনো ভিক্ষা চায় কিন্তু ভিক্ষা না পাইলে তাহার ক্রোধের সীমা থাকে না। পথে লোকজন না থাকিলে তাহার প্রতি উদাসীন পথিককে সে অশ্লীল গাল দিয়া বসে। এক পয়সার জিনিস কিনিয়া ফাউ না পাইলে দোকানীকে মারিতে উঠে। নদীর ঘাটে মেয়েরা স্নান করিতে নামিলে ভিক্ষার চাহিবার ছলে জলের ধারে গিয়া দাঁড়ায়। মেয়েরা ভয় পাইলে সে খুসি হয় এবং সরিয়া যাইতে বলিলে নড়ে না, দাঁত বাহির করিয়া দুর্বিনীত হাসি হাসে।

রাত্রে স্বরচিত শয্যায় সে ছটফট করে।

নারী সঙ্গ-হীন এই নিরুৎসব জীবন আর তাহার ভাল লাগে না। অতীতের উদ্দাম ঘটনাবহুল জীবনটির জন্য তাহার মন হাহাকার করে।

তাড়ির দোকানে ভাঁড়ে ভাঁড়ে তাড়ি গিলিয়া সে হল্লা করিত, টলিতে টলিতে বাসির ঘরে গিয়া উন্মত্ত রাত্রি যাপন করিত, আর মাঝে মাঝে দল বাঁধিয়া গভীর রাত্রে গৃহস্থের বাড়ী চড়াও হইয়া সকলকে মারিয়া কাটিয়া টাকা ও গহনা লুটিয়া রাতারাতি উধাও হইয়া যাইত। স্ত্রীর চোখের সামনে স্বামীকে বাঁধিয়া মারিলে তাহার মুখে যে অবর্ণনীয় ভাব দেখা দিত, পুত্রের অঙ্গ হইতে ফিনকি দিয়া রক্ত ছুটিলে মা যেমন করিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিত, মশালের আলোয় সে দৃশ্য দেখা আর সেই আর্ত্তনাদ শোনার চেয়ে উন্মাদনাকর নেশা জগতে আর কি আছে? পুলিশের ভয়ে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পলাইয়া বেড়াইয়া আর বনে জঙ্গলে লুকাইয়া থাকিয়াও যেন তখন সুখী ছিল। তাহার দলের অনেকেই বার বার ধরা পড়িয়া জেল খাটিয়াছে কিন্তু জীবনে একবারের বেশী পুলিশ তাহার নাগাল পায় নাই। রাখু বাগ্দীর সঙ্গে পাহানার শ্রীপতি বিশ্বাসের বোনটাকে যেবার সে চুরি করিয়াছিল সেইবার সাতবছরের জন্য তাহার কয়েদ হইয়াছিল, কিন্তু দু'বছরের বেশী কেহ তাহাকে জেলে আটকাইয়া রাখিতে পারে নাই। এক বর্ষার সন্ধ্যায় জেলের প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া সে পলাইয়াছিল। তারপর একা সে গৃহস্থবাড়ীতে ঘরের বেড়া কাটিয়া চুরি করিয়াছে, দিনে দুপুরে পুকুর-ঘাটে একাকিনী গৃহস্থ বধূর মুখ চাপিয়া গলার হার, হাতের বালা খুলিয়া লইয়াছে, রাখুর বৌকে সঙ্গে নিয়া নোয়াখালি হইয়া সমুদ্র-ডিঙ্গাইয়া পাড়ি দিয়াছে একেবারে হাতিয়ায়। ছ'মাস পরে রাখুর বৌকে

হাতিয়ায় ফেলিয়া আসিয়া পর পর তিনবার তিনটা দল করিয়া দূরে দূরে কত গ্রামে ডাকাতি করিয়া বেড়াইয়াছে তাহার সবগুলির নামও এখন তাহার স্মরণ নাই। তারপর এই সেদিন বৈকুণ্ঠ সাহার মেজ ভাইটার গলাটা সে দা'য়ের এক কোপে দু'ফাঁক করিয়া দিয়া আসিয়াছে।

কি জীবন তাহার ছিল, এখন কি হইয়াছে!

মানুষ খুন করিতে যাহার ভাল লাগিত, সে আজ ভিক্ষা না দিয়া চলিয়া গেলে পথচারীকে একটু টিটকারি দেওয়ার মধ্যে মনের জ্বালা নিঃশেষ করে। দেহের শক্তি তাহার এখনো তেমনি অক্ষুণ্ণ আছে। সে শক্তি প্রয়োগ করিবার উপায়টাই তাহার নাই। কত দোকানে গভীর রাত্রে সামনে টাকার থোক সাজাইয়া একা বসিয়া দোকানী হিসাব মেলায়, বিদেশগত কত পুরুষের গৃহে মেয়েরা থাকে একা। এদিকে, ধারালো একটা অস্ত্র হাতে ওদের সামনে হুমকি দিয়া পড়িয়া একদিনে বড়লোক হওয়ার পরিবর্ত্তে বিনু মাঝির চালাটার নীচে সে চুপচাপ শুইয়া থাকে।

ডান হাতটাতে অন্ধকারে হাত বলাইয়া ভিখুর আপ্‌শোষের সীমা থাকে না। সংসারের অসংখ্য ভীরু ও দুর্ব্বল নরনারীর মধ্যে এতবড় বুকের পাটা আর এমন একটা জোরালো শরীর নিয়া শুধু একটা হাতের অভাবে সে যে মরিয়া আছে। এমন কপালও মানুষের হয়?

তবু এ দুর্ভাগ্য সে সহ্য করিতে পারে। আপ্‌শোষেই নিবৃত্তি। একা ভিখু আর থাকতে পারে না।

বাজারে ঢুকিবার মুখেই একটি ভিখারিণী ভিক্ষা করিতে বসে। বয়স তাহার বেশী নয়, দেহের বাঁধুনিও বেশ আছে। কিন্তু একটা পায়ে হাঁটুর নীচে হইতে পায়ের পাতা পর্য্যন্ত তাহার থকথকে তৈলাক্ত ঘা।

এই ঘায়ের জোরে সে ভিখুর চেয়ে বেশী রোজগার করে। সে জন্য ঘা'-টিকে সে বিশেষ যত্নে সারিতে দেয় না।

ভিখু মধ্যে মধ্যে গিয়া তাহার কাছে বসে। বলে, ঘা'টি সারবো না, লয়?'

ভিখারিণী বলে 'খুব! অসুদ দিলে অখনি সারে।'

ভিখু সাগ্রহে বলে, 'সারা তবে, অসুদ দিয়া চটপট সারাইয়া ল। ঘা'টি সারলে তোর আর ভিক্ মাগতি অইবো না,—জানস্? আমি তোরে রাখুম।'

'আমি থাকলি'ত।'

'ক্যান? থাকবি না ক্যান? খাওয়ামু পরামু, আরামে রাখমু, পায়ের পরনি পা'টি দিয়া গাঁট হইয়া বইয়া থাকবি। না করস্ তুই বিয়ের লেগে?'

অত সহজে ভুলিবার মেয়ে ভিখারিণী নয়। খানিকটা তামাকপাতা মুখে গুঁজিয়া সে বলে, 'দু'দিন বাদে মোরে যখন তুই খেদাইয়া দিবি, ঘা'টি মুই তখন পামু কোয়ানে?'

ভিখু আজীবন একনিষ্ঠতার প্রতিজ্ঞা ক'রে, সুখে রাখিবার লোভ দেখায়। কিন্তু ভিখারিণী কোন মতেই রাজী হয় না। ভিখু ক্ষুণ্নমনে ফিরিয়া আসে।

এদিকে আকাশে চাঁদ ওঠে, নদীতে জোয়ার ভাঁটা বয়, শীতের আমেজে বায়ুস্তরে মাদকতা দেখা দেয়। ভিখুর চালার পাশে কলাবাগানে চাঁপাকলার কাঁদি শেষ হইয়া আসে। বিনু মাঝি কলা বিক্রির পয়সায় বৌকে রূপার গোট কিনিয়া দেয়। তালের রসের মধ্যে নেশা ক্রমেই ঘোরালো ও জমাট হইয়া ওঠে। ভিখু প্রেমের উত্তাপে ঘৃণা উবিয়া যায়। নিজেকে সে আর সামলাইয়া রাখিতে পারে না।

একদিন সকালে উঠিয়াই সে ভিখারিণীর কাছে যায়। বলে 'আইচ্ছা, ল, ঘা লইয়াই চল্।'

ভিখারিণী বলে—'আগে আইবার পার নাই? যা, অখন মর গিয়া, আখার তলের ছালি খা গিয়া।'

'ক্যান? ছালি খাওনের কথাডা কি?'

'তোর লাইগা হাঁ কইরা বইসা আছি ভাবছস তুই, বটে? আমি উই উয়ার সাথে রইছি।'

ওদিকে তাকাইয়া ভিখু দেখিতে পায় তাহারই মত জোয়ান দাড়িওয়ালা এক খঞ্জ ভিখারী খানিক তফাতে আসন করিয়াছে। তাহার ডান হাতটির মত ওর একটি পা হাঁটুর নীচে শুকাইয়া গিয়াছে, বিশেষ যত্নসহকারে এই অংশটুকু সামনে মেলিয়া রাখিয়া সে আল্লার নামে সকলের দয়া প্রার্থনা করিতেছে।

পাশে পড়িয়া আছে কাঠের একটা কৃত্রিম হ্রস্ব পা।

ভিখারিণী আবার বলিল—'বসস্ যে? যা, পালাইয়া যা, দেখলি খুন কইরা ফেলাইবো কইয়া দিলাম।'

ভিখু বলে, 'আরে থো, থুন, অমন সব হালাই করতিছে। উয়ার মত দশটা মাইন্‌ষেরে আমি একা ঘায়েল কইরা দিবার পর্ত্তাম, তা জান্‌স ?'

ভিখারিণী বলে—'পারস্ তো যা না, উয়ার সাথে লাগ না গিয়া। আমার কাছে কি ?'

'উয়াকে তুই ছাড়ান দে। আমার কাছে চ'।'

'ইরে সোণা! তামুক খাবা? ঘা দেইখা পিছাইছিলি, তোর লগে আর খাতির কিরে হালার পুত? উয়ার ছাড়ুম ক্যান? উয়ার মত কামাস তুই? ঘর আছে তোর? ভাগবি তো ভাগ, নইলে গাল দিমু কইলুম।'

ভিখু তখনকার মত প্রস্থান করে কিন্তু হাল ছাড়ে না। ভিখারিণীকে একা দেখিলেই কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। ভাব জমাইবার চেষ্টা করিয়া বলে, 'তোর নামটো কির‍্যা?'

এমনি তাহারা পরিচয়হীন যে এতকাল পরস্পরের নাম জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজনও বোধ করে নাই।

ভিখারিণী কালো দাঁতের ফাঁকে হাসে।

'ফের লাগতে আইছস্? হোই ও বুড়ীর কাছে যা।' ভিখু তাহার কাছে উবু হইয়া বসে। পয়সার বদলে অনেকে চাল ভিক্ষা দেয় বলিয়া আজকাল সে কাঁধে একটা ঝুলি ঝুলাইয়া বেড়ায়। ঝুলির ভিতর হইতে একটা প্রকাণ্ড মর্ত্তমান কলা বাহির করিয়া ভিখারিণীর সামনে রাখিয়া বলে, 'খা। তোর লেগে চুরি কইরা আনছি।'

ভিখারিণী তৎক্ষণাৎ খোসা ছাড়াইয়া প্রেমিকের দান আত্মসাৎ করে। খুসী হইয়া বলে, 'নাম শুন্‌বার চাস? পাঁচী কয় মোরে,—পাঁচী। তুই কলা দিছস্, নাম কইলাম, এবার ভাগ।'

ভিখু উঠিবার নাম করে না। অতবড় একটা কলা দিয়া শুধু নাম শুনিয়া খুসী হওয়ার মত সৌখীন সে নয়। যতক্ষণ পারে ধুলার উপর উবু হইয়া বসিয়া পাঁচীর সঙ্গে সে আলাপ করে। ওদের স্তরে নামিয়া না গেলে সে আলাপকে কেহ আলাপ বলিয়া চিনিতে পারিবে না। মনে হইবে পরস্পরকে তাহারা যেন গাল দিতেছে। পাঁচীর সঙ্গীটির নাম বসির। তাহার সঙ্গেও সে একদিন আলাপ জমাইবার চেষ্টা করিল।

'সেলাম মিয়া।'

বসির বলিল—'ইদিকে ঘুরাফিরা কি জন্য? সেলাম মিয়া হতিছে। লাঠির একঘায়ে শিরটি ছেঁচ্যা দিমু নে।'

দুজনে খুব খানিকটা গালাগালি হইয়া গেল। ভিখুর হাতে লাঠি ও বসিরের হাতে মস্ত একটা পাথর থাকায় মারামারিটা আর হইল না।

নিজের তেঁতুল গাছের তলায় ফিরিয়া যাওয়ার আগে ভিখু বলিল, 'র', তোরে নিপাত করতেছি।'

বসির বলিল,—'ফের উয়ার সাথে বাতচিত করলি' জানে মাইরা দিমু, আল্লার কিরে।'

এই সময় ভিখুর উপার্জ্জন কমিয়া আসিল।

পথ দিয়া প্রত্যহ নূতন নূতন লোক যাতায়াত করে না। একেবারে প্রথম-বারের জন্য যাহারা পথটি ব্যবহার করে দৈনন্দিন পথিকদের মধ্যে তাহাদের সংখ্যা দুই মাসের ভিতরেই মুষ্টিমেয় হইয়া আসে। ভিখুকে একবার যাহারা একটি পয়সা দিয়াছে পুনরায় তাহাকেই দান করিবার প্রয়োজন তাহাদের অনেকেই বোধ করে না। সংসারে ভিখারীর অভাব নাই।

কোন রকমে ভিখুর পেট চলিতে লাগিল। হাটবার ছাড়া রোজগারের একটি পয়সাও সে বাঁচাইতে পারিল না। সে ভাবনায় পড়িয়া পেল।

শীত পড়িলে খোলা চালার নীচে থাকা কষ্টকর হইবে। যেখানে হোক চারিদিকে ঘেরা যেমন-তেমন ঘর একখানা তাহার চাই। মাথা গুঁজিবার একটা ঠাঁই আর দুবেলা খাইতে না পাইলে কোন যুবতী ভিখারিণীই তাহার সঙ্গে বাস করিতে রাজী হইবে না। অথচ উপার্জ্জন তাহার যেভাবে কমিয়া আসিতেছে এভাবে কমিতে থাকিলে শীতকালে নিজেই হয়ত সে পেট ভরিয়া খাইতে পাইবে না।

যে ভাবেই হোক আয় তাহাকে বাড়াতেই হইবে।

এখানে থাকিয়া আয় বাড়াইবার কোন উপায়ই সে দেখিতে পায় না। চুরি

ডাকাতির উপায় নাই, মজুর খাটিবার উপায় নাই, একেবারে খুন করিয়া না ফেলিলে কাহারও কাছে অর্থ ছিনাইয়া লওয়া একহাতে সম্ভব নয়। পাঁচীকে ফেলিয়া এই সহর ছাড়িয়া কোথাও যাইতে তাহার ইচ্ছা হয় না। আপনার ভাগ্যের বিরুদ্ধে ভিখুর মন বিদ্রোহী হইয়া ওঠে। তাহার চালার পাশে বিন্নু মাঝির সুখী পারিবারিক জীবনটা তাহাকে হিংসায় জর্জ্জরিত করিয়া দেয়। এক-এক দিন বিন্নুর ঘরে আগুন ধরাইয়া দিবার জন্য মন ছটফট করিয়া ওঠে। নদীর ধারে খ্যাপার মত ঘুরিতে ঘুরিতে মাঝে মাঝে তাহার মনে হয় পৃথিবীর সমস্ত পুরুষকে হত্যা করিয়া পৃথিবীর যত খাদ্য ও যত নারী আছে একা সব দখল করিতে না পারিলে তাহার তৃপ্তি হইবে না।

আরও কিছুকাল ভিখু এমনি অসন্তোষের মধ্যে কাটাইয়া দিল। তারপর একদিন গভীর রাত্রে ঝুলির মধ্যে তাহার সমস্ত মূল্যবান জিনিস ভরিয়া জমানো টাকা কটি কোমরের কাপড়ে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ভিখু তাহার চালা হইতে বাহির হইয়া পড়িল। নদীর ধারে একদিন সে হাতখানেক লম্বা একটা লোহার শিক কুড়াইয়া পাইয়াছিল। অবসর মত পাথরে ঘষিয়া ঘষিয়া শিকটির একটা মুখ সে চোখা করিয়াছে। এই অস্ত্রটিও সে ঝুলির মধ্যে ভরিয়া সঙ্গে লইল।

অমাবস্যার অন্ধকারে আকাশ বা তারা তখন ঝিকমিক করিতেছে। ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্ত স্তব্ধতা। বহুকাল পরে মধ্যরাত্রির জনহীন জগতে মনের মধ্যে ভয়ানক একটা কল্পনা নিয়া বিচরণ করিতে বাহির হইয়া ভিখুর সহসা অকথনীয় উল্লাস বোধ হইল। নিজের মনে অস্ফুটস্বরে সে বলিয়া উঠিল, 'বাঁ টি লইয়া ডানটিরে যদি রেহাই দিতা ভগমান!'

নদীর ধারে ধারে আধমাইল হাঁটিয়া গিয়া একটি সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া সে সহরে প্রবেশ করিল। বাজার বাঁ হাতি রাখিয়া ঘুমন্ত সহরের বুকে ছোট ছোট অলিগলি দিয়া সহরের অপরপ্রান্তে গিয়া পৌঁছিল, সহরে যাওয়ার পাকা রাস্তাটি এখান দিয়া সহর হইতে বাহির হইয়াছে। নদী ঘুরিয়া আসিয়া দু'মাইল তফাত এই রাস্তারই পাশে পাশে মাইল খানেক বহিয়া গিয়া আবার দক্ষিণে দিক পরিবর্ত্তন করিয়াছে।

কিছুদূর পর্য্যন্ত রাস্তার দু'দিকে ফাঁকে ফাঁকে দু'একটি বাড়ী চোখে পড়ে। তারপর ধানের ক্ষেত ও মাঝে মাঝে জঙ্গলাকীর্ণ পতিত ডাঙার দেখা পাওয়া

যায়। এমনি একটা জঙ্গলের ধারে খানিকটা জমি সাফ করিয়া পাঁচ সাতখানা কুঁড়ে তুলিয়া কয়েকটা হতভাগা মানুষ একটি দরিদ্রতম পল্লী স্থাপিত করিয়াছে। তার মধ্যে একটি কুঁড়ে বসিরের। ভোরে উঠিয়া ঠক্ ঠক্ শব্দে কাঠের পা ফেলিয়া সে সহরে ভিক্ষা করিতে করিতে যায়, সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসে। পাঁচী গাছের পাতা জ্বালাইয়া ভাত রাঁধে, বসির টানে তামাক। রাত্রে পাঁচী পায়ের ঘা'য়ে ন্যাকড়ার পটি জড়ায়। বাঁশের খাটে পাশাপাশি শুইয়া তাহাদের কাটা কাটা কদর্য্য ভাষায় গল্প করিতে করিতে তাহারা ঘুমাইয়া পড়ে। তাহাদের নীড়, তাহাদের শয্যা ও তাহাদের দেহ হইতে ভাপসা পচা দুর্গন্ধ উঠিয়া খড়ের চালের ফুটা দিয়া বাহিরের বাতাসে মিশিতে থাকে।

ঘুমের ঘোরে বসির নাক ডাকায়। পাঁচী বিড় বিড় করিয়া বকে।

ভিখু একদিন ওদের পিছু পিছু আসিযা ঘর দেখিয়া গিয়াছিল। অন্ধকারে সাবধানে ঘরের পিছনে গিয়া বেড়ার ফাঁকে কান পাতিয়া সে কিছুক্ষণ কচু বনের মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর ঘুরিয়া ঘরের সামনে আসিল। ভিখারীর কুঁড়ে, দরজার ঝাঁপটি পাঁচী ভিতর হইতে বন্ধ করে নাই, শুধু ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল। ঝাঁপটা সন্তর্পণে একপাশে সরাইয়া দিয়া ঝুলির ভিতর হইতে শিকটা বাহির করিয়া শক্ত করিয়া ধরিল। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। বাহিরে তারার আলো ছিল, ঘরের ভিতরে সেটুকু আলোরও অভাব। দেশলাই জ্বালিবার অতিরিক্ত হাত নাই; ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া ভিখু ভাবিয়া দেখিল বসিরের হৃদ্‌পিণ্ডের অবস্থানটি নির্ণয় করা সম্ভব নয়। বাঁ হাতের আঘাত, ঠিক জায়গামত না পড়িলে বসির গোলমাল করিবার সুযোগ পাইবে। তাহাতে মুস্কিল অনেক।

কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া বসিরের শিয়রের কাছে সরিয়া গিয়া একটিমাত্র আঘাতে ঘুমন্ত লোকটার তালুর মধ্যে শিখের চোখা দিকটা সে প্রায় তিন আঙুল ভিতরে ঢুকাইয়া দিল। অন্ধকারে আঘাত কতদূর মারাত্মক হইয়াছে বুঝিবার উপায় ছিল না। শিকটা মাথার মধ্যে ঢুকিয়াছে টের পাইয়াও ভিখু তাই নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। একহাতে সবলে বসিরের গলা চাপিয়া ধরিল।

পাঁচীকে বলিল, 'চুপ থাক্। চিল্লাবিতো তোরেও মাইরা ফেলামু।'

পাঁচী চেঁচাইল না ভয়ে গোঙাইতে লাগিল।

ভিখু তখন আবার বলিল, 'একটকু আওয়াজ লয়, ভালা চাস ত একদম চুপ মাইরা থাক্।'

বসির নিস্পন্দ হইয়া গেলে ভিখু তাহার গলা হইতে হাত সরাইয়া নিল।

দম নিয়া বলিল, 'আলোটা জ্বাইলা দে, পাঁচী।'

পাঁচী আলো জ্বালিলে ভিখু পরম তৃপ্তির সঙ্গে নিজের কীর্ত্তি চাহিয়া দেখিল। একটি মাত্র হাতের সাহায্যে অমন যোয়ান মানুষটাকে ঘায়েল করিয়া গর্ব্বের তাহার সীমা ছিল না। পাঁচীর দিকে তাকাইয়া সে বলিল,—'দেখছস্? কেডা কারে খুন করল দেখছস্? তখন পই পই কইরা কইলাম; মিয়াবাই ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাইবার লারবা গো, ছারান দেও। শুইনে মিয়াবায়ের অইল গোসা! কয় কিনা, শির ছেঁচ্চ্যা দিমু। দেন গো দেন, শিরটা আমার ছেঁচ্যাই দেন মিয়াবাই—' বসিরের মৃতদেহের সামনে ব্যঙ্গভরে মাথাটা একবার নত করিয়া ভিখু মাথা দুলাইয়া হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল। সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, 'ঠ্যারাইন বোবা ক্যান গো? আরে কথা ক' হাড়হাবাইতা মাইয়া! তোরে দিমু নাকি সাবার কইরা,—অ্যাঁ?'

পাঁচী কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল,—'ইবারে কি করবি?'

'ছাখ কি করি! পয়সা করি ক'নে গুইনা রাখছে, আগে তাই ক।'

বসিরের গোপন সঞ্চয়ের স্থানটি পাঁচী অনেক কষ্টে আবিষ্কার করিয়াছিল। ভিখুর কাছে প্রথমে সে অজ্ঞতার ভান করিল। কিন্তু ভিখু আসিয়া চুলের মুটি চাপিয়া ধরিলে প্রকাশ করিতে পথ পাইল না।

বসিরের সমস্ত জীবনের সঞ্চয় কম নয়, টাকায় আধুলিতে একশত টাকার উপর। একটা মানুষকে হত্যা করিয়া ভিখু পূর্ব্বে ইহার চেয়ে বেশী উপার্জ্জন করিয়াছে। তবু সে খুসী হইল। বলিল 'কি কি নিবি পুঁটলি বাঁইধা ফ্যালা পাঁচী। তারপর ল' রাইত থাকতে মেলা করি। খানিক বাদে নওমির চাঁদ উঠবো, আলোয় আলোয় পথটুকু পার হমু।'

পাঁচী পুঁটুলি বাঁধিয়া লইল। তারপর ভিখুর হাত ধরিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ঘরের বাহির হইয়া রাস্তায় গিয়া উঠিল। পূর্ব্বাকাশের দিকে চাহিয়া ভিখু বলিল 'অখনই চাঁন্দ উটবো পাঁচী।'

পাঁচী বলিল, 'আমরা যামু কনে?'

'সদর। ঘাটে না' চুরি করুম। বিয়ানে ছিপতিপুরের সামনে জংলায় মস্তি

ঢুইকা থাকুম যাইতে একদম সদ্দর। পা চালাইয়া চ' পাঁচী, এক কোশ পথ হাটন লাগব।'

পায়ের ঘা নিয়া তাড়াতাড়ি চলিতে পাঁচীর কষ্ট হইতেছিল। ভিখু সহসা এক-সময় দাঁড়াইয়া পড়িল। বলিল, 'পায়ে নি তুই ব্যথা পাস্ পাঁচী?

'হ', ব্যথা জানায়।

'পিঠে চাপামু?'

'পারবি ক্যান?'

'পারুম, আয়।'

ভিখুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া পাঁচী তাহার পিঠের উপর ঝুলিয়া রহিল। তাহার দেহের ভারে সামনে ঝুঁকিয়া ভিখু জোরে জোরে পথ চলিতে লাগিল। পথের দু'দিকে ধানের ক্ষেত আবছা আলোয় নিঃসাড়ে পড়িয়া আছে। দূরে গ্রামের গাছপালার পিছন হইতে নবমীর চাঁদ আকাশে উঠিয়া আসিয়াছে। ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্ত স্তব্ধতা।

হয়তো ওই চাঁদ আর এই পৃথিবীর ইতিহাস আছে। কিন্তু যে ধারাবাহিক অন্ধকার মাতৃগর্ভ হইতে সংগ্রহ করিয়া দেহের অভ্যন্তরে লুকাইয়া ভিখু ও পাঁচী পৃথিবীতে আসিয়াছিল এবং যে অন্ধকার তাহারা সন্তানের মাংস আবেষ্টনীর মধ্যে গোপন রাখিয়া যাইবে তাহা প্রাগৈতিহাসিক, পৃথিবীর আলো আজ পর্যন্ত তাহার নাগাল পায় নাই, কোনদিন পাইবেও না।

শৈলজ শিলা

জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বিধবা মাসীর খোসামোদ করা। মাসী মরিল। সুতরাং জীবনটা উদ্দেশ্যহীন হইয়া গেল।

উদ্দেশ্যহীন জীবনটা নিয়া কি যে করিব ভাবিয়া পাই না।

বন্ধুবান্ধবের কুপরামর্শে একদা সুপ্রভাতে মেয়ে দেখিতে গিয়া যৎপরোনাস্তি অপমানিত হইলাম। মেয়ে অবশ্য সুন্দরী, ফিরিঙ্গী স্কুলের প্রবেশিকা ক্লাসেও পড়ে, কিন্তু গৃহস্থ ঘরের মেয়ে তো?—হবু বরের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিয়া আতঙ্কে মুখ কালো করিবার কি তার অধিকার? সারাদিন রাগে গজগজ করিলাম এবং পাশের বাড়ির কালো মেয়েটাকেই বিবাহ করিব স্থির করিয়া বিকালে ছাদে উঠিলাম।

আমাকে দেখিবামাত্র মুচকি হাসিয়া মেয়েটা তৎক্ষণাৎ নিচে চলিয়া গেল।

কবে যেন মাদুর পাতিয়া ছাদে শুইয়াছিলাম, কয়েক দিন বৃষ্টিতে ভিজিয়া মাদুরটা ছাদের সঙ্গে একেবারে আঁটিয়া গিয়াছে। মস্ত একটা হাই তুলিয়া ইহার উপরেই চিত হইয়া শুইয়া পড়িলাম। মনে মনে ভাবিলাম, অপরাহ্ণের ঐ চকচকে আকাশটা যে আয়না নয় এজন্য কত জন্ম ধরিয়া তপস্যা করিয়াছিলাম কে জানে!

আকাশে উঠিয়া পৃথিবীর দিকে মুখ ফিরাইয়া সাঁতার দিতে থাকিলে কোথাও গিয়া পৌঁছানো যায় কিনা এমনি একটা অবাস্তব চিন্তা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম;—স্বপ্ন দেখিলাম পাহাড়ের। তরুহীন শষ্পহীন ধূসরবর্ণ রাক্ষসের মতো গাদাগাদি করিয়া রাখা পাহাড়গুলির চাপে স্বপ্নেই আমার উপত্যকার প্রেম গুঁড়া হইয়া গেল। তিনদিন বাদে পিঠে বোঁচকা বাঁধিয়া চলিয়া গেলাম দার্জিলিং এবং একদা টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখিয়া সূর্যের উদ্দেশেই কয়েক দিনের জন্য বাহির হইয়া পড়িলাম।

ইহাতে আমার যে কি শাস্তি হইল শুনিলে আপনাদের চোখে জল আসিবে। এক ঘণ্টার ভিতরে সূর্যদেব কোন্ দিকে উঠেন তাহা তো ভুলিয়া গেলামই, পাক

খাইতে খাইতে আমি নিজে কোন্ দিকে চলিলাম তাহার পর্যন্ত কিছু স্থিরতা রহিল না। নিজেকে টানিয়া হিঁচড়াইয়া একটা খাড়াইএর উপর তুলিয়া কোন্ দিকে নামিলে যে হাত-পা ভাঙিয়াও প্রাণটা বজায় রাখা যাইবে, ঠিক করিতে পারি না, যেদিক দিয়া উঠিয়াছি, সেদিকে নামার কথা ভাবিলেও হৃদকম্প হয়। হাত আর হাঁটুর চামড়া ছিঁড়িয়া রক্ত পড়িতে লাগিল, মাস্‌লগুলি ছিঁড়িয়া পড়িতে চাহিল, এমন মাথা ঘুরিতে লাগিল যেন পৃথিবীর ঘূর্ণিত গতি প্রত্যক্ষ করিতেছি!

অবশেষে একবার যখন হাত ফসকাইয়া কুড়ি ফিট আন্দাজ গড়াইয়া একটা গাছের গুঁড়িতে আটকাইয়া গেলাম, তখন আর উঠিবার চেষ্টামাত্র না করিয়া মনে মনে বলিলাম, থাক যথেষ্ট হইয়াছে। সেইখানে শুইয়া শুইয়া পকেট হইতে বিস্কুটের গুঁড়া বাহির করিয়া মুখে পুরিতে লাগিলাম এবং চারিদিকে চাহিয়া প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলি উপভোগ করিতে আরম্ভ করিলাম।

ভাবিলাম, একেবারে শুকনা শিলার গায়ে এই গাছটা গজানো না জানি কোন্ নিষ্ঠুর দেবতার কীর্তি। ঐ তো তলা দেখা যাইতেছে, গড়াইয়া পড়িলেই হইত! জীবনের উদ্দেশ্যটা তাহা হইলে কিছু কিছু বোঝা যাইত নিশ্চয়।

ঘন্টাখানেক ঝিমাইবার পর উঠিবার চেষ্টা করিলাম। কোনো মতে গাছটা ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া উপরের দিকে চাহিয়া স্পষ্ট বুঝিলাম নিজের ইচ্ছায় যেটুকু নামি নাই শত ইচ্ছা করিলেও সেটুকু আর উঠিতে পারিব না। নানাবিধ কসরতের সাহায্যে ঘন্টা দুয়েকের মধ্যেই নিচে নামিয়া পড়িলাম।

সোজা হইয়া দাঁড়াতেই দেখি, চমৎকার! ত্রিশগজ তফাতে পাহাড়ী উনানে একটা ভাতের হাঁড়ি চাপানো রহিয়াছে এবং নিকটে যে রাঁধুনী বসিয়া আছেন তিনি নিঃসন্দেহে বাঙালী ভদ্রলোক।

মাতালের মতো হেলিয়া দুলিয়া নিকটে গেলাম। প্রশ্ন করিলাম, 'আপনি এখানে?'

ভদ্রলোকের মুখ আমসির মতো শুকাইয়া গেল! বলিলেন, 'আজ্ঞে, আপনাকে তো চিনলাম না?'

হাসিয়া বলিলাম, 'এখানেই জীবন কাটিয়েছেন নাকি? মানুষ দেখেননি কখনো? আমি আপনার মতোই মানুষ। এত জায়গা থাকতে এখানে এসে ভাত রাঁধছেন কেন তাই জিজ্ঞাসা করছি।'

'খিদে পেয়েছে।'

'খিদে পাবার জন্য বুঝি এখানে শুভাগমন করেছেন?'

ভদ্রলোক বিব্রত হইয়া বলিলেন, 'আমার বড়ো বিপদ মশাই।'

'সে আমারো' বলিয়া বসিলাম। নিকটবর্তী গুহাটায় চোখ পড়িল উনানের ধোঁয়া হইতে আত্মরক্ষা করিতে গিয়া।

'বাঃ বাঃ এ যে দেখছি গুহা! আপনি ওখানে তপস্যা করেন নাকি? পঞ্চাশোর্ধে বনং ব্রজেৎ করেছেন?'

'আজ্ঞে না। বিপদ তো ঐখানে।'

শুনিয়া ভদ্রলোকের আপত্তি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া গুহায় উঁকি দিলাম। একটি যুবতী মেয়ে মাদুরে শুইয়া বেদনায় কাতরাইতেছে।

ভড়কাইয়া লোকটির কাছে ফিরিয়া গিয়া চাপা গলায় বলিলাম, 'এ যে বিষম কাণ্ড মশাই।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ওর ছেলে হচ্ছে।'

'হচ্ছে নাকি?' বলিয়া আমি প্রকাণ্ড একটা হাঁ করিয়া ফেলিলাম এবং বহুক্ষণ অবধি সে হাঁ বন্ধ করিতে খেয়াল হইল না।

যত দুর্গম পথ দিয়াই আমি আসিয়া থাকি, এখানে আসিবার একটা সুগম পথও আছে দেখা গেল। এই পথ দিয়া প্রত্যহ দু-বেলা পাঁচ ছয় মাইল চড়াই-উৎরাই ভাঙিয়া নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া আনিবার ভারটা আমার উপরেই পড়িল। ভদ্রলোকটি দেখিলাম বেজায় কুঁড়ে। দু-বেলা রান্না করেন, খান আর গুহামুখে মস্ত একটা পাথরে ঠেস দিয়া বসিয়া চুপচাপ আকাশ-পাতাল ভাবেন। একেবারেই অকর্মণ্য।

গুহা আলো করা একটি মেয়ে হইয়াছে। ট্যাঁ ট্যাঁ করিয়া কাঁদে চুক চুক করিয়া দুধ খায় আর চোখ বুজিয়া ঘুমায়। আমি চাহিয়া দেখি আর তারিফ করি।

বলি, 'লোকজন ডেকে এবার লোকালয়ে নেবার ব্যবস্থা করা যাক, কি

বলেন মশাই ?'

লোক ডাকার কথা শুনিলে লোকটা কেমন কাঁদো কাঁদো হইয়া যায়, শহরে ইহাদের বিপদের কথা প্রচার করিব বলিলে একেবারে কাঁদিয়া ফেলে।

স্ত্রী তো চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর দশ ঘণ্টা কাঁদিয়াই কাটায়। ভিতরে কিছু গোলমাল আছে বুঝতে পারি, মেয়েটার চুলপাড় শাড়ি আর সিঁদুরহীন সিঁথি দেখিয়া সন্দেহ আরো দৃঢ় হয়। স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলে বলে, 'আঁতুড়ে কি সিঁদুর পরতে আছে ?' স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলে সে ডুকরাইয়া কাঁদিয়া ওঠে।

বড়োই জটিল ব্যাপার। নকল দুঃস্বপ্নের মতো।

দিন দশেক বাদে কিন্তু সব সরল হইয়া গেল। খাদ্য ও দুগ্ধের সন্ধানে বাহির হইয়াছিলাম, ফিরিয়া দেখি কচি মেয়েটা কাঁদিয়া কাঁদিয়া গলা শুকাইয়া মরিতে বসিয়াছে, মা-বাপ কাহারো চিহ্ন পর্যন্ত নাই। মেয়েটার কাছে একটা চিঠি পড়িয়াছিল। যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনি ভীষণ। আমার উপকারের জন্য কৃতজ্ঞ হইয়া নাম-ধাম না দিয়া লোকটি রহস্যের মীমাংসা করিয়া দিয়া গিয়াছে। যুবতীটি নাকি লোকটির স্ত্রী নয়, বালবিধবা কন্যারত্ন।

পাপটাকে যাহাতে গুহাতেই মরিতে দিয়া পলাইয়া গিয়া জগতের কল্যাণ করি শেষের দিকে এরূপ একটা অনুরোধও জানোনো হইয়াছে।

খুকিকে কোনো প্রকারে একটু দুধ খাওয়াইয়া আমি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিলাম। অনুপস্থিত বিধবাটি এবং তাহার বাপের উদ্দেশে আমার গালাগালি শুনিয়া গুহার পাথরগুলিও বোধহয় সেদিন লজ্জা পাইয়াছিল।

পনেরো বছর পরে ভূমিকম্প !

বাৎসল্যের সিমেন্ট দিয়া যৌবনের শক্ত গারদ করিয়াছিলাম, তাহা ফাটিয়া একেবারে চৌচির !

মেয়েটা গুহা আলো করিয়া জন্মিয়াছিল, এখন আমার বাড়িটা এমন আলো করিয়াছে যে, এই প্রৌঢ় বয়সে মাঝে মাঝে চোখে অন্ধকার দেখিতে

আরম্ভ করিয়াছি।

এক রাশি কালো চুল পিঠে জড়াইয়া ফর্সা একখানি কাপড় পরিয়া চঞ্চলপদে সারাদিন চোখের উপরে ঘুরিয়া বেড়ায়, সন্ধ্যার পর আলোর সামনে পড়িতে বসিয়া ছটফট করে, আমি চাহিয়া দেখি আর তারিফ করি। মেয়েটা যে এত সুন্দর এ যেন আমার অবিশ্বাস্য সুখ। কত কি মনে হয়। পিছু হাঁটিতে হাঁটিতে আমি যেন একেবারে কৈশোরের প্রান্তে গিয়া দাঁড়াই, ওর ঐ টানা চোখ আর রাঙা ঠোঁট আর অপূর্ব-গঠন তনু আমাকে সেইখানে আটকাইয়া রাখে।

রাতদুপুরে তার ঘরের দরজায় টোকা দিয়া অদ্ভুত গলায় ডাকি, 'শিলা!'

সে অবশ্য ঘুমাইয়া থাকে, সাড়া দেয় না, আমার মুখের ডাকে আমারই ভবিষ্যৎ ভূতটা যেন সামনে আসিয়া দাঁড়ায়, অকস্মাৎ এমন আতঙ্ক হয় যে বলিবার নয়। নিজের ঘরে ছুটিয়া গিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বিছানায় শুইয়া পড়ি। অন্ধকারে হাতড়াইয়া চুরুট দেশলাই খুঁজিয়া নিয়া তাড়াতাড়ি চুরুট ধরাইয়া টানিতে গিয়া কাশিতে আরম্ভ করিয়া দিই। কাশিতে কাশিতে হাসি পায়, আমার হাসির শব্দে অন্ধকার যেন নড়িয়া ওঠে, বাড়িটা যেন বিরক্তিতে একবার একটু কাঁপে, আমার গা যেন ছমছম করে। গলা চাপিয়া হাসি থামাইতে গিয়া গোঁ গোঁ শব্দ হয়, তাড়াতাড়ি হাত সরাইয়া নিয়া আমি উঠিয়া বসি।

খোলা জানালায় শব্দ হয়, 'দাদু!'

'কিরে শিলা?'

'আমার ভয় করছে দাদু। কে যেন হা হা করে হাসছিল।'

শুনিয়া শিহরিয়া উঠি। চৌকির প্রান্তটা শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া বলি, 'ভয় আবার কিসের? ঘুমোগে যা।'

'আমি তোমার ঘরে শোব দাদু, দরজা খোলো।'

মেয়েটা বলে কি! এই নিস্তব্ধ রাত্রি, অনুভূতিতে ঘা-মারা এই গাঢ় অন্ধকার, অর্ধোন্মাদ এই নিদ্রাহীন তৃষিত প্রৌঢ়, এঘরে শুইতে চায় ও কোন্ হিসাবে? রাতদুপুরে জ্বালাতন করিতে নিষেধ করিয়া এমন জোরে ধমক দিয়া উঠি যে নিজেরই চমক লাগে!

মিনিটখানেক ঘড়িটার টিকটিক শব্দ ছাড়া সব স্তব্ধ হইয়া থাকে, তারপর শুনিতে পাই অবাধ্য মেয়েটা জানালা ছাড়িয়া এক পাও নড়ে নাই, অধিকন্তু ফুঁপাইয়া

কাঁদিতেছে।

উঠিয়া দরজা খুলি, ভূত আর আমার ভয়ে শিলা ভালো করিয়া কাঁদিতেও পারিতেছে না, দুই হাতে চোখ ঢাকিয়া জানালার নিচে বসিয়া পড়িয়াছে। দেখিয়া আমার হৃদয় হিম হইয়া যায় এবং আমি স্পষ্ট অনুভব করি সেখানে অতনুর মূর্ছা হইয়াছে।

ওঘর হইতে বিছানা টানিয়া আনিয়া নিজেই শয্যা রচনা করিয়া দিই। চোখ মুছাইয়া হাত ধরিয়া তুলিয়া দিতেই শিলা নীরবে গিয়া শুইয়া পড়ে।

আমি ক্ষণকাল বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকি। খানিক দূরে তেতালা বাড়িটার মাথা ডিঙাইয়া গিয়া বড়ো বড়ো কয়েকটা তারার সংবাদ নিয়া ফিরিয়া আসার পূর্বেই জলীয় কুয়াশায় আমার দু-চোখ আত্মহারা হইয়া যায়। ভিজা স্যাঁতসেঁতে তাহার আর্তি।

পাড়া প্রতিবেশীরা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, 'এবার নাতনীর বিয়ে দাও। অমন টুকটুকে নাতনী তোমার।'

নাতনী টুকটুকে বলিয়া নয়, আমার টুকটুকে নাতনী বলিয়া ইহাদের বিস্ময় যেন বেশি। শুনিলে রাগে গা জ্বলিয়া যায়। আমার তিলোত্তমা বৌ থাকা যেন অসম্ভব! আমার সুন্দরী মেয়ে যেন ছিল না! টুকটুকে নাতনী যেন আমার থাকিতে নাই।

বলি, 'আমার নাতনীর বিয়ের ভাবনা আমিই ভেবে উঠতে পারব মিত্তির মশায়।'

সান্যাল বলে, 'তা অত ভাবাভাবির দরকার কি? তুমি নিজেই বিয়ে করে ফেলো না হে! পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে এমন শক্ত সমর্থ দাদু—নাতনী তোমার বর্তে যাবে।'

খুশি হইয়া সান্যালের পিঠ চাপড়াইয়া বলি, 'তা মন্দ বলোনি সান্যাল! আমিও মাঝে মাঝে ঐ কথাই ভাবি। একটা বেরসিক ছোঁড়ার হাতে ওকে দিতে আমার একটুও ইচ্ছে নেই।'

ইহাদের ভিতর চাটুজ্যে লোকটা অতি বদ। বলে, 'না না এ ঠাট্টার কথা নয়। মেয়েটি ডাগর হয়েছে, এবার বিয়ে দেওয়া কর্তব্য। আমাদের এই ভূপেনের সঙ্গে সম্বন্ধ করো না?'

ভূপেন ছোঁড়া পাড়ার হৃদয় ডাক্তারের পুত্র এবং পাড়ার মধ্যে বোধকরি সবচেয়ে সুপাত্র। অন্দরে ঢুকিতে দিই না, তবু নিত্য আমাদের এই আড্ডায় হাজির হয়। বোধহয় পান জল দিবার জন্য শিলা যে বাহিরে আসে সেই সময় তাহাকে দেখিবার লোভে। চাটুজ্যের কথায় ছোঁড়ার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া মনে মনে স্থির করিয়া ফেলি এবার হইতে পানজল দিবার বরাতটা চাকরের উপরেই থাকিবে।

মুখুজ্যে চাটুজ্যে অপেক্ষাও পাজী। স্মিতমুখে ভূপেনের দিকে চাহিয়া বলে, 'বড়ো ভালো ছেলে, বড়ো ভালো ছেলে। পাড়ার সবগুলি ছেলে এরকম হলে—'

ঠিক এমনি সময়ে পান নিয়া ঘরে ঢুকিয়া শিলা প্রশংসাগুলি সব শোনে। ইচ্ছা হয় মেয়েটাকে অন্দরে ছুঁড়িয়া দিয়া লাঠি নিয়া সকলকে মোড় পর্যন্ত তাড়াইয়া নিয়া যাই আর ভূপেনের মাথায় বসাইয়া দিই সেই লাঠি। পুলিসের হাত এড়াইয়া শিলাকে নিয়া তার সেই আঁতুড়ের গুহাতে চিরকাল লুকাইয়া থাকি। সেই অপরিসর গুহায় ঘেঁষাঘেঁষি হইয়া রাত কাটানোর সমর্থন পাইলে আমি কি না করিতে পারি?

সকলকে বিদায় দিয়া ভিতরে গিয়াই শিলাকে বলি, 'বিয়ে করবি শিলা?' সে মাথা নাড়িয়া বলে, 'না দাদু বিয়ে আমি করব না।'

'তবে কি করবি?'

'তোমার কাছে থাকব।'

'তা থাকিস। কিন্তু চিরকাল নাতনী হয়েই থাকবি? বৌ হয়ে থাক না!'

'দূর ছোটলোক!' বলিয়া সে হাসে।

তাহার মুখ হইতে যে দৃষ্টি সরাইতে পারি না, তাহা এমনি মুখর যে চক্ষু মার্জনার ছলে ঢাকিয়া দিতে হয়। আপসোস করিয়া মরি যে কোন্ মহৎ উদ্দেশ্য নিয়া ওর দাদু হইয়া স্নেহ শিখাইয়াছি, স্বামী হইয়া প্রেম শিখাই নাই। আজ তাহা হইলে—

চিন্তাটা বড়ো জটিল। আমার স্নেহের পুত্তলী আমাকে এমনভাবে ঠকাইবে কে তাহা ভাবিতে পারিয়াছিল?

ইচ্ছা হয় জন্মের কাহিনী শুনাইয়া মেয়েটাকে ভাঙিয়া দিই। উহার মুখের নিষ্পাপ সরলতা ঘুচিয়া গিয়া আমার পথ পরিষ্কার হোক।

'মার কথা শুনবি শিলা।'

'বলো দাদু।'

আমি বলিতে আরম্ভ করি। গুহার আবছা আলোয় শিলার জন্মকথা। কিন্তু যতবারই বলি আসল বক্তব্যটা গোপন থাকিয়া যায়, শেষ করি একটা মিথ্যা বলিয়া। অযত্নে অচিকিৎসায় ঠাণ্ডায় না-দেখা মার শোচনীয় মৃত্যুকাহিনী শুনিয়া শিলার চোখ দিয়া জল পড়ে!

নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবি, বদমাইশ তো কোনোদিন ছিলাম না, পারিব কেন! অন্যায় করিবার অক্ষমতায় আত্মপ্রসাদ জন্মে, যথালাভ মনে করিয়া তাহাতেই খুশি থাকিতে চেষ্টা করি।

কিন্তু পারিলাম না। শিলাকে চুম্বন করিবার মতো অবস্থাটা কিছুকালের মধ্যেই সৃষ্টি হইয়া গেল। কেমন করিয়া গেল তাহা এত বেশি সূক্ষ্ম যে ভাষায় মোটা ইঙ্গিতে সংক্ষেপে প্রকাশ করিবার দুঃখে কলম ছুঁড়িয়া ফেলিতে ইচ্ছা হইতেছে।

শিলার বয়স আর পনেরো নাই, যোলো হইয়াছে।

কিছুকাল হইতেই দেখিতেছি সে গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কী এক না-জানা ভয়ে চোখ দুটি চঞ্চল। মুখ যেন বর্ষণহীন শ্রাবণের আকাশ, ক্রমাগতই কালো কালো মেঘ ভাসিয়া যাইতেছে। সকালবেলা আমি টাকা-পয়সার হিসাব নিয়া ব্যস্ত থাকি, মুখ তুলিতেই দেখি একটা অদ্ভুত বিষণ্ণ মুখভঙ্গি করিয়া সে আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে।

আমাকে চাহিতে দেখিলে সরিয়া যায়।

আমার হিসাব যায় গুলাইয়া, ডাকি, 'শিলা শোন্।'

আমি ডাকিলেই শিলা দুড়দাড় ছুটিয়া আসিত, এখন এমন মন্থর গতিতে আসে যেন পদে পদে পা বাধিয়া যাইতেছে। খানিক তফাতে থাকিয়াই বলে, 'কি দাদু?'

'কাছে আয়।'

শিলা কাছে আসে না, আসিতে থাকে। নাগালের মধ্যে আসিলেই খপ করিয়া তার হাত ধরিয়া পাশে বসাইয়া দিই। বলি, 'তুই বড়ো লক্ষ্মী মেয়ে, শিলা?'

শিলা জোর করিয়া একটু হাসে। বলি, 'আমাকে তুই ভালবাসিস, শিলা?'

পরম আশ্বস্ত হইয়া সে তৎক্ষণাৎ বলে, 'বাসি দাদু। ঘামাচি মেরে দেব বুঝি?'

সুতরাং ঐখানেই থামিতে হয়, যদিও সে থামার অর্থই নেপথ্যে অগ্রসর হওয়া।

বলি, 'ঘামাচি কই রে? আমার আর ঘামাচি হয় না। দু-বেলা কত সাবান মাখি তা জানিস?'

খিলখিল করিয়া হাসিয়া শিলা বাঁচে এবং ইহার পর কয়েক দিন ধরিয়া সে আগের মতো হাসিখুশি হইয়া কাটায়। এই পরিবর্তন কিন্তু সাময়িক পরিবর্তনটাকে তাহার নিকটেও স্পষ্টতর করিয়া তোলে। তাহার শঙ্কা-সংকোচহীন জীবন প্রবাহ আবার অবাধে বহিতেছে দেখিয়া আমিও এদিকে ঝিমাইয়া পড়ি। হাই তুলিয়া মোড়ামুড়ি দিয়া ও মেয়েটার নারীত্ব যে আবার ঘুমাইয়া পড়ে, ইহা আমার ভালো লাগে না।

আবার আমার অজস্র সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের পীড়ন চলে। হাসিখুশি মিলাইয়া গিয়া তাহার কপোল হয় পাণ্ডুর, চোখ করে ছলছল।

এমনিভাবে দিন যায়, অবশেষে একদিন বর্ষা-ব্যাকুল দ্বিপ্রহরে আমার এই পুরু তামাকের ধোঁয়ায় বিবর্ণ ঠোঁট দিয়া শিলার হাসিখুসি চিরকালের জন্য মুছিয়া নিলাম। মনে করিয়াছিলাম ঘুমাইয়া আছে, কিন্তু দেখিলাম ধরা পড়িয়া গিয়াছি।

'কি দাদু?' বলিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

কত কথাই বলিতে পারিতাম। দাদামশাই নাতনীর ঠোঁটে চুম্বন করিয়াছে, ইহার কত সঙ্গত ব্যাখ্যাই ছিল। চুম্বন যে লভ রাইট-এর সভ্য সংস্করণ এ কথা আজও যে জানে না দুই-চারিটা সস্নেহ বাণী বলিয়া কত সহজেই তাহাকে ভোলানো যাইত। কিন্তু সে সব কিছু না করিয়া আমি দিলাম ছুট!

ছুটিয়া রাস্তার পড়িয়া হন হন করিয়া পুরা দুই মাইল হাঁটিয়া থামিলাম। পথের ধারে একটা নির্জন গাছতলায় দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলাম আর কত ঘণ্টা পরে বাড়ি ফেরা চলিবে।

হঠাৎ খেয়াল হইল একটি শীর্ণকায় বৃদ্ধ ভদ্রলোক দুই হাতের ভিতরে আসিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখে কি যেন খুঁজিতেছেন। ভালো করিয়া নজর করিতে চিনিলাম।

'আপনি যে! এখনো বেঁচে আছেন দেখছি। বলি, এবারও বিপদ নাকি? এ কিন্তু লোকালয় মশাই!'

'আজ্ঞে বিপদ নয়। সে বেঁচে আছে? বলুন, সে বেঁচে আছে?'

মাথা নাড়িয়া শূন্যে তুড়ি দিয়া বলিলাম, 'বাঁচে কি? আপনিই বলুন। মৃত্যুই

যে পৃথিবীতে একমাত্র সত্য! আপনি আমি বেঁচে আছি এটাই আশ্চর্য। আহা, ওখানে বসবেন না মশাই!'

লোকটা মাথায় হাত দিয়া পথেই বসিতে যাইতেছিল, আমার অনুরোধে বসিল না। বলিল, 'মেয়েটা পনেরো বছর ধরে পাগল হয়ে আছে, আপনাকে সেই থেকে খুঁজছি। দুর্গা দুর্গা, সব পরিশ্রম ব্যর্থ হল।'

বলিলাম, 'তাই হয়। ওজন্য দুঃখ করবেন না। ষোলো বছর পরিশ্রম করে প্রিয়ার মন খুঁজে পেলাম না, আপনার তো মানুষ খোঁজার তুচ্ছ পরিশ্রম।'

লোকটাকে ফাঁকি দিবার জন্য নানা রাস্তা ঘুরিয়া বাড়ি ফিরিলাম। দেখি, শিলা আমার জন্য ময়দা মাখিতেছে। মুখখানি তার যেমন বিষণ্ণ তেমনি শান্ত।

একগাল হাসিয়া বলিলাম, 'আমি ভাবলাম তুই রাগ করেছিস, শিলা।'

সে মুখ কালো করিয়া বলিল, 'খেতে দিচ্ছ, পরতে দিচ্ছ, রাগ আর কী করে করি দাদু।'

আপনারা শুনিলেন? খাইতে পরিতে দিই বলিয়া আমি যেন কত জোরখাটাই। জোর খাটাইতে পারিলে আমার ভাবনা কি ছিল বলুন তো?

উপরে গিয়া শুইয়া পড়িলাম। আধঘণ্টা পরে ক্ষুধার তাগাদায় শিলাকে তাগাদা দিতে নিচে নামিয়া দেখি, সে তখনো লুচি ভাজিতেছে আর সলজ্জে অদূরে দাঁড়ানো ভুপেনের প্রশ্নের জবাব দিতেছে। আমি বাড়ি না থাকিলে আমাকে ডাকিতে আসিয়া ছোঁড়া সদর হইতে শিলার সঙ্গে দুই-চার মিনিট কথা কহিয়া যায় সম্প্রতি ইহা জানিতে পারিয়াছিলাম, কিন্তু এ যে একেবারে অন্দরে চড়াও হওয়া!

আমাকে দেখিয়া দুজনেই খাসা লজ্জা পাইল। আমতা আমতা করিয়া ভুপেন বলিল, 'আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল, দাদু।'

'তা আমাকে ডাকলেই হত।' বলিয়া সটান বৈঠকখানায় চলিয়া গেলাম। এমন স্পষ্ট ইঙ্গিতও কি ছোঁড়া বুঝিতে চায়! হাঁক দিয়া বাইরে ডাকিয়া আনিলাম, তবে শিলার সঙ্গে তার গল্প ফুরাইল। বেহায়া!

'কি কথা বলতে চাও শুনি? চটপট বলো।'

মুখ লাল করিয়া কোনোমতে কথাটা বলিতেই চটিয়া উঠিলাম—'বটে! তা বিয়ে করে ওকে খাওয়াবে কি শুনি? এম-এ ডিগ্রির ডিপ্লোমাখানা?'

ছোঁড়া যে ইতিমধ্যে সাড়ে তিনশো টাকার চাকরি বাগাইয়া আট-ঘাট বাঁধিয়া

আসিয়াছে, আমি কি সে সংবাদ রাখি? প্রথমটা বেশ ভড়কাইয়া গেলাম, কিন্তু মুহূর্তে সামলাইয়া নিয়া বলিলাম, 'তা হোক, তোমার সঙ্গে আমি ওর বিয়ে দেব না।'

'কেন দাদু?'

'সে কৈফিয়ত তোমাকে দেব কেন হে বাপু! বাধা আছে এইটুকু শুনে রাখো।' বলিয়া আমি ফের রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিলাম।

দিন চারেকের মধ্যে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া শিলাকে বলিলাম, 'তল্পি বাঁধ শিলা, এখানকার বাস তুলতে হল।'

শিলা সজলচোখে বলিল, 'কেন দাদু? বেশ তো আছি এখানে?'

বেশ থাক আর যাই থাক, পরের দিন জিনিসপত্র সব গাড়ির ছাদে চাপাইয়া শিলাকে ভিতরে বসাইলাম। কিছু ফেলিয়া গেলাম কি না দেখিতে পাঁচ মিনিটের জন্য বাড়ির ভিতরে গিয়াছি, ইহার মধ্যে ভূপেন আসিয়া গাড়ির সামনে দাঁড়াইয়াছে।

শুষ্ক হাসিয়া বলিলাম, 'ভূপেন যে! আমরা তো চললাম।'

'একটা কথা শুনুন দাদু' বলিয়া সে আমাকে একান্তে নিয়া গেল।

'কোথায় যাচ্ছেন? শিলাও জানে না বললে।'

হাসিয়া বলিলাম, 'কোথায় যে যাচ্ছি আমিও জানি না হে! কোনো গুহাটুহায় আশ্রয় নেব ভাবছি।'

এক মুহূর্ত স্তব্ধ থাকিয়া ভূপেন বলিল, 'আপনার মত কি কোনোদিন বদলাবে না, দাদু? এ বিয়ে না হলে আপনার নাতনীও অসুখী হবে।'

গম্ভীর হইয়া বলিলাম, 'দেখো বাপু কবি, তোমায় একটা সৎ উপদেশ দিই। শুধু কাব্যচর্চা করে জীবনটা মাটি কোরো না। জীবনে আরও ঢের বড়ো বড়ো সাধনার সুযোগ আছে।' বলিয়া গাড়িতে উঠিয়া পড়িলাম। আমার সামনেই শিলা যতক্ষণ দেখা গেল ভূপেনের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

হে পাঠক হে পাঠিকা, কৈফিয়ত আমি দিব না। শুধু কয়েকটা কথা বলি। শিলাকে নিয়া আমি যে আদিকাব্য রচনা করিতে চাই, ত্যাগের কাব্য তার চেয়ে

বড়ো একথা মানা আমার পক্ষে আত্মপ্রবঞ্চনা। ভূপেনের হাতে শিলাকে সঁপিয়া দিয়া আমি শূন্য ঘরে বুক চাপড়াইলে আপনারা খুবই খুশি হন, কিন্তু তাহাতে আমার কি লাভ? কেনই বা শিলাকে আমি ছাড়িব। বিলাইয়া দিবার জন্যে এতকষ্টে এত যত্নে আমি ওকে মানুষ করি নাই। গুহায় ফেলিয়া আসিলে ও বাঁচিত না। আমি ওর প্রাণ রক্ষা করিয়াছি। আমার চেয়ে ভূপেনের অধিকার বেশি কেমন করিয়া? আপনারা ন্যায়বিচার করিবেন।

আপনারা বিশ্বাস না করিতে পারেন, শিলাকে আমি ভালবাসি। আমার যেমন প্রকৃতি আমার ভালবাসাও তেমনি। দেড়শো কোটি মানুষের মধ্যে আমি যেমন মিথ্যা নই, আমার এই ভালবাসাও তেমনি মিথ্যা নয়।

আমার এ প্রেম যেন গোড়া ঘেঁষিয়া কাটা তরুর মতো—শাখা নাই, কিশলয় নাই, পাতা নাই, ফুল নাই, শুধু আছে মাটির উপরে শক্ত গুঁড়ি আর মাটির নিচে সরস সতেজ মূল, যাহার রস সঞ্চয় কেবল নিজেকে পুষ্ট করিবার জন্যই। বাস্তবিক ভাবিয়া দেখিলে বোঝা যায় আমি যে আমার বিশাল লোমশ বুকে দুই হাতের হাতুড়ি দিয়া কচি মেয়েটাকে ছেঁচিতে চাই ইহার মধ্যে আমিও নাই শিলাও নাই, আছে শুধু অনাদি অনন্ত শাশ্বত প্রেম, পশু-পাখি মানুষকে আশ্রয় করিয়াও যে প্রেম চিরকাল নিজের সমগ্রতা বজায় রাখিয়াছে। আমি আর শিলা তো শুধু ক্রীড়নক। দু-দিন পরে আমরা যখন শূন্যে মিশাইব এ প্রেম তখনো পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবে।

তাছাড়া শিলার পবিত্রতায় আমার শ্রদ্ধা নাই। ওর বিধবা মাকে আমি কিছুতেই মন হইতে তাড়াইতে পারি না। তার সেই শুভ্রবাসা শীর্ণা-ক্রন্দসী মাতা আমার মনে একটা স্পষ্ট প্রেরণার মতো জাগিয়া আছে। দুই হাতে অন্ধকার ঠেলার মতো, সেই কলঙ্কিনী মাতার কন্যা আমার প্রেমেরই যোগ্য এই অন্ধ যুক্তি আমি ঠেলিয়া দিতে পারি না।

পশ্চিমে একটা শহরের প্রান্তে নিরালা বাগান বাড়িতে শিলাকে নিয়া নীড় বাঁধিয়াছি। রোমান্স একেবারে রোমাঞ্চকর হইয়া উঠিয়াছে।

আষাঢ়ের মেঘের মতো গম্ভীর হইয়া শিলা আমার তেমনি সেবা করিতেছে। পরিহাস করিলে হাসে না, মিষ্টি কথা বলিলে শ্রান্ত চোখ তুলিয়া তাকায়, হাত ধরিয়া সোহাগ করিতে গেলে কাগজের মতো সাদা আর পাথরের মতো শক্ত হইয়া ওঠে।

ইঙ্গিতে বলি, 'বেঁচে থাকতে হলে সবই চাই, শিলা।'

সে বলে, 'মরাটাও তো কঠিন নয় দাদু!'

তা বটে। বলি, 'তবু যার অন্যথা নেই তাকে মানতে হয়।'

সে বলে, 'জানি। কিন্তু মানার পথটা আমি তোমার কাছে শিখব না দাদু। দরজায় দাঁড়িয়ে থাকলে আমি কি করে বাইরে যাই বলো তো?'

দিনের ব্যাপারটা এখন এই রকম দাঁড়াইয়াছে। রাত্রির ব্যাপারটা অন্যরূপ।

বাহিরে কোনোদিন জ্যোৎস্না থাকে, কোনোদিন থাকে না, কোনোদিন বৃষ্টি পড়ে, কোনোদিন পড়ে না। দুই হাতে বুক চাপিয়া বিছানায় উপুড় হইয়া পড়িয়া থাকি। ঘুম আসে না, আসিবে না জানি, সেজন্য ভাবিও না। কিন্তু ঘরের বাতাস যেন নিশ্বাসের পক্ষে অপ্রচুর হইয়া পড়ে। উপরে কাঁটা নিচে কাঁটা দিয়া কে যেন আমাকে জীবন্ত কবর দিয়াছে মনে হয়।

তারপর এক সময় পা টিপিয়া টিপিয়া গিয়া শিলার দরজা ঠেলিয়া বলি, 'তোর আজকাল ভয় করে না কেন, শিলা?'

'চব্বিশ ঘন্টাই তো ভয় করে দাদু।'

'তবে দরজা খোল। ভয় মিটিয়ে নে।'

শিলা কঠিনস্বরে বলে, 'ঘুমোও গে যাও, দাদু। এমন যদি করো, যেদিকে দু-চোখ যায় চলে যাব।'

নিজের ঘরে ফিরিয়া গিয়া দুই হাতে বুক চাপিয়া শুইয়া পড়ি। শৈলে যার জন্ম শিলা যার নাম সে শিলার মতো শক্ত হইবে জানি, কিন্তু চিরকাল রসে ডুবাইয়া রাখিলেও শিলা কেন গলিবে না ভাবিয়া মাথা গরম হইয়া ওঠে।

হারাণের নাতজামাই

মাঝ রাতে পুলিশ গাঁয়ে হানা দিল।

সঙ্গে জোতদার চণ্ডী ঘোষের লোক কানাই ও শ্রীপতি। কয়েকজন লেঠেল।

কনকনে শীতের রাত। বিরাম বিশ্রাম ছেঁটে ফেলে উর্ধ্বশ্বাসে তিনটি দিনরাত্রি একটানা ধান কাটার পরিশ্রমে পুরুষেরা অচেতন হয়ে ঘুমোচ্ছিল। পালা করে জেগে ঘরে ঘরে ঘাঁটি আগলে পাহারা দিচ্ছিল মেয়েরা। শাঁক আর উলুধ্বনিতে আকস্মিক আবির্ভাব জানাজানি হয়ে গিয়েছিল গ্রামের কাছাকাছি পুলিশের আবির্ভাবের। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ সমস্ত গাঁ ঘিরে ফেলবার আয়োজন করলে হারাণের ঘর থেকে ভুবন মণ্ডল সরে পড়তে পারত, উধাও হয়ে যেত। গাঁ শুদ্ধ লোক যাকে আড়াল করে রাখতে চায়, হঠাৎ হানা দিয়েও হয়তো পুলিশ সহজে তার পাত্তা পায় না। দেড়মাস চেষ্টা করে পারেনি, ভুবন এ গাঁ ও গাঁ করে বেড়াচ্ছে যখন খুশী।

কিন্তু গ্রাম ঘেরবার, আঁটঘাট বেঁধে বসবার কোন চেষ্টাই পুলিশ আজ করল না। সটান গিয়ে ঘিরে ফেলল ছোট হাঁসতলা পাড়াটুকুর কখানা ঘর যার মধ্যে একটি ঘর হারাণের। বোঝা গেল আঁটঘাট আগে থেকে বাঁধাই ছিল।

ভেতরের খবর পেয়ে এসেছে।

খবর পেয়ে এসেছে মানেই খবর দিয়েছে কেউ। আজ বিকালে ভুবন পা দিয়েছে গ্রামে, হঠাৎ সন্ধ্যার পরে তাকে অতিথি করে ঘরে নিয়ে গেছে হারাণের মেয়ে ময়নার মা, তার আগে পর্যন্ত ঠিক ছিল না কোন পাড়ায় কার ঘরে সে থাকবে। খবর তবে গেছে ভুবন হারাণের ঘরে যাবার পরে! এমনও কি কেউ আছে তাদের এ গাঁয়ে? শীতের তে-ভাগা চাঁদের আবছা আলোয় চোখ জ্বলে ওঠে চাষীদের, জানা যাবেই, এ বজ্জাতি গোপন থাকবে না।

দাঁতে দাঁত ঘসে গফুরালী বলে, 'দেইখ্যা লমু কোন হালা পিঁপড়ার পাখা উঠছে। দেইখ্যা লমু।'

ভুবন মণ্ডলকে তারা নিয়ে যেতে দেবে না সালিগঞ্জ গাঁ থেকে। গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরছে ভুবন এতদিন গ্রেপ্তারী ওয়ারেন্টকে কলা দেখিয়ে, কোনও গাঁয়ে সে ধরা পড়েনি। সালিগঞ্জ থেকে তাকে পুলিশ নিয়ে যাবে? তাদের গাঁয়ের কলঙ্ক তারা সইবে না। ধান দেবে না বলে কবুল করেছে জান, সে জানটা দেবে এই আপনজনটার জন্যে।

শীতে আর ঘুমে অবশপ্রায় দেহগুলি চাঙ্গা হয়ে ওঠে। লাঠি সড়কি দা কুড়ুল বাগিয়ে চাষীরা দল বাঁধতে থাকে। সালিগঞ্জে মাঝরাতে আজ দেখা দেয় সাংঘাতিক সম্ভাবনা।

গোটা আষ্টেক মশাল পুলিশ সঙ্গে এনেছিল, তিন চারটে টর্চ। হাঁসখালি পাড়া ঘিরতে ঘিরতে দপ দপ করে মশালগুলি তারা জ্বেলে নেয়। দেখা যায় সব সশস্ত্র পুলিশ, কানাই ও শ্রীপতির হাতেও দেশী বন্দুক।

পাড়াটা চিনলেও কানাই বা শ্রীপতি হারাণের বাড়িটা ঠিক চিনত না। সামনে রাখালের ঘর পেয়ে ঝাঁপ ভেঙে তাকে বাইরে আনিয়ে রেইডিং পার্টির নায়ক মন্মথকে তাই জিজ্ঞেস করতে হয়, 'হারাণ দাসের কোন বাড়ি?'

তার পাশের বাড়ির হারাণ ছাড়াও যেন কয়েক গণ্ডা হারাণ আছে গাঁয়ে। বোকার মতো রাখাল পাল্টা প্রশ্ন করে—'আজ্ঞা, কোন্ হারাণ দাসের কথা কন?'

গালে একটা চাপড় খেয়েই এমন হাউমাই করে কেঁদে ওঠে রাখাল, দম আটকে আটকে এমন সে ঘন ঘন উকি তুলতে থাকে যে, তাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করাই অনর্থক হয়ে যায় তখনকার মতো। বোবা হাবা চাষাগুলো শুধু বেপরোয়া নয়, একেবারে তুখোড় হয়ে উঠেছে চালাকিবাজীতে।

এদিকে হারাণ বলে, 'হায় ভগবান।'

ময়নার মা বলে, 'তুমি উঠলা কেন কও দিকি?'

বলে কিন্তু জানে যে তার কথা কানে যায়নি বুড়োর। চোখে যেমন কম দেখে, কানেও তেমনি কম শোনে হারাণ। কি হয়েছে ভাল বুঝতেও বোধ হয় পারেনি, শুধু বাইরে একটা গণ্ডগোল টের পেয়ে ভড়কে গিয়েছে। ছেলে আর মেয়েটাকে বুঝিয়ে দেওয়া গেছে চটপট, এই বুড়োকে বোঝাতে গেলে

এত জোরে চেঁচাতে হবে যে প্রত্যেকটি কথা কানে পৌঁছবে বাইরে যারা বেড় দিয়েছে। দু-এক দণ্ড চেঁচালেই যে বুঝবে হারাণ তাও নয়, তার ভোঁতা ঢিমে মাথায় অত সহজে কোন কথা ঢোকে না। এই বুড়োর জন্যে না ফাঁস হয়ে যায় সব।

ভুবনকে বলে ময়নার মা, 'বুড়া বাপটার তরে ভাবনা!'

ভুবন বলে, 'মোর কিন্তু হাসি পায় ময়নার মা।' ময়নার মা গম্ভীর মুখে বলে, 'হাসির কথা না। গুলিও করতে পারে। দেখন মাত্তর। কইবো হাঙ্গামা করছিলেন।'

তাড়াতাড়ি একটা কুপি জ্বালে ময়নার মা। হারাণকে তুলে নিয়ে ঘরে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে হাতের আঙুলের ইশারায় তাকে মুখ বুজে চুপচাপ শুয়ে থাকতে বলে। তারপর কুপির আলোয় মেয়ের দিকে তাকিয়ে নিদারুণ আপসোসে ফুঁসে ওঠে, 'আঃ! ভাল শাড়িখানা পরতে পারলি না?'

'বলছ নাকি?' ময়না বলে।

ময়নার মা নিজেই টিনের তোরঙ্গের ডালাটা প্রায় মুচড়ে ভেঙে তাঁতের রঙীন শাড়িখানা বার করে। ময়নার পরণের ছেঁড়া কাপড়খানা তার গা থেকে একরকম ছিনিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি এলোমেলো ভাবে জড়িয়ে দেয় রঙীন শাড়িটি।

বলে, 'ঘোমটা দিবি। লাজ দেখাবি। জামায়ের কাছে যেমন দেখাস।' ভুবনকে বলে, 'ভাল কথা শোনেন, আপনার নাম হইল জগমোহন, বাপের নাম সাতকড়ি। বাড়ি হাতিপাড়া, থানা গৌরপুর।'

নতুন এক কোলাহল কানে আসে ময়নার মার। কান খাড়া করে সে শোনে। কুপির আলোতেও টের পাওয়া যায় প্রৌঢ় বয়সের শুরুতেই তার মুখখানাতে দুঃখ দুর্দশার ছাপ ও রেখা কি রুক্ষতা ও কাঠিন্য এনে দিয়েছে। ধুতি পরা বিধবার বেশ আর কদমছাঁটা চুল চেহারায় এনে দিয়েছে পুরুষালী ভাব।

'গাঁ ভাইঙ্গা কইখা আইতেছে। তাই না ভাবতেছিলাম ব্যাপার কি, গাঁর মাইনষের সাড়া নাই।'

ভুবন বলে, 'তবেই সারছে। দশবিশটা খুন জখম হইব নির্ঘাত। আমি যাই সামলাই গিয়া।'

'থামেন আপনে, বসেন', ময়নার মা বলে, 'ছাখেন কি হয়।'

শ দেড়েক চাষী চাষাড়ে অস্ত্র হাতে এসে দাঁড়িয়েছে দল বেঁধে। ওদের আওয়াজ পেয়ে মন্মথও জড়ো করেছে তার ফৌজ হারাণের ঘরের সামনে—দু-চারজন শুধু পাহারায় আছে বাড়ির পাশে পিছনে, বেড়া ডিঙিয়ে ওদিক দিয়ে ভুবন না পালায়। দশটি বন্দুকের জোর মন্মথের, তার নিজের রিভলভার আছে। তবু চাষীদের মরিয়া ভাব দেখে সে অস্বস্তি বোধ করছে স্পষ্টই বোঝা যায়। তার সুরটা রীতিমতো নরম শোনায়—স্রেফ হুকুমজারির বদলে সে যেন একটু বুঝিয়ে দিতে চায় সকলকে উচিত আর অনুচিত কাজের পার্থক্যটা, পরিণামটাও।

বক্তৃতার ভঙ্গিতে সে জানায় যে হাকিমের দস্তখতী পরোয়ানা নিয়ে সে এসেছে হারাণের ঘর তাল্লাস করতে। তাল্লাস করে আসামী না পায়, ফিরে চলে যাবে। এতে বাধা দেওয়া হাঙ্গামা করা উচিত নয়, তার ফল খারাপ হবে। বে-আইনী কাজ হবে সেটা।

গফুর চেঁচিয়ে বলে, 'মোরা তাল্লাস করতি দিমু না।'

প্রায় দুশো গলা সায় দেয়, 'দিমু না!'

এমনি যখন অবস্থা, সংঘর্ষ প্রায় শুরু হয়ে যাবে, মন্মথ হুকুম দিতে যাচ্ছে গুলি চালাবার, ময়নার মার খ্যানখেনে তীক্ষ্ণ গলা শীতার্ত থমথমে রাত্রিকে ছিঁড়ে কেটে বেজে উঠল, 'রও দিকি তোমরা, হাঙ্গামা কইরো না। মোর ঘরে কোন আসামী নাই। চোর ডাকাইত নাকি যে ঘরে আসামী রাখুম? বিকালে জামাই আইছে, শোয়াইছি মাইয়া জামাইরে। দারোগাবাবু তাল্লাস করতে চান, তাল্লাস করেন।'

মন্মথ বলে, 'ভুবন মণ্ডল আছে তোমার ঘরে।'

ময়নার মা বলে, 'ঢাখেন আইসা, তাল্লাস করেন। ভুবন মণ্ডল কেডা? নাম তো শুনি নাই বাপের কালে। মাইয়ার বিয়া দিলাম বৈশাখে, দুই ভরি রুপা কম দিছি ক্যান, জামাই ফিরা তাকায় না। দুই ভরির দাম পাঠাইয়া দিছি তবে আইজ জামাই পায়ের ধুলা দিছে। আপনারে কমু কি দারোগাবাবু, মাইয়াটা কাইন্দা মরে। মাইয়া যত কান্দে, আমি তত কান্দি—'

'আচ্ছা, আচ্ছা'—মন্মথ বলে, 'ভুবনকে না পাই, জামাই নিয়ে তুমি রাত কাটিও।

গৌর সাউ হেঁকে বলে, 'অত চুপে চুপে আসে কেন জামাই, ময়নার মা?'

গা জ্বলে যায় ময়নার মার। বলে, 'সদর দিয়া আইছে। তোমার একটা মাইয়ার সাতটা জামাই। চুপে চুপে আসে, মোর জামাই সদর দিয়া আইছে!'

গৌর আবার কি বলতে যাচ্ছিল, কে যেন আঘাত করে তার মুখে। একটা আর্ত শব্দ শুধু শোনা যায়, সাপেধরা ব্যাঙের একটি মাত্র আওয়াজের মতো।

ময়নার রঙীন শাড়ি ও আলুথালু বেশ চোখে যেন ধাঁধা লাগিয়ে দেয় মন্মথের, পিচুটির মতো চোখে এঁটে যেতে চায় ঘোমটা পরা ভীরু লাজুক কচি চাষী মেয়েটার আধপুষ্ট দেহটি। এ যেন কবিতা। বি. এ. পাশ মন্মথের কাছে, যেন চোরাই স্কচ হুইস্কির পেগ, যেন মাটির পৃথিবীর জীর্ণক্লিষ্ট অফিসিয়াল জীবনে এককোঁটা টসটসে দরদ। তার রীতিমতো আপসোস হয় যে যোয়ান মর্দ মাঝবয়সী চাষাড়ে লোকটা এর স্বামী, ওর আদরেই মেয়েটার এই আলুথালু বেশ!

তবু মন্মথ জেরা করে, সংশয় মেটাতে গাঁয়ের দুজন বুড়োকে এনে সনাক্ত করায়। তার পরেও যেন তার বিশ্বাস হতে চায় না! ভুবন চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে গায়ে চাদর জড়িয়ে যতটা সম্ভব নিরীহ গোবেচারী সেজে। কিন্তু খোঁচা খোঁচা গোঁপদাড়ি ভরা মুখ, রুক্ষ এলোমেলো একমাথা চুল, মোটেই তাকে দেখায় না নতুন জামায়ের মতো। মন্মথ গর্জন করে হারাণকে প্রশ্ন করে, 'এ তোমার নাতনীর বর?'

হারাণ বলে, 'হায় ভগবান!'

ময়নার মা বলে 'জিগান মিছা, কানে শোনে না বদ্ধ কালা।'

'অ!' মন্মথ বলে।

ভুবন ভাবে এবার তার কিছু বলা বা করা উচিত।

'এমন হাঙ্গামা জানলে আইতাম না কর্তা। মিছা কইয়া আনছে আমারে। সড়াইলের হাটে আইছি, ঠাইরেন পোলারে দিয়া খপর দিলেন, মাইয়া নাকি মর মর, তখন যায় এখন যায়।'

'তুমি অমনি ছুটে এলে?'

'আসুম না? রতিভরি সোনারূপা যা দিব কইছিল, তাও ঠেকায় নাই বিয়াতে। মইরা গেলে গাও থেইকা খুইল্যা নিলে আর পামু?'

'ওঃ! তাই ছুটে এসেছ? তুমি হিসেবী লোক বটে।' মন্মথ বলে ব্যঙ্গ

করে। আর কিছু করার নেই, বাড়িগুলি তাল্লাস তছনচ করে নিয়ম রক্ষা করা ছাড়া। জামাইটাকে বেঁধে নিয়ে যাওয়া চলে সন্দেহের যুক্তিতে গ্রেপ্তার করে কিন্তু হাঙ্গামা হবে। দুপা পিছু হটে এখনো চাষীর দল দাঁড়িয়ে আছে, ছত্রভঙ্গ হয়ে চলে যায়নি। গাঁয়ে গাঁয়ে চাষাগুলোর কেমন যেন উগ্র মরিয়া ভাব, ভয় ডর নেই। ঘরে ঘরে তাল্লাস চলতে থাকে। একটা বিড়াল লুকানোর মতো আড়ালও যে ঘরে নেই, সে ঘরেও কাঁথাকালি হাঁড়িপাতিল জিনিসপত্র ছত্রখান করে খোঁজা হয় মানুষকে।

মন্মথ থাকে হারাণের বাড়িতেই। অল্প নেশায় রঙীন চোখ। এ সব কাজে বেরোতে হলে মন্মথ অল্প নেশা করে, মাল সঙ্গে থাকে কর্তব্য সমাপ্তির পর টানবার জন্যে—চোখ তার রঙীন শাড়িজড়ানো মেয়েটাকে ছাড়তে চায় না। কুরিয়ে কুরিয়ে তাকায় ময়নার কুড়ি বাইশ বছরের যোয়ান ভাইটা, উসখুস করে ক্রমাগত। ভুবনের চোখ জ্বলে ওঠে থেকে থেকে। ময়নার মা টের পায়, একটু যদি বাড়াবাড়ি করে মন্মথ, আর রক্ষা থাকবে না।

মেয়েটাকে বলে ময়নার মা, 'শীতে কাঁপুনি ধরেছে, শো না গিয়া বাছা? তুমিও শুইয়া পড় বাবা। আপনে অনুমতি ছান দারোগাবাবু, জামাই শুইয়া পড়ুক। কত মানত কইরা, মাথা কপাল কুইটা আনছি জামাইরে'—ময়নার মার গলা ধরে যায়, 'আপনারে কি কমু দারোগাবাবু—'

ময়না ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। ভুবন যায় না।

আরও দুবার ময়নার মা সস্নেহে সাদর অনুরোধ জানায় তাকে, তবু ভুবনকে ইতস্তত করতে দেখে বিরক্ত হয়ে জোর দিয়ে বলে, 'গুরুজনের কথা শোন, শোও গিয়া। খাড়াইয়া কি করবা? ঝাঁপ বন্ধ কইরা শোও।'

তখন তাই করে ভুবন। যতই তাকে জামাই মনে না হোক, এরপর না মেনে কি আর চলে যে সে জামাই? মন্মথ আস্তে আস্তে বাইরে পা বাড়ায়। পকেট থেকে চ্যাপ্টা শিশি বার করে ঢেলে দেয় গলায়।

পরদিন মুখে মুখে এ গল্প ছড়িয়ে যায় দিগ-দিগন্তে, দুপুরের আগে হাতিপাড়ার জগমোহন আর জোতদার চণ্ডী ঘোষ আর বড় থানার বড় দারোগার কাছে পর্যন্ত গিয়ে পৌছায়। গাঁয়ে গাঁয়ে লোকে বলাবলি করে ব্যাপারটা আর হাসিতে ফেটে পড়ে, বাহবা দেয় ময়নার মাকে। এমন তামাসা কেউ কখনো

করেনি পুলিশের সঙ্গে, এমন জব্দ করেনি পুলিশকে। কদিন আগে দুপুরবেলা পুরুষশূন্য গাঁয়ে পুলিশ এলে ঝাঁটা বঁটি হাতে মেয়ের দল দিয়ে ময়নার মা তাদের তাড়া করে পার করে দিয়েছিল গাঁয়ের সীমানা! সে যে এমন রসিকতাও জানে, কে তা ভাবতে পেরেছিল?

গাঁয়ের মেয়েরা আসে দলে দলে, অনিশ্চিত আশঙ্কা ও সম্ভাবনায় ভরা এমন যে ভয়ঙ্কর সময় চলেছে এখন, তার মধ্যেও তারা আজ ভাবনা চিন্তা ভুলে হাসিখুসিতে উচ্ছল।

মোক্ষদার মা বলে একগাল হেসে গালে হাত দিয়ে, 'মাগো মা ময়নার মা, তোর মন্থি এত?'

ক্ষেন্তি বলে ময়নাকে, 'কিলো ময়না, জামাই কি কইলো? দিছে কি?'

লাজে ময়না হাসে।

বেলা পড়ে এলে, কাল যে সময় ভুবন মণ্ডল গাঁয়ে পা দিয়েছিল প্রায় সেই সময়, আবির্ভাব ঘটে জগমোহনের। বয়স তার ছাব্বিশ সাতাশ, বেঁটে খাটো যোয়ান চেহারা, দাড়ি কামানো, চুল আঁচড়ানো। গায়ে ঘরকাচা সার্ট, কাঁধে মোটা সুতির সাদা চাদর। গাঁয়ে ঢুকে গটগট করে সে চলতে থাকে হারাণের বাড়ির দিকে, এপাশ ওপাশ না তাকিয়ে, গম্ভীর মুখে।

রসিক ডাকে দাওয়া থেকে 'জগমোহন নাকি? কখন আইলা?'

নন্দ বলে, 'আরে শোন, শোন, তামুক খাইয়া যাও।'

জগমোহন ফিরেও তাকায় না।

রসিক ভড়কে গিয়ে নন্দকে শুধোয়, 'কি কাণ্ড বুঝ্‌লা নি?'

'কেমনে কমু?'

অবাক হয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে দুজনে।

পথে মথুরের ঘর। তার সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতা আছে জগমোহনের। নাম ধরে হাঁক দিতে ভেতর থেকে সাড়া আসে না, বাইরের লোক জবাব দেয়। ঘরের কাছেই পথের ওপাশে একটা তালের গুঁড়িতে দুজন মানুষ বসে ছিল নির্লিপ্তভাবে, একজনের হাতে খোঁটা শুদ্ধ গরু-বাঁধা দড়ি।

তাদের একজন বলে, 'বাড়িতে নাই। তুমি কেডা, হারামজাদাটারে খোঁজ ক্যান?'

জগমোহন পরিচয় দিতেই দুজনে তারা অন্তরঙ্গ হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে।

'অ! তুমিও আইছ ব্যাটারে দুই ঘা দিতে?'

তা ভয় নেই জগমোহনের, তারা আশ্বাস দেয়, হাতের সুখ তার ফসকাবে না। কাল সন্ধ্যায় গেছে গাঁ থেকে, এখনো ফেরেনি মথুর, কখন ফিরে আসে ঠিকও নেই, তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না জগমোহনকে! মথুর ফিরলে তাকে যখন বেঁধে নিয়ে যাওয়া হবে বিচারের জন্য, সে খবর পাবে। সবাই মিলে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলার আগে তাকেই নয় সুযোগ দেওয়া হবে মথুরের নাক কানটা কেটে নেবার, সে ময়নার মার জামাই, তার দাবি সবার আগে।

'শাউড়ি পাইছিলা দাদা একখান!'

'নিজের হইলে বুঝতা।' জগমোহন জবাব দেয় ঝাঁঝের সঙ্গে, চলতে আরম্ভ করে। শুনে দুজনে তারা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে অবাক হয়ে!

আচমকা জামাই এল, মুখে তার ঘন মেঘ। দেখেই ময়নার মা বিপদ গনে। ব্যস্তসমস্ত না হয়ে হাসিমুখে ধীরে শান্তভাবে অভ্যর্থনা জানায়, তার যেন আশা ছিল, জানা ছিল, এ সময় এমনি ভাবে জামাই আসবে, এটা অঘটন নয়। বলে, 'আস বাবা আস। ও ময়না, পিড়া দে। ভাল নি আছে বেবাকে? বিয়াই বিয়ান পোলামাইয়া?'

'আছে।'

আরেকটুকু ভড়কে যায় ময়নার মা। কত গোসা না জমে জামায়ের কাটা ছাঁটা এই কথার জবাবে। ময়নার দিকে তার না-তাকাবার ভঙ্গিটাও ভাল ঠেকে না! পড়ন্ত রোদে লাউমাচার সাদা ফুলের শোভা ছাড়া আর কিছুই যেন চোখ চেয়ে দেখবে না শ্বশুরবাড়ির পণ করেছে জগমোহন? লক্ষণ খারাপ।

ঘর থেকে কাঁপা কাঁপা গলায় হারাণ হাঁকে, 'আসে নাই? হারামজাদা আসে নাই? হায় ভগবান!'

'নাতিরে খোঁজে,' ময়নার মা জগমোহনকে জানায়, 'বিয়ান থেইকা স্থাখে না, উতলা হইছে।'

ময়নার মা প্রত্যাশা করে যে নাতিকে হারাণ সকাল থেকে কেন স্থাখে না, কি হয়েছে হারাণের নাতির, ময়নার ভায়ের, জানতে চাইবে জগমোহন

কিন্তু কোন খবর জানতেই এতটুকু কৌতূহল দেখা যায় না তার।

'খাড়াইয়া রইলা ক্যান? বস বাবা বস।'

জগমোহন বসে। ময়নার পাতা পিঁড়ি সে ছোঁয় না, দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে উবু হয়ে বসে।

'মুখ হাত ধুইয়া নিলে পারতা।'

'না, যামু গিয়া অখনি।'

'অখনি যাইবা?'

'হ। একটা কথা শুইনা আইলাম। মিছা না খাঁটি জিগাইয়া যামু গিয়া। মাইয়া নাকি কার লগে শুইছিল কাইল রাইতে?'

'শুইছিল?' ময়নার মার চমক লাগে, 'মোর লগে শোয় মাইয়া, মোর লগে শুইছিল, আর কার লগে শুইব?'

'ব্রহ্মাণ্ডের মাইনষে জানছে কার লগে শুইছিল। চোখে দেইখা গেছে দুয়ারে ঝাঁপ দিয়া কার লগে শুইছিল।'

তারপর বেধে যায় শাশুড়ী-জামায়ে। প্রথমে ময়নার মা ঠাণ্ডা মাথায় নরম কথায় ব্যাপরটা বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করে, কিন্তু জগমোহনের ওই এক গোঁ! ময়নার মাও শেষে গরম হয়ে ওঠে। বলে, 'তুমি নিজে মন্দ, অন্যেরে তাই মন্দ ভাব। উঠানে মাইনষের গাদা, আমি খাড়া সামনে, এক দণ্ড ঝাঁপটা দিছে কি না দিছে, তুমি দোষ ধরলা। অন্যে তো কয় না।'

'অন্যের কি? অন্যের বৌ হইলে কইতো।'

'বড় ছোট মন তোমার। আইজ মণ্ডলের নামে এমন কথা কইলা, কাইল কইবা যুয়ান ভায়ের লগে ক্যান কথা কয়।'

'কওন উচিত। ও মাইয়া সব পারে।' শুধু গরম কথা নয়, ময়নার মা গলা ছেড়ে উদ্ধার করতে আরম্ভ করে জগমোহনের চোদ্দপুরুষ। হারণ কাঁপা গলায় চেঁচায়, 'আইছে নাকি? আইছে হারামজাদা? হায় ভগবান, আইছে?' ময়না কাঁদে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। ছুটে আসে পাড়াবেড়ানি নিন্দাছড়ানি নিতাই পালের বৌ আর প্রতিবেশী কয়েকজন স্ত্রীলোক।

'কি হইছে গো ময়নার মা?' নিতাই পালের বৌ শুধায়, 'মাইয়া কাঁদে ক্যান?'

তাদের দেখে সম্বিৎ ফিরে পায় ময়নার মা, ফোঁস করে ওঠে—'কাঁদে ক্যান?

ভাইটারে ধইরা নিছে, কাঁদব না ?'

'জামাই বুঝি আইছে খবর পাইয়া ?'

'শুনবা বাছা শুনবা। বইতে দাও, জিরাইতে দাও।'

ময়নার মার বিরক্তি দেখে ধীরে ধীরে অনিচ্ছুক পদে মেয়েরা ফিরে যায়। তাকে ঘাঁটাবার সাহস কারো নেই। ময়নার মা মেয়েকে ধমক দেয়, 'কাঁদিস না। বাপেরে নিয়া ঘরে গেছিলি, বেশ করছিলি, কাঁদনের কি ?'

'বাপ নাকি ?' জগমোহন বলে ব্যঙ্গ করে।

'বাপ না ? মণ্ডল দশটা গাঁয়ের বাপ। খালি জন্মো দিলেই বাপ হয় না, অন্ন দিলেও হয়। মণ্ডল আমাগো অন্ন দিছে। আমাগো বুঝাইছে, সাহস দিছে, একসাথ করছে, ধান কাটাইছে। না তো চণ্ডী ঘোষ নিত বেবাক ধান। তোমারে কই জগু, হাতে ধইরা কই বুইঝা ছাখো, মিছা গোসা কইরো না।'

'বুইঝা কাম নাই। অখন যাই।'

'রাইতটা থাইকা যাও। জামাই আইলা, গেলা গিয়া, মাইনষে কি কইব ?'

'জামায়ের অভাব কি। মাইয়া আছে, কত জামাই জুটবো।'

বেলা শেষ হতে না হতে ঘনিয়ে এসেছে শীতের সন্ধ্যা। অল্প অল্প কুয়াশা নেমেছে। ঘুঁটের ধোঁয়া ও গন্ধে নিশ্চল বাতাস ভারি। যাই বলেই যে গা তোলে জগমোহন তা নয়। ময়নার মারও তা জানা আছে যে, শুধু শাশুড়ির সঙ্গে ঝগড়া করে যাই বলেই জামাই গট গট করে বেরিয়ে যাবে না ময়নার সাথে বোঝাপড়া, ময়নাকে কাঁদানো, এখনো বাকি আছে। যদি যায় জামাই, মেয়েটাকে নাকের জলে চোখের জলে এক করিয়ে তারপর যাবে। আর কথা বলে না ময়নার মা, আস্তে আস্তে উঠে বেরিয়ে যায় বাড়ি থেকে। ঘরে কিছু নেই, মোয়ামুড়ি কিছু যোগাড় করতে হবে। খাক না খাক সামনে ধরে দিতেই হবে জামায়ের।

চোখ মুছে নাক ঝেড়ে ময়না বলে ভয়ে ভয়ে, 'ঘরে আস।'

'খাসা আছি। শুইছিলা তো ?'

'না, মা কালীর কিরা, শুই নাই। মায় কওনে খালি ঝাঁপটা দিছিলাম, বাঁশটাও লাগাই নাই।'

'ঝাঁপ দিছিলা, শোও নাই বেউলা সতী'।

ময়না তখন কাঁদে।

'তোমার লগে আইজ থেইকা শেষ।'

ময়না আরও কাঁদে।

ঘর থেকে হারাণ কাঁপা গলায় হাঁকে, 'আসে নাই? ছোঁড়া আসে নাই? হায় ভগবান!'

থেমে থেমে এক একটা কথা বলে যায় জগমোহন, না থেমে অবিরাম কেঁদে চলে ময়না, যতক্ষণ না কান্নাটা একঘেয়ে লাগে জগমোহনের, তখন কিছুক্ষণ সে চুপ করে থাকে। মুড়িমোয়া যোগাড় করে পাড়া ঘুরে ময়নার মা যখন ফিরে আসে, ময়না তখন চাপা সুরে ডুকরে কাঁদছে। বেড়ার বাইরে সুপারি গাছটা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে ময়নার মা। সারাদিন পরে এখন তার দুচোখ জলে ভরে যায়। জোতদারের সাথে, দারোগা পুলিশের সাথে লড়াই করা চলে, অবুঝ পাষণ্ড জামাইয়ের সাথে লড়াই নেই।

আপন মনে আবার হাঁকে হারাণ, 'আসে নাই? মোর মরণটা আসে নাই? হায় ভগবান!'

জগমোহন চুপ করে ছিল, এতক্ষণে পরে হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করে শালার খবর।—'উয়ারে ধরছে ক্যান?'

ময়নার কান্না থিতিয়ে এসেছিল, সে বলে, 'মণ্ডলখুড়ার লগে গোঁদলপাড়া গেছিল, ফিরতি পথে একা পাইয়া ধরছে।'

'ক্যান ধরছে?'

'কাইল জব্দ হইছে, সেই রাগে বুঝি।'

বসে বসে কি ভাবে জগমোহন, আর কাঁদায় না ময়নাকে। ময়নার মা ভেতরে আসে, কাঁসিতে মুড়ি আর মোয়া খেতে দেয় জামাইকে, বলে, 'মাথা খাও, মুখে দাও!'

আবার বলে, 'রাইত কইরা ক্যান যাইবা বাবা? থাইকা যাও।'

'থাকনের যো নাই। মা দিব্যি দিছে।'

'তবে খাইয়া যাও? আখা ধরাই? পোলাটারে ধইরে নিছে, পরাণডা পোড়ায়। তোমারে রাইখা জুড়ামু ভাবছিলাম।'

'না, রাইত বাড়ে।'

'আবার কবে আইবা?'

'দেখি।'

উঠি উঠি করেও দেরি হয়। তারপর আজ সন্ধ্যারাতেই পুলিশ হানার সেইরকম সোর ওঠে কাল মাঝরাত্রির মতো। সদলবলে মন্মথ আবার আচমকা হানা দিয়েছে। আজ তার সঙ্গের শক্তি কালের চেয়ে অনেক বেশী। তার চোখ সাদা।

সোজাসুজি প্রথমেই হারাণের বাড়ি।

'কি গো মণ্ডলের শাশুড়ি,' মন্মথ বলে ময়নার মাকে, 'জামাই কোথা?'

ময়নার মা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

'এটা আবার কে?'

'জামাই।' ময়নার মা বলে।

'বাঃ, তোর তো মাগী ভাগ্যি ভাল, রোজ নতুন নতুন জামাই জোটে! আর তুই ছুঁড়ি এই বয়সে—'

হাতটা বাড়িয়েছিল মন্মথ রসিকতার সঙ্গে ময়নার থুতনী ধরে আদর করে একটু নেড়ে দিতে। তাকে পর্যন্ত চমকে দিয়ে জগমোহন লাফিয়ে এসে ময়নাকে আড়াল করে গর্জে ওঠে, 'মুখ সামলাইয়া কথা কইবেন!'

বাড়ির সকলকে, বুড়ো হারাণকে পর্যন্ত, গ্রেপ্তার করে আসামী নিয়ে রওনা দেবার সময় মন্মথ দেখতে পায় কালকের মতো না হলেও লোক মন্দ জমেনি। দলে দলে লোক ছুটে আসছে চারিদিক থেকে, জমায়েত মিনিটে মিনিটে বড় হচ্ছে। মথুরার ঘর পার হয়ে পানা পুকুরটা পর্যন্ত গিয়ে আর এগোনো যায় না। কালের চেয়ে সাত আট গুণ বেশী লোক পথ আটকায়। রাত বেশী হয়নি, শুধু এগাঁয়ের নয়, আশেপাশের গাঁয়ের লোক ছুটে এসেছে। এটা ভাবতে পারে নি মন্মথ। মণ্ডলের জন্য হলে মানে বুঝা যেত, হারাণের বাড়ির লোকের জন্য চারিদিকের গাঁ ভেঙে মানুষ এসেছে! মানুষের সমুদ্রের, ঝড়ের উত্তাল সমুদ্রের সঙ্গে লড়া যায় না।

ময়না তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়েই রক্ত মুছিয়ে দিতে আরম্ভ করে জগমোহনের। নব্বই বছরের বুড়ো হারাণ সেইখানে মাটিতে মেয়ের কোলে এলিয়ে নাতির জন্য উতলা হয়ে কাঁপা গলায় বলে, 'ছোঁড়া গেল কই। কই গেল? হায় ভগবান!'

ছোট বকুলপুরের যাত্রী

গাড়িটা ঘণ্টাখানেক লেট করেছে।

ঠিক সময়ে পৌছলেও অবশ্য প্রায় সন্ধ্যা হয়ে যায়, স্টেশনের তেলের বাতিগুলি তার আগেই জ্বালানো হয়। প্ল্যাটফর্মে অল্প কয়েকজন মাত্র যাত্রী গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছিল, শঙ্কিত ও স্তব্ধভাবে। আরও গভীর রাত্রের ট্রেনের জন্যও এ স্টেশনে সাধারণত আরও অনেক বেশী যাত্রী জড়ো হতে দেখা যায়। আজ একদল সিপাই প্ল্যাটফর্মে যাত্রীর অভাব পূর্ণ করেছে।

গাড়ি দাঁড়ায় মিনিট দেড়েক। এই সময়টুকুর ব্যস্ততা এবং কলরবও আজ স্টেশনে ঝিমানো মনে হয়, তারপর গাড়ি ছেড়ে যাবার দু-চার মিনিটের মধ্যেই অদ্ভুতভাবে স্টেশন এলাকা যাত্রীশূন্য হয়ে ছমছমিয়ে আসে। গাড়ি থেকে যারা নেমেছে তারা কোনদিকে না তাকিয়ে তাড়াতাড়ি গেটে টিকিট দিয়ে পথে নেমে যায়—এত লোকে যে টিকিট কাটে এবং সদর গেটে টিকিট দাখিল করে স্টেশন ছাড়ে এও এক অসাধারণ ব্যাপার বটে। চারিদিকে এক নজর তাকালেই টের পাওয়া যায় যে বাড়ির টান আজ সকলের হঠাৎ বেড়ে যায়নি, স্টেশন এলাকা ছেড়ে তফাত হবার তাগিদেই যাত্রীদের এত তাড়া।

পথে নেমেও কেউ দাঁড়ায় না। স্টেশনের লাগাও তে-রাস্তার মোড়, দু-তিনটি দোকানে মাত্র আলো জ্বলছে, বাকিগুলি বন্ধ। চায়ের দোকানের আলোটা সবচেয়ে উজ্জ্বল, সাধারণত এসময় দোকানটা লোকে প্রায় ভরা থাকে, আজ একরকম শূন্য পড়ে আছে। প্রকাণ্ড বাঁধানো বটগাছের তলায় দুজন চাষী কিছু তরিতরকারি সাজিয়ে বসে আছে, কিন্তু ভিণ্ডি বেগুনের দরটা জিজ্ঞাসা করার কৌতূহলও যেন আজ কারো নেই।

স্টেশনের বাতির মতোই মিটমিট করে দিবাকরের চোখ। সে এদিক ওদিক তাকায়। চোখের পলকে পলকে তার জানা চেনা স্টেশনটি যেভাবে যাত্রীশূন্য হয়ে

যেতে থাকে সেটা যেন ম্যাজিকের মতো ঠেকে তার কাছে। একদল সশস্ত্র সিপাইয়ের দখলে স্টেশনের চেহারা যে অভিনব হয়েছে এটা তার খাপছাড়া লাগে না। এ দৃশ্য দেখা অভ্যাস আছে। কাল এইখানে যে ব্যাপার ঘটে গেছে তার বিবরণও সে গাড়িতে শুনেছে। এরকম দৃশ্যই সে প্রত্যাশা করছিল। 'দেখলি ব্যাপার?'

বাচ্চাটাকে বুকে চেপে আন্না চাপা গলায় বলে, 'দেখব আবার কি? হাঙ্গামা হয়েছে, পাহারা বসেছে, না তো কি থেটার হবে? হাবার মতো দাঁড়িয়ে থেকোনি, যাই চলো।'

বিড়ি সিগারেট টানতে টানতে ক-জন বাবুমতো লোক একান্ত বেপরোয়া ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে যাত্রীদের লক্ষ্য করছিল, নাম ধামও জিজ্ঞাসা করছিল দু-একজনকে। স্টেশন যাত্রীশূন্য হয়ে আসায় এতক্ষণে দিবাকরদের দিকে তাদের নজর পড়ে। মাঝবয়সী বেঁটে লোকটি মুখ বাঁকিয়ে বলে, 'চাষাভুষো বাজে লোক, যেতে দাও।'

তার খদ্দর পরা ছোকরাবয়সী সঙ্গীটি পান-রাঙা মুখে আরও দুটো পান পুরে চিবুতে চিবুতে আন্নার দিকে চেয়ে থাকে, আচমকা প্যাচ করে পিক ফেলে হাত উঁচিয়ে আঙুল ঠেরে দিবাকরকে কাছে ডাকে, 'এই! শোন!'

দিবাকর অবশ্য দেখেও ছাখে না, শুনেও শোনে না। পুঁটুলিটা বগলে চেপে দড়ি বাঁধা হাঁড়িটা ঝুলিয়ে আন্নাকে সঙ্গে নিয়ে গুটি গুটি এগোতে থাকে।

ওরা জন তিনেক তখন সামনে এসে দাঁড়ায়।

'টিকিট আছে?'

'আছে।'

শার্টের বুক পকেট থেকে দিবাকর দু-খানা টিকিট বার করে দেখায়। 'কোথা যাবে?'

'আজ্ঞে ছোটবকুলপুর যাব।'

শুনে তারা যেন একটু চমকে যায়। পানখোর ছোকরা আবার প্যাচ করে খানিকটা পিক ফেলে। গতকালের হাঙ্গামায় প্ল্যাটফর্মের লাল কাঁকরে খানিক রক্তপাত ঘটেছিল, ছোঁড়া যেন পানের পিক দিয়েই তার জের টেনে প্ল্যাটফর্মটা রাঙা করে দিতে চায়। দিবাকরও পান ভালবাসে, রাস্তায় পুরো চার পয়সার তৈরি

পান কিনেছে। কাগজের ঠোঙাটা বার করে সেও একটা পান মুখে পুরে দেয়। লোকগুলির এত কাছে দাঁড়ানোর জন্যই বোধ হয় পানটা তার একটু তিতো লাগে। ওদের মাথার পিছনে দূরে কারখানাটার উঁচুতে টাঙানো নিঃসঙ্গ আলোটা তার চোখে পড়ছিল, অন্ধকার আকাশে যেন বিনা অবলম্বনে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। ওই কারখানার ধর্মঘট নিয়ে কাল স্টেশনের হাঙ্গামা। তিনজন নেতাকে ধরে ট্রেনে চালান দেবার সময় কয়েক শ' মজুর তাদের ছিনিয়ে নিতে এসেছিল। তখন গুলি চলে, রক্তপাত ঘটে। গাড়িতে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ শোনার পর থেকে দিবাকরের আধা-চাষী আধা-মজুর প্রাণটা বড়ই বিগড়ে আছে।

বেঁটে লোকটি জিজ্ঞাসা করে, 'রাত করে ছোটবকুলপুর যাবে? সেখানকার খবর জানো সব?'

দিবাকর নির্লিপ্তভাবে বলে, 'খবর জেনেই এয়েছি বাবু। আত্মীয়-কুটুম আছে সেথা, খবর নিতে এয়েছি তারা বেঁচে আছে না স্বাধীন হয়েছে।'

বেঁটে বলে, 'ও বাবা তোমার দেখি চাটং চাটং কথা?'

'না বাবু, গরিব মানুষ কথা কোথায় পাব?'

তেমাথার পাশে দুটি খোলা গরুর গাড়ি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, কাছে মাটিতে শুয়ে জাবর কাটছে একজোড়া শীর্ণ ও শান্ত বলদ। স্টেশনের সামনে সাধারণত দু-তিনটি ছ্যাকড়া ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে, ঘোড়া যত প্রাচীন, গাড়িগুলি ততোধিক। বেগার খাটার ভয়ে গরিব গাড়োয়ানেরা আজ গাড়িই বার করেনি। গাড়ি চেপে শ্বশুরবাড়ি যাবার মতো বড়লোক দিবাকর কোনদিন ছিল না, আজ কিন্তু সে গোড়ার গাড়ি চেপেই যেত—আন্নার রূপার গহনা বাঁধা দিয়ে এই উদ্দেশ্যেই সে টাকা যোগাড় করে এনেছে। ছোটবকুলপুর পৌঁছতে রাত হবে এটা জেনেই তারা রওনা দিয়েছে, তবে রাত করে ছেলেমেয়ে আর শিশু নিয়ে তিন মাইল রাস্তা পাড়ি দিতে ঘোড়ার গাড়ির আশাটা ছিল। এখন ভরসা গরুর গাড়ি।

'গাড়োয়ান কই হে!' দিবাকর ডাকে।

দুই গাড়ির দুজন মালিকেরই আবির্ভাব ঘটে। আবছা আলোয় মনে হয় একজন যেন পুরানো বটগাছটা এবং অন্যজন দোকান ঘরের বেড়া ভেদ করে কাছে এসে দাঁড়াল।

তাদের তাড়া নেই, গরুর গাড়িতে কম্পিটিশনও নেই। ধীরেসুস্থে তারা জানতে

চায় দিবাকরেরা কোথায় যাবে।

'ছোটবকুলপুর।'

শুনে তারা দুজনেই ঘাড় নাড়ে। 'ওরে বাবা, রাত্রিবেলা ছোটবকুলপুর কে যাবে! সেখানে সৈন্যপুলিশ গ্রাম ঘিরে আছে, রীতিমতো লড়াই চলছে।'

চারজনেই তারা সম্মুখে পথটার দিকে তাকায়। ছোটবকুলপুরের এ রাস্তা কিছুদূর গিয়ে বাঁক নিয়েছে, কিন্তু সে পর্যন্ত এখন নজর চলে না—মনে হয় বিপজ্জনক অন্ধকারেই বুঝি পথটা হারিয়ে গেছে। বাঁ হাতে কোলের বাচ্চাকে সামলে ডান হাতে আন্না দিবাকরকে এক পা পিছু ঠেলে দেয়, নিজে এগিয়ে দায়িত্ব নেয়।

'ওখান তক্ নাই বা গেলে বাবা? যদ্দুর যেতে চাও নিয়ে চলো, বাকি রাস্তা মোরা হেঁটে যাব। ভাড়া ঠিকমতো পাবে।'

রাম বলে, 'রাতের বেলা কে অত হাঙ্গামা করে, না কি বল ঘোষের পো?'

'ওমা, তোমরা পুরুষ হয়ে ডরাচ্ছ!' আন্না মিষ্টি সুরে বলে, 'বাচ্চা কোলে মেয়েছেলে যাব, তোমরা পুরুষ হয়ে ডরাচ্ছ।'

রাম চুপ করে থাকে। তার বয়স বেশী, সাহস কম। গগন ঘোষ বলে, 'কমলতলা তক যেতে পারি।'

তাই হোক। কমলতলার সীমা পেরিয়েও যদি নামিয়ে দেয় তবু প্রায় আধ-মাইল হাঁটতে হবে। পুরো দেড়ক্রোশ হাঁটার চেয়ে সে অনেক ভাল। একটা গাড়িতে বলদ জুড়লে আন্না উঠে বসে, এ কসরত তার অভ্যাস আছে। গগনের গাড়িটা নড়বড়ে, ক্রমাগত লেজ মলে তাড়া না দিলে শীর্ণ বুড়ো বলদ এক পা এগোতে চায় না। আন্না আগ্রহের সঙ্গে ছোটবকুলপুরের খবর জিজ্ঞাসা করে, তবে গাঁয়ে ঘরে পৌঁছবার আগে বাপ-ভায়ের কুশল জানার আশা সে করে না। গ্রামের সাধারণ অবস্থার ঘনিষ্ঠতর বিবরণ, অনেক নতুন খবর গগনের কাছে জানা যায়। দূর থেকে তারা শুনেছিল যে ছোটবকুলপুরের অবস্থা অতি শোচনীয়, প্রচণ্ড আঘাতে গাঁয়ের গেরস্থ জীবন তছনছ চুরমার হয়ে গেছে। গগনের কাছে শোনা যায়, ব্যাপার ঠিক তা নয়। গোড়ায় গাঁয়ের মধ্যে খুব খানিকটা অত্যাচার হয়েছিল, কিন্তু তারপর গাঁয়ের লোক এমন আঁটসাঁট বেঁধে তৈরী হয়ে জেঁকে বসেছে যে চৌধুরী বা ঘোষেদের কোন লোক অন্তত দু ডজন রাইফেল ছাড়া গাঁয়ের ভেতরে ঢুকতেই সাহস পায় না। একবার মুখ খুললে গগনকে থামানো দায়। গরুর লেজ

মনে মনে মুখে গরু তাড়ানোর অদ্ভুত আওয়াজের ফাঁকে ফাঁকে সে চারিদিকের অবস্থা বর্ণনা করে যায়, তার মতে কলিযুগ সত্যই এবার শেষ হতে চলেছে। সমস্ত লক্ষণ থেকে তাই মনে হয়। নইলে রাজায় প্রজায় এমন যুদ্ধ বাধে?

'মোরা কলির পাপী লোক, এ লড়ায়ে মোরা মরব। মোদের ছেলে-পুলেরা ফের সত্যযুগ করবে!'

অন্ধকার নিস্তব্ধ পথে বেশ সোরগোল তুলেই গাড়ি চলে। রাস্তার ধারের কোন কোন ঘরের বেদখল দাওয়া থেকে মাঝে মাঝে টর্চের আলো এসে পড়ে গাড়িতে, গুরুগম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন আসে: 'কে যায়? কোথা যাবে?'

গগন জবাব দেয়: 'ইস্টিশনের ট্রেইনের মেয়েছেলে! কমলতলি যাবে।' গাড়ি গাছপালা বাড়িঘরের আড়ালে যাওয়া পর্যন্ত টর্চের আলো আন্নার গায়ে সাঁটা থাকে, ট্রেনের প্যাসেঞ্জার নিরীহ নির্দোষ মেয়েছেলেই যে যাচ্ছে গাড়িটাতে সেটা যেন যতক্ষণ সম্ভব প্রত্যক্ষ করা চাই।

এ অঞ্চলে ঘন বসতি, গায়ে গায়ে লাগানো বড় বড় গ্রাম। তবু এখন সন্ধ্যা-রাত্রেই রাস্তায় প্রায় লোক চলাচল নেই। গেঁয়ো লোকের পথ চলাও খাপছাড়া রহস্যময় হয়ে উঠেছে! এই পথ ধরেই গ্রাম থেকে গ্রামান্তের লোকে পাড়ি দেয়, আজ যেন চারিদিকে সকলেরই দীর্ঘ পথ হাঁটার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। রাস্তার পাশ থেকে আচমকা হয়তো একজন রাস্তায় উঠে আসে, জোরে, জোরে পা ফেলে খানিকটা এগোতে না এগোতেই আবার রাস্তার ধারের অন্ধকারেই মিশিয়ে যায়। মাত্র দুটি একটি লোকের এরকম টুকটাক খুচখাচ খুচরো চলাফেরার প্রয়োজন নির্জনতা ও স্তব্ধতাকে আরও বেশী অস্বাভাবিক করে তোলে।

কদমতলায় মস্ত ছাউনি পড়েছে। চোখ তুলে সেদিকে চেয়ে গগন মাথা চুলকায়।

'যাব নাকি এগিয়ে ছোটবকুলপুর তক্?'—গগন অনুমতি চাওয়ার সুরে বলে, দিবাকরেরাই যেন তাকে যেতে বারণ করেছে! 'চলো যাই মেয়া, তোমায় নিয়ে যাই। মাঝ রাস্তায় কেমন করে নামিয়ে দি বলো, আঁ?'

আন্না খুশী হয়ে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলে, 'ভগবান মুখপোড়া [illegible] কানা, নইলে তোমার নতুন গাড়ি হত বাবা, জোয়ান বলদ হত!'

ছোটবকুলপুরের প্রান্ত ছুঁতে ছুঁতে একেবারে তিন তিনটে টর্চের আলো [illegible]

গাড়িতে এসে পড়ে। কিছু হাঁক ডাক শোনা যায়। বেশ বোঝা যায় গাঁয়ে ঢুকবার মুখে যারা পাহারা দিতে গেড়ে বসেছে বিদ্রোহী গ্রামটিকে বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে, অসময়ে গগনের গরুর গাড়ির আবির্ভাবে তাদের মধ্যে খানিকটা সানন্দ উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছে। গাড়িতে শুধু দুটি বলদ, একটি গাড়োয়ান, একজন পুরুষ ও একটি মেয়েমানুষ এবং একটি বাচ্চা—সুতরাং ভয়ের কোন কারণ নেই।

দেখতে দেখতে সাত আটজন গাড়িটা ঘিরে ফেলে। টুপিটা ঠিক করে বসাতে বসাতে মাঝবয়সী মোটা লোকটি, সেই বোধ হয় বেসরকারী দলপতি, গম্ভীর গলায় বলে, 'কোথা থেকে আসছ ?'

গগন বলে, 'ইস্টিশনের টেরেনগাড়ির প্যাসিঞ্জার আজ্ঞা।'

'শাট্ আপ! তোকে কে জিজ্ঞেস করেছে ? তোমার নাম ?'

'মোর নাম দিবাকর দাস।'

'বাপের নাম ? কোথায় থাক ? কি কর ? এদিকে এসেছ কেন ?'

'বাপের নাম মনোহর দাস। তেনা স্বগগে গেছেন—তিপ্পান্নের মন্বন্তরে। রোগ ব্যারাম কিছু নয়, উপোস দিয়ে মিত্যু। হাওড়ায় থাকি, ঘনশ্যাম-বেটেনট কারখানায় মজুর খাটি। ইদিকে হাঙ্গামা শুনলাম, বৌ কাঁদতে লাগল যে তার বাপ ভাই মরেছে না বেঁচে রয়েছে। তা ভাবলাম কি যে কারখানার ধরমঘট দু-দশ দিনে মেটার নয়, যা দিনকাল। বৌকে নিয়ে দেখে আসি শ্বশুরবাড়ির ব্যাপার কি।' সবিনয় স্পষ্ট সরল ভাষায় দিবাকর তাদের আগমনের কারণ ও বিবরণ দাখিল করে। কাঁদাকাটা করে না বলে, ভয়ে দিশেহারা হয়ে পায়ের তলায় আছড়ে আছড়ে পড়ে না বলে বোধ হয় তার ব্যাখ্যা এদের পছন্দ হয় না।

'পুঁটলিতে কি আছে ? বোমা বন্দুক ?'

'আজ্ঞে কাঁথা কাপড়।'

'তুমি যে সত্যি দিবাকর দাস, মজুর খাটো, শ্বশুরবাড়ি আসছ, কোন বদ মতলব নেই, তার প্রমাণ দিতে পার ?'

'কি প্রমাণ দেব বলেন ? সাক্ষী প্রমাণ তো সাথে আনিনি।'

ষোল সতের বছরের স্বেচ্ছাসেবক ফর্সা ছেলেটি খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে, দীর্ঘ থলথলে চেহারার প্রৌঢ়বয়সী লোকটির ধমকে বিষম খেয়ে থেমে যায়, কাসতে

কাসতে বেদম হয়ে পড়ে।

আন্না বলে, 'গাঁয়ের চাষা পাড়ার দশটা লোক ডেকে পাঠাও না বাবুরা, মোকে দু-চারজন চিনবেই, গাঁয়ের মেয়া আমি।'

'সে তো চিনবে, না চিনলেও চিনবে। যাদের সঙ্গে যোগসাজস তাঁদের যদি না চিনবে তো কাদের চিনবে?'

আন্না দিবাকরের কানে কানে বলে, 'গাঁয়ের লোক ডাকতে ডরাচ্ছে, জানো?'

দীর্ঘ থলথলে লোকটি আঙুল উঁচিয়ে বলে, 'এই? কানে কানে কী কথা হচ্ছে? চুপি চুপি সলাপরমর্শ চলবে না, খপর্দার।'

'গাঁয়ে যাওয়া কি বারণ বাবু? একশো চুয়াল্লিশ রটিয়েছো?' দিবাকর প্রশ্ন করে।

কদমছাঁটা চুল লম্বাটে মাথা পাঞ্জাবি গায়ে বয়াটে চেহারার ছোঁড়াটা বলে, 'বারণ কেন, বারণ নেই। তোমরা কে, কি মতলবে এসেছ জানা গেলেই যেতে দেওয়া হবে।'

'ওসব যাতে জানা যায় তার একটা বিহিত কর বাবুরা?'

'চোপ, তামাশা হচ্ছে, না?'

ধমকানির চোটে দিবাকরেরা চুপ হয়ে যায়, বাচ্চাটা ককিয়ে কেঁদে উঠে প্রতিবাদ জানায়। ওদের দিকে পিছন ফিরে বসে ছেলেকে শান্ত করতে করতে আন্না তাদের মন্তব্য ও পরামর্শ শোনে। আচমকা গরুর গাড়ি চেপে হাজির হয়ে তারা যে গুরুতর ও জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে তা নিয়ে মানুষগুলি রীতিমতো বিব্রত ও বেশ খানিকটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। সঙ্গের জিনিস, বেশভূষা, চেহারা দেখে আর কথাবার্তা শুনে সত্যি সত্যি টের পাবার জো নেই যে এরা সত্যিকারের নিরীহ সাধারণ, গোবেচারী চাষামজুর, মাগভাতার ছাড়া অন্য কিছু নয়, কিন্তু সেটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে দারুণ সন্দেহের কারণ। যে তাণ্ডব চলেছে ছোটবকুলপুরে কদিন ধরে, তাতে সত্যিকারের কোন ভীরু মুখ্য ছোটলোক মাগছেলে সাথে নিয়ে সাধ করে কখনো তার মধ্যে আসতে চায়? তাও আবার হাঙ্গামার খবর জানবার পরে! বাজে লোকের এ সাহস হবে কোত্থেকে? তার চেয়েও বড় কথা, সন্দেহের কথা, চারিদিকে এত রাইফেল বন্দুকের সমারোহ দেখেও ওরা মোটে ভড়কে যায়নি, দিব্যি নির্ভয় নিশ্চিন্ত ভাব।

একজন নীচু গলায় বলে, 'নিশ্চয় কোন ডেঞ্জারাস লোক ছদ্মবেশে এসেছে।'

আরেকজন বলে, 'সার্চ করা যাক না?'

দীর্ঘ থলথলে লোকটি হুকুম দেয়, 'এই! জিনিসপত্র নিয়ে নামো।' তার মুখের কথা খসতে না খসতে দুজনে দিবাকরকে ধরে টেনে নামিয়ে দেয়। উৎসাহ অথবা উত্তেজনার আতিশয্যে একজনের হাত থেকে পড়ে গিয়ে মুখবাঁধা মাটির হাঁড়িটা ভেঙে যায়, ছড়িয়ে পড়ে আধ হাঁড়ি জল আর তাতে কিলবিল করে গোটা ছয়েক শিং মাছ! দিবাকর গোসা করে বলে, 'দিলে তো বাবুরা, গরিবের পথ্যির দফা মেরে দিলে তো? রুগী বৌটা এখন খাবে কি!'

'বলি ওহে দিবাকর দাস', একজন গম্ভীর মুখে বলে, 'কারখানায় খেটে খাও বললে না? কুলি মজুরের বৌরা কবে থেকে শিং মাছের ঝোল খাচ্ছে হে? পাঁচ ছ-টাকা শিং মাছের সের।'

'শিঙিমাছ খাওয়া মোদের বারণ আছে নাকি বাবু?'

এ ফোড়নের অপমানে ক্রুদ্ধ হয়ে গর্জন করে ওঠে, 'শাট্ আপ বেয়াদপ!'

পোটলাটা খুলে তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়, তাতে একটা অঘটন ঘটে যায়। আন্নার বাচ্চাটা রাস্তায় দু-একবার পায়খানা করেছে, নোংরা ন্যাকড়া দলা পাকিয়ে আন্না পুঁট্লির মধ্যে রেখেছিল। ঘাঁটতে যাওয়ার অনুসন্ধানীর হাতে ময়লা লেগে যায়! গন্ধে ও স্পর্শে রাগ চড়ে যাওয়ায় বেহিসাবীর মতো পুঁটলিটাতে সে বল শুট করার মতো লাথি মেরে বসে। ফলে কাদার মতো তরল পদার্থ খানিকটা তার পায়েও লাগে, ছিটকে বন্দুকের গায়েও একটু আধটু লেগে যায়। গাড়িতে বিছানো বিচালি তুলে, ছেঁড়া বস্তাটার ভাঁজ খুলে খোঁজার পর গগন আর দিবাকরের গা খোঁজা হয়। দিবাকরের শার্টের পকেট থেকে বার হয় পানের মোড়কটা।

'বাঃ, সাজা পান! দে তো একটা।'

তিনটি পান অবশিষ্ট ছিল, তিনজনের মুখে যায়। পান চিবোতে চিবোতে একজন লণ্ঠনের আলোয় পান মোড়া ছাপান কাগজটার দিকে এক নজর তাকিয়েই যেন বৈদ্যুতিক শক্ খেয়ে চমকে ওঠে। কাগজটা ভাল করে মেলে ধরে সে বিস্ফারিত চোখে বড় হরফের হেডলাইনটার দিকে চেয়ে থাকে।—"ছোট বকুলপুরের সংগ্রামী বীরদের প্রতি।"

নিগূঢ় আবিষ্কারের উত্তেজনায় কাঁপা গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'পাওয়া গেছে!

ইশ্‌তেহার পাওয়া গেছে!'

ইশ্‌তেহার? তাই বটে। বিপজ্জনক ইশ্‌তেহার! যদিও দুমড়ে মুচড়ে চুন আর পানের রসে মাখামাখি হয়ে গেছে, তবু চেষ্টা করে আগাগোড়া পড়া যায়। পড়তে পড়তে চোখও কপালে উঠে যায়।

তবু তারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। আর শূন্যে হাতড়াতে হবে না, মনগড়া সন্দেহ সংশয়ে জর্জরিত হতে হবে না, একেবারে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেছে হাতের মুঠোয়। এবার ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যাবে।

'এ ইশ্‌তেহার পেলে কোথা?'

প্রশ্নটার যেন স্বাদ আছে এমনিভাবে আরামে জিভে জড়িয়ে জড়িয়ে উচ্চারণ করা হয়।

'ইশ্‌তেহার? ইশ্‌তেহারের তো কিছু জানি না! চার পয়সার পান কিনলাম, পানওয়ালা ও কাগজটাতে জড়িয়ে দিল।'

'পানওয়ালা জড়িয়ে দিল না তুমি ভেবে চিন্তে পান কিনে ইশ্‌তেহারটাতে জড়িয়ে নিলে?'

'কেন? তা কেন করতে যাব?'

'আর ঢং কোরো না। এবার আসল নাম বল দিকে।'

দিবাকর আর আন্না পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়।

মাটির সাকী

দেহে নাই কান্তি মনে নাই শান্তি।

গরীবের এ দুটি অভাব চিরদিনের।

কিন্তু চিরদিনের অভাবও স্বভাবে পরিণত হয় না, একদিন সহিয়া যায় এই মাত্র এবং তাহাতেও আপসোস বড় কম নহে।

নিজের একটা অপ্রিয় অকথ্য রূপান্তরের আপসোস।

ওমনি বাস ট্রেন, ছ'টা সতর মিনিটে ছাড়িয়া বজবজ যাইবে। ট্রেনটি এমনি সংক্ষিপ্ত যে মেয়েগাড়ীর বাহুল্য নাই। গাড়ী ছাড়িবার কয়েক মিনিট পূর্ব্বে উঠিয়া সুশ্রী মেয়েটি ঠিক সামনে শক্ত হইয়া বসিয়া আছে। মুখের দিকে চাহিবার ইচ্ছাও যেন হয় না। ভয় করে! মনে হয়, ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিলে পাতলা ঠোঁটদু'টি শুষ্ক ও শীর্ণ হইয়া উঠিবে, মসৃণ গাল ভাঙিয়া ব্রণের দাগে ভরিয়া যাইবে, ভাসা ভাসা চোখদুটি বুভুক্ষায় মুমূর্ষু পশুর চোখের মত পীড়িত ও সকাতর হইয়া উঠিবে, কপালে দেখা দিবে তেলমাখা চটচটে ঘাম! রূপ দেখিলে দু'চোখ কুরূপের স্বপ্নে বিভোর হইয়া যায়! কী আতঙ্কেই মিনিটগুলি ভরিয়া উঠিল।

মাত্র দশ মিনিটের পথ, গাড়ী ষ্টেশনে দাঁড়াইল। লাইনের একদিকে শহরতলী বালীগঞ্জ, অপরদিকে গ্রাম কসবা। আভিজাত্যের ছাপমারা পিচ-বাঁধানো পথটি রেলের গেট পার হইয়াই গোবর আর কাদায় ভরিয়া উঠিয়াছে। দু'পাশের দোকানগুলির গ্রাম্য মূর্ত্তির গায়ে শহুরে ভাবের তালি লাগানো—খালি পায়ে বুটপরা মানুষের মত। কিন্তু এগুলির দিকে চাহিয়া নিত্যই শঙ্করের মনে হয় যে এ রকম একটা দোকান দিতে পারিলেও বুঝি মন্দ হইত না।

ঘোষালপাড়া ছাড়াইলেই শঙ্করের বাড়ী। বাড়ীটি পাকাও বটে, দোতলাও বটে; কিন্তু যেমন পুরাতন তেমনি ক্ষুদ্র। পথ হইতে দোতলার খোলা ছাদে উঠিবার খোলা সিঁড়ি খানিকটা চোখে পড়ে, মনে হয় চূণবালির বাঁধনহীন কতকগুলি

আলগা ইটে পা দিয়া এ বাড়ীর লোকের উর্দ্ধগতির প্রয়াস। স্থানটি কিন্তু বেশ ফাঁকা আর পরিষ্কার। বাড়ীর সামনে একটা পুকুর—ছোট কিন্তু জল পচা নয়। দক্ষিণে হাত পঞ্চাশেক মাঠের ব্যবধানে রায় বাহাদুর মহাদেব বোসের বাড়ী। রায় বাহাদুরের অনেক টাকা ছিল বলিয়া এখানে সস্তা জমি কিনিয়া বাড়ী করিয়াছিলেন। রায় বাহাদুর এখন বাঁচিয়া নাই, ছেলে সুকান্ত বাপের টাকা ও বাড়ীর মালিক। বড় বড় ঘর তুলিয়া, দামী আসবাবে সাজাইয়া, ছবির ফ্রেমের মত চারিদিকে বাগান করিয়া এবং অন্যান্য বহুবিধ সংস্কারের দ্বারা সে বাড়ীটিকে বাসোপযোগী করিয়া নিয়াছে। বাগানের একটা যুবতী ও পুষ্পবতী বকুলিকার ছায়ায় বসিয়া নিত্য অপরাহ্নে সে পত্নী হিমানীর সঙ্গে চা পান করে।

আপিস-ফেরত পুকুরপাড় ঘুরিয়া নিজের বাড়ীর দরজায় যাইবার সময়টুকু শঙ্কর ইহাদের দেখিতে থাকে। মৃদু হাসি ও কথার মাঝে মাঝে চায়ের কাপে চুমুক দেওয়ার বিরাম, হ্রস্বপদ লোমশ কুকুরটিকে কাছে টানিয়া মাথা চাপড়ানো, আশে পাশে দুই চারিটা বকুলফুলের এলোমেলো বর্ষণ, শঙ্করের চোখে ইহা আর পুরানো হইল না। রোজই তার মনে হয় কলেজ-জীবনে পড়া কবিতাগুলির এক একটি বাছিয়া নিয়া উহারা যেন অভিনয় করে।

চেনা আছে, পরিচয় নেই। ও পক্ষে আগ্রহের অভাব এ পক্ষে সঙ্কোচের বাধা। কল্পনাতীত উপভোগ্য জীবনটা উহারা কি ভাবে ভোগ করে জানিবার সকরুণ কৌতূহল নিয়া ভাঙা ঘরে শঙ্কর দিন কাটায়।

পয়সার টানাটানি, ছেলেমেয়ের কান্না, আর বিধুর ধুঁকিতে ধুঁকিতে রান্না করা, বাসন মাজার ফাঁকে ফাঁকে অদৃষ্টের নিন্দাবাদ।

ন'টা এগারর গাড়ীতে আপিসে গিয়া ছ'টা সতরর গাড়ীতে বাড়ী ফেরা।

জীবনের এত অধিক বৈচিত্র্য সহ্য হইয়া গিয়াছে বলিয়া আপসোস করিয়া মরে।

আজ বকুলতলা খালি দেখিয়া সে বিস্মিত হইল। সচরাচর ইহা ঘটে না। শেষ বেলায় বকুলতলায় আসিয়া বসার নেশা যে কত তীব্র দূর হইতেও সে যে

তাহা জানে।

বাড়ী ঢুকিয়াই কারণটা বোঝা গেল। ছেলেমেয়ে তিনজন কাঁদ-কাঁদ মুখে একপাশে দাঁড়াইয়া আছে, বিধু চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছে চৌকির মলিন বিছানায় এবং শিয়রের কাছে টুলে বসিয়া হিমানী তার মাথায় ডবল আইসব্যাগ চাপিয়া ধরিয়া আছে।

অবস্থাটা বুঝিতে একটু সময় নিয়া শঙ্কর প্রশ্ন করিল, কি হয়েছে?

হিমানী বলিল, জ্বর। অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিলেন, এখনো জ্ঞান হয় নি। ছেলেদের চেঁচামেচি শুনে এসে দেখি মেঝেতে প'ড়ে আছেন।

ঘামে জামাটা ভিজিয়া গিয়াছিল কিন্তু হিমানীর সামনে খোলা চলে না—তলায় গেঞ্জি নাই। স্বামীর খালি গা'ও হিমানী কোনদিন দেখে নাই বলিয়াই শঙ্করের বিশ্বাস। বোতামগুলি আলগা করিয়া দিয়া সে বলিল, আমার আপিস এত দূরে যে ওরা চেঁচিয়ে ম'রে গেলেও শুনতে পাই না।

এই বাহুল্য কথাটা বলিবার উদ্দেশ্য অবশ্য বাহুল্য নয়, হিমানী চুপ করিয়া রহিল।

ছোট মেয়েটি বাবাকে দেখিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছিল, চোখের শাসনে তার কান্না থামাইয়া শঙ্কর বলিল; আজ এসে দেখছি অজ্ঞান, আর একদিন এসে হয় তো দেখব ম'রে গেছে!

শঙ্করের আশঙ্কা হাল্কা করিয়া দিবার কোন চেষ্টা না করিয়া হিমানী বলিল, এ সময় কোন আত্মীয়াকে এনে কাছে রাখা উচিত।

শঙ্করের সুর তৎক্ষণাৎ বদলাইয়া গেল!

এখনি? এই তো মোটে সাত মাস। এখন ভয় কিসের?

হিমানীর মুখের উপর দিয়া একটা কালো মেঘ আসিয়া গেল, কথা কহিল ক্লিষ্ট স্বরে, এ যে কী ভয়ানক সময় আপনি বুঝবেন না। যত সাবধান হওয়া যাক ভয় কমে না। সর্ব্বদা একজন মেয়েমানুষ কাছে না থাকলে যে কি সর্ব্বনাশ হয়ে যেতে পারে—

অন্ধকারে সাপের ঠাণ্ডা স্পর্শ পাওয়ার মত শিহরিয়া সে চুপ করিল। দেখা গেল মুখ তার ভারি বিবর্ণ হইয়াছে। তিনটি সন্তানের জননীর সম্বন্ধে অপুত্রবতীর আশঙ্কার পরিমাণটা শঙ্করের কাছে পরমাশ্চর্য্যের মত লাগিল। এ ভাবে হিসাব করিলে সকল অবস্থায় নরনারী-নির্ব্বিশেষে কতরকম সর্ব্বনাশই তো হইতে পারে,

মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া আধঘণ্টার ভিতর তার পঞ্চত্বলাভও সৃষ্টিছাড়া কিছুই নয়, সেজন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকার কোন অর্থই যে হয় না। কিন্তু ইহার আতঙ্ক অত্যন্তই সুস্পষ্ট,—ঠাণ্ডায় ফ্যাকাসে আঙ্গুলগুলি পর্যন্ত থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। মনে হয় বুকের ভিতর ধুকধুকানিরও সীমা নাই। শঙ্কর বলিল, আপনার শরীর আজ ভাল নেই মনে হচ্ছে।

জ্বরে অজ্ঞান স্ত্রীকে অতিক্রম করিয়া সদ্যপরিচিতার শরীর একটু ভাল না থাকার জন্য দুর্ভাবনা ভাল শোনাইল না। মুখ তুলিয়া ম্লান হাসিয়া হিমানী বলিল, রোজ যেমন থাকি আজও তেমন আছি। আমার কথা বাদ দিন। শরীর ভাল থেকেই বা কি হবে! ডাক্তার চ্যাটার্জ্জি এসেছিলেন, রক্ত নিয়ে গেছেন। ওষুধও লিখে দিয়েছেন, জ্ঞান হ'লে একদাগ খাওয়াতে হবে।

আমার জন্য কিছুই করার রাখেন নি দেখছি। ডাক্তারের ভিজিট?

লাগেনি। উনি আমার বন্ধু।

তবে পীড়াপীড়ি করব না; কিন্তু আপনার চা খাওয়ার সময় পার হ'য়ে গেছে, আপনি এবার ছুটি নিন।

হিমানী ব্যাকুল হইয়া বলিল, না, না, আমায় ওঁর কাছে থাকতে দিন। চা এখানেই দিয়ে যাবে।

লণ্ঠনটা নতুন—ধোঁয়া হয় না, কিন্তু কমানো রহিয়াছে বলিয়া আলো অনুজ্জ্বল। এই আলোতেই হিমানীর মুখখানা যেন স্পষ্টতর দেখাইতেছে। সেদিকে চাহিয়া থাকিয়া শঙ্করের মনে হইল আপিস যাইবার সময় সে কি কল্পনাও করিতে পারিয়াছিল যে ফিরিয়া আসিয়া গৃহে এমন দুর্ভাবনা ও এতবড় বিস্ময় সঞ্চিত থাকিতে দেখিবে! হিমানীর আজকার ব্যবহার অদ্ভুত। চার বছরের প্রতিবেশী ইহারা; কিন্তু গরীব প্রতিবেশীকে কবে কতটুকু আমল দিয়াছিল? সম্বৎসরে হিমানী ও বিধুর মধ্যে একটি বাক্য-বিনিময়ও হইয়াছে কিনা সন্দেহ! আর আজ নিজে হইতে আসিয়া এমন সেবাই আরম্ভ করিয়া দিল যে প্রয়োজন শেষ হইলেও উঠিয়া যাইতে চায় না।

টাইমপিসটায় দশটা বাজে। বেলা একটা হইতে একভাবে বিধুর শিয়রে বসিয়া আছে। তিনচারবার নিজে ডাকিতে আসিয়া একরকম ধমক খাইয়াই সুকান্ত ফিরিয়া গিয়াছে। কেরানীর কুশ্রী বধূর সেবার জন্য ধনীর তরুণী প্রিয়ার এ কি লোলুপতা! মহত্ত্ব সন্দেহ নাই, উদারতারই পরিচয়, কিন্তু কী অস্বাভাবিক!

আধঘণ্টা পরে সুকান্ত আবার আসিল। কোন কথা না বলিয়া গম্ভীর মুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অসীম কুণ্ঠার সঙ্গে শঙ্কর মিনতি করিয়া হিমানীকে বলিল, আর তো দরকার নেই, এবার আপনি যান। কতক্ষণ এভাবে ঠায় বসে থাকবেন?

অপ্রত্যাশিতভাবে এবার কিন্তু প্রতিবাদ আসিল সুকান্তর নিকট হইতে—থাক শঙ্করবাবু, কিছু বলবেন না, একেই সেবা করতে দিন।

অবাক হইয়া শঙ্কর বলিল, কিন্তু—

সুকান্ত মাথা নাড়িল কিন্তু নয়। বাড়ী গিয়ে ছটফট করার চেয়ে এখানে শান্তিতে থাকা ভাল। আমার যদি একটু বসবার ব্যবস্থা করে দেন ওর সেবা করাটা দেখতে পারি।

মেঝেতে মাদুর বিছাইয়া দিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইতেই শঙ্কর দেখিল, হিমনী কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া আছে। সুকান্ত একপ্রকার দুর্ব্বোধ্য হাসি দিয়া সে দৃষ্টিকে নন্দিত করিল, তারপর ঘরের চারিদিকে একবার চোখ বুলাইয়া গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল।

খাদ্য আসিয়াছিল সুকান্তর বাড়ী হইতে। ছেলেমেয়েরা খাইয়া ঘরের এককোণে ক্ষুদ্র বিছানায় জড়সড় হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। শঙ্কর বিছানার পাশে মাটিতেই বসিল। বুকের ভিতর চাপবাঁধা দুর্ভাবনা, তবু হঠাৎ তার যেন হাসি পাইল। ঘরে আজ দুইজোড়া স্বামী-স্ত্রী জড়ো হইয়াছে; কিন্তু জোড়ায় জোড়ায় কি অসীম পার্থক্য! শয্যায় পড়িয়া আছে চামড়া-ঢাকা একটা কঙ্কাল, বাসর-রাত্রিতেও যার ওষ্ঠে মধুর বদলে জুটিয়াছিল দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে পচা খাদ্যকণার দুর্গন্ধ, আজ সাত বছরের বেশী যে তার মনকে উপবাসী রাখিয়া দু'বেলা যোগাইয়াছে শুধু রাঁধা ভাত। তিনটি পেটমোটা শিশুর শিয়রে বসিয়া আছে একটা কলেপেষা জীবন্ত ইক্ষুদণ্ড, জীবনটা যার স্রষ্টা কবির সৃষ্টির খাতায় ভুলিয়া যাওয়া শাদা পৃষ্ঠা। আর রুগ্নার শিয়রে যে স্ত্রীটি বসিয়া আছে, যে স্বামিটি বসিয়া আছে তাহারই ছেঁড়া

মানুষে—রূপ-যৌবন অর্থ-সম্মান হাসি-উৎসবের কী সমারোহ উহাদের জীবনে। রাত্রি এগারটার সময়েও বিধুর জ্ঞান হইল না। কিছুক্ষণ হইতে হিমানী উসখুস করিতেছিল, হঠাৎ ব্যাকুল হইয়া সুকান্তকে বলিল, ডাক্তার বাবুকে আর একবার নিয়ে এসো।

সুকান্ত নীরবে উঠিয়া দাঁড়াইল।

হিমানী বলিল, দু'জন এনো, কনসাল্ট করবেন।

সুকান্তর মুখে বিস্ময়ের চিহ্নও নাই, শুধু অভিজ্ঞতা। সামান্য একটু মাথা নাড়িয়া এমনভাবে স্বীকৃতি জানাইল যেন দু'জন ডাক্তার আনবার কথা সেও ভাবিতেছিল।

প্রতিবাদের ইচ্ছা শঙ্করের মনে জাগিয়াছিল, কিন্তু কিসের প্রতিবাদ করিবে? ইহাদের ভাব দেখিয়া একথা তো কল্পনাও করা যায় না যে, কলিকাতার সমস্ত ডাক্তার আনিয়া বিধুর চিকিৎসা করার চেয়ে বড় কর্তব্য ইহাদের আর কিছু আছে।

টর্চ্চ জ্বালিয়া সুকান্ত চলিয়া গেল। পাড়াটা স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে—সেও যেন আজ অসুস্থ এবং ত্রয়োদশীর চাঁদের আলোর উপর তার শুশ্রূষার ভার। জানালার বাহিরেই চাঁদ ওঠার ইঙ্গিত, রোয়াকে বিধুর হাতে মাজা পিতলের ঘটিটা চকচক করিতেছে। বিধুর পায়ের আঙ্গুলে রেড়ির তেলে ভেজা ন্যাকড়া জড়ানো, হঠাৎ শঙ্কর তাহা লক্ষ্য করিল। আজ দুর্ভাবনা—অতন্দ্র নিশায় আলো নিবাইলে ওই পায়ে যদি জ্যোৎস্না আসিয়া পড়ে?

হিমানীর পা' দুটি চৌকীর তলের আবছা অন্ধকারে। জরিবসানো চটির দু'একটা জরি শুধু চিক-চিক করিতেছে। পা' দুটি যেন অন্ধকারে মোড়া সোনা, কয়েকটি সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া পরিচয় মিলিতেছে। ওই পায়ের গোড়ালি কি ফাটা? আঙ্গুলের চিপায় কি জলে ক্ষয়-পাওয়া শাদা ঘা?

শঙ্করের মনে হইল হিমানীর পা' দুটি চৌকীর তলা হইতে টানিয়া আনিয়া এই অসম্ভব সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া না নিলে চিরদিন তার মন কেমন করিবে।

চোখদুটা জ্বালা করিতেছে দেখিয়া শঙ্করের কৌতুক বোধ হইল। থাকিবার মধ্যে চোখে আছে একটু ক্ষীণ দৃষ্টি—সে চোখ আবার জ্বালা করে!

আপনি খাবেন না? খেয়ে নিন। ভেবে আর কি করবেন!

শঙ্কর চাহিয়া দেখিল হিমানী মুখের দিকে চাহিয়া আছে। স্ত্রীর অসুখের কথা ভাবিতেছে না বলিয়া তার একবিন্দু লজ্জা হইল না। বলিল, আজ খাব না।

আপনি না খেলে এঁর কোন উপকার হবে না।

আমার অপকার হবে। অম্বলে বুক জ্ব'লে যাচ্ছে।

সকলেরি দেখছি সমান অবস্থা। আমারও অম্বল হ'লে বুক জ্ব'লে যায়।

বসিয়া থাকিতে থাকিতে শঙ্কর কুঁজা হইয়া গিয়াছিল, অকস্মাৎ সোজা হইয়া বলিল—

আপনার অম্বল!

হিমানী ম্লান হাসিল, আর কলিক। যে দিন ধরে মনে হয় ব্যথায় বুঝি দম আটকাবে। মাগো, সে যে আমার কি কষ্ট!

শঙ্কর আবার কুঁজা হইয়া গেল—বিশেষভাবে হতাশ হইলেই তার মেরুদণ্ডটা ধনুকের মত বাঁকিয়া যায়।

হিমানী একটু ভাবিয়া বলিল, কিন্তু ওজন্য আমার নালিশ নেই।

কলিকের ব্যথা থাকার জন্য আবার নালিশ কি থাকিতে পারে শঙ্কর বুঝিতে পারিল না, বলিল, কেন?

হিমানী নতমুখে অস্বাভাবিক গলায় বলিল, শুনলে আপনি লজ্জা পাবেন, ও যে আমার প্রাপ্য। প্রত্যেকটি মেয়ের জন্য ভগবান নির্দ্দিষ্ট ব্যথা মেপে রাখেন, মাথা পেতে নিজের ভাগ নিতেই হবে। ব্যথার এক রূপ এড়িয়ে গেলে অন্যরূপে দেখা দেবেই।

কী অদ্ভুত মন্তব্য! সঙ্কোচে নয়, মন্তব্যের ভারে শঙ্কর মাথা হেঁট করিল। কথাগুলি যেন একবোঝা অভিযোগ—একটি সুদীর্ঘ জীবনের ব্যর্থতার মত অসম্ভব ভারি!

কিন্তু শয্যাশায়িনী ওই সংক্ষিপ্তা মানবীটির অভিযোগও তো নিখিল মানবতার ইতিকথায় প্রক্ষিপ্ত নয়! ওর বুকের প্রত্যেকটি দৃশ্যমান পাঁজরা, ওর কালিপড়া চোখের অত্যধিক স্নেহের কালো ছানি, ওর জীবনযাত্রার অধিকারীর অন্তহীন বঞ্চনার তবে মানে কি! ভগবানের মাপিয়া-রাখা ব্যথার ভাগের সঙ্গে মানুষের গুঁজিয়া-দেওয়া ব্যথায় ওর শিরায় রক্তের রঙও বুঝি ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে।

হিমানীর কথাটা সে বুঝিল, না বোঝার মত করিয়া। ও নিত্য অপরাহ্নে বকুলতলায় স্বামীর সঙ্গে চা পান করিতে পায়। ভোর বেলা মোটরে চাপিয়া লোকালয় ছাড়িয়া গিয়া খোলা মাঠের মাঝখানে নির্জ্জন পথপ্রান্তে ক্ষণকাল বিশ্রাম

করে। লক্ষ ছাপানো মনের সঙ্গে নিত্য ওর ঘনিষ্ঠতা জন্মে,—আঙুলের সোনার কাঠি দিয়া সেতারের ঘুমন্ত রাগ-রাগিণীরও ঘুম ভাঙায়। গন্ধতেলে খোঁপা বাঁধে, সাবান মাখিয়া স্নান করে, ঘরে পরিয়া বেনারসী ছিঁড়িয়া ফেলে।

বিধুর কি আছে ?

সহানুভূতির অভাব ছিল না কিন্তু ; হিসাবে হিমানীর হার হইল।

সুকান্ত ডাক্তার নিয়া ফিরিবার পূর্ব্বে বিধুর জ্ঞান হইল। রক্তবর্ণ চোখ মেলিয়াই সকলকে চমকাইয়া দিয়া চেঁচাইয়া উঠিল। হিমানীর হাত হইতে দুইটা আইস-ব্যাগই খসিয়া পড়িল। ছোট খোকা ঘুম ভাঙিয়া করুণ সুরে কাঁদিতে লাগিল। শঙ্কর ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বিধুর আর্ত্তনাদের শব্দার্থ এই :

মাগো এ ডাইনী কে ! খোকা ! ওরে খোকা !

বার কয়েক গলা চিরিয়া খোকাকে ডাকিয়া সে দিব্য সুর করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিল, খোকারে…

হিমানী আইসব্যাগ দুটি তুলিয়া আবার মাথায় চাপিয়া ধরিল। খানিক পরে শ্রান্ত হইয়া বিধু বোধ হয় ঘুমাইয়া পড়িল।

হিমানী জিজ্ঞাসা করিল, খোকা কোন্‌টি ?

নেই।

নেই !

নাঃ। ওর মনে থাকতে পারে, পৃথিবীতে নেই। জ্যোৎস্নারাতে খোকা একদিন ছাদ থেকে পাকা উঠানে প'ড়ে গিয়েছিল।

হিমানী চমকিয়া বলিল, সত্যি ?

হ্যাঁ। জ্যোৎস্না উঠলেই খোকাকে নিয়ে ও ছাতে উঠত কেন কে জানে ! রান্নার ফাঁকে ফাঁকে কতবার যে ছুটে যেত ঠিকানা নেই। জিজ্ঞাসা করলে বলত, জ্যোৎস্না দেখতে ভাল লাগে।

ও কথা সত্যি নয়।—হিমানীর কণ্ঠে কাতরতা।

তা ঠিক। জ্যোৎস্না দেখে ওর ভাল লাগা অসম্ভব। কিন্তু কেন যে উঠত ভেবে পাই না।

মুখ আড়াল রাখিয়া হিমানী নীরব হইয়া রহিল। তেল কমিয়া গিয়াছিল,

কয়েক দপদপ করিয়া আলোটা নিবিতে আরম্ভ করিল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর শঙ্কর যখন তেলের বোতলটা নিয়া আসিল আলো প্রায় নাই। দেখা গেল জ্যোৎস্না আসিয়া সত্যই বিধুর পায়ের কাছে বিছানায় লুটাইয়া পড়িয়াছে। বিধু কিন্তু পা গুটাইয়া নিয়াছিল।

তেল ভরিবার চেষ্টায় আলোটা একেবারে নিবিয়া গেল। প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে হিমানী বলিল, কতদিন আগে শঙ্কর বাবু ?

কিসের ?

কতদিন আগে খোকা ছাত থেকে—?

আলো জ্বালিবার চেষ্টা করিতে করিতে শঙ্কর বলিল, পাঁচ ছ'মাস হ'ল বৈকি।—চৈত্রের প্রথমে।

কান্না শুনিনি তো !

শঙ্কর মাথা নাড়িল, ও এখানে কাঁদেনি। খোকার সঙ্গে হাসপাতালে গিয়েছিল, সেখান থেকেই ওকে ওর মা'র কাছে রেখে এসেছিলাম।—লণ্ঠনটা কেরাসিন কাঠের ভাঙ্গা টেবিলে বসাইয়া দিয়া পূর্ব্বস্থানে বসিয়া গম্ভীর গলায় বলিল, কি জানেন, মড়াকান্না আমার একেবারে সহ্য হয় না।—মাথা ঘোরে।

যেন সে ছাড়া জগতের আর সব মানুষের মড়াকান্না সহ্য হয়, যে কাঁদে তারও ! মানুষ যে কাঁচা মাটির পাত্র, একবার ভাঙ্গিলে চোখের জলে গুলিয়া আবার গড়া যায় একথা সে যেন জানে না। যেন একান্ত অনভিজ্ঞ শিশুটি !

হিমানী কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, মড়াকান্না সত্যি বড় বিশ্রী। কিন্তু কাঁদতে না পারলে আরও বিশ্রী হয়। আমার ছোট ভাইটি যখন ম'রে যায় আমি কাঁদতে পারিনি।

শঙ্কর বলিল, কেন ?

কি জানি। নিজের হাতে মানুষ করেছিলাম ব'লে বোধ হয়। ছ'মাসের ভাইকে সাতবছরের করেছিলাম, সে মরলে কি কেউ কাঁদতে পারে ?

শঙ্কর নীরবে মাথা নাড়িয়া জানাইল—পারে না।

হিমানী যেন তাহাতে খুশি হইল না, ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, অন্ততঃ পারা উচিত নয়। ও-রকম ভাইয়ের সঙ্গে পেটের ছেলের কি তফাৎ আছে ! মরলে অজ্ঞান হ'তে হয় কাঁদতে নেই।

বলিয়া সে নিজের মনে বার কয়েক শিরশ্চালনা করিল। আবোল তাবোল মন্তব্যগুলির মধ্যে ইহা কোন্‌টির প্রতি সংশয়ের প্রতীক বুঝিতে না পারিয়া শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

ডাক্তার চ্যাটার্জ্জি এবং কলিকাতার আর একজন নামকরা ডাক্তারকে নিয়া সুকান্ত ফিরিল। চ্যাটার্জ্জি রক্ত পরীক্ষা করিয়াছিলেন ; বলিলেন, রক্তে মেলিগ্‌ন্যান্ট ম্যালেরিয়ার জীবাণুর অন্ত নাই। অন্যজন বিনা বাক্যব্যয়ে ইঞ্জেকসনের পিচকারীতে কুইনাইন ভরিলেন।

শঙ্কর বলিল, হাড়ে লেগে ছুঁচটা যেন না ভাঙ্গে ডাক্তারবাবু।

এই মন্তব্যে ঘরের আবহাওয়াটা অকস্মাৎ বীভৎস রকমের করুণ হইয়া উঠিল।

ডাক্তার বিদায় নেওয়ার খানিক পরে হিমানী শান্তভাবে স্বামীর সঙ্গে চলিয়া গেল।

ফিরিয়া আসিতে যতটা সময় লাগিল তাহাতে বোঝা গেল বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল।

একটা কথা বলতে এলাম, বলিয়া ভূমিকা করিল।

কি কথা বলুন।

পাঁচ ছ'মাস আগে জ্যোৎস্না উঠলে আমরাও ছাতে উঠতাম। খোকার মৃত্যুর জন্য আমাদের কি পাপ হয়নি ?

শঙ্কর আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, আপনাদের কেন পাপ হবে ?

হিমানীর চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল, বলিল, হয়েছে। আমি সত্যি ডাইনী। না জন্মাতেই আমার সব খোকাকে আমি মেরেছি, কারো খোকা মরলে আমি ছাড়া আর কার পাপ হবে ? জানেন জ্যোৎস্নায় নামতে আজ আমার গা ছমছম করছে। আপনার সেই খোকা যদি আঁচল ধ'রে টানে ?

টানিলে শঙ্কর কি করিবে ? পিতা বলিয়া এখন কি আর সে তার কথা শুনিতে চাহিবে।

হিমানী বলিল, আমার সঙ্গে একটু আসবেন?

সুকান্ত নিঃশব্দে পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, মৃদুস্বরে বলিল, ভয় কি, এসো।

সকালে সুকান্ত খবর নিতে আসিল বিধু কেমন আছে। চেহারা দেখিয়া সে যে সমস্তরাত্রি ঘুমায় নাই বুঝিতে কষ্ট হয় না। শঙ্কর টুলটা আগাইয়া দিয়া বলিল, বসুন।

দাঁড়ান, খবরটা দিয়ে আসি আগে; বলিয়া সুকান্ত চলিয়া গেল। পাঁচমিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া বিনা আহ্বানেই টুলটাতে বসিয়া পড়িল।

সকাল বেলার আলোতে রাত্রির আলোর ইঙ্গিতটুকুও নাই, এবং তাহা নিঃসন্দেহে পরম আশ্চর্য্যের ব্যাপার। তথাপি বিধুর পায়ের আঙ্গুলে জড়ানো রেড়ির তেলের ন্যাকড়াটা শঙ্কর কখন যেন খুলিয়া নিয়াছে।

সুকান্ত বলিল, বুঝলেন শঙ্করবাবু, জীবনে একফোঁটা সুখ নেই।

একথা সকলেই জানে, শঙ্কর কিছু বলিল না।

আপনার এখান থেকে গিয়ে কি চেঁচামেচি আর কান্না যে আরম্ভ ক'রে দিলে যদি দেখতেন। কোন অভাব নেই তবু কেন যে ওর মাথা এমনভাবে খারাপ হ'য়ে গেল!

অভাবের প্রাচুর্য্যে আধমরা স্ত্রীর দিকে চাহিয়া শঙ্কর এবারও কিছু বলিতে পারিল না।

সমাপ্ত